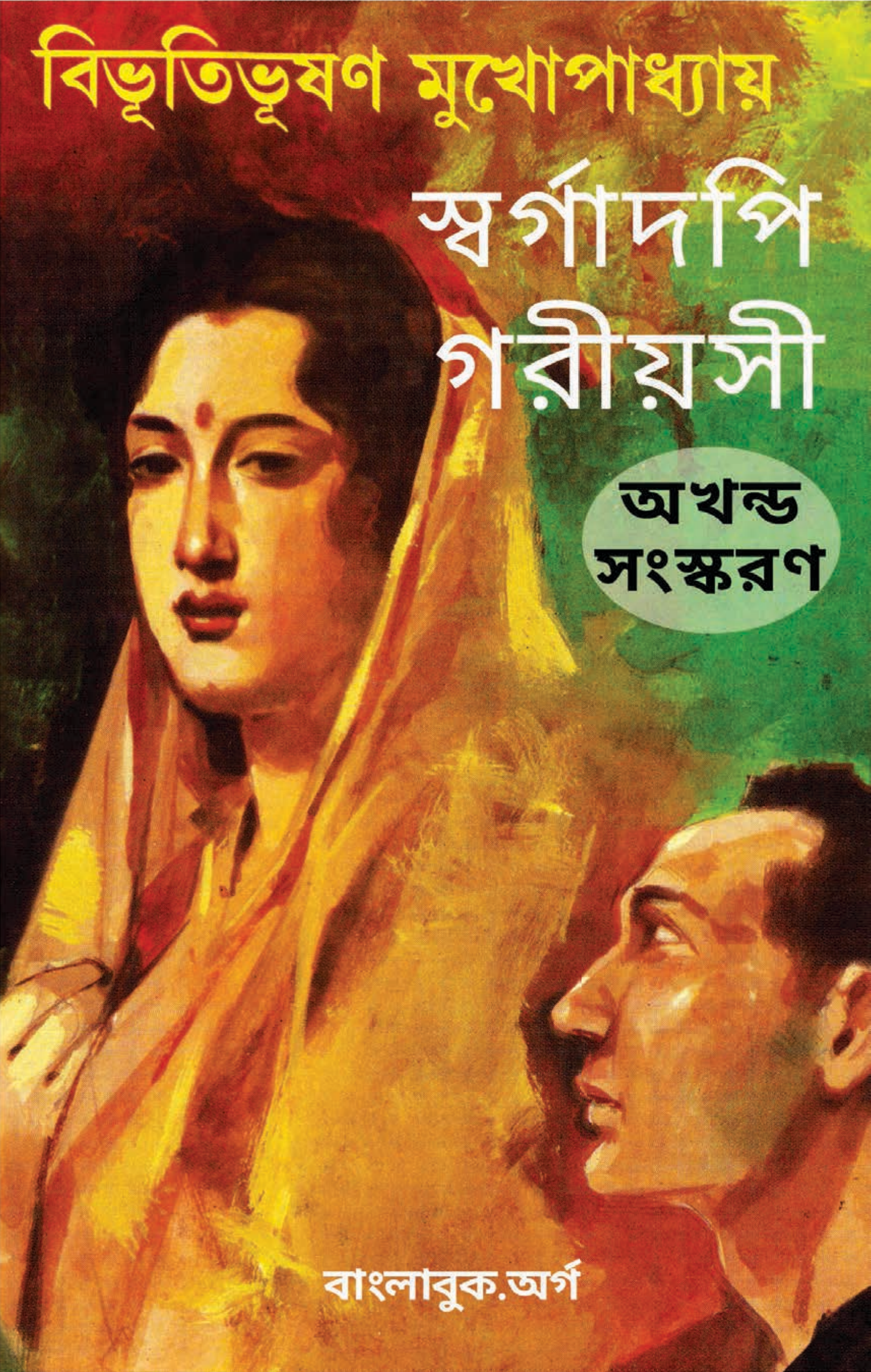
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
স্বর্গাদপি
গরীয়সী
অখন্ড
সংস্করণ
বাংলাবুক.অর্গ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের এমন একটি অনন্য স্থানের অধিকারী, যেখানে তাঁর কোনও সমকক্ষ নেই—এমন কি নিকটবর্তীও কেউ নেই—একথাও স্বচ্ছন্দে বলা চলে। বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসের যে জাহ্নবীধারা তিনি বইয়েছেন তা তাঁর নিজস্ব—সে রসধারা নির্মল, পবিত্র, অফুরন্ত হাস্যরসের প্রবাহ। কোথাও তা সীমা লঙ্ঘন করেনি, আবার কোথাও কোথাও সে হাস্যরসের সঙ্গে করুণরস মিশ্রিত হয়ে এক অপরূপ স্বর্গীয় জগতের সৃষ্টি করেছে। তবে হাস্যরসের শ্রেষ্ঠ লেখকই বিভূতিবাবুর একমাত্র পরিচয় নয়, সাধারণ কথাসাহিত্যে বা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তাঁর শক্তি ও বৈশিষ্ট্য সর্বজনস্বীকৃত। স্বর্গাদপি গরীয়সী উপন্যাসটি বিভূতিভূষণের মহত্তম ও শ্রেষ্ঠতম রচনা। এই গ্রন্থের প্রায় সব চরিত্রই বিভূতিভূষণের জানা, দেখা, অন্তরঙ্গজনের রূপকল্প। সর্বোপরি এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা তাঁরই পিতা-মাতা। এবং সে পিতামাতা স্বনামেই বর্তমান সেখানে। শুধুমাত্র গঠন পরিকল্পনায় নয়, অত্যাশ্চর্য লিপি-কৌশলে অপরিসীম মানবপ্রেমে ও অনুভূতিতে, অসামান্য চরিত্রবর্ণনায় এই উপন্যাসের জুড়ি বাংলাসাহিত্যে তো নেইই—বিশ্বসাহিত্যেও বোধ করি দুর্লভ।

প্রচ্ছদ—অনুপ রায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ২৪শে অক্টোবর ১৮৯৪ সালে মিথিলার এক গ্রামে। দারভাঙায় শিক্ষা ও বসবাস। ১৯৪২ থেকে পুরোপুরি সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বিভূতিভূষণ ১৯৫৮ সালে আনন্দ পুরস্কার, ১৯৭২ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৭৮ সালে শরৎচন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পুরস্কার ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট, শান্তিনিকেতনের দেশিকোত্তম প্রাপ্তি তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার অনন্য স্বীকৃতি। ১৯৮৭ সালের ২৯শে জুলাই তাঁর তিরোধান হয়।

স্বর্গাদপি গরীয়সী

(তিন খণ্ড একত্রে)

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম অখণ্ড সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৮৮
চতুর্থ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৪১৭

— দু'শো টাকা —

প্রচ্ছদপট অঙ্কন
অনুপ রায়

SWARGADAPI GARIYASI
A novel by Bibhutibhusan Mukherjee. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata - 700 073

Price Rs. 200/-

ISBN 81-7293-731-8

॥ বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ॥

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রকম পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্ব্যবহার বা পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শব্দগ্রন্থন : লেজার ইম্প্রেশনস্

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে পি, দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও ইউনিক কালার প্রিন্টার্স, ২০এ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

সৃষ্টির পরিকল্পনায় যাঁরা 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'
তাঁদেরই উদ্দেশে—

স্বর্গাদপি গরীয়সী

প্রথম খণ্ড ▫ দ্বিতীয় খণ্ড ▫ তৃতীয় খণ্ড

একত্রে অখণ্ড সংস্করণ

স্বর্গাদপি গরীয়সী

প্রথম খণ্ড

প্রথম পর্যায়

॥ ১ ॥

কি জানি কেন, কাজ করিতে করিতে হঠাৎ শৈলেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে।—

সব ব্যবধান-বৈষম্য মিটিয়া গিয়াছে,—স্থান, কাল, এমন কি পাত্রেরও। দেখিতেছে তাহার ললাট একটি শিশু-কন্যার চরণে লুণ্ঠিত—আলতা-পরা, পদ্মকোরকের মতো দু'খানি পেলব চরণ।

চারিপাশে আরও কত শত কি সব স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে: গোলপাতায় ছাওয়া চারখানি ঘর, মাঝখানে ভিজা-ভিজা কালচে মাটির একটা উঠান। একপাশে তুলসীমঞ্চ, তাহার উপরটা ঢাকিয়া একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। সদর দিকে সিঁড়ি দিয়া নামিয়াই একটা অপ্রশস্ত গ্রাম্য পথ, তার একদিকে ঝুরিনামা বটের নিচে ধর্মঠাকুরের মন্দির, একদিকে মোড় ঘুরিয়াই পাঁচুর-মায়ের মুড়কির দোকান। পাঁচুর মাকেও দেখা যায়—নথে, অনন্তয় আর ঠ্যাকারে জ্বলজ্বলে মানুষটি।...খিড়কির দিকে উঠানটা আস্তে আস্তে ঢালু হইয়া গিয়া মন্থর-গতি কানা-নদীর মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কঞ্চির বেড়ার উপর ভর করিয়া সাথীর মতোই দুইপাশ দিয়া নামিয়া গিয়াছে পুষ্পিত লতার ঝাড়—বন্য তেলাকুচাও আছে, যত্ন করিয়া আজ্জান অপরাজিতাও আছে। একদিকে একটা শিউলি ফুলের গাছ, কতকটা অসময় হইলেও তলায় অল্প ফুল বিছানো। গন্ধ পাইতেছে শৈলেন, অস্পষ্ট, কিন্তু ভুল হইবার নয়; সমস্ত মনটাকে যেন ভরিয়া তুলিতেছে। শুধু বর্ণ-গন্ধই নয়,—পাশেই কাদের বাড়িতে একটি ক্ষুধিত-গাভী হাম্বা রব করিয়া উঠিল, কে তাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—থাম্, এলাম হাতের পাটটুকু সেরে।...আর তর সয় না ওঁর।

পরিষ্কার করিয়া নিকানো শিউলি গাছের তলায় খানিকটা জায়গা ইটের বেড়া দিয়া ঘেরা। তাহার মধ্যে নানা আকারের খোলামকুচি, একটা ভাঙা কলসের কাণা, গোটাকতক ইতুর-ভাঁড়, একটা ভাঁড় হাতার টুকরা, একটা ছোট্ট বঁটি—সব যত্ন করিয়া সাজানো। শিশুটি এই গৃহস্থালীর কর্ত্রী। একদিকে একখানি ইট পাতা, তাহার উপর একটি হাতভাঙা মাটির পুতুল শোয়ানো রহিয়াছে। ইটটি দোলনা, পালঙ্ক হইতেও বাধা নাই, পুতুলটি কর্ত্রীর শিশুপুত্র।

ছেলে যে ঘুমাইয়া আছে এমন নয়, অত্যন্ত বায়না ধরিয়াছে, মা বেশ বিব্রত।

ওপাশের একটি ঘরের দাওয়া থেকে ডাক পড়িল—"গিরি, খাবি আয়, রাখ তোর পুতুল খেলা এখন।"

BanglaBook.org

মেয়েটি গৃহস্থালীর ব্যস্ততার মধ্যে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। গৃহিণীপনার অভিনয়ে মুখখানি রাঙা হইয়া গেছে। সেই রাঙা মুখের উপর, টুকটুকে ঠোঁটের মাঝখানটিতে কম্পমান নোলকের উপর, ছোট্ট শাড়িখানির রাঙা পাড়ের উপর, গাছের ফাঁক দিয়া দীপ্ত রৌদ্রের আলোক আসিয়া পড়িয়াছে—পুণ্য শৈশবের উপর স্বর্গের পরশ;—গাছের তলাটি হঠাৎ যেন ঝলমল করিয়া উঠিল।

শৈলেন কালের ব্যবধান থেকে দেখিতেছে স্বর্গের ছবি, দাওয়া থেকে কিন্তু যিনি ডাক দিলেন তাঁহার মেজাজ ছবি দেখার অনুকূল নয়। বেশ ঝাঁজিয়াই বলিতেছেন—"বলি, খেতে হবে না? ঐ আদাড়ে খেলা নিয়ে থাকলেই চলবে? কী বাই বাপু!—পুতুল খেলা তো কেউ কখন করেনি। আয়, এলি, না নামব?...দেখো মেয়ের চেহারা, দুপুর রোদ্দুরে মুখ একেবারে সিঁদুরবর্ণ হয়ে উঠেছে!"

মেয়েটি অগ্রসর হইতেছিল, আবার ব্যাকুলভাবে একবার ফিরিয়া পুতুলটির পানে চাহিল, তাহার পর আবার মায়ের পানে মিনতিনেত্রে চাহিয়া বলিল—"যাচ্ছি মাগো, একটুখানি রোস, এ—ক্‌টুখানি।"

যাইতেছিল মায়ের আহ্বানে, মায়ের কথাতেই তাহার বাধা পড়িল,— দুপুরের রোদে যদি তাহার নিজের মুখ সিঁদুরবর্ণ হইয়া থাকে তো তাহার ছেলেরও তো ঐ অবস্থাই হওয়ার কথা! পোড়ামাটির পুতুলে সিঁদুরবর্ণ কল্পনা করিতে অসুবিধাও হইল না, গিরিবালা গিয়া পুতুলটিকে বুকে চাপিয়া লইল। তাহার পর আরম্ভ হইল বিনাইয়া বিনাইয়া নানান্ রকম আলাপ-অনুযোগ—অবাধ্য ছেলে কথা শোনে না, শুধু দৌরাত্ম্য করিয়া বেড়ানো! রোদ নাই, বৃষ্টি নাই—মুখখানা যে একেবারে সিঁদুরবর্ণ হইয়া গেছে! হুঁশ আছে সেদিকে ছেলের? মা একলা মানুষ কতদিকে যে দেখবে।

এমন সময় আসল মায়ের আর একটা উগ্রতর ধমক আসিল, নকল মাকে চলিয়া যাইতে হইল।

॥ ২ ॥

ছেলেটিকে অবশ্য কাঁখে করিয়া লইয়া আসিল।

প্রথম কারণ—কচি ছেলে, তায় ক্রন্দমান, বায়না ধরিয়াছে ; তাহাকে একা ফেলিয়া আহার করিতে বসা চিরাচরিত মাতৃধর্মের বিরোধী। দ্বিতীয়ত, এক সে-ভিন্ন দুই বাড়ির শিশুমহলে কেহই স্থায়ীভাবে বিশ্বাস করে না যে ওটি একটি মানব-শিশু। সুতরাং ওর প্রতি সবারই পুতুলের লোভ আছে, একটা গোটা ছেলের উপর যে দরদ থাকা দরকার তাহা নাই। ঐ হাত-ভাঙার ব্যাপারটাই ধরা যাক, মা অবশ্য ওটাকে ছেলের দস্যিপনার নিদর্শন করিয়া লইয়া তাহার মানবত্বের প্রমাণ পাকা করিয়া লইয়াছে, কিন্তু ভিতরের কথা এই যে, তাহার অলক্ষিতে কোন অদরদীর হাতে ওটি নিছক মাটির পুতুলের মতোই ন্যাড়াচাড়া খাইয়াছিল বলিয়া ওর ঐ দুর্গতি। মতের মধ্য যেখানে এতটা প্রভেদ সেখানে ছেলেকে টাঙাইয়া লইয়া যাওয়া ছাড়া উপায় কি? মুখে বিপর্যস্ত মায়ের বিরক্তি ও ব্যাকুলতার ভাবটুকু ফুটাইয়া গিরিবালা রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া উঠিল।

BanglaBook.org

ছোট ভাই হরিচরণ নিতান্তই ছোট। খাইতেছিল, উৎসাহভরে প্রশ্ন করিল—"টোর ছেলেকে ভাট খাওয়াবি ডিডি?"

দিদি চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল—"চুপ কর হরু! ও কি ভাত খেতে পারে কখনও?"

হরিচরণের বিশ্বাসটা সত্য আর মিথ্যার মধ্যে দোলে। দিদিকে ছেলে কোলে আর সব মায়ের মতোই ভার-মন্থর গতিতে আসিতে দেখিয়া আশা করিয়াছিল পুতুলের মুখে সত্যকার অন্ন দেওয়ার মতো পরম বিস্ময়কর ঘটনাটা প্রত্যক্ষ করিবে; দিদির কথায় নিরাশ এবং একটু লজ্জিত হইয়া প্রশ্ন করিল—"মুখ নেই, নারে?"

দিদি পিঁড়ায় বসিতে বসিতে বলিল—"না, মুখ নেই! তোর বুদ্ধিসুদ্ধি কবে হবে বল দিকিন হরু? মুখ নেই তো বেঁচে আছে কি করে?"

একে তর্কটা অকাট্য, তায় বুদ্ধি সম্বন্ধে খোঁচা আছে, হরু আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া আহার করিতে লাগিল। গিরিবালা থেবড়ি খাইয়া বসিয়াছে, ছেলে কোলে করিয়া মায়েরা সাধারণত যেমন বসে; মুখে গ্রাস তুলিয়া হাঁটু দুলাইয়া দুলাইয়া ছেলেকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটিতে সত্যের রূপ আবার এমন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, হরুর পক্ষে আগ্রহ চাপিয়া রাখা ক্রমেই কষ্টকর হইয়া উঠিল; দু'একবার কোলের পুতুলটার পানে আড়চোখে চাহিল, তাহার পর পূর্বের প্রসঙ্গ ধরিয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিল—"টবে কেন খেটে পারে না রে ডিডি?"

দিদি দুরন্ত ছেলের মাথায় বাঁ হাতে মৃদু আঘাত করিয়া বলিল—"ওর কি বয়েস হয়েছে এখনও ভাত খাবার? চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছিস না?"

হরু পুতুলটার দিকে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল; বয়সের কি লক্ষণ আবিষ্কার করিল সেই জানে, বলিল—"খোকার মোটন, না রে?"

দিদি হঠাৎ একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, ভাই-এর মন্তব্যের কোন উত্তর না দিয়া ঘাড়টা একটু তাহার দিকে বাড়াইয়া অপেক্ষাকৃত চাপা কণ্ঠে বলিল—"দুটি ভাত তোর পাতে তুলে দিচ্ছি, মাকে বলে দিবি না তো? খোকার সমস্ত পাট আমার পড়ে রয়েছে ওদিকে।"

হরু অনেকক্ষণ পূর্বে খাইতে বসিয়াছিল, পেটে বিশেষ জায়গা ছিল এমন নয়, তা ভিন্ন শুধু ভাতের এমন কিছু একটা মোহও নাই; তবুও দিদির প্রয়োজনের গুরুত্বটা উপলব্ধি করিয়া রাজী হইল।

মা ভাত বাড়িয়া দিয়া কার্যান্তরে ওদিককার ঘরে গিয়াছেন, ভাইবোনের কথাবার্তা তাই এত মুক্ত এবং সাহস এত প্রবল।

"তাহলে আদ্দেকটা দিই?...তা হরু নেবে খন, বড্ড লক্ষ্মী ছেলে।...তুইও শিগগির শিগগির আসবি চলে, খেলবি।"—স্তোকবাক্যে ভাইকে ভিজাইয়া ভাত তুলিয়া দিতে যাইতেছিল, ওদিককার ঘর হইতে বরদাসুন্দরীর গলা শোনা গেল—'হ্যাঁ, দে তুলে ভাত! আমি সব দেখতে পাচ্ছি গিরি;— যখনই কাঁখে ভাঙা পুতুলটা দেখেছি, বুঝেছি খাওয়ার দফা নিকেশ। একটি ভাত যদি পাতে পড়ে থাকে, আমি জন্মের শোধ খেলা ঘুচুব, না খেয়ে খেয়ে মেয়ের চেহারা হচ্ছে দেখ না! বাপের আবার শখ ঐ মেয়ে গৌরীদান করবেন! মরি!"

BanglaBook.org

বোধ হয় নিজের দোষটুকু ঢাকিয়া লইবার জন্যই কন্যা বলিল—"তাহলে আর একটু ডাল দিয়ে যাও।"

"ডাল আর হবে না ; ডাল আজ বাড়ন্ত ছিল ঘরে, আর একজন মানুষ এখনও খেতে। যে ক'টা ভাত বাকি থাকে অম্বল দে' খেও, পাতলা করে অম্বল করছি—হয়ে এল।...হরু, তুইও বসবি একটু।"

দুজনেই একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেছে ; খানিকক্ষণ নীরবে আহার করিল, —তাহার পর পরস্পরের মুখের দিকে উভয়ে আড়চোখে চাহিল। বার দু'এক এরূপ চাওয়ার পর দুটি মুখেই একটু করিয়া অর্থপূর্ণ হাসি ফুটিয়া মায়ের বকুনির গ্লানিটা ধুইয়া দিল ; আবার উভয়ের মাঝে পুতুলটা আসিয়া পড়িল ; ভাই বলিল—"টোর ছেলে চুপ করেছে বুঝি?"

দিদি পা-নাড়াটা বন্ধ করিয়াছিল, ভাই-এর কথায় আবার দোলানিটা শুরু করিয়া দিয়া বলিল—"চুপ করার পাত্তোর কিনা! দেখছিস না চোখে?"

চোখে দেখিয়া কিছু বুঝুক বা নাই বুঝুক, পাছে চোখের মতো কানেরও অপবাদ হয় সেই আশঙ্কায় হরু বলিল—"কান ঝালাপালা করে ডিয়েচে, না রে ডিডি?"

ভাই-এর শ্রবণেন্দ্রিয়ের একেবারে এতটা সূক্ষ্মতা দিদি আশা করে নাই, হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"তুই হাসালি হরু, কান নাকি আবার ঝালাপালা করেছে!"

তখনই কিন্তু হাঁটুতে একটা দোল দিয়া পুতুলের মাথায় লঘু করাঘাত করিতে করিতে বলিল—"ঐ শোন্, মামা কি বলছে!"

হরু পুতুলটাকে দিদির ছেলে বলিয়া মানিয়া লইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে যে তাহারও পদবৃদ্ধি হইয়াছে অতটা খতাইয়া দেখে নাই। উল্লসিত হইয়া একটু লজ্জিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"আমি ওর মামা হই, না রে ডিডি?"

দিদি বলিল—"হোস না? আমার ছেলে তোর ভাগনে হয় না? তুই এত বোকা হরু!"

হরিচরণ উবু হইয়া আহার করিতেছিল, জায়গাটা বাঁ-হাতে ঝাড়িয়া লইয়া সভ্যভব্য একজন রীতিমত মামার মতো আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিল, এবং তাহার পর বাঁ হাতটা পেটের মধ্যে গুটাইয়া লইয়া আহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তবুও যেন নিজেকে হালকা বোধ হইতেছিল, মুখেও একটা কিছু না বলিলে যেন মান থাকে না। পাশের বাড়ির মাখনদাদা সম্প্রতি তাহার ভগ্নী আসিলে বড় ভাগনেটির পিঠে হাত দিয়া একটা প্রশ্ন করিয়াছিল ;—তাহা লইয়া আলোচনাটা যেমন গুরুগম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে হরিচরণের মনে হয় প্রশ্নটার দর আছে। সে বড়দের মতো আরও একটু ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিল—"ছেলের পৈটে কবে ডিবি রে ডিডি?"

দিদিও সমালোচনার সময়টায় ছিল ; কি একটা উত্তর দিবে এমন সময় মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দাওয়ায় উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"খেয়ে উঠে খোকাটাকে একটু দেখবি গিরি, দাঁত উঠবে না কি, কোনমতেই একটু থির হয়ে ঘুমোতে চাইছে না। বলছি কদিন থেকে একটা ওষুধ দাও, পরের ছেলেকেই ওষুধ বিলি করে ফুরসৎ নেই তা...অম্বলটা বুঝি গেল ধরে, একটা মানুষ যে ক'দিক দেখে! দিদি আজও গেছেন কালও গেছেন..."

অভাবের সংসার—লোকের অভাব আর এদিকেও বেশ যে সচ্ছল এমন নয়, অথচ

BanglaBook.org

যাহার ভাবিবার কথা তাহার অন্যের কথা ভাবিয়া অবসর থাকে না। বরদাসুন্দরী একটু গর্ গর্ করেন বেশি, তবে কেমন হালকা রাশ, রাগ ধরিয়া রাখিতে পারেন না। তাই কথায় যেটুকু বলেন সেটুকু কাজে কখনও পরিণত করিতে পারিবেন না বলিয়া স্বামী এবং আর সবাই নিশ্চিন্ত থাকে—সংসারের তাগিদে নিজের নিজের পথ ছাড়িয়া একটুও পাশ কাটাইয়া যাওয়ার প্রয়োজন দেখে না। শরতের আকাশের মতো মানুষটি,—যত গর্জান তাহার চেয়ে ঢের বেশি হাসেন—আওয়াজে বুকটা বোধ হয় একটু দুরু দুরু করে, কিন্তু মুখে সবার পরিপূর্ণ প্রসন্নতাই থাকে ছাইয়া।

অম্বল লইয়া আসিয়া হাতা কাত করিয়া বলিলেন—"ওমা, আজ হরুঠাকুর বড় ভবিব্যিসবিব্যি হয়ে বসেছেন যে! ব্যাপারখানা কি?"

ভাইবোনে মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে একবার পরস্পরের পানে আড়চোখে চাহিল, হরিচরণ বেশ একটু লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছে। দিদি প্রশ্ন করিল—"বলব হরু?"

হরিচরণ আরও লজ্জিতভাবে ঘাড়টা গুঁজিয়া দিয়া বলিল—"যাঃ!"

তাহার আপত্তি গ্রাহ্য না করিয়া গিরিবালা মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—"কি বোকা মা হরু?—খেলাঘরের মামা হলে নাকি আসন-পিঁড়ি হয়ে বসতে হয়?"

মা রান্নাঘরে চলিয়া গিয়াছিলেন, কড়ায় খুন্তির দুইটা ঘা দিয়া ঘুরিয়া চাহিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"খেলাঘরের মা যদি আহার-নিদ্রে ভুলতে পারে তো মামা বেচারী শুধু আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আর কি দোষটা করেছে?"

এমন সময় রসিকলালের ঘুড়িটা 'চি-হিঁ-হিঁ' করিয়া ডাকিয়া উঠিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজার কাছ থেকে আওয়াজ আসিল—"মা-রাণী কই গো?"

বরদাসুন্দরী রন্ধনের পাত্রগুলো গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে বলিলেন—"ঐ নাও আসল ছেলেও এল।...খবরদার উঠবিনি গিরি ; এক পলা দুধ দোব, আর দুটি ভাত খেয়ে উঠবি দুজনে।"

"আমি বাবার সঙ্গেই খাব'খন—বলিয়া গিরিবালা অম্বলের একটা মাছ মুখে ফেলিয়া এবং বাকিগুলা ভাইয়ের পাতে দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল।

হরিচরণ বলিল, —"ডিডি টোর ছেলে পড়ে রইল!"

মা আসিতে গিরিবালা পুতুলটাকে নামাইয়া পিঁড়ির পাশে রাখিয়া দিয়াছিল, দাওয়ার নীচে থেকে একবার দ্বিধাভরে ফিরিয়া চাহিল, তাহার পর পুকুরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল —"তুই নিয়ে গিয়ে ওর দোলনায় শুইয়ে দিস ভাই হরু লক্ষ্মীটি।"

॥ ৩ ॥

গিরিবালার ধারাই ঐ। ওর আট বৎসরের স্বল্প শরীর-মনকে আশ্রয় করিয়া একটি পরিপূর্ণ জননী আছে ; সে সর্বদাই আত্মপ্রকাশ খোঁজে এবং সাধারণত দুইটি আধারের মধ্য দিয়া নিজেকে চরিতার্থ করে ;—পুতুল এবং পিতা। পুতুলের ব্যাপারটা এমন কিছু অভিনবও নয়, আশ্চর্যও নয় ;—তাহাদের কথা নাই, গতি নাই, মন নাই বলিয়া সব ছেলেমেয়েই তাহাদের মধ্যে নিজেদের সাধ-আহ্লাদ-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিবিম্বিত বেশ নিরুপদ্রবে করিতে পারে। কিন্তু বত্রিশ বৎসরের একটা আস্ত মানুষ যখন আট বৎসরের একটা মেয়ের মনে

BanglaBook.org

মায়ের মায়া জাগায়—তখন আর ও-তত্ত্বটা লাগসই হয় না,—কারণটা একটু আলাদা করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়।

রসিকলালের বয়স হইয়াছে ; শরীরও তাহার সঙ্গে পাল্লা দিয়াছে, কিন্তু মনটা পড়িয়া আছে অনেক পিছনে। বিদ্যারম্ভের বয়স হইলে রসিকলাল হুড়হুড় করিয়া সাত-আট বৎসর বেশ পড়িয়া গেলেন। এই এক ঝোঁকে তিনি বয়সের যে স্থানটায় আসিয়া পড়িলেন সেখানে মানুষের বিচারশক্তি আরম্ভ হয়, মনের দ্বিজত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, অনুকরণের যুগ ছাড়াইয়া মানুষের বিচারের যুগ আসিয়া পড়ে ; সে ভালোকে চিনিতে শিখে, মন্দকে চিনিতে শিখে, আর তাহাদের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নিজেও সংসারের জন্য ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে। রসিকলালের মনটা কিন্তু এই চৌদ্দ-পনের বৎসরের রেখাটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর আবার আরম্ভ হইল গতি, কিন্তু সেটা পিছনের দিকে। ওঁর মধ্যে সুপ্ত এক কবি ছিল, সে যেন সংসারের তোরণে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল ; ওঁর সঙ্গী হইয়া পড়িল নদী, প্রান্তর, আগাছার জঙ্গল ; যে-ছেলে বই থেকে চোখ ফিরাইত না তাহার ব্যাসন হইল নিরুদ্দেশ ভ্রমণ—বনে, মাঠে, এ-গ্রাম থেকে সে-গ্রামে—দিনরাতই ওঁকে যেন নিশিতে পাইয়া বসিল। ভাল ছেলে যখন ক্লাসে আটকাইয়া গেল তখন পিতার এদিকে ভালো করিয়া চোখ পড়িল ; কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে চক্ষু বুজিতে হইল।

এর পর অভিভাবক হইলেন দাদা। বছর চারেকের বড়, অভিভাবক হিসাবে নিতান্ত বেমানান নয় ; কিন্তু হঠাৎ বিপদে সংসারের চাপে তাঁহার প্রায় ছয়-সাত বৎসর পর্যন্ত মাথা তুলিবার অবসর রহিল না। এই ছয়-সাত বৎসরের পূর্ণ স্বরাজে রসিকলাল কবে বইটইয়ের পাঠ একেবারে উঠাইয়া প্রকৃতির অবাধ মুক্তির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন, অর্থাৎ জীবনের এই গঠনের সময় উনি এমন সব সহচরদের মধ্যে কাটালেন যাহারা দুহাত তুলিয়া উহাকে শুধু দিলই,—দিল দ্বেষহীন প্রীতি আর অপরিমেয় আনন্দ।...শত্রুতা করিল আর কি, কেননা প্রীতি আর আনন্দের অতিরিক্ত যে আর কিছু আছে—প্রতিপদেই সংসারকে যাহা বিষাইয়া তোলে—সে-সবের আর সন্ধান পাইতে দিল না। মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের যখন পাকাপাকি একরকম একটা ব্যবস্থা হইল, জ্যেষ্ঠের হুঁশ হইল এদিকে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ বাকি রহিয়া গেছে। একদিন কনিষ্ঠকে ডাকিয়া কহিলেন—"এবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হতে হবে তো?"

কনিষ্ঠ নতশিরে নীরব হইয়া রহিলেন।

"বই-পত্তর চুলোয় দিয়ে টো টো করে ঘুরে বেড়ালি। সংসার পাতলে তার একটা সংস্থান করতে হবে তো? শুনলাম নাকি পদ্য লিখিস?"

মস্ত বড় একটা সংস্থানের গোড়াপত্তন হইয়াছে ভাবিয়া ভাই মুখটা আরও নিচু করিয়া লইয়া একটু উৎসাহভরেই কহিলেন—"চেষ্টা করি মাঝে মাঝে।"

"ঐ হোল,—সেও কম দোষের কথা নয়, খুন-ডাকাতির চেষ্টা করলেও দ্বীপান্তর হয়। খাতাটা তোর বৌদিকে দিয়ে দিস, খোকার দুধ জ্বাল দেবার জন্যে বিচুলিগুলো নষ্ট করে।"

মুখের দিকে চাহিয়া আকাশ-পাতাল কি চিন্তা করিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর প্রস্তাবটা যেন ভাই-এর চেহারা, স্বভাব, বিদ্যাবুদ্ধি—সব জিনিসের সঙ্গে খাপে খাপে মিলিয়া গিয়াছে এইভাবে বলিয়া উঠিলেন—"হয়েছে, হোমিওপ্যাথি পড়, পড়বি?"

BanglaBook.org

ভাই মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইলেন।

জ্যেষ্ঠ নিজের ব্যবস্থায় হৃষ্টচিত্তে বলিলেন—"ঐ ভালো, তোর ধাতে সইবে। এদিকে যেমন চেরা-ফাড়া নেই, তেমনি আবার কবিরাজির পঞ্চতিক্ত-কটু-কষায়, কি গোখরোর বিষ—এ সবেরও বালাই নেই। চিনিতে মোড়া নিরীহ জিনিস—লাগল, লাগল—না লাগল, সোবি আচ্ছা!...বেশ, তুই যা, করছি ব্যবস্থা।"

বছর দেড়েক কলিকাতায় থাকিয়া হোমিওপ্যাথি শিখিতে যে সময়টা গেল তাহারই মধ্যে দিন সাত-আটের মতো একবার আসিয়া রসিকলাল বরদাসুন্দরীকে বিবাহ করিয়া গেলেন।

বুদ্ধিমান ছেলে, তায় কলিকাতায় গিয়া বুদ্ধিটা একটু মাজা-ঘষা খাইল, শিক্ষা লইয়া রসিকলাল গ্রামে আসিয়া বসিলেন। ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ডাক হইতে লাগিল। নূতন কাজের উদ্দীপনার মধ্যে তিনি জীবনকে নূতন ভাবে পাইলেন, চিকিৎসায় সমস্ত প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। রোগ সারিতে লাগিল এবং সম্ভবত সস্তা ঔষধ বলিয়া যে-পসারটা নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে আরম্ভ হইয়াছিল, সেটা মধ্যবিত্তদের স্তর পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। দূর গ্রাম পর্যন্ত পাল্লা দিতে হয়—জ্যেষ্ঠ কি উপায় করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় রসিকলালের চিকিৎসাধীনেই বুড়ো নবীন সা মারা গেল। নবীন একটা ফক্‌রে ঘুড়ির পিঠে এক হাটে মালপত্র কিনিয়া অন্য হাটে বেচিত। হিসাবী লোক, এই করিয়া নিঃসাড়ে বেশ দুপয়সা করিতেছিল, তবে অন্য দিকে যে হিসাবের ভুল হইয়া যাইতেছে—ভদ্রোচিত বয়সের গণ্ডি পারাইয়া একমাত্র উত্তরাধিকারী নাতিটিকে যে চটাইয়া তুলিতেছে, সেদিকে খেয়াল করে নাই। নিবারণের ঘুড়ি লইয়া হাটে হাটে ঘোরার না ছিল উৎসাহ, না ছিল প্রয়োজন ; নবীন যেদিন মারা গেল তাহার দুদিন পরে আসিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে মুখটা খুব বিষণ্ণ করিয়া রসিকলালকে বলিল—"দাদাঠাকুরের মেহনতের জন্যে আমি আর কি দেব? এই ঘুড়িটা রইল ; ঠাকুরদা বড়ই ভালোবাসতো—তবু মনে হবে বামুনের দানাপানি খাচ্ছে। সময় হলে বাচ্চাটা-আসটাও দেবে, ঠাকুরদাকে দিয়ে এসেছে বরাবর।"

গ্রামের লোক একটু আলগা ভাবে ইংরাজী ও বাংলা অর্থ একত্র করিয়া ব্যাপারটার নামকরণ করিলেন নিবারণের 'হর্ষোৎসর্গ'...নিজের উপার্জিত ঘুড়ির পিঠে চড়িয়া রসিকলাল পসার জমাইয়া চলিলেন। সঙ্গে থাকে তারু নাপিতের ছেলে হারাণ। ছোঁড়াটা সেই স্কুল-পালানোর যুগ থেকেই কি করিয়া রসিকলালের অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। ঘুড়ির পাশে পাশে ঔষধের বাক্সটা হাতে ঝুলাইয়া বা কাঁধে বসাইয়া লইয়া চলে ; রসিক যখন ভিতরে রোগী দেখেন, সে বাহিরে পাঁচজন জুটাইয়া ঘুড়ির আর মনিবের বড়াই করিয়া আসর জমায় ; বাড়িতে আসিয়া ঘুড়িটার ঘাস কাটে ; পরিচয় দেয়—ডাক্তার-ঠাকুরের 'কম্পুণ্ডার'। যখন বড়াই করিবার লোক পায় না, মাথা দুলাইয়া ঔষধের বাক্স বা হাতের কাছে যাহা কিছুই পায় তাহার উপর তবলার বোল তোলে।

হাতযশে, ঘুড়িতে আর হারাণ নাপিতে পসার জমিয়া চলিল বটে, কিন্তু পয়সা জমিল না। পয়সা করিতে হইলে চিকিৎসকের মাঝখানটিতে একটি সতর্ক হিসাবনবিশ থাকা দরকার। রসিকলালের সেই আসন জুড়িয়া বসিয়া রহিল কবি ; নবীনের অত বড় পয়মন্তর ঘুড়ি আসিয়াও কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারিল না।

পয়সাহীন পসারের একটা মোটা ইঙ্গিত দেওয়া রহিল, ব্যাপারটা পরে আরও পরিষ্কার হইবে।

রসিকলালের নিয়মই হইতেছে বাহিরে আসিয়া মেয়েকে ডাকিয়া একটা সাড়া দেন। ভিতরের ভাবগতিকটা আগে একবার বুঝিয়া লন, তাহার পর প্রবেশ করেন। সব সময় যে প্রবেশ করেনই এমনও নয়।

গিরিবালা তাড়াতাড়ি গোটাদুই কুলকুচা করিয়া লইল, হাতের এঁটো খানিকটা জলে ধুইয়া, খানিকটা কাপড়ে মুছিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল এবং বাপের হাঁটু দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া মুখে চোখ তুলিয়া হাসিভরা আবদারের সুরে বলিল—"এনেছ বাবা?—দাও..."

রসিকলাল হাসি মুখে একটু ঝুঁকিয়া কন্যাকে আদর করিতে যাইতেছিলেন, হাতটা আলগা হইয়া গেল। নিষ্প্রভমুখে বললেন—"ঐরে! আজও গেছি ভুলে; রমেশের দোকানের ওদিকেই যাওয়া হয়নি কিনা..."

কন্যা অভিমানে ঠোঁট দুইটি জড়ো করিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল, বলিল—"যাও, রোজই—'ঐরে, আজও ভুলে গেলাম!...হারাণে, তোকেও তো বলে দিয়েছিলাম..."

হারাণ ঘুড়িটাকে বাঁধিয়া খাঁটি সহিসের পদ্ধতিতে—'হিস-হিস' শব্দ করিয়া ডলাই-মলাই শুরু করিয়া দিয়াছিল, ঘাড়টা বাঁকাইয়া বলিল—'দাঁড়াও ঠাকুরুণ, এক যা ঘুড়ি নিয়ে পড়েছি, ফুরসুৎ হলে তো তোমার পুতুলের কথা ভাববে হারাণে? তা ছাড়া, পুতুলের জন্যে তো কড়ি চাই? রমেশঠাকুর তো পুতুলের দানছত্র খুলে..."

রসিকলাল ধমক দিয়া উঠিতে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া আবার 'হিস-হিস' করিয়া আওয়াজ শুরু করিয়া দিল।

গিরিবালার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল, চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মাথাটা একটু নাড়িয়া চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"আজও কিছু পাওনি বাবা?"

রসিকলাল তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন—"না, পাইনি! বেলা দুপুর পর্যন্ত অমনি অমনি ঘুরে বেড়াবার পাত্তোর কিনা আমি! আজ যার নাম তিন-তিনটে টাকার হিল্লে করে তবে রসিক বাঁড়ুজ্যে বাড়ি ফিরছে...যা খরচ হয়ে গেছে তা আর ধরলামই না।"

মেয়ের চোখ দুটি আপনা-আপনি পকেটের উপর গিয়া পড়িতে বলিলেন —"কাছে নেই, কিন্তু সে কাছে থাকারই সামিল।"

পাছে সর্বজ্ঞ হারাণ আবার ফোড়ন দেয় সেই ভয়ে বলিলেন—"চল্ না গিরি ভেতরে, সব বলছি কিনা।"

গিরিবালা আর অভিমানিনী কন্যা নাই, এক নিমেষেই অনুকম্পাময়ী মায়ের পদবীতে উঠিয়া গেছে, সেই মায়ের—যার অদৃষ্টলিপি এই যে দুর্বল সন্তানকে চারিদিকের লাঞ্ছনা থেকে ক্রমাগতই আগুলাইয়া ফিরিতে হইবে।... রসিকলালা অগ্রসর হইতেই একটু পথ-আটকানো গোছের করিয়া দাঁড়াইল, একবার হারাণের পানে চাহিয়া লইয়া বলিল—"বাবা শোন।"

পিতাপুত্রীর মধ্যে এ ধরনের আলাপ প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার, রসিকলাল বেশ একটু উৎসুকভাবেই মুখটা নামাইয়া লইলেন। গিরিবালা হারাণকে এড়াইয়া চাপা গলায় বলিল —"আজ কিচ্ছু পয়সা আননি বাবা?...ডাল বাড়ন্ত যে! সক্কাল বেলা থেকে মা গরগর করছেন।"

রসিকলাল ধীরে ধীরে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। কন্যা

BanglaBook.org

আবার সেইরকম স্বরেই প্রশ্ন করিল—"তোমায় নাকি তিনদিন থেকে বলছেন, বাবা?"

রসিকলালের যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, ভিতরে শুনিলেও ক্ষতি নাই এই রকম সহজভাবে, বরং কতকটা গলা চড়াইয়াই বলিলেন—"ডাল আনতে হবে সে তো আজ তিনদিন থেকে ঐ বেটা নাপতের পোকে বলছি, তা..."

হারাণ হাত এবং শিস-দেওয়া দুই-ই বন্ধ করিয়া ফিরিয়া তাকাইল, বলিল—"আম্মো তো তিনদিন থেকে কইছি—ডেলের পয়সা দেও, ও বেটা বেনেরকাল বিজিটের ট্যাকা থেকে দাম কাটাবেনি, বলে—'নগদ চাই' বিজিটের সঙ্গে ডেলের কড়ির কি সম্বন্ধ?...তবু তারই বাড়িতে আবার কলে যাবেন, ট্যাকা ফেলে রাখাবেন।...এমন মনিষ্যির..."

এবার কন্যাই ধমক দিল—"আচ্ছা হয়েছে, তুই চুপ কর ; চেঁচাচ্ছে দেখ না শুনিয়ে শুনিয়ে! দূর করে দাও বাবা এমন চাকরকে, কাজ নেই..."

বরদাসুন্দরীর গলা শোনা গেল—প্রতি কথাতেই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে—"বাপে-মেয়েতে কি সব পরামর্শ হচ্চে বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? ডালের ভাবনা ভাববার লোক আছে, আমার বলাই ঝকমারি হয়েছিল। দুপুর গড়িয়ে গেল, এখন নেয়ে খেয়ে উব্‌গার করতে হবে, না এই রকম ঠায় হাঁড়ি কোলে করে বসে থাকব? একটা মনিষ্যি যে সকাল থেকে নাগাড়ে..."

গিরিবালা আর্তদৃষ্টিতে বাপের উৎকণ্ঠিত মুখের পানে চাহিয়া হাঁটুর কাপড়টা ধরিয়া বলিল—"চলো বাবা শীগ্‌গির।"

বরদাসুন্দরী রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। সুরটা আরও চড়াইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শঙ্কিত মেয়ের আড়ালে ততোধিক শঙ্কিত বাপকে নতশিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আর গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"মরিঃ, ঢুকলেন দেখ না মায়ে-পোয়ে—কচি ছেলেও অমন করে মায়ের আড়াল খোঁজে না!"

বরদাসুন্দরীর সংসারের ধারাই এই, এক কথাতেই থমথমে ভাবটা কাটিয়া গেল। রসিকলাল পাশ কাটাইয়া চলিয়া না গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, হাসিয়া বলিলেন—"কচি ছেলেদের যে একটা মস্ত সুবিধে,—বাপ-মায়ে চোখ রাঙাবার মানুষটিকে তখনও এনে হাজির করে না তো!"

"রঙ্গ রাখ, যেন চোখ রাঙিয়েই রয়েছি ; তবে একথাও বলব—অষ্টপহর একজন চোখ-রাঙাবার মানুষ কাছে থাকলেই তুমি থাকতে ভালো ; তোমার দরকার ছিল সেটা।" —বলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। সেখান থেকেই বলিলেন—"চট্‌ করে তেল মেখে নেয়ে নাও, ভাত বাড়ি। বকে মানুষ সাধ করে?...একবার আরশিটা সামনে ধর্‌ না গিরি, দেখুক কি চেহারা হয়েছে।"

ঘরে আসিয়াছে, মেয়ে বাপের পায়ের সামনে খড়ম জোড়াটা রাখিয়া জুতা খুলিতে খুলিতে একবার মুখের পানে চাহিল, ঠোঁট দুইটির উপর নোলক দুলাইয়া বলিল—"সত্যি বাবা, কি যে চেহারা হয়েছে তোমার ; মুখের দিকে চাওয়া যায় না।"

রসিকলাল জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে বলিলেন—"নাও, ওদিকে সামলালাম তো মায়ের মুখ ভার। ও তবু মুখের পানে চাইতে পেরেছিল,—হাজার হোক পরই তো? মা আর চাইতেই পারছে না। তাই তো বলি..."

মা আবার নিমেষেই মেয়ে হইয়া গেল। হাসিয়া, লজ্জিত চকিত দৃষ্টিতে বাপের মুখের পানে একবার চাহিয়া বলিল—"যাঃ।"

ঐটুকু শরীরের মধ্যে কেমন করিয়া যেন দুইটিতে মিশিয়া গিয়াছে,—যে-মেয়ে ভাবীকালে মা হইবে আর যে-মা অতীতকালে এক সময়ে মেয়ে ছিল।—নাকের নোলকটির মতোই যেন সোনায় মুক্তায় জড়িত হইয়া মনের কোথায় দোল খাইতেছে।

সেবা আরম্ভ হইল—কোট, গেঞ্জি, র‍্যাপার একবার তাড়াতাড়ি আলনায় রাখিয়া দিয়া তেল, গামছা, আনিয়া দেওয়া। ওদিকে তেলমাখা চলিল, এদিকে ছাড়া কাপড়-চোপড় গোছানো চলিল, সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের গল্প, হুকুম, সলা-পরামর্শ—"ঐ যাঃ, 'অশ্বত্থমায় নমো' বলে মাটিতে তেল ছিটুলে না তো বাবা? তুমি কেমন রোজই ভুলে যাও, পুতুল আনতেও ভোল, তেল ছিটুতেও ভোল। যাকগে পুতুল,—ঘরে ডাল বাড়ন্ত!—কি বল বাবা? আমিই কি পুতুলের কথা মনে করে বসে আছি? বলে কাজ থেকেই ফুরসত নেই...আজ ও-বাড়ির চিলের ছাদ থেকে নন্তী ঠ্যাকার করে মোমের পুতুলটা দেখালে তাই মনে পড়ে গেল...নয়তো, বলে, কাজ থেকেই ফুরসত নেই—মা বেচারী একলা পড়ে গেছেন, খোকার দৌরাত্ম্যি...জেঠাইমা-জেঠামশাই কবে আসবেন বাবা? পুতুরাণীর কথা আমি জিজ্ঞেসও করছি না, তিনি তো মামার বাড়ির মানুষই হয়ে গেছেন! আমরা গরীব, আমাদের এই বাড়িই ভালো, কি বল বাবা?"

পুতী জেঠতুত ভগ্নী, বয়সে ছোট, মামার বাড়িতে ছেলেপিলে নাই বলিয়া দিদিমা ধরিয়া রাখে, এক রকম সেইখানেই প্রতিপালিত হইতেছে। থাকিলে খেলার ভালো সঙ্গিনী হইতে পারিত বলিয়া গিরিবালা সুবিধা পাইলেই একটু খোঁচা দেয়।

রসিকলাল একটু হাসিয়া বলিলেন—"তাকে না ছাড়লে সে কি করে আসবে বল? ...দাদা বোধ হয় কালই চলে আসবেন। বৌদি দুটো দিন থাকুন না বাপের বাড়ি। তোকে যখন শ্বশুরবাড়ি থেকে পাঠাবে গিরি, আমরা কি একদিনেই ছেড়ে দোব—বল না?...পুতুল তোর আনব বৈকি। রমেশের দোকানে একটা দেখে রেখেছি—সে পুতুলের সামনে নন্তীর পুতুল দাঁড়াতে পারবে?...কত দাম বল দিকিন পুতুলটার?"

কন্যা উৎসুক স-প্রশ্ন নেত্রে চাহিতে মুঠার মধ্য হইতে দুইটা আঙুল আলাদা করিয়া ধরিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত চক্ষু দুইটা বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন। কন্যার মুখটি আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল, বাপের মতোই চোখ বড় বড় করিয়া বলিল—"দু টাকা!!"

জিনিসটা যেন চোখের সামনেই রহিয়াছে বাপ এইভাবে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন—"দু টাকা!...আনছিলামও কিনে—ভারী তো দুটো টাকা, তা ইয়ে হোল..."

মেয়ে কাপড় কোঁচাইয়া র‍্যাপার পাট করিয়া তামাক সাজিতেছিল, হুঁকাটা হাতে তুলিয়া দিল। রসিকলাল গলাটা খাটো করিয়া বলিলেন—"তোর মাকে বলবিনি তো?"

মেয়ে গম্ভীরভাবে বলিল—"মাকে কেন বলতে গেলাম? বোঝেন না সোঝেন না—সব কথাতেই গজর গজর..."

রসিকলাল বক্তব্যটাকে জোরাল করিবার জন্য একটা উপমা দিয়াই আরম্ভ করিলেন—"এই ধর, নন্তীর কথাই গিরি—ঠ্যাকার করে তোকে দামী মোমের পুতুল দেখালে,—দেখালে তো?—এখন যদি ওর পুতুলটি চুরি যায় কি ভেঙে যায়, আর তোকে বলে—'গিরিদিদি, তোর পুতুলটা একবার দে ভাই, খেলি'—তো 'না' বলতে পারবি? বল

BanglaBook.org

না?"...(হঠাৎ একটু উষ্ম হইয়া)—"ঐ গোকুল হারামজাদা—গাল না দিয়েও পারিনে—আমার কাছেই মেয়ের চিকিচ্ছে করাচ্ছিল, ছাড়িয়ে দিয়ে ডাকলে তো মতি চাটুজ্জেকে? ...আজ আসছি, দেখি মুখটি চুন করে বাইরের দাওয়ায় বসে আছে। 'কিগো গোকুলদা, মেয়েটা আছে কেমন?'...'আর ভাই, তোর হাত থেকে নিয়ে মতিকাকার হাতে দিলাম, এখন অ্যালোপেথি চিকিচ্ছের হিড়িক সামলাতে বুঝি মেয়েটাকে হারাতে হয়। মতিকাকা ওষুধ-পথ্যিতে তিন টাকার ফর্দ ধরে দিলে ; বললাম—হাতে কুল্যে ঐ ক'টি টাকা আছে, তোমার ভিজিটটা না হয় আর একদিন দিয়ে দোব মতিকাকা—পরের ডাকে একসঙ্গে চারটে টাকা,...কোনমতে শুনলে না! বলে—বড় খরচের টানাটানিতে আছি—আজকাল কলও নেই তেমন, হেনতেন, সাত সতেরো...তার হাতে দুটি টাকা তুলে দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি—কোথা থেকে ওষুধ আনাই, কি করেই বা দুটো বেদানা-কমলালেবু যোগাড় করি...একটা মেয়ে ধুঁকছে গিরি, আর সে-সব পুরনো কথা মনে রাখতে পারি? মেয়ে তো সবারই সমান—হ্যাঁগো গিরি, তুই-ই বল না, তার ওপর আবার আমার গলা শুনে গোকুলদার বৌ ঘোমটা টেনে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল ; মায়ের প্রাণ!...পেয়েছিলাম গোটাকতক টাকা আজ—সামন্তর ওখানে আট আনা, ছ'কড়ের ওখানে আট আনা, এদিকে দাসু-খুড়োর ওখানে দু'টাকা, সেখেদের বাড়ি..."

বরদাসুন্দরী দুধটুকু জ্বাল দিয়া লইতেছিলেন, তাগাদা দিলেন— "তোমাদের হোল গো গপ্প শেষ?"

রসিকলাল বলিলেন, —"তুমি বাড়ো না, একটা ডুব দেওয়া বৈ তো নয়। গিরি তামাকটা সেজে হাতের সামনে ধরলে নেহাৎ..."

গিরিবালা একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল, সমস্ত বর্ণনাটির মধ্যে একটি চিত্র তাহার মনে যেন গাঁথিয়া বসিয়া গিয়াছিল—'গোকুলদার বৌ ঘোমটা টেনে দোরগোড়ায় এসে মুখটি নিচু করে দাঁড়াল ; মায়ের প্রাণ!..."

এই বাপেরই মেয়ে তো? তাহার উপর বিষাদে-আনন্দে, গৌরবে-অভিমানে বিশ্বের যত মা সবাই যেন ওর আট বছরের দেহটিতে ভিড় করিয়া জড়ো হইয়াছে। ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"আহা, ভালো হয়ে যাক, না বাবা পুতুল নাকি পালিয়ে যাচ্ছে?—কি বল বাবা?"

"আহা, তা আর নয়? আর ও-টাকা আমার যাবে ভেবেছিস নাকি? রাম!...এই দেখো, তোকে আসল কথাটাই বলতে ভুলে বসে আছি—আজ কোথায় গেছলাম বল দিকিন?"

বরদাসুন্দরীর তাগাদা আসিল—"কৈ, ভাত যে বেড়ে ফেললাম।"

কথাটা মিথ্যা জানিয়াও মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করিবার সাহস হইল না। রসিকলাল হুঁকা রাখিয়া গামছা কাঁধে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

আহারে বসিলে বরদাসুন্দরী বলিলেন—"আজ বড্ড দেরি করে ফেলেছ, খুব দূরে গেছলে নিশ্চয়? পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, শরীর কালি করে অত দূরে যাবার কি দরকার বাপু?"

কন্যা বলিল—"কোথায় যে গেছলে আজ বাবা, তখন বলতে বলতে নাইতে চলে গেলে?"

BanglaBook.org

রসিকলালের হাতটা যেন থামিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কন্যাকে বারণ করিয়া দেওয়া হয় নাই, সে যে পাড়িবেই কথাটা তিনি বরাবর আশঙ্কা করিতেছিলেন। আর উপায় নাই দেখিয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ, গেছলাম বৈকি।—মাঝের পাড়ায় হঠাৎ অখিলদার সঙ্গে দেখা। আমিও যাব না, সেও ছাড়বে না..."

স্ত্রী ও কন্যা প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—"গেছলে নাকি সিমুরে?"..."গেছলে নাকি মামার বাড়ি বাবা?"

রসিকলাল একবার কাসিয়া একটু যেন স্খলিত কণ্ঠেই বলিলেন—"না গিয়ে উপায় ছিল? অখিলদা ছাড়বার পাত্তোর কিনা! গোটা দু'এক টাকা পেয়েছিলাম। খরচ হয়ে গেল, কুটুমবাড়ি তো আর খালি হাতে যাওয়া যায় না।"

মেয়ে আবার যাহাতে কিছু না বলিয়া বসে সেজন্য একবার চকিতে তাহার পানে চাহিয়া লইলেন।

বরদাসুন্দরী প্রসন্নভাবেই, বরং একটু গর্বের সহিতই বলিলেন—"তা খরচ হয়েছে বেশ হয়েছে। জামাই ডাক্তারি করছে, দুটো টাকার মিষ্টি নিয়ে গেছ তো আর কি অন্যায় করেছ? তবে একটা টাকা হলেও নিন্দে হত না। তা যাক গে।...মা কেমন আছেন? পিসিমা, দাদা, বিকাশ, মেজদি, বৌদি, বড়দি?...বড়দি এদিকে আর এসেছিলেন?"

রসিকলাল বলিলেন—"আছে ভালোই সব। শাশুড়িঠাকরুণ বাপের বাড়ি গেছেন, কাল-পরশু নাগাত ফিরবেন। না, বড়দি আর আসতে পারেন না, তার নাকি আবার ঝঞ্ঝাট বেড়ে গেছে। এঁরা সব আমায় কোনমতেই ছাড়বেন না, বলেন—চৌধুরীদের ওখানে রাস হচ্ছে—গোপাল উড়ের যাত্রা এসেছে, দেখে যাও ; বললাম..."

বরদাসুন্দরী বলিলেন—"দেখে এলেই পারতে একটা রাত, অত করে বললে যখন —হারাণকে দিয়ে বলে পাঠাতে।"

রসিকলাল যেন ভয়ে ভয়ে পা টিপিয়া অগ্রসর হইতেছেন। গিরিবালা শিশু হইলেও যেখানে বাপের চরিত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার কথা সেখানে পাকা গৃহিণী। বাকি টাকার কথা যে গোপন করিতে হইবে সেটা সে বুঝিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, ও-রহস্য ছাড়া আরও কিছু আছে যেন, সেটা প্রকাশ হইয়া যাইতে না পারে বাবা যেন সেটুকু বাঁচাইয়া চলিতেছেন। নয় তো সবই ভালো কথা, মিষ্টি পর্যন্ত লইয়া গেছেন শ্বশুরবাড়ি, অথচ বাপের কথার যেন বাঁধুনি নাই, কেমন যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব ভিতরে ভিতরে।

গিরিবালা সতর্কভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

বরদাসুন্দরীর কথায় রসিকলাল যেন একটু ওরই মধ্যে উৎসাহ পাইলেন, বলিলেন, —"দাদা নেই, থাকব আর কি করে? তবে বলে এলাম—দাদা বৌদি এসে গেলেই গিরি আর সাতুকে নিয়ে যাব।...যাবি নাকি গিরি?"

গিরিবালা রহস্যের সমাধানে অন্যমনস্ক হইয়া আছে, ঘাড়টা ঈষৎ নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। বরদাসুন্দরী বলিলেন—"তা বেশ করেছ, যাবে ওরা ; আহা এখানে দেখতে পায় না ওসব, যাবে না?"

তাহার পর তাঁহার স্বরটাও হঠাৎ যেন জড়িত হইয়া গেল, বলিলেন—"হ্যাঁগা, একটা কথা জিগ্যেস করব? আচ্ছা থাক্, আগে খেয়ে নাও।"

BanglaBook.org

রসিকলালের মুখটা শুকাইয়া গেল, হাতটাও বন্ধ হইয়া গেল, যেন এতক্ষণ যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই আসিয়া পড়িল শেষ পর্যন্ত। একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন —"কি বলোই না।" সঙ্গে সঙ্গে যেন বিপদটার সম্মুখীন হইবার নেশা চাপিয়া গেল, হাত গুটাইয়া লইয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া লইয়া বলিলেন—"না বলো, নইলে আমি এই হাত গুটিয়ে বসলাম।"

বরদাসুন্দরী যেন আরও গুটাইয়া গেলেন—নিজের বাপের বাড়ির কথা, স্বামীকে মনে হয় সেখানে তাঁহার পক্ষেও কুটুম। দু-একবার চোখ তুলিবার চেষ্টা করিয়া মুখটা নিচু করিয়াই বলিলেন—"গেলে—নাওয়া-খাওয়ার সময়, তা তারা খেতে বললে না? পিসিমা রয়েছেন, মেজদি রয়েছে...মানে, এক সূয্যিতে বামনকে দু'বার খেতে নেই কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি।"

মন থেকে মস্ত বড় একটা বোঝা নামিয়া যাওয়ায় রসিকলাল হালকা ভাবে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"এই কথা? আমি মনে করি—না জানি কত বড় একটা কথা বলবে। ...তা, তারা জামাইকে ভাত দেবে? শুনে রাখ, গিরি, তোর গর্ভধারিণীর বুদ্ধির কথা, সেখানে গিয়ে বলবি।"

শ্বশুরবাড়ির কথাটা একেবারে গোপন করিবার অভিপ্রায়েই রসিকলাল ক্ষুধা না থাকিলেও আহারে বসিয়াছিলেন, এখন লুচি খাওয়ার উপরই জোর দিয়া কথাটা সামলাইয়া লইলেন, বলিলেন—"তাড়াতাড়ি হলেও তারা লুচি আর আগড়ম্-বাগড়ম্ কি সব করেছিল ; দিনের বেলা দুটি ভাত না চাপা দিলে কি চলে? তাই মনে করলাম এক মুঠো ভাত খেয়ে নিই।"

এর পর কথা বেশ সহজভাবে চলিল অনেকক্ষণ, ফাঁড়াটা যেন কাটিয়া গেছে। তিনজনেই বেশ প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিলেন। হরিচরণের ঝোঁকটা ঘুড়ির দিকে বেশি ; এতক্ষণ বাহিরে ছিল, সেও আসিয়া নিজের টবর্গ-সঙ্কুল আলাপে আসরটাকে জমাইয়া তুলিল। তরকারির পর্ব শেষ হইলে রসিকলাল দুধের বাটিটা টানিয়াছেন, এমন সময় বরদাসুন্দরী কতকটা আপন মনেই বলিয়া উঠিলেন—"শুনেছিলাম বাড়িতে অখিল এবার খুব ভালো মূলো করেছে, আর পালং শাকের গোড়া ; কলকাতা থেকে নাকি ফুলকপিরও বিচি আনিয়ে লাগিয়েছিল...কাটারিভোগ ধানের চিড়েও এবারে করলে কিনা কে জানে..."

রসিকলালের মুখটা সঙ্গে সঙ্গে আগের চেয়েও শুকাইয়া গেল। দুধের বাটি থেকে হাতটা টানিয়া লইয়া প্রায় উঠিয়া পড়িয়াছেন, বড়দাসুন্দরী শঙ্কিতভাবে প্রশ্ন করিলেন —"কি হল?"

এমন সময় হারাণ স্নান করিয়া আসিয়া উঠানে কলাপাতা বিছাইয়া বলিল—"দাও ছোট মাঠাকরুণ। ওখানেও হল একচোট, কিন্তু দীঘ্য পথ, ক্ষিধে নেগে গেছে। কোথায় ভেবেছিনু ঘাড়ে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি, আজ বাড়ি এসে কুটুম-বাড়ির মত্তমান কলা আর সীতাভোগ-ধানের চিড়ে ফলার করব, তা যত সব হাভাতের দল রাস্তা এগলে বসে রয়েছে ; বাবাঠাকুরও তো দাতাকণ্ণ হয়ে..."

রসিকলালকে সামনে দাওয়ার উপর দেখিয়া থামিয়া গেল। বরদাসুন্দরী কাঠ হইয়া বসিয়া রহিলেন, একটি কথা বলিলেন না।

BanglaBook.org

ঘরে আসিয়া গিরিবালা চাপা ভীতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"আবার সব বুঝি বিলিয়ে দিয়ে এসেছ বাবা—মামাবাড়িতে যা-সব দিয়েছিলেন?"

রসিকলালের অপরাধী-ভাবটা তখনও কাটে নাই ; বলিলেন,—"এক ছিলিম তামাক সাজ তো গিরি ; শখ করে বিলোব আমায় কি তেমনি বোকা পেয়েছে লোকে? বাগ্দিপাড়া হয়ে আসব, দেখি দুলো বউটাকে বেধড়ক্ মার দিচ্ছে ধরে...তুই নিজে পড়ে : রোজগারের দ্বিতীয় লোক নেই, একপাল কাচ্ছাবাচ্ছা—ও বৌমানুষ কদ্দুর কি করবে? তুই-ই বল না গিরি, আনতে পারতিস চিড়েগুলো বয়ে তাদের মাঝখান থেকে?...তোর গর্ভধারিণীই পারত আনতে?—অত যে মুখ ভার, অত যে তম্বি?..."

॥ ৪ ॥

শৈলেনের এক একবার এই রকম হয়—কয়েকটা তীব্র-অনুভূত মুহূর্তের সমষ্টি হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া পড়ে, মনে হয় তাহার জাগ্রত দৃষ্টির উপর কে যেন স্বপ্নের প্রলেপ দিয়া গেল।—তাহাকে ঘিরিয়া আজিকার এই যে মহাকালের অংশটুকু—তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তন্ত্রী ছুঁইয়া বর্তমান এই যে নানা সুরে মিশ্র সঙ্গীত তুলিতেছে—এ সবই যায় মিটিয়া, স্তব্ধ হইয়া, আর তাহাদের জায়গায় জাগিয়া উঠে অতীত। জানার সঙ্গে অজানা মেশে, শোনার সঙ্গে অশ্রুত। সত্যে-মিথ্যায়, হাসিতে-অশ্রুতে কি যে একটা মায়াপ্রবাহ চলে কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। ইতিহাস-মাত্র নয় বলিয়া এ-অতীত প্রশ্নের উত্তর দেয় না, শুধু চলার মাতনে টানিয়া লইয়া চলে।—শৈলেন চেনে ঐ শিশু-জননীকে, তার ঐ বয়ঃপ্রাপ্ত শিশুটিকেও চেনে ; গৃহের ঐ লক্ষ্মীকে চেনে ; হরুও চেনা, তার ঐ টকারের টঙ্কার না শোনা থাকিলেও। কিন্তু কে হারাণ, কে সামন্ত, দুলোই বা কে?—রুগ্ণ মেয়ের অশুভ আশঙ্কা লইয়া যাহার বধূ ঘোমটা টানিয়া নত নয়নে দোরগোড়াটিতে দাঁড়ায়? ...অতীত যেন যাদু জানে,—সত্য আর অলীক মিলাইয়া একটা চঞ্চল স্বপ্নস্রোতের রচনা করে, দু-টাকে পৃথক করিয়া দেখিবার জো নাই, তাহা হইলে সমস্ত স্রোতই হইয়া যাইবে অবলুপ্ত। ...শৈলেন তাই প্রশ্ন করে না, মুগ্ধনেত্রে দেখিয়াই চলে, মাত্র দেখার আনন্দেই নিজেকে হারাইয়া ফেলে।—

সেই মেয়েটি—শিউলি গাছের তলায় ভাঙা পুতুলের উপর জননীর করুণ দৃষ্টি মেলিয়া যে দাঁড়াইয়াছিল—মায়ের গঞ্জনার ভয়ে বাপকে যে ছেলের মতোই—আড়াল করিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল—শ্বশুরবাড়ির সওগাত বিলাইয়া বাপ যাহার অনুকম্পায়-ভরা চোখ দুটির উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রশ্ন করিল—"তুই-ই বল না গিরি, আনতে পারতিস্ চিড়েগুলো বয়ে তাদের মাঝখান দিয়ে?..."

BanglaBook.org

গিরিবালার মুখটি ভালো করিয়া মুছানো, কপালের কাচপোকার টিপ, মাথায় বেড়া-বেণীর খোঁপা টান করিয়া সযত্নে বাঁধা। পরনে ডুরে শাড়ি, গায়ে একটি খাটো সাটিনের জামা—বোধ হয় বছর দু'এক আগের কেনা। কাঁধে পাটকরা একটি রাঙা গাঁতি।

পাশে বাপ।—গৌরকান্তি দীর্ঘ সুঠাম বত্রিশ বৎসরের যুবা পুরুষ। প্রসন্ন দৃষ্টি, সর্বব্যাপী কারুণ্য, আর, একটা আত্মভোলা ভাবের জন্য যৌবনের সঙ্গে যেন একদিক

দিয়া শৈশব, আর একদিক দিয়া পবিত্র বার্ধক্য আসিয়া মিশিয়াছে। পোশাক একটু বেশী পরিচ্ছন্ন।

পিছনে হারাণ। মাথায় একটা বেতের ঝুড়ি, তাহার একদিকে দুইটা লাউ, গোটাকতক চালদা আর কিছু করমচা ; অন্য পাশে একটা নেকড়ায়-বাঁধা কয়েক রকম বড়ি, কিছু পাঁপড় আর খানিকটা নূতন গুড়। অন্য একটি পুঁটুলিতে কিছু কদমা আর নূতন মুড়কি। হারাণের ভাবটা বেশ প্রসন্ন নয়। যেন কতকটা জাতিচ্যুত,—তাহার মাথায় বহিবার উপযুক্ত জিনিস ঔষধের বাক্সটা ; সে তখন পা ফেলে কম্পাউন্ডারের দর্পে। অন্তত তাড়াতাড়ি গ্রামটা ছাড়াইয়া গেলে যেন এই লজ্জার হাত থেকে রক্ষা পায়—ভাবটা কতক এইরকম।

কাল সন্ধ্যার সময় হঠাৎ দাদা-বৌদিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দাদা চার দিন ছিলেন না, আজ ডাল বাড়ন্ত গেছে, কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত আরও কত কি যে 'বাড়ন্তের' খবর পাওয়া যাইবে বলা যায় না। এই চারটে দিনের উপার্জনের হিসাব দাদাকে দিতে হইবে—আর বিপদ এই যে, বহুদিন পরে কপালদোষে এই চারটা দিনেই বেশি উপার্জন হইয়াছে। কিন্তু একটি পয়সা বাড়িতে আসে নাই।

এ-অবস্থায় মানে মানে সরিয়া পড়াই ভালো। রসিকলাল কন্যাকে সামনে আগাইয়া দিলেন, বলিলেন,—"গিরি, তোর জেঠামশায়কে বল সিমুরে যাওয়ার কথা, রাস ফুরিয়ে গেলে আর যাবি কবে? বলবি বড় দিদিমা মাথার দিব্যি দিয়ে বলে পাঠিয়েছে বাবাকে দিয়ে ; আর সত্যি দিয়েছিল মাথার দিব্যি, কাজের চাপে ভুলে গিয়েছিলাম, এই এক্ষুনি আমার হঠাৎ মনে পড়ল। আমায় জিগ্যেস করলে আমিও বলব, যা, রাজী কর গিয়ে।"

রাত্রিটা খানিকটা চিনিবাস সেকরার দোকান, খানিকটা ভবনাথের বৈঠকখানা এই করিয়া কাটাইয়া দিলেন। তাই ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছিলেন, সকাল সকাল আহার করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলে রসিকলাল সন্তর্পণে আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। গিরিবালা জাগিয়া ছিল, চুপি চুপি খবর দিল—"রাজী করেছি বাবা জেঠামশাইকে, কাল বিকেলে যাব আমরা। সাতু যেতে পারবে না বাবা, নতুন জুতোতে সমস্ত পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, আহা!"

একটু থামিয়া অল্প একটু ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল—"দেখলে তো বাবা? আমাদের পুতুরাণীর এবারও আসা হ'ল না! এলে তো যেতে পারতো?"

রসিকলালের আজ পুতির সম্বন্ধে মেয়ের চিরন্তন নালিশের দিকে মন ছিল না, প্রশ্ন করিলেন,—'তোর জেঠাইমা কোথায়? দাদা ঘুমিয়েছেন?" গিরিবালা বলিল—"জেঠামশাইকে তো আমিই মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এলাম। জেঠাইমা খোকার কাঁথায় ফুল তুলছেন রান্নাঘরে বসে, মা রাঁধছেন।"

"ডেকে আনতে পারিস্ তোর জেঠাইমাকে?"

গিরিবালা উঠিয়া দুয়ার পর্যন্ত যাইলে বলিলেন—"আর শোন গিরি, তুই তোর গর্ভধারিণীর কাছে একটু বসবি ততক্ষণ রান্নাঘরে,—ভয়-তরাসে মানুষ, তায় অন্ধকার রাত্তির..."

ভাজ বসন্তকুমারী আসিয়া কহিলেন—"কোথায় ছিলে গো ঠাকুর? উনি যে ক'বার খোঁজ করলেন...হ্যাঁগো ঠাকুরপো, দুটো দিন মানুষটা ছিল না, একেবারে শিবের সংসার

BanglaBook.org

করে রেখেছ? কিছু পাও-টাও নি এ ক'টা দিন?"

"না, তা কি আর পেয়েছি? একটু ফুরসত করে যে একবার বাজারটা করে আনব তার উপায় ছিল না, এমনি কলের হিড়িক ; মাংনাতেই বুঝি ঘুরে বেড়িয়েছি। ছোটবৌ বুঝি পাঁচখানা করে লাগিয়েছে তোমার কাছে? ...হ্যাঁ, তোমায় কেন ডাকলাম, মনে পড়েছে—পাঁচটা টাকা হাওলাত দিতে পারো?"

বসন্তকুমারী ঠোঁটটা উল্টাইয়া বলিলেন—"কি যে বলে, তাই—খুব মহাজন ধরেছ। আর এত রাত্তিরে হঠাৎ টাকা?"

"ঠাট্টা নয়, দরকার। মোটা সুদ পাবে, দাও দিয়ে আসি, ভবদাদার বৈঠকখানায় বসে আছে।"

"লোকটা কে?"

দেবর একটু রাগিয়াই বলিলেন—"ঐ তোমাদের মেয়েমানুষদের কেমন একটা রোগ। যদি নামই বলবে তো এক পহর রাত করে গা-ঢাকা দিয়ে আসবে কেন? দাও, তোমার টাকা মারা যাবে না, আমি জামিন রইলাম।"

অনেক করিয়া তিনটি টাকা পাওয়া গেল, আর ছিল না। পরের দিন রসিকলাল দাদা উঠিবার পূর্বেই "কল"-এ বাহির হইয়া গেলেন। সিমুরে যাওয়া ঠিক হইয়াছে, একটু সকাল সকালই ফিরিলেন। আরও তিনটি টাকার সংস্থান হইয়াছে,—দুইটি উপার্জন, একটি কর্জ। রাত্রের টাকার সঙ্গে মিলাইয়া দাদার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন—"গিরি বলছিল ওকে নিয়ে নাকি সিমুরে যেতে বলেছ তুমি?"

বড় ভাই অন্নদাচরণ একটু রুক্ষ প্রকৃতির লোক—অন্তত বাহিরে তো নিশ্চয়ই। তেল মাখিয়া তামাক খাইতেছিলেন, মাথায় একটা লঘু ঝাঁকুনি দিয়া বলিলেন—"হবে না যেতে? মাস-শাশুড়ি না মাথার দিব্যি দিয়ে দিয়েছে?"

রসিকলাল বলিলেন—"মাথার দিব্যি ওঁদের কথার মাত্রা একটা। কথা হচ্ছে, কতকগুলো কেস হাতে রয়েছে, এই সময় চলে যাওয়া..."

ভাইয়ের সাক্ষাৎ পান নাই বলিয়া কাল রাত্রি থেকে কথাগুলো জমিয়া আছে, অন্নদাচরণ রাগের চোটে ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন—"তোকে যেতে হবে। তিনি যখন দেখতে চেয়েছেন গিরিকে, তখন যেতে হবে তোকে, এই আমার কথা। কেস!—এক ঢঙের কথা শিখেছিস—কি যে হচ্ছে কেসে তা তো দেখি না, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো! দুটো দিন ছিলাম না, ঘরে একেবারে..."

রসিকলাল রাগের ভান করিয়া বলিল—"বেশ যাব, আমার আর কি? পাচ্ছিলাম এই সময়টা কিছু, ইনফ্লুয়েঞ্জাটা নেমেছে একটু, গুটি ছয়েক টাকা জমেছিল, রাত্তিরে এসে দেখি তুমি ঘুমুচ্ছ, দিতে পারিনি, এই গোটাচারেক নাও, দুটো আমি হাতে রাখলাম, যেতেই যখন হবে বলছ।"

যাত্রার গোছগাছের মধ্যে বসন্তকুমারী একটু চাপা গলায়ই অনুরোধ করিলেন—"টাকা তিনটে দিয়ে দাও ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, এই যা হাতে ছিল—আসবার সময় মেজকাকা দিয়েছিলেন। আর ও-তিনটেও হাওলাত নাকি? নাঃ, তোমার যে কি হবে, ভেবেই পাই না।"

BanglaBook.org

তিনজনে চলিয়াছে। বাড়ি থেকে প্রায় পো-তিনেকের মাথায় কানানদী, তাহাতে বড়-নদী অর্থাৎ দামোদরের জল নামিয়াছে, ওপারে গিয়া গরুর গাড়িতে উঠিতে হইবে। ক্রোশ তিনেক পথ বাহিয়া বড়-নদী, তাহার তীরে গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া নৌকায় পার হওয়া। আবার প্রায় আধ ক্রোশ হাঁটা। তারপর সিমুর।

বেলা প্রায় দুপুর। কার্তিক মাস, নূতন শীতের হাওয়ার সঙ্গে আতপ্ত রৌদ্র মিশিয়া বেশ একটি মিঠা আমেজের সৃষ্টি করিয়াছে। বাপের দীর্ঘ মন্থর পদক্ষেপের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গিরিবালা খুর-খুর করিয়া দ্রুত চরণক্ষেপে চলিয়াছে, পথের মাটির গায়ে চঞ্চল আলতার রেখা চিকচিক করিতেছে। বাপে-মেয়েতে কি সব কথা হইতেছে, গিরিবালা এক একবার মুখ তুলিতেছে, নাকের নোলকটি গড়াইয়া পড়িতেছে, আবার মুখ নত করিতে দুলদুল করিতেছে।

এদিকে সিংহবাহিনীর মন্দির। দুইজনে সিংহবাহিনীকে প্রণাম করিলেন। প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছের নিচে রথতলা। মেয়ে আবার বেশি ভক্তিমতী, রথে মাথাটা ঠেকাইয়া আসিতে গেল! রসিকলাল বলিয়া দিলেন—"শিগগির আসবি, ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

সমবয়সী ছেলেমেয়েরা জুটিয়াছে, প্রশ্ন করিল—"কোথায় যাচ্ছিস রে গিরি?"

গিরিবালার পায়া ভারী এখন, বিশেষ কাহারও দিকে না চাহিয়া চলিতে চলিতেই বলিল—"সিমুরে মামারবাড়ি।"

"কবে ফিরবি?"

"দেরি হবে, দিদিমা ছাড়বে তবে তো! চৌধুরীবাড়ি রাস আছে, যাত্রা আছে।"

"হেঁটে যাবি?"

"হেঁটে নাকি মামারবাড়ি যাওয়া যায়? এপাড়া-ওপাড়া কিনা!"

মুখটা ভারিক্কে করিয়া আবার আসিয়া বাপের সঙ্গে চলিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গীরা খানিকক্ষণ এই নবসৌভাগ্যশালিনীর পানে চাহিয়া রহিল, কি বলাবলিও হইল একটু। দু'একটি মেয়ে ঠোঁট দুইটি চাপিয়া একটু উল্টাইয়া লইল—সম্ভবত গিরিবালার দেমাক লইয়া মন্তব্য হিসাবে।

রথতলার পর রাস্তাটা আঁকিয়া বাঁকিয়া উত্তর হইয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। দুইদিকে পানায়-ভরা ডোবা, বাগান, মাঝে মাঝে ছাড়াছাড়া বাড়ি। পাড়াগাঁয়ে সাজিয়া-গুজিয়া পথচলা যে নিত্যকার ব্যাপার এমন নয়, নানারকম প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে তিনজনে অগ্রসর হইতে লাগিল—

"বাড়ুজ্জে মশাই, পেন্নাম হই। দূরের পাড়ি যেন?"

"কল্যাণ হোক। দূরেই যাব একটু, সিমুরে।"

"ও, তাই বলছিলাম, বাঁড়ুজ্জে মশাই যেন গাঁয়ের বাইরে যাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।"

"কম্পাউন্ডার সায়েবের মাথায় ঝুড়ি কেন? গিরিমায়ের সেজেগুজে বাপের সঙ্গে কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কোথায় গো রসিক?"

"একটু সিমুর যাব ঠাকুরদা।"

"নাতবৌ কোথায়?"

BanglaBook.org

"সে তো এখানেই।"

"তবে আর সিমুরে কি রইল?—আঁটিসার আমটা,—হাঃ—হা—হা।...তা যাও, মাঝে মাঝে একটু অদর্শন ভালো। নতুন বৌ জিজ্ঞেস করছে—

বিরহ—সে কেমন, হ্যাঁ গা?—
না, পিরিত-সোনার সেই সোহাগা।

ভাল কথা মনে পড়ে গেল। সিমুরের খাম্বিরে ডাকসাইটে, সেই কবে তোর বিয়ের সময় খেয়েছিলাম, এখনও মুখে তার লেগে আছে, আনবি খানিকটা। ভুললে অনর্থ করব। ...গিরি-মা, মনে করিয়ে দেবে, দেবে তো? হ্যাঁ ভোলো, আমার ক্ষতি নেই, মা'টি বেহাত হবে।—আমার সেই—নাকের বদলে নরুণ পেলাম, ড্যাং—ড্যাঙা—ড্যাং—ড্যাং—হাঃ—হা—হা।"

গিরিবালা কাপড় ধরিয়া প্রচ্ছন্নভাবে টান দিতেছে, হারাণের তো তাড়া আছেই, দুইবার গলা খাঁকারি দিল, তবুও একটু দেরি হইয়াই গেল।

হারাণের পাশে জুটিয়া গেল বাউরিদের রতন। গল্পের জন্য হারাণ উহারই মধ্যে গতি একটু মন্দীভূত করিয়া খানিকটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া লইল।

রতন ছেলেটা বেশ একটু অনুগত, হারাণের বক্তব্যগুলো নির্বিচারে শুনিয়া যায় এবং পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাস করে। পেয়ারা খাইতেছিল, চলিতে চলিতে কোঁচড় থেকে গোটা তিন বাহির করিয়া সবচেয়ে ভালটা হারাণের হাতে দিয়া বলিল—"স্যানেদের গাছের। বামুন-ডাক্তার কোথায় যাচ্ছে গা হারাণদা? তোমার ওষুধের বাক্সটা দেখছি না যে?"

হারাণ পেয়ারায় একটা কামড় দিয়া বলিল—"মিষ্টি আছে, পিরাণের পকেটে আর দুটো রেখে দে তো। বাক্স আছে—ঝুড়ির মধ্যে; তুই দেড় হাতের মানুষ, দেখবি কন্থে?"

রতন খানিকটা চুপচাপ করিয়া চলিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"বামুন-ডাক্তার যাচ্ছে কনে তাই জিগুচ্ছিনু।"

"জনাই। বাবুদের বাড়ি থেকে ডাক এয়েছে।"

ও-অঞ্চলের ছেলেদের কল্পনায় কলিকাতার পরেই জনাই এবং লাট সাহেবের পরেই জনাইয়ের বাবুরা। রতন চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—"জনাইয়ের বাবুদের বাড়ি ডাক হয়েছে? উরে বাব্বা। বামুন-ডাক্তার কেও-কেটা নয় বলো হারাণদা!"

"কেউ-কেটা হলে হারাণ পরামানিক এমন কাদাতে পড়ে থাকত না। বাবুরা কলকাতার ডাক্তারও আন্নেছেলো; অসুখের বহর দেখে ন্যাজ মুখে করে পাইলেচে। তখন ডাক্ বেলে-তেজপুরের রসিক বাঁড়ুজ্জেকে।"

"অসুখটা কি গা?"

হারাণ পেয়ারার একটা বড় গ্রাস কাটিয়া লইয়া খানিকক্ষণ চিবাইতে চিবাইতে একটা লাট-বেলাটের উপযোগী সম্ভ্রমযোগ্য রোগের নাম মনে করিবার চেষ্টা করিল, তাহার পর তাহার মনটা ওষুধের-বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করিল; হারাণ বলিল—"নক্সভোমিকা।"

কক্ষণও শোনে নাই এ নাম; রতন স্তম্ভিত হইয়া বলিল—"ব্বাস্‌রে! বাঁচবে?"

"বাঁচবে না তো যাচ্ছি কেন আমরা?"

রতন আবার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া ভয়ঙ্কর এই অজানা রোগের স্বরূপটা উপলব্ধি

BanglaBook.org

করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, একটু পরে জিজ্ঞাসা করিল—"কেবলই নাক দিয়ে বমি করছে বুঝি?"

হারাণ একটু রাগিল, বলিল "যা জানিস না বুঝিস না তাতে দখল দিতে যাসনে রতনা। বমি করে মরবি তোরা—বাউরি, দুলে, তাঁতিরা। জনাইয়ের বাবুদের অমন হেঁজিপেঁজি রোগ হয় না। ডাক্তাররাও অমন হেঁজিপেঁজি রোগের জন্যে কম্পুন্ডার সুদ্ধ হাজরে দেয় না!"

এইবার বোধহয় প্রশ্ন হবে বামুনদিদি যায় কেন। হারাণ অবশ্য উত্তর দিবেই, তবে একটু ভাবিতে হইবে। তা ভিন্ন বাবাঠাকুর অনেকটা আগাইয়া গেছে। হারাণ বাঁ হাতে ঝুড়িটা ধরিয়া ডান হাতে একমুঠা বড়ি আর একগোছা পাঁপর বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি রতনের কোঁচড়ে পুরিয়া দিয়া বলিল— "যা, ভেজে খাস্, বুঝবি কিরকম পথ্যি যাচ্ছে জনাইয়ের বাবুর রোগের জন্যে। খেতে বড়ি আর পাঁপড়ের চেয়ে যদি একচুল এদিক-ওদিক হয় তো হারাণের নামে কুকুর পুষিস্ তখন। যা, পথ্যি তৈরির কেরামতিটা দেখগে পরখ করে।"

ওদিকে মায়ে-পোয়ে জোর গল্প চলিয়াছে, মুক্ত আকাশের নিচে গতির আনন্দে কল্পনার কোন জড়তাই নাই। পাশে কাহাদের পুকুরে একরাশ রাঙা শালুক ফুটিয়াছে। একটু না দাঁড়াইয়া যেন পারিল না—বাপ মেয়ে উভয়েই। মেয়ে বলিল—"হারাণে পেছিয়ে গেছে বাবা, আসুক না।"

একটু আবদারের সুরে বলিল—"দুটো তুলে নিয়ে আসুক বাবা, হুঁ; নিয়ে যাব আমারবাড়ি।"

"তা নিয়ে আসুক দুটো। তুই বড় হলে আমি যে পদ্যগুলো লিখেছি তোকে শোনাব গিরি ; আর দুটো বচ্ছর বাদেই তুই বুঝতে পারবি, তাতে এই রাঙা শালুকের কথা লিখেছি। তুই যে মেয়ে, নইলে তোকেও শেখাতুম পদ্য লিখতে। হরুটাকে শেখাব। আমার নিজের আর হল না...নাঃ, আর উপায় দেখি না হবার, যা সংসারের দুশ্চিন্তে!"

হারাণ ঝুড়ি রাখিয়া একটু জলে নামিয়া একটা আঁকশি করিয়া ফুল তুলিতেছে। রসিকলাল একটু আত্মস্থভাবেই বলিলেন—"মেয়েছেলেতেও শেখে পদ্য লেখা, না শেখে যে এমন নয়। এই তো মানকুমারী লিখেছে। তা তুই না লিখলি—তোর ছেলে নাতি-নাতকুড় কেউ-না-কেউ লিখবেই গিরি—বাপের গুণ কোথাও না কোথাও বর্তাবেই। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ে গেল—রোজ শিবপুজো করিস তো, যেমন বলে দিয়েছিলাম?"

গিরিবালা একটু লজ্জিতভাবে রাগের সহিত বলিল—"হ্যাঁ, রোজ সময় পাই কিনা..."

"সময় করে নিতে হবে, আমি গিরিবালা নাম দিয়েছি এমনি নয়—আমার কথা ফলবে...করে নিতে হবে সময়।"

"কিগো রসিক যে, কোথায়?"

রসিকলাল ফিরিয়াই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"পণ্ডিতমশাই!"

সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া যেন একটা নির্মল আনন্দের জোয়ার খেলিয়া গেল। রসিকলাল অভিভূত ভাবে নবাগতের মুখের পানে চাহিয়া একটু দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর একবার বলিলেন—"পণ্ডিতমশাই দেখি যে!"

BanglaBook.org

তাহার পর যেন দেবতার চরণে নতি করিতেছেন এইভাবে মাথা প্রায় মাটি পর্যন্ত নামাইয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

॥ ৫ ॥

খানিকক্ষণ পর্যন্ত আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার বা বলিবার অবসর পাওয়াই দুষ্কর হইয়া উঠিল রসিকলালের। পণ্ডিতমশাই বলিয়া চলিলেন—

"আমি ঠিক দূর থেকে আন্দাজ করেছি—ভুল হতেই পারে না।...থাক্, থাক্, হয়েছে, দীর্ঘজীবী হও...ভুল হতেই পারে না। বয়েস হয়েছে, খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে ; কিন্তু মানুষটা তো আর বদলাবে না?—সেই "শালপ্রাংশু মহাভুজ"—ইস্কুলে তোমায় দেখে বলতাম না? মনে আছে?...শালগাছটা না হয় আর একটু বেড়েছে। বাঃ, বড় আনন্দ হল তোমায় দেখে রসিক।...দূর থেকেই চিনেছিলাম—তারপর আবার যখন দেখলাম লোকটা দাঁড়িয়ে কহ্লার ফুল তোলাচ্ছে তখন আমার সংশয়মাত্র রইল না। দুপুরের রোদে ডোবার ধারে দাঁড়িয়ে কহ্লার ফুল তোলাবে এমন লোক বেলে-তেজপুরে একটি মাত্রই আছে।"

"আরে চলো, দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাওয়া হচ্ছে কোথায়? তা যেখানেই যাও, পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়িতে খানিকটা না বসে পাদমপি নড়া চলবে না ; এতদিন পরে তোমায় পেয়েছি। অনেক কথা। আমার কথা জিজ্যেস করো না। সেই এখান থেকে বর্ধমান স্কুলে গেলাম—তোমরা ঘটা করে বিদায় দিলে ; নাঃ, দুটি বচ্ছরও টেঁকতে পারলাম না। বি-এ.-তে সংস্কৃতে অনার্স ছিল, আর হেডমাস্টারের চেয়ারে বসেছে, তাই সে মহাপণ্ডিত? বন্‌ল না—অর্বাচীনের ঔদ্ধত্য সোমেশ পণ্ডিত কখনও সহ্য করতে পারেনি, পারবেও না।...তারপর নবদ্বীপ ; মাইনে বেশি নয়, তবে পণ্ডিতের সাহচর্য ছিল। কিন্তু ঐ স্কুলের চাকরি—ঐ হয়েছে কাল জীবনে, টেঁকতে পারি না,—কী নীরস রুক্ষ পঠন-পাঠনের ধারা।—শুধু পাস করাও, নোট চাও, সংক্ষিপ্ত করো, খর্ব করো—এ যে কী যন্ত্রণা! কি পাপ যে করেছিলাম এ লাইন এসে!—তোমরা লাইনই বল না?—তা অবিকল লাইন ; একটু এদিক-ওদিক হবার যো নেই, তাহলেই সব ভূমিসাৎ! যাক, নবদ্বীপ ছেড়ে বছর খানেকের জন্যে এখানে এসে বসি। তুমি তখন ডাক্তারি পড়তে গেছ, দেখা হ'ল না। ঠিক করলাম আর বেরুব না, যজন-যাজনের দ্বারা যা হয় করে চালাব, আর একটা টোল খুলে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে অধ্যাপনা করব শেষ জীবনটা। পারলাম না প্রতিজ্ঞা রাখতে ; কেন, আন্দাজ করো তো?"

কাছেই বাড়ি, রাস্তার ধারে। গুরুশিষ্য আসিয়া বাহিরে দুইটি সিমেন্টবাঁধানো বেঞ্চে মুখোমুখি হইয়া অধিবেশন করিলেন। গিরিবালা পুষ্পসঞ্চয়ে পিছনেই রহিল।

পণ্ডিতমশাইয়ের মুখটি একটি অনাবিল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বসিয়া, কি যেন একটা মস্তবড় সম্পদ লাভ হইয়াছে এই ভাবের তৃপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আর একবার প্রশ্ন করিলেন—"কেন রাখতে পারলাম না প্রতিজ্ঞা আন্দাজ করো দিকিন..."

তাহার পর সেটা অসম্ভব জানিয়া নিজেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিলেন। উজ্জ্বল মুখটা হঠাৎ যেন আরও চতুর্গুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন— "উজ্জয়িনী টানলে!

BanglaBook.org

মেঘদূতের সেই অবন্তীপুর। মনে আছে তো?

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধান্
পূর্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাং।
স্বল্পীভূতে সুচরিত ফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকং॥”

তাহার পরেই কিন্তু তাহার মুখটা একটু একটু করিয়া দ্রুত নিষ্প্রভ হইয়া গেল। বলিলেন—“কিন্তু না গেলেই ভাল ছিল রসিক! এক বছর ছিলাম, শুধু পেটের দায়ে! না হলে যেদিন স্বপ্ন ভাঙল সেই দিনই চলে আসতাম, অর্থাৎ যাকে বলে ধুলো পায়েই।”

পণ্ডিতমশাই একটু অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন, কল্পনার উজ্জয়িনী থেকে তাঁহার দৃষ্টি রূঢ়, বাস্তব উজ্জয়িনীতে আসিয়া যেন নিবদ্ধ হইয়া গেছে।

একটু পরে সমস্ত ব্যাপারটা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিলেন—“এই দেখো, নিজের কথাই পাঁচ-কাহন করছি। তারপর, তোমার খবর কি? আমি মোটে এই কাল এসেচি—আরও কয়েক জায়গায় ঘুরে ঘুরে বাইরে বাইরেই জীবনের প্রায় সমস্তটা কাটিয়ে...হ্যাঁ, ভাল কথা, কাব্যচর্চাটা রেখে গেছ নিশ্চয় রসিক? মানে, পদ্য লেখার অভ্যাসটা ত্যাগ করনি তো?...বড় আনন্দ হল যখন দেখলাম তুমি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে কহ্লার পুষ্প সংগ্রহ করছ...বই কিছু প্রকাশিত করলে?”

রসিকলাল বিষণ্ণ দৃষ্টিতে একবার পণ্ডিতমশাইয়ের পানে চাহিলেন। এই একটি মাত্র মানুষের কাছে এক সময় উৎসাহ আর প্রেরণা পাইয়াছিলেন। নৈরাশ্যের কথাটা আর মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিলেন না।

পণ্ডিতমশাই বুঝিলেন এবং আর একবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন, মাঝে শুধু বলিলেন—“সংসার! সংসার!—তোমাকেও শেষ করলে?”

খানিকটা গেল। তারপর পণ্ডিতমশাই আবার সমস্তটা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিলেন—এবার একেবারে নিঃশেষভাবে। বলিলেন, —“না, শোক করো না রসিক, আমি এসেছি, তুমি আছ, আবার সব ঠিক করে নিতে হবে। ভাবনা কিসের?...তোমার সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল না? দেখো, মনেই ছিল না?”

বাড়ির সামনে লতাপাতায় ঢাকা একটা উঁচু বেড়া ছিল, সেইটার অন্তরাল হইতে গিরিবালা আর হারাণ সামনে আসিয়া উপস্থিত হইল, একরাশ ফুল, কতকগুলা গিরিবালার হাতে ; কতকগুলা হারাণের ঝুড়িতে।

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—“এই যে, বাঃ, দিব্যি মেয়েটি! কার মেয়ে? কার মেয়ে? ...তোমার? বাঃ...দিব্যি ফুটফুটে নাতনী পাওয়া গেছে তো? এসো তো দিদি।”

রসিকলাল কন্যাকে আদেশ করিলেন—“প্রণাম করো ঠাকুরদাদাকে।”

গিরিবালা সঙ্কুচিতভাবে গিয়া পদধূলি লইয়া মাথায় দিল। পণ্ডিতমশাই কোলে টানিয়া লইয়া বলিলেন—“রাজরাজেশ্বরী হও। কি নাম দিয়েছে বাবা?”

গিরিবালা নাম বলিল।

“বাঃ, গিরিবালা দেবী! তবে আর তোমায় আশীর্বাদ করব কি? বাপ এক নামেই তো সব আশীর্বাদ জড়ো করে রেখেছে। বড় চমৎকার মেয়ে, বাঃ! তা হবে না? হবে

BanglaBook.org

বৈ কি! তোমার বাবার মতো একটা চেহারা দেখাক্ না গ্রামের মধ্যে কে পারে। আমার পোড়া কপাল দেখো না—গ্রামের মধ্যেই দেবকন্যার মতো আমার এই সঙ্গিনী করে দিয়েছে রসিক আর আমি অঙ্গারসার উজ্জয়িনীর জন্য চোখের জল ফেলে বেড়াচ্ছি! কত বয়স হল নাতনীর রসিক?"

প্রাণতুল্যা কন্যার এত ঢালা প্রশংসা শুনিবার অদৃষ্ট হয় না বড় একটা, রসিকলালের মনের কবাট যেন ধীরে ধীরে খুলিয়া যাইতেছিল, স্নেহের দুর্বলতায় যত সব অসম্ভব সংকল্প মনে জমা করিয়া রাখিয়াছিলেন, মর্মগ্রাহী গুরুর সামনে একে একে প্রকাশ করিতে লাগিলেন—

"বয়স...এই আটে পড়বে। মনে করছি পণ্ডিতমশাই, গৌরীদান করব, কিন্তু..."

পণ্ডিতমশাই একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আবার 'কিন্তু' কি এর মধ্যে? গৌরীদানের মেয়েই তো..দেখাশুনা লাগিয়েছ? আমিও ঘটকালিতে নামব এবার, দাড়ি-টাড়ি রেখে নারদের মতো চেহারাও করে রেখেছি, দেখ না!"

দীর্ঘ শ্মশ্রুতে একবার হাত বুলাইয়া প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

গিরিবালা কোলের মধ্যে গুটাইয়া যাইতেছিল। রসিকলাল বলিলেন—"তাহলে আরও বলি পণ্ডিতমশাই। অন্য কাউকে বলিনি—বললে ভাববে পাগল ; ওর নামটা আমি স্বপ্নে পেয়েছিলাম, আর ও জন্মেও ছিল বাবা তারকেশ্বরের দোর ধরে...মানে..."

উচ্চাশা যে কতদূর তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিলেন না। পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"বুঝেছি, দাও তো দিদি বাঁ হাতটা একবার...ও আমি মুখের লক্ষণ দেখেই ধরেছি, তবুও একবার দেখি রেখাগুলো মিলিয়ে..."

বাঁ হাতটা তুলিয়া লইয়া পণ্ডিতমশাই করাঙ্ক-বিচার করিতে লাগিলেন। ক্রমেই তাঁহার মুখে একটা বিস্ময় আর আনন্দের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। হাতটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অতৃপ্ত আগ্রহেই অনেকক্ষণ দেখিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া আবিষ্টভাবে স্মিতহাস্যের সহিত রসিকলালের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। রসিকলাল উদ্বেগটা চাপিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেমন দেখলেন পণ্ডিতমশাই?"

পণ্ডিতমশাই উত্তর না দিয়া ভিতরের পানে চাহিয়া ডাকিলেন—"কৈ গো, কেমন নাতনী এসেছে, ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটু আলাপ-পরিচয় করো।...দেখেছেন নিশ্চয় আড়াল থেকে, নাতনীর রূপ দেখে হিংসেয় আর পা বাড়াতে পাচ্ছেন না বোধ হয়!...হাঃ--হা—হা..."

একজন নথ, শাঁখা আর চওড়া রাঙা পাড়ের শাড়ি-পরা বর্ষীয়সী বাহির হইয়া আসিলেন। পণ্ডিতমশাই গিরিবালার মাথায় হাতটা একবার বুলাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কার মেয়ে বলো দিকিন?"

রসিক অগ্রসর হইয়া পদধূলি লইয়া বলিলেন—"আমি রসিক, মা ; চিনতে পারছেন না বোধ হয়!"

বর্ষীয়সী রসিকের চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলি চারিটি স্বীয় অধরে ঠেকাইলেন ; বলিলেন—"ওমা, অমন কথা বলো না ; চিনতে পারব না কি! ভীমরতি হয়েছে নাকি? ...তোমার মেয়ে? চমৎকারটি হয়েছে তো!—বাপমুখী মেয়ে, পয় ভাল। এসো তো দিদি, ভেতরে চলো, রোদে তেতে মুখখানি রাঙা হয়ে উঠেছে!...আর কি ছেলেপুলে রসিকের?

BanglaBook.org

কাল মোটে এলাম, এখনও খোঁজখবর নেওয়া হয়নি কাউরি।”

রসিকলাল লজ্জিতভাবে বলিলেন—“ওর দুটি ভাই আছে, দুটিই ওর নিচে। একবার যাবেন মা আমাদের ওখানে।”

“মেয়েই তাহলে পেরথোম?—ভালো, পেরথোম মেয়ে আবার বাপের ভাগ্যি নিয়ে আসে, আর্শীবাদ করি সব বেঁচে-বর্তে থাক।...ওমা, যাব বৈকি, যাব না? আগে যাব—গেরস্থালীটা একটু গুছিয়ে নিয়েই।...যেখানেই থাকুন, হেন দিন যায়নি যেদিন একবার রসিকের নাম না করেছেন। যাব বৈকি।”

স্ত্রী গিরিবালাকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলে পণ্ডিতমশাই আবার স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টিতে রসিকলালের মুখের দিকে চাহিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—“দিদিকে আমার সরিয়ে দিলাম রসিক, লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তা ভিন্ন—তা ভিন্ন...”

দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা কাটাইয়া বলিলেন—‘তা ভিন্ন, দেব-অংশে জন্ম এ-মেয়ের, নিজের কথা যত কম শোনে ততই ভালো, জাতিস্মর হয়ে উঠলে—মানে নিজেকে চিনে ফেললে আর এরা থাকতে চায় না সংসারে।...বড় সুলক্ষণ মেয়ে রসিক ; পিতৃকুল, শ্বশুরকুল দুই কুলকেই ধন্য করবে এ মেয়ে।”

পণ্ডিতমশাই তারপর ধীর-সঞ্চারে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—“কিন্তু কাছে রাখতে পারেন না...না। এর বিবাহ বহুদূরে হিম-চক্রের মধ্যে—হিম-চক্রটা হল হিমালয়ের পঞ্চাশৎ ক্রোশ পর্যন্ত স্থানটা।...হুট্ করতেই যে ওপাড়ায় গিয়ে মেয়েকে দেখে আসবে সেটি হবার জো নেই। উঁহু...আর একটা কথা, তবে সেটা তেমন বিশেষ কিছু নয়...

শেষের কথাটুকু পণ্ডিত যেন একটু চিন্তিত ভাবেই বলিলেন। রসিকলাল উৎসুককণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—“কী পণ্ডিতমশাই?”

পণ্ডিতমশাই তাচ্ছিল্যের সহিত বলিলেন—“নাঃ, সে কিছু নয়, মানে, বিয়েতে একটু সঙ্কট আছে, তা সে সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাবে! মেয়ে থাকলেই পাঁচটা ভালোমন্দ সম্বন্ধ আসে, সাবিত্রীরও পাঁচ জায়গায় সম্বন্ধ খুঁজতে হয়েছিল। যদি হয়ই একটু গোলমাল তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই। বিবাহ আমার দিদির যথাস্থানেই ঠিক হয়ে আছে, খুঁজে নিয়ে যাবে।”

রসিকলালের স্বপ্ন যেন পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। কী যে বলিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। চোখ দুটি ভাবাবেগে ছলছল করিয়া উঠিয়াছে ; মুখখানায় কিসের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। একটু আবিষ্টভাবে থাকিয়া অবশেষে বলিলেন—“যেখানে থাকে ভালো থাক্ পণ্ডিতমশাই। ওর যার অংশে জন্ম সে বাপ-মাকে খুবই কাঁদিয়েছিল—শ্বশুরঘর যাওয়ার পরে থেকে,—তার জন্যে আমাদের দুঃখ নেই কোন। আর কারুর কাছে বলি না ওর কথা, ভাববে পাগল। ওকে শুধু বলি নিত্য শিবপুজোটা করে যাস্—তারই কি সময় পায় ঠিক মতো? যা ঘরে এসে জন্ম নিয়েছে।”

বহুদিন—বহুদিন পরে একটি মনের পরশ পাইয়াছেন যে তাঁহাকে চেনে, বোঝে, তাঁহার গূঢ়তম বিশ্বাসকে বাতুলতা বলিয়া বিদ্রূপ করে না, এমন একটি মন যাহাতে নিজের স্বরূপটিকে প্রতিবিম্বিত করিয়া দেখা যায়।...রসিকলালের অশ্রু উদ্‌গত হইয়া গড়াইয়া পড়িল, একটু লজ্জিতভাবেই কোঁচার খুঁটে মুছিয়া লইলেন।

বিষয়ান্তর আনিয়া ফেলিবার জন্যই পণ্ডিতমশাই বলিলেন—“তা আসল কথাই তো

Banglabook.org

জিজ্ঞাসা করা হল না,—চলেছ কোথায়? সঙ্গে বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে লোকও চলেছে দেখছি...”

রসিকলাল বলিলেন—“যেতে হবে একবার সিমুরে।”

“অর্থাৎ?”

“ইয়ে—গিরির মামারবাড়ি।”

“ঠিকই তো, মনে ছিল না। সিমুরেই তো তোমার বিবাহ হয়। ফিরছ কবে? ...অনেকদিন পরে দেশে ফিরলাম, অনেক কথা বাকি। শিগ্‌গির আসবে। শাশুড়ীর মোহে যেন আটকে যেও না বাপু!”

ঘরোয়া রসিকতাটুকু করিয়া পণ্ডিতমশাই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“তা করব বৈকি ঠাট্টা, আমার তো আর পুত্রসন্তান নেই, পুত্র বলো, শিষ্য বলো—সব তোমরাই।”

রসিকলাল লজ্জিতভাবে মাথাটা নিচু করিয়া ছিলেন, তুলিয়া বলিলেন—“আজ্ঞে, আপনাকে পেয়ে আমার তো মন সরছে না যেতে আর, নেহাত মেয়েটাকে দেখতে চেয়েছেন সবাই সেখানে...”

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—“এ কথা আমি বিশ্বাস করি রসিক, আমি এসে পড়েছি, আর যে তুমি কোথাও যেতে চাইবে না—একথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—”

একটু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন,—“তাহলে কিন্তু তোমায় উঠতে হয়। অনেকটা পথ তো? আমিও খানিকটা দেরি করিয়ে দিলাম।...ওগো, নিয়ে এসো নাতনীকে, তুমি যে ঘরের লোক করিয়ে দিলে!—ওকে অনেক দূর যেতে হবে।”

স্ত্রী গিরিবালাকে লইয়া বাহিরে আসিলেন, হাতে একটি রেকাবিতে গুটিকয়েক মুকুন্দ-মোয়া আর এক গ্লাস জল। বলিলেন—“তা সত্যি ঘরের-লোক করে রাখতেই ইচ্ছা করে। কী চমৎকারটি বাপু! কী গিন্নীবান্নির মতো কথার ছাঁদ এতটুকু মেয়ের, আর কী নরম স্বভাব!”

রসিকলাল বলিলেন—“এই মাত্র খেয়ে বেরিয়েছি মা, তা ভিন্ন অনেকটা পথ যেতে হবে, সময় অল্প...”

গুরুপত্নী অনুযোগের স্বরে বলিলেন—“ওমা, তা কি হয়! হোক্ অনেক দূর। বুঝলাম শ্বশুরবাড়ির আদর-যত্ন, আমার গরীবের এই দুটি মোয়ার মর্য্যেদা কিন্তু ঢের বেশি বাবা, ...কি গো, তুমি কথা কইছ না কেন?”

শেষের কথাগুলি পণ্ডিতমশাইকে উদ্দেশ করিয়া। পণ্ডিতমশাই প্রসন্ন গাম্ভীর্যে দাড়ির উপর হাতের একটা দীর্ঘ টান দিয়া বলিলেন—“তা কি ও-ই অস্বীকার করতে পারে? পারে কি কখনও?...নাও হে রসিক, চলবে না ওজর।”

গিরিবালাকে আবার কাছে ডাকিয়া লইলেন। বুকের কাছটিতে দাঁড় করাইয়া কী যেন এক পবিত্র অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া গেছেন। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন —“শিবপুজো করিস তো নিত্য?...না, ছুতোনাতা শোনা হবে না। ইস্, বিনি তপস্যাতেই ইনি কেল্লা ফতে করবেন ভেবেছেন! স্বয়ং উমাই বড় রেহাই পেয়েছিলেন! শোন্ তবে—

স্বয়ংবিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া-পুনঃ।

BanglaBook.org

তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চা তাং পুরাবিদঃ।।

মানে শুনবি?—

পর্ণ কিনা পাতা শুকিয়ে নিজে গাছ থেকে পড়বে, তাই খেয়ে থাকতে পারলে তবে সেই হল তপস্যা ; উমা তাও খাওয়া ছেড়ে দিয়ে অপর্ণা নাম নিলেন,—তবে গিয়ে মহাদেবকে...”

স্ত্রী ভিতর থেকে রসিকের জন্য পান সাজিয়া আনিলেন, হাতে আরও দুইটি মোয়া ; —হারাণকে ডাকিয়া দিয়া স্বামীকে বলিলেন—“করুক তপিস্যে, মানা করিনে, কিন্তু যার জন্যে তপিস্যে তাকেও ওদিকে তপিস্যে করতে হবে না? ইস্, ওমনি!”

উঠিবার সময় রসিকলাল একগোছা শালুক পাশটিতে রাখিয়া দিয়া বলিলেন—“আমার প্রণামি, পণ্ডিতমশাই!”

প্রণাম করিয়া কন্যার হাত ধরিয়া অগ্রসর হইলেন। খানিকটা যখন গেছেন, পণ্ডিতমশাই রাস্তায় নামিয়া আসিয়া একটু হাঁকিয়া বলিলেন—“বাপ, মা, আর গুরুতে পেছনে ডাকলে দোষ হয় না।—বলছিলাম—শিগ্‌গির আসবে ফিরে রসিক, কালিদাসের গ্রন্থগুলো আবার ঝেড়ে-ঝুড়ে একবার দুজনে ভালো করে পড়তে হবে।”

রসিকলাল একটু হাসিয়া কহিলেন—“বললাম তো পণ্ডিতমশাই, আমার পা উঠছে না যেতে।”

কি যে একটি আনন্দস্রোত বহিতেছে মনে,—রসিকলালের আর সবই যেন লঘু, অকিঞ্চিৎকর মনে হইতেছে। নিজেকে, গিরিবালাকে যেন নূতন করিয়া পাওয়া গেল আজ, যেন গুরুগৃহে নূতন এক জীবনের অভিষেকের পর তীর্থযাত্রা আরম্ভ হইল! শ্বশুরবাড়ির কথা লুপ্ত হইয়া গেছে, শুধু চলার আনন্দে, পাওয়ার আনন্দে, দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মনটা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তৃপ্তি-অতৃপ্তিতে মেশানো কী একটা অনুভূতি—স্কুলের সেই হারানো দিনগুলির টুকরা-টাকরা কোথা হইতে যেন ভাসিয়া আসিয়াছে...গিরি—গিরি আমার গিরি—নামটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়া সমস্ত মনটিতে একটা অপূর্ব মধুর রসে যেন মাখাইয়া লইতেছেন। কবির মনই, কিন্তু আজ হঠাৎ আকাশ, বাতাস, চারিদিকের গাছ-গাছড়া, পূর্বাপর সব কিছু কি করিয়া শতগুণ সুন্দর হইয়া গেছে।...মনে একটিমাত্র ধ্বনি উঠিতেছে—‘আমার গিরি—আমার গিরি—গিরিবালা—পার্বতী—উমা’।

গিরিবালা বলিল—“শিগ্‌গির চলো বাবা, রাত করে ফেলবে। এঁরা কারা বাবা?”

“ঐ দেখলি তো গিরি? উনিও তোকে শিবপুজো করতে বললেন।...কি জিগ্যেস করছিলি? ও! উনি পণ্ডিতমশাই, আমাদের স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন। অমন মানুষ হয় না।...শিবপুজো করবি গিরি ; বুঝলি?”

গিরিবালা গুরু-শিষ্যের কাছে এই আধঘণ্টার মধ্যে এই লইয়া এত তাগাদা খাইয়াছে যে আর ধৈর্য রাখিতে পারিল না, মুখঝামটায় নোলকটা একটু জোরে দুলাইয়া বলিল—“খালি শিবপুজো, খালি শিবপুজো!...বলছি তো করব। খোকাকে নিয়ে আর ছিষ্টির পাট করে সময় হলে তো?”

ভাবের ঘোরে ধমকটা খাইয়া রসিকলাল একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—“নারে পাগলি, বুঝিস্ না। দুটো ধুতরো আর বিল্বিপত্র দিয়ে ও-বুড়োর

BanglaBook.org

কাছে কী-ই বা আদায় না করা যায়?"

বাগ্‌দিপাড়া আসিয়া গেল। দুলাল বাগ্‌দি রোদে পিঠ দিয়া পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, জুতার শব্দে ফিরিয়া চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"পেন্নাম হই বাবাঠাকুর ; কদ্দুর যাওয়া হচ্ছে?"

একটু দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। কাল এই দুলালই স্ত্রীকে প্রহার দিতেছিল, রসিকলাল দুইটা চাপড় দিয়া নিরস্ত করিবার সময় টের পাইয়াছিলেন যে এর অসুখ। কহিলেন —"যাচ্ছি সিমুর ; আছিস কেমন দুলু? কাল যেন বললি জ্বর আছে?"

"জ্বরের ওপর ঠেঙানি দিলে কি জ্বর ছেড়ে যায়? ভূত নয় তো বাবাঠাকুর।" —কথাটা বলিয়াই আবার হাসিয়া বলিল—"না, আজ আছি ভালোই। থাকব কিনা, পালা জ্বর, দু'দিন বাদ দিয়ে দিয়ে এসে।"

"পালা জ্বর? তা গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসিস'খন। সিমুর থেকে ফিরি। কি খাচ্চিস্?"

"ডোবার জল আর হাওয়া। একলার পেট চলে না বাবাঠাকুর, তার ওপর বিধেতাপুরুষ বছর বছর একটি করে ভাগীদার পাঠাচ্ছে। আজ দিনদশ থেকে আমার এই দশা। ঘোষালদের ওপরে দুটো ঘর হচ্ছে—মাগী গতর খাটিয়ে গণ্ডা দু'এক করে পাচ্ছেল—মুড়িটা-আসটা কিনে কোন গতিকে চলে যাচ্ছেল। পরশু থেকে কোলের মেয়েটার কি হয়েছে ; ও-ও আর বেরুতে পারে না।...কাল তুমি বিধেতাপুরুষ হয়ে চিড়ে ক'টা দিয়েছিলে—তাও ক'দণ্ড বাড়িতে রইল?—নক্ষ্মীর মা নারায়ণীর কাছে কর্জ নিয়েছেল, সে খবর পেয়ে আদ্দেকটা নিয়ে দেল। আজ আর...তোমার তো সেই বড়নদী পেইরে?—তা যাও, শুনে কি ফুরুতে পারবে?"

একটি আট-নয় বছরের চিরকুট-পরা মেয়ে ওদিক-কোথায় থেকে আসিয়া একটু তফাতে দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া ভিতরে গিয়া বলিল—"মা, বামুন-ডাক্তার এয়েছে —খুকিকে দেখাবি বললি না ত্যাখন?"

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সের বৌ ছেঁড়া কাঁথায় আর ন্যাকড়ায় জড়ানো বছরখানেকের একটি শিশুকে বুকে করিয়া ঘরের দরজায় দাঁড়াইল, একটু যেন কি ভাবিল, তাহার পর হঠাৎ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া দ্রুতপদেই নামিয়া আসিল, এবং রসিকলাল ব্যাপারটা ঠাহর করিবার পূর্বেই শিশুটিকে একেবারে তাঁহার পায়ের কাছে নামাইয়া চাপা গলায় কাঁদিয়া উঠিল—"এই রইল ছিচরণে গো বাবাঠাকুর ; ও বাঁচবে নি—আজ তিন দিন মুখে রা নেই—কেন যে এসে সব দগ্ধাতে!..."

হঠাৎ যেন একটা কি হইয়া গেল। গিরিবালা একবার শিশুটির, একবার তাহার মায়ের, একবার রসিকলালের মুখের পানে চাহিয়া ভ্যাবাচাকা খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রসিকলালের অবস্থা ততোধিক খারাপ। একবার কি বলিবার চেষ্টা করিয়া নির্বাক হইয়া বিপর্যস্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এমন সময় দুলাল হঠাৎ উঠিয়া মারমুখো হইয়া বধুর পানে আগাইয়া আসিল। শিশুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—"তোল্ শিগ্‌গির ; তোল, নৈলে দোব তোর মেয়ের ওপর একটা লাথি বসিয়ে, মরা মেয়ে তুলতে হবে। ..পাড়া দিয়ে যাত্রা করে কারুর ভালোমন্দ জায়গায় যাবার জো নেই, অমুঙ্গলের দল পথ এগলে দাঁড়াবে। শুনবি নি কথা হারামজাদি? তুলবি নি?..."

ঘুষি তুলিয়া অগ্রসর হইতেই রসিকলালের যেন সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। চিৎকার

করিয়া উঠিলেন—"থাম্ বলছি দুলো, নইলে কাল আর তোর কী হয়েছে?—আজ আস্ত রাখব না।"

দুলুর স্ত্রীকে বলিলেন—"তোল্ মেয়েটাকে।"

তুলিলে, একবার একটু কুণ্ঠার সহিত ক্ষণমাত্র কন্যার পানে চাহিয়া শিশুটিকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিলেন, হোমিওপ্যাথি প্রথায় প্রসূতিকে একরাশ প্রশ্ন করিলেন—"একটু কাগজ আর দোয়াতকলম চাই তো?"

পাইবার কোনও আশা নাই জানিয়া নিজের পকেটগুলায় একবার হাত দিলেন, একটা ছোট পেন্সিল পাওয়া গেল। দুলালের মেয়েটি একটু তৎপর ; দরজার কাছে তাহার আরও তিনটি ছেলেমেয়ে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের সরাইয়া ভিতর থেকে বোধ হয় সাগু কি ঐরকম একটা কিছুর মোড়ক খুলিয়া খানিকটা কাগজ সংগ্রহ করিল, হাতের তেলোয় তাহার কুঞ্চন যথাসাধ্য মিলাইয়া দিয়া রসিকলালের হাতে তুলিয়া দিল। রসিকলাল একটি ঔষধের নাম লিখিয়া দিয়া দুলালের পরিবারকে বলিলেন—"আমার বাড়ি থেকে ওষুধ নিয়ে আসবি।...শোন, আর কারুর হাতে দিস্‌নি, বড়বৌয়ের হাতে দিবি। তুই নিজে যাস্। চল গিরি, গাড়োয়ানটা হা-পিত্তেশ করে দাঁড়িয়ে আছে।"

বেশ খানিকটা দূরে একটা অশ্বত্থ গাছের শানবাঁধান চাতালে হারাণ পেতে নামাইয়া বসিয়াছিল। অনকেগুলি ছেলেমেয়ে ঘিরিয়া বসিয়াছে, সে হাতমুখ নাড়িয়া কি সব মন্তব্য করিতেছে। রসিকলাল বলিলেন—"তুই খুব বসে বসে মাতব্বরি কর হারাণে, চার কোশ পথ ভেঙে যেতে হবে সেটা হুঁশ আছে?"

দুই পা অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দুলালের স্ত্রীকে বলিলেন—"একটু দুধ দিতে হবে মেয়েটাকে।"

দুলালের স্ত্রী একটু স্থির হইয়া রহিল।

"শুনলি? একটু দুধ চাই, ওষুধ তো আর খোরাকের কাজ করবে না? দুধ একটু দিতে হবে!"

দুলালের স্ত্রী এবার মাথা নাড়িল।

মেয়েটা দাঁড়াইয়া ছিল। রসিকলাল বলিলেন—'ডাক্ তো দোলকে, সে-হারামজাদা বুঝি ঘরে গিয়ে সেঁদুল?"

দুলাল আসিলে বলিলেন—"বউকে সামনে এগিয়ে দিয়ে তুই যে ঘরে গিয়ে বসলি? খালি বুঝি ঠেঙাবার গোঁসাই? ওকে তো দুধ এনে দিতে বললেও মাথা নাড়ছে, যদি বলি বেদনা আঙুর এনে দিতে হবে, তাতেও মাথা নাড়বে। পাবে কোথায় একবার ভেবে দেখেছিস?"

দুলাল বিরক্তভাবেই বলিল—"আমার কিছু ভেবে দেখবার খ্যামতা নেই বাবাঠাকুর, ওরা সব বাঁচবার জন্য এসে নি, মিচে বামুনের যাত্রা নষ্ট করে শাপমন্যি কুড়ুনো...দুধ এনে খাওয়াবে!"

রসিকলাল একটু দ্বিধাভরে কি ভাবিলেন, তাহার পর পকেট থেকে ব্যাগ বাহির করিয়া একটা আধুলি লইয়া দুলালের গায়ে ফেলিয়া দিলেন—বলিলেন, "অনেক ফি জমছে আমার, সঙ্গে এটাও দিয়ে দিবি, ফাঁকি দিসনি যেন, তোরা সব পারিস।"

BanglaBook.org

যাইতে যাইতে গিরিবালা বলিল—"বাবা যেন কী!"

যাত্রাপথে বাগ্‌দি ছোঁওয়ার জন্য আর আট-আনিটার জন্য রসিকলাল শঙ্কিতই ছিলেন মেয়ের কাছে, বলিলেন—"ওকে ছুঁলুম?—সে আমি ঠিক করে রেখেছি,—রাস্তায় নবীনের বাড়ি পড়বে, একটু গঙ্গাজল চেয়ে নিয়ে মাথায়..."

"সে নিও, সে কথা হচ্ছে না। ও গরীব, কোথা থেকে ফিরুবে আটআনিটা? —আবার ফি-ও দেবে!"

রসিকলাল হঠাৎ রাগিয়া উঠিলেন, যেন দুলাল সামনেই আছে এই ভাবেই বলিলেন —"দিতে হবে ওকে, ফি আমি এক পয়সা ছাড়ব না, যেমন করে পারি আদায় করব। ফি হল ডাক্তারের লক্ষ্মী, বাঃ! গরীব তো নিজের ঘরেই গরীব আছে...বাঃ!"

চুপচাপ চলিয়াছেন দুইজনে। আর একটু গিয়া গিরিবালা বলিল—"বাবা!"

এবার স্বরটা একটু দ্রব। রসিকলাল প্রশ্ন করিলেন—"কি গা, কি বলবি?"

"কিছু নেই ওদের খাবার, আহা! বলছিলাম—মুড়কিগুলো দিয়ে আসুক না গিয়ে হারাণে। বাড়িতে না বললেই হবে।"

মেয়ের নিকট হইতে ভয় করিবার কিছু নাই তাহা হইলে ;—রসিকলালের বুক হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। তবু কতকটা অভিভাবকের কণ্ঠেই বলিলেন—"হ্যাঁ, ওদের খাঁই মেটানো চাড্ডিখানি কথা!...তবে তুই যখন বলছিস, দিয়ে আসুক না হয়। ভারি তো নতুন গুড়ের মুড়কি!—মস্তবড় বয়ে নিয়ে যাওয়ার জিনিস কুটুমবাড়ি!"

পরিপূর্ণ আনন্দে নির্বাক হইয়া চলিয়াছেন।...কৈলাস-দুহিতা উমাপার্বতী যে!— কেমন করিয়া সহ্য করিবে সে এই অসহ দুঃখ? পারে কখন?

আরও খানিকটা গিয়া গিরিবালা ডাকিল—"বাবা!"

স্বর আরও করুণ, তবে যেন একটু দ্বিধাজড়িত। রসিকলাল স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন —"কি গা গিরি?"

"নাঃ, এমনি ডাকছিলাম।"

আর একটু পরে,—

"বাবা!—আচ্ছা বাবা, মায়ের বেশি কষ্ট না বাপের?"

অদ্ভুত প্রশ্ন মেয়ের। রসিকলাল হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"শোন গিরির কথা! তুই-ই বল না—তোর গর্ভধারিণী বেশি ভালোবাসে তোকে, না তোর বাবা? যে বেশি ভালোবাসে তারই তো লাগে বেশি।"

BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

ওপারে গিয়া দেখা গেল গাড়ি নাই। গিরিশ হাজরার গাড়ি ঠিক হইয়াছিল, এত দেরি দেখিয়া সে ভাবিল—এরা আজ আসিল না। খুব চটিলে হারাণের মুখে আড় থাকে না, বলিল—"এ আমার জানাই ছেল ; সেই তিন পহর রাত্তিরে সেখানে উঠতে গিয়ে চোর-তাড়ানি না খেতে হয় সবাইকে, তো...ত্যাখন দুলুবাগ্দি ঠ্যাকাবে'খন—তার ঐ গোরা-পল্টন তুলে নিয়ে এসে!"

কার্তিকের দিন—বাড়ি পৌছাইতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। গিরিবালার মামী আঁচলের

আড়াল দিয়া তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ দিতে যাইতেছিলেন, একেবারে উঠানের মধ্যে নূতন লোক দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন, সঙ্গে সঙ্গেই চিনিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন —"ওমা, কী ভাগ্যি! ঠাকুরজামাই যে! সঙ্গে কে—গিরি না?...এসো ভাই, একটু রোস, তুলসীতলায় পিদ্দিমটা দিয়ে দিই।...ও মেজঠাকুরঝি! দেখ'সে কে এসেছে!"

প্রদীপটি মঞ্চে রাখিয়া তাড়াতাড়ি একটা প্রণাম করিয়া সামনে আসিলেন। গিরিবালাকে কোলে তুলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন, তাহার মুখটি একটু সরাইয়া ধরিয়া বলিলেন—"ওমা, কী চমৎকারটি হয়েছে গো গিরিটা! কি লো, মামীকে পারিস্ চিনতে?"

"কে লা বৌ?"—বলিয়া রসিকলালের মেজ শ্যালী কাত্যায়নী ঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। আবছা আলোয় রসিকলালকে চিনিয়া বলিলেন—"বাঁড়ুজ্জে!—তাই তো বলি, বৌ কাকে পেয়ে এমন হঠাৎ উৎলে উঠল!...তা উঠে এসো, উঠোনে দাঁড়িয়ে কেন?"

বলিতে বলিতেই নিজেও নামিয়া আসিয়াছেন। রসিক প্রণাম করিলেন, মেয়েকেও কহিলেন—"নেমে মেজমাসিমাকে আর মামীমাকে প্রণাম কর। মামীর কোল দখল করে রইল বোকা মেয়ে!"

গিরিবালা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলই, লজ্জিতভাবে নামিবার জন্য অঙ্গ মোড়া দিল। মামী তাহাকে চুম্বন করিয়া ননদকে বলিল—"আমি যার জন্যে উৎলে উঠেছি তাকে এই দেখো। কী চমৎকার হয়ে উঠেছে দিদি, গিরি এই ক'টা দিনে!"

"ও তো হবেই সুন্দর, মায়ের চোখ মুখ, বাপের রং পেয়েছে, সুন্দর তো হবেই। আর এসেছিল সে কি 'কটা' দিন হোল?—নেত্যর সাধের সময়; সে প্রায় বছর ঘুরতে চলল। কতদিন বলেছি বাঁড়ুজ্জেকে, নিয়ে এসো ওদের একবার : তা অ্যাদ্দিনে বার হোল। দেখতে সাধ হয় না? তা নিয়েও এলেন তো একটিকে বাদ দিয়ে এলেন!"

কোট আলোয়ান নামাইতে নামাইতে রসিকলাল বলিলেন—"তোমারই জিনিস, দিদি, নিয়ে আসব তাতে আর হয়েছে কি? সে কথা নয়।—সেবার বাড়ি ফিরে গিয়ে গিরি পা ফুলে, জ্বর হয়ে তিন দিন বিছানায় পড়ে রইল। হরুটাকে ঐজন্যেই নিয়ে আসতে সাহস করলাম না।...বাপের রং পেয়েছে তো কি বাহাদুরি হয়েছে? চলাটা পাক্ দিকিন, —ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত হেঁটে পা ফেলানো কাকে বলে জানিনে..."

শ্যালিকা হাসিয়া বলিলেন—"তা কি হয়—তুমি যদি এখন লঙ্কা ডিঙোও, ওদের তাই পারতে হবে?"

তিনজনেই একটু হাসিয়া উঠিলেন।

গিরিবালাকে কাছে টানিয়া লইয়া, দুই হাতের তেলোয় তাহার মুখটা তুলিয়া কাত্যায়নী প্রশ্ন করিলেন—"মা, জেঠাইমা, জেঠামশাই, সাতু, হরু, পুতী, খোকা—সবাই কেমন আছে লো? বাপ কাল গুমোর করে গেল—বড় গিন্নী হয়েছিস—কৈ, চুপ করে রইলি যে?—বল সব খুঁটিয়ে, শুনি—তবে তো গিন্নী।...জেঠাইমা কি পাঠালে আমাদের জন্যে?"

গিরিবালা জড়িমার মধ্যে বলিয়া ফেলিল—"মুড়কি..."

তাহার পর মনে পড়িয়া যাওয়ায় একেবারে চুপ করিয়া গেল।

BanglaBook.org

রসিকলালের জুতার ফিতায় একটা গ্রন্থি পড়িয়াছিল, অনেকটা ঠিক করিয়া আনিয়াছিলেন, হঠাৎ আরও জটিল হইয়া গেল।

বাহিরের দাওয়ায় একটা খুট্‌খাট শব্দ হইতেছিল—হারাণের তবল—সেটাও হঠাৎ থামিয়া গেল।

কাত্যায়নী বলিলেন—"শুধু মুড়কি? কাল বাঁড়ুজ্জেকে যে চালতার কথা বলে দিয়েছিলাম।...তা কৈ, মুড়কিই দেখি।...বৌ নিশ্চয়ই বলেছে—মেজদিদির নোলা দেখো! —তা, বরদার ঘরের জিনিসে আমার একটু লোভ আছে বাপু,—ওর মিষ্টি হাতটি যেন মাখানো থাকে। কৈরে?...তোমার সেই বাজনদার নফরটি বুঝি?"

হারাণ পেতেটা লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। রসিকলালের গ্রন্থি আরও উৎকট হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

"ওমা, করেছে কি কাণ্ড!—লাউ—আর এই যে আমার চালতা,—বাঁড়ুজ্জে কি এত নেমকহারামি করতে পারে?...করমচা—পাঁপর—কত রকম বড়ি!...নতুন পোয়াতি—এইসব করেছে রোদে পিঠ পুড়িয়ে? মুকুন্দমোয়া—তা ভালো করেছে—অখিল বড্ড ভালোবাসে বেলেতেজপুরের মুকুন্দমোয়া।"

ঝুড়িটা সরাইয়া দিয়া কি বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল —বলে, "হ্যাঁ—মুড়কি কোথায়? গিরি মুড়কির কথা বললি যেন—বাবা পথে খেতে খেতে এসেছে নাকি!"

রসিকলালের মুখের পানে চাহিলেন, দেখা গেল না, দৃষ্টি তখন গ্রন্থিনিবদ্ধ। হারাণ নাপিতের সন্তান, ধূর্ত, পেতেটা রাখিয়াই বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল। কাত্যায়নী হাসিয়া বলিলেন—"বলি, ও বাঁড়ুজ্জে, মেয়ে যে বললে..."

গিরিবালা হঠাৎ ঘুরিয়া দুইবার ফোঁপাইয়া কাত্যায়নীর কোলেই মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাত্যায়নী আর তাহার ভাজ, দুইজনেই অপ্রতিভ হইয়া কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন, বিশেষ করিয়া কাত্যায়নী—তিনি আত্মীয়তা আর আনন্দের আতিশয্যে কুণ্ঠার গণ্ডিটা পর্যন্ত ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন—বোনের ওখানে সওগাত সম্বন্ধে নারীসুলভ কৌতূহলটিকে ভগ্নীপতির সামনেই মুক্তি দিয়া।...একবার ভাজের মুখের পানে চাহিলেন —অপ্রতিভ মুখেরই যেন প্রতিবিম্ব, তাহার পর উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া গিরিবালাকে বুকে চাপিয়া ঠাণ্ডা করিবার চেষ্টায় লাগিয়া গেলেন—

"কি হোল রে?—কাঁদিস কেন গিরি? চাকরটা ফেলেটেলে দিয়েছে?...বরুই দিতে ভুলে গেছে শেষ পর্যন্ত?—তাই হবে, এর জন্যে কান্না কেন?...দেখো তো! তোর বাপ কি সত্যিই খেতে খেতে আসতে পারে?...ঠাট্টার সুবাদ, ঠাট্টা করব না? চুপ কর, চুপ কর গিরি, লক্ষ্মীটি...হ্যাঁ বাঁড়ুজ্জে, তুমিও যে কথা কও না!...দেখো তো!"...

নিতান্ত একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। গিরিবালার কান্না কমবে কি, আরও বাড়িয়াই যাইতেছে। ওদিকে রাজ্যের সমস্যা আসিয়া রসিকলালের ফিতায় জড়ো হইয়াছে। কাত্যায়নী বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়া কী যে করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। হঠাৎ অতটা উৎসাহের মাথায় ধাক্কাটা খাইয়া তাঁহারও কণ্ঠে যেন কি একটা ঠেলিয়া উঠিতেছে। অসহায়ভাবে একবার ভাজের পানে চাহিয়া বলিলেন—"এমন কিছু বলে ফেলেছি, বৌ?"

BanglaBook.org

তিনি ভীতভাবে মগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"কৈ, এমন তো কিছু..."

কাত্যায়নীর আর সহ্য হইতেছিল না অবস্থাটা,—"ভাই, যদি কিছু বলে থাকি ভুলে" —বলিয়া অভিমানভরে রসিকলালের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় হারাণের দুর্বুদ্ধিই হোক, কি সুবুদ্ধিই হোক— আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া আসল কথাটা ফাঁস করিয়া দিল—

"ঐ লাউ-চালতা ক'টা আর বড়িগুলো যে ফাঁড়া কাটিয়ে পৌঁছুতে পেরেছে ছিচরণে এইটেই পোড়াকপালের খুশ্‌নসিব বলে ধরে নেবেন দিদিঠাকরুণ। পিরথিমিতে উপোস করবার লোকের অভাব রাখেন নি বিধেতাপুরুষ। তাদের কাটিয়ে এমনই গেরস্তমানুষের পথ চলা দায়, তার উপর যদি কেউ দাতাকণ্ণ হয়ে বাড়ি বয়ে তাদের খোরাক পৌঁছুবার দায় উঠোয় তো তুচ্ছ মুড়কি কেন, কুবেরের ভাঁড়ারও..."

গিরিবালা হঠাৎ চুপ করিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেছে। রসিকলাল অসহায় ভাবে শুনিয়া গেলেন খানিকটা, তাহার পর মুখটা নিচুভাবেই ঘুরাইয়া উগ্র দৃষ্টিতে হারাণের পানে চাহিলেন।

হারাণ আড়ালে সরিয়া গেল, সেইখান থেকেই বলিল—"আমার কি?—ঢাকি সুদ্দু বিসজ্জন দিতে বললে আরও ভালোই হোত, অমন নতুন গুড়ের মুড়কি বিলিয়ে কুটুম বাড়িতে শুধু লাউ-চালতা বইতে হোত না...বলতুম নি,—কি দরকার পড়েছে আমার? —খাই দাই গাজন গাই...তবে কইতে হোল কথা নেহাত নাকি মুড়কির আপসোসে দিদিঠাকরুণের কোমল অন্তরীক্ষে..."

কাত্যায়নী খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তুই থাম, বুঝিছি। মুড়কির জন্যে আমার 'কোমল অন্তরীক্ষে' ব্যথা লাগে নি; কি গেরোতেই পড়া গেল দেখো দিকিন!...বাঁড়ুজ্জের সেই খয়রাৎ?—তা বেশ করেছে। গরীব মানুষকে দিয়েছে —এ আর কি অন্যায়টা করেছে? গিরি, তুই এই জন্যে কেঁদে সারা হচ্ছিলি? আমি বলি, না-জানি কি এমন বেফাঁস বলে ফেললাম—কুটুম বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে...ভয়ে তো আমার পেটে হাতপা সেঁদিয়ে গিয়েছিল,—পিসিমা কি বলবেন, মা এসেই বা কি বলবেন?"

ভাজ বলিলেন—"আর ঠাকুরজামাইও যে ঘাড় হেঁট করে রইলেন, ভয় হল কী অপরাধ করে ফেলেছি আমরা,...নাও, জল গামছা দি, হাত পা ধুয়ে নাও।—চল্ গিরি, রাঙাদিদিমার কাছে;—এখনও খবর দেওয়া হল না পিসিমাকে।"

একটা বাধা পাইয়া আদর যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, একটুর মধ্যে গিরিবালা সবার সঙ্গে বেশ মিশিয়া গেল, আদরের উত্তাপে তাহার মনের দলগুলা একটি একটি করিয়া যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আদর বাড়িতেও আছে, বাবার ও জেঠামশায়ের তো নয়নের পুতুলি বলিলেই চলে; মা জেঠাইমার কাছে মাঝে মাঝে ধমকটা আসটা খাইতে হয়, তবু ও আতপ্ত বালির একটু নিচেই যে স্নিগ্ধ জলধারা বহিতেছে—এ সন্ধান ভালো রকমেই পাওয়া যায়। তবে এখানকার ভালোবাসাটা একটু অন্য ধরনের। ওখানে সংসার চলে অন্য কি-সবকে কেন্দ্র করিয়া, এখানে সব কিছুই যেন তাহাকে ঘিরিয়াই মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে—সবার সাধ, চিন্তা, কল্পনা।—রাঙাদিদিমার সঙ্গে একচোট জলযোগ হইল। আহারের পর খানিকটা ক্ষীর সরাইয়া রাখলেন—"এইটুকু তুলে রাখো বউমা, কাল সকালে

গিরি খাবে।—"তুমি খাও না পিসিমা, ওর জন্যে তো খাবার থাকবেই তোলা।"—"সে কি হয় বাছা? তোরা বুঝিস নে।—আয় লো গিরি, গল্প শুনবি তো আয়।—একটু হাত চালিয়ে নিস তোরা গো, কচি মেয়ে এতটা পথ এসেছে, হাক্লান্ত হয়ে আছে।"

ভাইঝি বলে—"গিরি শোবে কিন্তু আমার কাছে পিসিমা, এসেই আমার কোলে মুখ দিয়ে নাহক অতখানি কাঁদলে গা! কি পোড়াকপাল বলো দিকিন আমার! অন্য দিন যা হয় হবে, আজ আমার কাছে শুক্ বাপু, বুকটা যেন ভার হয়ে আছে—এখন তবু অন্যমনস্ক আছি, বিছানায় উঠলেই ঐ কথা মনে হবে, ঘুম হবে না। আমার কাছেই শুবি গিরি, বুঝলি?"

"হ্যাঁ, শোব। রাঙাদিদিমার কাছে গপ্পটা শুনে নি...।"

মাসী ঈষৎ হাসিয়া বলেন—"আমার কাছেও গল্প আছে, পিসিমা একচেটে করে নেন নি।"

পিসিমা লেপের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে হাসিয়া বলেন—"গিরি বল,—সে সব তো বাসি গপ্প—যখন আমার মতনটিই ছিলে, রাঙাদিদিমার কাছেই শুনেছিলে।"

গিরিকে লইয়া যেন কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে।

রাঁধিতে রাঁধিতে মামী উঠিয়া আসে।..."সাধন বেশ মাছটি ধরেছে, ঝোল ভালোবাসিস না ডালনা রে গিরি? তোর বাপের তো মুখে স্বাদ নেই, যা ধরে দোব তাতেই খুশী।"

আশ্চর্য বোধ হইতেছে গিরিবালার—এত বড় প্রশ্ন তাহাকেও জিজ্ঞাসা করে মানুষে! দিদিমার গল্পের আঠার দাসীর সেবায় লালিত রাজকন্যার চেয়ে নিজেকে যেন এতটুকুও কম বলিয়া বোধ হয় না।

মামীর নিশ্চয় প্রশ্নের চেয়ে একবার দেখিয়া যাইবার, কথা কহিবার আকাঙ্ক্ষাটাই বেশি প্রবল। বলেন—"দু'ই করব'খন, দুটো উনুনেই আঁচ দিয়েছি; তুই কিন্তু ঘুমুসনি মা গিরি, ঘুমের ঘোরে স্বাদ পাবিনি, মাঝখান থেকে আমার মনটায় একটা কষ্ট থেকে যাবে। সমস্ত রাত ছটফট করব।"

অখিলমামা রাত করিয়া ফিরিলেন। ভগিনীপতিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন, বলিলেন—"কৈ, কাল তো বললে না আজ আসবে, তা হলে কি এত রাত করি?—গিরিকে এনেছ?...তোমার সুবুদ্ধি সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম, আবার আশা হল। ঘুমিয়ে পড়েনি তো? দাঁড়াও বেটিকে ধরে নিয়ে আসি। বহুদিন দেখি নি হে!"

বাড়ির চেয়ে আরও তফাৎ এইখানে যে আদরের পাশে পাশে আবার প্রশংসার স্রোত চালিয়াছে—

"তুমি ভালো দেখতে পাচ্ছ না পিসিমা, সকালে দেখো কী চমৎকারটি হয়েছে গিরি!"

"আর, কী বাপ-অন্ত-প্রাণ মেয়ের—না মেজঠাকুরঝি?—তখন বাপ অপরুদ্ধ হয়ে গেছে দেখে ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেললে গা! সে কি থামতে চায় পিসিমা?"

পিসি বলেন—"ভালোই, বলে মেয়ের বাপের দিকে টান হলে ছেলেপুলের ওপর বাচ্ছিল্যি হয় বেশি। মেয়েমানুষের পক্ষে বাপ আর ছেলে দুই একই জিনিস কিনা—শুধু বয়সের যা তফাৎ।"

হাজার অভিজ্ঞ হইলেও এঁরা জানেন না নারীত্বের এই মূল তন্ত্রী গিরিবালার অন্তরে

BanglaBook.org

কত সুকুমার।—একটু স্পর্শেই রনরনিয়া উঠে। এত সূক্ষ্ম যে, হয়তো বাইরের বায়ুতে বীচিভঙ্গ করে না, তবে তাহার সমস্ত মনটা কান্নায় যখন ভরাট করিয়া তুলে।—লেপের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া গল্প শুনিতেছিল, কেহ টের পায় নাই, আহারের জন্য যখন তাহাকে ডাকিয়া আনা গেল, মুখটি বিষণ্ন। মামী প্রশ্ন করিল—"কি গো গিরি, মুখখানি ভার-ভার মনে হচ্ছে যেন?"

গিরির ঠোঁট দুইটি একবার কাঁপিয়া উঠিল।

মামী প্রশ্ন করিল—"বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে নাকি?"

ঠোঁট দুইটি আবার কাঁপিয়া উঠিল, গিরি সামলাইয়া লইয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল, না, মন কেমন করে নাই।

বোনঝির মাথার উপর দিয়া কাত্যায়নী ভাজকে ইশারায় আর এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে মানা করিয়া দিলেন। পিঁড়িটা পাতিয়া দিয়া বলিলেন—"বোস, দে ভাত বৌ,...বয়ে গেছে মন কেমন করতে ওর। কেন, আমরা কি পর?...মা জেঠাইয়ের তো ভারি আদরের ঘটা, তা আবার মন কেমন করতে হবে! গেছি আর কি! মেয়েকে পাঠিয়েছে, না চুল বাঁধবার ছিরি, না কাপড় পরাবার ছিরি!...ও আর যাবেই না সেখানে...এইখানেই থাকবি আমাদের কাছে, কি বলিস রে গিরি?"

গিরিবালা ঝোঁকটা সামলাইয়া লইয়াছে, বেশ কাত করিয়া ঘাড় নাড়িল,—মাসিমার এতগুলো কথার সঙ্গে যাহাতে মানায়। নাড়া পাইয়া দুই বিন্দু অশ্রু পাঁতির উপর ঝরিয়া পড়িল।

নূতন নূতন গল্প সংযোগে মাসিমা নিজের হাতে করিয়া খাওয়াইয়া দিলেন। কিন্তু যে মেঘখণ্ডটুকু জমিয়াছে তাহা যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ননদ-ভাজে কয়েকবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন —অর্থাৎ আর বুঝি রাখা যায় না। কোনমতে সামলাইয়া লইয়া মাসী বলিলেন—"চল্, তোকে আগে ঘুম পাড়িয়ে আসি গিরি। তারপর ওদের হবে'খন।...আমি এলে অখিল আর বাঁড়ুজ্জেকে খেতে দিবি বৌ; গপ্পসপ্প করব।"

লেপ ঢাকা দিয়া শুইয়া কাত্যায়নী যে জিনিসটাকে এতক্ষণ এড়াইয়া চলিতেছিলেন নিতান্ত অজান্তে একেবারে তাহারই কাছে আসিয়া পড়িলেন।—নিঃসন্তান বিধবা মানুষ অন্তরের সব দরদ ঢালিয়া বোনঝিকে নাড়া-চাড়া করিতে গিয়া মনের কোথায় কি উথলিয়া উঠিতেছিল কে জানে? লেপের মধ্যে ভালো করিয়া শুইয়া গিরিবালার চারিদিকে ভালো করিয়া লেপ টানিয়া দিতে দিতে হঠাৎ বুকে চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁলো গিরি, আমি মরে যদি তোর পেটে জন্মাই তো এমনি করে আমার আদর-যত্ন করবি তো? পিসিমার কাছ থেকে তোকে যেমন করে কেড়ে নিয়ে এলাম, এমনি করে সবার কাছে থেকে কেড়ে-কুড়ে—নিজের বুকে চেপে রাখবি? নিজের হাতে খাওয়াবি গপ্প বলতে বলতে? যখন খুব ছোট—কোলেরটি, তখন টিপ, কাজল পরিয়ে দোলনায় শুইয়ে দোল দিবি? ধুলো লাগলে ঝেড়ে দিবি? রোদে তেতে যখন ঘেমে এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ব, আঁচলে ঘাম মুছিয়ে..."

টানিয়া টানিয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ লেপটা যেন কাঁপিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই বোনঝির কান্না যেন কূল ছাপাইয়া উথলাইয়া পড়িল। কাত্যায়নী

মুখ থেকে লেপটা সরাইয়া সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—"ও কি রে, তুই কাঁদছিস গিরি। কান্না কিসের? সত্যি আমি মরে তোর মেয়ে হচ্ছি নাকি? দেখো কাণ্ড বোকা মেয়ের! আর যদি মরিই তো তোর মেয়ে হতে সে-ই যার নাম বুড়ো হয়ে মরব। কি ক্ষতি? ভালোই তো। আচ্ছা বেশ, তাও মরব না, বরাবর আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে বেঁচে থাকব; হল তো? নে, চুপ কর...দেখো জ্বালা, তবু চুপ করে না!"

কোথা দিয়া হঠাৎ কি হইল, কাত্যায়নী বোনঝিকে বুকে আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া নিজেও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

আর সান্ত্বনার কথা নাই। অসম মাতৃত্বের দুইটি ধারা নীরব অশ্রুর মধ্যে গলিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল।

একখানি হাত-ভাঙা মাটির পুতুল—ইট তাহার দোলনা—ইট তাহার শয্যা,—আর সবার পুতুল-শিশুরা জামায়-কাপড়ে জমজম করিতে থাকে—নন্তীর পুতুলের গায়ে পশমের জামা, মাথায় জরির টুপি, লোকে চাহিয়া লইয়া দেখে, প্রশংসা করে,—তাহাদের পাশে সেই অনাদৃত, লাঞ্ছিত, বিকলাঙ্গ শিশু—সবার অবহেলার দৃষ্টি বাঁচাইয়া মাকে বুকের কাছটিতে করিয়া বহিয়া বেড়াইতে হয়।...মায়ের মনে পড়িল আজ সেও অবহেলার সহিত ফেলিয়া আসিয়াছে সেটিকে; হরু কি আর যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবে? গিয়া দেখিবে হয়তো নাই—আবার গিয়া যখন শিউলি তলাটিতে খেলাঘর গুছাইবে—এই ভাঙা পুতুলটির স্থানটি হয়তো থাকিবে শূন্য...

এই দূরত্ব হিমরাত্রির এই অন্ধকার—সব যেন এই বিচ্ছেদকে সত্য করিয়া তুলিতেছে...সঙ্গে আসিয়া পড়িতেছে মা, খোকা, হরু,—সবাই, বাবা পর্যন্ত।...ভুল, অনাদর, বিদ্রূপের মধ্যে দিয়া বাবা কেমন করিয়া যেন মাটিতে-গড়ানো, ভাঙা পুতুলটির পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—ঐ রকমই অসহায়—কেন যে বাবা সব বিলাইয়া দেন এমন করিয়া!...মুখে পণ্ডিতমশাইয়ের ওখানে ছোট ছেলের মতো প্রাণখোলা হাসি, এখানে মুড়কির কথায় মাথা তুলিতে না পারা, মায়ের বকুনির ভয়ে বাড়িতে গুটি-গুটি তাহার পাশে পাশে থাকিয়া প্রবেশ—সব মিলিয়া সত্যই বাবাও যেন একটা ছোট ছেলে—পাশটিতে না থাকিলে—এখন যেমন গিরিবালা নাই—মনটা যেন হাঁপাইয়া ওঠে...

এর পাশেই আর একটি ধারা—যে মা হইতে পারিল না, উৎস যাহার নিরুদ্ধই রহিয়া গেল, হঠাৎ কিসের আবেগে তাহার সেই নিরুদ্ধ উৎসের মুখ খুলিয়া যাওয়া।—কাত্যায়নী নিজের বুকের যে অমৃত দিতে পারিলেন না, পরের বুকে সেই অমৃতের স্বাদ পাইতে চান...দেওয়ায় আর স্বাদ পাওয়ায় কি বেশি তফাৎ?...বুকের ধনের রৌদ্র-তপ্ত রাঙা মুখ মুছাইয়া দেওয়ার সঙ্গে—"গিরি তুই আঁচলে আমার মুখ মুছিয়ে দিস্"—এই যে সাধ, এর কতটুকুই বা প্রভেদ? এক দিক দিয়া বিস্তর হইলেও এক দিক দিয়া যে নিতান্তই নগণ্য—প্রভেদ নাই বলিলেই চলে। এ যে আরশিতে নিজের প্রতিবিম্ব ফেলা;—কতটুকু থাকে তফাৎ?

ঘুম পাড়াইয়া আসিলে ভাজ বলিলেন,—"ওমা, তুমিও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছিলে ঠাকুরঝি? চোখ দুটো ফুলো-ফুলো দেখছি যে?"

"হ্যাঁ, একটু চোখ বুজে এসেছিল, কাল সমস্ত রাত যাত্রা দেখেছি"...

"গলার আওয়াজটাও ভারী ভারী ঠেকছে। রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে যায়নি তো?"

সকালে বিছানা থেকে নামিয়াই গিরিবালা যেন নূতন জগতে প্রবেশ করিল। কাল সেই আসার কথা ওঠা থেকে নিদ্রাগমের পূর্ব পর্যন্ত মনটা খুব নাড়া খাইয়াছিল,—যাত্রার ঔৎসুক্য, পথের সেই বিচিত্র ঘটনার বিস্ময়, মামার বাড়ির আদর, তাহার পাশেই অশ্রু —সব মিলিয়া তাহার সত্তাটিকে যেন নূতন ভাবে একবার জাগাইয়া দিল।...প্রভাতটি বড় চমৎকার লাগিল। বাবার পূর্ণ মনের সচেতন কবিত্ব কোথায় পাইবে?—তবে নূতন লাগিল এবং মিষ্ট লাগিল। নিজেকে যেন বেশ একটু বড় বলিয়া বোধ হইল। রাত্রে সেই পুতুলের জন্য কান্নার কথা ভাবিয়া একটু যেন নিজের কাছেই লজ্জা-লজ্জা বোধ হইতে লাগিল —কতকটা যেন নিজেকে চেনার মতো। অবশ্য আবছায়া ভাবে চেনা, তবে অনুভব করা যে কাল-পরশুকার গিরিবালাটি যেন একটু ছোট—তাহার কথা ভাবিতে আজকের গিরিবালার মনে লজ্জার সঙ্গে একটি করুণার ভাব আসিয়া পড়ে।

আরও নাড়া খাইল মনটা। মাসী সকালে হাল্কা ভাবে সাজাইয়া-গুছাইয়া পাড়ায় লইয়া গেল, এ-বাড়ি, সে-বাড়ি,—কোন একটা ছুতা করিয়া—যেন বোনঝি দেখাইতে নয়, পাশে যে একটা নূতন মেয়ে আছে সেদিকে যেন চৈতন্যই নাই।

"কৈ গো খান্ত—রাঙাখুড়ি কোথায়? চানে গেছেন নাকি?"

"এত সকালে চানে গিয়ে মরব? এমনই শীতে হি-হিয়ে দিয়েছে। রাঙাখুড়ি গেলে বাঁচিস, না?—বুড়ী হয়ে গেছি তো? সঙ্গে ওটি কে?"

"দুটো পাঁপর নিয়ে এলাম, কাল বেলে-তেজপুর থেকে এসেছে, মনে করলাম সকাল সকাল দিয়ে আসিগে যাই, অভয়দার আবার অফিস, বেরিয়ে যাবে। ধর খান্ত, ভেজে দিস্।...ইটি?—ওমা, চিনতে পারলে না? বড়দির মেয়ে গো,—গিরি...যা, দিদিমাকে পেন্নাম করগে।"

"থাক্, থাক্, হয়েছে। দেখি; ওমা তাই তো!...আর মা, আমার কি চোখের দৃষ্টি আছে? দিব্যি মেয়েটি তো হয়েছে বরুর আমাদের—যেন নক্সীপিতিমেটি। বরুও ঐ রকমটি ছিল, মনে আছে কিনা; তবে মেয়ের রং যেন আরও মাজা। বেঁচে থাক্, পাকা চুলে সিঁদুর পরুক, আর কি আশীর্ব্বাদ করব?"

"মেয়ের আর এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আছেই বা কি রাঙাখুড়ি?"

"সঙ্গের উটি কে গো কাতু দিদি? যেন নতুন নতুন ঠেকছে?"

"বরুর মেয়ে। কাল বাপ নিয়ে এসেছে। এসেই বেড়াবার শখ হয়েছে মেয়ের; পাড়া-বেড়ানি কারুর বৌ হবেন বোধ হয়। দেখো না, সক্কালবেলা টেনে নিয়ে এসেছে আমায়, মাসীর যেন কত ফুরসোৎ!'

"বল্—'বেশ করেছি—মাসী হওয়া ওমনি নাকি'...নামটি কি তোমার মা?"

"গিরিবালা।"

"বেশ মিষ্টি নামটি; দুগ্গার নাম। আর আমাদের বাড়িতে এক নাম রাখার ঢো হয়েছে!—দাদার অমন চমৎকার মেয়েটির নাম হল তনিমা। ওর মাকে জিগ্যেস করি —হ্যাঁগা, তনিমা আবার কি জিনিস?—বেদে-পুরাণে কেউ কখনও শোনেনি!...কে তক্ক

BanglaBook.org

করে বলো ইশ্‌কুলে-পড়া মেয়ের সাথে? বাবাও ঐ দিকে; বলি—চুপ করে থাকাই ভালো।”

“গিরিবালা নাম রেখেই খালাস হয় তবে তো? বাপ বলে মেয়ে আমার পাব্বতী-উমা—গৌরী দান করব। ও আজকালকার সব বাপ-মাই সমান ভাই, কি যে এক নতুন হাওয়াই উঠেছে!”

“কে গো, শ্রীমতী কাত্যায়নী না? হঠাৎ আজ এ আকাশে যে! পথ ভুলে?”

“ভাবলাম—দেখে আসি ঘোষাল-ঠাকুরদাদার আকাশে কোন নতুন তারা উঠল কিনা।”

“ভালো, আড়ি পেতেও যদি এক-একবার উদয় হও তো ঠাকুরদাদার খালি আকাশটা মাঝে মাঝে আলো হয়। সঙ্গে কে ও?”

“আপনার ছোট নাতনীর মেয়ে।”

“বরুর মেয়ে? বেশ, বেশ, এস তো মা! বাঃ, দিব্যি মেয়ে, খাসা মা হবে আমার। নামটি কি?”

“গিরিবালা।”

“গিরিবালা দেবী।—তা মা আমার বোধ হয় বলবে ‘দেবী’—সে তো আমার চেহারা দেখেই বুঝবে লোকে, নিজের মুখে আর বলতে যাব কেন? তাই নাকি গো?...হাসিটিও বড় মিষ্টি মায়ের। থাকবে এখন কিছু দিন?”

“থামুন, থাকার কথা আর তুলে কাজ নেই। দেখতে ভালো-মন্দ যাই হোক, অতশত বুঝি না, তবে আদ্ধেকটি সংসার এই এক ফোঁটা মেয়ের ঘাড়ে। মা নতুন পোয়াতি, এক হাঁড়িটা শুধু জেঠাইমার হাতে, বাকি যত কন্না ঐ মেয়ের ওপর; থাকলে চলবে ওর? কি লো, থাকবি? বেশ তো এমন কোলের ছেলে পেলি!...আসি ঠাকুরদা এখন। এইদিকে একবার এসেছিলাম, মনে করলাম ঠাকুরমার খবরটা একবার নিয়ে যাই। ঠানদি কোথায়?...ভেতরে? যাই, একবার নতুন শাশুড়ীকে দেখিয়ে আনিগে, নইলে আবার মুখনাড়া খেতে হবে কোন্ দিন...”

সম্পত্তি দেখাইয়া যেন আশ মেটে না আর মাসিমার। অনেকখানি ঘোরা হইল সকাল থেকে, কিন্তু প্রতি পদেই নিজেকে নূতনভাবে অনুভব করার জন্য ঘোরটা গিরিবালার যেন গায়েই লাগিল না। যেটুকুই বা ক্লান্তি আসিয়াছিল, বাড়িতে আসিয়া তাহাও কোথাও যেন উবিয়া গেল। দিদিমা আসিয়াছেন, আর সঙ্গে আসিয়াছে অখিলমামার ছেলে বিকাশ। বিকাশ একটু বেশি চেনা, অখিলের সঙ্গে প্রায় তেজপুরের বাটীতে যায়। আদরের মধ্যে সখ্যের যে অভাব ছিল, বিকাশ সেটা পূরণ করিয়া দিল। দিদিমা থেকে ভাই পর্যন্ত সবার স্নেহ যেন একটি নিটোল আঙুরের মতো টলমল করিতে লাগিল।

বিকাশের মনোরঞ্জন করিবার পদ্ধতিটা একটু অন্য ধরনের। স্থানীয় স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়ে; নিজের বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে একটু বেশি সজাগ। বোনকে প্রশ্ন করিল—“কি পড়ছিস্‌রে তুই গিরি আজকাল?”

গিরিবালা একটু লজ্জিত ভাবে বলিল—“দ্বিতীয় ভাগ।”

“মোটে দ্বিতীয় ভাগ!” ঠোঁট দুইটা গোল করিয়া ‘উস্’ করিয়া এমন খানিকটা বিস্ময়ের হাওয়া পেটে টানিয়া লইল যে যেন গিরিবালার বয়স কুড়ি কি তিরিশ গোছের

কিছু একটা। বলিল—"চল্ আমার বই দেখবি, তুই তো অজ্ঞানই হয়ে যাবি তা হলে।"

একটা দেবদারু কাঠের টেবিলে অবিন্যস্ত একরাশ বই-খাতা। গিরিবালার বিদ্যার দৌড় ততদূর হইলে বুঝিত তাহাতে কাশীরাম দাসও আছে, অন্নদামঙ্গলও আছে, নূতন পুরাতন পঞ্জিকাও আছে। সে একটু বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। শুধু সংখ্যাতেই ভগ্নীর মনের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে একবার দেখিয়া লইয়া বিকাশ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মতো একখানা ঘাড়েগর্দানে বই তুলিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলে বল দিকিন এটাকে?"

আকারটা চেনা, গিরিবালা বলিল—"পাঁজি।"

বিকাশ বলিল,—"শুধু এক পাঁজিই চিনেছিস্ কিনা! ডিক্শনারি—বল্ দিকিন মুখে।"

গিরিবালা বলিল—"ডিশ্নারি।"

বিকাশ একটু মৃদু হাসিল, বলিল—"ডিক্শনারি—সি আর এস একসঙ্গে—ভারি তো বুঝলি তুই!—ক আর স একসঙ্গে, মাঝখানে কোন ভাউয়েল নেই—মানে স্বরবর্ণ নেই; এইবার বল দিকিন।"

গিরিবালা টীকার চোটে আরও ধাঁধা খাইয়া গেল, এবারে চেষ্টাও করিতে সাহস করিল না।

"এইখানে এসে আমার কাছে তোকে থাকতে হবে, নইলে বেলে-তেজপুরে থাকলে তুই মুখ্যু হয়ে যাবি গিরি। পিসেমশাইকে বলব।"

তাহার পর ডিক্শনারিটা তুলিয়া ধরিয়া হাতটাকে একটু ঘুরাইয়া বলিল—"পৃথিবীর মধ্যে য-ত্তো কথা-আছে তুমি এর মধ্যে পাবে। নাম করো—যে কোন কথা।"

গিরিবালা একটু ভাবিল; সকালে মাসিকে ঘোষালঠাকুরদার ডাকটি বড় মিষ্টি এবং অভিনব লাগিয়াছিল,—যেন কোন যাদুকরকে ঝুলির ভিতর হইতে অসম্ভব কোন দ্রব্য বাহির করিতে ফরমাইশ করিতেছে, এইভাবে বলিল—"আচ্ছা দেখাও—সীমতী কাত্যায়িনী।"

বিকাশ নিরাশভাবে বইটা রাখিয়া দিল, বলিল—"খালি—পাঁজি, সীমতী কাত্যায়িনী এই শিখেছিস কিনা..."

আরও সব বিষয় আছে, এল্জেব্রা, জিওমেট্রি,...অঙ্কের শিক্ষক থার্ড মাস্টার জগদীশবাবু—বাবাকে পড়াইয়াছেন, দাদাকে পড়াইয়াছেন, হেডমাস্টারকে পড়াইয়াছেন। হেডমাস্টারের কানের পিছনে এখন পর্যন্ত একটা কাটা দাগ আছে—গর্বের সহিত দেখাইয়া বলেন—"এই আশীর্বাদের জোরে আজ এখানে হেডমাস্টারের চেয়ার দখল করে আছি।" আসিয়াই প্রথমে থার্ডমাস্টারের পদধূলি লন, তাহার পর কাজ আরম্ভ করেন —অত বড় অঙ্ক জানা লোক এ তল্লাটে নাই।...এল্জেব্রা, জিওমেট্রির পর রয়েল-রীডারের ছবি সব—নেপোলিয়ান আল্পস্ অতিক্রম করিতেছেন—তুষার-ঢাকা অলঙ্ঘ্য গিরিবর্ত্ম—নেপোলিয়ান বলিলেন—"দেয়ার শ্যাল বি নো আল্পস্! আল্পস্ আমার গতিরোধ করে দাঁড়াবে?—বটে—আল্পস্কেই ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হতে হবে—তার মানে, মানুষের পরাক্রমের সামনে আল্পস্কে মাথা নত করতে হবে—তার মানে নেপোলিয়ান নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

আল্পস্ পাহাড় ডিঙোবেন—বরফে ঢাকা আল্পস্ পাহাড় এ পর্যন্ত যা কেউ পেরুতে পারেনি।”

বিকাশ উপযুক্ত শ্রোত্রী পাইয়া নিজের ইস্কুলের ধার-করা লেকচার শুনাইয়া যাইতেছে। গিরিবালা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চাহিয়া আছে। কে জগদীশমাস্টার জানে না, কে নেপোলিয়ান, কোথায়ই বা বরফে ঢাকা আল্পস্ পাহাড়? —যে পাহাড় ডিঙাইল সে বড়, না যে হেডমাস্টারের কানের পিছনে চিরদিনের জন্য বেতের দাগ রাখিয়া দিতে পারে সেই বড়, কিছুই নির্ণয় করিতে পারে না, শুধু একদল বিচিত্র-কর্মাদের আশ্চর্য জগতের সামনে মুগ্ধ নেত্রে দাঁড়াইয়া থাকে।

তাহার পর বাংলা রীডারের ছবি সব—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর!—ছবি মাত্র—তবু চোখ দেখিলে চোখ ফিরাইতে পারা যায় না যেন, এমনিই দীর্ঘায়ত আর ভাস্বর!...বিদ্যাসাগর।...বিকাশ বলে—“মাথায় চুল অমন করে কাটা বলে একটা হেঁজিপেঁজি মানুষ মনে করিসনি গিরি—মস্ত বড় লোক। আর জানিস? মা যদি বললে —‘ঈশ্বর’—নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—মা যদি একবার বললে—‘ঈশ্বর তোকে অমুক কাজটা করতে হবে’ ব্যস—আর নড়চড় হবার যো নেই, তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরই আসুন না কেন! খুব বড় চাকরি করতেন, বাড়িতে একটা বিয়ে ছিল, মা আসতে বলে দিয়েছিলেন। ছুটি চাইতে সাহেব বললে, ‘না পণ্ডিত, এখন ছুটি অসম্ভব।’ বাইরে গিয়ে একটু ভাবলেন, তক্ষুনি ফিরে এসে বললেন—‘তাহলে রইল সাহেব তোমার চাকরি, মা ডেকেছেন আমাকে যেতেই হবে।’...চটি-পড়া বামুনের তেজ দেখে সাহেব ছুটি দিতে পথ পায় না। বাড়ি আসতে রাস্তায় দামোদর—এই যে দামোদর তুই পেরিয়ে এলি—একূল-ওকূল দেখা যায় না—তার ওপর বর্ষাকাল, ভেবেই দেখ্ নিজের মনে! বিদ্যাসাগর যখন ধারে এসে পৌঁছুলেন তখন রাত্তির হয়ে গেছে...”

বিকাশ বর্ণনাটাকে আরও জোরাল করিবার জন্য নিজের কল্পনাশক্তির সাহায্য লইল, বলিল—“রাত্তির বারোটা হয়ে গেছে! অন্ধকার ঘুটঘুট করছে, আকাশে সে কী ভীষণ দুর্যোগ! মাঝি বললে—‘না ঠাকুর, যতই কেন বেশি দাও খেয়ার কড়ি, এমন রেতে নৌকো খুলব না ; প্রাণ আগে তবে তো কড়ি!’ ...কিন্তু, এদিকে যে মায়ের ডাক, বিদ্যাসাগরের নিজের প্রাণ তো তার আগে নয়?...যখন কোন মতেই মাঝিকে রাজী করা গেল না, তখন কি করলেন বল দিকিন গিরি?”

মহিমময় কাহিনীটি বলিতে বলিতে বিকাশের কিশোর বদনে একটা জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল, উত্তরের জন্য একটি শান্ত স্মিত হাস্যের সহিত ভগ্নীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। গিরিবালার বোধ হয় এই অবাধ্যতার অন্যায়টুকুর দিকেই মনটা আকৃষ্ট ছিল বেশি, বলিল —“মেরে ফেললেন?”

বিকাশ উত্তরটা শুনিয়া মুহূর্তমাত্র চোখ তুলিয়া যেন একটা কি ভাবিল, বোধ হয় মনে করিল ভগ্নী খুব বেশি ভুল বলে নাই—মারিয়া ফেলিলেও বিশেষ অন্যায় হইত না। মুখে বলিল—“দুৎ, তুই আমি হলে বোধ হয় ফেলতাম মেরে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের যে দয়াও ছিল তেমনি ভয়ঙ্কর। বিদ্যাসাগর বললেন—‘দেয়ার শ্যাল বি নো দামোদর’!”

প্রভাবটা কি রকম হইতেছে দেখিবার জন্য ভগ্নীর বিমুগ্ধ দৃষ্টির উপর চক্ষু রাখিয়া

BanglaBook.org

একটু দাঁড়াইয়া রহিল। গিরিবালা প্রশ্ন করিল—"সেই পাহাড় ডিঙোনোর লোকটা যা বলেছিল?"

বিকাশের দৃষ্টি প্রশংসায় আয়ত হইয়া উঠিল, বলিল—"তুই শুনছিস মন দিয়ে তাহলে, আছে মনে। হ্যাঁ, বিদ্যাসাগর অবশ্য ওকথা চেঁচিয়ে বলেননি, মনে মনেই বলছিলেন।—আমাদের হেডমাস্টার মহাশয় আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন—গ্রেট্ মেন থিঙ্ক্ এলাইক...মানে কি বল দিকিন?"

ভাবের ঘোরে অসম্ভব প্রশ্নটা করিয়া তখনই বলিল—"মানে—সব বড় লোকদের চিন্তার ধারা একই রকম। এই না মনে করে ঝপ্পাং করে সেই রাক্ষুসীর মতো দামোদর নদীতে দিলেন ঝাঁপ!"

গিরিবালা হঠাৎ যেন ভয়ে সিঁটকাইয়া উঠিল, বলিল,—"আহা গো!"

বিকাশের মুখটি শান্ত হইয়া আসিল, ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"তুই ভাবলি বুঝি মরে গেলেন?...মায়ের আশীর্বাদ, মারে কার সাদ্যি রে? বিয়ের আগেই মায়ের কাছে গিয়ে হাজির।"

বিকাশ এখানে আর একবার থামল, তাহার ব্যাখ্যানটার এমন অপ্রত্যাশিত প্রভাব হইতেছে দেখিয়া বোধ হয় একটু লোভ বাড়িল। বলিল—"তারপর মায়ে-ছেলেয় গলা জড়াজড়ি করে সে কী কান্না!"

যে রেটরিক অর্থাৎ অলঙ্কারের জোরে সে এতটা ফল পাইল, তাহাতেই যে কী গুরুতর ভ্রম করিয়া বসিল, বিকাশের তাহা বুঝিবার যেমন বিদ্যা ছিল না, তেমনি অবসরও ছিল না। ঝোঁকের মাথায় বলিয়াই চলিল, "গলা জড়াজড়ি করে সে কী কান্না!—সে কী কান্না!! কার সাদ্যি থামায় দু'জনকে...ও কি রে গিরি, তুইও যে কেঁদে ফেললি! দেখো মেয়ের কাণ্ড। চুপ কর্!"

ভগ্নীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া প্রবোধ দিতে লাগিল—"চুপ কর গিরি...দেখো তো!—ওরে কাঁদেনি, এটুকু আমি বাড়িয়ে বলেছি,—অমন তেজী ছেলে কখনও কাঁদে? চুপ কর গিরি, লক্ষ্মীটি ; কী ফ্যাসাদে যে ফেললি! পিসিমা ভাববে তোকে বুঝি মেরেছি আমি..."

অনেকক্ষণ পরে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া গিরিবালা থামিলে বলিল—"মেয়েছেলে, এক জাতই তোরা আলাদা, ছোটই হোস্ আর বড়ই হোস্ ; কার ছেলে কবে কষ্ট করে মায়ের কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধরেছিল তা কানে শুনেও তোর কান্না!"

বিকাশের আরও বলিবার ছিল—একটা ভাবের বান ডাকিয়া গেছে মনে ; ভগ্নীর অদ্ভুত আচরণে একটু বাধা পাইয়া খানিকটা চুপ করিয়া এ-বই সে-বই একটু নাড়াচাড়া করিল। তাহার পর সূত্রটা আবার তুলিবার আগে একটু উপক্রমণিকা হিসাবে বলিল —"যা ছিঁচকাঁদুনে তুই, তোকে বলতেই ইচ্ছে করে না ; আবার কাঁদবি তো?"

গিরিবালা মাথা নাড়িয়া জানাইল—না, কাঁদবে না।

বিকাশ আবেগটা সঞ্চিত করিয়া লইবার জন্য আরও একটু থামিল, তাহার পর বলিল —"নেপোলিয়ানও ঠিক ঐ রকম ছিলেন, মা যদি কোন কথা বললেন তো ঠিক বিদ্যাসাগরের মতন—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এলেও টলাতে পারবে না—অবশ্য ওঁরা খ্রীশ্চান, ওঁদের ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর নেই, শুধু যীশু আছে,—কিন্তু প্রতিজ্ঞা টলাতে পারবে না।

BanglaBook.org

তুমি যীশু আছ তো নিজের ঘরে থাকো, মায়ের কথার সামনে তোমার হুকুম চলবে না। আরও যত সব বড় বড় লোক হয়ে গেছেন, সব মায়ের ভক্ত,—ওয়াশিংটন বল্, আলেকজান্ডার বল্, আমাদের পঞ্চপাণ্ডব বল্, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বল,—কত নাম করব? ...তোকে একটা কথা বলছি গিরি, বলিসনি কাউকে।”

গিরিবালা কুতূহলী হইয়া মুখের পানে চাহিতে বলিল—“আমিও মাকে খু-ব ভক্তি করতে আরম্ভ করেছি গিরি ; মিলিয়ে দেখবি সব কাজ ছেড়ে আগে মায়ের হুকুম তামিল করি। এবারে ক্লাসে ফাস্ট হলাম কি করে? মিলিয়ে দেখিস—এক সময় খুব বড় হব ; মা মস্ত বড় জিনিস রে।”

গিরিবালার মনটা আবার উথলিয়া উঠিল, প্রতিজ্ঞার কথাটা স্মরণ করিয়া নিজেকে সংবৃত করিয়া লইল, তবু একটু ধরা গলায়ই বলিল—“আমি গিয়ে এবার থেকে সব কথা শুনব মায়ের, বিকাশ দাদা।”

বিকাশ আবার একটু কি ভাবিল, তাহার পর বলিল—“তোর অতটা না করলেও চলে, মেয়ে কিনা—তুই বরং বাপের দিকটা দেখিস—পিসেমশাইয়ের দিকটা আর কি।”

আর একটু থামিয়া কতকটা উপদেশ হিসাবে কতকটা উচ্ছ্বাসের বশে বলিল—“তোকে বরং ভাল মা হতে হবে গিরি—যে দেশে যত ভাল মা, সে দেশে তত উন্নতি। ঐ যে সব দেখছিস নেপোলিয়ন, বিদ্যাসাগর, মৌর্য-চন্দ্রগুপ্ত—ওঁরা কি অমনি অত বড় হয়েছেন?—ওঁদের মায়েরাও তেমনি ছিলেন। তুই এখন থেকেই ভগবানের কাছে রোজ প্রার্থনা করবি...‘হে ঠাকুর আমি যেন বড় হয়ে ভাল মা হতে পারি—আমি যেন বড় হয়ে ভাল মা হতে পারি।’...পুজো করিস রোজ তো?”

গিরিবালার মুখে এমন যোগাযোগে আর সত্যটা বাহির হইল না, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হ্যাঁ, করে।

বিকাশ বলিল—“পুজোর সময় বলবি শিবঠাকুরকে ; তা ভিন্ন তোকে আমি একটা সুন্দর প্রার্থনাও শিখিয়ে দেব, আমাদের বাংলার পণ্ডিত মশাইয়ের রচনা, রোজ ঘুম ভাঙলেই আগে বলে তবে বিছানা ছাড়বি—

রাত্রি হোল অপগত
    নব সূর্যোদয়ে,
খুলিনু নয়ন প্রভু,
    তবাশিস্ লয়ে ;
আমি না প্রার্থনা করি
    বিত্ত অগণন,
পুণ্য কর চিত্ত মোর
    এই নিবেদন ;
জ্ঞান দাও, শক্তি দাও
    দাও ভক্তি চিতে...

আরও আছে, আমি দু-এক জায়গায় বদলে ছেলের কথাটা বসিয়ে দোব'খন। পদ্যও লিখছি কিনা একটু একটু আজকাল...”

BanglaBook.org

গিরিবালা এবার বেশ কয়েক দিন রহিয়া গেল মামারবাড়ি—একেবারে পূর্ণিমা পর্যন্ত। রসিকলাল ইতিমধ্যে দুই-তিনবার বাড়ি শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-আসা করিলেন। টানা এতদিন শ্বশুরবাড়ি পড়িয়া থাকা যায় না, তাহা ভিন্ন হাতের কেসগুলা আছে। বেলে-তেজপুরে আর একটা নূতন আকর্ষণ হইয়াছে, পণ্ডিতমশাই। অলস রসালোচনা আর যত রকম অসম্ভব কল্পনার সঙ্গী পাইয়া রসিকলালের মধ্যেকার কর্মপলাতক কবিটি আবার মাথা ঝাড়িয়া উঠিতেছে। বেলে-তেজপুরে গেলে এখন ওঁর ওখানেই কাটে বেশিটা সময়।

এই গতায়াতের মধ্যে একবার ভাই-পো সাতকড়িকে রাখিয়া যান সিমুরে, তাহার পায়ের ঘাগুলা সারিলে। বিকাশ দুইটি শিষ্য বা ছাত্রছাত্রী পাইয়া পুরাদস্তুর শিক্ষকতা আরম্ভ করিয়া দিল বাড়িতে এবং বাহিরেও।—স্কুল থেকে প্রত্যহ বড় বড় যাহা কিছু শিখিয়া আসে—আজকাল ঝোঁক করিয়া শেখেও অনেক—সমস্ত দুইটি শিশুর সামনে উজাড় করিয়া দিয়া তাহাদের বিস্ময়ের পরিধি বাড়াইয়া তোলে। সাতকড়ি ছেলেটি বড় ভালোমানুষ আর দিদির নিতান্ত অনুগত। শুনিবার সময় মাঝে মাঝে দিদির দিকে চাহিয়া দেখে। দিদি যেমন মুখের ভাবটি করে, সেও করিবার চেষ্টা করে, দিদি "আহা" বলিলে "আহা" বলে, "ওরে ব্বাবা!" বলিলে হয়তো আর একটি শব্দ বাড়াইয়া বলে —"ওরে ব্বাবা! উস!"

বাহিরেও শিক্ষকতা হয়, ছোট গ্রামটির যত রকম দ্রষ্টব্য যা কিছু সেগুলির সঙ্গে বিকাশ ভাই আর বোনটির পরিচয় করাইয়া বেড়ায় বিকালে স্কুল থেকে আসিয়া। একটা মজা ডোবার, কি একটা পোড়ো বাড়ির, কি একটা ঢিবির মধ্যে অবশ্য দ্রষ্টব্য কিছু থাকে না, তবে বিকাশের কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্ক করিয়া তোলে সেগুলিকে দ্রষ্টব্য—তাহাদের সঙ্গে রোমান্স্ বা রহস্যের যোগাযোগ ঘটাইয়া।—"ঐ যে ঢিবিটা দেখছিস্ সাতকড়ি, ওর মধ্যে কিছু নয় তো লাখখানেক সোনার মোহর পোঁতা আছে—পেতলের ঘড়ায় করে।"

সাতকড়ি দিদির দিকে চায়; দিদি বিকাশকে প্রশ্ন করে—"সত্যি! কেউ নেয় না কেন বিকাশ দাদা?"

সাতকড়ি বলে—"সত্যি! কেউ যে নেয় না?" বিকাশের তৎক্ষণে উত্তর আরম্ভ হইয়া যায়। বলে—"চেষ্টা কর না তোরাই গিয়ে, এখন তো রাত্তিরও হয়নি।...সব ঘড়ার ঠিক মাঝখানটিতে এক যক্ষী বসে আছে।...চেষ্টা কেউ কেউ যে না করেছে এমন নয়; লোভ বড় পাপ কি না, কিন্তু..."

এফেক্টের জ্ঞান ভালো, আর বলে না।

এ-ভিন্ন স্কুল আছে, চৌধুরীদের বাড়ি আছে, পঞ্চাননতলা আছে, কতদিনের কত ইতিহাস বিজড়িত। এমন কি একদিন জগদীশ-মাস্টারকে পর্যন্ত দেখাইয়া দিল—সব বিস্ময়ের সেরা বিস্ময়!—হেডমাস্টারের কানের পিছনে যে একটি চিরন্তন দাগ রাখিয়া দিয়াছে সেও কিনা খালি গায়ে হুঁকা হাতে নিজের বাড়ির বারান্দাটিতে সাধারণ মানুষের মতো ঘুরিয়া বেড়ায়! এর পরে আরও কী না দেখিতে হইবে!

রাত্রিগুলো কাটে মেজমাসিমা, মামী আর দিদিমাদের কাছে। মাসিমার কাছেই বেশি, কেননা তিনি যেন বেশি করিয়া খোঁজেন, আর ঠিক ভাবে বলিতে গেলে অন্য সবার

BanglaBook.org

কাছ থেকে কাড়িয়া কাড়িয়া বেড়ান। মামীমার হাতটা একটু আজাড় থাকিলে মামীমা রান্নাঘরে ডাকিয়া লন, পাইলে দুজনকেই নয় তো শুধু গিরিবালাকে। অনেক রকম গল্প হয়—বেলে-তেজপুরের, এখানে আজ নূতন কি সব দেখিল, বিকাশ কি কি সব বলিল—সেই সব। মামী তরকারি নড়িতে নাড়িতে খন্তিটা তুলিয়া নিজের হাঁটুর উপর চিবুকটা রাখিয়া ঈষৎ হাসি মুখে শুনিতে থাকেন—কী মধু পান তিনিই জানেন—এক একবার একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। একদিন গিরিকে একলা পাইয়া এমনি করিয়া গল্প শুনিতে শুনিতে হঠাৎ বলিয়া বসিলেন—"বিকাশের যদ্দিন না একটি বোন হবে তুই যেতে পাবি না গিরি! থাকবি তো মামীর কাছে?"

একটু পরে উঠিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন—"যাস্‌নি গিরি যেন, এলাম বলে আমি।"

ফিরিয়া আসিয়া গিরির হাতে একটা ডবল পয়সা দিয়া বলিলেন,—"কাল রাসের মেলায় কিছু কিনে খাবি গিরি।"

একটু পরেই বলিলেন—"হ্যাঁ, ভাল কথা, তোকে যা বললাম কাউকে যেন বলিসনি, ভাববে মামী আটকে রাখতে চায়।"

আর একটু পরে একটি দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলিলেন—"মায়ের জিনিস মায়ের কাছে যাবি, আমি আটকতে গেলাম কেন, কি বল্‌রে?"

কয়েক দিন যাত্রা দেখাও হইয়াছে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া যায়। যায় প্রায় সকলেই, অখিল এবং দিদিমাদের মধ্যে কেহ একজন বাড়িতে থাকেন। পূর্ণিমার দিন হইল অভিমন্যু বধ। শেষ দিন, আসরটা সাজানো হইয়াছে খুব ঘটা করিয়া, লোকও হইয়াছে খুব বেশি। অভিমন্যু বধের পালাটাও গোপাল উড়ের নামজাদা পালার মধ্যে। কয়েক দিন থেকে নাগাড়ে যাত্রা হইয়া চলিয়াছে, এদিকে শ্রোতাদের অবসাদের জন্য আসরটা খালি-খালি হইয়া আসিতেছিল, সাজানোর মধ্যেও একটা গতানুগতিক ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, আজ যেন আবার গমগম করিয়া উঠিয়াছে। পূর্ণিমার এই শেষ রাত্রিটিকে বিশিষ্ট করিবার জন্য বরাবরই দু-একটা জিনিস আলাদা করিয়া রাখা হয়—এই রাত্রেই বাহির করা হয়। আজ মাঝখানটিতে একটি বেশ বড় টকটকে রাঙা বেলোয়ারি ঝাড় দেওয়া হইয়াছে, চারি কোণে চারিটা ভাল ভাল কাচের হাঁড়িলালটেম টাঙান হইয়াছে, চারি কোণের চারিটা থামেও সবুজ রঙের ব্র্যাকেটঝাড় বসানো হইয়াছে। যে মোমবাতিগুলি ছোট হইয়া গিয়াছিল সেগুলি বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে; কাগজের শিকল, কাগজের পতাকা যেখানে যেখানে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল পূরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। মোটের উপর, নিবিবার পূর্বে আসরটা যেন পূর্ণতর ঔজ্জ্বল্যে একবার দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

এদিকে রাসের মঞ্চেও এই ব্যাপার—আলোয়, সজ্জায় যেন ঝলমল করিতেছে। সাতকড়ির তো কথাই নাই, গিরিবালা, যে কতকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এ-ধরনের জাঁকজমকে, সে পর্যন্ত আজ যেন নূতন করিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। মনটা কি-একরকম পূর্ণতায় যেন কানায় কানায় ঠেলিয়া উঠিতেছে।

তাহার উপর আজ যাত্রাও হইতেছে সেই রকম। অভিমন্যু যে সাজিয়াছে সে দলের একেবারে নামকরা ছেলে, মাৎ করিয়া দিতেছে। গিরিবালা অবশ্য অত বুঝিতেছে না,

BanglaBook.org

তবে প্রায় মেয়ের মতোই সুকুমার ছেলেটির উপর ইহার বড় মায়া বসিয়া গিয়াছে। এই মায়াটুকু তাহার বুকে সংক্রামিত হইয়াছে সুভদ্রার পার্ট হইতে। অমন সদাব্যাকুল, পুত্রগত-প্রাণ মা আর হয় না,—অভিমন্যু না হইলে তাহার যেন কিছুতে স্বস্তি নাই। আজ যেন আরও অধীর,—থাকিয়া থাকিয়া স্বীয় সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, "সখি, আজ আমার ডান চোখ নাচে কেন? আমার অভিমন্যু কোথায়? সখীরে, আজ যেন আমার মনে কি হচ্ছে, কেন এমন হচ্ছে বল্ না আমায়, গোপন করিস না...আমার নয়নের মণি অভিমন্যু এখনও আসে না কেন?"

এমন সময় ধনুর্বাণ, বর্ম, আর সাজগোজ হাতে করিয়া একটা গান গাহিতে গাহিতে অভিমন্যু প্রবেশ করিল—

ওমা ও জননী, পূর্ণচন্দ্রাননী,
এই যে অভি তোমার, নাও মা তুলে কোলে,
নাশি অরিকুলে, তোমার আশিস্ বলে,
'মা, মা', বলে আবার আসব চলে।

গিরিবালা একবার হঠাৎ কাত্যায়নীকে প্রশ্ন করিল—"কেন মেজমাসিমা, ডান চোখ নাচলে কি হয়?"

কাত্যায়নী গিরিবালাকে বুকে একটু চাপিয়া বলিলেন,—"অমঙ্গল। অভিমন্যু বাঁচবে না কিনা, তাই ডান চোখ নাচছে মায়ের।"

শুনিয়া অবধি মনটা বিষণ্ন হইয়া আছে। চারিদিকের জাঁকজমক যেন একটু বিস্বাদ ঠেকিতেছে ; অথচ বিপদটার জন্য একটা শিশুসুলভ ঔৎসুক্যও লাগিয়া আছে।...সুভদ্রা প্রথমে গানের মধ্য দিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া পরে আবার যথার্থ ক্ষত্রিয়ললনার মতোই পুত্রকে যথাবিধি সাজাইয়া দিল, তাহার পর কারুণ্য, আশীর্বাদ ও বীরত্বের সমাবেশে খানিকটা বক্তৃতা করিয়া পুত্রকে বিদায় দিল। আসর ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জুড়ি উঠিয়া তান ধরিল—

ওযে পণ করেছে মনে
যাবে রণাঙ্গনে,
কেমনে রুধিবি
ক্ষত্রিয় ললনে?
ওরে কোল থেকে নামায়ে,
বাঁধ মা আপন হিয়ে,
ওর সব বাঁধন ঘুচিয়ে
নিয়তি যে টানে।

অর্থ বিশেষ না বুঝিলেও গিরিবালার মনটা সুরের কাতরানিতে যেন টন-টন করিতে লাগিল। কিন্তু পরে অভিমন্যু যেভাবে সগর্ব হুঙ্কারের সহিত শত্রুসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল, গিরিবালার অনেকটা আশা হইল যে ব্যাপারটা সামলাইয়া যাইবে। একবার বলিল—"সবাইকে বেশ মেরে ফেলছে না মেজমাসিমা?"

মাসিমা বলিলেন—"ফেলবে না মেরে? কত বড় বীর ছেলে!...চুপ করে দেখ্ না।"

BanglaBook.org

একে একে সপ্তরথী আসিতে লাগিল, একক সকলেই পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। গিরিবালার মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। মনের আনন্দটা চাপিতে না পারিয়া সাতকড়িকে বলিল—"দেখছিস সাতু কি বীর, উস্!"

সাতকড়ি ঢুলিতেছিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন চক্ষু দুইটিতে চাড়া দিয়া বলিল—"হুঁ, উরে ব্বাস্ রে!"

তাহার পর একজোটে সপ্তরথীতে বালক অভিমন্যুকে ঘিরিয়া ফেলিল। আরও ঘোরতর যুদ্ধ, সপ্তরথীদের সকলেই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। তাহার পর অস্ত্রাঘাতে অস্ত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া অভিমন্যু ধরাশায়ী হইল।

গিরিবালার মুখে আসা-নিরাশার একটা আলো-ছায়া খেলিতেছিল এতক্ষণ, সব দীপ্তি যেন নিবিয়া গেল। একবার মাসিমাকে প্রশ্ন করিল—"ও-ই মরে গেল, না?"

"মরবে না?—একটা শিশুকে সাতজন মিলে চারিদিক থেকে ঘিরে মারলে!"

তিনি চোখে আঁচলের খুঁট দিতেছেন দেখিয়া আর অন্য প্রশ্ন করিল না।

তাহার পর আসিল কাঁদার পালা—সুভদ্রা যখন আসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কান্নার সঙ্গে গান ধরিল—

"বাপরে অভিমন্যু, রিদয় করিয়া শূন্য
কোন্ পুণ্যধামে গেলিরে তুই চলে?
যদি, নিতান্তই কৃতান্ত করবে সর্বস্বান্ত,
কেন আশা দিলি পুনঃ আসিব বলে?"

গভীর করুণাত্মক পালাটির আলোচনা করিতে করিতে বর্ষীয়সীরা গৃহে ফিরিল। গিরিবালার মনটাও খুব আলোড়িত, সমস্ত রাস্তাটায় আর বিশেষ কিছু কথা কহিল না। বিশেষ বুঝিতেছে না, তবে এই অস্পষ্ট শোক যেন একটা অবলম্বন চায়। আসিয়া লেপে প্রবেশ করিল, মাসিমা তখনও আসেন নাই, মুখ হাত পা ধুইতে গেছেন—গিরিবালা সাতুকে বলিল—"বড় কষ্ট, নয় রে সাতু?—সবাই মিলে মারলে বেচারীকে। আহা!"

সাতকড়ি বলিল—"হুঁ।"

একটু পরে গিরিবালা বলিল—"হ্যাঁরে সাতু, আমার একটা পুতুল রেখে এসেছিলাম হরুর কাছে,—কিছু বলেনি তোকে?"

সাতকড়ি বলিল—"না তো।"

মাসিমা আসিয়া পড়ায় গিরিবালা আর কিছু বলিল না।

তাহার পরদিন সকালে রসিকলাল আসিলেন এবং বৈকালে ইহাদের লইয়া চলিয়া গেলেন।

ননদভাজে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া ভাইবোনকে সাজাইয়া দিলেন—দুধের সর দিয়া হাত মুখ মাজিয়া নির্মল করিয়া। মামার বাড়িতে পাওয়া নূতন কাপড়চোপড় পরিয়াছে, তাহার উপর বাড়িমুখো—গিরিবালা ও সাতকড়ি দুইজনেই প্রফুল্ল। তবুও কিন্তু সেই প্রফুল্লতার মধ্যে কয়েকটি বিষন্নতার রেখা প্রস্ফুট, বিশেষ করিয়া গিরিবালার। মাসিমা আর মামীমা ঘন ঘন চোখ মুছিতেছেন—গিরিবালা সাহস করিয়া তাহাদের মুখের পানে চাহিতে পারিতেছে না।

BanglaBook.org

সবাই দাওয়ায় একত্র হইয়াছেন। গিরিবালার হাতে একটি পুঁটুলি—এতদিনে যাহা কিছু সঞ্চিত হইয়াছে সব জড়ো করা তাহার মধ্যে। মামীমার কাছ থেকে পাওয়া একটি পমেটমের পাত্র—অল্প একটু পমেটমসুদ্ধ, একটি গোলাপি রং-এর নূতন সাবান, একটা এসেন্সের খালি শিশি, খানিকটা মাথার ফিতা ; মাসিমার কাছ থেকে একটি কালোপাথরের নাড়ু-গোপাল, একটা রাধাকৃষ্ণ নামের পিতলের ছাপ ; বিকাশের কাছে একটা পেন্সিল, একটা হাড়ের কলম। এছাড়া কিছু কাচের পুতুল এবং সাতকড়ির কয়েকটা মার্বেলগুলি এবং একটা ব্যাটবল উহারই মধ্যে আছে। বিকাশ নিজের একখানি ছবিওয়ালা প্রাইজের বইও বোনকে উপহার দিয়েছে, সেটি রহিয়াছে গিরিবালার হাতে।

শাশুড়ী আসিয়া ঘোমটা টানিয়া দরজার কাছটিতে দাঁড়াইলেন, অস্পষ্ট স্বরে জামাইকে উদ্দেশ করিয়া অখিলকে কহিলেন—"ওঁকে বল্ অখিল, নিয়ে আসতে মাঝে মাঝে—কোন্ এমন নশোপঞ্চাশ কোশ দূর?...মেয়েটা বড় হয়েছে, এখন দেখতে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়। আর কতদিনই বা দেখব? ও-ই বা আর কতদিন বাপের বাড়িতে আছে?"

কাত্যায়নী চোখ মুছিয়া হাসিয়া আরম্ভ করিলেন—"ওমা, তোমাদের আবদারও তো কম নয়! বাঁড়ুজ্জের পায় ভারী এখন, সম্পত্তির মালিক হয়েছে—নিজের সম্পত্তি দেখাতে কি কেউ চট করে..."

শেষ করিতে না পারিয়া মুখে আঁচল গুঁজিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। ভাজও আর নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া, হঠাৎ অগ্রসর হইয়া গিরিবালাকে বুকে চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন ; চাপা ভাঙা ভাঙা গলায় বলিলেন—"জোর করে আসিব গিরি—আমরাও এমন কিছু পর নয়..."

গিরিবালা তাঁর বহু বিস্তৃত জীবনে ভালোমন্দ অনেক কিছুই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু ছেলেবেলার ঐ কটা দিনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ যেন আর সবের চেয়ে বেশি করিয়া করিতেন—এই এবারের মামার বাড়ি যাওয়ার ব্যাপারটা। মামার বাড়িও যে এই প্রথম যাওয়া এমন নয়, পূর্বেও গেছেন অনেকবার, পরেও গেছেন, কিন্তু এইবারের উল্লেখ যত করিতেন, আর যত দরদ দিয়া, অন্য কোনও বারেই ততটা বা তেমনভাবে করিতেন না। শৈলেনের বড় কৌতুক বোধ হইত, তাহার পর ভাবিয়া একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

এই কয়টা দিনের খুব তাড়াতাড়ি ঘটিয়া যাওয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া গিরিবালা এক নবতর জগতের সন্ধান পান, উত্তরকালে তাঁহার জীবন যখন ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করে—আত্মীয়-পরিজন, মান, ঐশ্বর্য সবদিক দিয়াই, তখন যাত্রা আর প্রবাসের অভিজ্ঞতা লইয়া সিমুরের ঐ কটা দিন মনে পড়িয়া যাইত। পৃথিবী যে বেলে-তেজপুরের চেয়ে বড়, এবং তিনিও যে শ্রী আর স্বভাবে সে-পৃথিবীর কিছু পাইবার অধিকারী, শতমুখের আশীর্বাদ আর প্রশংসার মধ্য দিয়া এ-চেতনার উন্মেষ হইয়াছিল সিমুরের ঐ দিনগুলিতে। সেখানে যাহাদের মনের উত্তাপে প্রথম আশা ফুটিয়াছিল, প্রথম আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল—আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিণতির দিনে সে জায়গার আর সে-সব মানুষের কথা যে না মনে পড়িয়াই পারে না।

BanglaBook.org

সেই সঙ্গে বোধ হয় একটু নিরহঙ্কার অনুকম্পাও ছিল মিশানো।

যখন পড়ার বই-এ বাড়ি ঠাসা, পুত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ সম্মান অর্জন করিয়াছে, নাতি-নাতনীরা স্কুলের বই-এর ভারে বিপর্যস্ত,—তিনি নিজে এক বৃহৎ নগরীতে অধিষ্ঠিতা,—যেখানে এক গ্রাম্য জমিদারের আড়ম্বর নিতান্তই নিষ্প্রভ ;—এমন দিনের স্মিত মুহূর্তগুলিতে সিমুরের কথা মনে পড়িবে বৈকি, একটু বেশি করিয়াই মনে পড়িবে। বিকাশ দাদার কৈশোর-সুলভ দম্ভ একটি হাস্যমণ্ডিত প্রীতির স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠিবে বৈকি।

দ্বিতীয় পর্যায়

॥ ১ ॥

নন্তীদের বাড়ির একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। নন্তীদের পূর্ব-পুরুষেরা বাহিরের কোথা থেকে উঠিয়া আসিয়া এই গ্রামে বসতি করে। অবস্থা ভালো ছিল না, গ্রামের এক প্রান্তে সস্তা দেখিয়া একটু জমি লইয়া দুইখানি চালা তোলেন। বেশ কিছুদিন যায়, গিরিবালাদের সে-সময়ের পরিবারের সঙ্গে কি করিয়া সৌহার্দ্য হয় এবং তাঁহাদেরই চেষ্টায় গিরিবালাদের বাড়ির নিকটে, সদর রাস্তাটাকুর ব্যবধান দিয়া একফালি জমি লইয়া ইঁহারা গ্রামের মধ্যে বসবাস আরম্ভ করেন। বহুদিনের কথা সে, একেবারে গোড়ার ইতিহাস। তাহার পর কয়েক পুরুষ কাটিয়া গিয়াছে। এ-ক্ষেত্রে যেমন হইয়া থাকে,—কোন পুরুষে থাকে সদ্ভাব, কোন পুরুষে থাকে অসদ্ভাব, কোন পুরুষে হয়তো ঔদাসীন্য ;—তবে বর্তমানের, অর্থাৎ এই পুরুষের সম্বন্ধটাকে একটা নাম দিয়া ব্যক্ত করা শক্ত। হয়তো চলেও একটা সংজ্ঞা দেওয়া, কিন্তু সেটা যখন আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িবে তখন আর মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। বরং গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে গিরিবালাদের ফিরিবার পরদিনের কথাবার্তা হইতে উদ্ধৃত করিয়া আরম্ভ করা যাইতে পারে—

পরের দিন সকালবেলায়ই নন্তীর পিসিমা দামিনী পুকুরের ওদিককার ঘাট হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—"কি গো গিরি, মামার বাড়ি থেকে কি সব নিয়ে এলি গো মোট বেঁধে?"

গিরিবালা হাসিয়া বলিল—"অনেক জিনিস পিসিমা, এসো না, দেখবে।"

"মুয়ে আগুন আমার! যাব বললেই যদি যেতে পারতাম তবে তো আগে পারে যাবারই ব্যবস্থা করতাম। নেপটে পড়ে আছি। তা যাব'খন দুপুরে, সব যেন খেয়ে ফেলিসনি, পিসির জন্যেও রাখিস দুটি। জেঠাই কি করছে?"

তখনই কি কাজে হঠাৎ উঠিয়া গেলেন বলিয়া গিরিবালার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হইল না।

'দুপুরবেলা আসিলেন, নন্তীকে লইয়া। নন্তীর হাতে একটা নূতন পুতুল, যেন গিরিবালাকে নবৈশ্বর্যশালিনী ধরিয়া লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য তৈয়ার হইয়া আসিয়াছে।

BanglaBook.org

জা কোথায় বাহিরে গিয়াছিলেন ; বরদাসুন্দরী ঘুমন্ত শিশুকে পাশে শোওয়াইয়া একটা কাঁথায় ফুল তুলিতেছিলেন। গিরিবালা, সাতকড়ি আর হরিচরণ বর্ধিত সরঞ্জাম লইয়া শিউলিতলার খেলাঘর গোছাইতেছিল।

পিসি আসিয়া ডাকিতে গিরিবালা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বরদাসুন্দরী বলিলেন —"পিসিমাকে পেন্নাম কর, এতদিন পরে এলি ; কী যে হচ্ছেন মেয়ে, খেলা নিয়ে উম্মত্ত!"

"থাক, হয়েছে"—বলিয়া দামিনী তাহাকে ধরিয়া পাশটিতে বসাইলেন, মুখের দিকে একবার চাহিয়া বরদাসুন্দরীকে বলিলেন—"বলি, হ্যাঁগো বৌ, তোরা সব কী, মেয়েটাকে একবার ঘুরে দেখিস না?—ক'টা দিনই বা মামার বাড়িতে ছিল?—কিন্তু বলতে নেই, এরই মধ্যে ছিরি হয়েছে দেখ দিকিন মেয়ের! তারা তো হাতি-ঘোড়াও খাওয়ায়নি, দুধেও নাওয়ায়নি।"

"দুধে নাওয়াবে কি, তাদের নিজেদেরই কোন রকমে জোটে একটু প্রাণধারণের জন্যে। একটু আদর যত্ন পেয়েছে কটা দিন,—মেজদিদি আর বৌদি, গিরির নাম নিতে অজ্ঞান একেবারে। এখানে, কোন্ দিকটা সামলাই, কাকে দেখি ঠাকুরঝি...দেখতেই তো পাও ; মরবার ফুরসত থাকে না।"

দামিনীর মুখে একটা কথা আসিয়াছিল, যেন তুলিয়া রাখিলেন। গিরিবালাকে প্রশ্ন করিলেন—"তা কি কি নিয়ে এলি মামার বাড়ি থেকে?"

বড় ধামায় করিয়া সঙ্গে যাহা আনিয়াছিল সব কিছুরই নমুনা একটু একটু করিয়া বাড়িতে গেছে, কথার ভয়ে বরদাসুন্দরী নিজে দেখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। গিরিবালা তালিকা দিতে যাইলে বলিলেন—"ওসব আমি পেয়েছি লো, তোকে আর ফিরিস্তি গুনতে হবে না। তোকে কি দিলে তাই বল।" একটু হাসিয়া বলিলেন—"ওসব না পেলে তোর মার কিছু আর বাকি রাখতাম নাকি? তোকে কি কি দিলে?"

গিরিবালা উৎসাহের সঙ্গে তাড়াতাড়ি খেলার ঘরে গিয়া, মামার বাড়ি থেকে সংগ্রহ-করা জিনিস সব কোঁচড়ে করিয়া হাজির হইল। বরদাসুন্দরী যেন কাঠ হইয়া ঠায় একদৃষ্টে নিচুদিকে চাহিয়া ফুল তুলিতে লাগিলেন। গিরিবালা সম্পত্তিগুলো দাওয়ায় মেলিয়া ধরিলে দামিনী একটি হাসি মুখে পিষিয়া লইয়া একটু মুখটা ফিরাইয়া লইলেন। একটু থামিয়া বলিলেন—"আর যা দিয়েছে না হয় দিয়েছে ; অন্তত একটা পুতুল তো দিতে পারতো ভালো দেখে ছেলেমানুষের হাতে?...তা তোর মায়ের সামনেই বললাম বাছা, আমি আবার বড় ক্যাটকেঁটি...যা, খেলগে যা।"

বরদাসুন্দরী ঘাড় নিচু করিয়াই বলিলেন—"দুজনের হাতে দুটি টাকা দিয়েছে পুতুলটুতুল কেনবার জন্যে।"

সূচের একটা ফোঁড়ের সঙ্গে সঙ্গে মুখটা তুলিয়া বলিলেন—"আর, পাবেই বা কোথায় ঠাকুরঝি, তুমিই বলো না? সংসারটি তো একেবারে ছোট না, উপার্জন করতে ঐ তো একলা দাদা।"

দামিনী বলিলেন—"দেখো গেরো, বউ ভাবলে আমি বুঝি সত্যি বললাম কথাটা! মনে একটা কথা এল, ঠাট্টার সম্পর্ক, বলে ফেললাম, তুই রাগ করবি জানলে..."

বরদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না, না, রাগ করব কেন ঠাকুরঝি—রাগের কি বলেছ? আর, যদি তুমি একটা কথা নেয্য ভেবে বলেই থাক, হুট করে

BanglaBook.org

রাগ করে বসব?—কথা উঠল, তাই বললাম অবস্থাটা, তোমাকে বলায় তো দোষ নেই?"

এর পরে অনেকক্ষণ ধরিয়া একথা-সেকথা হইল। দামিনী একবার নন্তীকে বলিলেন—"যা না, খেলগে যা না; বড়রা একটু বসে কি দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইছে, হাঁ করে শুনতে হবে? ঠিক মায়ের অব্যেসটি পেয়েছেন মেয়ে!"

নন্তী চলিয়া গেলে আরও দু-একটা এদিক-ওদিকের কথা তুলিয়া দামিনী বলিলেন—"বৌ, বলব? কু-ভাবে নিবি না তো?...না বাছা, পরের কথায় থাকি না, জিগ্যেস করেই বলা ভালো।"

বরদাসুন্দরী এসব বাঁধা গৎ-এ অভ্যস্ত, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কথা ঠাকুরঝি? বলবে বৈকি, তুমি বলবে তার আর..."

"না; নেহাৎ তোর মুখ দিয়ে ফুরসতের কথাটা বেরুল, প্রাণে গিয়ে বিঁধল, তাই বলছি; আর বেরুতে দোষই বা কি? নিজের সন্তানের দিকে একবার ফিরে দেখতে পাচ্ছি না, আর দুটো সংসারের পাট সারতে সারতে নাজেহাল হচ্ছি—এতে কোন্ মায়ের মনেই না আক্ষেপ হয় বল না—মায়েরই প্রাণ তো? একটা গাইও বিয়োলে বাছুরটাকে চেটেপুটে একটু স্নেহ-আত্তিস্য দেখায় যে। বলি, গিন্নি নিজে গেছেন কোথায় টহল দিতে?"

বরদাসুন্দরী মুখটা নিচু করিয়া আস্তে আস্তে ফোঁড় দিয়া চলিলেন।

দামিনী একটু থামিয়া বলিলেন—"কেন, আজকাল তো রসিক দু' পয়সা আনছে।"

বরদাসুন্দরী সেই ভাবেই বলিলেন—"কৈ, দেখি না তো ঠাকুরঝি!"

নেহাৎ একতরফায় সুবিধা হইতেছিল না, দামিনী একটু উৎসাহ পাইলেন। বলিলেন—"দেখবে কোথা থেকে বোন?—বাড়ির দরজা না পেরুতে মা-লক্ষ্মী যে দাদার বাক্সয় গিয়ে ওঠেন। খবর রাখি তো একটু একটু। লক্ষ্মণভাইয়ের অনেক ভোগান্তি বোন, গোড়াতেই একটু সাবধান হওয়া ভালো।"

বরদাসুন্দরী এবারে আর কিছু বলিলেন না। সেইভাবেই কাজ করিয়া চলিলেন।

দামিনী একটু থামিয়া বলিলেন—"রসিক তাহলে তোকেও কিছু জানায় না দেখছি?"

বরদাসুন্দরী বলিলেন—"কৈ, কিছু বলেন না তো।"

দামিনী মুখে একটা 'চ্যু" করিয়া শব্দ করিলেন, বলিলেন—"বলিহারি শাসন ভাই আর ভাজের।"

বরদাসুন্দরী এ-কথার উপরেও কিছু বলিলেন না।

কথা অগ্রসর হইবার বেশ রসদ পাইতেছে না দেখিয়া দামিনী একটু একথা-সেকথা করিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"আসি এখন বৌ, আবার ছিষ্টির পাট পড়ে রয়েছে।"

বরদাসুন্দরী একটা মৌখিক প্রশ্ন করিলেন—"বসবে না ঠাকুরঝি আর একটু?"

"না, এখন আসি বৌ। বসবার কি জো আছে বেশিক্ষণ? মনে করলাম—গিরিটা কতদিন পরে এল, যাই একবার চট্ করে দেখে আসি।"

দরজা টপকাইয়া নিজের মনে বিড়-বিড় করিয়া বলিলেন—"বসবে না ঠাকুরঝি?

BanglaBook.org

—ঠাকুরঝির বকে বকে মুখের ফেকো উঠুক, উনি চুপটি করে কাঁথার ফোঁড় তুলে যান। মুয়ে আগুন গোমড়ামুখী!"

এ-পুরুষে এক তরফের মনের ভাবটার একটা নিদর্শন দেওয়া গেল। এরূপ ক্ষেত্রে হয় তো ভাইয়ে ভাইয়ে আলাদা হইয়া উভয় পরিবারেই শুভার্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার আবির্ভাব হয়, নয় তো বা শুভার্থীদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয় ;—এ-ক্ষেত্রে দুইয়ের মধ্যে একটাও হইতেছে না। তাহারও একটু কারণ আছে এবং নিচের ব্যাপারটুকু থেকে সে-সম্বন্ধে কতকটা আন্দাজ পাওয়া যাইবে।

বসন্তকুমারী যেইখানেই থাকুন, খোকার দুধ খাওয়াইবার সময়টিতে ঠিক আসিয়া উপস্থিত হন বাড়িতে। কি কারণে ঠিক বলা যায় না, এ কাজটুকু নিজের হাতেই রাখিয়াছেন, বলেন,—"তোর হাত বড় কড়া ছোটবৌ, কোন্‌দিন কি করে বসবি! তোর আর ও উবগারটুকু করে কাজ নেই। মা-গিরি ফলাবার ঢের সময় পাওয়া যাবে এর পর।"

সময় হইয়াছে, বরদাসুন্দরী দাওয়ায় নারিকেল পাতা জ্বালিয়া দুধ জ্বাল দিতেছিলেন —"কৈ রে ছোটবৌ, বলি খোকার দুধ খাওয়ার যে সময় হল সে হুঁশ আছে?"—বলিয়া বসন্তকুমারী বাড়িতে প্রবেশ করিলেন, এবং জায়ের যে সে হুঁশ একটু বেশি আছে তাহার প্রমাণ পাইয়া লজ্জিতভাবে বলিলেন—"কৈ খোকা?—আমারই বরং ঘোষগিন্নীর ওখানে একটু দেরি হয়ে গেল। যা গপ্পে মানুষ!"

বরদাসুন্দরী একটু চাপা গলায় ডাকিলেন—"দিদি শোন ; উঠে এসো না ওপরে।"

"কি লো?"—বলিয়া বসন্তকুমারী উপরে উঠিয়া আসিলেন।

"আজ দামু ঠাকুরঝি এসেছিল, এই খানিকক্ষণ আগে।"

"আসছে তো রোজই, নৈলে ভাত হজম হবে? তা নতুন কিছু বললে নাকি?"

"নতুন নয়, কিন্তু পুরনোও তো হয় না বলে বলে।—'দুটো সংসারের পাট করতে নিজের সন্তানদের দেখে উঠতে পারিস না'...ওর নাম করে—'তার তো আজকাল বেশ পশার হয়েছে—সব টাকা দাদার বাক্সয় ওঠে তো আর দেখবি কি করে?' উত্তর দিচ্ছি না, তবু পাশে বসে গজর গজর।...ছেলেপুলেগুলোকে তো সব্বদাই ধোওয়াচ্ছি মোছাচ্ছি দিদি, আর ক্রমাগতই খিট খিট করছি, মাখবে ধুলোমাটি তো কত সামলাবো বলো? আর এই এক ছাইয়ের ডাক্তারি হয়েছে—যা এক আধ পয়সা হাতে আসবে দাতব্য করে আসবে—শত্রুদের চোখ টাটিয়ে শুধু ফ্যাসাদ ডেকে আনা।...কী দুজ্জন মনিষ্যি দিদি! কবে যে কী ঘটাবে!..."

বসন্তকুমারী বলিলেন—"তুই কিছু বলিসনি তো?"

"দিব্যি দিয়ে রেখেছ তো বলব আর কি করে! তুলে নাও তো মুখ ছাড়ি একবার, গায়ে হেন বিষ ছড়িয়ে দেয়!...তাই বা করি কি করে ঝগড়া?—বড়ঠাকুর, উনি ভাববেন —দেখেছ—বৌ-মানুষ হয়ে।"

"দিব্যি আমি কখনও তুলব না বোন, চুপ করেই শুনে যাস। তুই যে সংসারে আছিস সেখানে ও কিছুই করতে পারবে না। সে-দিক দিয়ে আমি নিশ্চিন্দি আছি। হাজার ধুলেও কয়লার ময়লা কখনও ঘোচে না ; স্বভাব, কি করবি বল?"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"আর তোরও যেন কি হয়েছে।—রাগ করিসই বা কেন,

BanglaBook.org

আর অত ভয় করাই বা কিসের? আমার তো বেশ লাগে,—যাত্রায় না গিয়ে, বাড়িতে বসেই জটিলে-কুটিলের ভ্যানভ্যানানি শুনি—খরচ নেই, রাত-জাগা নেই। আমি হলে তো আরও খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বাড়িয়ে তুলতাম।...চমৎকার লাগে আমার।...'হ্যাঁলা ছোটবৌ, তিনি রাজ-রাণী নিত্যি টহল দিয়ে বেড়াবেন, আর তোর বরাতে বুঝি দুবেলা হাঁড়ি ঠেলা? ...ছোট-বৌয়ের হাতের রান্না না হলে বড় ঠাকুরের মুখে ওঠে না!...বলে নেকি বুদ্ধির ঢেঁকি!...সব ঐ বড় আবাগির কারচুপি, কবে বুঝবি?"

দামিনীর ভঙ্গি নকল করিয়া কথাগুলো টানিয়া টানিয়া বলিতে বলিতে বসন্তকুমারী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বরদাসুন্দরী না হাসিয়া পারিলেন না। বড়-ঠাকুরের তাঁহার হাতের রান্না-প্রিয়তার কথায় চোখের কোণে একটু অশ্রুও চকচক করিয়া উঠিল।

বসন্তকুমারীর রঙ্গ করিবার ঝোঁক চাপিলে সহজে ছাড়ে না। হঠাৎ দীপ্ত মুখে বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক হয়েছে রে ছোটবৌ, আজ রাত্তিরে যাব'খন গতরখাকির ওখানে। তুই উত্তর দিসনি, নিশ্চয় চটে আছে। গেলে নিশ্চয় বলবে (আবার দামিনীর নিজস্ব ভঙ্গিমা অনুকরণ করিয়া)—

'ওমা, বড়গিন্নী যে! কী ভাগ্যি আমার! কোন্ দিকে আজ সূয্যি উঠেছে?'

আমি ভালো মানুষের মতন বলব—'বলে নাও ঠাকুরঝি জো পেয়ে। পাট সেরে এই দু'পা এসেছি, বলি ঠাকুরঝিকে কদ্দিন দেখিনি, একবার দেখে আসি—এইতেই ছোটরাণীর মুখে কত কথা উঠবে দেখে নিও। দেখতেই—দুই জায়ে আছে দিব্যিটি, কিন্তু কি সুখে যে আছি অন্তর্জ্জামীই জানেন।'

(আবার দামিনীর ভঙ্গি সহকারে)—

'তা যদি বললি বড়বৌ তো বলতে হোল।—আজ দুপুরে পাট-সাট সেরে একবার মনে হোল—বড়বৌকে দেখে আসি। ছোট রাণীকে জিগ্যেস করলাম—কৈ গো, আমাদের বড়বৌকে দেখি না যে?...তা, বানিয়ে বানিয়ে এই এতো কথা—বড়-রাণী রাজ্য তদারকে গেছেন। এই দেখো না ঠাকুরঝি, দু'বেলা হাঁড়ি ঠেলা ; রাজ্যের ঝঞ্ঝাট, একটু ফুরসত নেই যে, নিজের পেটের সন্তানগুলোকেও একবার কাছে ডেকে—'

পূর্বের চেয়ে আরও জোরে বসন্তকুমারী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর সামলাইয়া লইয়া ভাব ভঙ্গি সব বদলাইয়া বলিলেন—"দে, তোর হোল? দাঁড়া, খোকাটাকে নিয়ে আসি।—মুখে আগুন, পোড়াকপালির, নাম করলেই হাতের কাজ পর্যন্ত ভুলে বসে থাকতে হয়। অতবড় রোগটা হোল, মোলোও না তো?—যমের অরুচি!"

এইখানে আর একটি মানুষের কথা বলিয়া রাখি, তাহা হইলেই নন্তীদের বাড়ির আসল পরিচয়টা দেওয়া হইয়া যায়। স্বয়ং কর্তার কথা।

নিকুঞ্জলাল লোকটি অত্যন্ত মৃদু স্বভাবের। আস্তে আস্তে খুব স্পষ্ট স্পষ্ট করিয়া কথা বলেন, বেশ থিতিয়া-জিরাইয়া ভাবিয়া-চিন্তিয়া, আর মানুষ যতটা পারে মিষ্টি করিয়া। একসঙ্গে গড়-গড় করিয়া যে বেশি কথা বলিয়া যাওয়া তাহাও নাই। হাতে প্রায় সর্বদাই একটি হুঁকা থাকে, খানিকটা বলিয়া হুঁকাটা ফর্‌ফর্ করিয়া একটু টানিয়া লন, আবার বলেন ; কি বলিয়া গেলেম, ফল কি হইতে পারে যেন সঙ্গে সঙ্গে হিসাব করিয়া লন, কি বলিবেন তাহাও একবার ভাবিয়া লন—এই মনে মনে ভাঁজা আর পুনরাবৃত্তির মধ্যে

BanglaBook.org

দিয়া নিকুঞ্জলালের বক্তব্য চলিতে থাকে।

গৃহিণীকে দুয়ারের পাশে না দাঁড় করাইয়া বিচক্ষণ বরের বাপ যেমন কোন কাজের কথা পাড়েন না, হুঁকা হাতে না করিয়া নিকুঞ্জলালও তেমনি কোন আলোচনা কি মন্তব্যে অগ্রসর হন না ; না থাকিলে ত্বরায় আনাইয়া লন। লোকে বলে—নিকুঞ্জলালের হুঁকাটা সজীব, ফর-ফরানির মধ্য দিয়া নিয়তই কানে মন্ত্রণা ঢালে।

নিকুঞ্জলালের বৃত্তি ঘটকালি। এটা হইল বংশগত বৃত্তি ; নিজের বুদ্ধিবৃত্তি দিয়া আরও অনেকগুলি দাঁড় করাইয়াছেন। আইন-কানুনে একজন হুঁশিয়ার লোক, জেলার বড় বড় উকিল-মোক্তারের নাক কাটেন ; প্রায়ই লোকের দরকার হয় তাঁহাকে, আদালত মাড়ান না এমন দিন খুব কমই যায়। এমন বুক পাতিয়া জেরার ধাক্কা সামলাইতেই খুব কম লোকেই পারে।

মন্ত্রণা ভিন্ন মন্ত্র দেওয়ার আছে। দূরে দূরে—অনেকগুলি যজমান গড়িয়াছেন, স্বকৃতই। আরও কি কি সব আছে, অনুসন্ধিৎসু লোকে এখনও জানিয়া উঠিতে পারে নাই।

ভদ্রাসনটি পৈতৃক। কোঠাটা নিজেই তুলিয়াছেন। সরিকদারের মধ্যে একটি কনিষ্ঠ ভাই ছিল। রোদ-ছায়ার নিয়মানুসারেই এমন-এমন দাদার ভাইয়েদের অনেক সময় একটু ধর্মের দিকে টান হয়। নিকুঞ্জলালের কনিষ্ঠেরও একটু ছিল—জপ, সাধুসঙ্গ, তীর্থ প্রভৃতির সুবিধা করিয়া দিয়া ভাইয়ের প্রবৃত্তিকে বাড়াইয়া বাড়াইয়া নিকুঞ্জ তাহাকে কায়েমিভাবে বিবাগী করিয়া দিয়াছেন। এখন একছত্র মালিক ; বয়োজ্যেষ্ঠ কেহ আসিলে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বলেন—"আশীর্বাদ করো মতি-গতি ফিরুক, ফিরে আসুক সে।"

গভীর জলের মানুষ—নতুন লোকের পক্ষে চিনিতে সময় লাগে। নিকুঞ্জলালের চরিত্রে সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার ওঁর সম্মোহিনী শক্তি। চিনিয়াও আবার লোককে ওঁর কাছে আসিতে হয় ;—দায়ে পড়িয়াও, আবার মোহের বশেও।

পরিবারের মধ্যে ঐ বিধবা বড় ভগ্নী—দামিনী, একটি কন্যা,—নন্দী, আর স্ত্রী,—রাইমণি।

স্ত্রীটি ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অত্যন্ত ভয়-প্রবণ, নিরীহ, ভালোমানুষ ; কথাবার্তা নিকুঞ্জলালের চেয়েও মৃদু এবং মন্থর, তফাৎ এই যে রাইমণির এটা ভয়ে ;—সর্বদাই একটা আতঙ্ক, কি বুঝি বেফাঁস বলিয়া ফেলিলেন, কি বুঝি একটা অঘটন ঘটিল!

—অমন স্বামী আর অমন ননদের চাপে যেমনটি হওয়া সম্ভব আর কি। চাপটা অবশ্য ননদেরই বেশি ; ননদের আওতায় পড়া বধূর সম্বন্ধে একটা কথাই চলিয়া গেছে গ্রামে—'রায়বাঘিনির রাইমণি।'

॥ ২ ॥

বেলে-তেজপুরের দিনগুলি শান্তগতিতে গড়াইয়া চলিয়াছে, কানানদীর মতো। যখন কালেভদ্রে দামোদরের জল নামে, কানানদী একটু জাগিয়া ওঠে, দু'পাঁচ-দিন তীরের আগাছাগুলো একটু নাড়া খায় ; দু'পাশের শিশুমহলে একটু স্নানের হুড়াহুড়ি পড়ে, দু'কূল ব্যাপিয়া একটু যেন প্রাণের সঞ্চার হয়। তাহার পর আবার নদী খাদে নামিয়া যায়, স্রোত

BanglaBook.org

হইয়া আসে মন্থর ; ক্রমে অতি মন্থর—স্রোতের প্রায় কোন চিহ্নই থাকে না ; নিতান্ত তলায় একটা অচঞ্চল স্বচ্ছ জলের ফালি পড়িয়া থাকে—কানানদীর প্রতিদিনের আসল রূপ।

বেলে-তেজপুরেরও এই ইতিহাস। সিংহবাহিনী কি বারোয়ারি তলায় একটা পূজা, কিংবা চৌধুরীদের বাড়িতে একটি বড় কাজ হইলে—গাঁয়ের মধ্যে ঘটনাটিকে কেন্দ্র করিয়া কিছুদিন আগে এবং কিছুদিন পরে পর্যন্ত একটা স্পন্দন জাগিয়া উঠে, খানিকটা ছুটাছুটি, খানিকটা দলাদলি, খানিকটা বকাবকি ; তাহার পর জীবন আবার খাদের বীচিহীন স্বচ্ছ ধারাটিতে নামিয়া আসে,—নাকে চশমা দিয়া আর বাঁহাতে হুঁকা লইয়া নিকুঞ্জলাল মকদ্দমার খাতাপত্র, কি পাত্র-পাত্রীর কোষ্ঠী-ঠিকুজি বিচারে নিজের বাহিরের ঘরে লীন হইয়া থাকেন ; ভগ্নী দামিনী এবাড়ি-সেবাড়ি ঘুরিয়া ভাঙনের মন্ত্র পড়িয়া বেড়ান ; অনুগত হারাণের মাথায় ঔষধের বাক্স চাপাইয়া ফকরে ঘুড়ির পিঠে চাপিয়া রসিকলাল একের বাড়িতে যাহা উপার্জন করেন অন্যের বাড়িতে তাহা বিলাইয়া বেড়ান ; দুলালের বৌ 'বামুনডাক্তার'-এর পথ চাহিয়া একটি-না-একটি শিশুকে বুকে লইয়া দুঃখ, দারিদ্র্য আর মাতৃত্বের শ্রীতে কুটির দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকে। রসিকলালের প্রত্যাশায় থাকেন আরও একজন, কিছু কম আগ্রহের সঙ্গে নয় ;—পণ্ডিতমশাই রাস্তার ধারেই সিমেন্টের বেঞ্চিটিতে বসিয়া থাকেন ; পাশে এক-আধটা খাতা, দু'একখানা বই। খাতার মধ্যে একটা হয়তো রসিকলালের পদ্যের খাতা। পণ্ডিতমশাইকে সংশোধনের জন্য দিয়া গিয়াছেন রসিক, সেই সূত্রে কোন্ লাইনে কি অপূর্ব অর্থগৌরব বা ব্যঞ্জনা আবিষ্কার করিয়াছেন পণ্ডিতমশাই বলিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকেন। আসিলেই দুজনের মুখেই এমন একটা আলো খেলিয়া যায় যাহার সন্ধান দিবসের কোন মুহূর্তেই অন্য ব্যাপারের মধ্যেই পাওয়া যায় না। রসিকলাল ঘুড়ির পিঠ থেকে নামিয়া আসেন, এমন হালকা হইয়া যান যে মনে হয় শুধু যে বাহনটিরই ভার লাঘব করিলেন এমন নয়, নিজেও যেন মস্ত বড় একটা বোঝা পিছনে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। পণ্ডিতমশাই বলেন—"গিন্নীর কথা—'রসিক এলেই তোমার নাওয়া-খাওয়া যায় উল্টে, কি যে হয় দুজন বসে।' বলি 'ঐ সময়টুকু আমাদের প্রতিদিনের জীবনের বানপ্রস্থ,—নিজের কথাও মনে থাকে না, তোমাদের কথাও মনে থাকে না।' হাঃ—হা—হা"

রসিকলাল মুখে কিছু বলেন না, কিন্তু তাঁহার লঘু মন ঠিক ঐ কথাটিতেই সায় দেয়—প্রতিদিনের বানপ্রস্থ—প্রতিদিনের বানপ্রস্থ—সংসার-মুক্ত কয়েকটি নির্মল, সৌম্য মুহূর্ত—বানপ্রস্থ যে স্বর্গের কাছাকাছি।

আরম্ভ হয় কবিতার আলোচনা—"তুমি যে কি ক্ষতিটাই করেছ লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে! এই সব ভাব কি সচরাচর চোখে পড়ে আজকাল? এগুলো প্রতিভার ক্ষণিক স্ফূরণ—বিদ্যুতের এক একটা ক্ষণিক বিকাশ—বুঝতে হবে পিছনে একটা মস্ত বড় শক্তি আছে ; তা তুমি নিজেও চিনলে না নিজেকে, কেউ চিনিয়েও দিলে না। এই যে পেয়েছি শোন..."

বেড়ার পাশে ঔষধের বাক্সের পিঠে হারাণের তবলার বোল মৃদু হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে থাকে। তন্ময় হইয়া মাথা নাড়িয়া একলাই চালাইতেছে। প্রভুর চেয়ে আরও সৌভাগ্যশালী—তাহার বানপ্রস্থ একেবারে হাত-ধরা ; বাক্সটা লইয়া একটু তফাতে বসিতে পারিলেই হইল।

বেলে-তেজপুরে জীবনের স্রোতে এই সব রেখার পাশে আরও অনেক রেখা ফোটে, সব এমনই মন্দগতি, অচপল।

কাব্যের সঙ্গে গিরিবালারও আলোচনা হয়। পণ্ডিতমশাই প্রশ্ন করেন—"শিবপুজোটা তো করে যাচ্ছে নাতনী? না, লক্ষ্য রেখো।"

আলোচনাটুকুতে একটা বেদনার সুর থাকে। গৌরীদান হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই আর। পণ্ডিতমশাই সঙ্কল্পটা জানাইবার পর বহুদিন চলিয়া গেছে। তখন গিরিবালার বয়স ছিল আট বছরের মাস দুয়েক বাকি, এখন নয় বৎসরের প্রায় অতটাই কাছাকাছি আসিয়া গেছে। মজার কথা এই যে, এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রায় রোজই চলিলেও, যখন প্রকৃতই দু-একটা পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল, তখন দেখা গেল গৌরীর বয়সের সঙ্গে 'অষ্টবর্ষে'-র আর বিশেষ কোন সম্বন্ধই নাই।

এখন গিরিবালার বিবাহের উল্লেখ মাত্রেই একটি নৈরাশ্যের সুর থাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যেদিন এই তথ্যটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়, প্রথম আঘাতের স্তব্ধতার পরেই দুজনেই হঠাৎ বেশি রকম মুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন—যেন কি একটা দুর্ভাবনা নামিয়া গেল। পণ্ডিতমশাই সান্ত্বনা হিসাবে বলিয়াছিলেন—"এর জন্য তুমি খেদ রেখো না রসিক। ভেবে দেখো না, আজকালকার একটা আট বছরের মেয়ের সঙ্গে আগেকার আট বছরের মেয়ের তুলনা চলে? যুগটা কি যাচ্ছে দেখতে হবে তো? না, এইবার এসো, একটু কোমর বেঁধে লাগা যাক ; ও তোমার এক-আধ বছরে এদিক-ওদিকে কিছু যাচ্ছে আসছে না ; যুগটা দেখতে হবে যে গো।"

রসিকলাল উৎসাহের সঙ্গেই বলিয়াছিলেন—"হ্যাঁ, আমরাও চেষ্টা করি, ওদিকে দাদাও নিকুঞ্জদাকে বলে রেখেছেন।"

নিকুঞ্জলালের নামে পণ্ডিতমশাইয়ের মুখটা একটু শুকাইয়া গিয়াছিল, প্রশ্ন করিলেন —"নিকুঞ্জের পরামর্শ তোমার দাদা নেন নাকি বেশি?"

তখনই সে-ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলেন—"তা ভালোই তো, নিকুঞ্জ হল যাকে বলে জাত ঘটক। দেখুক না। তবে কি জান?—আত্মচেষ্টার মতো কিছুই নেই ; দাঁড়াও, তোমাদের হেডমাস্টারমশাই যে কি ইংরিজিটা বলতেন—হ্যাঁ, মাই গুড্ সাইঠ্যাং ঠ্যাং না কি বলতেন আমার ঠিক মনে নেই বাপু, তখন করে নিয়েছিলাম সুখস্থ।"

গৌরীদানের বয়স পারাইয়া যাওয়ায় মনটা প্রসন্ন ছিল না বলিয়া নিকুঞ্জ-ঘটিত ব্যাপারটাকে সেদিন বেশি আমল দেন নাই।

গিরিবালার শিবপূজার একটু ইতিহাস আছে। সেবার সিমুর থেকে ফিরিয়া শিবপূজা আরম্ভ করিয়াছিল ; আত্মচেতনার সঙ্গে এবং তাহারই পাশে পাশে একটা বৃহত্তর জগতের সহিত পরিচয়ের সঙ্গে, এক ধরনের উচ্চাশা জাগিয়াছিল মনে,—হাওয়ার মধ্যে দিয়া, পাওয়ার মধ্যে দিয়া—আত্মোপলব্ধির একটা কৈশোর বাসনা। কি হওয়া, কি পাওয়া ঠিক বোঝা যায় না—চিত্রের রেখা খুবই অস্পষ্ট, কিন্তু অস্পষ্ট বলিয়াই আরও মোহন—শিবঠাকুর সব দেন, বেশ ঘরোয়া ঠাকুরটি, পুজোরও বিশেষ কোন হাঙ্গামা নাই। মাটির ছোট তালটিকে মাঝখানে একটু টিপিয়া টুপিয়া মাথায় ছোট একটি গুলি বসাইয়া দেওয়া। তাহার পর এক মুঠা বিল্বপত্র আর গোটাকতক ধুতুরার ফুল, ব্যস্। বরাৎগুণে কোন দিন যদি একটু গঙ্গাজল জুটিল তো মনে হয় ঠাকুর যেন সমস্ত পৃথিবীটা হাতে তুলিয়া

BanglaBook.org

দিতে পারেন। চমৎকার ঠাকুর; গিরিবালা তো গল্প শোনে জেঠাইমার কাছে—ভক্তকে রাজা করিয়া বেড়ান অথচ এদিকে নিজে ভিখারি! এমন আত্মভোলা ঠাকুরের উপর দয়াও হয় খানিকটা। দুইটা ধুতুরা বিল্বপত্র না দিলে মন কেমন করে যেন।

গিরিবালা এদিকে বরাবর পূজা করিয়া যাইতেছিল, তারপর গেল একবার মামার বাড়ি। সেকালের মেয়েরা প্রায় এই বয়সে করিত ঐ পূজাটা, কেহ আশ্চর্য হইল না। মামী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁলা, পুজো করিস, তা মন্তর-টন্তর কিছু জানিস? না, শুধু—'আমি ঠাকুর হাবলা গোবলা, ফুল খাও খাবলা খাবলা'?"

গিরিবালা জেঠাইমার কাছে শেখা মন্ত্রটা যথা-অশুদ্ধি বলিয়া গেল—

ধ্যায় নৃত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্র বতাংসং
রত্নকল্লো জলং ঘং পরশুমৃগবরা ভীতিস্তং...

মাসি বলিলেন—"বেশ, এই তো দিব্যি শিখেছিস। পুজোর পর বর চাস তো?—মানে, পুজোর শেষে বলিস তো—ঠাকুর আমায় অমুক জিনিসটা দাও, আমি এইটে চাই, আমি ঐটে চাই?...কি বলিস শুনি তো?"

গিরিবালা দুই হাতের আঙুলে একটা মুদ্রা সৃজন করিয়া বলিল—"নমঃফট্" বলে এমনি করে ধরে শুইয়ে দিই।"

কাত্যায়নী বিস্মিতভাবে বলিলেন—"ব্যাস্!" তারপর খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"ও পিসিমা, শোনসে তোমার নাতনীকে শিবঠাকুর কি রকম ঠকিয়ে রোজ পুজো আদায় করে যাচ্ছেন! ফুল বিল্বিপত্তোর নিয়ে 'নমঃ ফন্ট্' বলে শুয়ে পড়েন, না হয় বর দিতে, না হয় কিচ্ছু। একি বাপু—ছেলেমানুষটাকে ওমনি-ওমনি খাটিয়ে নেওয়া!"

গিরিবালার রাঙাদিদিমাও শুনিলেন, হাসিয়া বলিলেন—"পুজো, মন্তর ঠিকই আছে, ওর জেঠাইমা কি ভুল শেখাবে? তবে, আইবুড়ো মেয়ের পুজো আর একটু জুড়ে দিতে হয়।...বলবি—'শিবের তুল্যি বর দাও, নারায়ণের ঘর দাও'।"

পিসি চলিয়া গেলে কাত্যায়নী গিরিবালাকে বুকে জড়াইয়া, যেন নিজের বুকে সঞ্চিত সব তৃষ্ণা ঢালিয়া বলিলেন—"শুনলি? সব চাইবি, আরও চাইবি, ছেলে দাও, মেয়ে দাও, নাতি দাও, নাতকুড় দাও। চাইবি বুড়োর কাছে, তোর মতন মেয়েকে দেবে না তো কার জন্যে রেখেছে সব?...সবাই কি কাতি আবাগি?"

শিব পূজার এই গূঢ় উদ্দেশ্যটি বোঝা পর্যন্ত, গিরিবালা লজ্জার বশে পূজা পর্যন্ত ছাড়িয়া দিয়াছে। মা জেঠাইমা মাঝে মাঝে ঝোঁক হইলে তাগাদা দেন, রসিকলালও বলেন। গিরিবালা কর্মের অজুহাতে এড়াইয়া চলে।

এক বৎসরের পূর্বের গিরিবালার চেয়ে এক বৎসরের পরের গিরিবালা একটু আলাদা হইয়া পড়িয়াছে নানা দিক দিয়াই। শৈশব আর কৈশোরের সেতুরূপে খেলাঘরটা ছিল, সেটাও গিরিবালার জীবন থেকে ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছে। এ বিচ্ছেদটা ভালো করিয়া ঘটাইল হরিচরণ। ঘটনাটি কিছুদিন পূর্বের এবং বেশ একটু কৌতুকপ্রদ।

সেই হাতভাঙা পুতুলটির হাজার খোঁজ করিয়াও সন্ধান মেলে নাই; তবে পুতুল-সম্পদে গিরিবালা এখন বেশ সম্পন্ন। যদিও রমেশের দোকানের মোমের পুতুলটি বাপ আর মেয়ের জল্পনার মধ্যেই রহিয়াছে, তবু মামার বাড়ি থেকে অনেকগুলি সংগ্রহ হইয়াছে, এদিক-ওদিক থেকে আরও কয়েকটা আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ছেলে-মেয়ে

BanglaBook.org

বৌ-জামাইয়ে বাড়িটি গমগমে। হরিচরণও একটু মানুষের মতো হইয়া আসিতেছে, মা-মা ছাড়া অন্য দু-একটা ভূমিকাও করে মাঝে মাঝে...কখনও গুরুমশাই হইয়া একটু দূরে কৃষ্ণচূড়ার তলে পাঠশালা খুলিয়া বসে—গিরিবালার বাড়ির, নন্তীর বাড়ির ছেলে-মেয়ে লইয়া বেত আছড়ায়। কখনও হয় ডাক্তার, কখনও বা আর কিছু। আজকাল আসল সংসারে গিরিবালার একটু বেশি খাটিতে হয়; তবু ফুরসুত পাইলে যখন খেলা-ঘর পাতে তখন জমে ভালো।

একদিন নন্তীর মেয়ের সঙ্গে গিরিবালার ছেলের বিবাহের যোগাড়-যন্ত্র চলিতেছে। পুতী মামার বাড়ি হইতে বেড়াইতে আসিয়াছে; তাহার আসাটা এই বিবাহ উপলক্ষ করিয়াই এইরূপ ধরিয়া লওয়ায় খেলাটা একটু বেশি করিয়াই জমিয়াছে। পুতীর মামার বাড়ি শহরে, মামারাও বেশ অবস্থাপন্ন, এ সব কারণে সমবয়সীদের মধ্যে সে একটু খাতির পায়ও বেশি, আর মাঝে মাঝে দু-একটা নূতন ধরনের কথা বলিয়া খাতির আদায়ও করিতে জানে বেশ।

সব ঠিক, বর বাহির হইবে; হরু পুরুত পূজার-ঘর থেকে কিছু উপচার সরানো যায় কিনা দেখিতে গিয়াছে, এমন সময় নন্তী কাঁদ-কাঁদ হইয়া আসিয়া বলিল—"গিরিদিদি ভাই, সব্বনাশ হয়েছে, খোকা মেয়ের কি করেছে দেখোসে!"

খোকা হরিচরণের ছোটটি; দুলিয়া দুলিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে, সুযোগ পাইলে অনিষ্ট-সাধনে বেশ তৎপর।

গিয়া দেখা গেল পুতুলের মুণ্ডটি তাহার হাতে। নন্তী সব ঠিক করিয়া কৌতূহল-বশে একটু বরের বাড়ির সরঞ্জাম দেখিতে আসিয়াছিল, ফিরিয়া গিয়া দেখে—এই কাণ্ড। দিদি যাইতেই খোকা জবাবদিহি হিসাবে বলিল—"ছাছি!" অর্থাৎ শাশুড়ী।

"রাক্কুসে ছেলে!" বলিয়া গিরিবালা একটু মৃদু তিরস্কার করিল বটে, কিন্তু ক্ষতিটা সহিয়া যাইতে হইল, কেননা খোকাকে কাঁদাইলে জেঠাইমা খেলা বন্ধ করিয়া দিবেন। এক-পয়সানে মাটির পুতুল মাঝে মাঝে অমন একটা যায়ই, তাহা ভিন্ন শেষ মুহূর্তটিতে অমন একটা দুর্ঘটনা ঘটাইয়া খেলাটাকে প্রায় সত্যের কাছাকাছি আনিয়া দিয়াছে খোকা, এক দিক দিয়া লাভই।

গিরিবালা অতঃপর কি করা যায় চিন্তা করিতেছিল, পুতী মুখটা গম্ভীর করিয়া নন্তীকে বলিল—"তোমার ঘরের কথা বুঝি না ভাই, আমাদের এক কাঁড়ি খরচ হয়ে গেছে, এখন পাবই বা কোথায় মেয়ে আমরা?"

পুতীরই পরামর্শে নন্তী বরের মার বিস্তর হাতে পায়ে ধরিল এবং তাহারই পরামর্শে শেষ পর্যন্ত একটা রফাও হইল;—নন্তীর মেয়ের সঙ্গে যে ঝি আসিবার কথা ছিল, তাহাকে কনে সাজাইয়াই আপাতত বিবাহ দেওয়া স্থির হইল। পুতী বলিল—"নৈলে যে দাঁড়িয়ে অপমান হই আমরা সমাজের কাছে ভাই, এ পাড়াগাঁ নয়, শহরের সমাজ, জান না তো তোমরা!"

গিরিবালা কৃতজ্ঞচিত্তে বলিল—"ভাগ্যিস বোন-পো ভেবে এসেছিলি পুতী, একটা সমিস্যে মিটিয়ে দিলি, আমার তো মাথা গুলিয়ে গেছল একবারে!"

বিবাহ আরম্ভ হইয়া গেলে গিরিবালা হরুকে বলিল—"তুই পুরতের কাজটা সেরে নিয়ে ডাক্তার হবি; মেয়েটার চিকিচ্ছে করতে হবে তো?"

BanglaBook.org

পুতী আবার মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিল—"তা করতে হবে না? একে বিয়ে হোল না, তায় মুণ্ডু গেল—একসঙ্গে দুটো চোট সইতে পারে ছেলে-মানুষ?"

খেলা ভাঙিবার পর ভাঙা পুতুলটা হরিচরণের জিম্মা করিয়া দেওয়া হইল।

হরু ছেলেটি বেশ চালাক। ছোট হইলেও তাহার সব কাজেই মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। দিদির খেলাঘরের ডাক্তারপদে গৌরব লাভ করিবার সুযোগ অনেকবার হইয়াছে বটে, কিন্তু কখনও এত বড় সার্জারির কেস হাতে পড়ে নাই। সমস্ত দিন সে বড় অন্যমনস্ক হইয়া রহিল, গতিবিধিটাও যেন একটু ছমছমে। তাহার পরদিন যখন আবার খেলা আরম্ভ হইল, হরুর ডাক্তারি দেখিয়া সবার, এমন কি শহরবাসিনী পুতীরও তাক লাগিয়া গেল। পুতুলের গলাটি ধড়ের সঙ্গে পরিপাটি করিয়া জেয়ল-আঠা দিয়া জুড়িয়া এমন ভাবে ব্যান্ডেজ করিয়াছে যে মনে হয় যেন হারাণের হাতের কাজ। আগে তো উহারা বিশ্বাসই করিল না ; যখন হরু শপথ খাইল এবং হারাণের কাছে ভজাইয়া দিবার জন্য লইয়া যাইতে চাহিল, তিনজনে পরম বিস্ময়ে পরস্পরের মুখের পানে চাহিল। পুতী বলিল—"শহরে এক সায়েব-ডাক্তারের কথা শুনেছি, হরু দেখছি..."

শেষ করিতে না দিয়াই নন্তী আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল—"গিরি দিদি, এবার থেকে হরুকে সাহেব ডাক্তার করতে হবে, কি বলিস?"

গিরিবালা বলিল—"নিজের ভাই বলেই বলছি না, সায়েব-ডাক্তারেও এমন করে পারে না। এক খালি যে গণেশের গলায় হাতির মুণ্ডু বসিয়েছিল সেই পেরেছিল—রাঙাদিদিমার কাছে গপ্প শোনা,—কি নামটা ভুলে যাচ্ছি যে...।জেঠমশাইকে বলব'খন--তোকে ডাক্তারি পড়াতে হরু!"

নন্তী বলিল—"রসিক কাকার চেয়ে বড় ডাক্তার হবে হরু, উঃ!"

গিরিবালা বলিল—"বাপ হন, ও-কথা বলতে আছে?"

পুতী বলিল—"বাপ যে আবার গুরুজন রে!"

নন্তী প্রশ্ন করিল—"পটিটা যখন খুলবি তখন জোড়টা আলগা হয়ে খুলে যাবে না তো রে হরু?"

হরিচরণ একহাতে পুতুলটা লইয়া, একহাত কোমরে দিয়া দর্পিতভাবে তিনজনের কথা শুনিতেছিল, ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল—"কি রকম বোকা! খুলে গেলেই হোল? খালি পটি বেঁধেছি নাকি?"

গিরিবালা বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল—"আর কি করেছিস রে?"

নন্তী প্রশ্ন করিল—"আটার কথা বলছিস বুঝি?"

হরু একটা ঢোক গিলিয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

গিরিবালা প্রশ্ন করিল—"কিছু মিশিয়েছিস বুঝি আটার সঙ্গে?"

পুতুলের গলার কাছে নাকটা লইয়া গিয়া আঘ্রাণ লইয়া বলিল—"হ্যাঁ রে, পাথরকুঁচির পাতা বেটে দিয়েছিস,—না?—গন্ধ পাচ্ছি।"

তাহার পর পুতী আর নন্তীর পানে চাহিয়া বলিল—"হরুটা জানে সব রে! হাড় জোড়ার অমন ওষুধ আর নেই কিনা।"

হরিচরণ আরও দর্পিতভাবে স্মিত হাস্য ঠোঁটে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খেলাটা খুব জমিল সেদিন। এমন বিচক্ষণ ডাক্তার হাতে পাইয়া পুতী আর

BanglaBook.org

গিরিবালার ঘরে পাঁচটি ও নন্তীর ঘরে তিনটি ঝপাঝপ অসুখে পড়িয়া গেল ; কাজের বাড়িতে এমন কিছু আশ্চর্য ব্যাপারও নয়। তবে এপিডেমিকের একঘেয়েমি নয়, রকমারি অসুখ। পটির লোভে পুতী নিজের একটা কাচের পুতুলের একটা পা পর্যন্ত ভাঙিয়া দিল, ডাক্তার-ভাইয়ের ব্যান্ডেজসুদ্ধ মামার বাড়ি লইয়া যাইবে, সবাইকে দেখাইবে ; সেখানে আবার বাপের বাড়ির বড়াই শোনাইবার লোক আছে তো?

দুপুরের অনেক আগেই রসিকলাল বাড়ি ফিরিলেন এবং প্রবেশ করিয়াই হৈ-হৈ লাগাইয়া দিলেন—"আমি আর ও-ব্যাটা নাপতের-পোকে কখনও রাখব না। এই প্রথম বার নয়, কয়েক বারই হয়েছে, যতই সয়ে যাচ্ছি, ততই বাড়াবাড়ি হচ্ছে, যতই সয়ে যাচ্ছি, ততই..."

বসন্তকুমারী বাহির হইয়া আসিলেন, বিস্মিতভাবে কহিলেন—"বলি ব্যাপারখানা কি? আজ আবার এ মূর্তি কেন?"

রসিকলাল বলিলেন—"আমি বলে দিচ্ছি, ও-বেটা ঠিক আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে প্র্যাকটিস লাগিয়েছে। নরুন চালাতে জানে বলে ও নিজেকে ভাবেই একটা মস্তবড় সার্জেন, এবার আমার পুঁজি ভেঙে তলায় তলায় ওষুধেও হাত পাকাচ্ছে।—তাই তো বলি—হারাণ-কম্পুন্ডারের এত খাতির বেড়ে যায় কোথা থেকে দিন দিন!—যখনই দেখি, একপাল লোক চারিদিকে..."

বসন্তকুমারী বলিলেন—"ব্যাপারখানা কি আগে তাই বলো না।...হারাণে!"

হারাণ ঘুড়িটার গলায় ছোলার থোলেটা বাঁধিয়া দিয়া 'হিস-হিস্' করিয়া ডলাই-মলাই করিতেছিল, কতকটা নির্লিপ্ত কণ্ঠেই উত্তর করিল—"এস্‌ছি বড়মা, ঘুড়িটাকে একটু ঠাণ্ডা করে: অবলা জীব, মনে মনে শাপমণ্যি দিলে সইবে না ; বামুন না হোক, এর শাপমণ্যিগুনো সত্যিকারের শাপমণ্যি হবে কিনা।"

রসিকলাল আরও জ্বলিয়া উঠিলেন, ভাজকে সাক্ষী রাখিয়া বলিলেন— "শুনে নাও হারামজাদার কথাগুনো।—আমি মিথ্যে বলছি, সত্যিবাদী হোল ঐ একটা ফকরে ঘুড়ি! দাদা কিছু বলবেন না, হয়ে উঠেছে ওর কথাগুনো ঐরকম চ্যাটাং-চ্যাটাং আজকাল।...মিথ্যে কথা বলছি আমি!—তাবৎ ওষুধের নাম ওর মুখস্থ, না ঘাঁটাঘাঁটি করলে হয় কি করে? তক্কে তক্কে থেকে আজ অ্যাদ্দিন পরে হদিস পেলাম,—দাঁয়ের বৌকে ওষুধ দিতে গিয়ে দেখি শিশি খালি! নরেনের ছেলেটাকে ওষুধ দিতে গিয়ে দেখি শিশি খালি! স্বরূপের বৌটাকে ওষুধ দিতে গিয়ে দেখি শিশি আদ্দেকটা খালি! তখন বাক্সটা আরও ভালো করে মিলিয়ে দেখি আর তিন-চারখানা শিশির ঐ দশা, কোনটা একেবারে খালি কোনটা আদ্দেক! রোগী দেখে বেড়াব কি, রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। দাদা এসে ওকে আগে বিদেয় করুন, নৈলে আমার দ্বারা আর..."

এমন সময় বরদাসুন্দরী ঘোমটা টানিয়া লঘু পদে রান্নাঘর থেকে নামিয়া আসিলেন, বসন্তকুমারীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন,—"দিদি, রান্নাঘরে দেখোসে কি কাণ্ড!"

"বেড়ালে সব মাছ নিয়ে গেল তো?—তোর যেমন..."

"দেখোইসে না।" বলিয়া বরদাসুন্দরী তাঁহাকে এক রকম টানিয়াই লইয়া চলিলেন।

"যেমন দেবা তেমনি দেবী! খুলে বল, তা নয়..." বলিতে বলিতে বসন্তকুমারী অগ্রসর হইলেন।

সেই কবন্ধ পুতুলটি, যেটিকে হরিচরণের চিকিৎসাধীনে রাখা হইয়াছিল ; আবার ধড় আলাদা আর মুণ্ড আলাদা হইয়া পড়িয়াছে। ধরের দিকটা গলার নিচেই পুতুলের বুক আর পেট লইয়া বেশ একটা বড় গর্ত ;—গর্তটির সমস্তটা হোমিওপ্যাথির সাদা সাদা ক্ষুদ্রাকার চিনির গুলিতে ভরা!

বরদাসুন্দরী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ভাইয়ের ডাক্তারীর কথা গিরি ফলাও করে বলতে এসেছিল—ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে। অত কি জানি দিদি? ভাবলাম সত্যি বুঝি তেমনি কোন আটা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে—দেখি তো! হরু 'হাঁ-হাঁ করতে করতেই একটা টান্ দিয়ে ফেলেছি, দেখি এই কাণ্ড!"

চাপা হাসিতে দুই জায়ে লুটোপুটি খাইবার দাখিল। বসন্তকুমারী সামলাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় গেল দুটোতে?"

"আর থাকে?" বলিয়া বরদাসুন্দরী কহিলেন—"বলে দেবে নাকি দিদি? কিন্তু না বললেও যে ওদিকে নিরীহ হারাণেটা বকুনি খেয়ে সারা হয় ; বড়ঠাকুর এসে বোধ হয় ছাড়িয়েও দেবেন।"

"বোস"—বলিয়া বসন্তকুমারী পুতুলের খণ্ড দুইটি কাপড়ের ভিতর লইয়া উঠানে নামিয়া আসিলেন, গম্ভীরভাবে দেবরকে বলিলেন—"তোমার দ্বারা না হয় ছেড়ে দাও, তার জন্যে আর অত চোখরাঙানি কেন? ডাক্তারী করবার ঢের ভালো লোক আছে।"

হঠাৎ এই পরিবর্তিত ভাব দেখিয়া রসিকলাল একটু বিমূঢ়ভাবে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ব্যাপার কি বল দিকিন?"

"ঐ তো বললাম।"

রসিকলাল রাগিয়া উঠিলেন—"বলো বলছি বৌদি, একে আমার মাথার ঠিক নেই..."

"তবে চুপ করতে হল—মাথা না ঠিক হওয়া পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়।"

"আঃ, বৌদি বলো বলছি।"

"তার আগে কথা দিতে হবে, শুনে মাথা ঠিক রাখবে, কোন গোলমাল করতে পারবে না।"

তাহার পর পুতুলের ভিতরকার গ্লোবিউলগুলো হাতে ঢালিতে ঢালিতে কপট গাম্ভীর্যের সহিত বলিলেন—"হরু বেঁচে থাক, কে তোমার আর তোয়াক্কা রাখে গা? কি পাকা কাজ,—ব্যান্ডেজ, তার ওপর এক পেট ওষুধ!..."—বলিতে বলিতেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আমি ওকে আর আস্ত রাখব না, কোথায় সে?"—বলিয়া রসিকলাল অগ্রসর হইতেছিল, বসন্তকুমারী বলিলেন—"কথা দিয়েছ, কিছু বলবে না। আমার মাথা খাও।"

হারাণ আসিয়া উঠানের দরজার নিচে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—"হারাণে তো যাচ্ছেই। এ মিছে গঞ্জনার চেয়ে না খেতে পেয়ে মরাও ভালো। তবে যাবার আগে একটা হক্ কথা বলে যাই, বলি—কি অন্যায়টাই বা হয়েছে যে মার খেতে যাবে হরু ঠাকুর?

BanglaBook.org

ওষুধগুনো কোনও রোগীর পেটে গেলেই বা কী রাজা করে দিত? রোজ তো কাঁড়ি কাঁড়ি যাচ্ছেই, বাড়ি ঢোকার সময় পকেট যে ঢন্‌ঢন্‌ সেই ঢন্‌ঢন্‌!”

॥ ৩ ॥

মাসের পিঠে মাস, ঋতুর পিঠে ঋতু এই করিয়া দিন বহিয়া যাইতেছে।

গিরিবালা দশ ছাড়িয়া এগারোর পানে পা বাড়াইয়াছে, এবং নিজের অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে খেলার ঘর ছাড়িয়া আসল ঘরগুলিকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে।

একটি যেন পবিত্র, নির্মল চন্দ্রোদয়,—চন্দ্রমা ধীরসঞ্চারে নিজেকে স্পষ্টতরভাবে উপলব্ধি করিতেছেন, আর স্নিগ্ধ আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

জেঠামশাইয়ের সমস্ত সেবার ভার এখন গিরিবালার হাতে, একটির পর একটি করিয়া কেমন করিয়া যে চলিয়া আসিয়াছে কেহই জানে না। বাবার সেবার হাঙ্গাম নাই বড় একটা, একে আত্মভোলা মানুষ তায় বাহিরেই বেশি থাকেন এবং অভাবও কম, তবু উহারই মধ্যে গিরিবালার বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রসিকলালের জীবনে যেন একটু শৃঙ্খলা আসিয়াছে। দুপুরের আহারের সময়টা অনেকটা নিয়মাধীন হইয়াছে। বারোটা বাজিলেই মনে পড়ে তেল গামছা ঠিক করিয়া একটি কচি মেয়ে প্রতীক্ষা বসিয়া আছে, যতই বিলম্ব হইতেছে ততই গোছানো জিনিস আবার ঝাড়িয়া গোছাইতেছে—পাটকরা গামছা আবার উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পাট করিতেছে, কোঁচানো কাপড় আবার খুলিয়া কোঁচাইতেছে—প্রয়াসের সঙ্গে মুখখানি এদিক ওদিক হেলিয়া পড়িতেছে। জেঠামশাই ছোট ছোট দুইটি মাকড়ি গড়াইয়া দিয়াছন,—চাঞ্চল্যে ঝিকমিক করিতেছে; দিন তপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিতেছে, বাহিরে আসিয়া পথের খবর লওয়া তো প্রায় মিনিটে-মিনিটে।...দুপুরের পর আর দেরি করেন না রসিকলাল —চিকিৎসায় ক্রমাগত ভুল হইয়া পড়ে।

দুই ভাইয়ে একসঙ্গে খাইতে বসাটা আজকাল আর তত বিরল ঘটনা নয়। গিরিবালাও সঙ্গে সঙ্গে বসে, একটু দেরি হইলে জেঠামশাই হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকেন, ডাক দেন,—“আয় গিরি, ভাতের সামনে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না।”

গলা নামাইয়া বলেন—“যাবে কিনা, আরও আষ্টেপৃষ্টে জড়াচ্ছে।”

বসন্তকুমারী কথার সূত্রটা তুলিয়া লন, কখনও কখনও সূত্র না থাকিলেও নিজে পাড়েন কথাটা—“বলি, হ্যাঁগা, এখন দুই ভাই রয়েছ, বলি, চলবে এরকম নাকে তেল দিয়ে শুয়ে থাকলে?...বলি, হ্যাঁ, ঠাকুরপো?”

জ্যেষ্ঠ সুযোগ বুঝিয়া বোঝাটা কনিষ্ঠের উপর চাপাইয়া দিয়া নিজের গা বাঁচাইবার চেষ্টা করেন; কালক্ষেপ না করিয়া বধূকে সাক্ষী রাখিয়াই বলেন—“তা বুঝি জান না? —মেয়ে ওঁর গৌরী, মহাদেব আপনি এসে...”

বসন্তকুমারী সঙ্গে সঙ্গেই নাক নাড়া দিয়া ওঠেন, বলেন,—“তুমি বড়, আর ও গিয়ে নিজের মেয়ের জন্যে পাত্তোর খুঁজে বেড়াবে!—কি করে বের করলে কথাটা মুখ দিয়ে? বলিহারি!”

অন্নদাচরণ ঝামটাটা খাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া যান, ভারিক্কে হইবার চেষ্টা করিয়া বলেন,

—"আমি! আমি বসে আছি নাকি? হুঁ, জিগ্যেস করগে গিয়ে নিকুঞ্জদাকে, এমন দিনটি যায় না, যে দিন না..."

গিরিবালা আসিয়া না পড়িলে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাগাদা দেন—"কৈ গো গিরি, কতক্ষণ আর..."

কথাটা একেবারে সত্য না হইলেও নিতান্ত মিথ্যাও নয়। নিকুঞ্জলালকে ওদিকে দু-একবার বলিয়াছিলেন—এখন উল্টা তাগাদা ঠেকাইতে ঠেকাইতে প্রাণান্ত হইতেছে। নিকুঞ্জ প্রায়ই পাত্রের সন্ধান দেন—"পঁচিশ বিঘে জমি, এক গোয়াল গরু...একটু বয়েস হয়েছে ছেলের...তো ছেলের আবার বয়েস, তুমিও যেমন! হ্যাঁ, পারতে খরচপত্র করতে তো আলাদা কথা...কি বল?"

অন্নদাচরণ বলেন—"বেশ তো দাদা।"

নিকুঞ্জলাল আবার সন্ধান আনেন—"নাও, আজকাল 'পাস-পাস' এক ঢো হয়েছে। পাওয়া গেছে তোমার পাস করা ছেলে।...দোজবরে, এই কয়দিন হল বউটি মারা গেছে, বিশেষ কিছু নয়, একটি বছর আষ্টেকের ছেলে, একটি কোলের মেয়ে। গ্রামে বিষয়-আশায় যথেষ্ট...সনাতন তো ঝুলোঝুলি করছে, বলে দিয়েছি—অন্নদাকে কথা দিয়ে ফেলেছি...আগে নিজের লোক, তার পর অন্যের কথা।...কি বল?—দেখি?"

অন্নদাচরণ একটা ঢোঁক গিলিয়া বলেন—"বেশ তো দাদা, দেখবে বৈকি, এ তো খাসা ছেলে।"

বাঞ্ছনীয় পাত্রেরও আসে সন্ধান দু-একটা। অন্নদাচরণ বলেন—"বেশ তো দাদা, এ তো অতি উত্তম পাত্র।"

যত ভালো পাত্র, বিদায়ের সম্ভাবনা যত বেশি হইয়া ওঠে, মনটা ততই যেন কি রকম হইয়া পড়ে। বাড়িতে আসিয়া কৌশলে এদিক ওদিক দু-একটা কথা পাড়িয়া বলেন, "হ্যাঁগা, গিরিটার বয়স হল কত?"

বসন্তকুমারী বিস্মিত হইয়া বলেন—"সব সইতে পারি, ন্যাকামিটা সয় না; জান না, না দেখতে পাচ্ছ না?"

অন্নদাচরণ তাড়াতাড়ি বলেন—"আঃ, তোমাদের সঙ্গে কথা কওয়াও এক ফ্যাসাদ! মাস দিন ধরে ঠিকুজির বয়সের কথা বলছি।...ঠিকুজিটা বের করে দাও না হয়, একটি ছেলে পাওয়া গেছে, পাকা করে ফেলি। কারুর যেন গা নেই।"

বসন্তকুমারী রাগিয়া যান, বলেন—"তার জন্যে ঠিকুজি-কুষ্টির দরকার হয় না, চৌঠা-আশ্বিন জন্মেছিল, আশ্বিনে দশ বছর গেছে—কাত্তিক, অঘ্রাণ, পোষ, মাঘ, ফাগুন, চোত—এই ছ'মাস।...মেয়েছেলের বাড়তে দেরি হয়?..."

গর-গর করিতে করিতেই বাক্সর মধ্য হইতে ঠিকুজিটা বাহির করিয়া স্বামীর কোলে ফেলিয়া দেন, বলেন—"এইটুকু বা বাকি থাকে কেন, নিয়ে যাও; দেখাও, কি করবে করো। আসল কথা, গা নেই; না আছে নিজের, না আছে ভাইয়ের। সরি দিদি বিধবা মানুষ, দু-দুটো মেয়ে বিদায় করলে—দুটো বছর না ঘুরতে ঘুরতে।...এক কথার ঢং হয়েছে—কুষ্টি বের করে দাও!"

অন্নদাচরণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কোষ্ঠীর উপর দৃষ্টি ফেলিয়া বসিয়া থাকেন। ...দশ বছর ছ' মাস,—কিসের তাড়া এত? মাসখানেক একটু উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে

BanglaBook.org

বিবাহ হইয়া যাইবে, ভারি তো একটা মেয়ের বিবাহ!...তাও কানা হইত, খোঁড়া হইত, একটা ভাবনা ছিল।—গিরিবালা নাই এমন অবস্থায় বাড়িটি কল্পনা করিবার চেষ্টা করেন ; মনটা হাঁপাইয়া উঠে। শুধু কি তাই?—কোথায় পড়িবে, কেমন শাশুড়ী কেমন ননদ? ...এই তো চোখের সামনেই রহিয়াছে নিকুঞ্জদাদার স্ত্রী, সর্বদাই সশঙ্ক। মাত্র একটি ননদ, তাহাতেই এত! ভাবা যায়?—এই গিরিবালা, এত মুক্ত, সবার আদর মাখিয়া মাখিয়া কাজের মধ্যে, সেবার মধ্যে প্রতিনিয়তই বাড়িটাকে জীয়ন্ত করিয়া রাখিয়াছে, সে কোথায় এতটুকু বয়সেই ঘোমটা টানিয়া শাশুড়ীর বিরাগ, ননদের গঞ্জনা বাঁচাইয়া অতি সন্তর্পণে, অতি ধীরগতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভাবা যায়? ...রায়দের বউটি বিষ খাইয়া মারা গেল সেদিন। একটি লক্ষ্মী-প্রতিমা। অন্নদাচরণ গিয়াছিলেন দেখিতে,—বাড়ির কাহারও মুখে শোক দূরের কথা, নিজেদের জিনিস গেল বলিয়া যে একটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভাব তাহা পর্যন্ত যেন নাই। অবশ্য স্বামী ছিল না বাড়িতে, কিন্তু সে তো আর সবারটিও হইয়াছিল সংসারের মধ্যে।...অন্নদাচরণ এ চিত্র থেকে মনটাকে জোর করিয়া সরাইয়া লন,—না, না, সবাই কি রায়েদের বউই হয়? সবাই কি গঞ্জনাই খায়? আদর আছে বৈ কি, গিরি আদরই খাইবে, ওর কোষ্ঠীতে লেখা আছে সেকথা ; কোন্‌খানটায় যে লেখা আছে, সেদিন নিকুঞ্জদাদা পড়িয়া বেশ বুঝাইয়া দিলেন। অন্নদাচরণ যে সংস্কৃত বোঝেন না, নইলে এখনই বাহির করিয়া ফেলিতে পারিতেন।

তবে এটা ঠিক যে মেলা শাশুড়ী আর গুটিখানেক ননদের সংসারে মেয়ে দিবেন না অন্নদাচরণ, দিতে হইবে ছিমছাম দেখিয়া—শাশুড়ী, এক আধটা ননদ—তাহাও, বিবাহ হইয়া গেছে, নিজের নিজের লইয়া শ্বশুরবাড়ি থাকে, ক্বচিৎ কখনও আসে এই রকম দেখিয়া। ও হাঙ্গাম যত দূরে দূরে থাকে ততই ভালো।

ছেলেটি একটু দেখিয়া দিতে হইবে।...নিকুঞ্জদাদা শুধুই দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র টানিয়া তুলিতেছেন।...এইখানটায় আসিয়া অন্নদাচরণ একটু বেশি অন্যমনস্ক হইয়া যান—চিন্তা যেন একটা কেন্দ্রের চারিদিকে পাক খাইতে থাকে...দ্বিতীয় পক্ষ...দোষেরই বা কি এত? ...দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রের কাছে একটু আদর হয় বেশি, খানিকটা ভুগিয়া তাহারা একটু কর্তাগোছের হইয়া পড়ে কিনা। এদিকে একটি বউকে নিঃশেষ করিয়া শাশুড়ীও একটু ঠাণ্ডা হইয়া পড়ে—যদি নেহাৎই থাকে শাশুড়ী। যদি থাকিলই ও-পক্ষের দু-একটা সন্তান—ক্ষতি কি? গিরি একেবারে গিয়াই মা হইয়া বসিবে। সে-খাতিরেও সংসারে ওর একটা মর্যাদা থাকিবে। মোটের উপর যেখানে ভেজালের সম্ভাবনা—সেদিকে ঘেঁষা হইবে না। বিনি বা অল্প খরচে এই রকম দোজবরে হয়, তাহাই সই ; একটু খরচ করিয়া বেশ একটি ছোটখাটো সংসারের একটি ভালো ছেলে হয় তো কথাই নাই। তাহা হইলে আর সময় কই?

আন্নদাচরণ ঈষৎ চটিয়া ওঠেন, বলেন—"বিয়ে অমনি হয় না, চাই এক কাঁড়ি টাকা আজকাল। তা দেখেছে কেউ সেদিকে একটু চাড় ওর বাপের? কি করছে ও? এর চেয়ে যে মাঠে গিয়ে লাঙল ঠেললে গেরস্তর ঢের উবগার হত। চোখের সামনে একটা মেয়ে হু-হু করে বেড়ে উঠছে, পণ্ডিতমশাইয়ের ওখানে গিয়ে কাব্যি করবার ওর এই সময়? ও ঠাউরেছে কি আমায় বলতে পারে? যেখানেই যাও—'শুনছ হে, রসিকের তোমার হাতটা খুলেছে খুব'।...আরে, তাতে রসিকেরই বা কি? আর দাদারই বা কি? —বাড়িতে তো সেই ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। হাত খুলেছে, ভারি কেতাত্ত

BanglaBook.org

করেছে। আগে দানের হাতটা বন্ধ হোক দিকিন দাতাকর্ণের, তবে বুঝব, হ্যাঁ। তোর ঘাড়ে একটা অত বড় মেয়ে, তুই নিজের কড়াগণ্ডা বুঝে নিবিনি? হালদারের নাতনীটাকে আমতার গুপি ডাক্তার এলে দিয়ে চলে গেল—করকরে আটটি টাকা পকেটে নিয়ে। শেষে চাঙ্গা করলে তো ওই? ভেতরে একটা বস্তু আছে বলেই তো? কিন্তু কি পেলে একবার জিগ্যেস করো তো—দুটি টাকা। তার একটি দাতব্য করে একটি এনে দাদার হাতে তুলে দিলেন—তাতে তেল আনবে, কি ডাল আনবে, কি...”

ওদিককার ঘর থেকে বসন্তকুমারী চিৎকার করিয়া উঠিলেন—“বলি, গিরি, কানের মাথা খেয়েছিস্? তামাক দিয়ে মুখ বন্ধ কর, অকেজো মনিষ্যির গরগরানি আমার ভালো লাগে না। সে তেতেপুড়ে ফিরবে এই সময়টা, ওঁর সুর উঠল!...এই কান মলছি, আর যদি কখনও বিয়ের কথা তুলি। থাক্ মেয়ে আইবুড়ো থুবড়ি হয়ে ঘরে বসে। অদিষ্টে থাকে হবে বিয়ে, না থাকে বাপের দ্বারাও কিছু হবে না, জেঠার দ্বারাও কিছু হবে না।”

সুবিধা পাইয়া, অর্থাৎ জা ভাসুর থেকে কতকটা দূরে থাকায় বরদাসুন্দরী তাঁহার কাছে আসিয়া চাপা গলায় বলিলেন—“কি অন্যায়টা বলছেন দিদি?—বলতে দাও, এসে শুনুন। ভয় নেই, হাজার তেতেপুড়ে এলেও সে-মানুষের গায়ে আঁচ লাগবে না—তা যদি লাগত...”

বসন্তকুমারী আরও জোরে ঝঙ্কার করিয়া ওঠেন—“তুই চুপ কর ছোট বউ, তোকে আর ভাসুরের হয়ে ওকালতি করতে হবে না, বসন্তবামনি সবাইকেই চেনে ।..ও না হয় ওই ধরনের মানুষ—বোকাই বলো, আপন-ভোলাই বলো—লোকে ঠকিয়ে নেয়, মুখ ফুটে বলতে পারে না। পাপটা তো ও করে না? ভগবান ওকে ঐ রকম গড়েছেন, কি করবে? তুমি তো বড় ভাই—তুমি কোন্ তাদের বলে নিজেদের পাওনা-গণ্ডা আদায় করে আন? —বাড়ি বসে বসে শুধু...”

হুঁকা লইয়া অন্নদাচরণ বাহিরে গিয়া বসেন।

॥ ৪ ॥

বরদাসুন্দরীও সুযোগ খুঁজিতে থাকেন, তবে তাঁহার ভাগ্যে সুযোগ ঘটা বড় অল্প কথা নয়, অর্থাৎ ভাশুর এবং জা উভয়েই বাহিরে থাকা চাই, বেশ কিছুক্ষণের জন্য, এবং স্বামী বাড়ি থাকা চাই। এ যোগাযোগ দুর্লভ, তবে হইলে বরদাসুন্দরী ফস্কাইয়া যাইতে দেন না।

বর্ষার প্রথম বারিপাত—আকাশ বেশ ঘোর করিয়াই নামিয়াছে। মেঘের সরঞ্জাম দেখিয়াই অন্নদাচরণ সকালেই মুনিষ ঠিক করিবার জন্য বাহির হইয়া গেছেন, সেখান থেকে মাঠে যাইবেন, বীজ ছড়ানোর ব্যবস্থা করিতে হইবে। বসন্তকুমারী গেছেন সরি-দিদির বাড়ি, সরিদিদির প্রথম মেয়েটি আসন্ন-প্রসবা। এসব ব্যাপারে বসন্তকুমারীই গ্রামের লেডি-ডাক্তার, কখন আসিবেন ঠিক নাই, হয় তো নাও আসিতে পারেন আজ।

রসিকলাল বাড়িতেই আছেন। একবার হালদারের ওখানে যাইবার দরকার ছিল ; সকাল থেকেই সঞ্চীয়মান মেঘের স্তূপ তাঁহাকে কেমন আজ অন্যমনস্ক করিয়া দিয়াছে

BanglaBook.org

—যাই যাই করিয়া দেরি হইয়া গেল ; তাহার পর হঠাৎ একটা শীতল বায়ু আর গোটাকতক বিদ্যুৎঝলকের পর বৃষ্টি নামিয়া পড়িল,—কে যেন সমস্ত আকাশটার গায়ে একবার যাদুঅস্থি বুলাইয়া দিয়া কোথা থেকে কি একটা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটাইয়া বসিল।

বরদাসুন্দরী রান্নাঘরে পাক করিতেছেন। গিরিবালাও তাঁহারই কাছে। এ-ঘরের দাওয়ায় সাতকড়ি, হরু আর খোকা। সাতকড়ি ইস্কুলে বাহির হইতেছিল, বৃষ্টি নামিতে বই-শ্লেট ঘরে রাখিয়া দিয়া ভাই দুইটিকে লইয়া একটা খেলার মতলব আঁটিল,—সে ঘোড়া, খোকা কাকা—অর্থাৎ ডাক্তার এবং হরু হারাণ। হরিচরণ "আয় বৃষ্টি হেনে" বলিয়া ডাইনে বাঁয়ে দুলিয়া বর্ষার গান ধরিতেছিল, সাতকড়ি ধমক দিয়া থামাইয়া দিল, বলিল—"তুই না হারাণে হরু? ভুলে যাস কেন?"

হারাণ ঘুড়ির পিঠে দিবার জন্য ভিতরে কম্বল লইয়া আসিয়াছিল, আটকাইয়া গেছে ; দাওয়ার একদিকে কিনারাটিতে উবু হইয়া বসিয়া বর্ষা দেখিতেছে, মাঝে মাঝে ডান হাতটা যেন নিজে হইতেই এদিক-ওদিক চলিয়া চলিয়া যাইতেছে ;—হারাণ অন্যমনস্ক ভাবে তবলা খুঁজিতেছে।

কিসের একটা যেন ঘোরে রসিকলাল দাওয়ায় একটু পায়চারি করিলেন। নীরব ; অনন্তের কী একটা অনাবিল আনন্দে মুখে একটা স্মিত হাস্য ফুটিয়া উঠিয়াছে—সরসীর রসপুষ্ট পদ্মকলিটির মতো। আবিষ্ট ভাবে একটু ঘুরিলেন, তাহার পর হারাণকে বলিলেন —"নাঃ, আজ আর বেরুনো হবে না হারাণে। এক রকম বাধা। জ্বালাতন করে তুলছে।"

হারাণ নিষ্প্রয়োজন কথার উত্তর দেয় না। চুপ করিয়া যেমন ছিল সেইরূপই বসিয়া রহিল। রসিকলাল সিঁড়ির একটা ধাপ নামিয়া ডাকিলেন —"গিরি, একবার আসতে পারবি এ ঘরে? দেখিস যেন ভিজিসনি, নতুন জল, টোকাটা মাথায় দিয়ে আসবি।"

ভিতরে গেলেন এবং একটা পেটিকার মধ্যে হইতে খাতা আর কতকগুলা আগলা কাগজ লইয়া একটা মোড়ার উপর বসিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন।

গিরিবালা আসিল, এইটুকু আসিতেই টোকা সত্ত্বেও একটু একটু ভিজিয়া গিয়াছে। তবে লাগিয়াছে ভালো, পাড়ের কাছে কাপড়ের ধারটুকু একটু নিংড়াইয়া লইয়া, সমস্ত শরীরটিতে একটা আহ্লাদের শিহরণ তুলিয়া বলিল—"উঃ, কী তোড় বাবা, দু-পা না আসতে আসতেই ভিজিয়ে দিলে।...আজ আমি বাবা নাইব বিষ্টিতে—হ্যাঁ!"

রসিকলাল বলিলেন—'তোর গর্ভধারিণীকে জিগ্যেস করিস, বকাবকি করবে।"

একটু মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন—"আমি তো নাইবই।"

গিরিবালা বোধ হয় উঠানে স্নানরত পিতাকে ভালো করিয়া কল্পনা করিয়া লইবার জন্য একবার বাহিরের দিকে চাহিয়া দীপ্ত মুখে বলিল—"কী চমৎকার বাবা, না?"

কন্যার মনেও অনুরূপ স্পন্দনের সংবাদ পাইয়া রসিকলাল মুগ্ধদৃষ্টিতে খানিকটা তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন, যেন নিজেই উহার মধ্যে মুকুরিত হইয়া গেছেন। তাহার পর কতকটা আবিষ্টভাবেই বলিলেন—"প্রথম বর্ষা কিনা, লাগবেই ভালো। এমনি বর্ষা-জিনিসটাই চমৎকার কিনা..."

'কেন ডাকছ বাবা?"

"তোকে ডেকেছি, না?...কেন যে ডাকছিলাম!...কাজ করছিলি?"

"না, বসে ছিলাম মার কাছে। বলো না তুমি কি করতে হবে?"

রসিকলাল কথার মধ্যেই কাগজগুলো ওলটাইতেছিলেন। বলিলেন—"তোকে ডেকেছি—তুই কবে যেন একবার বলেছিলি না—তোমার পদ্যগুলো একবার শুনব বাবা—? তা, ফুলসতই হয় না..."

ওলটাইতেই লাগিলেন।

গিরিবালার মনে পড়িল না, এমন আবদার কখনও করিয়াছে বাপের কাছে। মনে করিবার বিশেষ কোন চেষ্টা না করিয়াই বলিল—"বলেছিলাম বৈকি সেদিন—হ্যাঁ বাবা, পড়ো না..."

"রোস্, অত উতলা হলে হয়?...তোর বাবাই যেন এক পদ্য লিখতে পারে, আর তো কেউ পারে না!...এই পেয়েছি, এইটেই শোনাই আগে।"

উঠানে জল দাঁড়াইয়া বর্ষার জলতরঙ্গ আরও জাগিয়া উঠিয়াছে, ঘাটের ঢালুতে স্রোতের কলতান উঠিল, ভেকের দল কণ্ঠসঙ্গীত তুলিল।...হাতের কাছের টোকাটা টানিয়া লইয়া হারাণের অঙ্গুলি তবলার বোলে মতিয়া উঠিয়াছে।...প্রভাত হইয়া পড়িল সন্ধ্যা, আর এই অকাল-সন্ধ্যার মলিন আলোয় গোটাকতক ঝিঁঝি জাগিয়া উঠিয়া একটা একটানা সুরের সূত্র দিয়া বর্ষাদিনের বিচিত্র সঙ্গীতগুলাকে গাঁথিয়া তুলিতে লাগিল। রসিকলাল আত্মহারা হইয়া পদ্য পড়িয়া যাইতেছেন। গিরিবালা বাপের হাঁটু দুটা জড়াইয়া মুখ তুলিয়া না-বোঝার পরম বিস্ময়ে শুনিয়া যাইতেছে। বরদাসুন্দরী দুই তিনবার ডাকিলেন, দুইবার-—"যাই মা" বলিয়া উত্তর দিল, একবার বিরক্ত ভাবে বাপকেই বলিল—"কী যেন মা, আমি একটু পদ্য শুনছি, তা..."

রসিকলাল একবারে আবিষ্ট হইয়া গেছেন। একটা পদ্য শেষ করিয়া নতুন একটা ধরার মুখে একটা-আধটা কথা বলিতেছেন—"এইটে স্কুলের সময়ের লেখা—পণ্ডিতমশাই সংশোধন করে দিয়েছিলেন, তাঁর নিজের হাতের লেখা, এই দেখ না কেমন মুক্তোর মতন অক্ষর গিরি! আজ পণ্ডিতমশাই নিশ্চয় মেঘদূত আরম্ভ করেছেন, খেয়েদেয়ে যাবই কোন রকমে...'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং বপ্রক্রীড়া পরিণতগজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ।' ...এটা পণ্ডিতমশাইয়ের বিদায়ের দিনে লেখা—যেদিন বর্ধমানে চাকরি নিয়ে গেলেন না?...এই পেয়েছি এইটে শোন গিরি—পদ্যটার নাম হচ্ছে—'নবীন বর্ষা'...আজ যেমন নতুন বর্ষা নেমেছে না?—এই রকম একটা দিনে লিখেছিলাম ; আজও একটা লিখব, দেখি নতুন কিছু ভাব আসে কিনা কলমের ডগায়। শোন্—

অম্বর ঘিরি একি গম্ভীরে বাজে আজি
শাখে শাখে কদম্ব শিহরে
শঙ্কর হর বুঝি ডম্বরু করে লয়ে
ভূতসাথে সদম্ভে বিহরে!

কেমন ছন্দটা বল দিকিন গিরি? বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক মিলে যাচ্ছে না?"

একবর্ণও না বুঝিলেও ছন্দের দোল লাগে মনে। করতলে চিবুকটা রাখিয়া গিরিবালা একটু দুলিয়া বসিয়া বলে—"চমৎকার বাবা! পড়ো, আরও আছে তো?"

"অনেকখানি এটা, শোন্ না।"

ও-ঘরের দাওয়া থেকে আবার ডাক পড়ে—"যাই" বলিয়া গিরিবালা মুখটা আবার

ঘুরাইয়া লয়, বলে—"মা যেন কী!"

রসিকলাল বলেন—"শোন্"—

তাণ্ডবে ক্ষিতিতল টলমল টলমল
তরুদল মূর্ছিয়া পড়ে যে,
লক্ষ-অযুতে কারা লক্ষিয়া বসুধরা
প্রলয়ের গর্জনে নামিছে।
চঞ্চল ফণিদল শঙ্কর-জটা ছাড়ি
নামে বুঝি মন্থিয়া আকাশে?
শঙ্কা নাহিরে, তারা উর্ধ্বেই আছে দেখ—
চিক্কুর-গর্জনে বিকাশে।
লঙ্ঘিয়া কতদেশ..."

এমন সময় অতি রুক্ষ কণ্ঠে—"কী হচ্ছে শুনি?"—বলিয়া বরদাসুন্দরী ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং বাপ ও মেয়ে উভয়েই তাঁহার দিকে চাহিয়া নিশ্চল হইয়া গেলেন।

বরদাসুন্দরী ভিজিয়া একশা হইয়া গেছেন, সমস্ত শরীর বহিয়া জলের ধারা নামিয়া পায়ের চারিদিকে জমা হইয়াছে। কাঁপিতেছেন—রাগে কি ঠাণ্ডায় বলা যায় না, তবে বেশ স্পষ্টই কাঁপিতেছেন। ইহারা চাহিতেই গিরিবালাকে লক্ষ্য করিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন—"কী হচ্ছে?—বলি হচ্ছে কি শুনি--তখন থেকে একটা মানুষ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে যে গলা ফাটিয়ে ফেলল্, তা কানে যাচ্ছে না একটা কথা?...কাজের কথা তো যাবে না কানে, তেমন মানুষ যে জন্মই দেয়নি!—নৈলে যার ঘরে একটা আইবুড়ো মেয়ে—সে-মানুষ বসে বসে রাশি রাশি ছড়া নিকে যেতে পারে? হায়া ঘেন্না বলে একটা জিনিস থাকে মানুষের—তা কিছু কি দেননি ভগবান? ওঠ্, ওঠ্ বলছি গিরি, নৈলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন—কচি খুকি, আদর কাড়িয়ে বাপের কাছে ছড়া শুনতে এসেছেন! যা, ভিজতে ভিজতে হাঁড়ি ঠেলগে যা। আমি পারব না; আমি পারব না, পারব না, পারব না—এ বাড়ির কোন কাজে, কোন কথায় যদি আর থাকি তো আমার অতি বড়-কোটি দিব্যি রইল।"

গিরিবালা বাপের হাঁটু ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। ভাবের ঘোরে এ ধরনের উগ্র ভর্ৎসনা খাইয়া বাপ-মেয়ে উভয়েরই অবস্থা অবর্ণনীয়; কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছে না। গিরিবালা দুয়ারের দিকে পা বাড়াইতেই বরদাসুন্দরী চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"কোথায় চলেছিস ঠ্যাকার করে শুনি?—তোর না এই ক'দিন আগে জ্বর হয়েছিল? ঠ্যাকার!—তেজ!—গটগটিয়ে চললেন মেয়ে এই পাহাড়ে-বিষ্টি মাথায় করে। যাঁর শিক্ষা তিনি নিজে কেন বসে রইলেন?—যান, বিষ্টি মাথায় করে রোজগার করতে! হবে যেতে—যার ঘড়ের ওপর বারো বছরের আইবুড়ো মেয়ে তার আবার রোদ-বিষ্টি কি?...হারাণে—কোথায় গেল সে?..."

ঘরের দুর্যোগ আরম্ভ হইতেই হারাণ তবলার বোল ভুলিয়া দাওয়ার যে কিনারায় ছিল সেই কিনারা হইতেই উঠানে নামিয়া পড়িয়া সিধা বাহির হইয়া গিয়াছিল, তাহার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

BanglaBook.org

বরদাসুন্দরী যেমন অকস্মাৎ আসিয়াছিলেন, সমস্ত তিরস্কার, মন্তব্য অসমাপ্ত রাখিয়া তেমনি ভাবেই অবারিত মস্তকে উঠান বাহিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

মা চলিয়া যাইতে গিরিবালা সেইভাবেই দাঁড়াইয়া অঞ্জলিতে মুখ চাপিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। রসিকলাল উঠিয়া দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইলেন, গিরিবালার কাছে আসিয়া দ্বিধাজড়িত পদে ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া বলিলেন—"চুপ কর গিরি।"—ঐটুকু দাঁড়াইতে আর ঐটুকু সান্ত্বনা দিতেও যেন ভয়—রান্নাঘরের দাওয়া থেকে বরদাসুন্দরী বুঝি টের পাইয়া গেলেন।

তাহার পর টোকাটা মাথায় দিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

ঘণ্টা দুয়েক বৃষ্টি রহিল এবং এই ঘণ্টা দুয়েক বাড়িটা থম্ থম্ করিতে লাগিল। হৃদয়াবেগটা প্রশমিত হইলে গিরিবালা পদ্য-লেখা কাগজপত্রগুলো পেটিকাতে তুলিয়া রাখিয়া, হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। এক-একবার মনটা আলোড়িত করিয়া চোখে জল ঠেলিয়া আসিতেছে, হাত দিয়া মুছিয়া লইতেছে। ছেলে তিনটি খেলা ভুলিয়া দাওয়ার এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে। খোকা এক-একবার সাহস করিয়া দাদাদের আবার খেলায় নামাইবার চেষ্টা করিতেছে, বিফলমনোরথ হইয়া আবার রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পাশটিতে গুটাইয়া সুটাইয়া বসিতেছে।

বরদাসুন্দরী আবার এ-ঘরে আসিলেন। গরগর করিতেছেন, তবে অনেক নরম গলায়—শেষ বর্ষণের বৃষ্টিধারার মতোই।—

"ওঠ্, খেয়ে নিবি চল্।...চিরকেলে অব্যেস মানুষের—পারে কখনও ছাড়তে? তবে অব্যেসটাই খারাপ, তাই বকতে হয়,—চিরকালটা কি কাব্যি নিয়ে থাকলেই চলে? দেখিস্, কাগোজগুনো যেন ছড়িয়ে না পড়ে—রেখেছিস তুলে? ছেলেগুনোকেও খাইয়ে দে গিরি, আমার শরীরটে যেন ভালো নেই, একটু শুইগে,—কোথায় যে গেল মানুষটা এই দুজ্জয় বিষ্টি মাথায় করে!..."

হারাণ প্রবেশ করিল। হারাণকে দেখিয়াই বরদাসুন্দরীর বকুনিটা একটু বাড়িয়া গেল —"হ্যাঁরে, আমি না হয় ঝোঁকের মাথায় বকলাম, তোর তো আক্কেল করতে হয়। লোকটা যে এই পাহাড়ে-বিষ্টি মাথায় করে রাগের ঝোঁকে রুগী দেখতে বেরিয়ে গেল, তুই কোন্ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বারণ করলি?"

হারাণ বিস্মিতভাবে বরদাসুন্দরীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"শোন কথা ছোট মায়ের! উনি তো এখানথে' বেইরে ওব্‌ধি এক পহর ধরে ছড়া শুনিয়ে শুনিয়ে আমায় ক্ষেপিয়ে তুলেছেন।—একটা মানুষ অমন দাবড়ানিটা খেয়ে বেইরে এয়েছে, বলতেও পারি না কিছু ;—বসে বসে নরকযন্ত্রণায় ভুগছি।...বারণ।—যাবার জন্যে পা বাড়ালে তো বারণ করব? আর তাও বারণই বা করবো কাকে কও দিকিন?—মণ্ডলের মায়ের পেটে ফিক ব্যথা উঠেছে, ডাকতে এল, গেলে ডবল বিজিট কবলালে, তা নড়লেন এক পা? ...দাও, তেল চেয়ে পাট্যেচে...বলেন—'তুই কোন্ বারণ করলি'!..."

বরদাসুন্দরী হাসিটা চাপিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। হাসির সঙ্গেই একটু দুঃখের ভাব মিশাইয়া বলিলেন—"ওই শোন্ গিরি, তোরা বলিস মা বকে কিসের জন্যে ; —মেয়ের কাছে জুৎ হল না, চাকরের কাছে ছড়া কাটছে।...মরিঃ, কারেই বা বলা! মানুষ

হয় তবে তো ;—উনি বিষ্টি মাথায় করে রোজগারে বেরুবেন! আমি আবার মন খারাপ করে ছেলেগুনোকে পয্যন্ত শুকিয়ে রেখেছি, পোড়া কপাল!...তা আধিখ্যেতা কেন? ভেতরেই আসতে বল্‌গে।"

॥ ৫ ॥

সিমুরের চৌধুরীদের বাড়িতে রাসের মতো শ্রাবণ মাসে ঝুলনটাও খুব ঘটা করিয়া হয়। রসিকলাল একদিন গিয়া গিরিবালা সাতকড়ি আর হরিচরণেকে রাখিয়া আসিয়াছেন। জায়গাটা বড়, তা-ভিন্ন অনেক বাড়িতেই ঝুলন উপলক্ষে কুটম্ব সাক্ষাতের আমদানি হয় বলিয়া এই সময়টা অনেক লোকজন হয় ; মেয়ে দেখাইয়া বিবাহের সম্বন্ধ করিবার মস্ত একটা সুযোগ। গিরিবালারা সমস্ত ঝুলনটা ওখানেই কাটাইবে।

নিকুঞ্জলাল একটা দিন-মজুরের সঙ্গে পাওনা লইয়া কথাবার্তা কহিতেছেন। মজুর রাখায় নিকুঞ্জলাল একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেন।—প্রথমত, নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে কখনও কাছে-পিঠের লোককে নিয়োগ করেন না; তেমনি আবার সুস্থ-সবল লোককেও নিয়োগ করেন না। বলেন—"আহা দুর্বল, কেউ ডাকে না, তবুও দুটো পয়সা যা পায়। লোক দেখিয়ে যে দান-ধ্যান করব সে-অদেষ্ট তো করে আসিনি, এই করেই গরীব দুঃখীদের ঘরে যা দুটো পয়সা পৌঁছে দিতে পারি।"

অবশ্য এরূপ দয়ার পাত্র যে একবার কাজ লয়, সে আর দ্বিতীয়বার এ পথ মাড়ায় না, তবুও একবার ধরা পড়িবার মতো হতভাগ্যও চারিদিকে বহুৎ, নিকুঞ্জলালের কাজ চলিয়াই যায়।

মজুরটা কাতরভাবে বলিতেছে—"একে তো আধা মজুরিতে কাজ করনু বাবাঠাকুর, তায় এই ক'টা পয়সার জন্যে চার কোশ থেকে তিনবার হেঁটে আসতে হল। আর পারি না ; শরীল কখনো বয়—আপনিই কন্ না?"

নিকুঞ্জলাল বলিতেছেন—"এই জন্যেই বলে, তোদের ছোটলোকদের ভালো করতে নেই কখনও। ঐ শরীরে তুই কত কাজ করবি যে তোকে পুরো মজুরি দিতে হবে বল? রেট খারাপ করে তো গেরস্তদের শাপমণ্যি কুড়োতে পারিনে? তোকে পুরো দিলে যারা সক্ষম তারা ডবল চাইবে না গেরস্তদের কাছে?—তখন?"

মজুরটা বলিতেছে—"যা জোরে পারিনি তা বেশি খেটে হাঁসিল করে দিয়েছি বাবাঠাকুর। যারা সক্ষম, যারা কাজের, তারা খেতে বাড়ি যেতেই কতটা পুষিয়ে নেয় কন্ না কেন? একমুঠো ভাজাভুজি মুখে দিয়ে নাগাড়ে তো খেটে গেছি, নইলে চারটে দিনে অতটা জঙ্গল পস্কের করা যায়? সক্ষম দুটো লোকেও পারত না ; আপনি কাউকেই ডেকে জিগুন না কেন!"

নিকুঞ্জলাল বলিতেছেন—"ঘাট হয়েছে বাপু, ভেবেছিলাম মজুর, এখন দেখছি এক তর্কপঞ্চাননের পাল্লায় পড়েছিলাম। তা বেশ, তিনবার হেঁটে এসেছিস, খালি হাতে তো ফিরে যেতে হয়নি? বারো আনা থেকে কুল্যে পাঁচ আনায় ঠেকেছে,—নিয়ে যাবি, তার আর কি?—গেরস্তর হাতে তো সব সময় থাকে না পয়সা..."

মজুরটা পায়ের কাছে বসিয়া কাতরাইতেছে—"না বাবু, আপনি রাজা, এই ক'টা

BanglaBook.org

পয়সার জন্যে গরীবকে ঘোরাবেন না। বাদল নামল, পথের কষ্ট, তার ওপর আবার জ্বর নেগেছে, দেন চুকিয়ে, শরীল আর বয় না বাবাঠাকুর।"

নিকুঞ্জলাল বলিতেছেন—"হ্যাঁ, তাগাদা বলতে হয় তো একে! চার কোশ দূরে থাকিস, বলছিস শরীর বইছে না, তার ওপর তো তাগাদার চোটে ভিটের মাটি তুলে ফেলছিস, কাছে-পিঠে থাকলে যে কি করতিস!...বলছি নিয়ে যাস, বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে না তো মান্‌ষে? সক্কালবেলা থেকে দিয়ে-থুয়ে হাতে ছ'টি পয়সা ঠেকেছে ; তুই আগে আসতিস তো তোকেই চুকিয়ে দিতুম।"

মজুরটা বলিতেছে—"চার কোশ পথ হেঁটে এর আগে আসা যায়?—আপনিই কন্‌ বাবাঠাকুর? দেন চুকিয়ে, দোহাই।"

নিকুঞ্জলাল অসহায়ভাবে বলিতেছেন—"এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! তা নিয়ে যা ঐ ছ'টা পয়সা, কি আর করব? মেছুনি এলে বুঝিয়ে বলব। হোক মেয়েমানুষ, সে বরং বুঝবে।"

মজুরটা পা জড়াইয়া ধরিয়াছে, বলিতেছে—"তাহলে আর ছ'টা পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দেন বাবাঠাকুর, আর এসবোনি। মনে করব..."

এমন সময় হুই-হাঁই শব্দ করিতে করিতে সামনের রাস্তায় কয়েকজন ঢুলি একটা পালকি নামাইল। পালকির দোরটা একটু টানা বলিয়া ভেতরটা দেখা যায় না। সঙ্গে একজন পাইকবরকন্দাজ গোছের লোক আছে। দুই একজন ব্যক্তি জড়ো হইলে সে প্রশ্ন করিল—"এখানে নিকুঞ্জ ঘটক-ঠাকুরের বাড়িটা কোথায় বলতে পার?"

নিকুঞ্জলাল ফতুয়ার পকেট থেকে আড়াই গণ্ডা পয়সা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"নে তাহলে, আর এক আনা পয়সা ছেলেদের মুড়ির জন্যে রেখেছিলাম, তুই-ই নিয়ে যা ; কিন্তু খবরদার আর এ-মুখো হসনি—ভদ্রলোকের বাড়িতে খাটবার যুগ্যি নোস্‌।...কে আবার এল দেখিগে।"

মাঝখানে একটা বাগান পড়ে, সেটা পারাইয়া আসিতে আসিতেই নিকুঞ্জ বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আরে, পরেশ যে!—তুমি হঠাৎ কোথা থেকে?"

পা চালাইয়া গিয়া পালকির সামনে উপস্থিত হইলেন। পালকির আরোহী লোকটি বাহির হইয়া নিকুঞ্জলালের পদধূলি গ্রহণ করিল, তাহার পর ঈষৎ লজ্জিতভাবে মুখটা অল্প নিচু করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল—"অনেকদিন পায়ের ধুলো দেননি, মনে করলাম একবার নিজেই গিয়ে নিয়ে আসি।"

চেষ্টা করিয়াই হোক, অথবা স্বভাবসিদ্ধই হোক—কথাটাতেও একটু ছেলেমানুষি আবদারে ভাব আছে।

বর্ণটা কালোই, তবে মাজাঘষা; মাথায় টাক, চুল গোটাকতক যা আছে তাহাতে বোধ হয় পাক ধরিয়াছে, একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে মাঝে মাঝে কলপের কটাশে রংটা চোখে পড়ে, মোটা গোঁফ জোড়াটিরও সেই অবস্থা।

মাথায় একটু খর্বই ; এদিকে আড়ে বেশ ফাঁদাল। বয়স পঁয়তাল্লিশের এদিকে ওদিকে একটা কিছু হওয়া সম্ভব,—অর্থাৎ আধ আধ কথা বলিবার মতো নয়, লজ্জা করিবার মতোও নয়, এমন কি নিকুঞ্জলালকে প্রণাম করিবার মতোও নয়, কেন না নিকুঞ্জলালের বয়স পঁয়তাল্লিশের নিচেই।

আগন্তুকের গায়ে দামী সাটিনের চীনে কোট, গলায় পাট-করা একটি দামী রেশমের চাদর, পরনে গিলে-করা ফরেশডাঙ্গার কালোপেড়ে ধুতি, পায়ে সিল্কের মোজা এবং গিল্‌টি সোনার ফুলকাটা বকলস্‌ বসানো চীনেবাড়ির দামী পম্পশ্যু।...এসবের উপর আবার সঙ্গে একজন পাইক; বেশ লোক জড়ো হইয়া গেল।

পদধূলি গ্রহণ করিতে নিকুঞ্জলাল মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—"বেশ করেছ, খুব ভালো করেছ। আমার মনটাও ক'দিন থেকে বড় উতলা হয়েছিল—হবেই কি-না, সম্বন্ধটা তো সোজা নয়; শাস্ত্রে বলে গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধটা হল পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ—মনটা টানবেই কিনা। হাতের গোটাকতক কাজ সেরেই যাচ্ছিলাম, তা এসে ভালোই করেছ।...চলো, এসো; আর বাবাজি, যা গুরুর বাড়ি; একটা কুঁড়ে বললেই হয়, এ কি আর তোমাদের থাকবার যুগ্যি?"

দলটি পিছনে পিছনে চলিয়াছে। নিকুঞ্জলাল আলাপচ্ছলে যে পরিচয়টুকু দিয়া যাইতেছেন সেইটুকু লইয়াই বিস্মিত আন্দাজ-আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেছে। উঁহারা দুইজনে ঘরে প্রবেশ করিতে দলটি দুয়ার এবং জানলার বাহিরে চারাইয়া পড়িল। গুমট গরম পড়িয়াছে, নিকুঞ্জলাল থাকিয়া থাকিয়া সরাইয়া দিতেছেন, যাহাতে ঘরে একটু হাওয়া আসে। দলটা সরিয়া গিয়া আবার বর্ধিত কৌতূহলে আসিয়া জড়ো হইতেছে। কিন্তু নিকুঞ্জলাল অত কাঁচা নন যে একেবারে সব পরিচয়টা দিয়া ব্যাপারটাকে হালকা করিয়া দিবেন। কুশল প্রশ্নাদি প্রাথমিক কথাবার্তার মধ্যেই পাখার হাওয়া খাইয়া খানিকটা জিরাইয়া আগন্তুক জামা-জুতা খুলিয়া তাকিয়া আশ্রয় করিল। স্থূল শরীর ঢাকিয়া বুকে-পিঠে রাশীকৃত চুলও আছে—দলের লোকেরা এর অধিক পরিচয় যখন আপাতত কোনমতেই পাইল না, তখন অল্পে অল্পে পাতলা হইতে লাগিল।

আরও খানিকক্ষণ গেল। মিছরির সরবৎ, ফলমূল, কিছু মিষ্টান্ন সেবন করিয়া আগন্তুক ঠাণ্ডা হইল, তাহার পর কৌতূহলীদের যখন আর কেহই বাকি নাই সেই সময় আসল কথা আরম্ভ হইল। গুমট করিয়াছিল, একটু পরে বর্ষা নামিল, বিশ্রম্ভালাপে সুবিধাও হইল।

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"একটু দেরি করে ফেললে পরেশ, মেয়েটি পরশু মামার বাড়ি চলে গেছে। আমি আকুলি-বিকুলি করে মরছি পরেশ এখনও আসে না কেন। পষ্ট বলতে তো পারি না, তবুও ছুতোনাতা করে ওর বাপকে দুটো দিন রেখেছিলাম, আর পারা গেল না, শ্বশুরবাড়ির টান, বোঝই তো বাবাজি—হি-হি-হি,...তা ঐ যে বললাম মেয়ে দেখতে হবে না, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণটি।"

পরেশনাথ শিষ্যোচিত লজ্জা ও বিনয়ের সহিত বলিল—"মেয়ে দেখবার তো আমার কোন দরকার নেই, আপনি নিজেই যখন রয়েছেন তখন আর কথা কি? তবে বিলম্বটা আর ঠিক হচ্ছে না, তাই ভাবলাম নিজে গিয়েই গুরুদেবকে বলি, বার বার তাঁকে ডেকে আনানো ঠিক নয়—অবিশ্যি পায়ের ধুলো পড়লেই আমার ভাগ্যি...তাহলেও নিজেই যাই একবার। গুরুগৃহের মতন তীর্থ তো আর নেই; অনেক দিন থেকে একটা সাধ আছে। থাকত মেয়ে, দেখে যেতাম, সে আলাদা কথা। আসল দরকার একটু তাড়াতাড়ি যাতে..."

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"আমার চেষ্টার বিরাম নেই বাবাজি, তবে বেশি তাড়াহুড়ো করতে গেলে আবার এ-সব ব্যাপার ভেস্তে যায়। বুঝতেই তো পার? বড়টিকে বুঝিয়ে-

BanglaBook.org

সুঝিয়ে অনেকটা হাতে এনেছি। দোজপক্ষের জন্যে তার আর তেমন আপত্তি নেই। অবিশ্যি কে ছেলে, কত বয়স, কি বৃত্তান্ত—সেটা সইয়ে সইয়ে ভাঙতে হবে। তবে তাকে করবই রাজী—এ তুমি অবধারিত জেনো বাবাজি, বড়কে রাজী করব। মুশকিল হয়েছে ছোটকে, অর্থাৎ মেয়ের বাপকে নিয়ে। সে এক আধ-পাগলা মানুষ—মাথায় কে ঢুকিয়ে দিয়েছে, মেয়ে ওর পার্বতী, শিব এসে তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে। দিনকতক তো 'গৌরীদান করব, গৌরীদান করব' বলে খুব খেপলো, সে-ফাঁড়া কাটিয়ে মেয়ে তো এখন তেরোতে পড়েছে, এখন মাথায় বসে গেছে শিব নিজে মানুষের বেশে এসে ওর মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে।...এ পাগলামিও ঘুচবে, তবে নেহাত বাপ, শেষ পর্যন্ত না আবার উল্টে বসে, তাই একটু সাবধানে পা টিপে এগুনো...”

আগন্তুক বলিল—“আপনি যা ভাল বুঝবেন তার ওপর আমার আর কি বলবার আছে? তবে খুব দেরি যাতে না হয়...মানে সংসারটা ভেসে যাচ্ছে কি-না...বছর খানেকের বেশি যাতে না যায়...”

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—“এই আসছে মাঘ-ফাল্গুন, তার বেশি এগুতে দোব না, নিশ্চিন্ত থাকো।...হ্যাঁ, তুমি যখন এ সইছ, তখন কাজ খানিকটা এগিয়ে ফেলা যাক। বড়কে ডেকে তোমার সঙ্গে আলাপটা করিয়ে দিই। ওসব কথা এখন স্রেফ কিছু নয়, শুধু একটু চেনা-শোনা আলাপ-পরিচয় হয়ে থাকা, পরে আমার কথাবার্তা পাড়তে সুবিধে হবে। খুব সাবধানে চালিয়ে যেও তুমি—বরং একটা পরামর্শ করে ফেলি এস।...তাহলে কিন্তু তোমার আর সন্ধ্যের গাড়িতে ফেরা হয় না।”

অনেকক্ষণ ধরিয়া দুইজনে সলা পরামর্শ হইল। পাইকটাকে বলিয়া রাখা হইল—দরকারী মকদ্দমার কথাবার্তা হইতেছে, কেহ আসিতে থাকিলে সে যেন পূর্বাহ্ণেই সঙ্কেত করিয়া দেয়।

বৃষ্টিটা ঘণ্টাখানেক পরে ধরিলে নিকুঞ্জলাল নন্তীকে পাঠাইয়া দিলেন অন্নদাচরণকে ডাকিয়া আনিতে। আগন্তুক আবার জামা মোজা পরিয়া মোটা সোনার-ঘড়ির চেনটা বুকে দুলাইয়া ভব্যসভ্য হইয়া বসিল।

অন্নদাচরণ আসিলে নিকুঞ্জলাল বলিয়া উঠিলেন—“এসো, এসো অন্নদা। পরেশ বলে—বেলে-তেজপুরে এলাম, এখানে সমাজে যাঁরা বিশিষ্ট তাঁদের সঙ্গে একটু দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় না করে গেলে মনটা খুঁৎ খুঁৎ করবে।...আমি বললাম—বিশিষ্ট লোক—মানে, একটা ন্যায্য কথা বললে বোঝে, পাঁচটা ভালো কথা নিয়ে চর্চা করে—মানে, চারিদিক দিয়ে আলাপ করবার মতন আমি তো অন্নদাকেই দেখি, আর লোক আছে কে বেলে-তেজপুরে? অবিশ্যি থাকবে না কেন, রায়েরা রয়েছে, সাহারা দুই ভাই রয়েছে—টাকার আণ্ডিল, কেবল বড় বড় কথা, সেদিক দিয়ে খুব বড়, খুব বিশিষ্ট...পরেশ হেসে বলে—না, টাকায় বড় ঢের দেখেছি, রোজই দেখছি ; যাঁর সঙ্গে দুটো ভালো আলাপ করে আরাম পাব, এমন লোকের সঙ্গই চাই দু'দণ্ড। তাই তোমায় ডেকে পাঠালুম, কাজের ক্ষতি করে আসতে হল নাকি?”

অন্নদাচরণ কতকটা অভ্যর্থনা এবং পরিচয়ের ভঙ্গিতে, কতকটা আগন্তুকের সাঙ্গোপাঙ্গ এবং বেশভূষার জাঁকে এবং সর্বোপরি বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও তাহার সম্বন্ধে নিকুঞ্জলালের কনিষ্ঠের উপযোগী ভাষা প্রয়োগে বেশ একটু হকচকিয়া গিয়াছিলেন ; একটু

BanglaBook.org

জড়িতভাবে চৌকির একটা কোণে বসিয়া নবলব্ধ বিশিষ্টতা অনুযায়ী কি একটা মানানসই প্রশ্ন করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় আরও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার ঘটিল।—আগন্তুক স্থূল বপুটি দুইধারে একটু দুলাইয়া উঠিয়া পড়িল এবং পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া অন্নদাচরণের সামনে রাখিয়া ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল।

"ওকি করেন, ওকি করেন, বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি।"—বলিয়া অন্নদাচরণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিতে যাইতেছিলেন, নিকুঞ্জলাল জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আমি জানতাম তুমিও ঐ ভুল করবে অন্নদা। ওর অধিকার আছে প্রণামের, করুক ; বয়োজ্যেষ্ঠ-টেষ্ঠো নয়, ছেলেবেলা থেকে চেহারাটা একটু ভারী-ভারী—সবাইকেই ঐ ভুল করতে হয়—হাঃ হা—হা— ।...কিন্তু তুমি আবার ওকি করলে পরেশ! আবার টাকা কেন বাপু?"

আগন্তুক হাতটা অন্নদাচরণের দুই পায়ে ঠেকাইয়া বুক এবং মাথা স্পর্শ করিয়া সেই অল্প আধ-আধ স্বরে বলিল—"সে কি কথা গুরুদেব! আপনার ভাই, কত সৌভাগ্যে পায়ের ধুলো পেলাম, দুটো টাকা প্রণামী দেব বৈকি, এত বারণ করলে শুনব কেন?"

সলজ্জ গতিতে গিয়া নিজের জায়গায় বসিলে নিকুঞ্জলাল অন্নদাচরণকে বলিলেন—"নাও তুলে, ও ঐ রকম একগুঁয়ে ছাড়বে না। অবিশ্যি ওর অধিকার যে আছে একথাও স্বীকার করতে হবে বৈকি, আমার শিষ্যি হলে তোমার সঙ্গে সেই সম্বন্ধই দাঁড়াল কিনা!...পরেশ হল হরিপুরের গাঙ্গুলীদের ছ-আনি শরিক—এখনকার বড় তরফ আর কি। বংশমর্যাদায় বলো, প্রতিপত্তিতে বলো, অর্থে বলো, অত বড় জমিদার আর ও-অঞ্চলে..."

পরেশ গাঙ্গুলী বিনয়ে একটু হেলিয়া গেল, বলিল—"অর্থ কোথায় গুরুদেব? আশ মিটিয়ে যে আপনাদের সেবা করব এমন সামর্থ্যটুকু পর্যন্ত নেই ; কত কথাই যে মনে হয়!...তবে হ্যাঁ, গুরুবল আছে, চলে যায়—অভাব-অপ্রতুলটা আর ভোগ করতে হয় না..."

অন্নদাচরণের দিকে চাহিয়া বলিল—"এইটুকুই কি যথেষ্ট নয়? এইটুকুতেই কি আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত নয়?"

হরিপুর এখান থেকে বহুদূর হইলেও গাঙ্গুলীদের নাম-ডাকের পরিচয় মাঝে মাঝে কানে আসে, সেখানকারই ছ-আনি তরফের মালিককে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে এত কাছে দেখিয়া অন্নদাচরণ সত্যই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নিকুঞ্জলালের উপরও কোথা দিয়া একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিতেছিল। একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন—"এ তো অতি মহতের মতন কথা, আপনার উপযুক্তই কথা..."

পরেশ গাঙ্গুলী ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত অল্প একটু হাসিয়া,—মাথাটা নিচু করিয়া বলিল—"আমায় 'আপনি' বলেই ডাকতে থাকবেন?"

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"ওটা ক্রমেই শুধরে যাবে, ওর জন্য তুমি খেদ করো না। আর অন্নদার চেয়ে তুমি খুব ছোট তো নয়ও, বছর দুয়েকের হদ্দ হবে, বোধ হয় তাও নয়। আলাপ-পরিচয় বাড়বার সঙ্গে ওটুকু কেটে যাবে।...ভুলছ কেন গো?—নতুন নতুন তো আমিও তোমায় আপনি ছাড়া বলতে পারতাম না।"

অন্নদাচরণ বিজ্ঞ এবং বিশিষ্ট লোকের মতো একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইলেন, বলিলেন—"তুমি ওর কুলগুরু, আমার দাদা—আমাদের উভয়েরই নমস্য, তোমার সব

মানায় ; কিন্তু তাই বলে যে আমারও ওঁকে উপযুক্ত সম্ভাষণ করলে দোষ হবে—একথা মানবো কেন দাদা—দেশের রাজা, বয়সে কনিষ্ঠ হলেও সে সমাজের শীর্ষস্থানীয়। রাজা বিনয়ী হন, তাঁর গুণ, তাঁর দয়া ; তাতে তো তিনি ছোট হন না, বরং আরও বড়ই হয়ে পড়েন ; তাঁর সঙ্গে আলাপে আমাদের এ সোজা কথাটুকু ভুললে চলবে কেন?"

নিকুঞ্জলাল হুঁকা অবলম্বন করিয়া মৃদু হাসিতেছিলেন, অন্নদাচরণ শেষ করিলে —মুখ তুলিয়া পরেশ গাঙ্গুলীর পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"শুনলে তো? এখন দাও উত্তুর।...না, বেফাঁস তো কিছু বলেনি অন্নদা, বলেছে খাঁটি কথাই, ওর উপযুক্ত কথাই। আর বলবেই কিনা, নৈলে তুমি ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলে, সবাইকে ফেলে আমি নিজের ছোট ভাইটিকে ডাকিয়ে আনাই কেন?...না, দিতে হবে উত্তুর তোমায়, উঁহু..."

পরেশ গাঙ্গুলী মাথা নিচু করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত উভয়ের কথাই শুনিয়া যাইতেছিল, মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে দুলাইয়া বলিল—"এর উত্তুর আমার কাছে নেই, হার মানলাম গুরুদেব। তবে এও বলি, যদি মেনে নিতেই হয়—রাজা, তো সে আর সবার কাছে, আপনার কাছে নয়, ওনার কাছেও নয় ; আপনাদের কাছে স্নেহই আশা করি, আর যদি দেখি সামান্য একটি সম্ভাষণের মধ্যেও সে স্নেহ ছাড়া অন্য ভাব আসছে তো আপত্তি করতেও ছাড়ব না।"

উত্তর দেওয়ায় অক্ষম বলিয়া জানাইলেও বেশ ভালো উত্তরই দেওয়া হইল। শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে পরেশ গাঙ্গুলী বেশ ভালো ভাবেই হাসিয়া উঠিল। নিকুঞ্জলাল আবার হুঁকায় মুখ লাগাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, একবার আড়চোখে যেন শিষ্যগৌরবে অন্নদাচরণের পানে চাহিলেন। অন্নদাচরণ বলিলেন—"সাধু, সাধু ;—নৈলে আর রাজার সৌজন্য বলেছে কেন?...বাঃ, পরিচয় পেয়ে, আলাপ করে ধন্য হলাম।...সাধু!"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা হইল, খুব হৃদ্যতা জমিয়া উঠিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল, পরেশ গাঙ্গুলী বরকন্দাজকে ডাকিয়া পালকি ঠিক করিতে হুকুম দিল, তাহার পর নিকুঞ্জলালের পানে চাহিয়া বলিল—"এরকম মহাশয় পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গ ছেড়ে যেতে মন সরছে না গুরুদেব, থেকে যেতাম রাতটা, আমার তীর্থধামই তো, কিন্তু জানেনই তো কি রকম হ্যাঙ্গামে পড়ে আছি কটা ব্যাপার নিয়ে?"

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"তা জানি বৈকি। শুনতেই রাজা, রাজত্ব করাটা যে কী তা দেখছিই।...অন্নদার সঙ্গে মাত্র ঘণ্টা দু'একের আলাপে তৃপ্তি তো হয়ই না। তা তোমার বক্তব্যটা কি?"

পরেশ গাঙ্গুলী কুণ্ঠিতভাবে বলিল—"বলতে সাহস হয় না। গুরু বা গুরুবংশীয় কাউকে হুট করে আহ্বান করলেই হল না তো ; তবুও যদি দিতেন পায়ের ধুলো একবার উনি..."

শেষের দিকটায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অন্নদার পানে চাহিল। অপ্রত্যাশিত এত বড় একটা নিমন্ত্রণে তিনি একটু সঙ্কুচিত দৃষ্টিতেই নিকুঞ্জলালের পানে চাহিলেন। নিকুঞ্জলাল ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"বুঝি, তোমারও অনেক কাজ হাতে! কিন্তু যেতে হবে একবার। পরেশ বলছে অত করে, কি আর করবে?"

পালকিতে উঠিয়া পরেশনাথ আবার পকেট থেকে দশটি টাকা বাহির করিয়া

BanglaBook.org

নিকুঞ্জলালের হাতে দিল, বলিল—“দু'বাড়ির ছেলেপুলেদের মিষ্টি খাবার জন্যে এটা রাখুন, ভুলেই যাচ্ছিলাম কথায় কথায়।”

নিকুঞ্জলাল সঙ্গে সঙ্গেই অন্নদাচরণের দক্ষিণ হস্তটা টানিয়া লইয়া একরকম জোর করিয়া টাকা কয়টা গুঁজিয়া দিলেন, বলিলেন—“আমার বাড়ির ছেলেপুলে বলতে তো এক ঐ নন্তী। তুমি মিষ্টি-টিষ্টি কিনে দুটো কিছু পাঠিয়ে দিও অন্নদা।”

বাড়িতে আসিতে আসিতে অন্নদাচরণের মনে হইল পৃথিবীতে যখন এমন সরল আর উদারপ্রকৃতির জমিদার থাকা সম্ভব, তখন নিশ্চয় এটাও সম্ভব যে নিকুঞ্জলালের সম্বন্ধে তিনি একটা ভুল ধারণাই পোষণ করিয়া আসিয়াছেন এতদিন। যতক্ষণ জাগিয়া রহিলেন মনটা একটা প্রীতি আর ক্ষমার রসে পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

পরদিন সকালে নন্তী গিয়া আবার অন্নদাচরণকে ডাকিয়া আনিল। নিকুঞ্জলাল একটা কিসের দলিল লইয়া হুঁকা-হাতে মনোযোগ সহকারে অনুধাবন করিতেছিলেন, একবার অন্নদাচরণকে দেখিয়া লইয়া বলিলেন—“বসো।”

একটু পরে দলিলটা মুড়িয়া পাশে রাখিয়া দিয়া বলিলেন—“কাল রাত্তিরেই ডেকে পাঠাব ভেবেছিলাম, তা শরীরটা কেমন করতে লাগল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। জমিদার-শিষ্যি ও শুনতেই ভালো, এলে মস্ত বড় ধুকপুকুনি লেগে থাকে কিনা—কি ত্রুটি হল, কি খেলাপ হল,—তোমার কাছে তো নুকুনো নেই ; ভালোয় ভালোয় যেন বিদেয় হলেই ভালো।”

অন্তরের গোপনীয় কথাটি বলার সঙ্গে একটু হাস্য করিলেন। অন্নদাচরণ বলিলেন —“তা বৈকি।”

নিকুঞ্জলাল তামাক টানিতে লাগিলেন। একটু পরে সেই ভাবেই—শুধু একটি তির্যকদৃষ্টিতে অন্নদাচরণের মুখের পানে চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন—“কেমন বোধ হল লোকটিকে বলো দিকিন?”

প্রশ্নটা করার ভঙ্গিতে অন্নদাচরণ একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠেই বলিলেন—“কেন, আমার তো বেশ ভালই বোধ হল দাদা। কেন বলুন তো?”

নিকুঞ্জলাল তামাকটা একটু টানিয়া হুঁকটা পিতলের বৈঠকে বসাইয়া দিলেন। তাহার পর কলিকাটা আবার সাজিয়া দিবার জন্য নন্তীকে একটা হাঁক দিয়া বলিলেন—“না, ভালোই। কতকগুলো বড়মানষি খামখেয়ালিপনা আছে।—যেমন ধরো এই বয়স কমিয়ে বলা,—তা সে অত ধরা চলে না—অমন পায়ের ওপর পা দিয়ে খাবার সংস্থান থাকলে তোমার আমারও হত...”

নিকুঞ্জলাল মাথাটা একটু হেলাইয়া বলিলেন—“মনে হওয়া-হওয়ি নয়, বেশিই ; আমার কাছে তো নুকুনো নেই—কুষ্টি-ঠিকুজি পর্যন্ত তোয়ের করে দিতে হয়েছে। তবে হ্যাঁ, আমার চেয়ে ছোটই ; তবে তোমার চেয়ে বড়ই ; তোমার কত যাচ্ছে?”

অন্নদাচরণ বলিলেন—“আমার এই চোতে একচল্লিশ গেল।”

নিকুঞ্জলাল কপালে তর্জনিটা চাপিয়া একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—“দাঁড়াও, তাহলে একটু ভুল হয়েছে—পরেশ তাহলে তোমার চেয়েও একটু ছোটই হয় ; পরেশের হল...মানে, এই গেল মাঘে আটত্রিশে পড়েছে, ঠিকুজির বয়েস বলছি। তাহলে হল না

BanglaBook.org

তোমার চেয়ে বছর দু-একের ছোট?"

একটু চুপ করিয়া বলিলেন—"চুলোয় যাক, বাজে কথা বেড়ে যাচ্ছে। তোমায় যার জন্যে ডাকা,—তোমার উপর হঠাৎ যেন একটু নেকনজর বলে বোধ হল—আমি লক্ষ্য করে দেখছিলাম কিনা কাল...খপ্ করে নেমতন্ন পর্যন্ত করে বসলো..."

অন্নদাচরণ একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"হ্যাঁ, অতি সজ্জন...কিন্তু সেই কথা ভাবছিলাম দাদা—যাওয়াটা কি ঠিক হবে? আমাদের মতো লোক—ওঁদের দেউরি মাড়াবার যুগ্যি নয়..."

নিকুঞ্জলাল অন্নদাচরণের হাঁটুর উপর চারটি আঙুল চাপিয়া তাঁহাকে থামাইয়া বলিলেন—"শোন অন্নদা, ঐজন্যেই তোমায় ডাকা। নিকুঞ্জদাদাকে কি মনে করবে জানি না, তবে নিকুঞ্জদাদা যে-পরামর্শটা ভালো মনে করেছে, চিরকাল দিয়েও এসেছে, দেবেও। তোমায় যেতে হবে, আর টাটকা-টাটকি, আর 'তুমি' বললেই ও সন্তুষ্ট হয়, 'তুমি'ই বলতে হবে।"

অন্নদাচরণ একটু বিস্মিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। নিকুঞ্জলাল বলিলেন, "অবিশ্যি ঐ যে বললে সজ্জন, তা খুবই সজ্জন পরেশ ; তবে আমরা হচ্ছি গেরস্ত মানুষ, রাজরাজড়ারা সজ্জন কি দুজ্জন অত বুঝি না, আমাদের কাজ হাঁসিল হলেই হল। তা হলে সব কথাটা তোমায় খুলেই বলি—মানুষটা সজ্জন বলেই, ওর স্বভাব জানি বলেই, আর সবাইকে ছেড়ে তোমাকেই কাল ডাকিয়ে আনলাম, ভাবলাম যদি একটু সুনজরে পড়ে যায় অন্নদা তো একটা আখের হয়ে যাবে। তা দেখলাম, দেখামাত্রই তোমার ওপর কেমন একটা ভালো ধারণা জন্মে গেল—অবিশ্যি আমিও আগে থাকতে জমি ঠিক করে রেখেছিলাম, আর তোমার কথাবার্তাগুলিও খুব বিবেচকের মতোই হয়েছিল। তবে কি জান রে ভাই? —যতই বল, যতই কও, রাজরাজড়ার মন। ও টাটকা-টাটকি যতটা হয় কাজ আদায় করে নেওয়াই হুঁশিয়ারের কর্ম। তাই বলছিলাম—বলে গেছে, একবার দেরি না করে গিয়ে পড়ো, নিজে সেধে তো যাচ্ছ না যে লজ্জা আর কুণ্ঠা। একটু দহরম মহরম তো হোক, তারপর আমি আছি। অন্তত একটা মোটা বিদেয় তো নিয়ে এসো আপাতত!"

নন্তী কলিকাটা সাজিয়া হুঁকায় বসাইয়া বাপের হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া গেল। নিকুঞ্জলাল দুইটা টান দিয়া হুঁকামুখেই অন্নদাচরনের পানে চাহিয়া মিটি মিটি হাসিতে লাগিলেন, পরে বলিলেন—"অন্নদা ভাবছে, নিকুঞ্জদাদা আচ্ছা মতলববাজ মানুষ তো! তা একটু মতলব খাটাচ্ছি বৈকি, তোমাদের যদি পর বলে ভাবিতাম, গা করতাম না। এই সময় রসিকেরও একটু নামডাক হচ্ছে, একটা অমন জমিদার-বাড়িতে, বেশি না, যদি মাসে একটা করেও ডাক পায় তো...রাবণের তো গুষ্টি, লেগেই রয়েছে একটা না একটা অসুখ-বিসুখ..."

পূর্বসম্বন্ধের ইতিহাসে যা কিছু গলদ আছে সমস্ত ভুলিয়া অন্নদাচরণের মনটা ভিতরে ভিতরে কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিতেছিল ; বলিলেন—"একটু কুণ্ঠিত হচ্ছিলাম দাদা, না হচ্ছিলাম যে এমন নয় ; তবে ভেবে দেখছি আপনার পরামর্শই ঠিক। মেয়েটা ওদিকে তরতর করে বেড়ে উঠছে, একটা বেশ বাঁধা গোছের উপার্জন নেই—আমার হাত খালি, ওর বাপেরও ওদিকে চাড় নেই...এই সময় ভগবান যদি নিজে একটু যোগাযোগ করে দিলেন তো ছাড়া কোনমতেই উচিত নয়।"

শেষের কথাগুলো নিকুঞ্জলাল তীক্ষ্ণ ঔৎসুক্যে শুনিয়া যাইতেছিলেন ; অভীপ্সিত সুযোগটাকে আপনা হইতে এত কাছে আসিয়া পড়িতে দেখিয়া প্রায় সংযম হারাইয়াছিলেন ; কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইলেন এবং অত্যন্ত ঘন-ঘন হুঁকা টানিতে লাগিলেন। তবু মনটা খুব তোলপাড় করিতে লাগিল। আরও অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল, আরও অনেক সৎপরামর্শ ; এই পরিচয়টাকে কতরকমে কামধেনু করিয়া লওয়া যায় এবং উচিত—এই সব নানারকমের হিতৈষণার কথা। সবশেষে, প্রস্তাবটা একেবারে পুরোপুরি না আনিয়া ফেলিলেও সামান্য, অতি সূক্ষ্ম একটি ইঙ্গিত দিয়াই রাখিলেন নিকুঞ্জলাল, কথাটা একসময় পাড়িবার সুবিধা হইবে। খুব চটুল একটি হাসি হাসিয়া কহিলেন —"আরও একটা জাঁদরেল মতলব ঠাউরে আছি হে অন্নদা, নেহাৎ বসে নেই তোমার নিকুঞ্জদাদা!"

অন্নদাচরণের আন্দাজটা অত বেশি উঠিতে পারিল না, তবু একটু আশান্বিতভাবেই প্রশ্ন করিলেন—"কি মতলব দাদা?"

নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"দেখবে দেখবে ; তখন বলো..."

আরও সূক্ষ্ম একটি হাসি ঠোঁটে জাগিয়াই মৃদু মৃদু তামাক টানিতে টানিতে আড়চোখে অন্নদাচরণের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

যাওয়াই স্থির হইল, তবে বর্ষার সময়টা চাষবাসের হাঙ্গামাটা একটু লাগিয়াই থাকে, যাই যাই করিয়াও দেরি হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে নিকুঞ্জলালের কাছে দুইখানা চিঠি আসিল—"ছোট গুরুঠাকুর"-এর পায়ের ধূলা না পড়ার জন্যে অনেক দুঃখ-অভিমান করিয়া লেখা।—পরেশনাথ কি এতই অযোগ্য? প্রথম সাক্ষাতে আলাপ-পরিচয়ে কি কোন অপরাধ হইয়া পড়িয়াছিল? হইলেও যে শিষ্যস্থানীয়, সন্তানস্থানীয়,—তাহার জন্য কি ক্ষমা নাই?...এইরকম অনেক করিয়া লেখা। নিকুঞ্জলাল দ্বিতীয় চিঠিটা হাতে দিয়া একটু ক্ষুণ্নভাবেই মুখটা গম্ভীর করিয়া বলিলেন—"দেখো হে, উত্তরটা তুমিই না হয় দিয়ে দাও যা হয় একটা, একদিকে জমিদার-শিষ্য, একদিকে ভাই, আমি মাঝখান থেকে কথাটা দিয়ে বড়ই অন্যায় করেছিলাম, এখন বুঝছি। এদিকে আমারও একবার যাওয়া দরকার, বাড়ি বয়ে এল অত বড় লোকটা ;—কিন্তু মুশকিল হয়েছে, তুমি একবার হয়ে না এলে আমি কোনমতেই তার সামনে হতে পারছি না..."

কাজের সঙ্গে সত্যই একটু কুণ্ঠাও লাগিয়াছিল, অলক্ষ্যে হইলেও গড়িমসি করিবার সেইটেই বোধ হয় বিশেষ কারণ ; কিন্তু আর ঠেলিয়া রাখা গেল না। ভাদ্রের মাঝামাঝি অন্নদাচরণ দ্বিধাসঙ্কোচ লঙ্ঘন করিয়া যাত্রা করিলেন। নিকুঞ্জলালের পরামর্শ মতোই কথাটা গ্রামে এবং বাড়িতেও গোপন রাখা হইল। নিকুঞ্জলাল বলিলেন—"লোকের নজর বড় খারাপ হে, সেদিন কটা টাকা প্রণামী দিয়ে গেল, তাইতেই অনেকের চোখ করকর করছে। থাক না, লক্ষ্মীর যদি হয় কৃপাদৃষ্টি—মা যদি আসেনই আলো করে তো কারুর জানতে তো বাকি থাকবে না। বাড়িতেও এখন কাজ নেই জানিয়ে—মেয়েদের পেটে থাকেই না কথা, আর ভাইটি তো দেখতেই পাচ্ছ—বোধ হয় পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে বসে এই নিয়ে এক মহাকাব্যই লিখে সাতখানা গ্রামে ঢেঁটরা পিটিয়ে বেড়াবেন!"

ঢেঁটরা পিটাইলেন অন্নদাচরণ নিজে। শ্বশুরবাড়ির নাম করিয়া দিন পাঁচেক পরে

BanglaBook.org

হরিপুর হইতে ফিরিয়া মাসাধিক তাঁহার মুখে আর অন্য কথাই রহিল না এক রকম।

বাড়ি যখন ফিরিলেন তখন বৈকাল। বসন্তকুমারীর এ সময়টা পাড়ায় টহল দেওয়ার জন্য আলাদা করিয়া রাখা ; জানা থাকিলেও একবার খোঁজ করিলেন, না পাইয়া রসিকলালের খোঁজ করিলেন। হারাণ খিড়কির পুকুরের ধারের বেড়াটাতে গোটাকতক নূতন বাঁধন দিতেছিল, আসিয়া গড় করিয়া দাঁড়াইল। অন্নদাচরণ তাহার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—'এই যে! তা আজ বেরুসনি যে?"

হারাণ বলিল—"সেই কথাই তো এতক্ষণ ছোট মাকে কইছিলুম—বলি, বেরষোর দাগা ষাঁড়ের মতন কাঁধে বাক্সটা চাপ্যে একা টহল দিয়ে বেড়ালে যদি চলতো না হয় একাই..."

অন্নদাচরণ রাগিয়া উঠলেন, বলিলেন—"ও! আর তিনি বুঝি কাব্যি করে বেড়াচ্ছেন? সংসারের এই অবস্থা, ঘাড়ে আইবুড়ো মেয়ে! দাদা আছে, কিসের তোয়াক্কা? তা বলে দিবি, দাদাও তোয়াক্কা রাখে না কারুর,—কারুর তোয়াক্কা রাখে না। ঘুড়ি-টুড়ি বেচে ফেলে ও ওর ছড়া লেখা নিয়েই থাক,—ঘুরে দেখবার কিছু দরকার নেই, যাঁর দেখবার তিনিই দেখছেন। বলে দিবি দেখে নিতে—একা, কারুর একটি কানাকড়িও স্পর্শ না করে যদি আমি গিরির বিয়ে না দিতে পারি তো..."

এমন সময় সদর দরজা দিয়া মন্থর গতিতে বসন্তকুমারী প্রবেশ করিলেন, বলিলেন, —"এসেই আরম্ভ হয়েছে? শ্বশুরবাড়ি হপ্তাকে হপ্তা কাটিয়ে এসেই মুখসাপট, তা না হলে পুরুষমানুষ কিসের!"

অন্নদাচরণের ঠিক রাগের মেজাজ ছিল না, পুরুষকারের জন্য দম্ভটাই ওই ছদ্মরূপে বাহির হইতেছিল ; বসন্তকুমারীর উপস্থিতিতেই ঠাণ্ডা হইয়া গেলেন। একটু হাসিয়া ঠাট্টার ভাবে কহিলেন—"এই যে, এসেছ, তাই তো বলি—টহলদার না হলে টহলদারের জন্য ওকালতি করে কে? এদিকে একটা মানুষ যে দশ কোশ পথ বেয়ে..."

অন্নদাচরণের মেজাজ ভালো থাকুক, কিন্তু বসন্তকুমারীর ছিল না, না থাকিবারই কথা। একটু বেশ খোঁচা দিয়াই বলিলেন—"দশ কোশ পথ বেয়ে যে আবার আসবে, শ্বশুরবাড়ির আদর ছেড়ে যে আবার নিজের কুঁড়ের কথা মনে পড়বে, এ ভরসা ছিল না। থামো বাপু, আমায় খেপিয়ে তুলো না, দুই ভাইয়ের আক্কেল দেখে দেখে..."

অন্নদাচরণ রহস্যচ্ছলেই বলিলেন—"অথচ নিজেই বে-আক্কেলের মতো কথা বলছ, শ্বশুরবাড়িতে শুক্‌নো আদর নিয়ে থাকা চলে কখনও? শ্বশুরবাড়ির যা সারবস্তু তা তো এখানেই..."

রান্নাঘরের দোরের অন্তরালে ভাতৃবধূর কৌতূহলী ঘোমটার পাড়টায় নজর পড়ায় থামিয়া গেলেন। হারাণ তামাক সাজিয়া দিয়া গেল, হুঁকাটা হাতে করিয়া একটা টুলে বসিয়া কয়েকটা টান দিলেন। কিভাবে যে আরম্ভ করিবেন যেন বুঝিতে পারিতেছেন না, শেষে কোটের পকেট থেকে মানিব্যাগটা বাহির করিয়া বলিলেন, "নাও, এইটে আগে তুলে রাখ একেবারে আলাদা করে।"

ব্যাগটাকে এত স্ফীতোদর খুব কমই দেখা গিয়াছে। বিশেষ করিয়া পাঁচটা দিনের প্রবাসের পর উদরটা খালি থাকিবারই কথা ; বসন্তকুমারী উপরে উপরেই একবার টিপিয়া

BanglaBook.org

একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—"অনেকগুলো টাকা যেন মনে হচ্ছে ; কার গা?"

"খুব জিগ্যেস কর তো!—অন্য কার টাকা তোমায় বাক্সয় তুলতে বলব? পাঁচদিন শ্বশুরবাড়ির আদর খেয়ে আমার মাথা এতটা খারাপ হয়নি।"

"রঙ্গ রাখ ; কত টাকা আছে?—ধার করলে নাকি?"

কথাটা প্রকাশ করিয়া ফেলিবার জন্য অন্নদাচরণের জিব নিস্-পিস্ করিতেছিল, বলিলেন—"নাঃ, তোমাদের কাছ থেকে পার পাবার জো নেই। যদি বলি ধার নয়, তখন, —কোথা থেকে এল তাহলে?—কি বৃত্তান্ত?'...বলব একদিন, শুনো'খন, তাড়াতাড়ি কিসের?"

স্ত্রী অভিমানভরে মুখ ভার করিয়া বলিলেন,—"ঘাট হয়েছে, এত কথা উঠবে যদি জানতাম..."

ঘরের পানে পা বাড়াইতে বাড়ইতে অন্নদাচরণ বলিলেন—"এতে আর রাগের কি হয়েছে? শুনবে শোন, নুকোবার আর কি আছে? চুরি করেও আনা নয়, চামারি করেও আনা নয়।...লক্ষ্মণ দেওরটিকে বললে গায়ে লাগে, কিন্তু সংসার করতে হলে, শুধু পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে কাব্যচর্চা নিয়ে থাকলেই চলে না, পাঁচটা লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, দুটো ভাল-মন্দ কথা বলতে শিখতে হয়, সমাজের মধ্যে যাকে বলে বিশিষ্ট—তাই একজন হতে হয়।"

গিরিবালা জেঠাইমার সঙ্গে বেড়াইতে গিয়া নিকুঞ্জলালের বাড়ি একটু আটকাইয়া পড়িয়াছিল, আসিয়া উপস্থিত হইয়াই বিস্মিতভাবে বলিল—"ওমা, জেঠামশাই কখন এলে?"

আজকাল আর ছুটিয়া চলে না, বিশেষ যদি মা বা জেঠাই কাছেপিঠে থাকে ; তবুও কয়েকদিন পরে জেঠামশাইয়েক পাইয়া যেন বর্তাইয়া গেছে, ওরই মধ্যে একটু অসংযত গতিতে কাছে আসিয়া বলিল—"কখন এলে জেঠামশাই? ওমা, এখনও জামা জুতো পর্যন্ত খোলো নি!..."

জামার বোতাম খুলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অন্নদাচরণ কন্যার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া বলিলেন—"তাই তো বলি, মায়ে আর অন্যজনে তফাৎ আছে বৈকি। একজনের কাছে বাড়িতে ঢোকবামাত্রই তাড়া...নাঃ, চটিয়ে কাজ নেই ; মায়ের আদর আর কদ্দিনই বা খাব?"

বিদায় দেওয়ার সুযোগে আনন্দও হয়, এদিকে আবার কথাটা মুখে আনিলেই গলাটা ভারী হইয়া আসে। গাঢ় প্রীতিভরে পিঠে আরও গোটাকতক টান দিয়া একটু চুপ করিয়া তামাক খাইলেন, তাহার পর বলিলেন—"হ্যাঁ, যা বলছিলাম, পাতুলে যাইনি, শ্বশুরবাড়ি যাবার ভারী ফুরসৎ!"

বসন্তকুমারী অতিমাত্র আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"তবে?"

অন্নদাচরণ বলিলেন—"সেই সেবারে নিকুঞ্জদার ওখানে হরিপুরের রাজা এসেছিলেন, মনে আছে?"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"ওমা, মনে থাকবে না? অতগুলো টাকা পেন্নামি দিয়ে গেল..."

"নিজে হতে দেয় না, আদায় করতে জানতে হয়।...তারপর গিয়ে অবধি চিঠির

BanglaBook.org

উপর চিঠি, কি নজরে যে দেখে ফেলেছিল! তা ফুরসৎ হলে তবে তো যাবে মানুষে? শেষে আর ঠেকানো ভালো দেখায় না দেখে দুর্গাশ্রীহরি বলে...”

রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া কথাগুলো এমন অবহেলার সহিত বলিয়া যাইতেছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অনাড়ম্বর ভাবে নিজেকেও এমন একটি মর্যাদা দিয়া যাইতেছিলেন যে বসন্তকুমারী বিস্ময়ের আর কূল পাইতেছিলেন না; ক্ষানিকক্ষণ অবাক হইয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—“হ্যাঁগা, দামুদিদি বলছিল তারা সত্যিই মস্ত বড় মানুষ!...পারলে চিনতে? যত্নআত্যি...”

“চিনতে পারার কথা কি? কোথায় রাখবে, কি করবে ভেবে পায় না। বড় মানুষ কি আমিও দেখিনি?—দেখেছি; বাড়িতে একটা মহল বাড়ল, কি একতলার উপর খানকতক ঘর উঠল তো মাটিতে পা পড়ে না।...তিন মহলের দেউড়িবাড়ি, সদর দরজায় ভোজপুরী দারোয়ান মোতায়েন, জুড়িগাড়ি; লোকজন, আমলাপাইক গিজগিজ করছে; কিন্তু একবার মনে হবে যে এই লোক এইসবের মালিক?—আর ‘ছোট গুরুঠাকুর’ বলতে তো অজ্ঞান। কটা দিন রইলাম, একটু চোখের আড়াল করা নয়, সর্বদা কাছে বসিয়ে আলাপ-আলোচনা সলা-পরামর্শ; কেউ এল তো—আর ‘লোকজন আসা তো লেগেই রয়েছে—অমনি পরিচয় করে দেওয়া,—তেজপুরের অমুক বাঁড়ুজ্জে—আমার বড়ঠাকুরের ভাই, মহা বিচক্ষণ ব্যক্তি। হেন-তেন, অত কি মনেও আছে? ভেবেছিলাম—গিয়ে একটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে চলে আসব, রাজবাড়িতে থাকা কি আমাদের ধাতে পোষায়? তা আসতে দিলে তো! আজ-কাল, আজ-কাল করে শেষে আসবার সময় প্রণাম করে দশ টাকার ঐ দশখানি নোট, তাও কত যেন ‘কিন্তু’,—‘বুঝছি, আপনার উপযুক্ত হল না, সামনে পুজোর খরচটা রয়েছে, নইলে’—”

সকলে স্তম্ভিত হইয়া শুনিতেছে—চিত্রার্পিতের মতো, আওয়াজ যাহাতে রান্নাঘরে ভ্রাতৃ-বধূ পর্যন্ত পৌঁছায়, অন্নদাচরণ গলাটা তদুপযোগী বড় করিয়া লইয়াছেন ক্রমে। হারাণকে একবার সতর্ক করিয়া দিলেন—“শুনছিস শোন্, বাড়ির চাকর ক্ষতি নেই, তবে খবরদার—বাইরে লোক জড়ো করে ঢাক পিটোবিনি, তোর আবার সে-রোগটি আছে। মানুষের কুনজর পড়তে দেরি হয় না, আর যা সব শুভাকাঙ্ক্ষী চারিদিকে।”

বসন্তকুমারী বলিলেন—“হ্যাঁগা, সত্যি সব, তা মিথ্যেই বা কেন বলবে বাপু? আর ঐ তো টাকাও রয়েছে। কিন্তু কেমন-কেমন একটু যেন ঠেকছে বাপু।...তাই বা কেন গো? ভগবান যেমন মন্দ গড়েছেন, তেমনি আবার ভালো লোকও কি গড়েননি?”

একটু চিন্তান্বিতই রহিয়াছেন যেন, কোথায় বেশ পরিষ্কার হইতেছে না যেন ব্যাপারটা। অন্নদাচরণ আবার এক চোট আরম্ভ করিবার জন্য হুঁকা টানিয়া দম সংগ্রহ করিতে লাগিলেন; চাপা আবেগে মুখটি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। হারাণ আবার বেড়ায় বাঁধন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। গিরিবালা ঔৎসুক্যবশে কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, এমন সময় বসন্তকুমারী যেন কতকটা নিজের মনেই বলিলেন—“ভালোই,—ভগবান একটু মুখ তুলে যদি চান...”

অন্নদাচরণ বলিলেন—“চাইবেন। তবে দেওরটিকে একটু গা করতে বলো। একটু মানুষ হতে বলো। নিকুঞ্জদাদা অভিভাবকের মতো রয়েছেন, আমিও একবার হয়ে এলাম, এই সময় পশার-টশার হচ্ছে,—মাসে একবার করেও যদি হরিপুরে ডাক হয় তো টাকা

কামিয়ে এলে যাবে। তুলেও এসেছি কথাটা একটু, তবে দু'চারবার হাঁটাহাঁটি করতে হবে, —তা ও যাবে?...আর যায়ই যদি তো কথাবার্তায় দিব্যি একটা বিচক্ষণ মানুষের মতো...”

বসন্তকুমারী বলিলেন—“হাবা নয়, বোকা নয়, পারবে না কেন? আর হবে পারতে, ভগবান যখন দিচ্ছেন একটু সুবিধে করে...”

নিকুঞ্জলাল গ্রামে ছিলেন না। সন্ধ্যার সময় অন্নদাচরণ ঘোষালের বাড়ি, মিত্তিরদের বাড়ি, এবং গতায়াত আছে এমন আরও দু-একটা বাড়ি চক্কর দিতে গেলেন। যেখানেই গেলেন হরিপুরের রাজবাড়ির পরিচয়ের টুকরা-টাকরা একটু ছাড়িয়া আসিলেন, অবশ্য, খুব অনাসক্ত ভাবে।—“হ্যাঁ, নাম-ডাক যা শুনেছিলাম, তা মিছে নয়। অবিশ্যি, তাই বলে যে বলতে হবে জনাইয়ের মুকুজ্জে কি মনসাতলার রায়েদের মতন কিছু-একটা তা নয়, তবে আমাদের ব্রেলে-দক্ষিণপাড়ার চৌধুরীরা...নাঃ,. কিসে আর কিসে!...তা হোক গে, টাকা কিছু সবার সমান হয় না, তবে মেজাজ!—হ্যাঁ, সে একটা দেখবার জিনিস বটে। —কি দরাজ হাত! দান ধ্যান সদাব্রত—সে এক এলাহি কাণ্ড, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।”

বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া যেটুকু সময় রহিল ফিরবার পথে ধর্মতলার চাতালে কাটিল, জায়গাটা পাড়ার আড্ডা, অনেকেই সন্ধ্যার পর সমবেত হয়। জমিদার বাড়ি লইয়াই আলোচনা চলিতেছিল—চৌধুরীদের ভাগাভাগি হইয়াছে, এইবার পূজা হইবে দুইটা, রেষারেষির মধ্যে ঘটাটাও এবার অন্যভারের চেয়ে হইবে বেশি করিয়াই...

অন্নদাচরণ উপস্থিত হইলেন। তর্কালঙ্কার বলিলেন—“এই যে অন্নদা, ক'টা দিন ছিলে কোথায় হে? রসিক বললে—শ্বশুরবাড়ি। জিজ্ঞাসা করলাম—এতদিন শ্বশুরালয়! নতুন বিবাহ করলে নাকি দাদা তোমার?...হাঃ-হাঃ...তারপর?...”

অন্নদাচরণ হাত বাড়াইয়া বলিলেন—“শ্বশুরবাড়ি! ভায়া খুবই ফুরসৎ দেখছেন দাদার!...দাও।”

তর্কালঙ্কারের হাত হইতে নস্যের ডিবাটা লইয়া বলিলেন—“একটু বাইরে বরাত ছিল।...রেষারেষির কথা কি হচ্ছে?”

“এবারে চৌধুরীরা পৃথক হল কিনা, প্রতিমাও দুটো হবে। অনাথ বলছে —পুজো কাকে বলে এবার দেখিয়ে দোব। অনন্ত আবার একটু কৃপণ কিনা...”

অন্নদাচরণ নস্য লইয়া ডিবাটা ফেরত দিলেন; হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন —“খুড়োর ওপর যদি এতই টেক্কা দেবার ইচ্ছে অনাথের তো এইবেলা লোক পাঠিয়ে দিক না, হরিপুরে কেষ্টনগরের কুমোরেরা এসেছে, কজনকে নিয়ে আসুক...”

ওদিক থেকে একজন প্রশ্ন করিল—“হরিপুরের রাজাদের বাড়ি?”

অন্নদাচরণ বলিলেন—“রাজা না হাতি; জমিদারই, তবে হ্যাঁ, জমিদারেরই যা বোলাবোলাও দেখে এলাম, তাতে অনেক রাজরাজড়াকেও মাথা হেঁট করতে হয়...”

পরদিন সন্ধ্যার পর নিকুঞ্জলাল ফিরিলেন। উচ্ছ্বসিত বিবরণ, মায় প্রণামীর কথাটা পর্যন্ত তামাক টানার মধ্যে অল্প অল্প মাথা দুলিয়া শুনিয়া বলিলেন—“হল তো? অথচ তুমি ভয় পাচ্ছিলে যেন তোমায় বাঘের মুখেই পাঠাচ্ছে, কি সিংগীর মুখেই পাঠাচ্ছে নিকুঞ্জদাদা!...তবে নিকুঞ্জদাদার ঐ এক কথা সর্বদাই মনে রাখবে রে ভাই;—ওরা রাজা, আমরা গেরস্ত; টাটকা-টাটকি নিজের কাজটুকু গুছিয়ে নেওয়া...”

পরের দিনটা আর পারিলেন না, তাহার পরের দিন নিজেই হরিপুর যাত্রা করিলেন।

BanglaBook.org

॥ ৬ ॥

রসিকলালের শরীরটা একটু অসুস্থ ছিল, পবদিন সকালে আর বাহির হইলেন না। কয়েক জায়গায় প্রয়োজনীয় ঔষধ বিলি করিয়া প্রায় দুপুরের কাছাকাছি হারাণ গরগর করিতে করিতে বাটীতে প্রবেশ করিল—"হারাণে বলে বেড়াবে!—বলে বেড়াবে কি, সওয়ালের জবাব দিতে দিতে হারাণের পথচলা দায় হয়ে উঠেছে ; বেলে-তেজপুরে বোধ হয় হেন একটি লোক নেই, যে হরিপুরের বাবুদের কথা না জানে। প্রাণের দায়ে রাস্তা ছেড়ে বনবাদাড় ধরে এস্ব—সেখানেও—'কিরে হারাণ, তোর বড়কর্তা নাকি হরিপুরে গিয়ে...' "

"দাদা তো?"—বলিয়া রসিকলাল বাহিরে আসিয়া এই সুযোগে অগ্রজের চরিত্রের এই হালকা দিকটা লইয়া একটা সুমিষ্ট মন্তব্য করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়—"কৈ গো দিদি!" বলিয়া কাত্যায়নী সদরের দুয়ার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে একটি পোঁটলা হাতে করিয়া বিকাশ।

"কাতু দিদি যে!"—বলিয়া রসিকলাল দাওয়া হইতে নামিতে নামিতে কহিলেন —"কি সৌভাগ্য! পথ ভুলে নাকি...অ বৌদি, কে এসেছে বেরিয়ে দেখসে। বিকাশও এসেছে? বাঃ, বেশ!"

বসন্তকুমারী ওদিককার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।—"কে, আমাদের কাতু? ওমা, তাই বলি সকাল থেকে বাঁ চোখ নাচে কেন! বিকাশও এসেছিস যে! আনেকদিন পরে ; আমি এই সেদিন ছোট বউকে বলছিলাম—বলি—'হ্যাঁরে, বিকাশ এদিকে প্রায় বছরখানেক হল আসেনি, তেজপুরের বড়পিসিকে ভুলে গেল নাকি?' থাক্, থাক্, হয়েছে বাবা, দীর্ঘজীবী হও, বংশের মুখ উজ্জ্বল করো..."

কাত্যায়নী বলিলেন—"তোমাদের আশীর্বাদে তারই যেন একটু রাস্তা হয়েছে দিদি। আর বছর তো অসুখে অসুখেই গেল। এ বছর সুভালাভালি পাসটা দিলে: কবে সিংহবাহিনীর তলায় নাকি মানত করে গেছল তাই দিতে..."

বসন্তকুমারী দেবরের পানে চাহিয়া বলিলেন—"পাসের খবর তো ঠাকুরপো অনেকদিন হল দিয়েছিলে..."

কাত্যায়নী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ওমা, তা জান না বুঝি? ভাইপো তোমাদের সেয়ানা কত!..."

বিকাশ লজ্জিতভাবে মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ছোটপিসির ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

কাত্যায়নী এবার তাহার পানে চাহিয়া লইয়া বলিতে লাগিলেন—"পাশ করার খবর পাওয়া অবধি ক্রমাগত খ্যাঁচখাচ্ছি—'ওরে বিকাশ চ', ঠাকুর-দেবতার নামে মানত, পুজোটা চুকিয়ে আসি।'...কোনমতে গা করে না, কোনমতে গা করে না ; শেষে একদিন খিঁচিয়ে-মিচিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমায় তেমনি বোকা পেয়েছেন কিনা,—ঘরের পয়সা বের করে পুড়ো দোব! পাস করার খবর পাওয়ার দিনই মনে মনে বলে দিয়েছি—জলপানি না পেলে...' "

তিনজনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। বসন্তকুমারী হাস্যজনিত অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন..."কি জ্বালা, ঠাকুর দেবতার সঙ্গে এ কি তঞ্চকতা বল্ দিকিন!—চল্, আয় ; উঠোনেই দাঁড়িয়ে আছি।"

BanglaBook.org

ঘরের দিকে যাইতে যাইতে কাত্যায়নী কাহিনীর জেরটা ধরিয়া—"তা অমন না হলে জব্দও হন না ঠাকুর, দিদি।...জলপানির খবরটিও পাওয়া গেল, প্রথম টাকা হাতে আসতে এই ধরে নিয়ে এসেছি।...বরু কোথায়? গিরি, ছেলেরা?...পুতী মামার বাড়িতেই আছে তো?...কতদিন যে দেখিনি!"

রসিকলাল বলিলেন—"এ পুজোও ঠিক যে সিংহবাহিনীর পাওনা বলব, তা বলব না,—বিকাশ যে জলপানি পাবেই এ তো ধরা কথা। আজকের পুজোর জোরে ওকে যদি বড় একজন নেতা, কি বড় একজন কবি..."

ভাজ বক্র দৃষ্টিতে দেবরের পানে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছিলেন, বাধা দিয়া বলিলেন, "ক্ষ্যামা দাও বাবু, সিংহবাহিনীর মানত করেই বুঝি নিজে কবি হয়েছ?—উঠতে বসতে দাদার মুখনাড়া, উঠতে বসতে..."

আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসি থামিলে বলিলেন— "গুণধর পিসে-শালাপোর কথায় হাসব কি তোর কথার জবাব দোব?...ছেলেরা ইস্কুলে, ছোটবৌ গিরিকে নিয়ে ঘোষালদের বাড়ি সাধের নেমন্তন্ন খেতে গেছে। নে, হাত-মুখ ধো কাতু।"

বিকাশ একটু একলা পড়িয়া গিয়া ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, বসন্তকুমারী প্রবেশ করিয়া দেখিয়াই বলিলেন—"ওমা, চুপ করে বসে রইলি যে বিকাশ!—নে, হাত-পা ধুয়ে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা হ'...এ যেন মনে হচ্ছে আবার সিংহবাহিনীকে কি করে ফাঁকি দিবি মনে মনে তার মতলব আঁটছিস?"

আবার হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ঐ রকম হাস্যোচ্ছল প্রসন্ন আলাপের মধ্যে দিয়া অভ্যাগতদের তত্ত্বাবধান চলিল।

হারাণকে এসব বলিয়া দিতে হয় না, নিজেই গিয়া ঘোষালবাড়িতে বরদাসুন্দরীকে খবরটা দিয়া আসিল। তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া দুপুরের একটু পরেই গিরিবালাকে লইয়া তিনি চলিয়া আসিলেন। বেটাছেলেদের আহার হইয়া গিয়াছিল। বসন্তকুমারী আর কাত্যায়নী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে গল্প করিতে করিতে আহার করিতেছিলেন, এমন সময় কন্যাকে লইয়া ত্বরিতপদেই বরদাসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শয়নকক্ষের দিকে নজর ছিল, কাত্যায়নী বলিলেন—"এদিকে।...দিব্যি মা যাহোক, মেয়ে সাতকোশ থেকে এসে হা-পিত্তেস করে বসে, আর মা ওদিকে নেমন্তন্ন খাওয়ায়..."

গিরিবালা পরিবর্ধমান বয়সের গাম্ভীর্য এক নিমেষে ভুলিয়া গেল, একরকম ছুটিয়াই গিয়া মাসিকে জড়াইয়া তাঁহার কোলে মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া প্রশ্নে প্রশ্নে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল।

বরদাসুন্দরী বলিলেন—"সে কথা বলতে পারবে না দিদি। হারাণের মুখে শুনে ওবধি কি আর ওর তর সইছিল একটু? কেবলই 'মা চলো', কেবলই 'মা চলো'।...যত গা টিপে বলি—রোস এসেছিস একটা বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে..."

কাত্যায়নী হাসিয়া উঠিলেন, বসন্তকুমারীকে সাক্ষী মানিয়া বলিলেন—"শুনে যেও দিদি, বলে ধম্মের কল বাতাসে নড়ে,—মা আর বোনে তফাত নেই? অ্যাদ্দিন পরে দিদি এত দূর থেকে এল, নেমন্তন্নের লোভে বোন..."

BanglaBook.org

ভগ্নী রাগের অভিনয় করিয়া বলিলেন—"দেখো তো কথার ঢং! আমি তাই বললাম নাকি? তুমি বল দিদি—পাঁচটা মানুষ একত্তর হয়েছে—পারা যায় সেখানে তাড়াহুড়ো লাগিয়ে গেরস্তকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে? তবুও দিদির আসার কথা শুনে আমার মনটা আনচান করছিল, ওদের সেজবউকে বলে-কয়ে ওপরঘরে আলাদা জায়গা করিয়ে খেয়েদেয়ে আসছি। তাতে কি তাড়া মেয়ের।—আদ্দেকটা নাকে-মুখে গুঁজে..."

কাত্যায়নী বোনঝিকে বাঁ হাতে জড়াইয়া বুকের কাছে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন —"বেশ করেছে আদ্দেক খেয়ে উঠে এসেছে, বাকি ক্ষিদেটুকু আমার পাতে মেটাবে, না হলে আমারও মনে একটা খুঁতখুঁতনি থেকে যেত। সিমুরে আমার পাতে খাওয়া গিরির একটা নিত্যকর্ম ছিল কিনা।"

বসন্তকুমারী একটু বেদনা-স্তিমিত কণ্ঠে বলিলেন—"নে খাইয়ে সাধ করে যটা দিন পারিস, আর তো হয়ে এল।"

"ইস, তাই নাকি?..." কি একটা বলিতে গিয়াই কাত্যায়নী সঙ্গে সঙ্গে থামিয়া গেলেন। হঠাৎ যে একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেছেন সেটা কেহ বুঝিবার আগেই গিরিবালাকে বুকের আর একটা চাপ দিয়া হাতটা গুটাইয়া লইলেন, থালাটা তাহার সামনে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন "নে, খেয়ে নে।"

বসন্তকুমারী আর বরদাসুন্দরী দুজনেই বলিয়া উঠিলেন—"দেখো কাণ্ড! ওকি খাওয়া হল?"

কাত্যায়নী বলিলেন—"পথ চলে এলে নাকি ক্ষিদে থাকে? আমার তো কমে যায় বাপু, কেমন উল্টোধাত। তোর আবার বিকাশদাদা এসেছে, ঘুমিয়ে পড়েছে বোধ হয়, নইলে এতক্ষণ তো কবার খোঁজ করলে।"

হারাণ ঝির মারফৎ সংবাদটা পৌঁছাইয়া দিয়াছিল : সে বিকাশের কথাটা—ভুলিয়াই হোক অথবা অপ্রয়োজন মনে করিয়াই হোক—আর বলে নাই। গিরিবালা পুলকিত হইয়া বলিল—"বিকাশদাদা?—কৈ, সেকথা তো বলেনি! বলেছিল মা?"

বরদাসুন্দরী বিস্মিত এবং পুলকিত হইয়া বলিলেন—"কৈ না, সেও এসেছে নাকি?"

বসন্তকুমারী বলিলেন—ঘুমুচ্ছে নিশ্চয় ; থাক একটু হাক্লান্ত হয়ে এসেছে।"

গিরিবালা নিমন্ত্রণ খাওয়ার মতই তাড়াহুড়া করিয়া আরম্ভ করিয়া দিল, বলিল—"হ্যাঁ, ঘুমোতে দিলে তো? এবার এতদিন গিয়ে রইলাম, একদিনের তরেও এলেন না কলেজ ছেড়ে..."

কাত্যায়নী বলিলেন—"তা যাক্, তুলুকগে : আর সত্যিই তো,—দুটো দিনের জন্যে এসে যদি ঘুমিয়েই কাটাবে তো ভাই-বোনদের সঙ্গে একটু মিশবে কখন? ওদের জন্যে কলকাতা থেকে কি সব বই কিনে নিয়ে এসেছে, দেবে। কি ভালোটাই যে বাসে ওদের। বিশেষ করে গিরিকে,—গিরির কথা যদি উঠল তো কি বলে যে প্রশংসা করবে ভাই, যেন ভেবে পায় না।"

বসন্তকুমারী একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"নিজের তো আর বোন দিলেন না ভগবান এ পর্যন্ত একটি, সাধ হয় তো?"

কাত্যায়নী বলিলেন—"ওমা, তা বুঝি শোননি ছেলের কথা?"

দুই জায়ে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন, কাত্যায়নী বলিলেন—"একদিন হুট করে বলে

BanglaBook.org

বসল—'আমার কি মনে হয় জানো মেজপিসিমা?—মনে হয় আমার যেন মার পেটের বোন আর না হয়'...'সি কি রে? বিয়ের ভাবনা নাকি?' 'না, বিয়ের ভাবনা কেন?—তার দিকেই তা হলে বেশি টান হবে ; অন্তত গিরি ভাববে নিজের বোনকেই বুঝি বেশি ভালোবাসি'।"

কথাটার মধ্যে হাসির যে কিছু ছিল না এমন নয়, তবে সেই সঙ্গে একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য ছিল, দুই জায়ে স্মিত বদনে একটু চুপ করিয়া রহিলেন। কাত্যায়নী বলিতে লাগিলেন—"বলে, ওকে বই থেকে যখন বড় বড় মেয়েছেলেদের কথা পড়ে শোনাই মাসীমা—সীতা হলেন, সাবিত্রী হলেন, দয়মন্তী হলেন, অন্য অন্য দেশেরও মেয়েরা হলেন, —এত মন দিয়ে শোনে গিরি!—দেখে নিও, ও-ও একসময় ওঁদের মতন হবে।"

কাত্যায়নী একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"সে দৈবজ্ঞির মতন মুখ গম্ভীর করে বলবার যদি ধরন দেখ! একলা মনে মনে আর কত হাসবো!"

তাহার পর গিরিবালার পিঠে আদরভরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন —"বলি, তা হবে বৈকি, হবে না?—অমন চমৎকার স্বভাব, যেখানেই যাক, যার কাছেই যাক, শুধু আশীর্ব্বাদ কুড়িয়েই বেড়াচ্ছে, ও হবে না তো হবে কে?"

গিরিবালা এদিকে মুশকিলে পড়িয়া গিয়াছে। প্রশংসার চোটে সে ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল। পলাইতে পারিলে বাঁচে, বিকাশদাদার ওখানে মনটাও পড়িয়া আছে, কিন্তু এইসব প্রশংসার মূল উৎস বলিয়াই আপাতত তাহার কাছে যাওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাড়াতাড়ি আহার আরম্ভ করিয়াছিল, হাতটা ক্রমেই মন্থর হইয়া আসিল, পলাইতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু প্রশংসাটা না থামিলে যেন ওঠাই অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, সময় পাইবার জন্যই পাতের সব কটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া আহার করিতে লাগিল। চাঁচিয়া পুঁছিয়া যখন প্রায় শেষ গ্রাসটি তুলিয়াছে, গল্পের মধ্যেই কাত্যায়নীর নজর পড়িল, বলিলেন —"দেখলে?—খিদে রেখে এইরকম করে উঠে আসে মানুষে?"

বিকাশ উঠিল বিকাল করিয়া—সাতু এবং হরু স্কুল থেকে আসিয়া যখন হুড়ুদ্দুম করিয়া তাহাকে ঠেলিয়া তুলিল। এদিক ওদিক করিয়া গিরিবালারও ততক্ষণে প্রশংসাজনিত লজ্জার ভাবটা কাটিয়া গেছে, বিকাশ উঠিতে সেও আসিয়া উপস্থিত হইল। বরদাসুন্দরী কি একটা কাজে ঘরেই ছিলেন, বিকাশ অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল—"একি! দেখেছ ছোট পিসিমা? গিরিটা কত বড় হয়ে গেছে!"

বিকাশের রকমই ঐ ; হাসিবার খোরাক রাখিয়া হঠাৎ এমন অসমঞ্জস ভাবের কথা বলিয়া বসে এক-একবার! তাহার কারণ বিস্ময়ই হইয়া পড়ে ওর প্রধান, যুক্তি একেবারে আড়ালে পড়িয়া যায়।

বরদাসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—"না, ছোটপিসিমা কি আর দেখেছে?—বলে, দেখে দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছে। তুই আজ প্রায় দেড় বছর পরে দেখছিস, বড় মনে হবে না তোর? তুই নিজেই কতটা বড় হয়েছিস ভেবে দেখ না।"

বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে নাই বিকাশের, বলিল—"আমি বড় হয়েছি...মানে..."

রহস্যটা যেন ঠিক ধরিয়া উঠিতে পারিতেছে না, বলিল—"মানে আমার তো বয়েসও হয়েছে, পিসিমা...ইস্কুল ছেড়ে কলেজেও গেছি..."

BanglaBook.org

সদ্যোত্থিতের জড়তাটাও তখনও লাগিয়া আছে মুখে-চোখে, তাহার উপর এই বোকার মতো কথা ; বরদাসুন্দরী হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"অ দিদি, শোনসে বিকাশের কথা!...হ্যাঁরে, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঠাঁইনাড়া করে বেড়ালেই বয়স হয়, নইলে হয় না?—কি জ্বালা বাপু! তুই না জলপানি নিয়ে পাশ করেছিস্ বিকাশ!— হ্যাঁরে?"

আসলে বিকাশ যে বিস্মিতই হইয়াছে তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটা আঘাতও পাইয়াছে। বিকাশ নিরাশ হইয়াছে। ক্লাসে ওঠা, পাশ দেওয়া, কলেজে প্রবেশ করিয়া একটা নতুন জগতে পদার্পণ— এই সবের ভিতর দিয়া নিজের বয়োবৃদ্ধি বরাবরই উপলব্ধি করিয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে, কাছে থাকিলেই যে সর্বক্ষণ তাহার শরীরটিকে বেষ্টন করিয়া থাকিত, এবং দূরে থাকিলে ঠিক তেমনি ভাবেই যে মনটিকে জড়াইয়া থাকিত, সেই গিরিও যে লুপ্ত হইয়া এই অপেক্ষাকৃত গাম্ভীর্যময়ী কিশোরীতে পরিণত হইয়াছে, তাহা ভাবিবার অবসর পায় নাই। এ-বিস্ময়টা হইত না যদি এর মাঝে আরও দু-একবার সে দেখিত গিরিবালাকে ; কিন্তু প্রায় দেড় বৎসরেরও অধিক ধরিয়া এমনি হইয়াছে, পাসের পড়া, পাশ করা, কলেজ ইত্যাদির হিড়িকে সেও তেজপুরে আসিতে পারে নাই ; ওদিকে গিরিবালা যখন সিমুরে গিয়াছে সে থাকিয়াছে অনুপস্থিত।...বিকাশ বেশ একটু নিরাশ হইল। আধার যত নিচু, স্নেহের তত বেগ, সেই আকুল বেগে হঠাৎ যেন একটা সম্ভ্রমের ভাব মিশিয়া বেগটাকে মন্থর করিয়া দিল। ব্যাপারটা সব সংসারেরেই ভাই বোনের মধ্যে নিত্যই হইতেছে, এমন কি পিতা-পুত্রীর মধ্যেও।—কিশোরী কন্যার মধ্যে বাপ কোলের শিশুটিকে হারাইতেছে, যুবতী কন্যার মধ্যে হারাইতেছে বক্ষলগ্ন কিশোরীটিকে—কিন্তু এটা হইতেছে ধীর-নিঃসাড়ে প্রতিদিনের অলক্ষ্য তিল তিল পরিবর্তনের মধ্যে। বহুদিন অদর্শনের পর হঠাৎ এটার উপর দৃষ্টি পড়িলেই বুকে ধক্ করিয়া একটা ধাক্কা লাগে।

বিকাশের মনে হইল—"যাঃ, সে গিরি কোথায়?" কতকগুলা অসংলগ্ন যুক্তির মধ্যে আঘাতের হেতুটাকে হাতড়াইয়া ফিরিতে লাগিল।

ঠিক এই আকারেই যে জিনিসটা কায়েমী হইয়া রহিল এমন নয়। মেলামেশার মধ্যে আবার এ-গিরিবালাও অনেকটা অভ্যাস হইয়া আসিল। গল্প-ফরমাইশ, উপদেশ ; সকালে এবং বিকালে একটু ঠাণ্ডা পড়িয়া গেলে চার-ভাইবোনে কাছাকাছি একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়ানো, মধ্যে মধ্যে তাহার কলিকাতার নতুন জীবনেরও গল্প চলে। গিরিবালা যেমন একটু দূরে চলিয়া গেছে, তেমনি শ্রোতা হিসাবে সাতকড়ি এবং হরু আবার বেশি উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে ; গিরিবালাকে মূলে ইস্কুল জিনিসটাই কি তাহা বুঝাইতে বেগ পাইতে হইত, সাতু এবং হরুকে, বিশেষ করিয়া সাতুকে কলেজ জিনিসটা যে কি ব্যাপার তাহার একটা আন্দাজ দিতে অপেক্ষাকৃত কম বেগ পাইতে হয়। সাতু ফোর্থক্লাসে পড়িতেছে, যদিও এখনও প্রায় সব বিষয়ে চরম মতামতের জন্য দিদির প্রতিধ্বনি করার অভ্যাসটি অনেকাংশেই আছে, তবু বড় হইয়াছে, ইস্কুলের বড় সংস্করণ কলেজ যে কি হওয়া সম্ভব—বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

বিকাশের গল্প বলার মধ্যে অপেক্ষাকৃত গাম্ভীর্য আসিয়াছে নিশ্চয়, কিন্তু তবু পুরনো মন্দির বা পরিত্যক্ত বাড়ির চারিদিকে একটা কল্পনার কুহেলী বিস্তার করার ঝোঁকটা যায়

BanglaBook.org

নাই। একবার বেড়াইতে বেড়াইতে ধর্মতলার বটবিদীর্ণ ধর্মঠাকুরের মন্দিরে একটা ছাপমারা ইষ্টকখণ্ড তুলিয়া খুব গভীর ভাবে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিল—"নাঃ, ভাবিয়ে তুললে!"

গিরিবালা আর সাতু নিরতিশয় কুতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল—"কেন বিকাশদা?"

বিকাশ গম্ভীরভাবে উত্তর করিল—"এর এক-একটা ভাঙা অক্ষরের পেছনে যে কত বড় এক-একটা ইতিহাস আছে, কত বড় কীর্তি সব!...যদি কখনও মিউজিয়ামে যাস তো বুঝবি।"...টুকরাটা পকেটস্থ করিল।

গিরিবালা কিছু বুঝিল না, শুধু একবার বটগাছটা আপাদশীর্ষ দেখিয়া বলিল—"ওরে বাব্বা!"

সাতকড়ি ইতিহাস কথাটা বুঝিল। যথানিয়ম দিদির মতো একবার—"ওরে বাব্বা!" বলিয়া স্বীয় পাণ্ডিত্যের প্রমাণ হিসাবে ইতিহাসের খুব একটা জবরদস্ত নাম আনিয়া হাজির করিল—"তৈমুরলঙ্গের কীর্তি বিকাশদাদা?"

বিকাশ তাহার পানে চাহিয়া বলিল—"কোথায় বেলে-তেজপুর আর কোথায় তৈমুরলঙ্গ! তুই একটু মন দিয়ে পড়াশুনা করবি সাতু।"

।। ৭ ।।

সিংহবাহিনীর মন্দিরে বিকাশের মানসিক পূরণ করাই কাত্যায়নীর বেলে-তেজপুরে আসিবার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না; আরও একটা ছিল, যেদিন আসিলেন সেইদিনই সন্ধ্যার পর কাত্যায়নী সেই কথাটা পাড়িলেন।

আকাশ পরিষ্কার, বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, গাছের খণ্ডিত ছায়া দোল খাইয়া খাইয়া সেটাকে করিয়া তুলিয়াছে সচল, কে যেন আঙুল লতাইয়া উঠানটায় লক্ষ্মীপূজার আলপনা দিয়া চলিয়াছে। বরদাসুন্দরী রান্নাঘরে; খন্তিনাড়ার শব্দের সঙ্গে মসলার গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে, তাহারই সঙ্গে বিকাশের গলার আওয়াজ। মাঝে মাঝে গড়গড়ার আওয়াজটা থামিয়া গিয়া অন্নদাচরণের প্রৌঢ় কণ্ঠের ভারী আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছে, সমস্ত জিনিসটা উপযুক্ত পুত্রের সঙ্গে পিতার পরামর্শের মতো শান্ত, গম্ভীর। রসিকলালের ঘরের দাওয়ায় সাতকড়ি আর হরু খোকাকে লইয়া কি একটা হুড়োহুড়ি খেলা করিতেছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ তাহাদের কণ্ঠস্বর হাস্যে কলরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। গিরিবালা আছে ঘরের মধ্যে, বোধ হয় শয্যারচনা করিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া ভাইদের বারণ করিতেছে—"ওরে থাম, দেখছিস বাবার শরীরটা খারাপ!"

রসিকলাল বলিলেন—"আমায় এক ছিলিম তামাক আগে সেজে দে মা গিরি।"

—একখানি আদর্শ সংসারের চিত্র,—শান্ত, তৃপ্ত, আপনাতেই আপনি পরিপূর্ণ। উঠানের মাঝখানে একটি শানের চাতালে কাত্যায়নী একলা বসিয়া বসন্তকুমারীর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমে ধীরে ধীরে চক্ষু দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল। খানিকক্ষণ যেন একটি স্রোতের মধ্যে শরীরটাকে আলগা করিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, ক্রমেই কোথায় যেন তলাইয়া যাইতেছেন, তৃপ্তিতে অতৃপ্তিতে মেশানো কোন্ এক অতলে।

এক সময় চোখ দুইটা মুছিয়া উঠিয়া পড়িলেন, একলাই একটু এদিক-ওদিক করিয়া

BanglaBook.org

মনটাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইলেন। নিকুঞ্জলালের স্ত্রী অসুস্থ, বসন্তকুমারী একবার দেখিয়া আসিতে গেছেন, এখনই আসিয়া পড়িবেন।

তিনি আসিলে দুজনে আবার চাতালটায় আসিয়া বসিলেন। খানিকটা একথা-সেকথার পর কাত্যায়নী বলিলেন—"গিরির সম্বন্ধের কিছু হল দিদি?"

বসন্তকুমারী উত্তর করিলেন—"কৈ, এখনও কিছু তো হল না ভাই। মুখে তো ভাত ওঠে না আমার। কত্তারা যে বসে আছে নিশ্চিন্দি হয়ে এমন বলতে পারি না, তবে খুব যে গা আছে, তাই বা কৈ? বাপের অবস্থা তো দেখছই—আপনভোলা মানুষ, কোন্ কথাটাতেই বা আছে সংসারের? জেঠাকে যদি বললে..."

বসন্তকুমারী গরগর করিয়া যাইতেছেন, কাত্যায়নী মাথা নিচু করিয়া নীরবে শুনিয়া যাইতেছেন, একসময় মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আমি একটা কথা বলব দিদি?"

বসন্তকুমারী জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া বলিলেন—"কি কথা বল না।"

"গিরিকে আমায় দাও।"

বসন্তকুমারী মুখের পানে চাহিয়া বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"বুঝলাম না!"

একবার কথাটা পাড়িয়া ফেলিয়া কাত্যায়নী আর কোনখানে আটকাইলেন না, বাকি কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলিয়া গেলেন—"আমার একটি বৈমাত্র দেওর আছে জানো বোধ হয় দিদি, তার একটি ছেলে আছে।...ঐ একটি মাত্র ছেলে, বাপের সমস্ত সম্পত্তি যা কিছু সব ওতেই বর্তাবে, নেহাত কিছু মন্দও নয়; পাঁচিশ-ত্রিশ ঘর যজমান আছে, তা ভিন্ন জোত-জমি, বাগান-পুকুর; একটা গেরস্তের খুব ভালো ভাবে চলে যাবে। তারপর আমার ভাগের যা আছে সব গিরিরই হবে; একটা কানাকড়িও রাখব না দিদি। দিদিকে আর আমায় বাবা গয়না-পত্তর কম দেননি, বরুর বেলায়ই না হয় অবস্থাটা একটু পড়ে এসেছিল,—আমি একটি একটি করে গিরির গায়ে সাজিয়ে দোব। বলবে, জায়গাটা একটু একটেরেয়। কিন্তু সমাজ জায়গা, গিরি বনবাদাড়ে পড়বে না। তোমার কাছে মনের কথা নুকোব না দিদি, আমার বরাবরই সাধ ছিল। এবার গিরি যেতে আমি দেওরকে ডাকিয়ে আনিয়ে দেখিয়ে দিয়ে পাড়লাম কথাটা। সে তো রাজী, একটি পয়সা কামড় হবে না। এদিকে সম্বন্ধেও মোটেই আটকায় না, সে সব আমি, একজন না, কয়েকজন ঘটকপুরুতকে দিয়ে বিচার করিয়ে দেখেছি, কিছু আপত্তির নেই..."

কাত্যায়নী সামান্য একটু থামিলেন, তাহার পর দুই হাতে বসন্তকুমারীর ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কণ্ঠে অশেষ আকৃতি ঢালিয়া বলিলেন—"তুমি দাও আমায় গিরিকে দিদি, আবার আমি একটু সংসার পাতি, মুখ তুলে চাও ছোট বোনের ওপর।"

তাঁহার চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিয়াছে।

প্রস্তাব অত্যন্ত আকস্মিক, তায় কাত্যায়নীর বাক্যস্রোতে অভিভূত হইয়া বসন্তকুমারী ভাবিবার অবসর পাইতেছেন না, কতকটা বিমূঢ় ভাবে মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ছোট বউকে বলেছিস?"

এতক্ষণ প্রার্থনা ছিল, কাত্যায়নী এবার তাহার সঙ্গে খোশামোদ জুড়িয়া দিলেন, বলিলেন—"হ্যাঁ, বরুকে আমি বলতে গেলাম! তুমি থাকতে বরু কে তা তো বুঝি না।"

বসন্তকুমারী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন ; বিলম্বে সুর কাটিয়া যাইতেছে দেখিয়া কাত্যায়নী বলিলেন—"দিদি, দাও কথা, পায়ে ধরি তোমার।"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"এতে আর পায়ে ধরার কি আছে কাতু?—তুই তো মন্দ কিছু বলছিস না যে...ছেলেটি কেমন?"

কাত্যায়নী ক্ষণমাত্র নিরুত্তর রহিলেন, কথাটা যেন গলায় আটকাইয়া গেল, একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"ছেলে—যেমন গেরস্তর ছেলে হয়—জমিটমি আছে, বাপ এখনও সবল, সে-ই দেখাশুনা করে—তা বলে ছেলে যে ঘুরেও দেখে না এমন নয়..."

একটু যে ছন্দপতন হইলই বসন্তকুমারীর সেটুকু কান এড়াইল না। তবে তিনি সেদিকে খুব খেয়াল করিলেন না। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, বোধ হয় একটু বেশী সঙ্গীপ্রিয়, —ও ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। এক ছেলে, একটু আদুরে হইবেই।

বসন্তকুমারীর দৃষ্টিটা সুবিধাগুলির দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল ; জোত-জমি, যজমান, গয়না—সব দিক দিয়া যে একটি প্রাচুর্যের ছবি তাহারই উপর। এর অতিরিক্ত কাত্যায়নী যদি নিজে গিয়া সংসার পাতে—আর পাতবেই, নারীর মন দিয়া কাত্যায়নীর ক্ষুধাটা স্পষ্টই বুঝিতে পান—তাহা হইলে গিরিবালার আর কিছুই দুঃখ থাকিবে না।...সচ্ছল সংসার —কাত্যায়নী তার বুকের সঞ্চিত মধু সমস্তটুকু উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, আর কি চাই?

কল্পনার মাঝেই বসন্তকুমারী বলিলেন—"বেটাছেলেদের বলে দেখব কাতু।"

কাত্যায়নী আবার হাতটা চাপিয়া ধরিলেন—"তোমায় কথা দিতে হবে দিদি, আমি তোমার সামনে বেটাছেলেদের অত বুঝি না।"

চরমের কাছাকাছি আসিয়া যেন আর নিজেকে সামলাইতে পারিতেছেন না।

বসন্তকুমারী ঈষৎ হাসিয়া কাত্যায়নীর পিঠে বাঁ হাতটা বুলাইয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন —"তুই ছেলেমানুষই রয়ে গেলি কাতু, কথা কি মেয়েমানুষ হয়ে আমি দিতে পারি? তবে এইটুকু তোকে বলতে পারি যে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। অমতের মতন তো কিছুই দেখছি না।"

সেই রাত্রেই কথাটা স্বামীর কাছে পাড়িলেন। অন্নদাচরণ খুব বেশি ভাবিয়া দেখিলেন বলিয়াও মনে হইল না ; বলিলেন—"এ তো অতি উত্তম কথা, আজ হয় তো কাল নয়। তোমরা মেয়েছেলে, চোখে দেখলেও বুঝতে পার না,—দেখতে পাচ্ছ না ভগবানের উদ্দেশ্যটা—ঠিক এই সময়টিতে হরিপুরের বাবুদের সঙ্গেও মহরম-মহরম হতে চলল, হাতে কিছু এলও, আর যেমন বুঝছি, আরও আসবে।...সে কি কথা!—ওঁদের কামড় নেই বলে গিরিকে আমি শুধু শাঁখা পরিয়ে বিদেয় করব নাকি? শুনি?"

অন্নদাচরণের প্রায় নিয়মেই হইয়া গেছে, গিরিবালার বিবাহের কথায় শেষ পর্যন্ত খানিকটা রাগ রসিকলালের উপর গিয়া পড়িবেই ; পড়িলও। বলিলেন—"কথাটা ওঁকেই তুলতে হল! কেন, রসিক কি খোঁজ রাখতে পারতো না?—বয়ে গেছে তার এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে! ততক্ষণ পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে বসে ছড়া আওড়ালে কাজ দেবে।"

তবুও মেয়ের বাপই, মনস্থির করিয়া ফেলিলেও অন্নদাচরণ সকালে ভ্রাতাকে বাহিরের ঘরে লইয়া গিয়া একান্তে কথাটা বলিলেন। শুনিয়াই রসিকলাল বিমূঢ় হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন,—"ওখানে গিরির বিয়ে!"

BanglaBook.org

অন্নদাচরণ একটু রাগিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"আপত্তিটা কি শুনি? কোথাও ঠিক করেছ?"

আপত্তি!...কে বুঝিবে মনের কী যে গোপন আকাঙ্ক্ষা, কি যে গভীর বিশ্বাস? ...পার্বতী-উমার জন্য শিব আসিবেন নিজে—বাপের অন্তরের অভিলাষ বাতুলের বিশ্বাসের রূপ ধরিয়াছে,—মুখ ফুটিয়া বলিলেই যে প্রলাপ!...আর, হে দেব, বিশ্বাস সম্বলটুকুও যে সত্যই ধরিয়া রাখা যায় না—গৌরীদান!—সে স্বপ্ন গেল, এখন আনন্দের পুত্তলি হইয়া উঠিয়াছে, নিদ্রা-জাগরণের দুশ্চিন্তা...

রসিকলাল যেন একটা আচ্ছন্নভাব থেকে জাগিয়া উঠিয়া আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন—"ঠিক?—কৈ, নাঃ...বলছিলাম—বলছিলাম ওখানে বিয়ে দিলে তো খুবই সুবিধে হয়।"

ভ্রাতৃবধূকেও অন্নদাচরণ নিজের মুখেই শুনাইলেন কথাটা। বরদাসুন্দরী বসন্তকুমারীর মুখেও শুনিয়াছিলেন, সাতুকে দিয়া জানাইলেন তাঁহারা যাহা করিবেন তাহাই হইবে, আর এ তো সব দিক দিয়াই আনন্দের কথা।

সেই দিন সংবাদটা বেশ ভাল করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বৈকালবেলায় দামিনী পান চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুয়ার টপকাইয়া হাঁক দিলেন —"কৈ গো, আমাদের হবু-বেয়ান কোথায়? বড়গিন্নি কৈ গো?"

বরদাসুন্দরী বাহির হইয়া আসিলেন, দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া দিয়া বলিলেন—"বোস ঠাকুরঝি, দিদিরা এই যে বেরুলেন কোথায়।"

দামিনীর সেটা অজ্ঞাত নয়, ওঁর নিয়মই হইতেছে আগে হইতে খোঁজ লইয়া তবে আসেন, দুই জা বাড়িতে থাকিলে আসেন না, আসিয়া কোন কাজ হয় না।

দামিনী উপবেশন করিলে বরদাসুন্দরী একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"শুনেছ বোধ হয় ঠাকুরঝি?"

"ওমা শুনব না? বলে, কাক-কোকিলের মুখে উড়ছে কথা!"

সামনে হাতটা চাপিয়া বলিলেন—"বোস, ছোটবউ। একটা কথা শুনলাম তাই ছুটে এলাম। তোরা জিগ্যেস করিস না-করিস, ঠাকুরঝির মনটা রসিক আর ছোটবউয়ের কাছে পড়ে থাকে অষ্ট পহর,—আহা, দুটোই হয়েছে সমান, সংসারের ভালোমন্দ কিছুই বোঝে না! বলি, হ্যাঁলা, এ দুর্মতি হল কেন—বোনে-বোনে বেয়ানের সুবাদ?"

বরদাসুন্দরী একটু ভীত হইয়া বলিলেন—"কেন ঠাকুরঝি, অন্যায় হয়েছে? দিদির বৈমাত্র দেওরপো, সম্বন্ধে তো..."

দামিনী বলিলেন—নৈলে আর হাঁদা বলি কেন? শুধু যে অন্যায় হয়নি তাই নয়, এমন সম্বন্ধ লাখে একটা হয় না, ভাল ঘর, তায় জানা ঘর...এমনি যা-তা সম্বন্ধ যে তুমি করবে না তা আমি জানি ; কিন্তু একজনের মুখ বন্ধ করবে কি করে?—আর যে-সে একজন নয় তো?"

কথার ঢোʼটা নতুন না হইলেও বরদাসুন্দরী একটু ভীত হইয়া উঠিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে 'একজন' ঠাকুরঝি?"

"ঐটি ঠাকুরঝিকে জিগ্যেস করো না বোন ; আন্দাজে বুঝতে পার ভালই, সাবধান হবে, না পার, সেও মন্দ নয়।...কত কথা সে!—'এইবার দুই বোনে একজোট হলেন,

BanglaBook.org

আর কি আমরা থৈ পাব ঠাকুরঝি?'...এই দেখ বেরিয়ে গেল নামটা মুখ দিয়ে...'আর কি আমরা থৈ পাব ঠাকুরঝি? ও শুনতেই ভাই-ভাদ্দোরবউ—কোকিল-ছাঁয়ের মতন পুষে মরো, ডানা গজালেই নিজের পথ দেখবে'...সে ইনিয়ে-বিনিয়ে কত কথা!—শুধু তোর নামে হলে তো বাঁচতাম, শুনে শুনে, সয়ে সয়ে তোর ঘাটা পড়ে গেছে; চিরকালটা এখন হবেও শুনতে, কিন্তু ঐ একটা বিধবা, তায় কুটুম মানুষ, তার ওপর আবার নতুন কুটুম হতে চলল,—ওর নামেও এই এতগুলো—'দেখো ঠাকুরঝি, বলে রাখছি—ছোট বোন তো কি, বড়টি আবার যা সেয়ানা!—বছর না ঘুরতে যদি হাঁড়ি আলাদা না করিয়ে দেয় তো'..."

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গেলে কাত্যায়নীকে লইয়া বসন্তকুমারী বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। মনটা খুবই প্রফুল্ল, বেশ জোর গলায়ই কি একটা গল্প করিতে করিতে আসিতেছেন, উঠানে আসিয়া ডাকিলেন,—"ছোটবৌ কৈগা?"

"এই যে" বলিয়া বরদাসুন্দরী রান্নাঘরের দাওয়ার নিচে নামিয়া আসিলেন।

বোঝা গেল কর্তাদের কেহই বাড়ি নাই। বসন্তকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে, দামু-ঠাকুরঝি এসেছিল?"

বরদাসুন্দরী বলিলেন—"এসেছিল বৈকি।"

বসন্তকুমারী হাসিয়া কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"দেখলি?—না এলে ওর ভাত হজম হবে না।"

জাকে প্রশ্ন করিলেন—"কিছু বললে?"

বরদাসুন্দর একবার কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে কাত্যায়নীর পানে চাহিলেন।

বসন্তকুমারী হাসিয়া বলিলেন—"আ গেল যা! কাতু জানে, সব শুনেছে আমার কাছে। তোকে কি বলে গেল তাই বল্ না।"

জায়ের অপেক্ষায় না থাকিয়া বসন্তকুমারী নিজেই মুখটা গম্ভীর করিয়া লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিতে লাগিলেন—"এইবার দুই বোনে একজোট হলেন, আর কি আমরা থৈ পাবো ঠাকুরঝি?...দেইজিবালাই, কোকিল-ছাঁয়ের মতন, পুষেই মর, বলে, একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর—ছোট তো কি, বড় বোনটি আবার যা সেয়ানা!'—বল্ না, হাঁ করে রইলি কেন?"

কাত্যায়নীর মুখে কাপড় দিয়া দম আটকাইয়া যাইবার মতো হইয়াছে, বরদাসুন্দরী অত্যন্ত ভীত এবং বিস্মিত হইয়া একবার তাঁহার দিকে একবার জায়ের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কি করে জানলে দিদি? ঠিক এ সব কথাই তো ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে গেল?"

বসন্তকুমারী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আ মর!—আমিই বাড়ি বয়ে গিয়ে গুছিয়ে গুছিয়ে সব বললাম, আর জানব না?"

বরদাসুন্দরী আরও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"সত্যি বললে?"

"ও মা, বলব না?—আজ আমার কত আহ্লাদের দিন, ও উনুন-মুখীকে ক্ষেপিয়ে পাড়ায় একটা গুলতান তুলব না? আমায় কত দরদ দেখিয়ে বললে—'ও যেমন হাঁড়ি তেমনি সরা বোন; শুধু ছোট বউকেই চিনেছ, ছোট কত্তা এখনও চিনতে বাকিই আছে।

BanglaBook.org

দামু ঠাকুরঝি বরাবরই বলে এসেছে, কিন্তু সময়ে তো হলে না সাবধান, এখন'..."

কর্তারা নাই, দামিনীর নকল করিয়া বসন্তকুমারী তিনজনের চাপা হাসিতে বাড়িটা মুখরিত করিয়া তুলিলেন।

॥ ৮ ॥

আশ্চর্যের বিষয় এই হইল যে সব চেয়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন রসিকলাল নিজে, আর হঠাৎ। অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিকাশের সঙ্গে কাব্য আলোচনা করিলেন, ওদের যে-সব কাব্য কলেজে পড়ানো হয়—গ্রের এলিজি, কোলরিজের দি রাইম্ অব্ দি এনশিয়েন্ট্ মেরিনার—আরও সব অন্যান্য কবিদের ছাড়া ছাড়া কবিতা। ইংরেজী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি খুব অধিক নয়, বহুদিনের অপরিচয়ও, তবু নিজের কবি-মন, খুব উৎসাহভরেই আলোচনায় যোগদান করিলেন। নিজের কবিতাও বিকাশকে পড়িয়া শোনাইলেন...বিয়ের কথাও উঠিল, অন্তত সপ্তাহখানেক পূর্বে তো বিকাশকে ছুটি লইয়া আসিতে হইবে, সেই এখন বাড়ির বড় ছেলে বলিতে গেলে।...বিকাশ তো বড় হইয়াছে, স্বাধীন মতামত হইয়াছে একটা—গিরির সম্বন্ধটা বিষয়ে তাহার মত কি?

কাব্যের আলোচনায় বিকাশের সে উৎসাহটি শিখায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, হঠাৎ একটু যেন স্তিমিত হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল—"ছেলেটি দেখেছেন?"

রসিকলালের মুখটা প্রসন্নতায় দীপ্ত হইয়া উঠিল—"কাতু দিদির দেওরপো, দাদা সব শুনেটুনে চারিদিক ভেবেটেবে কথা দিয়েছেন, এ যে দেখার চেয়েও বেশি হল বিকাশ! তা ভিন্ন নীলমণিদাকে যে অনেকবার দেখেছি—আরে তাঁরই ছেলে তো? না..."

হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, যেন ভাবী বেহাই-এর সাক্ষাতেই তাঁহাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছেন।

সকালে শরীরটা বেশ ভাল ছিল না, তবু ঘুড়ি কশাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। দূরে, বেলের ওদিকে ঝিক্নের রায়েদের বাড়ি একটা পুরনো কেস আছে, আগে সেইখানেই গেলেন। পথে হারাণের সঙ্গে কথাবার্তা হইতে লাগিল—

"দেহটা খুব যে ভালো আজও এমন নয়, তবে সামনে একটা অতবড় খরচ, আর বসে থাকা চলে রোজগার ছেড়ে? বেরুলেই কোন্ না দু-তিনটা টাকা আসছে আজকাল? দাদা যাই বলুক, তুই তো দেখেছিস? ঝিক্নেতেই যাচ্ছি আজ, কটা ভিজিটের টাকা বাকি পড়ে গেছে, এবার আদায় করতে হবে..."

রসিকলাল একটু রাগিয়া উঠিলেন, যেন ক্রোশ দেড়েক দূরে রায়েদের শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—"করতে হবে না আদায়? ভিক্ষে তো চাইছি না, নিজের হক্কের টাকা। দু-কোশ পথ ভেঙে রোগী দেখতে যাচ্ছি, আর টাকার বেলায়...তুলবি কথাটা, আমি তুলতাম, কিন্তু...তা আমার সামনেই তুলবি, ভয়টা কিসের? না হয় তুলবই আমি নিজে; মেয়ের বিয়ে রয়েছে, আর কত খাতির করব?"

হারাণ বলিল—"তোমায় দিয়ে হবে নি বাবাঠাকুর, বড্ড মরা রাশ তোমার; আমি নিজেই তুলব'খন।"

রসিকলালের উৎসাহটা নিবিয়া গেল, ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি অনুভব করিয়া

BanglaBook.org

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"আমার সামনে তুলতে তোর কোন রকম ইয়ে হয়, না হয় একলা বিকেলেই আসিস একবার তাগাদা দিতে।"

আর একটু চুপচাপ থাকিয়া বলিলেন—"সেই ভাল, বিকেলেই আসিস'খন, শরীরটার জুত নেই, ওবেলা তো আর বেরুতে পারব না, বসে বসে কি করবি?"

রায়েদের বাড়ি ষোলটি টাকা ভিজিট পাওয়া গেল। হাতে টাকা আসিয়াছিল, রোগীটিও বেশ সারিয়া উঠিতেছে। একেবারে আজ পর্যন্ত চুকাইয়া দিল।

রসিকলালের মনে যে কী হইতেছিল, প্রকাশ করিবার ভাষা পাইতেছিলেন না বলিয়া অনেকটা পথ নীরবেই চলিলেন। এক সময়ে বলিলেন—"লক্ষণটা মিলিয়ে দেখছিস হারাণে? পাব না কেন?—পেয়েছি, একসঙ্গে চার টাকা ছ'টাকা ওবধি পেয়েছি। যেই বিয়ের কথাটি উঠল একেবারে ষোল-ষোলটা টাকা—একটা সিভিল সার্জেনের ভিজিট! লক্ষণটা মিলিয়ে দেখ একবার!"

কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে মনটা যেন আরও ভরাট হইয়া গেল, আবার চুপ করিয়া গেলেন। টাকাগুলো খুব একটা বড় কাজের জন্য পকেটে যেন ছটফট করিতেছে। খানিকটা গিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ভাল কথা মনে পড়ে গেল, একবার চিনিবাসের দোকানে যেতে হবে না? বিয়ের যা গয়না, তা তো দাদা ঠিকঠাক করবে, বাপ হয়ে আমার একটা আলাদা না দিলে কি ভাল দেখায়? তুই-ই বল্ না হারাণে?"

চিনিবাস স্বর্ণকারের দোকানের পথ বাগদী পাড়ার ভিতর দিয়া। মোড় ফিরিয়া দুলালের বাড়িটা নজরে পড়িতেই দেখা গেল দুলালের বউ একটি শিশু কোলে হা-প্রত্যাশা করিয়া কাহার পথ চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রসিকলাল কয়েক পা অগ্রসর হইবার পূর্বেই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল ঝালরের মতো শতচ্ছিন্ন যে ময়লা কাপড়টা পরিয়াছিল যেন সেইটাকেই আড়াল করিয়া ফেলিবার জন্য।

রসিকলাল বাড়ির সামনেটা একটু ছাড়াইয়া গেছেন, দুলালের একটা ছেলে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"বামুনডাক্তার গো, বাবা আবার অসুখে পড়েলো।"

রসিকলাল ঘুড়িটা দাঁড় করাইয়া বলিলেন—"কবে থেকে? বেশ তো ভাল হয়ে গেছল।"

এই দুঃস্থতম পরিবারটি সব দিক দিয়া তাঁহাকে বেশি দোহন করে বলিয়া রসিকলাল হারাণের কাছেও একটু 'কিন্তু' হইয়া থাকেন। তাহার পানেই চাহিয়া বিরক্তির সহিত বলিলেন—"ভাল একটি পথ্যি করবে না, আমি ওষুধ দিয়ে দিয়ে মরি! আমার ওষুধের তো দাম নেই!"

জ্বরটা খুব বেশি, দুলাল বাহিরে উঠিয়া আসিতে পারিল না, রসিকলালকেই ঘরে গিয়া দেখিতে হইল।

পরশু থেকে জ্বর হইয়াছে, ওর স্ত্রী কাল গিয়াছিল বামুনডাক্তারকে জানাইয়া ঔষধ লইয়া আসিতে, পথেই শুনিল তাঁহার শরীরটা খারাপ আর যায় নাই। আর কেনই যে তাহার জন্য ঔষধ-পত্র করা, সে আর বাঁচিবে না। এত করিয়া বারণ করিল—কাজ নেই দা'ঠাকুরকে ডাকিয়া—তা রাস্তা থেকে তাঁকে এই নরককুণ্ডুতে ডাকিয়া আনা—যাইবার সময় বামনের শাপমন্যি কুড়ানো।

দুলালই শ্বাস টানিয়া টানিয়া বলিয়া যাইতেছিল, অন্যবার তাহার স্ত্রী থাকিয়া ঘোমটার

BanglaBook.org

আড়াল হইতে বিবরণগুলা দেয়, এবারে সে একেবারেই আড়ালে রহিল, তাহার চাপা কান্নার ধ্বনি আর মাঝে মাঝে জ্বরের এক-একটা লক্ষণের কথা শোনা যাইতে লাগিল।

অন্য অন্য বারে রসিকলাল একটু আধটু ধমক দেন, আজ আর দিলেন না। ঔষধ দিয়া পথ্যের কথা বলিয়া পকেট থেকে একটি টাকা বাহির করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর হঠাৎ যেন মনে পড়িয়া গেল এই ভাবে বলিলেন—"আর একটা কথা শুনিসনি বুঝি?—গিরির আমাদের যে বিয়ে!"

খুব যেন অন্তরঙ্গ কাহাকে খবরটা দিলেন এই ভাবে স্মিত বদনে দুলালের পানে চাহিয়া রহিলেন। দুলাল ক্লিষ্টস্বরে যতটা আনন্দ আনা সম্ভব আনিয়া বলিল—"হবে ; আর খুব ভালই হবে দা'ঠাকুর ; ধম্মঠাকুর জাগ্‌গত দেবতা, নক্ষীর মা আর আম্মি যেতে এসতে নিত্যি মাথা ঠুকি ; আমাদের পাখোনা যে শুনতে হবেই দা'ঠাকুর তানাকে..."

দুয়ারের নিকট হইতে রসিকলাল আবার ফিরিয়া আসিলেন। পকেট থেকে আস্তে আস্তে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া দুলালের শিয়রের কাছে রাখিয়া বলিলেন—"আর এই এক-আধখানা কাপড় সবাইয়ের জন্য কিনে নিবি দুলু—সবাইকে গিয়ে ক'দিন কাজের বাড়িতে খাটতে হবে তো?"

কি যে একটা প্রবাহ নামিয়াছে মনে, শুধু ইচ্ছা হইতেছে বন্যার নদীর মতো চারিদিকে ছড়াইয়া দিই নিজেকে।

চিনিবাসের দোকানে একটা হারের কথা ঠিকঠাক করিয়া ফিরিতে ফিরিতে রসিকলাল কয়েকবার পকেটে হাত দিয়া আবার খালি হাতটা বাহির করিয়া লইলেন, তাহার পর একবার কুণ্ঠা কাটাইয়া দুইটা টাকা বাহির করিয়া বলিলেন—"এই দুটো টাকা তুই আজ রাখ হারাণে, প্র্যাকটিস্ আরম্ভ করেছি পর্যন্ত কখনও তো মুখ ফুটে চাইলিনি একবার! অনেকবারই ভেবেছি, না চাক, আমারই হাত তুলে দেওয়া উচিত ; তা হয়েই ওঠে না, দেখছিস তো খরচের হিড়িকটা?...নে ধর—গোটা পাঁচেক দোব পুরিয়ে ; আজ আপাতত এই দুটো রাখ, দাদাকে আর বলে কাজ নাই, ভারি তো দিচ্ছি তার আবার..."

হারাণ বলিল—"তা দাও বাবাঠাকুর। এমনি তো খাচ্ছি পরছি তোমাদেরই, তবুও সবাই ছুতোনাতা করে টেনে নিচ্ছে, হারাণেরই কি সাধ হয় না বাবাঠাকুর আশীব্বাদ বলে হাত তুলে দেয়? বলিনি,—দেখছি এসছে আর বেইরে যাচ্ছে, এসছে আর বেইরে যাচ্ছে। দাও, এ দুটো নক্ষীর পেতেয় তুলে রাখব।"

টাকা দুইটি কপালে ঠেকাইয়া পিরানের পকেটে রাখিয়া দিল।

একবার হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"এই দেখ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছিলাম। কদ্দিন থেকে গিরি রমেশের দোকানের সেই পুতুলটার কথা বলে আসছে! চল্, একবার ওদিক হয়েই যাই।"

রমেশ বর্ণনা শুনিয়া এবং ইতিহাস শুনিয়া একটু হাসিল, বলিল—"সে কবে বিকিয়ে গেছে, অ্যাদ্দিন থাকে কখনও?"

কয়েকটা অন্য পুতুল দেখাইল।

রসিকলালের বুকে একটা বড় আঘাত লাগিল, ছেলেবেলায় পুতুলটার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া গিরিবালা বলিতেছে—"বাবা, ঐটে...।" কচিমুখে অসম্ভব আবদারের লজ্জা এবং আশঙ্কা লাগিয়া আছে ;—ছবিটা স্মৃতির বিদ্যুৎস্ফুরণে জ্বলজ্বল করিয়া উঠিল

BanglaBook.org

একবার।...সে-গিরিবালা আবদার বুকে করিয়াই মিলাইয়া গেছে, এ-গিরিবালাও যাইতে বসিল।

কিন্তু আজ আঘাতের ব্যথাটুকু আর স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। পকেট থেকে দুইটা টাকা বাহির করিয়া রসিকলাল টেবিলের ওপর রাখিয়া বলিলেন—"না, তুমি সেই রকম একটা পুতুল নিয়ে আসবে রমেশ, যাওয়া-আসা তো আছেই কলকাতায়।"

ষোল টাকার মধ্যে ছয়টি টাকা অন্নদাচরণের হাতে উঠিল। এত বড় একটা অভাবনীয় ব্যাপার, রসিকলাল একদিনে একসঙ্গে ছয়-ছয়টা টাকা দিয়াছেন, জ্যেষ্ঠের মনে পড়ে না। প্রীতিভরে ভাইকে খুব উপদেশ দিয়া বলিলেন—"গিরিটার বিয়েটুকু হয়ে যাক তারপর তুই থাক না নিজের খেয়াল-খুশি নিয়ে রসিক, বলতে যাব কিছু? আমারই মাথার ওপর একটা দাদা থাকলে আমি এই জোয়াল ঘাড়ে করতাম নাকি? রাম বলো।"

সন্ধ্যার দিকেও শরীরটা ভাল ছিল না ; না থাকিবারই কথা, তবু রসিকলাল একবার পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি গেলেন ;—সমস্ত দিনের সেই আবেগের জোয়ারটা যেন ঠেলিয়া লইয়া গেল বলা চলে। যখন পৌঁছিলেন সন্ধ্যাবন্দন সারিয়া পণ্ডিতমশাই বাড়ির সামনের শানের বেঞ্চটিতে আসিয়া বসিয়াছেন। বেঞ্চের উপর একটা ছোট মাচায় থরে থরে মালতী ফুল ফুটিয়াছে—কতকগুলা শানে, কতকগুলা নিচের জমির উপর ঝরিয়া পড়িয়াছে—জ্যোৎস্নার গায়ে সাদা সাদা বুটির মতো। অন্য স্থানেও জ্যোৎস্না ওঠে, ফুল ফোটে, তাহার গন্ধ ছড়ায়,—কিন্তু এখানে এই সদাপ্রফুল্ল, আত্মসমাহিত ব্রাহ্মণকে ঘিরিয়া তাহারা একটা অন্য লোকের সৃষ্টি করে।

দূর থেকেই পণ্ডিতমশাইকে বাহিরে বসিয়া থাকতে দেখিয়া রসিকলালের মুখে হাসি ফুটিল। পণ্ডিতমশাইও দূর থেকেই প্রশ্ন করিলেন,—"কি, রসিক নাকি? এসো, এসো।"

রসিকলাল পায়ের ধূলি লইয়া সামনের বেঞ্চটায় বসিলেন, হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"শুনেছেন বোধ হয়?"

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"সমস্ত দিনটা বাড়িতে ছিলাম না, ব্যাপার কি? তোমার মুখ দেখে বোধ হচ্ছে যেন ভাল খবর এনেছ কি একটা?"

"খুব ভালো খবর"—আনন্দের আতিশয্যে কথাটা কণ্ঠে আটকাইয়া গেল। পণ্ডিতমশাই প্রসন্ন উৎসুক দৃষ্টিতে শিষ্যের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

রসিকলালের মুখটা যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—একটি রাঙা গোলাপ যেন শেষ পাপড়িটি পর্যন্ত মেলিয়া ধরিয়াছে।—"খুবই ভালো খবর পণ্ডিতমশাই, আপনার গিরির..."

সঙ্গে সঙ্গেই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বেঞ্চের পিঠে মাথা দিয়া শিশুর মতোই হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—"উঃ, আমার সব স্বপ্ন ভেঙে গেল পণ্ডিতমশাই।..."

বাড়ির মধ্যে আরও একটি চিত্তে এই রকম প্রবাহ নামিয়াছিল—যদিও এই রকম আনন্দের ছদ্ম মূর্তিতে নয়।

অনেক সময় দেখা যায় চাওয়ার ঔৎসুক্যের মধ্যে এবং পাওয়ার প্রতীক্ষার মধ্যে কী যে চাহিতেছে তাহার স্বরূপটি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। সেটা ধরা পড়ে, যখন

BanglaBook.org

এত প্রাণ মন দিয়া যাহা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছি, সেটা হাতে আসিয়া পড়ে। তখন নিজের আকাঙ্ক্ষার সর্বগ্রাসী রূপ দেখিয়া নিজেকেই শিহরিয়া উঠিতে হয়। যতক্ষণ চাওয়ার মেয়াদ, ততক্ষণ না পাওয়ার আশঙ্কার সঙ্গে পাওয়ার সম্ভাবনার একটা সুদৃঢ় আনন্দ মিলিয়া সমস্ত মনকে একটি মাত্র মিশ্র চেতনায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মনের আর বিচার করিবার অবসর থাকে না, সে শুধুই ছোটে তার প্রেয়ের পানে—যতই ছোটে, ছোটার উন্মাদনায় ততই তৃষ্ণাটা বাড়িয়া যায়। ক্রমে সেই তৃষ্ণাটাই হইয়া পড়ে মূল অনুভূতি।

তাহার পর তপস্যার শেষে হয় বর লাভ। উন্মাদনা গিয়া স্নিগ্ধ শান্তি আর অবসাদের মধ্যে মনটা যেন নিজে থেকে আলাদা হইয়াই বিচারে বসে যাচাই করে—যাহা পাইলাম সেটিকেও, আর যে পাইল তাহাকেও, অর্থাৎ নিজেকেও।

প্রথম দিনটা সাফল্যের উল্লাসে, বিশেষ করিয়া বসন্তকুমারী সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ানোয়, আলাপ-আলোচনায় ক্বচিৎ নূতন কুটুম্বিতার হাসি-ঠাট্টায় কাত্যায়নী অতটা বুঝিতে পারিলেন না, শুধু সব কিছুর মাঝে মাঝে মনটা যেন অহেতুক ভাবে ক্ষণিকের জন্য বিষণ্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। পরের দিন সকাল হইতেই এই ক্ষণিক বিষণ্ণতা যেন একটি স্পষ্ট বেদনায় রূপ ধরিয়া উঠিতে লাগিল।...কাল ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে একটা একেবারে নূতন ধরনের চৈতন্যে মনটা ভরিয়া উঠিয়াছিল—সকালটি হইয়াছিল ঠিক একটি নূতন জগতের তোরণদ্বার—তার মধ্যে দিয়া দেখা যায় দূর—সূদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সুখে, তৃপ্তিতে, হাসিতে ভরা একটি সংসার।—সংসার! জীবনের অপরাহ্ণ পর্যন্ত কাত্যায়নী যাহার সন্ধান পান নাই।...কাল সুখের অলসতায় কাত্যায়নী অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিছানায় পড়িয়া ছিলেন—কল্পনার তুলি দিয়া শুধুই রং ফলাইয়া গিয়াছিলেন। আজ কিন্তু ঘুম ভাঙার পর বিছানাটা—শুধু শুইয়া থাকাটা যেন অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। কাত্যায়নী উঠিয়া বাহিরে আসিলেন।

দাওয়ায় আসিয়াই প্রথমে দেখিলেন গিরিবালাকে। গিরিবালা ওঠেই সবার আগে; আজ যেন আরও সকালে উঠিয়াছে। খিড়কির পুকুরে মুখ ধুইতে নামিয়াছিল, ঘাটের ঢালু বাহিয়া অর্ধেকটা উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; বস্ত্রাঞ্চলে মুখটা মুছিল, তাহার পর বোধ হয় সামনের গাছে কিছু একটা দেখিয়া স্থির কুতূহলী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। নবোদিত সূর্যের রশ্মি আসিয়া গায়ের উপর মুখের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, চারিদিকের সবুজ আবেষ্টনীর মধ্যে দেহনিবদ্ধ সূর্যরশ্মিতে একটা নূতন ধরনের আভা ফুটিয়াছে। ভোরের স্নিগ্ধ মৌন দৃষ্টির নিচে, এই অদ্ভুত গোলাপী আভায় মণ্ডিত গিরিবালাকে যেন নূতন কোন এক লোকের জীব বলিয়া মনে হয়। এখানকার নয়; আলোর পথ বাহিয়া ও যেন এই সদ্য নামিয়া আসিয়াছে, হালকা চরণ দুটি এখনও মাটিতে পড়ে নাই। ও যেন এ-মাটির নয়, এ-মাটির বেদনার নয়, পৃথিবী তাহার নিজের মলিন সুখদুঃখ লইয়া ভালো করিয়া জাগিয়া উঠিবার পূর্বেই, স্পর্শাতীত হইয়া ঊষার মতোই ও আবার আলোর জগতে মিলাইয়া যাইবে।

BanglaBook.org

কাত্যায়নী একটু আড়ালে ছিলেন, দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুতে ছল-ছল করিয়া উঠিল—বেদনাটা খুব স্পষ্ট নয়, তবে মনে হইল সত্যই যেন ও এইবার মিলাইয়া যাইবে। এতদিন ছিল তাঁহার কাছে, তাঁহার বুকের মধ্যে—তাঁহার নিতান্ত নিজেরটি হইয়া;—তবে ছিল একটা হালকা মুক্তির মধ্যে; এইবার তৃষ্ণার আর্তিতে দুই

বাহু দিয়া জড়াইতে গিয়া কাত্যায়নী যেন তাহাকে হারাইতে বসিয়াছেন। এ কী সর্বনাশ করিলেন তিনি!...

আবার দিন অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজের চঞ্চলতার মধ্যে গিরিবালার নিত্যকার রূপটি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, সেই গিরিবালা—যাহাকে আর পাঁচটা মেয়ের মতোই সংসার পাতিবার জন্য চাওয়া যায়, পাওয়া চলে। কাত্যায়নী আবার তাহাকে আদর-যত্নের তন্তু দিয়া বুকের সঙ্গে জড়াইতে লাগিলেন। অবশ্য তন্তুতে মাঝে মাঝে টান পড়িতে লাগিল—মন যেন হঠাৎ নিজের থেকে সরিয়া দাঁড়াইয়া এক-একটা প্রশ্ন করিতে লাগিল—দৃঢ়ভাবে উত্তর চাহিতে লাগিল—সত্যই কি গিরিবালা তাঁহার সংসার পাতিবার মতো? ...শাশুড়ীর কথা কাত্যায়নী লুকাইলেন কেন?—ছেলের কথা উঠিতেও কেন এড়াইয়া গেলেন?...তাঁহার অমন নির্মল ভালোবাসায় খাদ মিশিল কোথা থেকে?—কেন দিলেন তিনি মিশিতে?...

প্রশ্ন থেকে কাত্যায়নী যেন পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বসন্তকুমারীর সঙ্গে, ভগ্নীর সঙ্গে, আগামী কাজের যোগাড়যন্ত্রের আলোচনায়, আর গিরিবালার ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্রটাকে রঙে রঙে বোঝাই করায় মাতিয়া রহিলেন ; আজই যে যাইবেন, আর সময় আছে?—সব ঠিক করিয়া লইবেন না?

এই সব-কিছুর মধ্যে কিন্তু সেই এক প্রশ্ন,—কত আকারে!—উত্তর চাই।...এক ঝাঁক মৌমাছিতে যেন তাঁহাকে খেদাইয়া ফিরিতেছে, জলে ডুব দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু সেখানেও যে সেই মৃত্যুরই যন্ত্রণা!

দুপুরের একটু আগে বিকাশকে লইয়া সিংহবাহিনী-তলায় পূজা দিতে গেলেন। পূজা সাঙ্গ হইলে প্রণাম করিতে গিয়া যেন গোলমাল হইয়া গেল—'আমায় দাও, আমায় দাও মা, কী আর বেশি চাইছি তোমার কাছে?...আমার বড় তেষ্টা, বড় যন্ত্রণা, বড় জ্বালা—নিজের জ্বালায় বুঝি আমি সব জ্বালিয়ে দিতে বসলাম—বাঁচাও আমায়—তুমি তোমার পদ্ম হস্ত বুলিয়ে আমার এ-জ্বালা মিটিয়ে দাও...শেষের কটা দিন আর আমায় এই তেষ্টা নিয়ে যেন না দগ্ধাতে হয়...'

দিন যত অগ্রসর হইতে লাগিল কাত্যায়নী তত যেন সাধ মিটাইয়া দিনের সমস্ত মধুটিকে নিংড়াইয়া নিংড়াইয়া পান করিতে লাগিলেন—

"কোথায় গেল বাঁড়ুজ্জে?...সেটি হচ্ছে না, বাপের কাছ থেকে আমি গুনে গুনে গয়না আদায় করব, তেমন কুটুম নয়, পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালে ছাড়ছে কে?...দাদাকে একবার বলে কয়ে পাঠিয়ে দেবে বউদি, আমার ওখানের মোটামুটি ব্যবস্থাটা তাঁকেই গিয়ে একবার করে দিয়ে আসতে হবে, দেওর তো আনাড়ি মানুষ এক...আয় গিরি, তোর চুলটা আমি বেঁধে দিই আজ...নিজের দিকে একটু চাইবি—গিন্নিত্ব করতে করতে কী যে মেয়ের ছিরি হয়েছে!"

সন্ধ্যার সময় যাত্রা, ঘণ্টাখানেক আগে কাত্যায়নী প্রস্তুত হইলেন। উঠানের মাঝখানে একত্র হইয়া প্রণাম-আশীর্বাদের পালা চলিল। ভিতরে যেন একটা ঝড় উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে মুখ ফিরাইয়া নিজের ঠোঁটটাকে নির্দয়ভাবে কামড়াইয়া ধরিতেছেন।...তরী প্রায় ঘাটে ভিড়াইয়াছেন, আর একটু সময়, তাহা হইলেই সব রক্ষা হয়। বিদায়ের ক'টা মুহূর্ত যেন প্রাণপণে হালটাকে চাপিয়া আছেন।

BanglaBook.org

গিরিবালা দুই দিন থেকে একটু দূরে দূরে থাকিতেছে ; আসিয়া কাত্যায়নীকে প্রণাম করিল। কাত্যায়নী তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া দক্ষিণ হস্তে মুখটা তুলিয়া ধরিয়া একটু চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর মাথাটা গাঢ় আবেগে নিজের পাঁজরার কাছে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"গিরি..."

উপরি উপরি দু-তিনবার নিজের ঠোঁটটা কামড়াইয়া ধরিলেন, কিন্তু বাধা মানিল না, দরদর করিয়া দুই গাল বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বসন্তকুমারী অতটা বুঝিলেন না ; বড় সুখের আলোড়নের পর বিদায়ের সময় হয় ওরকম। তবু বলার খাতিরেই বলিলেন—"ওকি কাতু, আহ্লাদ বুকে করে যাওয়ার সময়..."

কাত্যায়নী আর পারিলেন না, বসিয়া পড়িয়া বসন্তকুমারীর পা দুটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন—'ও দিদি, এ যে কী সর্বনেশে আহ্লাদ—তোমাদের জানতে দিইনি...আমায় ক্ষমা করো—আমার এ লোভের কি প্রাশ্চিত্তির বলে দাও আমায়...আমি গঙ্গাপুজোর ফুল এঁটোকুড়ে ফেলতে নিয়ে যাচ্ছিলাম দিদি—বলো বলো, আমার কি উপায় হবে?..."

পাড়ায় কথাটা যখন ছড়াইল, কত লোক কত ভাবে কত বলিল, কত ভঙ্গিতে হাসিল। দামিনী নন্তীকে দিয়া খোঁজ লইয়া যখন জানিলেন বরদাসুন্দরী বাড়ি নাই, আসিয়া বসন্তকুমারীকে বলিলেন—"আমি আগেই জানতাম বড়-বৌ—বলে সবার চেয়ে যার টান বেশি তাকে বলে ডাইন। নেহাৎ মা সিংহবাহিনীর চোখের নিচে এমন একটা অঘটন নাকি ঘটতে পারে না, তাই, নৈলে..."

জীবনে বোধ হয় এই প্রথম বসন্তকুমারী লঘু কৌতুকে দামিনীর সুরে সুর মিশাইলেন না। বেশ দৃঢ় এবং কতকটা রুক্ষ স্বরেই বলিলেন—"অমন কথা বলো না ঠাকুরঝি, অধর্ম্ম হবে। কাতু যে কী রত্ন মুঠোর মধ্যে পেয়েও নিজের ইচ্ছেয় ছেড়ে দিলে তা আর কেউ না বুঝুক, আমি বুঝেছি ; শুধু মনটা কত বড় হলে এমন ছাড়ান ছাড়তে পারে লোকে সেইটেই বুঝে উঠতে পারছে না।"

BanglaBook.org

তৃতীয় পর্যায়

॥ ১ ॥

গিরিবালা জীবনে কোথাও অনাদর পান নাই, কিন্তু এটাও ঠিক যে কাত্যায়নী দেবীর মতো অমন হৃদয়ের সমস্ত মধু-ঢালা আদরও কোথাও পান নাই। তাই তাঁহার স্মৃতি গিরিবালার মনে একটা সম্পূর্ণ আলাদা স্থান অধিকার করিয়া ছিল। আর অন্য কারণ থাকিলেও কাত্যায়নী দেবীকে ঘিরিয়াই সমস্ত সিমুরটা বলিয়া সিমুরের কথা বোধহয় গিরিবালার এত প্রিয় ছিল। কাত্যায়নী দেবীর প্রসঙ্গে মা যেন একেবারেই রূপান্তরিত হইয়া যাইতেন। এবং সেই জন্যেই শৈলেনও কৃত্রিম করিয়া প্রসঙ্গটাই তুলিত বেশি। গল্প শুনিতে শুনিতে শৈলেনের মনে হইত না যে একজন প্রৌঢ়া কাহিনী বলিতেছেন, মনে হইত একজন কিশোরী জীবনের প্রভাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—তাহার চারদিকে প্রীতি আর বাৎসল্য

ছড়ানো,—বৃক্ষ-বল্লরীচ্যুত পুষ্পের মতোই সে সেগুলা কুড়াইয়া ফিরিতেছে।...গল্পের দিকে শৈলেনের কান থাকিত না ;—সে মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া থাকিত এই মায়ের মধ্যেই বিকশিত সেই তাহার কিশোরী জননীর পানে। আনন্দমাখা এক অদ্ভুত রহস্য শুধু তাহাদের দেহকে নয়, যেন মনটাকে পর্যন্ত রোমাঞ্চিত করিয়া তুলিত। ঐ মা তাহার এই মা-ই!...গল্প শুনিবে কি এরই সূত্র ধরিয়া জীবন তাহার সহস্র বিস্ময় লইয়া তাহার সামনে উপনীত হইত। ছেলেমানুষের প্রশ্নের মতোই কতকগুলা বোধহীন প্রশ্ন ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিত, —মা যখন কিশোরী, শৈলেন তখন কোথায় ছিল? সে—শুধু সেই কেন—তাহারা সব ভাইবোনে কি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন আকারে—অচিন্তনীয়, একেবারেই অব্যক্ত কোন ধারণামাত্র রূপে ঐ ত্রয়োদশী কিশোরী জননীর মধ্যে লুপ্ত ছিল?—নবজাতা লতার মধ্যে ভাবী লতাসন্ততি যেমন থাকে—মাত্র এক সম্ভাবনার আকারে? না, তাহারা তখন সম্পূর্ণই আলাদা শুধু এই মহিমময়ীকে মা বলিয়া পাইবার জন্য কোন কঠিন তপস্যায় নিরত? ...শিশুর মতো প্রশ্ন সব, কিন্তু বড় ভালো লাগিত ; মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। শিশু এক এক সময় যেমন হঠাৎ সব কিছু ছাড়িয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে বুঝিবার চেষ্টা করে, নির্ণীত করিবার চেষ্টা করে, এই মানুষটিই সব চেয়ে এত আলাদা, সব চেয়ে এত কাছে কেন—সেই রকমের কি একটা ব্যাপার ঘটিতে থাকিত।...গিরিবালা এক-একবার হাসিয়া শৈলেনের পানে চাহিয়া বলিতেন—“তুই এত অন্যমনস্ক হয়ে যাস শৈলেন, মেজমাসির গল্প শুনতে শুনতে—অথচ শোনাও চাই বসে বসে। কী অত ভাবিস?”

শৈলেন চুপ করিয়াই থাকিত, একটু বোধ হয় অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া ; তবে একদিন দিয়া ফেলিয়াছিল উত্তর, সেদিন বোধ হয় আরও বেশি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল —হাসিয়াই বলিল—“তুমিই অন্যমনস্ক হয়ে আমায় অন্যমনস্ক করে তোল মা। কাতুদিদিমা তোমায় যেন যাদু করে রেখেছেন—তুমি যেন স্পষ্টই আবার তার ছোট বোনঝিটি হয়ে যাও ; আমি যেন দেখতে পাই।”

গিরিবালা হাসিয়া বলিয়াছিলেন—“কেন, বাবা-জেঠামশাইদের কথা তো বলি, সে সময় তো হোস না এত অন্যমনস্ক।”

শৈলেন উত্তর দিয়াছিল, হাসিয়াই—“তাহলে বলি মা?—রাগ করবে না তো?—ওঁদের কথায় তুমি যেন কেমন গিন্নীবান্নি হয়ে যাও—ছোট একটি মা হয়ে যেন বুড়ো ছেলেদের সামলে বেড়াচ্ছ। কাতুদিদিমার গল্পে তোমার যেমন আদর খাওয়া ছোট মেয়ের রূপটা খোলে, তেমন আর অন্য কারুর বেলাতেই খোলে না।”

দুজনের হাসিই একটু বেশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পরই গিরিবালা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিলেন—“তা বোধ হয় মিছে বলিসনি, কী যে আদর পেয়েছিলাম তাঁর কাছে সে সময়।...মনে হয় আবার সেই বয়সে ফিরে গিয়ে আর একবার খেয়ে আসি।”

*

পরদিন সকালে রসিকলাল প্রথমেই পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি গেলেন। বেড়ের পিছনটায়, বাড়ি আর রাস্তার মাঝখানে একফালি জমির উপর একটা ফুলের বাগান। বাগানের ও-প্রান্তে পণ্ডিতমশাই বেড়ার একটা বাতায় গেরো দিতেছিলেন, নামাবলী গায়ে

খড়ম পায়ে সমবয়সী কে একজন যাইতে যাইতে রহস্য করিয়া বলিলেন—"বাগানের বেড় দেওয়া হচ্ছে, সোমেশ্বর?—রামপ্রসাদের মতো বেড়া বাঁধতে পার তবে তো!"

পণ্ডিতমশাই হাসিয়া বলিলেন—"সেই চেষ্টাতেই আছি, দেখি যদি আনতে পারি ফাঁকি দিয়ে বেটিকে। এলে কিছু চোখা চোখা সওয়াল আছে।"

"বলে ফেললে, আর সে আসবে?—ওই সওয়ালের ভয়েই তো আসতে চায় না। কত বড় ধড়িবাজ মেয়ে!"

দুইজনে হাসিয়া উঠিলেন, এমন সময় বেঞ্চের সামনে রাস্তায় রসিকলালের ঘুড়িটা উপস্থিতির সাড়া দিয়া উঠিল, পণ্ডিতমশাই ফিরিয়া দেখিয়া কতকটা যেন চিন্তিতভাবেই তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়া বেঞ্চটা ঘুরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রসিকলাল ঘুড়ি থেকে নামিয়া রাশটা হারাণের হাতে তুলিয়া দিলেন, তাহার পর পণ্ডিতমশাইকে প্রণাম করিয়া উৎফুল্ল বদনে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, চোখ দুইটি হালকা দুই বিন্দু জলে চকচক করিতেছে। পণ্ডিতমশাইয়ের মুখে একটা উগ্র উৎকণ্ঠা লাগিয়া রহিয়াছে —যা আঘাতটা পাইয়াছে রসিক যেন সব কিছুই হইতে পারে।

রসিকলাল সংবাদটা নানারকম ভাষায় মণ্ডিত করিতে করিতে আসিতেছিলেন, যেন সব ভুলিয়া গেছেন। শেষে একটু চাহিয়া থাকিয়া অপেক্ষাকৃত চাপা কণ্ঠেই বলিলেন —"আপনার আশীর্বাদ ফলে গেল পণ্ডিতমশাই...আমার কিন্তু বরাবরই আশা ছিল ফলবেই...কেটে গেছে গিরির এ ফাঁড়াটা।"

পণ্ডিতমশাই চক্ষু দুইটি বিস্ফারিত করিয়া "অ্যাঁ!" করিয়া কতকটা অশোভন উচ্চৈঃস্বরেই চিৎকার করিয়া উঠিলেন। রসিকলালের দক্ষিণ বাহুটা ধরিয়া দুইজনে আসিয়া বেঞ্চটাতে বসিয়া বলিলেন—"কি ব্যাপার বল সবিস্তারে, সত্যিই আমি ধৈর্য রাখতে পারছি না রসিক—কি যে অবস্থা যাচ্ছে!"

রসিকলাল আস্তে আস্তে সাধ্যমত নিজের মন্তব্য সহকারে কাল সন্ধ্যার কাহিনীটা বিবৃত করিয়া গেলেন। শুনিতে শুনিতে পণ্ডিতমশায়ের চিরন্তন শান্তিটি আবার পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিল। শেষ হইলে রসিকলালের পিঠে হাত দিয়া বলিলেন —"চলো ঘরে গিয়ে বসি রসিক, তাতটা বেড়ে উঠছে।...ওখানে খুট-খুট কিসের শব্দ ওটা!...ও! তোমার সেই পাখোয়াজি সহিস বুঝি?"

হাসিতে হাসিতে দুইজনে ঘরের ভিতর একটি মাদুর-পাতা তক্তপোশের উপর গিয়া বসিলেন। পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"পা তুলে গুছিয়ে বসো রসিক, গোটাকতক কথা আছে।"

একটু থামিয়া বলিলেন—"আমার মনটাও কাল থেকে বড় খারাপ হয়ে আছে রসিক, অবশ্য তুমি বাপ, তোমার কথাই আলাদা, তবুও কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। সকালে একটু অন্যমনস্ক থাকবার জন্যেই কাদম্বরীটা নিয়ে বসলাম—কিছুতেই অভিনিবেশ হল না, ঐ দেখো না, পড়ে আছে, তোলাও হয়নি। শেষকালে কাতাটা নিয়ে বাগানে গিয়ে নেমেছি, তুমি এলে।...এ হতেই হবে রসিক, এত বড় অন্যায় কখনও হয় না। আমার গণনায় কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রম ছিল না। ও-কন্যার যেখানে বিবাহ সেখানে স্থির হয়েই আছে ; নড়চড় হবার জো নেই। সঙ্কটের কথা তো তোমায় বলেছিলাম— সাবিত্রীর পাঁচ জায়গায় সম্বন্ধ করতে হয়েছিল, দময়ন্তীর বিবাহেও সঙ্কট উদয় হয়েছিল, এ-সব সঙ্কট কিন্তু

কর্পূরের মতো উবে যেতে বাধ্য।...কাল সব কথা শুনে গিন্নী বললেন—'চার পো কলি, এমন সত্য ত্রেতা যুগের কথা ধরে বসে থাকলে চলবে কেন?'...মেয়েছেলে, তাদের সঙ্গে তর্ক করাই অবিধেয়, জানই তো—স্ত্রীয়াহি নাম খল্বেতা নিসর্গাদেব পণ্ডিতাঃ—অর্থাৎ স্ত্রীজাতি আপনা-আপনিই পণ্ডিত—অন্তত তাই মনে করে নিজেদের। তবে আমার যতটুকু আত্মলব্ধ জ্ঞান তাতে মনে হয় চার পো সত্য যুগ বলেও কোন্ও যুগ কখনও ছিল না, চার পো কলি বলেও কোন যুগ কখনও হবে না। পাপ যদি কোন কালে বেশি গাঢ় হয়ে ওঠে—কালধর্মে, তো পুণ্যও হয়ে উঠবে সেই অনুপাতেই উজ্জ্বল। এই সৌর সংসার সূর্যের আলো-ছায়ার নিয়মেই চলে আসছে; সেই নিয়মেই চলবে—ছায়া যত নিবিড়, আলো ততই প্রদীপ্ত।...তোমার শালীর এই আত্মজয়টা পুরাণের কোন্ আত্মজয় থেকে ন্যূন আমায় বলো না? হয়তো বলবে তিনি লুব্ধ হয়েছিলেন। অত্যন্ত স্বাভাবিক— গিরিবালার মতো মেয়েকে আত্মসাৎ করতে চাইবে—বিশেষ করে তাঁর মতো এক বাল-বিধবা যে চিরকালটা বঞ্চিতই রইল সংসারে—এ অত্যন্ত প্রাকৃতিক একটা ব্যাপার। তা না হলে গিরিবালাকে শ্রী আর স্বভাবে অমন মধুর সৃষ্টি করে পাঠাবার কোন সার্থকতাই থাকত না বিধাতার পক্ষে। কিন্তু ঐ লোভের রূপই কি তোমার শালীর আসল রূপ?—তিনি যে সেই লোভকেই মাড়িয়ে এই স্বমহিমায় উঠে দাঁড়িয়েছেন—এই তাঁর প্রকৃত রূপ না দেখতে পেলে কি ওঁর চেয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যই বেশি নয় রসিক?"

প্রত্যেক কথাটি রসিকলালের মনে অনুরূপ ধ্বনি তুলিতেছিল, স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন —"আমি ওঁকে ভালো করেই জানি পণ্ডিতমশাই, আমার মত এক মুহূর্তের জন্যও বদলায়নি, তবে একথা ঠিক যে একটু আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু নানান লোকে নানান কথা—"

পণ্ডিতমশাই কথাটা শেষ হইতে দিলেন না, অধরোষ্ঠে অল্প যেন চাপ দিতে দিতে বলিলেন—"নানান লোকে নানান কথা!...লোক!—আপামর সাধারণ!—তারা অন্তঃসত্ত্বা জানকীকেও অরণ্যে পাঠিয়েছিল রসিক।—ভুললে চলবে না সে কথা।"

দুইজনেই খানিকক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন, যেন মহিমার সঙ্গে বেদনায় মণ্ডিত যে প্রসঙ্গটি উঠিয়াছে দুইজনেই সর্বান্তঃকরণ দিয়া সেটাকে অনুভব করিতেছেন। একটু পরে কতকটা যেন আচমকাই মুখটা তুলিয়া পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"হ্যাঁ, যার জন্যে তোমায় ভেতরে ডেকে আনা;—রসিক, পাত্রের সন্ধান আমি পেয়েছি।"

অদ্ভুত কথা। যে-প্রসঙ্গের মধ্যে আর মনের যে অবস্থায় শোনা, আরও যেন অদ্ভুত ঠেকিল কানে: রসিকলাল মুখটা ঈষৎ হাঁ করিয়া পণ্ডিতমশাইয়ের পানে চাহিয়া রহিলেন, পণ্ডিতমশাই বলিতে লাগিলেন—

"পাত্রের সন্ধান পেয়েছি। কাল নিজেই আমি সংবাদটা নিয়ে যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু তার আগেই তুমি এলে, আর এমন উল্টো এক সংবাদ নিয়ে এলে যে কথাটাই আর তোলবার অবসর পেলাম না আমি। পূর্বেই বলেছি, তুমি বাপ, তোমার কথা আলাদা, কিন্তু সন্ধানটা পাওয়ার অব্যবহিত পরেই অমন আঘাতটা পেয়ে আমারও যে কি করে কেটেছে তা অন্তর্যামীই জানেন রসিক। স্নেহে আঘাতের চেয়ে বিশ্বাসে আঘাত যে কোন অংশেই কম নয়, সেইটেই আমি উপলব্ধি করছি কাল থেকে।"

BanglaBook.org

রসিকলাল বলিলেন—"আপনার স্নেহ কি আমার চেয়ে কম পণ্ডিতমশাই?—আমি তো বুঝি।"

পণ্ডিতমশাই সস্নেহে শিষ্যের পিঠে হাত দিলেন, স্মিত হাস্যের সহিত কহিলেন —"নিজের গভীরত্বেই সমুদ্রতল অন্ধকার, তাই সে দেখতে পায় না সে কত গভীর। তবে একটা কথা তোমায় বলব রসিক—বিশ্বাস আমার আঘাত পেয়েছিল বটে, তবে টলেনি। সমস্ত বেদনার মধ্যে আমি বুঝতে পারছিলাম—এটা দৈবের রহস্য মাত্র, পাত্র —সে স্বস্থানেই আছে, সময়েই আসবে।...এক-একটা ঘটনাকে উপলক্ষ করে একটু জটিলতা সৃষ্টি করে বিধাতা মানবচরিত্রের এক-একটা দিক আমাদের সামনে প্রকাশ করে ধরেন—ভালোর দিক, আবার মন্দের দিকও হতে পারে,—এ তাই রয়েছে। যাক্ আসল কথাটা বলি : তোমায় বলেছিলাম দূরদৃষ্টবশতঃ আমার এক সময় উজ্জয়িনী প্রবাস ঘটেছিল, মনে আছে বোধ হয়। প্রথম যখন যাই তখন গাড়িতে আমার একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়। বাড়ি সাঁতরায়, তবে আমারই মত ঘরছাড়া বাই—একটা কুঠিতে কাজ নিয়ে মিথিলায় বসবাস করছেন। সুরসিক এবং সুপণ্ডিত মানুষ, আর সুপুরুষ। বরং শুধু সুপুরুষ বললে তাঁর বর্ণনাটা সম্পূর্ণ হয় না, একে সুন্দর তায় বরাবর পশ্চিমে সুখ-প্রতিপত্তির মধ্যে কাটিয়েছেন—অমন কান্তিমান পুরুষ আমাদের মধ্যে দেখাই যায় খুব কম। বহুদূর পর্যন্ত একসঙ্গে আর খুব আনন্দে গিয়েছিলাম আমরা ; তারপর পাটনার কাছাকাছি কোন একটা ইস্টিশনে নেমে তিনি গঙ্গা পেরিয়ে কর্মস্থলের অভিমুখে চলে গেলেন।"

"প্রায় পনেরো বৎসর পরে হঠাৎ পরশু তাঁর সঙ্গে দেখা। নবদ্বীপ গিয়েছিলাম জানই, ফেরবার সময় ত্রিবেণী পর্যন্ত নৌকোয় এসে রেল ধরলাম। এমনি বিধির নির্বন্ধ, যে-গাড়িতে উঠলাম ভদ্রলোকও সেই গাড়িতে বসে আছেন। বহুদিন পরে দেখা হলেও সামান্য একটু খটকা কাটিয়েই উভয়ে উভয়কে চিনতে পারলাম। তার পর যতক্ষণ গাড়িটিতে ছিলেন, দুজনে মুখোমুখি হয়ে আলাপ করে কাটানো গেল। বললেন বড় ছেলেটি দেশেই আছে, বিবাহের সম্বন্ধ ঠিক করে এবং সম্ভব হলে একেবারে বিবাহ দিয়েই কর্মস্থলে এইবার নিয়ে যাবেন। নিজের বয়স হয়ে এসেছে, এবার ছেলেটিকে কাছে নিয়োজিত করে দেওয়া দরকার। কতদিনের পরিচিতের মত অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা। যদি বিবাহের যোগাযোগ হয় তো আমায় পূর্বেই নিমন্ত্রণ দিয়া রাখলেন, বললেন সময়ে আবার জানাবেন। গাড়িতে আলাপের একটু অসুবিধে এই যে প্রায় প্রতি ইস্টিশনেই নূতন লোকের সমাগম হতে থাকায় প্রতি ইস্টিশনে কথাবার্তার মোড় ঘুরে যায়। তায় সময় অল্প আর বলবার কথা অনেক। বিচ্ছিন্নভাবে অনেক রকম কথা হল। গাড়ি যখন অনেকটা এগিয়ে এসেছে, বিদ্যুৎস্ফুরণের মতো একটি কথা আমার মনে উদয় হল — হিমালয়ের পাদমূলে সুদূর মিথিলায় এই তো বর! আমরা যাকে খুঁজছি সে তো এই ; একে দেখিনি, কিন্তু এই রকমই পিতার সন্তান হয়ে, দেব-দুর্লভ রূপ নিয়ে এই রকমই কুলশীলের অধিকারী হয়ে তো তার জন্ম নেওয়ার কথা। আমার নবদ্বীপ যাওয়া, অকস্মাৎ এই দেখা হওয়া, এমনি কি পনেরো বৎসর পূর্বেকার সেই প্রথম সাক্ষাৎ—সবই যেন দৈব-নির্দিষ্ট বলে মনে হল আমার। 'আমার হাতেও একটি অতি সুলক্ষণা পাত্রী আছে।'—বলে প্রস্তাবটা তুলব—একেবারে ঠোঁটে এসেছে, এমন সময় তাঁর যেন হঠাৎ

চাক হল। অন্য কি একটা প্রসঙ্গ চলছিল, হঠাৎ বিরতি দিয়ে বলে উঠলেন—'দেখুন! এত সুযোগ পেয়েও ভুলে যাচ্ছিলাম!—আপনি তো পণ্ডিত মানুষ, বহু জায়গায় গতায়াত আছে,—আপনার সন্ধানে কোন পাত্রী যদি থাকে। যৌতুক সম্বন্ধে আমার কোনই লোভ নেই, তবে কন্যাটি সুশ্রী, এবং সুলক্ষণা হওয়া দরকার'।"

পণ্ডিতমশাই রসিকলালের পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া অর্থপূর্ণ হাস্যের সহিত বলিলেন—" 'সুলক্ষণা' কথাটি লক্ষ্য করবে রসিক। ঠিক এই কথাটি আমার মুখ দিয়ে বেরুচ্ছিল!...বললেন—কন্যাটি সুশ্রী আর সুলক্ষণা হওয়া চাই, আর সৎ বংশের, ব্যস, এর চেয়ে বেশি আমার দেখবার দরকার নেই, গরীব কি বড় লোকের মেয়ে, শহুরে কি পাড়াগেঁয়ে আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না'—আমি গিরিবালার কথা স্রেফ চেপে গেলাম।"

পণ্ডিতমশাই থামিয়া গিয়া রসিকলালের পানে চাহিয়া মিটিমিটি একটু হাসিয়া তেজের সহিত বলিলেন—"আগেই অমনি হামড়ে পড়তে যাব কেন হ্যাঁ? মেয়ে আমাদের ফেলনা নাকি? ওঁর সুশ্রী সুলক্ষণা মেয়ে চাই, আমাদের বুঝি কানা খোঁড়া যা হোক একটা পাত্র হলেই হল—ইস!...আরে কে আসছে তা তো জানিই, তবে দাপট ছাড়ি কেন? নিচু হই কেন?...বললাম—'আছে একটি মেয়ে; তবে সে মেয়ে হওয়া দুরূহ'...

"বলতেই তো তিনি সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন—'কেন দুরূহ কেন, পণ্ডিতমশাই?' "

"আমি যেন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বললাম—'দুরূহ। আরও দুটি মেয়ে আছে হাতে, তবে একটু নিরেশ, তা আপনার বোধহয় চলে যাবে'।"

পণ্ডিতমশাইয়ের মুখের হাসিটা আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল, বলিলেন—"তোমরা ভাব পণ্ডিতমশাই শুধু কাব্যচর্চা করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলে—ষাঁড়ের গোবর। ঘটকালি যা আরম্ভ করলাম দেবর্ষি নারদ খানিকটা শিখে যেতে পারতেন! তোমার বেহাই (বিবাহ স্থির-নিশ্চয় রসিক, এ তুমি লিখে রেখে দাও)—তোমাদের বেহাই একেবারে জিদ ধরে বসলেন—'না, পণ্ডিতমশাই, আমার ঐ মেয়েই চাই, দুরূহ কেন বলুন খুলে, দুরূহ বলে যদি আমি সরে দাঁড়াতাম তো সতেরো বছর বয়সে একবস্ত্রে সাড়ে তিনশো মাইল পাড়ি দিয়ে বিদেশে গিয়ে চাকরি করতে পারতাম না। বলতেই হবে আমাকে।'...আর একটু ন্যাজে খেলালাম তোমার বেহাইকে, তারপর বললাম—আপনি মাত্র সুশ্রী আর সুলক্ষণা পাত্রী চান, পাত্রীর পিতা চান একেবারে দেবকান্তি পাত্র, লক্ষণ আর কুলশীলের কথা তো ছেড়েই দিন—সামান্য একটুও খুঁৎ থাকলে পেছিয়ে পড়বে। ...অনেক সম্বন্ধই এল গেল—দু-একটা এত বাঞ্ছনীয় যে আমরা চারিদিক থেকে চেপে ধরলাম; কিন্তু উঁহুঃ, নিজের কোট ছেড়ে সে একচুল নড়বার পাত্রই নয়, এ বিষয়ে জনকরাজা ওর চেয়ে ঢের সুবিবেচক ছিলেন মশাই। বড্ড রাশভারী কড়া লোক। তাই বলছিলাম আপনি ওটার আশা ছেড়ে বরং অপর দুটিকে দেখতে বলেন তো চেষ্টা দেখি।"

"যা প্যাঁচ দিয়েছি, পারে কখনও ছাড়তে রসিক?—'আপনি এখুনি নেমে আমার ছেলেকে দেখে নেবেন চলুন পণ্ডিতমশাই; নিজের ছেলের বড়াই করতে নেই, তবে

যদি বলেন যে সেরকম ছেলে আপনাদের নজরে পড়েছে এর পূর্বে তো আমি আর একটুও অনুরোধ করব না'।”

নিজের কূট ঘটকালি নীতিতে আর রসিকলালের বেহাইয়ের দুরবস্থায় পণ্ডিতমশাই বেশ প্রাণ খুলিয়া একটু হাসিয়া লইলেন ; তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিলেন...“আরে আমার তো অজানা নেই ছেলের সম্বন্ধে, সে যে কী ছেলে হবে সে তো বহুদিন পূর্বেই তোমায় বলে দিয়েছি হে, তবে ঐ যে বললুম—দাপট ছাড়ি কেন? আর অমন নাতনীর বিয়েতে যদি প্রাণ খুলে খানিকটা ঘটকালি না করতে পারলাম...”

পণ্ডিতমশাই আবার হাসিয়া উঠিলেন। রসিকলাল নীরবে শুনিয়া যাইতেছেন, তাঁহার বদনে কখনও সাফল্যের, কখনও গৌরবের, কখনও মাত্র কৌতুকের আলোক খেলিয়া যাইতেছে। এক-একবার কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের আত্মগরিমা আজ এতই মুখর যে অবসর মিলিতেছে না। কন্যাকে কেন্দ্র করিয়া গুরু খানিকটা নির্দোষ মিথ্যাচরণে ডুবিয়া গেছেন, প্রসন্ন গৌরবে শিষ্য সেটা উপভোগ করিতেছেন—এমন অদ্ভুত যোগাযোগ পূর্বে কখনও আর হয় নাই। হাসি থামাইয়া পণ্ডিতমশাই বলিলেন—“তাড়াহুড়া করে ছেলে দেখতে যেতে আমার বয়ে গেছে, নাতনীর হাত আগে না দেখে থাকতাম তো একটা কথা ছিল বরং, তার চেয়ে শিগগির তোমায় খবরটা দেওয়ার বেশি তাড়া ছিল ; মনে হচ্ছিল গাড়ির বেগ নেই, লাফিয়ে পড়ে ছুটি তেজপুর পানে। আবার হরিপুরে যাবার কথা শুনে গেছলাম কিনা,...ধড়ফড়ানি লেগে রইল। তোমার বেহাইকে বললাম,—'এই মুহূর্তেই নামা আমার সম্ভব হল না ; তা ভিন্ন, আমি তো আপনার কথায় অবিশ্বাস করছি না ; যার অবিশ্বাস করা একটা বাই দাঁড়িয়ে গেছে, আর যার অবিশ্বাসে আটকাবে, খোদ তাকেই গিয়ে আমি পাঠিয়ে দোব।'”

“নাও, ঠিকানা-টিকানা ভালো করে নিয়ে এসেছি, তোমার বেহাইকে যা-ই বলে আসি না কেন, তুমি সব কাজ ফেলে কালক্ষেপ না করে একবার হয়ে এসো দিকিন। আমি যেতাম সঙ্গে, কিন্তু এসেই বেহাইয়ের এক নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছি, তাঁর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ। যেতেই হবে, বড্ড ব্যাদড়া লোক। শিষ্যের বেহাইয়ের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার ক্ষমতা রাখি বটে, কিন্তু আমার নিজের নাকে আমার নিজের বেহাইয়ের দড়ি।”

আবার হাসিয়া উঠলেন, হাসি থামিলে বলিলেন—“আমি একবার যাব, বিয়ের আগে একবার দেখে আসব বৈকি, তবে তার আগে তুমি একবার বুড়ি ছুঁয়ে এসো, কথাবার্তা শুরু হয়ে যাক। বরং গিরিবালার কুষ্টিটাও পকেটে করে নিয়ে যেয়ো ; চান, তাঁদের দিয়ে এসো। অন্নদাচরণকে একবার বলবে?—বলতে তো হবেই, সে-ই তো কর্মকর্তা, তবে তার আগে তুমি চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে এসো।...না,. তুমিই দেখে এসো আগে, কবি-দৃষ্টি এক আলাদা বস্তু হে, যে যতই বলুক, ওখানে আমরা কারুর কাছেই হার মানতে নারাজ।”

॥ ২ ॥

রসিকলাল আর বিলম্ব করিলেন না। একটা চিকিৎসার জন্য একটু পরামর্শ করিতে কলিকাতা যাইবার নাম করিয়া সাঁতরা যাত্রা করিলেন। খুব প্রত্যুষেই যাত্রা করিয়াছিলেন

BanglaBook.org

—পণ্ডিতমশাইয়ের কাছেই লগ্ন ঠিক করিয়া লইয়া। রেল থেকে যখন নামলেন তখন সাতটা। রেলের ধারে ধারে একটা রাস্তা ধরিয়া অনেকটা যাইতে হয়। তাহার পর রেলের একটা চরখি পড়ে—রেলপথটা পারাপার করিবার জন্য। সেইখানে আসিয়া রসিকলাল একজন ভদ্রলোককে সামনে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"ভটচার্যি পাড়া কোন্ দিকটায় যাব মশ্যাই?"

ভদ্রলোক গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিতেছেন। বয়স অনুমান পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, গৌরকান্তি, সুপুরুষ, হাতে একটি বড় তামার ঘটিতে এক ঘটি জল। অনুচ্চস্বরে একটি স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে ক্ষিপ্রগতিতে আসিতেছেন। সমস্ত শরীরটি শুচিতায় দীপ্ত হইলেও মুখের ভাবটা যে খুব প্রসন্ন, এমন কথা বলা যায় না, দৃষ্টিও বেশ চঞ্চল। রসিকলালের প্রশ্নে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মুখে যেন একটা ব্যঙ্গ হাস্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন,— "এসে পড়েছেন ভটচার্যি পাড়ায়, এইখান থেকেই আরম্ভ হল। কার বাড়ি যাবেন?"

ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায় মশাইয়ের বাড়ি।

ভদ্রলোক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথা থেকে আগমন হচ্ছে আপনার?"

"বেলে-তেজপুর থেকে।"

ভদ্রলোক আবার একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন—"কি কাজ?...থাক, কাজের কথা পরেই হবে; আসুন, আমারই নাম ভগবতী মুখোপাধ্যায়।"

দুইজনে আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবতীচরণ মাঝে মাঝে স্তোত্রের খুঁটটুকু ধরিয়া আরম্ভ করিতেছেন, আবার যেন অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া যাইতেছেন। রসিকলাল কথা কহিবার সাহস পাইতেছেন না। সঙ্গীর ভাবভঙ্গিতে নিজেকে কেমন যেন বিপন্ন বলিয়া মনে হইতেছে। খানিকটা গিয়া ভগবতীচরণ মুখ খুলিলেন, তাঁহাকে কিছু বলা নয়—একটা বাড়ির সামনে রকে বসিয়া প্রায় সমবয়সী একটি ভদ্রলোক তামাক সেবন করিতেছিলেন, ভগবতীচরণ দাঁড়াইয়া পড়িয়া তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, —"আজ ভদ্রলোকের কাছে বড় অপদস্থ হলাম হে রমেশ।"

রসিকলাল যেন ভয়ে সঙ্কোচে এতটুকু হইয়া গেলেন। রমেশ একবার তাঁহাকে দেখিয়া লইয়া, ভগবতীচরণের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"ব্যাপারখানা কি?—নতুন লোক দেখছি যেন?"

ভগবতীচরণ আবার ব্যঙ্গের হাসি হাসিলেন, বলিলেন,"জানাশোনা হলে তো কোন কথাই ছিল না, জানতেনই ভটচায্যি পাড়ার এই রূপই হয়েছে আজকাল। জানেন না বলেই না, পাড়ার মাঝে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল—'ভটাচায্যি পাড়া কোথায় বলতে পারেন?'...অথচ শুনেছ বোধ হয় রমেশ, কর্তাদের আমলে সাঁতরায় এসে কাউকে পরিচয় নিয়ে ভটচায্যি পাড়ায় ঢুকতে হত না।"

কথার ভাবে বোধ হইতেছে দোষটা রসিকলালের তত বেশি নয়, তবুও একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে না পারায় তিনি নির্লিপ্তভাবে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

রমেশ বলিলেন—"একটু ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হয়েছে বৈকি; তবু তুমি রয়েছ, অষ্টপ্রহর খিটখিট করছ।"

"আর খিটখিট!"...বলিয়া ভগবতীচরণ অগ্রসর হইলেন। কতকটা নিজের মনেই

BanglaBook.org

এবং কতকটা বোধহয় রসিকলালকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন—"খিটখিট করি কি সাধে? ভটচায্যি পাড়ায় এসে মানুষে জিগ্যেস করবে, কোন পাড়ায় এলাম, তবে তো ব্রাহ্মণকেও শূদ্র বলে ভ্রম হবে এবার! তা হবেও, যা কাল এসেছে। ভগবতীচরণ খিটখিট করে বলে, এটুকুও বজায় আছে এখনও, যেদিন চোখ বুজব, সেইদিনই মুন্সিপালিত ঢুকে যদি উচ্ছন্ন না দেয় পাড়া তো..."

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার স্তোত্র পাঠ শুরু করিলেন ; কিন্তু একঠায় পড়িয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে—পথে কোথায় একটু বোধ হয় ছাই কি গোময় পড়িয়া আছে, কোথায় ঝাঁট দেওয়ার মধ্যে একটু ত্রুটি,—ভগবতীচরণের শ্লোকের সূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। কখনও পাশের বাড়ির কাহাকেও ডাকিয়া কখনও বা আলগোছেই তিরস্কার করিয়া উঠিতেছেন। সে তিরস্কার যেমন স্পষ্ট তেমনই তীক্ষ্ণ, অল্প একটুও ক্ষমার প্রশ্রয় নাই। কখনও দাঁড়াইয়া আবার সহৃদয় প্রশ্নাদিও করিতেছেন—"তোর মেয়েটি আজ কি রকম আছে সারদা?...ছেলেটি যে পালিয়েছিল, কালকে নাকি ফিরে এসেছে রাঙাখুড়ি? ...আছে বাড়িতে?...আচ্ছা এখন থাক, এখনই গিয়ে পুজোয় বসতে হবে, মেজাজটা বিগড়ে থাকবে। বৈকালে পাঠিয়ে দেবে একবার...অর্বাচীন কোথাকার!"

চলিতে চলিতে পাশের বাড়ি হইতে কখনও কখনও শোনা যাইতেছে—"ওরে ভগবতীচরণ-কাকার নেয়ে ফেরবার সময় হল, দেখ বেরিয়ে একবার, বাইরেটা ঠিকমতো ঝাঁট দিয়েছে কিনা!"..."ওরে, গোয়ালের দিকে কেউ এখন যাসনি বুঝি? দেখ শিগগির : পস্কের করে দে, দুটো কিছু ধরে গরুটার মুখে ; ভগবতীচরণদাদার ফেরবার সময় হয়েছে।"

অপর কণ্ঠে অনুযোগ উঠিতেছে—"ক' দিক যে সামলাবে গেরস্ত একসঙ্গে!"

আরও অপরার কণ্ঠে, সম্ভবত ঝিয়ের—"আর ও-আবাগী গরুও যেন টের পায় বাপু, নালিশ মুখে করেই আছে।"

ভগবতীচরণ রসিকলালকে বলিতেছেন—" 'মিলিয়ে যাবেন।'...কিচ্ছু বলব না তো! দুদিন পরে যা হবে তা আজই হোক, ভগবতী-দাদার বেঁচে থাকতে থাকতেই।—রাস্তায় ঘাটে ঝাঁট পড়বে না, দোরে পড়বে না, গোয়ালঘরে ঢুকবে শুধু কেঁড়েভরে দুইবার সময় —সমস্ত অনাচার যদি একসঙ্গে না এসে পড়ে!—এসে পড়ে কি, পড়েছে এসে..."

কণ্ঠস্বর যেমন চড়াইয়া দিয়াছেন, বেশ বোঝা যায় শুধু রসিকলালকে সাক্ষী মানাই উদ্দেশ্য নয়।...বাড়িটার সমস্ত শব্দ একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেছে, গরুটার 'নালিশ" পর্যন্ত। মনে হয় যেন তিনজনেই সব কাজ ফেলিয়া তাহার তদারক লইয়া পড়িয়াছে।

বড় কৌতুক বোধ হইতেছে রসিকলালের। রেলের চরখির নিকট হইতে পাড়ায় প্রবেশ করিয়া তিনি যেন একটি নূতন জগতে আসিয়া পড়িয়াছেন। ভগবতীচরণ যাহাই বলুন, রসিকলাল পাড়ার অনেকখানি তো অতিক্রান্ত করিয়া আসিলেন রাস্তা, ঘাট, বাগান, এমন কি মুক্ত দ্বার দিয়া অনেক বাড়ির ভিতরেও তাহার যেটুকু নজর গেল, কোথাও এতটুকু আবর্জনা চোখে পড়িল না। সব তকতকে ঝকঝকে করিয়া পরিষ্কৃত। শুধু তাহাই নয়, —সব বাড়িতেই পুজোর আয়োজন আছে বলিয়া বোধ হইল ; ক্বচিৎ ঘণ্টির আওয়াজের সঙ্গে সমস্ত পাড়াটির হাওয়া ধূপ ধুনা আর মৃদু পুষ্পসৌরভে বোঝাই হইয়া আছে। কোন বাড়ির পাশ দিয়া যাইতে যাইতে মন্ত্রপাঠের শব্দ কানে আসিতে লাগিল।

শুচিতায়, সৌন্দর্যে, পবিত্রতায় রসিকলালের কবিমনে জায়গাটাকে যেন একটা স্বপ্নলোক বলিয়া মনে হইতেছিল। না পরিচয় লইয়া ভটচায্যি পাড়ায় পৌঁছিয়া যাওয়ার অর্থটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন,—ভগবতীচরণের ধ্যানে এরই একটা পূর্ণতর রূপ আছে নিশ্চয়। সে-পরিকল্পনা যে কী তাহা জানিবার উপায় নাই, তবে সামনে যাহা কিছু দেখিতেছেন শুনিতেছেন, সমস্ত যেন একসূত্রে গাঁথা ;—রাস্তা চলিতে চলিতে মনে হয় না একটা পাড়ার মধ্যে দিয়া চলিয়াছি,—মনে হয় একখানি বাড়িরই বিভিন্ন অংশ, গৃহকর্তা উঠান বাহিয়া, সন্ধান লইয়া লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।...ভগবতীচরণ আসিতেছেন —স্নান করিয়া ফিরিবার সময় হইয়া গেছে—চারিদিকেই একটা সন্ত্রস্ত ভাব ; কিন্তু বেশ বোঝা যায় সেই সন্ত্রাসের সঙ্গে আছে একটি অপরিসীম শ্রদ্ধা, একটি পরম নির্ভরশীলতা, প্রাণঢালা দরদ না পাইলে যা সম্ভব হয় না।...এমন পাড়াও দেখেন নাই, আর সমস্ত পাড়ার উপর এমন আধিপত্যও দেখেন নাই। রসিকলালের মনটিও বিস্ময়, সম্ভ্রম আর শ্রদ্ধায় ভরিয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু তবু একটা অস্বস্তি লাগিয়াই রহিল কোথায় যেন। বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

খুব যে বড় বাড়ি এমন নয়, তবে বেশ খানিকটা জায়গা লইয়া। প্রথমেই সবুজ ঘাসে ভরা খানিকটা উঠান। তাহার পর একটি পাকা বৈঠকখানা, সামনে খানিকটা রক, তাহারই একপাশ দিয়া ভিতর বাড়ির রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ভিতর বাড়ি, বৈঠকখানা, মায় সামনের উঠানটি পর্যন্ত একটা টানা পাঁচিল দিয়া ঘেরা। ওদিকে পাড়ার লোকদের সন্ত্রস্ত বলিয়া মনে হইতেছিল, এখানে আসিয়া মনে হইল সমস্ত বাড়িটাই যেন নিজেকে সূক্ষ্মতম আবিলতা হইতে বাঁচাইয়া তটস্থ হইয়া আছে।—ভগবতীচরণ স্নান করিয়া ফিরিতেছেন।

দুইজনেই গিয়া রকের উপর উঠিলেন। ভগবতীচরণ বলিলেন—"আপনি গিয়ে বসুন, আমি ততক্ষণ পূজোটা ঝট করে সেরে আসি।—আর পুজো!—যা বিঘ্ন পদে পদে! মধুও এক্ষুণি এসে পড়বে, এইসময় পাড়ায় একটু দেখাসাক্ষাৎ করতে বেরোয়, ডাকতেও পাঠাচ্ছি।"

নিজে আর ঘরে প্রবেশ করিলেন না, রক থেকে নামিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন।

বোধ হয় দুয়ারের নিকট হইতেই প্রশ্ন করিলেন—"কৈ রে, হল পুজোর জো'টা..."

বেশ একটি ঝঙ্কৃতকণ্ঠে উত্তর হইল—"নাঃ, হয়ে আর কাজ কি? তুমি পাড়া তদারক করে বেড়াও, মেজাজও আগুন হয়ে উঠতে থাকুক, ঠাকুরও শুকোতে থাকুক।...আজ খুব বেশি বেলা করে ফেলেছ।"

যাহারই কণ্ঠস্বর হোক, সে যেন উন্মুখ হইয়া ছিল। রসিকলাল উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন,—বাড়িতে কলহ-অশান্তি আছে নাকি? আর কিন্তু কোন তরফেই কোন কথা শোনা গেল না।

বৈঠকখানায় একটা বড় তক্তপোষের উপর টানা ফরাস বিছানো, গোটাকতক তাকিয়া ধারে ধারে বসানো আছে। তক্তপোষের পাশেই একটি লম্বা কাঠের বৈঠকে গোটাকতক হুকা বসানো, কোনটাতে একটা কড়িবাঁধা, কোনটাতে দুইটা, কোনটাতে বা

তিনটা ; গোটাদুই নিরাভরণ। পাশেই একটা আলাদা বৈঠকে একটি সুদৃশ্য আলবোলা। একধারে সায়েব-বাড়ি থেকে কেনা গদি-আঁটা চারখানা ভাল ভাল কেদারা, একটা সাধারণ কাঠের সীট দেওয়া চেয়ার, একটা ভাল আলমারি। দুইখানি থাকে বই,—পদ্মপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, চৈতন্য-চরিতামৃত, মেঘনাধ-বধ কাব্য, এন্ট্রেন্স ক্লাসের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক, একখানি টেনিসনের বাঁধানো ভ্যলুম। বাকি দুইটি থাকের মধ্যে একটিতে পিতল কাঁসার কয়েকখানা সুদৃশ্য বাসন—দুইখানি রূপারও। একটিতে কিছু কাচকড়া আর মাটির পুতুল। দেয়ালে খানকতক দেবদেবীর ছবি আর দুইখানি বিলাতি ল্যান্ড্‌স্‌কেপ্‌।

পরিবারটি পুরাতনপন্থী, ভগবতীচরণই তাহার সাক্ষী, তবুও রসিকলালের মনে হইল কোন্‌ দিক দিয়া নূতন হাওয়াও যেন একটু প্রবেশ করিয়াছে। রসিকলাল নিজে যে কোন্‌ দিকে বলা শক্ত, তাঁর জীবনের মধ্যে ডাক্তার বেশে নিজেও আছেন—নূতনের প্রতীক, আবার পণ্ডিতমশাইও আছেন। আসল কথা তাঁর কবি-মন অভিনবত্ব খোঁজে, নূতনে পুরাতনে যেখানেই পায়—সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাপ্রবণ হইয়া পড়ে।...বেশ লাগিতেছে বাড়িটি, পাড়াটি, নূতন সুরে ভরা আজিকার সমস্ত প্রভাতটি চমৎকার বোধ হইতেছে।...ওই দুয়ার দিয়া, এই সবুজ দূর্বাদলের ঘাসের উপর কচি পা ফেলিয়া চেলি-পরা বধূ-বেশিনী গিরিবালা প্রবেশ করিল...এই তার বাড়ি—তেজপুরের মেটে ঘরে এতদিন মানুষ হইয়া ওঠা তাঁহাদের সেই গিরিবালা...কেমন দেখায় তাহাকে এখানে?...প্রতিদিনই দেখিতে না পাওয়ার জন্য অথচ নূতন জীবনে প্রতিদিনই বদলাইয়া যাইতেছে বলিয়া কতকটা যেন অপরিচিত, অথচ কত নিজের! শত যোজন দূরে থাকিলেও, শত যুগের অদর্শন ঘটিলেও গিরিবালা কি এতটুকু আলাদা হইবার? আশ্চর্য!...গিরিবালার হয়তো একদিন এই সামনের আলমারিটা খোলার দরকার হইবে..খানিকটা বড় হইয়াছে, চাবি থোলাটা হাতে লইয়া চাবিটা বাছিয়া লইল,...গিরিবালার নিজের আলমারি, শখ হইয়াছে একটা নূতন কি পুতুল রাখিবে, কিংবা প্রয়োজন হইয়াছে—শৌখিন একটা রেকাবি বাহির করিতে হইবে।

একটা চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল। পশ্চিমা চাকর। ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন করিল —"বাবু তামাক সাজিয়ে আনবো?"

রসিকলাল সম্মতি দিতে গড়গড়া, একটা কলিকা আর একটা ডিবার মধ্যে হইতে একটু তামাক ও খান দু-এক টিকা লইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। ব্যাঘাত পাইয়া কল্পনার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, অহার জায়গায় আসিয়া পড়িল একটু দুশ্চিন্তা,—ভগবতীচরণ লোকটি কি রকম?—একটু বোধ হয় কোপনস্বভাব,...একটু নয় বিলক্ষণই। এই অল্পটুকু আসিতেই যতটা দেখা গেল, বেশ উৎসাহ মনে হয় না। আর, এ শুধু রাস্তা দিয়া আসা অনাত্মীয়দের কোথায় কি ত্রুটি হইয়াছে তাহার খোঁজ লইতে লইতে ; নিজের বাড়িতে, পরিপূর্ণতার মধ্যে কি স্বরূপ ভগবতীচরণের? ভগবতীচরণকে অতিক্রম করিয়া গিরিবালাকে এ-বাড়িতে আনিয়া ফেলা যাইবে কি? সেও পরের কথা, আপাতত তিনি এমন কোপনস্বভাব লোকের সঙ্গে কথাবার্তাই বা চলাইবেন কি করিয়া? একে এমনই শক্ত, তাহার উপর আবার দেখাইতে হইবে তিনি রাশভারী, তিনিও কম কড়া লোক নহেন—পণ্ডিতমশাই যে রাস্তা একেবারে বাঁধিয়া দিয়াছেন!

একদিকে লোভ, আশা আর একদিকে ভয় ; ভগবতীচরণের সঙ্গে কথাবার্তা চালানো

BanglaBook.org

যদি নেহাতই অসম্ভব না হয় তো খুব শক্ত তো নিশ্চয়ই, সমস্ত রাস্তায় একটি কথা বলিবার সাহস হয় নাই। এদিকটা যতই ভাবিতেছেন, মনটা ততই অস্বস্তিতে ভরিয়া আসিতেছে। শুধু যে মনে হইতেছে পণ্ডিতমশাই আসিলে ছিল ভাল এইটুকুই নয়, নিরুপায় মনটা পণ্ডিতমশাইয়ের উপর এক-একবার বিরূপ হইয়া উঠিতেছে,—নিয়ে আসিতে পারিলেন না অথচ রাশভারী বলিয়া রসিকলালের পরিচয় দিয়া এক ফ্যাসাদ বাধাইয়া বসিলেন!... আবার সব ঠেলিয়া গিরিবালা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সে যে আসিবেই, এ যে তাহারই বাড়ি,—পণ্ডিতমশাইয়ের গণনা তো মিথ্যা হইবার নয়; কাতুদিদির ওখানকার ফাঁড়াটা কাটিয়া গেল কি করিয়া?—শরতের মেঘের মতো দেখিতে দেখিতে আকাশে যেন মিলাইয়া গেল!

আর ভগবতীচরণ লোকটা ভালোই, শুদ্ধাচারী, পরহিতব্রতী।..'পরহিতব্রতী!'...মনে ওঠামাত্র এই কথাটিকে যেন দশ অঙ্গুলি দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিলেন। গিরিবালা লইয়া পণ্ডিতমশাই যতই জোরের কথা বলুন না কেন, আসলে রসিকলাল কন্যাদায়গ্রস্থই তো? পরহিতব্রতী লোকেরই তো দরকার তাঁহার।

এই সমস্যা যদি বা মিটিল আর একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ভগবতীচরণের কথার উত্তরে যে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল সে কে? গিরিবালার শাশুড়ী নয় নিশ্চয়, তবে?...

চিন্তায় তাহার বাধা পড়িল। সদর দরজা দিয়া আর এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। ভগবতীচরণের মতই চেহারা, তবে শরীরটা আরও বলিষ্ঠ, রংটা আর মাজা। পাত্রের পিতা, আর সন্দেহ নাই। উদ্বেগে রসিকলালের সমস্ত অন্তরাত্মা যেন কণ্ঠে আসিয়া জড়ো হইয়াছে।

ভিতরেই যাইতেছিলেন, বৈঠকখানার দিকে নজর পড়ায় দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথা থেকে আগমন হচ্ছে মশাইয়ের?"

রসিকলাল উত্তর করিলেন—"বেলে-তেজপুর থেকে!"

কথাটা যেন আগন্তুককে সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে আকর্ষণ করিয়া লইল, ফরাসে উপবেশন করিতে করিতে বলিলেন—"বেলে-তেজপুর থেকে? পণ্ডিতমশাই পাঠিয়েছেন?"

আগ্রহটা দেখিয়া অকূলে কূল পাইলেন, উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, পণ্ডিতমশাই পাঠিয়েছেন।"

"নমস্কার। তবে তো, ...কখন এলেন আপনি?"—ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

রসিকলাল প্রতি-নমস্কার করিলেন, বলিলেন—"মিনিট পনেরো-কুড়ি হবে। আপনি মধুসূদন মুখোপাধ্যায় মশাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"হয়েছে, তিনি নেয়ে ফিরছিলেন, একসঙ্গেই এলাম।"

মধুসূদনের মুখটি এক মুহূর্তেই শুকাইয়া গেল। ঐ রকম জেদি, কড়াপ্রকৃতির লোক, তাহার উপর গোড়াতেই দাদা তাঁহাকে একলা বসাইয়া গেলেন, অভ্যর্থনায় এত বড় একটা ত্রুটি হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত কী যে বলিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না; তাহার

BanglaBook.org

পর দাদার বিলম্বের জবাবদিহি হিসাবে কহিলেন—"দাদা আসবে এখুনি। আসল কথা, নাওয়ার পরই তাঁর পুজোটা সেরে নেওয়া চাই-ই, মনটা যাতে কোন রকম চঞ্চল হয়ে না উঠতে পারে আর কি।"

একটু হালকাভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন—"সামান্যতে একটু চটে যান কিনা, রাস্তায় আসতে আসতেই সেটা টের পেয়েছেন নিশ্চয়?"

টের যথেষ্ট পাইয়াছেন : রসিকলাল মধুসূদনের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। হাস্যে যোগদান তো করিতেই পারিলেন না, অস্বস্তির ভাবটা যেন ভিতরে ভিতরে বাড়িয়া গেল। বলিলেন—"আমি ওবেলা আসব'খন একটু ঠাণ্ডা পড়লেই। কাছেই দু-একজন আত্মীয়-স্বজন আছেন।...নিশ্চয়ই, পুজোটা আগে সেরে নেবেন বৈ কি,—মনস্থির করে..."

মধুসূদনের মুখের ভাবটা এমন হইল যেন যেটি আশঙ্কা করিয়াছেন, ঠিক সেইটি ফলিয়া গেছে। বলিলেন—"উঠবেন? না; সে কি হয়? এতক্ষণ যখন দয়া করে বসেছেন...এসে যদি আবার দেখেন আপনি নেই তাহলে আমার ওপর যে...পুজোর পরেও এক একদিন মেজাজটা বিগড়ে থাকে কিনা..."

পুজোর পরেও!...দাদার পূর্ণ পরিচয় রসিকলাল তাহলে এতক্ষণে পান নাই, বেয়াড়া রকম রাগী আর একবগ্গা লোককে লইয়া মধুসূদনের বর্ণনার বাহিরেই—ভিতরের আতঙ্কে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"ওটা...মানে, ওবেলা তো আসছিই...বাড়িটা দেখা রইলই..."

একটা অসহ্য অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, থাক একেবারেই চলে না; অথচ ভাল একটা ছুতাও যোগাইতেছে না, মনের এরকম গোলমেলে অবস্থায়।

মধুসূদন নিজেও দাঁড়াইয়া উঠিলেন—"না; সে কোন মতেই হতে পারে না; একটু তামাকও খেলেন না; দাদা আমার আর কিছু বাকি রাখবেন না; ভয়ানক বদরাগী লোক, আপনি জানেন না। তায় আসতে আসতে আজ আবার আরও বেশি চটে রয়েছেন..."

তাহার কারণটাও রসিকলাল কতকটা নিজে!—"যো নেই থাকবার মশাই; বাড়িটা একবার শুধু দেখে নিতে এসেছিলাম—সেটা হয়ে রইল, আবার আসছিই তো বিকেলে" —বলিয়া আবার একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া পা বাড়াইয়াছেন,—এমন সময় এক হাতে গোটাকতক গোলাপ আর গন্ধরাজের চারা লইয়া ও অন্য হাতে একটি মেয়েকে ধরিয়া একটি যুবক সদর দরজা দিয়া প্রবেশ করিল। মধুসূদন ক্ষণমাত্র কি চিন্তা করিয়া লইয়া ডাক দিলেন—"বিপিন এদিকে এসো একবার, গাছগুলো ওখানে রেখে দাও।"

রসিকলাল আর এক পা বাড়াইয়া ছিলেন, যুবকের পানে নজর পড়িতেই থামিয়া গেলেন। উঠান বাহিয়া আসিতে যতটুকু সময় লাগিল স্থির চাহিয়া রহিলেন। ঐটুকু সময়ের মধ্যে বিস্ময় এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কী একটা অনির্বাচনীয় ভাবে তাঁহার মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিল। মধুসূদন চকিতে একবার দেখিয়া লইলেন।

যুবক দুয়ারের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি বাবা?"

মধুসূদন বলিলেন—"এঁকে প্রণাম কর।"

যুবক একটু কুতূহলী দৃষ্টিতে ক্ষণমাত্র রসিকলালের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া মধুসূদনকে প্রশ্ন করিল—"ডাকছেন আমায়?"

"তোমার জেঠামশাইয়ের পূজা হল কিনা দেখো একবার।"

BanglaBook.org

যুবক চলিয়া গেলে রসিকলালের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"এইটিই আমার বড় ছেলে।"

দরকার ছিল না, তবুও রসিকলালের পক্ষে ফিরিয়া আবার বসাটা সহজ করিয়া দিবার জন্যই বলিলেন—"না, একটু বসে যেতেই হবে আপনাকে।"

বেশ ভাল করিয়া গড়গড়া প্রভৃতি ধুইয়া পশ্চিমা চাকরটা তামাক আনিয়া হাজির করিল।

॥ ৩ ॥

দুই বৈবাহিকের প্রথম সাক্ষাৎ দুই পরিবারের মধ্যে একটি স্মরণীয় ঘটনা, এই বৈঠকখানাকেই কতবার হাস্যমুখরিত করিয়া তুলিয়াছে।

মধুসূদন বলেন—"আরে, আমার কাছ পণ্ডিতমশাই গেয়ে রেখেছেন, মস্ত বড় জিদে, রাগী, রাশভারী, লোক, দাদার সঙ্গে দেখা হয়েছে অথচ একলাটি বসিয়ে দাদা পুজো করতে লেগে গেছেন, পনেরো-কুড়ি মিনিট হয়ে গেছে...আমার তো আক্কেল গুড়ুম! মুখের দিকে চেয়ে দেখি মুখ একেবারে বর্ষার মেঘের মতো থম-থম করছে। হবে না? এক মানী লোক, এমনি তটস্থ হয়ে থাকতে হয়, তার ওপর এই অভ্যর্থনা!...আমি কি করে জানব, বেহাই এদিকে দাদার গতিক-গাতাক দেখে একেবারে থ মেরে গেছেন?...দেখছি—মানী লোকের যতই মান ভাঙাবার চেষ্টা করি, সে ততই ভেতরে ভেতরে ওঠে ক্ষেপে—বেহাই যে ওদিকে দাদা আসবার আগেই পিঠ বাঁচিয়ে পিঠটান দিতে চান..."

হাসির হররা ওঠে...

রসিকলাল লজ্জিতভাবে হাসিতে হাসিতে বলেন—"আমি তো ছিলাম সামলে-সুমলে একরকম—'রাগী, বদরাগী, আজ আবার বেশি চটে আছেন'—এইসব বলেই তো বেহাই আমায় আরও ঘাবড়িয়ে দিলেন। সাত্ত্বিক মানুষ, নেয়ে মনটি শুদ্ধ করে পুজোয় বসবার জন্যে আসছেন, আর হবি তো হ' আমিই ভটচার্যি পাড়ার কথা জিগ্যেস করে দিয়েছি খিঁচড়ে মনটা! হয় সাহস আর বসে থাকতে?...বেহাইয়ের পিঠ শক্ত, অমন দাদা থাকলে হয়ই শক্ত, সবার তো আর তা নয়..."

হাস্যের তরঙ্গ আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।

ভগবতীচরণ যখন প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন দুইজনে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। রসিকলাল গড়গড়া সেবন করিতেছিলেন, সদ্যত্যক্ত নলটার মুখ দিয়া ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ রেখা বাহির হইতেছে, মধুসূদন মাথাটা নিচু করিয়া ফরাসের উপর নখ দিয়া ধীরে ধীরে আঁক কাটিতেছেন।...ভিতরকার কথাটা এই যে মধুসূদন আর ঘাঁটাইতে সাহস পাইতেছেন না, ওদিকে ছেলেটি চোখে দেখা পর্যন্ত রসিকলালের সমস্যা আরও ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছে—ছাড়িয়া যাওয়াও অসম্ভব, বসিয়া থাকাও দুষ্কর।

ভগবতীচরণ আসিয়া সম্পূর্ণ কাঠের যে চেয়ারটি তাহার উপর উপবেসন করিলেন। পায়ে খড়ম, গায়ে একখানি রেশমের নামাবলি। মুখের পানে চাহিয়া রসিকলাল একটু

BanglaBook.org

বিস্মিত হইলেন। পূজার পূর্বের সেই একটা বিরক্তির ছাপ, দৃষ্টির সেই চাঞ্চল্য আর ক্রমাগত ছিদ্রান্বেষণের কৌতূহল—সেসব যেন একেবারেই নাই, তাহার জায়গায় বেশ একটি স্থির প্রসন্ন ভাব। সাঁতরার লোকেরা ভগবতীচরণের এই দু'ধরনের রূপের সঙ্গে খুব পরিচিত ; বলে,—ভগবতীঠাকুর গঙ্গা থেকে শুধু দেহটাকে স্নান করাইয়া আনেন, পূজায় করান আত্মার স্নান, তখন তাঁর পূর্ণরূপ ফুটিয়া ওঠে।

মধুসূদন রসিকলালকে যে বলিয়াছিলেন,—দাদার মেজাজ এক-একদিন পূজার পরও বিগড়াইয়া থাকে সেটা সম্পূর্ণ বানাইয়া বলিয়াছিলেন, নিজের গঞ্জনার কথা বলিয়া রসিকলালকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য।

ভগবতীচরণ মধুসূদনের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"মধু নিশ্চয় শুনেছ, ইনি বেলে-তেজপুর থেকে আসছেন?"

মদুসূদন যেন একটা জড়তা কাটাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"হ্যাঁ, আলাপ পরিচয় হল। ইনিই মেয়ের বাপ।"

"বাঃ, বড় আনন্দের কথা।"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"কিন্তু আলাপে একটু বেশি মেতেছিলে বলে বোধ হচ্ছে। ওঁরা এখনও জামাজোড় খোলা হয়নি, হাত-পা ধোয়া হয়নি। প্রজাপতি যদি যোগাযোগ ঘটান তো অভ্যর্থনা-সৎকার সম্বন্ধে বৈবাহিককে একটু নিরাশই হতে হবে দেখছি।"

—বেশ পণ্ডিতী চালের ঘর-কাঁপানো একটি হাসি হাসিয়া উঠিলেন। তাহাতেই ঘরের গুমোট ভাবটা একেবারে কাটিয়া গেল। রসিকলাল মধুসূদন—এঁরা দুজনেও কতকটা লজ্জিতভাবে হাসিতে যোগদান করিলেন। চাকরটাকে ডাকিবার জন্য মধুসূদন উঠিলে ভগবতীচরণ বলিলেন—"আর আহারও উনি এখানেই করবেন,—সাঁতরা আর বেলে-তেজপুর এপাড়া ওপাড়া নয়।"

বৈঠকখানা হইতে ভিতরে যাইবার একটা দুয়ার আছে ; সেইটা খুলিয়া মধুসূদন চাকরকে ডাক দিলেন, আহারের কথা শুনিয়া নিজেই ভিতরে যাইতেছিলেন। ভগবতীচরণ বলিলেন—"সে সব আমি বলে এসেছি, তুমি বসো এসে।"

পশ্চিমা চাকরটা আসিয়া, জুতা খুলিয়া খড়মে পা বসাইয়া, জামা উড়ানি আলনায় টাঙাইয়া রাখিয়া স্নানাদির সরঞ্জাম করিয়া দিল এবং তাহার পর বেশ পরিপাটিভাবে তৈলমর্দন শুরু করিয়া দিল। এই সবেরই ফাঁকে ফাঁকে উভয় পক্ষের খানিকটা বংশ পরিচয় হইয়া গেল, খানিকটা পারিবারিক পরিচয়ও। যদিও আসল কথাটা পাড়া হইল না, তবুও সমস্তই বেশ অনুকূল বলিয়া বোধ হইতেছে, একটি প্রীতি আর আত্মীয়তার ভাব সংলাপকে স্নিগ্ধ করিয়া তুলিতেছে। তেলমাখা শেষ হইয়া আসিলে ভগবতীচরণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আপনি তাহলে এবার স্নানাহ্নিক সেরে নিয়ে একটু জলযোগ করে নিন।" তাহার পর নিজের পেটে হাতটা একবার বুলাইয়া বলিলেন—আমারও জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছেন, তাঁকে ঠাণ্ডা না করলে অব্যাহতি নেই। আসছি আমি এক্ষুনি।"

সেই ধরনেরই অপেক্ষাকৃত মৃদু হাস্য করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেলেন। তখনই আবার ফিরিয়া আসিয়া দুয়ারটা একটু খুলিয়া মধুসূদনকে বলিলেন—"একটু দেখো মধু ওঁকে, কুটুম্বিতার পূর্বেই কুটুম্বিতার ত্রাস জন্মে দিও না যেন।"

BanglaBook.org

হাসিতে হাসিতে দুয়ার ভেজাইয়া চলিয়া গেলেন।

একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে খানিকক্ষণ কাটাইতে হইয়াছিল বলিয়াই পরস্পরে মনের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া দুই বেহাইয়ের আলাপ, আর সেই আলাপের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেশ জামিয়া উঠিল। মধুসূদনের আশ্চর্য বোধ হইতেছে, পণ্ডিতমশাই যে লোকের পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহার কাছে সে লোক কই? এ-তো যতই দেখিতেছেন, যতই শুনিতেছেন, ততই নিতান্ত একটি শিশুর মতো সরল প্রকৃতি তাহার সামনে উদ্‌ঘাটিত হইয়া উঠিতেছে। মধুসূদন নিজে সতর্ক লোক, একটা গোটা নীলকুঠির প্রায় হর্তা-কর্তা-বিধাতা,—এক-দিকে সাহেব আর অন্য দিকে আমলা প্রজা থেকে সামান্য মজুরটির পর্যন্ত মেজাজ, গতিবিধি আর চরিত্রের হিসাব রাখিয়া চলিতে হয়; তবু এই অনাড়ম্বর মনের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বিবাহ লইয়া তাঁহার আগ্রহের কথা তো প্রকাশ করিয়া ফেলিলেনই, তাহা ভিন্ন অন্য বিষয়েও কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে পারিলেন না। নিজের ঘটনাবহুল জীবনের অনেককথাই এই নব-পরিচিতের নিকট ব্যক্ত করিয়া ধরিলেন। তাহাতে এও প্রকাশ হইয়া পড়িল যে দূর বিদেশে, নিতান্ত এক পাড়াগাঁয়ে বাঙালী বলিতে সপরিবারে এক তিনিই, অনেক সুবিধার সঙ্গে অসুবিধাও বিস্তর, পথও বেশ সুগম নয়;—আরও অনেক কথা, বৈষয়িক হিসাবে যা সব লুকাইয়াই রাখা সঙ্গত ছিল—বিবাহ যেখানে নির্বাসনেরই নামান্তর, কে আর জানিয়া শুনিয়া সেখানে অগ্রসর হয়? এক ঝোঁকে সমস্ত বলিয়া গিয়া বোধ হয় একটু ভয়ও হইল, পাকা বিষয়ী মনই তো? একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই রসিকলালের মুখের পানে দু-একবার চাহিলেন—কোন ভাবান্তর উপস্থিত হইল কিনা লক্ষ্য করিবার জন্য। পণ্ডিতমশাইয়ের পরামর্শ মতো এইখানে একটু 'রাশভারী' হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ ছিল রসিকলালের, বলার রাস্তা ছিল—'তাই তো মশাই, একটু ভাবিয়ে তুললেন যেন...দেখতে হচ্ছে ভেবে-চিন্তে একটু...এতটা যে তা তো জানতাম না'...অন্তত—"পণ্ডিতমশাইকে একবার জিগ্যেস করে দেখি, বিচক্ষণ লোক তিনি..."

সে-ধরনের তো কিছু বলিলেনই না, বরং মনের আনন্দে একেবারে উল্টো কথা বলিয়া দিলেন; ঈষৎ হাস্যের সহিত মধুসূদনের মুখে সমস্তটা শুনিয়া গিয়া বলিলেন,—"আমি তাই মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিলাম—পণ্ডিতমশাই বললেন কিনা—'রসিক, মেয়ের সবই ভাল—পিতৃকুল, শ্বশুরকুল উভয় কুলই সমুজ্জ্বল করবে, তবে ঐ এক কথা—মেয়ের বিবাহ বহুদূরে, হুট করে যে চাইবে একবার দেখে আসি মেয়েকে সেটি হবার জো নেই'...আচ্ছা কাছেপিঠে হিমালয়ের কোন অংশ পড়ে কিনা বলতে পারেন কি?"

রসিকলাল স্মিত হাস্যের সহিত চাহিয়া আছেন,—মধুসূদন মনে মনে একটু হিসাব করিতে করিতে বলিলেন—"দাঁড়ান, তা কাছেই বলতে হবে বৈকি, শীতকালে আকাশ একটু পরিষ্কার থাকলেই আমরা বরফঢাকা চূড়াগুলো দেখতে পাই; একটু বৃষ্টি হয়ে গেলে যেদিন আকাশ বেশি পরিষ্কার থাকে, ঝলমল করতে থাকে।"

রসিকলাল উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন,—"বললাম না?—অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে; বললেন 'হিমচক্রের মধ্যে তোমার গিরির বিয়ে হবে'...মেয়ের নাম হল গিরিবালা—হিমচক্র হল হিমালয়ের পঞ্চাশ ক্রোশ পর্যন্ত জায়গা, এর পরেও মেয়ে আমার দূরদেশে পড়ল বলে দুঃখু করা চলে? আপনিই বলুন না?"

পণ্ডিতমশাইয়ের একটা কথা মধুসূদনের মনে পড়িয়া গেল—"সামান্য একটু খুঁত

থাকলে পিছিয়ে পড়বে,...ওর চেয়ে জনকরাজা ঢের সুবিবেচক ছিলেন মশাই।"

আগ্রহসহকারে প্রশ্ন করিলেন—"তাহলে আপনার আর অমত নেই ধরে নিতে পারি তো?"

রসিকসলাল পণ্ডিতমশাইকে একেবারেই ভুলিয়া গেলেন, হাসিয়া খুব বিজ্ঞের মতো বলিলেন—"অমত! এখন ভালোয় ভালোয় আপনাদের জিনিস আপনাদের দিয়ে নিশ্চিন্দি হতে পারলে বাঁচি মশাই; এ যে পরের বোঝা মাথায় করে রয়েছি।"

স্নান-আহ্নিকের পর জলযোগ করিতে করিতে কথাটা আরও এক ধাপ অগ্রসর হইল। প্রসঙ্গটা উঠিল ঘিয়ের কথা লইয়া। মধুসূদন বলিলেন— "হালুয়া, লুচি, নিমকি ওসবই ওখানকার ঘিয়ে ভাজা, স্বাদটা একটু লক্ষ্য করে দেখবেন।"

রসিকলাল লুচিতে মুড়িয়া খানিকটা হালুয়া মুখে তুলিতেছিলেন, বিস্মিত আনন্দে বলিয়া উঠিলেন—"তাই নাকি! বাঃ এ তো চমৎকার যোগাযোগ! গিরিকে গিয়েই বলতে হবে,—গিরি, তোর আসল শ্বশুরবাড়ির ঘি খেয়ে এলাম,...সাঁতরা যদিও মূল, তবু সেই তো এখন কার্যত ওর আসল শ্বশুরবাড়ি? কি বলেন?"

এমন সরল প্রকৃতির মানুষকে পণ্ডিতমশাই অত উগ্র বলিয়া পরিচিতি দেওয়ায় মধুসূদনের মনে মাঝে মাঝে একটা প্রশ্ন না জাগিতেছিল এমন নয়। আপত্তি করিবেন কি,—রসিকলালই তো বরং কথাটা আগাইয়া লইয়া যাইতেছেন। পণ্ডিতমশাই তাহা হইলে অমনভাবে বলিলেন কেন?—হয়তো রসিকলালকে বেশি অন্তরঙ্গভাবে জানেন না, নয়তো যে অত কড়া তার একটু উগ্রত্বেরও তো পরিচয় পাওয়া যাইত। কথাবার্তার মধ্যে এইটুকুও এক সময় পরিষ্কার হইয়া গেল। রসিকলাল বলিলেন—"আর কি করে যে আমি কাটান্ দিয়ে আসছি তা পণ্ডিতমশাই নিশ্চয়ই বলে থাকবেন আপনাকে। ভাল ভাল সব সম্বন্ধ এসেছে। ঝুলোঝুলি, রসিক ঠিক তার গোঁ ধরে বসে আছে। এই তো দু'দিন হয়নি —আমার শালি—নিজের শালি আমার, তার বৈমাত্র দেওরপোর জন্যে বাড়ি এসে সে হত্যে দেবার মতো; মেয়ের গর্ভধারিণীকে, জেঠাইকে, এমন কি আমার দাদাকে পর্যন্ত হাত করে নিলে—মেয়েমানুষে এসব বিষয়ে কি রকম পোক্ত জানেনেই তো; আমি সেই নিজের কোট ধরে বসে আছি। দাদা আমায় বাইরের ঘরে ডেকে পাঠালেন, একলা, জানেনেই বড্ড একবগ্‌গা লোক আমি,—বললেন—'গিরির বিয়ের ঠিক করে ফেলেছি আমি, কাতুর দেওরপোর সঙ্গে।'

—ভয়ঙ্কর রোখা লোক দাদা, অস্বীকার করব না, আমিও এখন পর্যন্ত সব সময় মুখ তুলে কথা কইতে ভরসা পাই না...স্পষ্ট বললাম—'ওখানে গিরির বিয়ে দাদা! তোমরা যে অবাক করলে—।'...'কেন, আপত্তিটা কি শুনি? তোর মেয়ে বলে তোর জোর?'

ভয়ানক একরোখা লোক, একবার যা ঠিক করে ফেলেছেন সে-সম্বন্ধ নড়-চড় করে কার সাধ্যি। তা আমিও তো কম যাই না, বললাম—"জোরের কথা হচ্ছে না, তুমি থাকতে আর আমার কিসের জোর? তবে গিরির কুষ্টিটা একবার দেখো, ওখানে কি ওর..."

দুয়ার খুলিয়া ভগবতীচরণ প্রবেশ করিলেন, প্রশ্ন করিলেন—"জলযোগ হল আপনার একটু?...কুষ্টির কথা হচ্ছিল?"

কল্পনার দাদার সঙ্গে স্পষ্টভাবে কথা বলিতে পারায় রসিকলালের মনটা আরও

BanglaBook.org

স্ফূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, মধুসূদনের পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন— "তা বলতে গেলে একরকম কোষ্ঠীবিচারটুকুই শুধু বাকি আছে..."

মধুসূদন বলিলেন—"আমি তোমায় বলছিলাম না দাদা? যদি সুবিধে হয় তো বিয়েটা একেবারে দিয়ে যাব। দিন পনেরো তো এখনও হাতে আছে ছুটির, একটা আটুই একটা তেরোই দিন আছে বলছিলে না তুমি? আজ ছউই হল, আটুই তো হতেই পারে না, যদি সম্ভব হয় তো তেরোই..."

ভগবতীচরণ হাসিয়া উঠিলেন, অনেক বিবাহ দেওয়াইয়াছেন, তাঁর অত ত্বরিত আর অত অসতর্ক হইলে চলে না, বলিলেন—"তুমি যে শিশুর মতো কথা কইছ মধু! আমাদের হিন্দুর বিবাহ, এ তো বর-কনে কোন রকমে গির্জায় একবার গিয়ে উঠতে পারলেই হল না। উভয় পক্ষের ভালো রকম করে পরিচয় নিতে হবে, ছেলে দেখা আছে, মেয়ে দেখা আছে, ভালো করে কোষ্ঠীবিচার আছে, আশীর্বাদ আছে...যেগুনো করণীয় সব করতে হবে তো?"

প্রবল আবেগের মধ্যে উপদেশের আকারে প্রায় এই ভর্ৎসনাটুকুতে উভয়েই যেন ভিতরে ভিতরে একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন ; রসিকলাল, ভগবতীচরণ আসিয়াই কোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়া কোষ্ঠীটা প্রায় বাহির করিয়া দিতে যাইতেছিলেন, চাপিয়া গেলেন।

ভগবতীচরণ রসিকলালকে প্রশ্ন করিলেন—"কি বলেন? এগুনো সব তো করতেই হবে?"

রসিকলাল সঙ্গে সঙ্গে খুব ভারিক্কে হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"তা করতে হবে বৈকি, হিন্দুর ঘর। তা করতে হবে না? বাঃ!"

মধুসূদন কহিলেন—"না, আমি বলছিলাম, যেগুলো দরকারী সেগুনো সেরে যদি দেখা যায় যে যোগাযোগ হচ্ছে তো এই ঝোঁকেই কাজটা সেরে যেতাম একেবারে, আবার সেই চারশ মাইল ঠেলে আসা সহজ নয় তো? না আটুই হল, তেরোই রয়েছে, না —তেরোই, আরও না হয় হপ্তাখানেক ছুটি বাড়িয়ে নিলাম।"

ভগবতীচরণ বলিলেন—"তাতে আপত্তি করছি না, সম্ভবের মধ্যে যতটা তাড়াতাড়ি পারো করো না তুমি। ছেলে উনি দেখে যাচ্ছেন, তুমি একদিন গিয়ে মেয়ে দেখে এসো। ইতিমধ্যে কোষ্ঠীবিচার হোক, কোষ্ঠীটা কি এনেছেন উনি সঙ্গে করে? না হয় গিয়েই পাঠিয়ে দেবেন।"

রসিকলাল একটু যেন স্মরণ করিবার ভঙ্গীতে বলিলেন—"কোষ্ঠীটা কি দিয়েছে সঙ্গে? আনলেই হোত তবে, আমি আবার বারণ করে দিলাম, বললাম—'দাঁড়াও, আগে দেখাশুনা হোক, পরিচয়াদি হোক, তাড়াতাড়ি তো কোষ্ঠী নিয়ে বসলেই চলবে না।...দাঁড়ান্ দেখি, দিয়ে দিয়েছে কি না ভুল করে?"

উঠিয়া যে পকেটগুলায় না থাকিবার কথা সেইগুলায় প্রথমে দেখিলেন, তাহার পর কোটের বুক পকেট থেকে কতকটা নির্লিপ্তভাবে কোষ্ঠীটা বাহির করিয়া ভগবতীচরণের হাতে দিয়া বলিলেন—"যাক, দিয়েই দিয়েছে দেখছি।"

ভগবতীচরণ কোষ্ঠীটা মনে মনে পাঠ করিতে লাগিলেন, ইঁহারা দুইজনে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ভগবতীচরণের মুখে এক-একটি সূক্ষ্ম রেখা ফুটিয়া তখনই মিলাইয়া যাইতেছে। রসিকলাল বিশেষ কিছু বুঝিলেন না, তবে মধুসূদন দাদাকে চেনেন,

BanglaBook.org

তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না যে কোষ্ঠীটায় খুবই আসাধারণ কিছু একটা আছে, মুখে বিস্ময়, প্রশংসা আর আনন্দের ভাব উঠিতে না উঠিতেই জ্যেষ্ঠ সংবৃত করিয়া লইতেছেন। শেষ করিয়া অনুচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"কোষ্ঠীটি বেশ ভালই দেখছি। কে তোয়ের করেছেন?"

রসিকলাল নাম বলিলেন।

"বেশ পণ্ডিত লোক। এইবার একবার বিপিনের কোষ্ঠীর সঙ্গে দেখতে হবে। আমি এটা নিয়ে যাচ্ছি, তোমরা ততক্ষণ গল্প-সল্প করো।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ভগবতীচরণ আবার প্রবেশ করিলেন।

ভগবতীচরণ অভ্যর্থনা-আতিথ্যে যতই মুক্তচিত্ত, আর কৌতুকপ্রবণ হন, বিষয়সম্পর্কীয় কথায় খুব সংযত ; এটাও ভুলিবার লোক নন যে তাঁহারা বরপক্ষীয়। যখন প্রবেশ করিলেন, মধুসূধন লক্ষ্য করিলেন খুব যেন একটা বড় আনন্দ আর আবেগকে চাপিবার চেষ্টায় মুখটা একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ভগবতীচরণ যেন একটু কাঁপিতেছেন। চেয়ারে আসিয়া বসিতে মধুসূদন প্রশ্ন করিলেন—"কেমন দেখলেন দাদা?"

"উঁ?" বলিয়া ভগবতীচরণ মাথা নিচু করিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিলেন—"তোমার যদি এতই তাড়া থাকে তো একটা শ্রম আমি লাঘব করে দিতে পারি।"

দুজনে উৎসুক নেত্রে তাঁহার পানে চাহিলেন। ভগবতীচরণ আর বরপক্ষীয়ের গাম্ভীর্যটা রক্ষা করিতে পারিলেন না : নিজের মনের আনন্দটা যেন পূর্ণ মুক্তি দিয়াই রসিকলালের পানেই চাহিয়া বলিলেন—"আমাদের আর মেয়ে দেখবার প্রয়োজন হবে না, একেবারেই গিয়ে আশীর্বাদ করব।"

দুজনে বিস্মিতভাবে চাহিতে বলিলেন—"অদ্ভুত যোগাযোগ, প্রায় শতাধিক বিবাহ আমি নিজের হাতে দিয়েছি, এমনটি চোখে পড়েনি।"

বিস্মিত-প্রফুল্লদৃষ্টিতে খানিকটা মধুসূদনের মুখের পানে, খানিকটা রসিকলালের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর রসিকলালকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এখন আমার একটা অনুরোধ আছে আপনার কাছে।"

কথাবার্তার এরকম আকস্মিক পরিবর্তনে, রসিকলালের মনটাও যেন হঠাৎ চড়াসুরে বাঁধিয়া দিয়াছে, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন—"সে কি, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ অনুরোধ করবেন!"

ভগবতীচরণ বলিলেন—"তাতে দোষ নেই, সম্বন্ধটা একবার দাঁড়িয়ে গেলে তো হুকুমই করব—যেমন মধুকে করি।...মিলিয়ে দেখলাম, এদের যেমন রাশিচক্র তাতে গ্রহ-সংস্থানে সামনের এই আট তারিখের দিনটাই প্রশস্ত। বড় সুন্দর যোগাযোগ, আমার আর একটুও খুঁত রাখবার ইচ্ছে নেই। তাই বলছিলাম যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে চারটের মধ্যে একটি লগ্ন আছে ভাল।"

একটু থামিয়া রসিকলালের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তার মানে পরশু একদিনেই মেয়ে আশীর্বাদ, গায়ে হলুদ, বিবাহ—তাও দুপুর থেকে নিয়ে রাত্রি একটার মধ্যে।"

এতবড় একটা কাজ একটিবার মাত্র আসিয়া একেবারে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছেন

BanglaBook.org

—রসিকলালের জীবনে ইতিপূর্বে কখনও এমন ঘটে নাই ; বাড়ি গিয়া জাঁক করিয়া বলিবার কথা। এতটা উত্তেজিত হইয়া গিয়াছেন ভিতরে ভিতরে যে বন্দোবস্তটার মধ্যে যে কতটা অসঙ্গতি-অসুবিধা আছে একবার ভাবিয়া দেখিতে পারিলেন না। আগ্রহ সহকারে বলিলেন —"এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। যোগাযোগ ভাল থাকে একদিনেই সব সেরে নিতে হবে।"

ভগবতীচরণ বলিলেন—"অসুবিধে হবে বেশ একটু, তবে কি জানেন?—আমরা হলাম ঋষির বংশধর মশাই, কাজের মধ্যে লগ্ন আর মন্ত্রটা ঠিক থাকলেই হল, আড়ম্বর যতটা হল, হল ;—যা হয়ে উঠল না, তার জন্যে আপসোস কিসের?"

॥ ৪ ॥

কয়েক বৎসর পূর্বেকার কথা, এক সময় নিতান্ত অজ্ঞাতসারেই গিরিবালার মন খেলাঘরের পুতুলের-সংসার থেকে গুটাইয়া আসিল। সে কিন্তু নির্ঝঞ্ঝাটে হইতে পারিল না, দেখিল দুইটি শিশু তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে, বাপ আর জেঠামশাই। ...মা ছোট ভাইটির কল্যাণে 'মঙ্গলবার' ব্রত করেন—অর্ধোপবাস, মুখটি বাৎসল্যের বেদনায় যেন শুকাইয়া থাকে সমস্ত দিন। মনে হয় মা যেন আরও বেশি করিয়া মা হইয়া ওঠেন।...গিরিবালা একদিন জেঠাইমাকে একান্তে পাইয়া কোলে মুখ গুঁজিয়া আবদারের সুরে বলিল—"আমিও মঙ্গলবার করব জেঠাইমা।" জেঠাইমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন— "সে কি রে, তুই কার জন্যে মঙ্গরবার করতে যাবি?" গিরিবালা আরও মাথাটা গুঁজিয়া বলিল—"জেঠামশাইয়ের জন্যে।" সবার হাসিতে অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল, জেঠামশাইয়ের আদরে অনেকক্ষণ পরে চুপ করিল।

অনেকদিন পূর্বেকার কথা! তাহার পর কবে এক সময় গিরিবালার অন্তরের মা'টি কুণ্ঠিত চরণে এ দুই আধার থেকেও সরিয়া আসিল। সেবা উদ্বেগ সবই রহিল, কিন্তু সেই জিনিসটি রহিল না যাহার জন্যে 'মঙ্গলবার' করিবার আগ্রহ জাগিতে পারে। এই সময় একটি অসহায় বিড়ালশিশু কোথা থেকে আসিয়া জুটিয়া গিরিবালাকে আবার প্রায় পুতুলখেলার যুগে টানিয়া লইয়া গেল। বাবা জেঠামশাইয়ের মত সে স্পষ্ট 'মা' বলিয়া ডাকিয়া সঙ্কোচ জাগাইতে পারে না বটে, তবে নিজের দৈন্যে, অসহায়তায় গিরিবালার মধ্যেকার মাতৃত্বকে নানাভাবে উদ্রিক্ত করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি আবার সে নিজেই পাঁচ-ছয়টি শিশুর জননী।

গিরিবালা পা ছড়াইয়া রাঙিকে কোলে লইয়া আদর করিতেছে, তাহার সন্তানগুলি লাঙ্গুলের পতাকা উড়াইয়া চারিদিকে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় রসিকলাল—"গিরি কোথায় গো?"—বলিয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কন্যার দিকে নজর পড়িতে হাসিয়া বিড়াল-পরিবারকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, খেয়ে নে আদর যত পারিস, আর ক'টা দিন বা? বৌদিদি কোথায় রে গিরি?"

অন্নদাচরণ নিজের ঘরে ছিলেন, ডাকিলেন—"রসিক এলে? একবার এদিকে এসো।"

রসিকলাল গিয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে প্রশ্ন করিলেন—"তুমি কার মুখে শুনলে?"

BanglaBook.org

রসিকলাল কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ভাবে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। অন্নদাচরণ বলিলেন—"ও! ঐ কথাটা বললে কিনা গিরিকে, আমি ভাবলাম বুঝি শুনেছ তাহলে।...ইয়ে, গিরির কথাবার্তা ঠিক করে ফেললাম, হরিপুরে ; পরশু খেতে আসবে।"

সমস্ত ব্যাপারটি নিম্নরূপ—

রসিকলাল প্রত্যুষে সাঁতরা যাত্রা করিলেন, বেলা প্রায় নয়টার সময় নিকুঞ্জলাল অন্নদাচরণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। নিজে তিনি পূর্বদিন সন্ধ্যার পর হরিপুর হইতে ফিরিয়াছেন।

দৃশ্য প্রায় পূর্ব্ববৎই, বাঁ হাতে হুঁকা লইয়া তামাক খাইতেছেন, পাশে মকদ্দমার কতকগুলি নথিপত্র জড়ো করা ; আপাতত সামনে বেশ দীর্ঘ একটি কোষ্ঠীর উপর ঝুঁকিয়া তদ্‌গতচিত্তে কি অনুধাবন করিতেছেন। অন্নদাচরণ আসিতে একটু চোখ তুলিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন—"বস।"

আবার সেইভাবেই ঝুঁকিয়া রহিলেন।

একটু পরে সোজা হইয়া বসিয়া আত্মগতভাবেই বলিলেন—"বাবাঃ, রাজারাজড়ার কুষ্টিই হল পঞ্চাশ হাত!"

অন্নদাচরণের পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা দোষই বা দিই কেমন করে?— কলসী দিয়ে তো আর সমুদ্র মাপা যায় না।...কৈ দাও।"

ডান হাতটা বাড়াইয়া দিলেন।

অন্নদাচরণ একটু বিস্মিতভাবেই প্রশ্ন করিলেন—"কি দাদা?"

নিকুঞ্জলাল বললেন—"কুষ্টিটা সঙ্গে আনতে বলে পাঠালাম যে ; নন্তীটা বুঝি ভুলে গেল বলতে? ওটা ঐ রকম।"

অন্নদাচরণ আগ্রহভরে প্রশ্ন করিলেন—"পারলেন ঠিক করতে কোনখানে দাদা?"

নিকুঞ্জলাল গম্ভীরভাবে বলিলেন—"যে-কোনখানে ঠিক করলেই যদি নিকুঞ্জলালের মনস্তুষ্টি হত তো এতদিন কবে হয়ে যেত অন্নদা, কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, নন্তীর চেয়ে গিরিকে বরং বেশি করেই দেখেছি ; কখনও কম করে দেখিনি। আর যতদিন নিজের মনে সামান্যও খুঁৎখুতুনি ছিল, তোমায় বরাবর জিগ্যেস করে গেছি —'ওহে অন্নদা পাত্রটি এই রকম, দেখ যদি পছন্দ হয় ;— কিন্তু কৈ, এবারে তোমায় তো জিগ্যেস করতেও গেলাম না।"

অন্নদাচরণ নিকুঞ্জলাল দ্বারা এদিকে বরাবরই উপকৃত হইয়া আসিয়াছেন, সামনে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তাহাও নিকুঞ্জলালেরই হাতে, একটু লজ্জিতভাবে কতকটা খোশামোদের ভাষাতেই বলিলেন,—"সে কি কথা দাদা, আপনি থাকতে আমরা কে? জিগ্যেস করেছেন সে ছোট ভাইয়ের পরামর্শ নেওয়া হিসাবে ; আমি রসিককে জিগ্যেস করি না? তাই বলে সব পরামর্শই নিতে হবে এমন কোন কথা আছে?"

নিকুঞ্জলাল হুঁকায় মুখ বসাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—"তুলনাটা খুব সঙ্গত হল না ;—তোমার রসিকের সঙ্গে পরামর্শ করা আর আমার তোমার সঙ্গে পরামর্শ করায় অনেক তফাত,—তুমি হলে একজন...যাক, জিগ্যেস করিনি, আর করতে গেলে হাতছাড়াও হয়ে যেত, তোমায় একটা আভাস দিয়েছিলাম এর পূর্বে।"

আবার হুঁকায় মুখ দিয়া আড়চোখে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অন্নদাচরণ

বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া থাকায় একটু স্পষ্টভাবেই হাসিয়া বলিলেন—"ঐ দেখো, ভোলানাথ ভাই আমার ভুলে বসে আছেন ;—কেন, সেবারে হরিপুরের রাজার প্রসঙ্গে বললাম না, —আরও একটা বড় মতলব ঠাউরে আছি?"

"কে?...কার সম্বন্ধে দাদা?"

অন্নদাচরণের প্রশ্ন করিতেও স্বরটা কাঁপিয়া গেল।

নিকুঞ্জলাল অবিচলিত কণ্ঠেই বলিলেন—"শোন কথা অন্নদার! খোদ পরেশ ছাড়া আর কার সম্বন্ধে মাথাব্যথা আমার?...বছরখানেক হল রাণী মারা গেলেন..."

অন্নদাচরণ বাক্‌রুদ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন, দৃষ্টিও যেন ভাবলেশহীন।

নিকুঞ্জলাল ভান করিয়াই হোক আর প্রকৃতই হোক একটু আতঙ্কের সহিত প্রশ্ন করিলেন—"ভুল করলাম নাকি অন্নদা? আমি তো মনে করলাম ভাল একটা..."

অন্নদাচরণ সেইভাবেই বলিলেন—"না,...ভুল...মানে, কথাটা কখনও ভেবে দেখিনি দাদা।"

প্রৌঢ় চল্লিশ বৎসরের...হয়তো আরও ঢের বেশি...বিপত্নীক—হয়তো বহুপত্নীকই —কে জানে অত ভিতরের কথা? এ দিকে রাজা!...হরিপুরের রাজবাড়ি!...

অন্নদাচরণের চিন্তাটা কোন একটা জায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না...অত্যন্ত আকস্মিক, কখনও যদি কল্পনার মধ্যেও আনিতেন তো যা হোক একটা মতামত লইয়া যৎসামান্যও প্রস্তুত থাকিতেন!...বলিলেন—"একটু ভেবে দেখি দাদা।"

নিকুঞ্জলাল গম্ভীরভাবে বেশ ক্ষুণ্ন হইয়াই বলিলেন—"বেশ দেখ।"

কিন্তু পাকা খেলোয়াড় লোক, এ সমস্তই তাঁহার পূর্ব হইতে গণনা করিয়া রাখা। বেশি এবং নিরুপদ্রবে ভাবিয়া দেখিতে অবসর দিবার পাত্র নন তিনি। অল্প একটু বিরতি দিয়াই বলিলেন—"কিন্তু সেখানে যে রাজ্যে তার সমারোহ পড়ে গেছে—বড্ড ভুল করলাম তো।"

অন্নদাচরণের মনে ঝঞ্ঝা উঠিয়া মনটাকে তোলপাড় করিয়া দিতেছে ; যদিও বাহিরে তার মাত্র এইটুকুই প্রকাশ যে দৃষ্টিটা কোনখানেই নিবদ্ধ করিতে পারিতেছেন না।...রাজ্যে সমারোহ!—রাজ্যে সমারোহ!—রাজ্যে!—কথাটার মানে যেন একপ্রকার ধরিতে পারিতেছেন—ঝঞ্ঝার মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুৎঝলকে।...তাঁদের গিরিবালা—এখন পর্যন্ত গায়ে একখানি ভালো গহনা ওঠে নাই। যে দিন কানের ওই হাল্কা দুল জোড়াটি পরিল—কী খুশী!—জেঠামশাই যেন সর্বাঙ্গ সোনা দিয়া মুড়িয়া দিয়াছে!...একখানা ভাল কাপড়ই কি দিতে পারিয়াছেন? স্মৃতি মথিত করিয়া হঠাৎ একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল অন্নদাচরণের মনে, এই এইবারেই সিংহবাহিনীর পূজার সময় ; নন্তীতে আর গিরিবালাতে একসঙ্গে সিংহবাহিনী তলা থেকে ফিরিতেছে ;—দুই সখী, কত অন্তরঙ্গ, কিন্তু কত তফাত সাজসজ্জা!...গিরিবালা নন্তীর কাপড়ের আঁচলটা তুলিয়া ধরিয়া কি বলিতে বলিতে আসিতেছে—দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু যেন মনে হয় মুখে একটু লজ্জা, একটু মেয়েমানুষের লোভ...

দুপুরবেলা মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"নন্তীর কাপড়টার দাম সতেরো টাকা...বাবাঃ, সতেরো টাকা দাম!"

খানিকক্ষণ পরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"জামাটা কিন্তু চার টাকাতেই হয়েছে...জেঠামশাই, ঘুমুলে?"

অন্নদাচরণ আর বলিতে পারিলেন না—জাগিয়া আছেন।

নিকুঞ্জলালের হুঁকার একটানা আওয়াজ হইতেছে, মাঝে মাঝে এক-একটা টান দীর্ঘতর। সময় যেন আপন মনে নির্বিকারভাবে বহিয়া চলিয়াছে—কে নিজের কাজ গুছাইতে পারিল কে পারিল না—এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নাই।

অন্নদাচরণের চিন্তাটা একটু যেন দানা বাঁধিতেছে, তবে ঐদিকে ঘেঁষিয়া,—কবে গিরি বঞ্চিত হইয়াছে, অভাবের সংসারে কবে মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াছে—এই সব। ওরই সূত্র ধরিয়া একটা বিশেষ দিকে চলিল,—দ্বিতীয় পক্ষের কথাটা তো তিনি এর পূর্বে ভাবিয়া দেখিয়াছেন, হ্যাঁ, এবার মনে পড়িতেছে,—ভাবিয়া দেখিয়াছেন ও সম্ভাবনার কথাটা—মনে পড়িতেছে ভাবিয়া এই সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছিলেন যে স্ত্রী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, আর, একটিকে হারাইয়া দ্বিতীয় পক্ষের পাত্ররা একটু বিবেচনা-প্রবণ, একটু মমতাপ্রবণ হয়—কন্যা একেবারে গৃহিণী হইয়া প্রবেশ করে বলিয়া, বিশেষ করিয়া যদি এক-আধটা সন্তান থাকে তো একেবারেই জননী হইয়া প্রবেশ করে বলিয়া সোজাসুজি খানিকটা প্রতিপত্তি, খানিকটা মর্যাদার মধ্যে গিয়া দাঁড়ায়। মন্দ কি?...তারপর এই রাজত্ব,—পুরাদস্তুর রাজত্ব না-ই হোক, একটা জমিদারি তো বটেই...

নিকুঞ্জলাল হুঁকা হইতে মুখ তুলিয়া বলিলেন—"পরেশ আমার সঙ্গেই একজন গোমস্তা পাঠিয়া দিয়েছে, কুষ্টি-ঠিকুজি মিলিয়ে কি ফলাফল হল পাঠাবার জন্যে। অবশ্য মেলানো আমার বহু পূর্বেই হয়ে গেছে, নইলে এগুতাম না—গিরিবালার কুষ্টি আমার মুখস্থ...দেখ ভেবে, নয় শুধু এটা ফেরত দিয়ে দিই।"

হুঁকার শব্দ আবার আরম্ভ হইল।

স্বপ্নশ্রুত কথার মতো নিকুঞ্জলালের কথাগুলা কানে কি একটা মোহ বিস্তার করিতেছে। 'গোমস্তা!'—জমিদারির সঙ্গে আর কোন নাম বোধ হয় এত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়ানো নয়—অর্থে, প্রতিপত্তিতে জমজমে একটা গোটা জমিদারির রূপ যেন সামনে দাঁড় করাইয়া দেয়। অন্নদাচরণ অনুভব করিতেছেন—লোকটাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা মনে বলবতী হইয়া উঠিতেছে,—তিনি মাত্র একবার 'হ্যাঁ' বলিলেই যে-গোমস্তা গিরিবালার সামনে মাথা নত করিয়া দাঁড়ায়।

অন্নদাচরণের মনে ঝড় শান্ত হইয়া আসিতেছে। নিকুঞ্জলালের হুঁকার টান নিশ্চিন্ত আর মন্থর হইয়া আসিয়াছে,—মাছ ক্লান্ত হইয়া আসিলে ছিপের ঘূর্ণির পাকটা যেমন শ্লথ, নিশ্চিন্ত আর মন্থর হইয়া আসে। তবু পাকা খেলোয়াড়—ডাঙায় না ভিড়াইয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইবার লোক নয় ; বলিলেন—"না ; অমত হয় তাও বলে দাও, মনসাতলার রাজবাড়ির একটি মেয়ে নিয়ে এখন কথা চলছে—চুলটা একটু কটা বলে মনে খুঁৎ ধরিয়া আটকে রেখেছি, সেইটেই ঠিক করুক। গোমস্তা চলে যাক এখুনি। না, মনে একটা খুঁতখুঁতুনি রেখে তোমায় আমিও মত দিতে বলব না। আমি একটু খাটো হলাম পরেশের কাছে—বেশ একটু, তা..."

অন্নদাচরণ এতক্ষণে কথা কহিলেন, বলিলেন—"একবার বাড়িতে বলে দেখি দাদা, মানে..."

BanglaBook.org

নিকুঞ্জলাল মুখ থেকে হুঁকাটা বেশ খানিকটা সরাইয়া লইলেন, স্বরটা বেশ রুক্ষ করিয়াই বলিলেন—"এবার আমায় রাগতে হল অন্নদা। তুমি আমায় দাঁড়িয়ে অপমান করাতে বসেছ, করাও, লোকের উপকার করবার প্রবৃত্তিটা আমার এইখানেই শেষ হোক, কিন্তু এর মধ্যে মেয়েছেলে ডেকে এনে আমার অপমানটা বাড়িও না। আমি জানি তোমার ভাইঝি, তোমার জোর আছে। তুমি হ্যাঁ, না—যা বলবে সেইটেই শেষ কথা; সেই ভরসাতেই আমি এ বোঝা ঘাড়ে করেছিলাম। তোমার নিজের মতিস্থির না থাকে, স্পষ্ট বলে দাও, বুঝব..."

অন্নদাচরণ মিনতির কণ্ঠে বলিলেন—"দাদা, আপনি রাগ করলেন! আমার সত্যি মতিস্থির নেই; আমায় জিগ্যেস করাই আপনার ভুল হয়েছিল। আপনি নিজের মতেই কাজ করুন।"

অনেকক্ষণ একেবারেই চুপচাপ গেল। নন্তী আদেশ অনুযায়ী আর এক ছিলিম তামাক দিয়া গেল, নিকুঞ্জলাল কখনও দ্রুত, কখনও মৃদু লয়ে টানিয়া যাইতে লাগিলেন, অন্নদাচরণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। এত পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন যে পাছে স্ত্রীর পরামর্শ লইতেছেন বলিয়া নিকুঞ্জলালের সন্দেহ হয়, নিজে না গিয়া নন্তীকেই কুষ্টিটা আনিতে পাঠাইয়া দিলেন।

নন্তী চলিয়া গেলে নিকুঞ্জলাল একবার উঠিয়া বাড়ির ভিতর গেলেন। মুখটা একটু ভার-ভার রহিয়াছে। ভিতর থেকে যখন ফিরিলেন, হাতে একটি ছোট বাণ্ডিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"গোড়াতেই মনটা খিঁচড়ে দিলে ভাই, সব কথা আনন্দ করে বলবারই অবসর পেলাম না। তোমাদের জন্যেই করে মরি, আমার আর কি স্বার্থ বল? এই ধরো, একশ টাকার করে পাঁচখানা নোট আছে। হাত গুটিয়ো না, ধরো, এর মধ্যে এতটুকু অপমানের কিছু নেই। আমি তোমায় জানি না—যে অপমানের টাকা হাতে তুলে দোব? আর তোমার যে-টাকায় অপমান সে-টাকায় কি আমারই মান বাড়বে? আড়াইটি হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, স্পষ্ট বললাম—'তুমি তাকে চেন না পরেশ, তোমার একটি পয়সায় সে হাত দেবে না। সে হলদে রঙে কাপড় ছুবিয়ে, নো-শাঁখা দিয়ে মেয়েকে বিদেয় করবে। এর অতিরিক্ত তার ক্ষমতাও নেই, সে করবেও না, বড় খাড়া লোক।' তখন হার মেনে বললে—'বেশ, একটা রফা করুন, লোক খাওয়ানো,—এই সবে তাঁর সাধ্যমত তিনি খরচ করবেন, কিন্তু আমার একটা মর্যাদা আছে তো?—বরযাত্রী সেই রকম নিয়ে যেতে হবে—আমার মর্যাদা রক্ষার জন্যে গ্রামেও তাকে সেইভাবে নেমন্তন্ন করতে হবে, তা ভিন্ন আশীর্বাদের একটা বড় হাঙ্গামা আছে—এ-সবের জন্যে যে অতিরিক্ত খরচটা, সেটা তিনি ঘাড়ে করতে যাবেন কেন?' অনেক তর্ক, পাকা লোক, একেবারে পরাস্ত করতে পারি কখনও?—শেষে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে এই ক'টা টাকায় এনে ঠেকাতে পারলাম। নাও, সে তো ভুলও বলেনি কিছু—সত্যি তার মর্যাদাটুকুও রক্ষা হওয়া চাই, আর তার জন্যে তুমিই বা দণ্ড সইবে কেন?"

নন্তী ফিরিয়া আসিল, বলিল—"আসল কুষ্টিটা পাওয়া যাচ্ছে না। বড় কাকী বললেন—বোধ হয় সিমুরে পড়ে আছে। এই একটা ছিল, দিলেন।"

রাশিচক্রটার নকল, নিকুঞ্জলাল হাতে লইয়া বলিলেন—"দেখি, এইটেতেই এখন কাজ চলবে—তুমি ওটা আনিয়ে রেখো সিমুর থেকে। আর, এ কিছু দেখতে হবে না,

গিরির কুষ্টি-ঠিকুজি আমার কণ্ঠস্থ, আমি গণনা ঠিক করে তবে কথা পেড়েছি—তবুও আপাতত এই দুটোই পাঠিয়ে দিই, যেখান থেকে পারুক সন্দেহ মিটিয়ে নিক।”

কয়েকবার হুঁকা টানিয়া যেন হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে এইভাবে বলিলেন—“হ্যাঁ, ঠিক কথা, পরশু আশীর্বাদ করতে আসছে সব। এটা আমি নিজেই জোর করে বললাম, একটা পাকা কথা তো হয়ে থাক,—রাজারাজড়ার মন, বিশ্বাস কি?”

॥ ৫ ॥

দাদার মুখে সংবাদটা শুনিয়া রসিকলাল শূন্য দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন, একটু পরে প্রশ্ন করিলেন—“পরশু আশীর্বাদ করতে আসবে,—পরশুই?”

অন্নদাচরণ কিছু বিস্মিত হইলেন না ; আর সব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ছাড়িয়া আশীর্বাদের সময়ের কথাটাই যে বড় হইবে ভাইয়ের কাছে ইহাতে একটু হাসি পাইলেও আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। বলিলেন—“বস” রসিক ঐখানটায়। বুঝেছি আশীর্বাদটা একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে হচ্ছে, কিন্তু যাতে সেটা সামলে যায়, তার ব্যবস্থা হয়েছে। সব ভেবেটেবে দেখলাম রসিক, সামান্য একটু দোজপক্ষের আর একটু বয়েস হয়েছে বলে এমন সুবিধেটা পায়ে ঠেলা যুক্তি-যুক্ত নয়। একটি বছর-সাতেকের ছেলে আর একটি বছর-তিনেকের মেয়ে, প্রথম পক্ষের এই আছে। কী আর এমন বল? মেলা নয়, তবে এক আধটা ছেলেপুলে থাকাই ভাল বলে যেন আমার মনে হয়—একেবারে মা হয়ে ঢুকলে কদর বাড়ে খানিকটা। বয়েস—তা হয়েছে, তবে যতটা বয়েস তার চেয়ে একটু বেশি বড়ই দেখায়। ভেবে দেখলাম নিকুঞ্জদাদা যা বললে সেটা নিতান্ত অগ্রাহ্যির কথা নয়,—ভোগে আছে, শরীরের বাড়বাড়ন্ত আছে, বয়সের তুলনায় একটু বড় দেখতে হবেই। নিকুঞ্জদাদা নিজেকে দেখিয়েই বললে—‘দেখ না, নিত্যি পেটের অসুখ, তার পর আবার সেই 'পেটের চিন্তাতেই দুনিয়া ঘুরে বেড়ানো, চিকিৎসা নেই, শরীরের একটু তোয়াজ নেই চুয়াল্লিশ বছরের মানুষটা চব্বিশ বছরের ছোকরা হয়ে রয়েছি।’...তা দেখলাম মিছে বলেননি নিকুঞ্জদাদা, আমরা কি পাই বাড়তে যে বড় দেখাবে?...তারপর দেখ বাড়িটা, একেবারে ছিমছাম ; একটি বুড়ো বোন আছে, তীর্থে-তীর্থেই ঘুরে বেড়ায়...”

রসিকলালের মনে হইতেছে বহুদূর হইতে যেন একটু গুনগুনানি ভাসিয়া আসিতেছে—মাঝে মাঝে এক-একটা কথা তাহার হইয়া উঠিতেছে স্পষ্ট— “সামান্য একটু দোজপক্ষের বয়েস—তা হয়েছে ...পেটের চিন্তাতেই...বুড়ো বোন...”

এলোমেলো, কোন একটা মানে ধরা যায় না, মানে ধরিবার উৎসাহও নাই মনের যেন।

অন্নদাচরণ বলিয়া যাইতেছেন—“তবু মন খুঁতখুঁত যে একটু না করে এমন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার অন্য দিকটাও দেখতে হবে তো?—অবশ্য ঐ যে রাজা রাজা হাঁক পড়ে গেছে ওটা কিছু নয়। ও কথাটি তোমার কাছে এযাবৎ ভাঙিনি, আজ ভাঙছি। রাজা—নিজের জমিদ্দারিতে সবাই রাজা, সেই হিসাবে। আমিও ঐ কথাটাই ধরেছিলাম —দেখছি, একটা লোক অযাচিতভাবে অনুগ্রহ করে যাচ্ছে, তাকে ছোট করতে যাই কেন? আর, আগে যাই করুক, এখন নিজের জেনেই এতটা করছে, নিকুঞ্জদাদাকেই বা আমার

BanglaBook.org

খেলা করবার কি দরকার? রক্তের সম্বন্ধ না হোক, পুরুষানুক্রমে একটা সখ্যও তো রয়েছে ওঁদের সঙ্গে? উনি যদি গেয়ে বেড়ান উনি রাজগুরু তো পারতপক্ষে যোগান্ দেওয়াও দরকার আমাদের নয় কি? বিষয়ী লোককে আবার সব দিক বজায় রেখে চলতে হবে তো?...কিন্তু ভের্তরকার কথা তা নয়। এবার গিয়ে আমি কতক কতক খবর নিয়ে এলাম তো? ভাগাভাগি হয়ে এখন পরেশের ভাগে হাজার পনেরো দাঁড়ায় ; লাটের দেনা, খরচ খরচা বাদ দিয়ে সাত আট হাজার টাকা বাঁচে বছরে। এই ; কিন্তু এও কি সোজা হল?...বংশটা বোনেদি—এক সময় বোধ হয় কেউ ছিল রাজা, তাই সব সরিকেই রাজা...”

একটা উত্তর পাইবার জন্য থামিলেন। না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— “কি বল তুমি?”

রসিকলাল শূন্য দৃষ্টিতেই উত্তর করিলেন—“অ্যাঁ!”

অন্নদাচরণ ভাইয়ের মুখের পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“বলছিলাম যতটা খবর পেলাম খরচ-খরচা বাদ দিয়ে বছরে নিট্ হাজার সাত-আট বাঁচে—সেও তো কম হল না?”

রসিকলাল বলিলেন—“না, কম কি করে?...বলছিলাম আশীর্বাদটা কিছুদিন পিছিয়ে দিলে হত না?”

অন্নদাচরণ বুঝিলেন এতদূর তাতিয়া পুড়িয়া আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইয়ের কাছে এতবড় গুরুতর কথাটা পাড়া ঠিক হয় নাই, একে চঞ্চল মনই। হাতে যা টাকা রহিয়াছে তাহাতে একটা পাকা দেখা মেটানোর পক্ষে দুইটা ঘণ্টাই যথেষ্ট, কিন্তু সে কথা আর তুলিলেন না। বলিলেন—“সে তোমায় ভাবতে হবে না, তবে কালকের দিনটা আর বেরিয়ে কাজ নেই ; দরকারও আছে, পরামর্শও আছে। এখন তুমি হাত পা ধুয়ে একটু ঠাণ্ডা হও গে। হল, যা করতে গিয়েছিলে?”

“হ্যাঁ হয়েছে।”—শুষ্ককণ্ঠে কোন রকমে জবাবটা দিয়া রসিকলাল চলিয়া গেলেন।

ভয়ে তাঁহার হাত-পা কাঁপিতেছে। সন্ধ্যা হইয়া গেছে, বিড়াল ছাড়িয়া গিরিবালা বিছানা গুছাইতে আরম্ভ করিয়াছে। রসিকলাল ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —“বৌদি কোথায় রে গিরি—ও কোথায়?”

হরিচরণ একটা পড়ার বই লইতে ভিতরে আসিয়াছিল, বলিল—“তাঁরা দুজনেই নিকুঞ্জজেঠার বাড়ি গেছেন বাবা, ডেকে আনব?”

“ডেকে আনবি?...আচ্ছা যা...শিগগির একছিলিম তামাক সেজে আন তো মা গিরি।”

বিছানায় চাদরটি ফেলিয়া দুটা হাত পিছনে দিয়া বিছানার উপরই বসিয়া পড়িলেন।

গিরিবালা একটু আড়চোখে বিস্মিতভাবে চাহিল, তাহার পর কলিকা লইয়া তামাক সাজিতে যাইবে, রসিকলাল হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—“কি করি এখন বল দিকিন গিরি?”

সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইয়া বলিলেন—“থাক তামাক, এক্ষুনি আনছি আমি। বৌদিকে তোর কিছু বলে কাজ নেই।”

দাদা আওয়াজটা যাহাতে না টের পান এই ভাবে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলেন। পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে যাইতেছেন, তাঁহার কথা যে এতক্ষণ কেন মনে পড়ে নাই!

BanglaBook.org

কবিতার মিল নির্ণয় থেকে সংসারের খুঁটিনাটি পর্যন্ত সব সমস্যার সমাধান পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে।...আর তিনিই না বলিয়াছিলেন যে সঙ্কট আসিবেই ; দময়ন্তীর বিবাহেও আসিয়াছিল, কিন্তু কাটিয়া যাইবে।...সত্যই তো বিবাহ যেথায় হইবার পাকা হইয়া গেছে, ওদিক দিয়া আর ভয় কি? ...এখন এই সময়টুকু কাটাইয়া উঠিতে পারিলেই হয়, পণ্ডিতমশাই আছেন।...মনটা অনেক শান্ত হইল।

পথে মনে পড়িয়া গেল পণ্ডিতমশাইয়ের তো আজই দশটার গাড়িতে কৃষ্ণনগরে যাইবার কথা ছিল। তবুও অগ্রসর হইলেন, যদি কোন কারণে আটকাইয়া গিয়া থাকেন —নিতান্ত যদি কোন কারণে। আসিবার সময় ঘুরিয়া চিনিবাসের দোকান হইয়া আসিলেন, নহিলে তো দেখাই করিয়া আসিতেন পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে।

পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হইল। কণ্ঠস্বরকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আজ সকালের গাড়িতে চলে গেছেন পণ্ডিতমশাই, মা?"

"কৈ আর যেতে পারলেন বাবা?"

বিশ্বের যত আশা একটি মুহূর্তের মধ্যে যেন আসিয়া জড়ো হইয়াছে। প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছে না ; পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী একটু বিরতি দিয়াই অনুযোগের কণ্ঠে টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিলেন..."সকালের গাড়িতে আর কৈ যেতে পারলেন? একজন শিষ্যি এসে পড়ল। এই বিকেলের একটু আগে বেরুলেন, সমস্ত রাত যারপরনাই নিগ্রহ—নৈলে নাকি সময়ে পৌঁছনো...ওকি, তোমার শরীরটা খারাপ নাকি রসিক?"

রসিকলাল অবসন্নভাবে শানের একটা বেঞ্চে বসিয়া পড়িয়াছেন, বলিলেন—"না না, অনেকটা হেঁটে এলাম কিনা, এক গ্লাস জল দিন তো।"

একটু মিষ্টি সংগ্রহ করিয়া জল আনিতে একটু বিলম্ব হইল, পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী আসিয়া দেখিলেন রসিকলাল চলিয়া গেছেন।

রসিকলালের নিকুঞ্জদাদার কথা মনে পড়িয়া গেছে। এমনি লোকটাকে এড়াইয়া চলেন, বিশেষ যে কোন কারণ আছে তা নয়, শুধু খুব বুদ্ধিমান লোকদের সঙ্গ কেমন অস্বস্তিকর বলিয়া মনে হয়। দেখা হইলে নিকুঞ্জলাল ভাল উপদেশই দেন। সেইজন্য আরও ভয় হয়। কিন্তু মনে পড়িল এ সমস্যায় আপাতত নিকুঞ্জলালই একমাত্র লোক যে বাঁচাইতে পারে। অবশ্য বাঁচানো মানে আশীর্বাদটা পিছাইয়া দেওয়া। আর আশীর্বাদটা কাল একজন লোক পাঠাইয়া পিছাইয়া দিলেই তো বিপদটা কাটিয়া যায়, কেননা পরশু সাঁতরা থেকে ওঁরা আসিলেই—রসিকলাল সামনে থাকিতে পারুন বা নাই পারুন, ওখানকার আশীর্বাদের কথা, আরও সব কথা, আপনি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। অবশ্য যে কোন অবস্থাতেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তবে হরিপুরের লোকেরা আসিয়া পড়িলে যে দৃশ্যটা দাঁড়াইবে তাহা কল্পনা করিতেও রসিকলালের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

নিকুঞ্জলাল স্থায়ী পেটের দুর্বলতার জন্য সকাল সকাল আহার করিয়া শয়ন করেন, বিলম্ব হইয়া যাইতে পারে বলিয়া রসিকলাল আর অপেক্ষা করিলেন না।

নিকুঞ্জলাল বাহিরেই ছিলেন, এবং একলাই ছিলেন। খুব আদর করিয়া বসাইলেন, বাছা উপদেশ দিলেন।—সংসারটা কি, এখানে কবিতারই বা কি মূল্য, টাকারই বা কি মূল্য, এইবার একটু সুবিধা ভগবান করিয়া দিলেন— নিকুঞ্জলাল তো নিমিত্তমাত্র—একটা বড় সহায় হইল, এইবারে নিজের কাজ গুছাইয়া লওয়া। একটি ভাইঝি তো বিবাহের

BanglaBook.org

উপযোগী হইয়া উঠিল—মামার বাড়ি থাকে বলিয়া মামারা তো সব ভার উঠাইয়া লইবে না, তা ভিন্ন আবার কন্যা হইবে, তাহাদেরও বিবাহ দিতে হইবে, ভগবান তো রোজই সুবিধা করিয়া দিতেছেন না—পুরুষকারও চাই—ভগবান গীতায় কত জায়গায় সে কথা কতভাবে বলিয়া গিয়াছেন...

রসিকলাল মাথা নিচু করিয়া সব শুনিয়া গেলেন, শেষকালে প্রশ্ন করিলেন—"বলছিলাম আশীর্বাদটা কিছুদিন পেছিয়ে দেওয়া যায় না?"

হুঁকা নিকুঞ্জলালের হাতে ছিল, খুব দ্রুত বোল তুলিতে লাগিলেন, ওরই মধ্যে কয়েকবার আড়চোখে রসিকলালের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন—"হয়, তবে তোমার দাদার পরামর্শে পরশুই ঠিক করেছি। অবশ্য তুমিই হচ্ছ মেয়ের বাপ, এখানে তোমার মতের সামনে দাদার মত কিছু না, তা বল তো না হয়..."

রসিকলাল বলিলেন—"না, তাহলে থাক। দাদা যখন বলেছেন..."

চলিয়া গেলে নিকুঞ্জলাল দুয়ারের পানে মুখটা ঘুরাইয়া মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, —"সাতগেঁয়ের কাছে মামাদোবাজি! এখুনি হাঁড়ি আলাদা করিয়ে দিতে পারি জানেন না!"

রসিকলাল বাগান পারাইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। মনের অবস্থা একেবারে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দাঁড়াইয়াছে। বেশ রাত হইয়া গেছে, কিন্তু বাড়ি ঢুকিতে সাহস হইতেছে না। যেভাবে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন, গেলেই একটা জবাবদিহির মধ্যে পড়িয়া যাইতে হইবে। অথচ মনটা পরশুকার ব্যাপার লইয়া এমন ব্যাপৃত রহিয়াছে যে একটা জবাবদিহি গড়া হইয়া উঠিতেছে না। কেমন যেন একটা জিদও ধরিয়া গিয়াছে, একটা উপায় না করিয়া ফিরিবেন না—নহিলে পরশু যে সর্বনাশ!

একবার একটা কথা মনে পড়িয়া মনটা যেন উল্লসিত হইয়া উঠিল—একটা চিঠি পাঠাইয়া দিলে কেমন হয়—নিকুঞ্জদাদা লিখিতেছেন...লেখা চেনা?— না হয় বড় ব্যস্ত, অন্যকে দিয়া লিখাইতেছেন—"হঠাৎ কোন কারণে আশীর্বাদটা কয়েকদিন বন্ধ রাখিতে হইল, পরে তারিখ জানাইতেছি..." চিঠির চেয়ে টেলিগ্রাম?—সেই ভাল—সঙ্গে সঙ্গে পঁহুছিবে, আর—আর হাতের লেখার হাঙ্গামা নাই!—ঠিক, একটা টেলিগ্রাম—"আশীর্বাদ স্থগিত রহিল, পত্রে সব জানাইতেছি।"—পরশু তো এই করিয়া কাটুক...

সঙ্গে সঙ্গেই মনটা অবসন্ন হইয়া পড়িল—না, চলিবে না ওসব—কোন মতেই চলিবে না—নিকুঞ্জদাদার কাজ—এ সামান্য সম্ভাবনার কথা আর আন্দাজ করে নাই সে?...চলিবে না..—শুধু ধরা পড়িয়া একটা কেলেঙ্কারি...

ভাংচি?—, নিকুঞ্জদা জানে রসিক এ-সবই করিবে, আটঘাট বাঁধা আছে।...যে দিকেই দৃষ্টি যায় নিকুঞ্জদাদা দাঁড়াইয়া —হুঁকা হাতে, মুখে ক্রূর হাসি...পদে-পদেই ঠোক্কর খাইয়া রসিকলাল যেন ক্রমেই দিশাহারা হইয়া উঠিতেছেন।

নিশিতে পাওয়ার মতো পথ ঘুরিতে ঘুরিতে এক সময় হঠাৎ হারাণের কথা মনে পড়িয়া গেল।

রাত্রি বারোটার কম নয়, সমস্ত গ্রাম নিষুপ্ত, রসিকলাল হারাণের বাড়ির সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। সমস্ত দিনের মেহনতে, উদ্বেগে শরীর একেবারে অবসন্ন। দুইবার ডাকিতে গিয়া কথা বাহির হইল না, গলা একেবারে শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে, তৃতীয়বারে

BanglaBook.org

যখন শব্দটা বাহির হইল তখন নিজেই যেন চমকিয়া উঠিলেন। হারাণের ছেলে আর মা বাহির হইয়া আসিল। এত আশ্চর্য তাহারা জীবনে কখনও হয় নাই। প্রয়োজন শুনিয়া উত্তর করিল—হারাণে তো তাঁহাদের বাড়িই গেছে, সাতু আর নিকুঞ্জলালের ঝি আসিয়া ডাকিয়া লইয়া গেছে। রসিকলাল বলিলেন—"ও, তাহলে গেছে? আমিই ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ডেকে অন্য জায়গায় চলে গেছলাম।"

এ উপস্থিত-বুদ্ধিটুকু যে কোথা থেকে যোগাইল, নিজেই বিস্মিত হইয়া গেলেন, চিন্তা করিবার ক্ষমতা তখন আর একেবারেই নাই। বোধ হয় খুব চরমে আসিলে বুদ্ধির এই একটা ঝলক খেলিয়া যায়।

"বেশ, তোরা শুগে যা,"—বলিয়া ফিরিয়া একটু অগ্রসর হইয়াছেন, হারাণের সঙ্গে দেখা।

হারাণ যেন ভূত দেখিয়াছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর কথা কহিল—"ছোট বাবাঠাকুর! আমি সমস্ত গাঁ ঘুরে বেইরেছি, কোথায় ছেলে? বাড়িতে যে ভেবে সারা হচ্ছে সবাই!"

রসিকলালের ভাবটা ঠিক উল্টা—হারাণকে দেখিয়াই অর্ধেক ভাবনা যেন চলিয়া গেছে, অনেকটা শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—"সে হচ্ছে, আগে তোর সদর ঘরটা খোল দিকিন একটু ; এক গেলাস জল, আর একটু তামাকের ব্যবস্থা কর। তোর মা ছেলে সব জেগে আছে, যেন টের না পায়।"

ঘরটা বেশ খানিকটা তফাতে ; হারাণ খুলিয়া দিয়া কুলুঙ্গিতে একটা টেমি জ্বালিয়া দিল, ক্ষীণ আলোয় ঘরটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেই রসিকলাল একটা স্মিত হাস্যের সহিত চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন, বলিলেন—"ঠিক সেই রকম আছে দেখছি।"

হারাণ বলিল—"এদানি পূর্বদিকে একটা জানালা ফোটালাম, আর সব সেই রকমই আছে।...দাঁড়াও বাবাঠাকুর, তোমার সেই মোড়াটা বের করে দিই।"

চৌকির নিচে হইতে একটা মোড়া বাহির করিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সামনে পাতিয়া দিল। বলিল—"তোমার সেই মোড়াটা বাবাঠাকুর।...শুধু জল খাবে?"

রসিকলাল মোড়াটার উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতেছিলেন, বলিলেন—"কি আছে?...আজ কতদিন পরে এলাম বল দিকিন এ ঘরে?"

হারাণ বলিল—"তা হল বৈকি, সেই কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে যাবার আগে এসতে, তারপরে এই। তা আছে, আজ রামীর শ্বশুরবাড়ি থেকে তত্ত্ব এয়েছেল, কিন্তু সে-সব মার ঘরে, জানাজানি হয়ে যাবে। আমার ঘরে বোধ হয় মুকুন্দ-মোয়া আছে, রামীর ছেলেটা রেত-বিরেতে বায়না ধরে কিনা, ওর দিদিমা জুগিয়ে রাখে।"

"তাই আন। গোল করিসনি কিন্তু।"

বহুদিন পূর্বের সেই স্কুল-জীবন, আর স্কুল-ছাড়া নিরুদ্বেগ জীবনের একটা দিন এই নিষুতি রাতে কেমন করিয়া আসিয়া গিয়াছে।—একেবারে হারাণের মাকে লুকাইয়া খাবার সংগ্রহ করা পর্যন্ত। হারাণ তখন ছিল নিত্যসঙ্গী, প্রণয়-সুহৃদ্—বনবাদাড়, সুদূর পল্লী ঘুরিয়া আসিয়া এই ঘরটা ছিল আশ্রয়।...কত কথা মনে পড়ে, এমন সব কথা যা আজিকার দিনের সমস্ত ঘটনা, এই নিদারুণ উদ্দেশ্য লইয়া মধ্যরাত্রের অভিযান—সব যেন হালকা করিয়া দিয়াছে! হারাণ তাঁহার অশ্বপাল, কিন্তু আজ দারুণ সমস্যায় পড়িয়া

BanglaBook.org

তিনি সেই নিত্যসঙ্গী সুহৃদ্ হারাণের কাছে আসিয়াছেন।...কেমন একটা ভরসা হইয়া গিয়াছে তাহাকে দেখিয়া পর্যন্ত—মনে হইতেছে একটা বিহিত হইবেই...অদ্ভুত ধরনের একটা নিশ্চিন্ততার ভাব আসিয়া গেছে মনে। গোটাচারেক মোয়া খাইয়া বড় পেপে-ঘটি থেকে ঢকঢক করিয়া একঘটি জল খাইলেন। হুঁকাটা হাতে লইয়া বলিলেন—"নে, এইবার বোস এইখানটায়, চ্যাঁচাতে পারব না তো। বড় যে পরামাণিকের মাথা বলে গুমোর করিস কথায় কথায়—একটু হদিস বাতলা দিকিন, কেমন পারিস..."

সাঁতরা থেকে লইয়া হরিপুর পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার এক-একটি করিয়া বলিয়া গেলেন হারাণের কাছে, মায় নিজের আশা, আশঙ্কা, টীকা-টিপ্পনী সমেত।

হারাণের মনে একটা অন্তঃশীলা বহিতেছিল,—বাবাঠাকুর এতদিন পরে তাহার বাড়িতে আসিয়াছেন, একটু পায়ের ধূলা লইবার প্রবল ইচ্ছা হইতেছিল—নিশ্চয় উচিত লওয়া। কিন্তু আড়ম্বর করিয়া কিছু করিবার স্বভাব নয় বলিয়া কেমন একটা লজ্জা করিতেছিল, সবটা শুনিয়া একটা অছিলা পাইয়া পায়ে মাথা ঠেকাইয়া ধূলি লইয়া বলিল—"পায়ের ধুলো দেও বাবাঠাকুর, গিরিদিদিমণির তাহলে, অন্য জায়গায় ঠিক করে এলে? ...আজ সমস্ত দিনটা যে কিভাবে কেটেছে তা..."

রসিকলাল একটু রুক্ষভাব বলিলেন—"এই দেখ, তু'বেটার তো ঐ দোষ। আগে পরশু দিনটা সামলাতে পারবি কিনা তাই বল, দেখছিস কি একটা বেতর সমস্যা মাথায় করে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি।"

হারাণও বেশ মৃদুভাবে জবাব দিল না, বলিল—"সমিস্যে সমিস্যে তোমার একটা বাই; তা হক কথা বলব—এগুনে য্যাখন ছড়া নিকতে, চিলের সঙ্গে টিল মিলবে কি কিল মিলবে ভেবে ভেবে সারাদিন এপাড়া ছুটোছুটি করে বেড়াতে।...তারা এসলে, তবে তো সমিস্যে?...নাও, বামুনকে বাড়িতে 'ওঠ' বলতে নেই তবে বাড়িতে তানারা সবাই যে কী করে কাটাচ্ছে!..."

সমস্যার কি সমাধান তা অবশ্য বলিল না, তবে অন্যান্য গল্প করিতে করিতে মনিবকে বাড়ি পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া গেল।

॥ ৬ ॥

কাজের বাড়ি; মাত্র পাকা দেখা হইলেও অন্নদাচরণ বেশ ভালোভাবেই নিমন্ত্রণ করা স্থির করিয়াছেন, যাহাতে পয়সা বাঁচানো লইয়া নূতন কুটুমের কাছে একটা বদনাম না ওঠে। কিন্তু সমস্ত উৎসব-চাঞ্চল্যের মধ্যেও বাড়িটা যেন থমথমে হইয়া আছে। স্বামী কর্মঠ হইয়াও একরূপ অকর্মণ্য,—বরদাসুন্দরীকে সাধ্যমত মনের ভাব গোপন করিয়া চলিতে হয়। মুখে বেশ একটা হাসি ধরিয়া রাখিয়াছেন, প্রকৃতও হইতে পারে—গিরিবালার এতটা সুখ, এ তো কল্পনাতীতই তাঁহার পক্ষে; যদি কৃত্রিমই হয় হাসিটা তো এমন ভাবে ফুটাইয়া রাখিয়াছেন যে তাহার অন্তরালে যে কী আছে বোঝা অসম্ভব। অশ্রু লইয়াও একবার ধরা পড়িয়াছেন। দামিনী সর্বেসর্বা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহার দাদারই কীর্তি তো! একবার কাজেই হোক, অকাজেই হোক, খোঁজ লইতে গিয়া দেখিলেন ভাঁড়ার ঘরের একটি কোণে একটা হাঁড়ির সরা উঠাইয়া বরদাসুন্দরী আঁচলে অশ্রুমোচন করিতেছেন।

BanglaBook.org

দামিনী রাগিয়া উঠিলেন—"দেখো কাণ্ড! হ্যাঁলা ছোট বউ, সবে পাকা দেখা তাও শেষ হয়নি এখনও, আর তুই কিনা মেয়ের জন্যে কাঁদতে বসলি?"

বরদাসুন্দরী আর একটু উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের সহিতই বলিলেন—"না, মনটা কেমন একবার উৎলে উঠল তাই...নৈলে বড় ঠাকুরের আশীর্বাদে আজ তো আমার হাসবারই দিন ঠাকুরঝি।"

বসন্তকুমারীর প্রকৃতিটাই অন্যরূপ, মনের ভাবও ভাল করিয়া চাপিতে জানেন না, রাখিয়া-ঢাকিয়া কথাও বলিতে পারেন না। যেদিন প্রথম অন্নদাচরণ প্রণামীর টাকা ঘরে আনেন সেইদিনই তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল—এই একটি মানুষ, নিকুঞ্জলালের সম্বন্ধে যাঁহার মত কখনও পরিবর্তিত হয় নাই। তিনি স্পষ্ট বুঝিতে পাইতেছেন একটা ভীষণ চক্রান্ত চলিতেছে, শুধু যতটা দেখিতে পাইতেছেন তাহার চেয়েও সেটা কত ভীষণ সেটুকু বুঝিতে পারিতেছেন না। ব্যর্থ ক্ষোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, একটু পাড়া বেড়াইয়া, একটু বা দেখাশুনা করিয়া ; মুখে একটা হাসি তাঁহারও আছে, কিন্তু সে হাসিকে হাসি বলিয়াই যে লোকে মানিয়া লইবে এমন তাঁহার উদ্দেশ্যও নয়, আশাও নয়।

একবার পাঁচ-সাতজনের জমায়েতের মধ্যেই কে একজন বলিল—"যাহোক নিকুঞ্জদাদা একটা কাজের মতন কাজ করলেন।"

বসন্তকুমারী পায়েসের জন্য কিসমিস বাছিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়াই কহিলেন —"তা আর একবার বলতে?—কুঁড়েঘর থেকে টেনে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসাতে চললেন। কাঙ্গালকে যে দিনই শাকের ক্ষেত দেখিয়েছিলেন সেই দিনই বুঝেছিলাম একটা বড় সৌভাগ্যি কপালে নাচছে।"

সবাই একটা না একটা কাজ লইয়া ছিল, নিম্ন দৃষ্টিতেও একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি হইল, স্মিত হাস্যও কয়েকটা মুখে ফুটিল নানা অর্থে, কেননা নানা অর্থ করিবার লোক ছিল।

দামিনীও ছিলেন। হটিবার পাত্রী নহেন, একটা ছুতা করিয়া বসন্তকুমারী উঠিয়া গেলে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন—"অনেক কিছুই দেখতে হল!...কেন যে দাদার থাকা পরের কথায়!...তাও বলি,—গিরি যদি তোমার পেটেই জন্মাত, শাকের ক্ষেত তো লুকিয়ে রাখত না দাদা তোমাদের কাছ থেকেও।"

অন্নদাচরণ কাজের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছেন। জিনিসপত্র আনা, লোকজন যোগাড় করিয়া বাড়ি, উঠান পরিষ্কার করানো, ভিতরে আসিয়া একটু আধটু খোঁজ লওয়া, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেলে কোন জিনিসের ফরমাশ দিয়া আসা ; যখন কিছুই হাতে থাকিতেছে না, গিয়া নিকুঞ্জলালের কাছে বসিতেছেন,—পরামর্শ হইতেছে, শুধু কালকের কাজ লইয়া নয়, আসল কাজ লইয়া—তাহারই বা আর ক'টা দিন হাতে আছে?

অন্নদাচরণ নিজেকে কোন মতেই খালি থাকিতে দিতেছেন না, খালি থাকিলে যে চিন্তাটা মনে উঁকি মারিতেছে তাহার সম্মুখীন হইতে পারিতেছেন না। কাহার সঙ্গে যেন বোঝাপড়া করিতে করিতে ওঁর কেমন এমনই একটা জিদ দাঁড়াইয়া গেছে—উনি গিরিবালার ভাল করিবেনই ; নানা বাধা, নানা দুর্বলতা আছে—সবকেই কাটাইয়া উঠিতে হইবে। বেশ বুঝিতেছেন, কাটাইয়া উঠিতেছেনও।

শুধু কাল কথাটা প্রকাশ হওয়ার পর থেকে গিরিবালার মুখের পানে ভাল করিয়া চাহিতে পারিতেছেন না।

BanglaBook.org

বিকেলবেলা বসন্তকুমারী হরুকে দিয়া অন্নদাচরণকে নিকুঞ্জলালের বাড়ি হইতে ডাকিয়া আনাইলেন, প্রশ্ন করিলেন—"ভয়ঙ্কর ব্যস্ত আছ বলে এতক্ষণ জিগ্যেস করিনি, ঠাকুরপো যে সকাল থেকে বাড়ি নেই সেটা জানো?"

কণ্ঠস্বর নিতান্ত শান্ত, শুধু দু-একটা কথায় একটু যেন ব্যঙ্গের ঝোঁক পড়িল। অন্নদাচরণ বসন্তকুমারীকে সাধ্যমত এড়াইয়াই আসিতেছেন সমস্ত দিন, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"বাড়ি নেই! কাল যে আমি তাকে বাড়ি থেকে বেরুতেই বারণ করলাম!"

সেইরকম মসৃণ অল্প ব্যঙ্গের উত্তর হইল—"অবাধ্য তো আছে, নইলে দাদা পাঁচটা বিচক্ষণ লোকের পরামর্শে যা করছে তাতে অমত করতে যায়? কিন্তু সে কথা থাক, এখন..."

অন্নদাচরণ হুলের বিঁধুনিটা অনুভব করিতেছিলেন, তবুও রাগটা চাপিয়াই বলিলেন —"অমত! তাকে জিগ্যেস করিনি? সে রাজী হয়নি?"

বসন্তকুমারী এতক্ষণ পর্যন্ত দুটো কথা বলিবার সুযোগ পান নাই, জ্বালাটা আরম্ভ হইয়াছে বুঝিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, একটু হাসিয়া বলিলেন —"হুঁঃ, কথা বলছ যেন তার রাজী অরাজীর কথা জানো না তুমি,—'না' বলে একটা ধমক খেয়ে 'হ্যাঁ' বলেছে, 'হ্যাঁ' বলে ধমক খেয়ে তক্ষুনি সেটাকে 'না' করেছে, এই তো দেখে আসছি আজ এই ষোল বছর ধরে।"

অন্নদাচরণ রাগিয়া উঠিলেন ; বলিলেন—"বাজে কথা রাখো ; তোমার বাজে কথা কইবার ফুরসত আছে, আমার নেই। ঘুড়িটা আছে কিনা খোঁজ নিয়েছ?"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"নেই।"

অন্নদাচরণ আর নিজেকে সংযত করিতে পারিলেন না, বেশ উচ্চ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিলেন—"বোঝ, বোঝ একবার কাণ্ডটা ! ধুম পড়ে গেল আজই তার রুগী দেখবার, হবে না তাকে আসতে, আমি একাই..."

বসন্তকুমারী মুখের কাছে হাতটা লইয়া গিয়া চাপা গলায় বলিলেন— "চুপ করো ; আর শত্রু হাসিয়ে কাজ নেই, একে তো কে যে শত্রু, আর কে যে বন্ধু চেনা দায় হয়ে উঠেছে, যা করছ করগে, অদিষ্টে যা হবার হবে।"

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল। নিকুঞ্জলালকে অন্নদাচরণ নিজেই বলিলেন—নিকুঞ্জলাল হুঁকা হইতে মুখ সরাইয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন—"তাই নাকি! তুমি অবাক করলে যে! দেখো, দেখো খোঁজ নাও!"

অন্নদাচরণ ফিরিয়া যাইতে নিকুঞ্জলালের একটু যেন কি রকম ঠেকিল ; কথায় আতঙ্কের সুরটা যেন তত প্রবল নয়। মনের সন্দেহ ভাবিয়া আর ও লইয়া মাথা ঘামাইলেন না।

রাত্রি হইয়া গেলেও যখন রসিকলাল আসিলেন না, তখন সকলের আলাদা করিয়া হারাণের কথা মনে পড়িল। সাতকড়ি আর হরু হারাণের বাড়ি গিয়া খবর আনল হারাণও আজ সকাল হইতে বাড়ি নাই, বলিয়া গেছে, বিশেষ কাজে শ্বশুরবাড়ি যাইতেছে ; কাল ফিরিয়া আসিবে।

BanglaBook.org

অন্নদাচরণ ঘরে শুইয়াছিলেন, শুনিয়া 'হুঁ' করিয়া একটা শব্দ করিলেন।

যতই রাত্রি বাড়িতে লাগিল, উৎসবের আনন্দ ধীরে ধীরে মুছিয়া গিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন পুরী একটা আসন্ন বিপদের প্রতীক্ষায় থরহরি-কম্প হইয়া রহিল।

বিপদটা সকালে দেখা দিল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে—

পরদিন আটটা থেকে দশটার মধ্যে আশীর্বাদের লগ্ন, হরিপুর থেকে সকলের ভোরেই আসিবার কথা। ব্যবস্থা হইয়াছে—সন্ধ্যার পর গাড়ি থেকে নামিয়া ডুমজুড়েই কাটাইয়া অল্প রাত থাকিতে যাত্রা করিবেন, যাহাতে সূর্যোদয়ের পরেই বেলে-তেজপুরে পহুঁছাইয়া যান। এদিক থেকে কয়েকজন মাইল দুয়েক দূরে সাতনলায় গিয়া বসিয়া আছে, সেখান হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবে।

সূর্যোদয় হইল, বেলা বাড়িয়া চলিল, কাহারও দেখা নাই। এক-একজন করিয়া জনচারেককে সাতনলায় ছুটাইয়া দেওয়া হইল, সেখান থেকেও জনদুয়েক আরও অগ্রসর হইয়া সন্ধান লইতে গেল। কোনও খবরই নাই।

আটটা বাজিয়া গেল, নয়টা, দশটা। অন্নদাচরণ পাগলের মতো হইয়া গেছেন। গ্রামের প্রত্যেক ভদ্র গৃহস্থের কর্তাকেই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। অবশ্য পাড়াগাঁয়ে মধ্যাহ্ন-নিমন্ত্রণ মানে বেলা চারটের ব্যাপার, তবু আশীর্বাদ সভায় উপস্থিত থাকিবার জন্য সকলে আসিয়া গিয়াছে। গোলমালের কথা শুনিয়া আরও সব দুটিয়া আরও গোলমাল বাড়াইয়া দিতেছে। অন্নদাচরণ প্রবীণদের একবার এর হাত ধরিতেছেন, একবার ওর পায়ে ধরিতেছেন—"আমি কি করি?...রসিক কোথায় গেল?...একি—কি হল?"

সামনে সান্ত্বনা পাইতেছেন তবে পিছনে নানারকমের টীকা-টিপ্পনী চলিতেছে—"বামন হয়ে চাঁদে হাত! ওহে, বিদ্যাসাগরের কাকপক্ষী আর ময়ূরপুচ্ছের কথাটা পড়েছ তো? হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ..."

ঘোষাল মশাই-ই পরিবারটিকে আন্তরিক স্নেহ করেন। প্রথমেই বেগতিক দেখিয়া একবার আড়ালে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন—"বলেছিলাম বাপু, নিকের পাল্লায় প'ড় না; দেখলে তো? আমি আশঙ্কাই করছিলাম পুরনো ঝাল ও মোক্ষম ভাবেই মেটাবে। দেখছি নিকেই সর্বেসর্বা, আমরা আমল পাচ্ছি না তাই বলিনি, নৈলে যতটুকু খোঁজ পেয়েছি, তাতে দেখছি অনেক গলদ ভেতরে। যাক; আপাতত নেমন্তন্নটার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটোর সময় একটা লগ্ন আছে। নেমন্তন্নটাকে রাত্তিরে ঠেলে দেওয়া যাক, হরিপুর থেকে লোক আসে ভালই, না আসে এমন অবস্থাতেও রাত্তিরে যারা খেতে আসবে তাদের খাইয়ে দিলেই হবে। দুঃখ করে আর করবে কি? হয়ে পড়ল একটা কেলেঙ্কারি, সামলাতে হবে তো? মেয়েটার খবর কি?"

অন্নদাচরণ ঘোষাল মশায়ের হাতটা ধরিয়া ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"কাকা, পরশু থেকে আমি তার মুখের দিকে চাইতে পারিনি।"

ঘোষাল মশাই স্নেহভরে পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"বিপদের সময় উতলা হয়ো না অন্নদা। আমি সাধন আর শিবুকে টিপে দিয়েছি, তারা রান্নার হাঙ্গামাটা সামলে রাখবে। আমি নেমন্তন্নটা সামলে নিচ্ছি বুঝিয়ে সুঝিয়ে, তোমার ওদিকে যাওয়াটাও ঠিক হবে না। তুমি একটু ভেতরে চলে যাও, মেয়েদের একটু দেখা দরকার।...নিকে হারামজাদাকে দেখছি না যে? কাঁচা মাথাটা ধড় থেকে ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে করছে, উঃ!"

BanglaBook.org

অন্নদাচরণ বলিলেন—"নিকুঞ্জদাদা সাতনলায় ওদের এগিয়ে আনতে গেছেন, রাজগুরুও সঙ্গে আসবেন, তাই..."

ঘোষাল মশাই দাঁতে দাঁতে পিষিয়া বলিয়া উঠিলেন—"রাজগুরু! রাজগুরু! রাজা! —এখনও তোমার মোহ যায় নি অন্নদা!"

অন্নদাচরণ বলিলেন—"কি করি কাকা, আমি যে কী ভাবে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছি!— আজ আমায় অপমান হতে হল, এটা ফাউ, যদি এইটুকুর ওপর দিয়েই আমার প্রায়শ্চিত্ত হত কাকা, দুঃখ ছিল না, কিন্তু গিরিকে আমার জলাঞ্জলি..."

এমন সময় সাতনলায় যাহারা গিয়াছিল তাহাদের কয়েকজন ফিরিয়া আসিল। খবর দিল নিকুঞ্জলাল একটা পালকি করিয়া স্বয়ং ডুমজুড়ে গেছেন। বলিয়া দিয়াছেন দুইটার সময় একটা 'দিন' আছে, আশীর্বাদের বন্দোবস্ত যেন ভাঙিয়া দেওয়া না হয়।

ভিতরের অবস্থা খুব জটিল, টীকা-টিপ্পনীতে অনেক নখে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে, ধারাল ঠোঁট পানজর্দার ঘন ঘন শান পড়িতেছে ; দুই তরফেই, কেননা ঘোষাল গিন্নীর মতো মানুষও আছেন, বলিতেছেন—"টাকার শ্রাদ্ধ! তাও যদি মেয়েটা পরিত্রাণ পায় তো বুঝব বাপ-জেঠার লোভের প্রাচিত্তির অল্পর ওপর দিয়েই হল।"

দামিনী গম-গম করিয়া ফিরিতেছেন। ঘোষাল গিন্নীকে ভয় করেন, সরিয়া যাইতে যাইতে বলিতেছেন—"প্রাশ্চিত্তির হচ্ছে তার, যে গায়ে পড়ে পরের উবগার না করে থাকতে পারে না। এর মধ্যে কারচুপি আছে অনেক, বহু দিন থেকেই আঁচ পাচ্ছি। দুটোর সময়ও যদি তারা না এসে পড়ে তো বুঝব, সেই বিটলে বামন গিয়ে ভেঙে দিয়েছে। ঐ রসিক—ভয় করে বলছি না তো!"

বেশ স্পষ্ট ঝগড়া বাধিবার কথা, কিন্তু বাধিতেছে না। বরদাসুন্দরী ওদিক দিয়া যানই না, ক্রমাগত আড়াল খুঁজিয়া চোখের জল মুছিতেছেন।

বসন্তকুমারী মাথায় ব্যথা লইয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়াছেন। সত্য বা ভান মাত্র বলা দুষ্কর।

গিরিবালা শুষ্কমুখে ক্রমাগত নিজেকেই সবার চক্ষু হইতে আড়াল করিয়া ফিরিবার চেষ্টা করিতেছে, ভালমন্দ বুঝাটা অনেকটা তাহার সাধ্যাতীত, তবে তাহাকে ঘিরিয়া যে এতটা বিক্ষোভ এইটেতেই তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। আড়াল চায় কিন্তু এত লোকে ভরা উৎসব বাড়িতে সেটা সম্ভব নয়—বিশেষ করিয়া সে-ই যখন উৎসবের কেন্দ্র। নিরিবিলি ভাবিয়া জেঠাইমার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, দেখিল জেঠাইমা শুইয়া। এই লোকটিকে সে সব চেয়ে বেশি এড়াইয়া আসিতেছে, তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিবে, জেঠাইমা ডাকিলেন—"কে গিরি? শোন্।"

গিরিবালা পাশে গিয়া দাঁড়াইলে বলিলেন—"উঠে বস।"

গিরিবালা উঠিয়া পায়ের কাছে বসিল, সঙ্গে সঙ্গেই কোথা দিয়া কি হইল তাঁহার গায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া কোলে মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বসন্তকুমারী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া শুধু গিরিবালার মাথার উপর দিয়া, পিঠের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্তটা ধীরে ধীরে টানিয়া যাইতে লাগিলেন, তাহার পর বলিলেন—"তোকে শেষ করলে গিরি—দু'জনে মিলে—আমি মেয়েমানুষ কিছুই করতে পারলাম না।" অশ্রু নাই, কোনরকম আবেগও নাই।

এই সময় বাহিরের কলরবে একটা যেন জোয়ার আসিল, একেবারে অন্য ধরনেরই গুলতন—"এসেছে...এসে গেছে...বর এসেছে!"

সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা যেন নতুন ভাবে সজীব হইয়া উঠিল—কৌতূহলভরে ছুটাছুটি, ত্রস্ত প্রশ্ন, অস্পষ্ট উত্তর; কতকগুলা ছেলেমেয়ে জোয়ারের কুটাকাটার মতই হু-হু করিয়া বাড়িতে ঢুকিয়া পড়িয়া তাহাদের কাকলিতে বাড়িটা ভরিয়া দিল—"দেখেছি...কি সুন্দর বর!...কি সুন্দর পুরুত। খোট্টা চাকর!..."

বসন্তকুমারী শুইয়া ছিলেন উঠিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা কণ্ঠে বিস্মিত শব্দ উঠিল—"ওমা, কাতু যে!!"

কাত্যায়নীর কণ্ঠেই উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন—"বড়দি কোথায়?"

তাঁহার পিছনে পিছনে একটি ছোট দল বসন্তকুমারীর ঘরের সামনে আসিল; চৌকাঠ ডিঙাইতে যাইয়াই কিন্তু সকলে থমকিয়া দাঁড়াইল, কাত্যায়নী পর্যন্ত।—

বসন্তকুমারী একেবারে সিধা হইয়া বসিয়া আছেন। মুখটা রাঙা টকটকে, চোখ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে, কোলের উপর উবু হইয়া শুইয়া গিরিবালা; বসন্তকুমারীর একখানি হাত তাহার মাথার উপর,—আলগাভাবে রাখা নয়, কতকটা যেন খামচাইয়া ধরিয়া আছেন। দৃষ্টি হইতে পয়ের নখ পর্যন্ত অচঞ্চল।

অদ্ভুত সাদৃশ্যে কাত্যায়নীর ধাঁ করিয়া একটা ছবির কথা মনে পড়িয়া গেল, বিকাশ কবে একবার দেখাইয়াছিল,—একটি সিংহী থাবার নিচে নিজের শাবককে চাপিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া আছে।

তিনদিনের চাপা কণ্ঠস্বরকে মুক্তি দিয়া বসন্তকুমারী কাত্যায়নীকে লক্ষ্য করিয়া গর্জাইয়া উঠিলেন—"নিজে গিলতে পারলিনি, দেখতে এসেছিস অন্য কোন্ রাক্ষসের পেটে গেল?—হবে না তোদের মনস্কামনা পূর্ণ! ডাক, কে আমার কাছ থেকে গিরিকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তাকে!"

এমন সময়—"ওগো শুনছ—কোথায় গেলে?"—বলিতে বলিতে অন্নদাচরণ আসিয়া বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। ঘরের কাছে একটু বেশি ভিড় দেখিয়া কাছে আসিয়া বলিলেন—"তোরা একটু সর্ তো ...ওগো শুনছ?—রাজপুত্তুর এনেছে রসিক—রসিক নিজে—আজই বিয়ে..."

ভিড়কে, বাড়ির মধ্যে আর সবাইকে এবং স্ত্রীকে শুনাইতে শুনাইতে দরজার সামনে আসিয়া তিনিও হতভম্ব হইয়া গেলেন, দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন—"একি!"

স্বামী-স্ত্রীকে একত্র দেখিয়া বড়রা সরিয়া গেল, বসন্তকুমারীও মাথার কাপড়টা তুলিয়া দিলেন। একটা ধাক্কা খাইয়াছেন, কিন্তু আবেগটা সহজে যাইবার নয়, অন্নদাচরণ বলিয়া চলিলেন—"রসিক ঠিক করলে! বাপ যে, আমার গুমর করলেই চলবে না তো।...বর দেখবার জন্যে এতবড় কাজের বাড়িটা খালি হয়ে গেছে—ঘোষালকাকার বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম,...আশীর্বাদ পর্যন্ত সেরে এসেছে রসিক..."

খুব শক্ত করিয়া বাঁধা তার হঠাৎ আলগা হইয়া গেলে যেমন হয় অনেকটা সেইরকম হইল—কিছু শুনিবার বুঝিবার ক্ষমতা হারাইয়া বসন্তকুমারী অবশ ভাবেই আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িলেন।

"দেখো, শুলো! যার বাড়িতে আজই কাজ সে আরাম করে কাতু, তুই এসে

দেখ্ দিদি ; আমার আর এখন মান ভাঙাবার...”

শেষ করিবার পূর্বেই হুঁশ হইল। “বৌমা কোথায়? পুতী, বৌমা কোথায় রে?—একবার বল্ তো মা দোরের পাশে এসে দাঁড়াতে...”

বলিতে বলিতে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

॥ ৭ ॥

কয়েকদিন পরে পণ্ডিতমশাই ফিরিয়া আসিয়া যখন রসিকলালের কাছে সব বিবরণ শুনিলেন, উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিয়াছিলেন—“শিবের বিয়েতেও নানা উৎপাত হয়েছিল, দুঃখ রয়ে গেল আমার দেখা হল না, এমন আটক পড়ে গেলাম!”

এদিককার গোলমালটা একটু থিতাইয়া আসিলে টের পাওয়া গেল রসিকলালের আবার দেখা পাওয়া যাইতেছে না। খোঁজাখুঁজি ছুটাছুটির আর একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। হারাণও আসে নাই এখনও, সে ফিরিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য সাতকড়ি তাহার বাড়িতে ছুটিল।

গিয়া দখিল কাকা হারাণের সদর ঘরে বসিয়া হুঁকা টানিতেছে ; সামনে, নিজের হাঁটু দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া হারাণ ঊর্ধ্বমুখে বসিয়া। সাতকড়ি কাহাকেও দেখিতে পাইবে মোটেই আশা করে নাই, আর কেহ দেখিয়া পাছে খবরটা আগে দিয়া ফেলে, এই ভয়ে ফিরিয়াই ছুট দিয়াছে, রসিকলাল ডাকিলেন,—“সাতু, শোন্!”

সাতকড়ি পাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া দাঁড়াইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—“দাদা খুব বকাবকি করছে?”

সাতকড়ি কাকার স্বভাবটা অনেকখানি বুঝিতে পারে এখন, বলিল—“না তো, খুব সুখোত করে বেড়াচ্ছন বরং, তুমি যাবে না?”

“বলবি হারাণের বাড়িতে একটা অসুখের খবর পেলাম, দেখেই চলে আসছি।”

হারাণ হাতটা একটু ঘুরাইয়া বলিল—“সে তুমি রামীর-মার নিমোনিয়া হয়েছে বল না ; গিরিদিদিমণির এমন বিয়ে হচ্ছে, হারাণ আর তোয়াক্কা রাখে না।”

রামীর-মা হারাণের স্ত্রী। বারণ করিয়া রসিকলাল অন্য একটা কিছু বলিবার পূর্বেই সাতকড়ি একছুটে গলির বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সাতকড়ি চলিয়া গেলে হারাণ আবার গুছাইয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—“ডুমজুড়ের সেই বৈকুণ্ঠ পরামানিকের ওখানে গেনু। আমার খুড়শ্বশুর হয়, দেখতেই জিগুলে—‘কুটুম এত ভোরে যে? বাড়ির খবর সব ভাল তো?’

বললাম—‘বাড়ির খবর একরকম ভালোই আপনার ছিচরণের আশীব্বাদে, তবে এক অন্য বিপদে পড়া গেছে হঠাৎ।’

তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব বললাম—হরিপুরের ওনার আর নিকুঞ্জঠাকুরের য্যাতো শয়তানির কথা জানতুম তার ওপর দু’পোঁচ রং চড়িয়ে। শেষে বললাম—‘উদিকে কাল বিয়ে, সাঁতরা থেকে বরযাত্রী এসতেছে, ইদিকে হরিপুরের এনাদের কাল সকালেই আশীব্বাদ, আজ সন্দের গাড়িতে এইখানে নেমে তানারা নিশ্চয় রাত কাটাবে, একটা

BanglaBook.org

ব্যবস্থা তোমায় করতে হবে, নৈলে গরীব বামন দুটো দলের চাপে পিষে মারা যায়। ও-দলেরা আবার পশ্চিমে থাকেন, একটু বদরাগী, আর কি যে বলে—বেশ শক্ত-সমত্থ।'

শুনে খুড়শ্বশুর বললে—'এই তুশ্চু কথা?'

তা, তানার বলবার হক আছে কিনা বাবাঠাকুর।—ডুমজুড়ে পাঁচটি দোকান আছে, পাঁচটিই নরহরি ভটচায্যির। ভটচায্যি মশাই থাকেন হাবড়ায়, পাঁচটি দোকানই শ্বশুরমশাইয়ের তদারকে। অবিশ্যি লোকে জানে পাঁচটি দোকান পাঁচজন ভেন্ন ভেন্ন লোকের; কিন্তু ভেতরের গোপনীয় কথাটা এই।...এখন ধরুন আমতার আদালতে মোকদ্দমা, গাড়ি থেকে চারজন সাক্ষী নামল। ও-পক্ষের লোক এসেও ধরলে—'বৈকুণ্ঠ, এই যৎসামান্যি নাও, সাক্ষী ক'টিকে একটু আটকে রাখতে হবে বাপু।...সে সাক্ষী আর সেদিন আদালতের মুখ দেখতে পাবে নাকি বাবাঠাকুর? এই রকম দশ জনের উবগার করে করে শ্বশুরমশাইয়ের হাত পেকে গেছে। আমার কাছে সব শুনে বললে—'এই তুশ্চু কথা?'

তারপর দু-একবার গুড়ুক টেনে বলল—'তবে সেখান থেকে ক'জন আসছে, কে কে আসছে, কার কিরকম ভাল মন্দ অব্যেস একটু জানলে সুবিধে হোত; তা আমার তো নড়বার উপায় নেই, এক্ষুনি একটা গাড়ি আছে, দোকানের খদ্দের নামবে; তুমি হরিপুরে চলে যাও কুটুম, দেখ কতটা খবর যোগাড় করে আনতে পারো।'

আর দুজনেরই ফুরসুত কম, তা ভেন্ন মনটাও ঐ দিকে পড়ে রয়েছে, খুব সাটে বলে যাই বাবাঠাকুর, আর একদিন খুঁটিয়ে শোনাব'খন। শ্বশুরের পরামর্শেই জাতব্যবসার সরঞ্জাম নিয়ে সেই গাড়িতেই হরিপুর গেলাম; তিনিই যোগাড় করে দিলে, বললে—'কুটুম, আমাদের বাপ পিতামোরা অনেক বুদ্ধি খরচ করেই আর সব ব্যবসা ছেড়ে এই খেউরির ব্যবসাটি বেছে নিয়েছিল—দাড়িতে ক্ষুর ঠেকালেই মানুষের আঁতে সুরসুরি লাগে, আপনি থেকেই গপ্প করি গপ্প করি —বাই চাগে, পেটে কথা রাখতে পারে না।'

নিভ্যুল কথা বাবাঠাকুর, ঘাঁঘি লোক কিনা, ভুল বলবার পাত্তর নয়, আপনি বরং মিলিয়ে দেখবেন। মোট কথা, আমি সেই গাড়িতেই হরিপুরে গেনু আর এর মুখে তার মুখে সব খবর নিয়ে ওদেরই সঙ্গে সন্দের গাড়িতে ফিরে এনু, অবিশ্যি ওদের দলে নয়, গা নুকিয়ে নুকিয়ে। আগেভাগেই নেমে আড়াল থেকে শ্বশুরমশাইকে সব চিনিয়ে দিনু। খুব মোটামুটি একটা পরচেও দিয়ে দিনু— 'দাড়ির ডগায় গেরো বাঁধা উটি কুলগুরু, উটি পুরুত, পাকানে চাদর গায়ে উটি আরপক্ষের সুমুন্দি নীলমণিবাবু, পাশেই উটি সুমুন্দির ছোট সুমুন্দি, তেলের কুপোর মতো উটি দাওয়ানজি, তার সঙ্গে পিপের মতন যে লোকটি কথা কইছে সে হল বাবুর পিসেমশাই—কত্তা হয়ে এসেছে,...'

খুড়শ্বশুর একবার তাক্যে দেখে বললেন—'কত্তামি ভাঙচি। নেশাটেশা কার কি অব্যেস খোঁজ নিয়েছ? তাতে কাজের সুবিধে হয়।'

বনু—'না, যারা ওদিকের তাদের যে আসতেই দিলে না, কম হারামজাদা! এদের একটু আপিন হল, একটু সিদ্ধি হল, কি কারুর একটু বড় তামাক—এই পয্যন্ত।'

ত্যাতক্ষণে সেকেন কেলাস থেকে নেমে সবাই এগ্যে এয়েছে, সামনে পিসে। শ্বশুরমশাই গিয়ে খুব নিচু হয়ে গড় করে বললে—'প্রাতপ্রণাম হই, ঘরটর চাই হুজুরদের রেতে থাকবার জন্যে?'

পিসেমশাই গোঁফজোড়া ফুলিয়ে বললে—'নরহরি হারামজাদার দোকান নয় তো?'

শ্বশুর আর একটা গড় করে হেসে বললে—'নরহরি ঠাকুরের দোকানের নোক হলে ভদ্দর নোকের সামনে এসে দাঁড়াতে পারতুম? মনে সে ধম্মবল পেতুম?—এইটেই ভেবে দেখুন না কেন হুজুর?'

পিসে বললে—'তাহলে চল্, এগো।'

'সামনের দোকানটাতে না তুলে, আর একটু এগিয়ে গিয়ে একেবারে চার নম্বরটাতে তুললে, আমিও একটু ঘুরে গিয়ে খদ্দের হয়ে উঠনু।'

ওপরে একখানা ঘর, নিচে দু'খানা। সামনে দোকান।

সবাই এসে উঠলে খুড়শ্বশুর জিজ্ঞেস করলে—'ওপরে আপনারা কে কে থাকবেন?'

গোল বাধাবার জন্যেই প্রত্যেক দোকানে একটি করে ওপরে ঘর আছে, পরে খুড়শ্বশুরের মুখে শুনলাম কিনা। কথাটা খুব সোজা বাবাঠাকুর,...যে ওপরে ঠাঁই পাবে না সে-ই মনে করবে মানহানি হল, চটে গিয়ে কাজ পণ্ড করবার চেষ্টা করবে। সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। পিসে বললে —'আর ওপরে ঘর নেই?'

খুড়শ্বশুর বললে—'আর একটি আছে, তবে আপনাদের যুগ্যি নয় হুজুর। চিলে-কোটার সঙ্গে একটা ছোট খুবরি আছে।'

পিসে বললে—'আমরা চারজন চিলে-কোঠায় সেঁদুচ্ছি, নীলমণিবাবু আর ওনার সুমুন্দি ভাল ঘরটা দখল করুন।'

অবিশ্যি ওর মানে হয় উল্টো। নীলমণিবাবু মুখটা একটু বেঁকিয়ে বললে —'তা কি হয়? আপনি হলেন কত্তা, উনি দাওয়ানজি, উনি কুলগুরু, উনি পুরুত। আমাদের চিলে-কোঠারও দরকার নেই। আমরা নগণ্য মনিষ্যি নিচেই বেশ থাকব।'

খুড়শ্বশুর আমায় পরে বললে—'বাবাঠাকুর কুটুম যখন শুনলাম পিসেও আছে আবার সুমুন্দিও আছে তখনই জেনে গেছি বাজি মাৎ, কথাটা বুঝতে পারলেন না—বাবাঠাকুর? পিসে আর সুমুন্দিতে কখনও বনে না,—বলতে পারেই না—সুমুন্দি মনে করে—আমি খোদ সুমুন্দি, আমার কাছে দাঁড়ায় বেটা? পিসে ভাবে—আরে গেল! তুই যার সুমুন্দি বলে মাটিতে পা দিচ্ছিস না, খোদ তার বাপ যে আমার সুমুন্দি! কাজেই গোলমাল বেধে যায় বাবাঠাকুর।'

এদিকে পিসে আবার বাড়িতে একটু মুরুব্বির মতন থাকতে চায় বলে দাওয়ানজির সঙ্গে খাতির থাকতে পায় না। দাওয়ানজি বললে—'আমিও নিচে যাই, কর্মচারী মানুষ, ওপরে থাকাটা শোভা পায় না।'

থাকবার বিলিব্যবস্থা করে দিয়ে, আহ্বরাদির বিলি করে থাকাথাকি নিয়ে বেশ একটা মনকষাকষি বাধিয়ে খুড়শ্বশুর জিগ্যেস করলে—'কোথায় যাওয়া হবে হুঁজুরদের?—গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করব কি পালকির?'

পিসে বললে—'আমাদের যা হয় হবে ; আগে ওদের জন্যে একটা পালকির ব্যবস্থা কর, নইলে মান ভাঙবে না।—যেতে হবে বেলে-তেজপুর।'

খুড়শ্বশুর এই ধরনের কথাবার্তাই খুঁজছিল, নেমে এসে নিচের ঘরে ঢুকে একপাশে

BanglaBook.org

হাঁটু মুড়ে বসে বললে—'মশাইদের জন্যে শওয়ারির কি ব্যবস্থা করা যায়?'

সুমুন্দি মুখ গোঁজ করে জিগ্যেস করলে—'কত্তাদের কি ব্যবস্থা হল? তাঞ্জাম?'

খুড়শ্বশুর একটু মুচকি হাসলে, বললে—'ওপরের ওনারা যে মর্য্যেদার নোক দেখছি তাতে তাঞ্জাম হলেই হোত ভাল। দুখানা বাছা বাছা পালকির হুকুম দিলেন।'

সুমুন্দির সুমুন্দি মুখটা কুঁচকে জিগ্যেস করলে—'আর আমাদের জন্যে?'

খুড়শ্বশুর হাত জোড় করে বললে—'হুঁজুর, গোলাম গরীব নোক, একটি এই দোকানের উপর নিভ্‌ভর করে কোনরকমে চলে যায়। বড় নোকেদের সেবা করি, কিন্তু কথায় থাকি না, বিশেষ করে ওনাদের ভাবটা একটু যেন কেমন কেমন বুঝছি কিনা।'

সুমুন্দিও ছাড়বে না, খুড়শ্বশুরও বলবে না। শেষকালে কাঁচুমাচু করে বললে—'ওনারা কিছু বললেন না, তাই আমি পেরথমটা ভাবলাম বুঝি আপনারা নিজের ব্যবস্থা নিজে করবেন। তারপর আবার ভাবলাম একটু জিগ্যেস করেই নিই, ইনিই যেন কত্তা দেখছি। তাইতে আপনাদেরই জিগ্যেস করতে হুকুম করলেন। বললেন—'জিগ্যেস করগে লবাব বাহাদুরদের পালকি চাই কি গোরুর গাড়ি হলেই হবে।'...যা শুনলুম তাই বললুম হুজুর, গরীব নোক, অত ভালমন্দ বোঝাবার খ্যামতা নেই।'

সবটা খুঁটিয়ে বলবার ফুরসুত নেই বাবাঠাকুর, মোট কথা একদিকে খুড়শ্বশুর আর একদিকে দাওয়ানজি—দুই জনায় মিলে এমন গরম করে তুললে যে সুমুন্দি দিব্যি গেলে বসল।—'আমি যদি এ আশীর্বাদে যাই তো আমার অতি বড় কোটি দিব্যি রইল।'

তানার সুমুন্দি যাত্রার দলের দুর্ব্বাসা মুনির মতন পৈতেটা বের করে বললে—'আমি যদি আর এক দণ্ড ওদের সাথে এ দোকানে থাকি তো আমার নাম গজু চাটুজ্জেই নয়।'

—হবেই কিনা বাবাঠাকুর, নৈলে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় আর বলেছে কেন শাস্ত্রে? —ও আবার তোস্য সুমুন্দি কিনা।

খুড়শ্বশুর সুমুন্দিকে বললে—'আমার একজন খদ্দের গেল বলে নয়, কিন্তু কাজটা কি ওনার ভাল হবে?—আর যে রকম রোকা লোক দেখছি শোনবেনও না। তা, অন্তত আপনি বাবু চোখকান বুজে সয়ে যান। মানী লোক ওনারা, আপনি সুদ্ধু চলে গেলে ওঁদের অপমানের আর হিসেব থাকবে না।'

সুমুন্দি পৈতেটা ছিঁড়েই দিব্যি করতে যাচ্ছিল,—নিজের শালার কাছে তো খাটো হতে পারে না বাবাঠাকুর,—দাওয়ানজি তাড়াতাড়ি ধরে ফেললে। খুড়শ্বশুরকে বললে—'যদি ফিরে যেতেই চান এঁরা তো যেতে দাও হে বাপু, শেষে একটা অনত্থ হবে? ইনি আবার ভয়ানক অভিমানী, তুমি বাইরের নোক, জান না তো।'

সবই তো নিজেদেরই দোকান, খুড়শ্বশুর তাড়াতাড়ি দুজনাকে অন্য দোকানে সরিয়ে ফেললে। ফিরে এসে আমায় বললে—'কুটুম্ব, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতন সংসারটা বড় পাজি জায়গা, এখুনি বোধ হয় দুজনার মত বদলে যাবে, আমার এতটা মেহনতই সার হবে। এই নাও, তুমি বেশ মিহি করে এই সিদ্ধিটুকু পিষে ফেলো দিকিন, খানকতক কচুরি করে খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দিগে, জেদটা আঁকড়ে বসে থাকবে'খন। ভোরের একটা টেন আছে, চাপ্যে বাড়িমুখো করবার যোগাড় করে দিয়ে আসি গে।'

ওদিককার ব্যবস্থা পাকা করে খুড়শ্বশুর এ-চারজনকে নিয়ে পড়ল। কচুরিটা

BanglaBook.org

সুমুন্দিদের ভাল লেগেছিল বলে মাত্তোর দুখানা বেঁচেছিল, খুড়শ্বশুর দাওয়ানজির ঘাড় দিয়ে চালিয়ে দিলে। একে মোটা দুখানি, তায় দাওয়ানজি কর্মচারী মানুষ, একটা ভয় আছে, ভাঙানো গেল না। খুড়শ্বশুর বললে—'চলুক চারজনেই তাহলে, আর ভাবতেও পারি না মেলা, মানুষের শরীল তো?'

খাওয়া-দাওয়ায় রাত কাটিয়ে দেছল, ওনাদের উঠতে একটু বিলম্বই হয়ে গেল বাবাঠাকুর। মানে, এনারা য্যাখন পালকিতে চড়ল ত্যাখন সুমুন্দি জোড়া সিদ্দির ঝোঁকে ঝিমুতে ঝিমুতে ওদিকে দুটো ইস্টিশান পেইরে গেছে। পিসে খুব একচোট চটল, দাওয়ানজি বললে—'খোদ কত্তা ওনাদের আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়াচ্ছেন, আপনি আর কি করবেন?'

আট-আট বেয়ারার দুখানা পালকি, একটাতে চড়ল পিসেমশাই আর গুরুঠাকুর, একটাতে চড়ল দাওয়ানজি আর পুরুত। পালকি য্যাখন আধ পোটাক রাস্তা এগ্যে গেছে, আমি দুগ্‌গাস্‌সিহরি বলে খুড়শ্বশুরের পায়ের ধুলো নিয়ে বেইরে পরনু। খুড়শ্বশুর বলে দিলে—'কুটুম, তুমি এইরকম তফাতে তফাতেই থেকো। পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বেস নেই, শেষে তোমাকেও এই ব্যাপারের মধ্যে ফাঁসিয়ে দেবে—নিরীহ মানুষ, মাঝে পড়ে খানিকটে নাকাল হবে।'

মনে মনেই বললুম—'হারাণ পরামাণিককে নাকাল করবে সে এখনও মায়ের পেটে। ...ওনাকে অবিশ্যি বললাম—'না; কিসের মাথাব্যথা কন্‌না আমার ওনাদের সঙ্গে থাকবার?'

সুতুনীর খালের ধারে য্যাখন পৌঁছুল, সবে সূয্যি উঠেছে। বড় নদীর লতুন জল নেমেছে, বেয়ারারা পালকি নাব্যে কেনারায় থুলো। ওদের মুখপাত ছেল চরণ বেয়ারা; জিগ্যেস করলে, 'হুজুরেরা পালকিসুদ্ধু পার হবেন, কি পুল দিয়ে পেইরে যাবেন, কি হেঁটেই এইটুকু সেরে নেবেন?—আমরা তো বলি—হেঁটে গেলেই ছেল ভাল, জল এক কোমরের বেশি হবে না।'

আমি ত্যাতক্ষণে এসে একটা ঝোঁপের আড়ালে বসেছি। পিসে তো এক কোমর জল ভেঙে পার হবার কথায় চরণদাসকে শুধু মারতে বাকি রাখলো—'অসম্মানের কথা কিনা বাবাঠাকুর। দাওয়ানজি পালকিতে পেরুতে রাজী হ'লনি, পুল পেইরে যাবে ঠিক করলে। পিসে, গুরুঠাকুর আর পুরুত পালকিসুদ্ধু পেরুবে; চারজন চারজন করে আটজন বেয়ারা এগুনে পিসে আর কুলগুরুঠাকুরকে পার করে এসে অন্য পালকিতে পুরুতমশাইকে নিয়ে যাবে। পিসে বললে—'পালকিতে যদি একটুও জল লাগে তো তোদের এক-একটাকে আমি আস্ত পুতব নদীর মধ্যে হারামজাদারা।'...ভয়ঙ্কর রোখা লোক বাবাঠাকুর, নৈলে জমিদারের পিসে হতে পারে?

পুল না হাতী, বোধ হয় দেখেইছ তুমি বাবাঠাকুর! এপার থেকে ওপার পয্যন্ত একসারি বাঁশের খুঁটি পোতা আছে, তার সঙ্গে দু'সারি বাঁশ ওপর নিচে করে এমুড়ো-ওমুড়ো বাঁধা, একটার ওপরে পা দিয়ে একটা ধরে পার হও—বৈতরুণী বলে আমি পদে আছি। সে-পুল দিয়ে দাওয়ানজি পার হতে চাইত না বাবাঠাকুর; মোটা মানুষ, তায় এ-সবে অব্যেস নেই তো?—আমার যা আন্দাজ, কত্তার সুমুন্দিদের নিয়ে খুড়শ্বশুরের কেরামতিটা দেখে ওনার একটু খটকা নেগে গেছল বোধ হয়; জমিদার সেরেস্তার

BanglaBook.org

দাওয়ান, ঝানু নোক তো বাবাঠাকুর? কত দেখেছে কত শুনেছে। অবিশ্যি তিনিও খুড়শ্বশুরের সাথে একরকম একজোট হয়েই সুমুন্দিদের সরালে, তবুও কয়েকবার আড়চোখে তানার দিকে ফিরে ফিরে দেখলে যেন।

পা টিপে টিপে দাওয়ানজি য্যাখন পুলটার আদ্ধেকের কাছাকাছি গেছে, পুরুতমশাই কেনারা থেকে জিগ্যেস করলে—'আমিও তাহলে আসব নাকি?'

বেচারি বুড়া হয়ে এসেছে, অতটা ঠাওর করতে পারেনি, দাওয়ানজির ত্যাখন পা বেশ একটু একটু কাঁপতে নেগেচে। তিনি বাঁশটা বুক দিয়ে জইড়ে ধরে, ঘুরে না দেখেই বললে—'আসুন না, এ তো নেতান্তই কিছু নয়, যেন মনে হচ্ছে ছাতের ওপর হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছি।'

হ্যাঁ, হাত সাফাই বলতে হবে বাবাঠাকুর! খুড়শ্বশুর বললে কিনা, কুটুম, মানুষের অদেষ্ট না বালির বাঁধ।— এদেরই বাপ-পিতেমোরা এক সময় ডাকাতি করে খেতো, কপাল ভেঙেছে, আজকাল ডুলী বেয়ারাগিরি করে কোন রকমে দিন গুজরান করছে। ...দাওয়ানজি পুলের ঠিক আধা-আধি পৌঁছে পুরুতঠাকুর কতটা এগুলো দাঁইড়ে সাড়া নিচ্ছে, এমন সময় পিসের পালকি মাথায় করে এরা নদীর কোলে পৌঁছুল। ঠিক নিচে পৌঁছেই সামনের একজন বলে উঠল —'সামলে, পেছল!'...চরণদাস বলে উঠল—'বাঁশের খুঁটি ধরে ফেল্ সবাই, ওপরে আপনারা একটু কসে ধরবেন।'...দাওয়ানজি বললে —'খবরদার, বাঁশ ধরবি নে, নড়ছে।'...পিসে আর কুলগুরুঠাকুর পালকির ভেতর থেকে চেঁচ্যে বললে—'বাঁশ কসে ধর্, খবরদার, পালকি দুলছে'...জোয়ান জোয়ান আটজনের নাড়া খেয়ে পুল তখন বেশ দুলতে নেগেছে বাবাঠাকুর। দাওয়ানজি ত্যাখন দুটো হাত আর গলা দিয়ে বাঁশটাকে আঁকড়ে ধরে নাগরদোলার দোল খাচ্ছে আর পরিত্তাহি চেঁচাচ্ছে —'বাঁশ ছাড় হারামজাদারা ; শিগ্‌গির বাঁশ ছেড়ে দে!'...এদিকে—'পেছল, সামাল! পেছল সামাল!'—করে পালকিতে রীতিমত ঝাঁকানি লাগ্যেছে। ভেতর থেকে পিসে বলছে—'খোঁটা বাগ্যে ধরিস, গুরুঠাকুর রয়েছেন।'...ওপরে পুরুতঠাকুর চেঁচ্যাচ্ছে, 'আমায় ফিরে যেতে দে, পালকিতেই পেরুব ধীর সুস্তে'...দাওয়ানজি বলছে, 'ছাড় খোঁটা, আমি বুকে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পাচ্ছি না আর!'...সবারই গলা চিরে যাচ্ছে বাবাঠাকুর, এমন সময় খুব জোরে—'সামাল! সামাল!'—বলে এমন একটি রাম-ঝাঁকানি দিলে বাবাঠাকুর, দাওয়ানজি গুলতি দিয়ে পাড়া পাকা আমটির মতন পুলের ওপর থেকে এক্কেবারে পালকির মাঝখানটিতে,—সঙ্গে সঙ্গে পালকির ছাদ ভেঙে ওদের দুজনসুদ্ধ এক কোমর জলে..."

রসিকলাল শুনিতে শুনিতে শেষের দিকে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, প্রশ্ন করিলেন —"মারা গেল নাকি রে!"

হারাণ বলিল—"খুড়শ্বশুর ছাঁপোষা মানুষ, পাঁচটা কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করে, ব্রেহ্ম-হত্যে করে কি পাপের ভাগী হতে পারে? কিছু একটা হলে তো তানারই পাপ লাগতো? বেয়ারা সবাই তো নিরীহ মানুষ ; সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না কারুর, যেমন বলেছে করে গেছে। তবে পালকি যখন টেনে তুললে—উরি মধ্যে আন্দাজ করেই তুলছে বাবাঠাকুর—ত্যাখন তিনজনই বেশ খানিকটা করে ঘোলা জল খেয়ে কপালে চোখ তুলেছে, দাওয়ানজি ছাদ ফুঁড়ে ওনাদের দুজনার মাঝখানটিতে যেয়ে সভা করে বসেছিল

BanglaBook.org

কিনা।...হ্যাঁ, নেশানা বটে বাবাঠাকুর! গপ্পই শুনে এসেছি অ্যাদ্দিন, গিরি দিদিমণির কল্যেণে স্বচক্ষে পেত্তক্ষ করনু।

ওদিকে পুরুতঠাকুর হালকা মানুষ, ছিটকে তিনপাক খেয়ে একটা কেয়াবনের ঝোঁপের মধ্যে পড়ে...”

এমন সময় সাতকড়ি, হরু এবং আরও কয়েকজন ছেলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—“শিগগির ডাকছেন তোমাদের!...”

হারাণ বলিল—“কেন, রামীর-মার নিমুনিয়ার কথা বলনি?”—

সাতকড়ি বলল—“সে তো সেখানে আলপনার পিটুলি বাটছে, শুনে বললে—যে বলেছে তারেই ডবল নিমুনিয়া ধরুক আগে।”

॥ ৮ ॥

বড়দিদিমাকে শৈলেনের বেশ মনে পড়ে। আঁটো-সাঁটো গড়নের মানুষটি, নাকে রাঙা-পাথর বসানো একটি নথ। খুব রহস্যপ্রিয় ছিলেন ; সোনা, পান্না আর হাসিতে মুখখানি সদাই ঝলমল করিত। এদিকে সংসারের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধটা ছিল ছাড়া-ছাড়া। ঠিক অবহেলা নয়, আসলে সমস্ত গ্রামটা ছিল তাঁহার সংসার,—কাহার অসুখ, কাহার প্রসববেদনা উঠিয়াছে, কাহার বাড়িতে আনন্দের ভোজ, কাহার বাড়িতে অভাবের অনশন —এই সামলাইতেই বড়দিদিমার দিন কাটিয়া যাইত ; কখনও কখনও রাত্রিও। তবে নিজের সংসার সম্বন্ধে একটা শক্তি তাঁহার খুব প্রবল ছিল,—কোথাও একটা সূক্ষ্মতম ত্রুটি হইলেও তাঁহার চোখটা সেখানে গিয়া পড়িত, সেটুকু সংশোধন করিতে বড় কড়া হইয়া উঠিতেন, দরকার পড়িলে স্বামীও বাদ পড়িতেন না। তাহার পর আবার সেই ওদাসীন্য। সংসারটা চালাইতেছেন ছোটদিদিমা,—শ্যামাঙ্গী, খুব টানাটানা চোখ, কর্মঠ, স্বল্পবাক। রাগিতেন শুধু স্বামীর ঢিলেপনা লইয়া, সে-রাগও হাসিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিতেন।...এই রাগটুকুও মেয়ের মধ্যে আসিয়া একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল,—শৈলেন মাকে কখনও রাগিতে দেখে নাই, উনি আবার প্রায় রাগিবার আগেই হাসিয়া ফেলিতেন।

বড়দিদিমার সংসারে একটু টান হইত যখন শৈলেনরা মামার বাড়ি যাইত। নাতিদের দেখা-শোনা, ধোওয়ানো-মোছানো, একটা বড় থালায় ভাত লইয়া নিজের হাতে খাওয়াইয়া দেওয়া,—সঙ্গে সঙ্গে চলিত নাতিদের লইয়া সেকালের দিদিমাদের ঠাট্টা। “কি জ্বালা, গিরি, তোর মেজছেলেটা যে কোন মতেই আমার আঁচল ছাড়তে চায় না! আমায় নিয়ে দাদামশাইয়ের সঙ্গে শেষে শুম্ভ-নিশুম্ভের লড়াই বাধাবে নাকি? দু'দিনের জন্যে এসে একি মায়ায় আবদ্ধ করা বল্ দিকিন?”

আসল কথা বড়দিদিমাকে তো এমনই ভাল লাগিত শৈলেনের, তাহার উপর ছিল তাঁহার গল্প,—রূপকথা, আবার রূপকথার চেয়েও আশ্চর্য কথা সব।—

“তোর বাবা যখন উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখনও আমি বিছানায় শুয়ে। মাথাটা ছেড়েছে, কিন্তু লজ্জায় আর আপসোসে আমি মুখ তুলতে পারছি না। মনে একটা আগ্রহ রয়েছে, অথচ ভাবছি—কাতুর মতন মানুষকে ওরকম করে বললাম, আর তার সামনে মুখ তুলব কি করে? ওদিকে বরণ আমায়ই করতে হবে, তোর দুই দাদামশাই বাইরে

BanglaBoi.org

তাগাদা লাগিয়েছে, কাতু আমার গলা জড়িয়ে বলছে—তুমি ওঠ দিদি; আমি তোমায় না চিনতাম, রাগ করতাম, তুমি বলেছ, না পাঁচভূতে বলিয়েছে, জানি ভেতরের সব কথা তো সব...”

মাথার দিব্য দিয়ে একরকম টেনেই তুললে আমায়। দাওয়ায় এসে দেখি তোর বাপ সমস্ত উঠোনটা যেন আলো করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর সে কী ভিড়! বর দেখবার জন্যে মেয়ে-পুরুষে এত লোক জুটে গেছে যেন তিল ফেলবার ঠাঁই নেই উঠোনে। বড্ড মনটা দমে গেছল, তার পরেই এই দেবকুমারের মত রূপ ছেলের, বেশ মনে পড়ে প্রথমটা আমি কী রকম হয়ে গেলাম একেবারে। একবার মনে হল স্বপ্ন দেখছি না তো? একবার মনে হল ও-বাড়ির বড়ঠাকুরের একটা কিছু সাজানো ব্যাপার, এখুনি যেন এ ভাবটা মিলিয়ে গিয়ে অন্য একটা কি হয়ে যাবে। আহ্লাদে ভয়ে কি রকম যে হয়ে গেছি, কাপড় ছাড়বার জন্যে কাতু, তোর ছোটদিদিমা, আরও সবাই তাগাদা দিচ্ছে, শুনছি, কিন্তু যেন হুঁশ নেই। তোর বড়দাদু ভিড় ঠেলে ঠেলে যেন চড়কি ঘুরে বেড়াচ্ছে নেমন্তন্ন থেকে নিয়ে বিয়ের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সদ্য সদ্য ঠিক করা—সোজা কথা নয় তো। একবার কতকগুলো কাপড়-চোপড় হাতে করে—‘উঠল বড়বৌ?’’বলতে বলতে আমার ঘরের দিকে আসতে আসতে আমায় দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল,—খাটুনিতে, আহ্লাদে, এদিকে আবার দুভ্‌ভাবনায় যেন কি রকম হয়ে গেছে, আমার দিকে চেয়েই চোখ ছলছলিয়ে উঠল, বললে—“যাও শিগগির, তুমিই না বলতে ওর বাপের বিশ্বাস ফলবেই, গৌরীকে নিয়ে যেতে আসতেই হবে তাঁকে একদিন...”

বড়দিদিমার গল্প বলার কথা এখনও প্রায়ই মনে হয় শৈলেনের। তাহারা এপাশে ক'জন, ওপাশে ক'জন, মাঝখানে দিদিমা শুইয়া, কুলঙ্গির মধ্যে পেতলের প্রদীপের আলোর শিখা কাঁপিয়া ঘরের ছায়াগুলো যেন সজীব করিয়া তুলিয়াছে। রান্নাঘর থেকে মাঝে মাঝে ছোটদিদিমা কিংবা হয়তো মায়েরই আওয়াজ আসিতেছে—“তোরা যেন ঘুমিয়ে পড়িসনি, আর দেরি নেই বেশি।” ঘরে কোথায় মুড়ি রাখা আছে, দেশের মুড়ির বিশিষ্ট সোঁদা-সোঁদা গন্ধটা মাঝে মাঝে নাকে আসিতেছে। গল্পের মধ্যে দিদিমার স্বরটা এক-একবার আবেগে গাঢ় হইয়া আসিতেছে।

শৈলেনের বড় অদ্ভুত ঠেকিতেছে। এক প্রকারের নূতন অনুভূতিতে মনটা ভরিয়া যাইতেছে, সেটাকে বোধ হয় বংশানুভূতি বলিয়া অভিহিত করা চলে,—মনে হয় মাকে লইয়া যাওয়ার মধ্যে সে-ও যেন কোথায় উপস্থিত রহিয়াছে। এই মাকে দিদিমার গল্পে নূতন রূপে দেখিয়া তাহার বিস্ময় লাগে। একটু যেন দূর বলিয়াও মনে হয়—মামার বাড়ির সবাইকে লইয়া মা যেন আলাদা। তাহার পূর্বে কবে কোথায় তপস্বিনী উমাকে যেমন কৈলাসে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেইরকম একটা ব্যাপারের মধ্যে দিয়া মা ক্রমে ক্রমে হইয়া পড়িলেন সাঁতরার ওদের। শৈলেনরা যেন সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কোথায় কি ভাবে আছে। সেই দূরের মা-ই আজ আবার সমস্ত মামার বাড়িসুদ্ধ কাছে হইয়া গেছেন, আপনার হইয়া গেছেন নিবিড় ভাবে। ওদিকে গল্প চলিতে থাকে, এদিকে শৈলেনের নিজের জগৎ ওঠে রেখায় রেখায় পূর্ণ হইয়া। যাঁহারা দেবমূর্তিতে পূজা পান তাঁহারাই যেন মানবমূর্তিতে রূপান্তরিত হইয়া গেছেন—কখন, আর কি করিয়া বোঝা যায় না, তবে মনে হয় যেন ঠাকুরমার সকালবেলাকার শ্লোকের, অজানা অর্থের

BanglaBook.org

‘রজতগিরিনিভ’ শঙ্কর উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, পাশে বধূবেশিনী উমাপার্বতী...এমন সহজ ভাবে, কোন কিছুর গণ্ডি না ডিঙাইয়া হয় ব্যাপারটা যে, শৈলেনের মনে একটু প্রশ্ন উদয় হয় না, বিশ্বাসে এতটুকু বাধে না, দৃষ্টিতে এতটুকু কুহেলি স্পর্শ করে না। বাঙালীর ঠাকুর-দেবতা ঘরের লোক, মানুষের নিত্য সুখ-দুঃখে, মানুষের মতোই হাসি আর অশ্রু লইয়া মানুষেরই সঙ্গে মিশাইয়া আছেন,—মা কখন পার্বতী-উমা হইয়া যান, পার্বতী-উমা কখন মায়ের মধ্যে কানায় কানায় ভরিয়া ওঠেন বোঝা যায় না, তবে দিদিমার গল্পে নিত্যই যেন এই খেলাই হইয়া চলিয়াছে।...শৈলেনের কান থাকে গল্পে, দৃষ্টি থাকে তাহার নিজের গড়া এই কল্পলোকে। এক এক সময় কল্পলোকই এত বাস্তব হইয়া ওঠে, গল্প আর কানেই আসে না, ‘হুঁ’ দেওয়া বন্ধ হইয়া যায়। দিদিমা বলেন—“মেজকত্তা ঘুমুলে নাকি?...গিরি তোদের হল গা? তোরা যেন যজ্ঞির রান্না রাঁধছিস বাছা, পারে কখনও কচ্ছেলেরা জেগে থাকতে এতক্ষণ?”

শৈলেন বলে—“তুমি বলো না দিদিমা, ঘুমোব কেন?”

গল্প চলে : “প্রথম যখন ছেলে-কোলে এল গিরি, আমার বেশ মনে আছে, থাকবেই কিনা—কেমন আশ্চর্য রকমে এসে পড়ল—একেবারে হঠাৎ!—চারিদিকে ষষ্ঠীর বোধনের আওয়াজ উঠেছে। সিংহবাহিনীর তলায় যাত্রার দল নেমেছে, তাতে রামীর-মার দূর সম্পক্কের এক ভাই গান গায়। রামীর-মা তাকে নিয়ে এসেছে, উঠোনে বসে আমরা গান শুনছি। এই বিকেল বেলাকার দিকটা আর কি, বেটাছেলেরা সব সিংহবাহিনীর তলায় গেছে। আশপাশের ক’বাড়ির মেয়েরা একত্তর হয়েছে, ছোঁড়াটা গান করছে। গানটা মনে নেই সমস্ত, তবে প্রথম দিকটা একটু একটু মনে আছে, কানে বড্ড লেগে গেছল কিনা —‘মা, গা তোল গা তোল, বাঁধো মা কুন্তল, ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী। লয়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ বলে...’ আর মনে পড়ছে না। একে ছোঁড়াটার গলা খুব মিষ্টি, তাতে প্রায় বছর তিনেক দেখিনি মেয়েটাকে, প্রাণটা যেন আইঢাই করে উঠল। চোখের জল না সামলাতে পেরে তোর ছোটদিদিমা আর আমি দুজনেই আঁচল তুলেছি এমন সময়—‘জেঠাইমা কৈ গো?—মা কোথায়?’ বলতে বলতে দোর টপকে একেবারে গিরি!—কোলে এই ইনি—বড় কর্তা...”

দিদিমা দাদার পানে মুখ ফিরাইয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে হাসিয়া বলিলেন —“এখন বড়কর্তা হয়েছেন, মুরুব্বি হয়েছেন ; তখন এত্তোটুকুটি —ফুটফুট করছে রং, মাথায় একমাথা কালো কুচকুচে চুল...‘ওমা, কে গো?—গিরি, তুই আমাদের মন থেকে বেরিয়ে মাটিতে পা দিলি নাকি গো?’ সঙ্গে সঙ্গেই তোর ছোটদাদুর সঙ্গে গল্প করতে করতে জামাই এসে গড় করলেন...”

অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হয় শৈলেনের, একটু উঠিয়া ঘাড় ফিরাইয়া দেখে, কি ভাবিয়া হাসিয়া বলে—“দাদা!” দাদাও একটু হাসিয়া বলে—“যাঃ”—দুজনেই বোধ হয় ভাবে মস্ত একটা গৌরবের কাজ হইয়া গেছে—যাহাতে গৌরবের জন্যই লজ্জিত হইয়া পড়িবার কথা।

গল্প এগোয়, শৈলেনের আবার ভাঙা-গড়া চলিতে থাকে। মনটা যেন স্বপ্নের ঘোরে কোন্ বিস্ময়কর জগতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে,—সেদিনকার মা, কাপড়ে, গয়নায়, আলোয় ঝলমল—তখন তাহারা কেহই ছিল না—তাহার পর ঐ মা—দাদা কোলে,— মনে

BanglaBook.org

পড়িয়া গেল পাঁজিতে কবে একটা ছবি দেখিয়াছিল—গণেশকে কোলে লইয়া দুর্গা আসিয়াছেন বাপের বাড়ি, পিছনে মহাদেবের কোলে কার্তিক, পাশে লক্ষ্মী-সরস্বতী, আরও পিছনে একটা মোট কাঁধে নন্দী কি ভৃঙ্গী ; সামনে চণ্ডীমণ্ডপের মতো বাড়ি থেকে নামিয়া একটি স্ত্রীলোক আগাইয়া যাইতেছে—বোধ হয় মেনকা। ছবির নীচে লেখা আছে —'শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা'...ঐ মা'র পরে আবার আজকের এই মা...শৈলেন একটু আগে একবার রান্নাঘরে গিয়াছিল,—মা ছোটদিদিমার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে রাঁধিতেছেন, আগুনের আলোয় মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে ; কপালে ওপরঠোঁটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া উঠিয়াছে, সিঁথির সিঁদুর একটু যেন ভিজিয়া চিক্‌চিক্ করিতেছে ; গল্পচ্ছলে কি একটা বোধ হয় কৌতুকের কথা হইয়াছে, মা'র মুখে হাসির জের লাগিয়া আছে এখনও ; অত্যন্ত ব্যস্ত...

শৈলেন প্রশ্ন করে—'হ্যাঁ বড়দিদিমণি, উমাই তো শেষকালে অন্নপূর্ণা হয়েছিলেন বড়দিদিমণি?"

দিদিমা হাসিয়া বলেন—"শোন কথা মেজকর্তার। অন্নপূর্ণা যেন আর একজন কেউ!"

সব গল্প একদিনেই শোনা নয়, এমন কি বোধ হয় একবারেও নয়, তবে বড় দিদিমার মুখেই প্রায় সব শোনা। ছোটদিদিমণির আদরটা রূপ ধরিত বেশির ভাগ খাওয়ানয়, গল্প বলিবার মতো তাঁহার বড় একটা ফুরসতও থাকিত না, তাহা ভিন্ন বড় জায়ের নিকট হইতে নাতিদের পাওয়াও সম্ভব ছিল না গল্প শুনাইবার নিমিত্ত।...বড়দিদিমা বলিতেছেন :

"সমাজ আছে বৈকি, সমাজ নেই তো মানুষের চলছে কি করে?—দায় আছে ধম্ম আছে মানুষের, সমাজই তো দেখে।...তোদের বড়দাদু তো পাগলের মতন হয়ে উঠল —চরখি বাজির মতন ঘুরপাক খাচ্ছে—এটা সামলে, ওটা ঠিক করে, আর মাঝে মাঝে ঐ এককথা—'মা আমার তো সব সামলে নিলে নিজের তপিস্যের জোরে, কিন্তু নিকুঞ্জদাদার হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাই?—সে যে এসেই ঝগড়া লাগাবে, কি করে কাটবে রাতটা?...হে ভগবান, হে বাবা তারকেশ্বর, আজকের রাতটা কাটিয়ে দাও...হে মা সিংহবাহিনী'...

শেষকালে কথাটা ঘোষাল ঠাকুরের কানে উঠল। তিনি ওদিকের ব্যাপারটা সামলাচ্ছিলেন, এসে এই উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে লাগলেন— 'বলি, তুমি যে মেয়েমানুষেরও বাড়া হলে হে?—বেলে-তেজপুরের সমাজে কি মানুষ নেই, —সব ভেড়ার দল? এই জোর গলা করে বলছি—দিক দিকিন বাগড়া, কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে দেখি! নরু ঘোষাল মরে গেছে? ও-ই কেমন করে বেলে-তেজপুরে বাস করে দেখবে? ও-ই আগে সমাজের কাছে জবাবদিহি দিক—টাকা খেয়ে, তঞ্চকতা করে ও একটা নিরীহ লোকের কেন এভাবে সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল,—একটা তেজবরে আটচল্লিশ বছরের দেউলেমারা জোচ্চোরের সঙ্গে সাজোস করে! তার নাড়ি-নক্ষত্রের খোঁজ নিইনি আমি? নেহাত আমল দিচ্ছেলে না, কি করব?...রাজা।—সে হারামজাদা রাজার লোকেরা পৌঁছুচ্ছে না কেন এসে? আমি তাদের দেখে নোব, দেখে নেব কেমন করে তারা আস্ত শরীরে বেলে-তেজপুর থেকে ফিরে যেতে পারে...আর, তুমি কি ভেবেছ

BanglaBook.org

হোতে দিতাম আমরা ও-বিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের চোখের সামনে?'

—ভয়ঙ্কর রাগী লোক, সে কি থামতে চান?

চারদিকে ছি-ছিক্কার পড়ে গেল। যাই হোক সে রাত্তিরে আর ফিরে আসতে পারলেন না ও-বাড়ির বড়-ঠাকুর, ওদিকে আবার এই বিটকেল ব্যাপার কিনা,—যারা আসছিল তারা সব পুল ভেঙে সুতুনির খালের মধ্যে পড়ে মরণাপন্ন। বলে যে ধম্মের কল বাতাসে নড়ে—সে তো মিথ্যে নয়।...অত গোলমালের মধ্যে, অত তাড়াহুড়োর মধ্যে খুবই সুচরংকুলে কেটে গেল রাতটা। খানিকটা যোগাড়-যন্ত্র ছিলই, তোর দাদামশাই গ্রামের সমস্ত মেয়ে-পুরুষ বলে এলো। যখন লোক এসে পড়তে লাগল, হুঁশ হল বসাবে কোথায়? আমার তো চিরকালই দুষ্টু বুদ্ধি?—বললাম—'কেন ও-বাড়ির বড়-ঠাকুরের অত বড় বাড়িটা রয়েছে কি করতে?'

দামিনী ঠাকুরঝি মাথাব্যথার নাম করে বাড়ি গিয়ে শুয়েছিল, উমেশ লাহিড়ী, তোদের বড়দাদু, আরও কয়েকজন গেছেন। আমিও খিড়কির দিক দিয়ে পৌঁছুলাম। আগেই পৌঁছে—যেমন বলি—ইনিয়ে বিনিয়ে আপনাত্ব দেখিয়ে বললাম—'নিজের বাড়িতে কাজ, আর তুমি কিনা ঠাকুরঝি শয্যে আশ্রয় করে পড়লে?—আমি জেঠাই, একটু পড়ে ছিলাম তাইতেই কত গঞ্জনা দিচ্ছে, তুমি আবার হলে বাপের বোন পিসি!...'

মিষ্টি চিপটেন কাটছি, এমন সময় এঁরা এদিক থেকে সব গিয়ে পড়লেন। তোর বড়দাদু বললে—"দিদি, দেখতেই তো পাচ্ছ, কি আতান্তরে পড়েছি, বাড়ির খানিকটা একটু ছেড়ে দিতে হবে সবার বসবার জন্যে নৈলে মান-সম্ভ্রম থাকে না।"

দিদিমা নিজের কূটবুদ্ধির স্মরণে হাসিয়া উঠিতেছেন মাঝে মাঝে, বলিতেছেন —আমি ঘরের মধ্যে ঐ-জন্যেই আগাম গিয়ে জুটেছি, একবার পিত্তিরক্ষে গোছের করে খাটের কাছে গিয়ে বললাম—'শুনছ ঠাকুরঝি, কি বলছেন ওঁরা?' ...তারপর কি উত্তর দেয় না শুনেই দোরের কাছে এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে বাইরের সবাইকে শুনিয়ে বললাম—'ঠাকুরঝি বলছেন, এ-বাড়ি আর ও-বাড়ি কি আলাদা যে ওঁরা আমায় জিগ্যেস করতে এসেছেন, না গিরি আমার পর?'...উস্, সেই একটি দিনে অতদিনকার গায়ের জ্বালা সব মিটিয়ে নিয়েছিলাম। ও আবাগী ওদিকে গায়ের চিড়বিড়িনিতে আড়ামোড়া ভাঙছে বিছানায়, কিছু মুখ ফুটে বলতেও পারে না...এদিকে ওঁরা একটা কথা বলছেন আর আমি খাটের কাছে গিয়ে ধম্মের ডাক ডেকে, দোরের কাছে এসে বানিয়ে বলছি —হাসিতে পেট এদিকে গুড়গুড় করে উঠছে..."

দিদিমা যেন সদ্যই উপভোগ করিতেছেন এইভাবে উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া ওঠেন। বলেন —"তার পরদিনও নয়, তার পরের দিন—মেয়ে-জামাই যখন চলে গেছে, সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বড়-ঠাকুর এল। 'ট্যা-ফোঁ'—কিছু নয়, বাড়ি ঢুকল যেন চোরের মতনটি হয়ে। সব খবর তো পেয়েছিলই, তা ভিন্ন টেরও পেয়েছিল যে সমস্ত বেলে-তেজপুর বেঁকে দাঁড়িয়েছে ওর ওপর।

সকালবেলা ঘোষালঠাকুর, রমাই চাটুজ্জে, কেদার চৌধুরী, উমেশ লাহিড়ী—আরও দু-তিনজন কাকে সাক্ষী করে নিয়ে—সেই আগেকার পনেরো টাকা, তারপরের একশ' টাকা, তার পরের পাঁচশ টাকা—সব ফিরিয়ে দিয়ে তোদের দাদু একখানা রসিদ লিখিয়ে নিলে। কম ভোগান্ ভুগিয়েছে আমাদের ওরা?"

BanglaBook.org

মায়ের মুখে শোনা শৈলেনের।

সব চেয়ে বেশি কাঁদিয়াছিলেন কাত্যায়নী দেবী ; অত কান্না বড়দিদিমা পর্যন্ত নাকি কাঁদেন নাই। উল্লেখ করিতে গেলেই মায়ের চোখ ছল ছল করিয়া উঠিত, বলিতেন—"মেজমাসিমার কথাগুনো যে দাগ কেটে বসে রয়েছে বুকে—"গিরি, তোকে ভালবেসে আমি কলঙ্ক নিলাম। তুই আমায় কিন্তু কখনও ভুল বুঝিসনি—বিশ্বাস করিস, যা ভুল করতে যাচ্ছিলাম, তা ভালোবাসারই ভুল। বল্ বিশ্বাস করলি বল্, মনে কিছু নেই, বল্ গিরি।"

মায়ের সমস্ত চিত্তটা যেন স্মৃতির আলোড়নে মথিত হইয়া উঠিত, একটি দীর্ঘশ্বাসের সহিত অসীম প্রীতি আর শ্রদ্ধায় বলিতেন—"কী মানুষই ছিলেন, অমনটি আর দেখলাম না!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

স্বর্গাদপি গরীয়সী
দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পর্যায়

॥ ১ ॥

গিরিবালার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে সাঁতরার গঙ্গার ঘাট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ননদ মনোমোহিনী দেবী স্নান করিতে লইয়া গেলেন, সঙ্গে গিরিবালার দেবর চণ্ডীচরণ। সবচেয়ে নিকটতম ঘাটটি, এদিককার লোকেরা যেটা বেশি সরে, সেটা পাকা নয় ; একদিকে কতকগুলো গাছপালা, একদিকে ছিদাম ময়রার দোকান। ঘোমটার মধ্যে থেকে দেখার চেয়ে যেমন বেশিভাগ অনুভব করিতে করিতেই সঙ্গিনীর সঙ্গে নামিয়া গেলেন গিরিবালা। জলের ধারে আসিয়া মনোমোহিনী বলিলেন—"পারবি নাইতে, না জোয়ারের ফুলের মতন আমাদের কাছে যেমন কোত্থেকে ভেসে এসেছিস, তেমনি আবার ভেসে চলে যাবি?"

ঘোমটার মধ্যে থেকেই গিরিবালা ঘাড়টা নাড়িয়া অস্পষ্ট উচ্চারণে জানাইলেন—পারিবেন।

বোধ হয় গৌণত জোয়ারের ফুল কথাটা মানিয়া লওয়ার জন্যই মনোমোহিনী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"চল্, না পারিস, যাবি ভেসে, জোয়ার থেকে আর একটা ফুল তুলে নেওয়া শক্ত হবে না। আয় হাত ধরে নেমে আয়।"

গিরিবালা অবগুণ্ঠিত হইয়াই ডুব দিলেন।

যখন উঠিলেন তখন স্রোতে অবগুণ্ঠনটি সরিয়া গিয়াছে, চক্ষু উন্মীলন করিয়া যেন সম্পূর্ণ এক নূতন জগতে উত্তীর্ণ হইলেন। ডুব দিবার কথা ভুলিয়াই, এমন কি অবগুণ্ঠন টানিবার কথা ভুলিয়াও অপরিসীম বিস্ময়ে চুপ করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর দৃষ্টি যায় আলোয় ঝলমল আর ছোটবড় ঢেউয়ে চঞ্চল ধূসর জলের রাশি ; ওপারে স্রোতের পর থেকে আকাশ পর্যন্ত সবুজে ভরা, মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে বোধ হয় এক একটা রাধাচূড়ার গাছ, রাঙা ফুলের স্তবকে যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে, আর এ সবুজের কোলে কোলে এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত শত শত বাড়ি, মন্দির, ঘাট,—সাদা, কত রকমের রং করা, কত রকমের গড়ন সব! দূরে কাছে কত নৌকা; কত রকমের, কত দিকে গতি!...আর ওটা কি?—পিছনে চরকিবাজির ন্যায় প্রকাণ্ড চাকার মতো কি একটা দিয়া গঙ্গার জলে যেন ধূলি উড়াইয়া আগাইয়া চলিয়াছে,—ওই জাহাজ নাকি?—সম্ভব।

মনোমোহিনী বলিলেন—"হাঁ করে দেখছিস কি? ওমা, তাও তো বটে, বুনী এ সব দেখেনি যে কখনও!...ওটা লাটসাহেবের বাগান, মাঝখানে ঐটে বাড়ি, ঐ যে লম্বা লম্বা

থামের মতন।...আজ শীগ্‌গির নেয়ে ওঠ, জোয়ারের নোতুন জল এসেছে, অন্য দিন চিনিয়ে দেব'খন সব।"

গিরিবালা ডুব দেন, কিন্তু এই নূতন জগতের আলোর ডাকেই যেন তখনই উঠিয়া পড়েন। একটুখানি ঝাপসা, তাহার পর চোখের উপরকার জলটা ঝরিয়া গিয়া আবার সব পরিষ্কার হইয়া ওঠে। আশ্চর্য, অদ্ভুত!—গিরিবালার মনেও কোথা থেকে একটা জোয়ার ঠেলিয়া আসে। এ ধরনের অনুভূতি তাঁহার প্রথম হইয়াছিল প্রথম বোধ উন্মেষ হইবার পর, প্রায় আট বৎসর বয়সে তিনি প্রথম যখন সিমুরে মামারবাড়ি যান। ক্ষুদ্রতর থেকে একটা বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে আসিয়া পড়ার জন্য একটা অপূর্ব আনন্দ-শিহরণ যা আর সব রকম আনন্দ থেকে আলাদা। গিরিবালা অবশ্য অত বুঝিলেন না, তবে অনুভূতির সমতার জন্য বোধ হয় সিমুরটা মনে পড়িয়া গেল।—এ এক অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি —হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া আর বড় করিয়া যেন পাওয়া যায়। মনে হয় যেন অনেকখানি জায়গা পাইয়া অনেকখানি বড় হইয়া গেছি—শরীরে, মনে সব দিকেই। তবুও সিমুরের সঙ্গে সাঁতরার তুলনা হয় না, এ যেন সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। বেলে-তেজপুরের সামনে সিমুর যেমন বোধ হইয়াছিল, সিমুরের কাছে সাঁতরা তাহার চেয়েও অপরূপ। একবার সাঁতরার সামনে আসিয়াই সিমুর যেন সঙ্গে সঙ্গে নিষ্প্রভ হইয়া গেল।

নদীও যে এমন হইতে পারে,—এত প্রসার, এত মুক্তি, এ ধারণা ছিল না গিরিবালার। মনে পড়িয়া গেল মামারবাড়ির পথে বড়-নদীর কথা; প্রথম দেখিয়া কি এই ধরনের কিছু মনে হইয়াছিল গিরিবালার?—একটা আবছায়া বিস্ময়ের স্মৃতি যেন ভাসিয়া আসে মনে। কিন্তু বড়-নদী কেমন যেন একলা, চুপচাপ,—এপারের খেয়াঘাটে একটি অশথ গাছ, ঘেটেলের একটি কুঁড়ে, একখানি নৌকা ওপারে যায়, এপারে আসে; নদীর মাঝে চড়া, তাহার পর মাঠের পর মাঠ। ...একবার মাত্র দুইটা কি পাখির হাঁকা-হাঁকিতে বড় নদীর মধ্যে কেমন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল,—এখনও যেন কানে লাগিয়া আছে গিরিবালার।

আর সাঁতরার গঙ্গা যেন ভরাট,—জলেও ভরাট, আবার দু'ধারের ডেঙাতেও ভরাট; গতিতেও ভরাট, শব্দেও ভরাট। একটা যেন বড় সংসার। গিরিবালার যেমন অদ্ভুতভাবে কোথাকার কথা কি করিয়া মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া যায়, সেইভাবে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সিমুরের চৌধুরী-গিন্নীর কথা,—কয়েকবার দেখিয়াছিলেন, বড় ভালো লাগিত দেখিতে।—অত ছেলেপুলে, নাতি-নাতকুড়, কর্‌-কুটুম, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী; অত কাজ, অত ব্যাপার; তাঁহাকে ঘিরিয়াই সব, অথচ তাঁহার এমন একটা হাসি-হাসি নিশ্চিন্ত ভাব—যেন আরও অনেক জায়গা আছে তাঁহার চারিদিকে, আরও অনেক আসিতে পারে, মোটেই ভিড় হইবে না, তাঁহার মুখের নিশ্চিন্ত হাসি এমনই অটুট থাকিবে।

এর পরেও এই রকম আকস্মিক ভাবেই গিরিবালার আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল,—সম্পূর্ণ অন্য কথা।...শিবপূজার কথা হইতেছে, কাত্যায়নী দেবী গিরিবালাকে বুকে জড়াইয়া বলিতেছেন—"চাইবি বুড়োর কাছে, দিতে হবে তাকে; তোর মতন মেয়েকে যদি না দেয় তো কার জন্যে রেখেছে সব?"

মনোমোহিনী দেবী জপ করিতেছিলেন, সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বলিলেন—"তুই এখনও দাঁড়িয়েই আছিস তো? নাঃ, একে হাঁদা তায় অবাধ্য—তোকে নিয়ে বেগ

BanglaBook.org

পেতে হবে দেখছি। নে, ওঠ, একটা ডুব দিয়ে নে।"

এঁরা উঠিতে ছেলের দলের মধ্যে থেকে দেওরটিও উঠিয়া আসিল। বছর দশ এগারো বয়স, গৌরকান্তি, বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছেলেটি। বৌদিদি আসিয়াছে পর্যন্ত সর্বদাই ঘিরিয়া আছে। স্কুলে পড়ে; যত রকম বই পড়ে, আরও অনেক রকম যা পড়ে না, সব একত্র করিয়া ক্রমাগতই বৌদিদিকে তাক লাগাইয়া দেওয়া ছেলেটি ব্রত করিয়া লইয়াছে। এর উপর স্কুলের গল্প আছে—সত্য যাহা ঘটে তাহার সঙ্গে এমনও অনেক কিছু যাহা ঘটা অসম্ভব।...খুব ভাব হইয়া গেছে গিরিবালার সঙ্গে। ছেলেবেলাকার বিকাশদাদার মতো, শুধু তফাত এই যে, গিরিবালার চেয়ে বয়সে ছোট। কতকটা এর মধ্যে বিকাশদাদাকে পান বলিয়া আর কতকটা সম্বন্ধের মাধুর্যে গিরিবালার সব স্নেহ এই ছেলেটির উপর গিয়া জড়ো হইয়াছে। একটি স্নেহের পাত্র না থাকিলে নিজেকে বড় বলিয়া অনুভব করা যায় না, দেওরটিই এখানে একমাত্র মানুষ যে সেই অভাবটি পূরণ করিয়া আছে। সাতু, হরিচরণ, খোকা বেলে-তেজপুরে যা, চণ্ডীচরণ সাঁতরায় তাই, বরং গিরিবালার যেন মনে হয় এই অভিনব সম্বন্ধের মাধুর্যে এ-ছেলেটি আরও মিষ্ট। সিমুরে বিকাশদাদার গল্প শুনিয়া যে-গিরিবালা মুগ্ধ বিস্মিত হইয়া পড়িত সে-গিরিবালা আর নাই ; তবু চণ্ডীচরণ বই থেকে এবং কল্পনা থেকে যখন নব নব রোমাঞ্চকর কাহিনীর অবতারণা করে, গিরিবালা প্রশ্রয়ই দেন, বলেন—"সত্যি নাকি ঠাকুরপো? এমনটা তো শুনিনি কখনও।"

এই সম্বোধনটিও তাঁহার নিজের রসনায় বড় মিষ্ট লাগে, নূতন জীবনের অনেকখানিই যেন এই সম্বন্ধটুকুর মধ্যে জড়াইয়া আছে।

খুব বেশি করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে চণ্ডীচরণ উঠিয়া আসিল। দিদি তখন তামার বড় ঘটিটা মাজিয়া জল ভরিয়া লইবার জন্য আবার জলে নামিয়াছেন, চণ্ডীচরণ কাছে সরিয়া আসিয়া, হাঁপানিটা আরও একটু বাড়াইয়া দিয়া প্রশ্ন করিল—"দেখলে বৌদি?"

অপূর্ব যাহা দেখিয়াছেন আজ সেটার সম্বন্ধে অভিমতটা ব্যক্ত করিবার জন্য গিরিবালার একটা ব্যাকুলতা ছিলই মনে, উপযুক্ত শ্রোতা পাইয়া বলিলেন—"সত্যি, কি আশ্চয্যি ভাই-ঠাকুরপো!"

চণ্ডীচরণ বুকের ওঠা-নামাটা থামাইয়া বুকটা বেশ ভালো করিয়া ফুলাইয়া লইয়া বলিল—"এইতেই তুমি আশ্চয্যি হয়ে গেলে?"

হারজিতের রেষারেষিটা দেওর-ভাজের সম্বন্ধে বোধ হয় আপনি-আপনিই আসিয়া পড়ে, গিরিবালা সামলাইয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া বলিলেন,—"না তেমন আর আশ্চয্যি কি?—আমাদের বড় নদীও কম চওড়া নয় এর চেয়ে, তবে বলছিলাম মা-গঙ্গা যেন..."

একটু ধাঁধায় পড়িয়া গিয়া চুপ করিয়া চণ্ডীচরণ কথাটা বুঝিল, বলিল—"আমি সে কথা বলছি না। আমি এতক্ষণ কী ভয়ানক সাঁতার কাটছিলাম দেখনি?"

গিরিবালা দেখেন নাই, দেখিলেও বুঝিতে পারিতেন—'ভয়ানক সাঁতার কাটা'টা কিনারার কাছে একটা উবুড় করা নৌকার কোণ ধরিয়া পা-ছোঁড়ার অতিরিক্ত কিছু নয়। মুখে, খুব বিস্মিত হইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন,—"তাই নাকি? তুমিই অত সাঁতার কাটছিলে? আমি মনে করি..."

চণ্ডীচরণের মুখটা হাসিতে বিকশিত হইয়া উঠিল, চক্ষু দুইটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মাথাটা উপরে নিচে অল্প দুলাইয়া বলিল—"আমিই তো। গঙ্গার আদ্দেক পর্যন্ত সাঁতরে

BanglaBook.org

মেরে দিতে পারি ; দিদি বকবে যে, নৈলে...”

মনোমোহিনী ঘাট হইতে উঠিয়া আসিলেন। বীরত্বের কাহিনীটা চণ্ডীচরণ কণ্ঠকে একটু মুক্তি দিয়াই আরম্ভ করিয়াছিল, বলিলেন—“ভাজের কাছে বুঝি মন্দাত্তি হচ্ছে? বেশ, সাঁতরে মেরে দিতে পারো তো পেরো'খন, এখন চলো, বেলা হয়ে গেছে।”

অগ্রসর হইতেই একটি বর্ষীয়সী সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাজা মাজা রং, কাঁচা-পাকা চুলের বেশির ভাগই পাকা, সিঁথিতে বেশ চওড়া করিয়া সিঁদুর, কাঁধে রাঙা গামছা, বাঁ হাতে খানিকটা ঘুঁটের ছাই, তাই দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে নামিতেছেন।—

“ইটি কে লো মোনু? বৌ বৌ ঠেকছে যেন।”

মনোমোহিনী দাঁড়াইয়া পড়িলেন, হাসিয়া বলিলেন—“না, বৌ বৌ ঠেকবে কেন? —ঠানদিদির মতন একেবারে পাকা গিন্নি হয়ে আসবে?...এটি যে তোমার নাতবৌ হোল।”

“তাই নাকি?—একদিন কার মুখে শুনলাম যেন মধু ঠিক করতেই এসেছে, তা এত শীগ্‌গির...”

“শীগ্‌গির ব'লে শীগ্‌গির? রাতারাতি একেবারে। একদিন সকালে বাপ এলেন —মেয়ের কুষ্ঠি দেখে বাবা তো মুচ্ছো যাবার উপক্রম। নাকি ভালো লক্ষণ ; দেনা-পাওনা, গয়না-গাঁটির কথা শিকেয় তোলা রইল—তখুনি আশীব্বাদ, তক্ষুনি গায়ে হলুদ, তক্ষুনি বিয়ে—লোকে একটু শাঁকে ফুঁ দিয়েও আহ্লাদ করবে তার ফুরসতটুকু পেলে না! রাজবাড়ির ডাকসাইটে পুরুত তোমাদের ছেলে—তার উপর আর কে কথা কইবে? মুখটি বুজে সব দেখে গেলাম।”

গিরিবালা ভয়ে যেন কাঁটা হইয়া গেলেন। বিবাহের এই হঠকারিতা লইয়া একটু-আধটু ফিস্‌ফিসানি উঠিয়াছে শ্বশুরবাড়িতে। অবশ্য ভগবতীচরণের সিদ্ধান্তে স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ করে এমন মানুষ সংসারটায় নাই কেহ, তবুও মেয়েমহলে এই লইয়া একটু মৃদুগুঞ্জন উঠিয়াছে।—এতে দেনাপাওনা, গয়নাগাঁটির দিকটা একরকম বাদ পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার চেয়েও মেয়েদের যাহা লইয়া দুঃখ, একটা হাঁকডাক করিবার সুবিধা হয় নাই, মাসখানেক ধরিয়া রোদে পিঠ দিয়া বিবাহের আলোচনার সঙ্গে বড়ি-পাতা হয় নাই, তেমনি করিয়া রাত জাগিয়া আনন্দনাড়ুর ঘটা হয় নাই। বাড়ির বড় ছেলে লইয়া সবার বহুদিনের জল্পনা-কল্পনায় পরিপুষ্ট একটা সাধ ছিল, নিরাশ হইয়াছে।

বর্ষীয়সী একটু হাসিলেন, বলিলেন—“মোনুর আমাদের রাগ,—লাখ কথার কমে কেন বিয়ে হোল?...দেখি দিদি মুখখানি তোল তো!...এই তো প্রতিমের মতন দিব্যি মুখের ছাঁদ। পয়মন্ত বৈকি, ভগবতীচরণ সারা তল্লাটটায় বিধান দিচ্ছেন, আর নিজের ভাইপোর বেলায়ই কি ভুল করেন?”

“পয়মন্ত বলতে, তোমার মতন পাকাচুলে সিঁদুর পরতে পারেন তবেই বুঝি পয়মন্ত, আর সব ভুয়ো ঠানদিদি, দেখলাম তো এই বয়সে অনেক...”

আরও তিন চার জন জুটিল। গিরিবালাকে লইয়া আলোচনা, নাইয়া উঠিয়াও গিরিবালা যেন ঘামিয়া উঠিতেছেন। আলোচনা অনুকূলই—ঠানদিদির অভিমতের মতো ঐ একই ছন্দে রচা, তবু একটা ধুকপুকুনি লাগিয়াই থাকে। ছেলেবেলায় সেই কাত্যায়নী দেবীর পরিচিত করিয়া বেড়ানোর চেয়ে অনেকটা আলাদা ব্যাপার, যদিও একই ধরনের। আলাদা এই হিসাবে যে, এখনকার সবার একটি অভিমতের এদিক-ওদিকের উপর

BanglaBook.org

শ্বশুরবাড়ির আদর-অনাদর অনেক পরিমাণে যেন নির্ভর করিতেছে। মুখ দেখাইয়া হাতের আঙুল দেখাইয়া যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অভিমতের অপেক্ষা করিতে হয়।

একটু ছন্দপতন ঘটিলও!—খুব মোটা থলথলে গোছের একটি স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধবধবে ফরসা, কপালটা অতিরিক্ত চাপা, নাকটা খাঁদা, ঠোঁট দুইটা খুব পুরু এবং ঝোলা, দাঁতগুলি একটু উঁচু। মুক্তা পান্নায় বোঝাই টানা-দেওয়া একটা বেশ ফাঁদাল নথ এই নাক, ঠোঁট এবং দন্তপঙ্ক্তিকে বেড়িয়া আছে। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তামাকের গুল দিয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে এইদিকেই পা বাড়াইলেন।

কে একজন অস্ফুটস্বরে বলিল—"ঐ আসছেন!"

একটু তফাত থেকেই গুললিপ্ত তর্জনীটা একটু বাহির করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তোমাদের কিসের মিটিন্ গো?...এই যে আমাদের মোনুও রয়েছে; হ্যাঁলা শুনলাম নাকি সাক্ষাৎ দুগ্‌গোপ্রিতিমের মতন ভাজ করেছিস, সমস্ত সাঁতরাটায় নাকি তেমন..."

আসিয়া পড়িলেন।

"ইটি কে?"

সবাই স্তব্ধ হইয়া রহিল একটু, একজন বলিল—"এইটিই মোনুর ভাজ হয়েছে।"

নবাগতার অতখানি ঠোঁট একদিকে একটি কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া যেন গুটাইয়া গেল। সেইভাবেই গিরিবালার মুখের পানে একটু চাহিয়া মুখটা ফিরাইয়া রহিলেন। বলিলেন—"রাগ করিসনে মোনু, বড় সুখ্যেত নাকি শুনলাম—সবার মুখেই এক কথা, তাই একটু ধোঁকা নেগে গেছল।...অবিশ্যি এমন কিছু নিন্দের নয়, তবে...থাক্ ছেলেমানুষ কষ্ট হবে। খাসা হয়েছে, দিব্যি হয়েছে...তবে ওই একটু আর কি—রংটা আরও অন্ততপক্ষে দু-পোঁচ মাজা হলে মানিয়ে যেত..."

মনোমোহিনীর মুখটা কঠিন হইয়াই গিয়াছিল, একেবারে যেন পাথরের মতো স্পন্দনহীন হইয়া গেল। ক্ষণমাত্র; তাহার পর বলিলেন—"রূটা রঙের তো আমি শুধু এইটুকুই বাহার দেখি রাঙাখুড়ি, যে মুখে গুল থাকলে খোলে চমৎকার।"

সমস্ত দলটা যেন কাষ্ঠপুত্তলিবৎ একেবারে নিশ্চল হইয়া গেল। মনোমোহনী দেবী সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালার হাতটায় খপ্ করিয়া একটা হোঁচকা দিলেন, বলিলেন—"চল্! দেখা নেই, শোনা নেই, একটা কালো কুচ্ছিৎ কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলেন সব; অপ্সরাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে করছিস কি?"

॥ ২ ॥

সমস্ত পথটা গিরিবালার যে কি করিয়া কাটিল বলা যায় না। গঙ্গায় ডুব দিয়া উঠিয়া মনে যে এক অপরূপ আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেটা কখন কি করিয়া যে মিলাইয়া গেল বুঝিতে পারিলেন না। ননদ লইয়া সব মেয়েরেই সংস্কারগত ভয় থাকে, এই দুইটা দিন গিরিবালা তাহার কিছুই নিদর্শন পান নাই, বরং কোন একটি নিগূঢ় টানে এই বিবাহ-বাড়ির ভিড়ের মধ্যে মনোমোহিনী দেবীকেই বেশি জড়াইয়া লেপ্টাইয়া বেড়াইয়াছেন। এই তাহলে আসল রূপ নাকি ননদের?...গিরিবালা ইংরাজী জানেন না। একেবারেই এ-বি-সি পর্যন্ত নয়, তবে একটা অদ্ভুতগোছের আঁটোসাঁটো ইংরাজী কথা তাঁহার—

BanglaBook.org

অদ্ভুতভাবেই মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, মনে মনে সভয়ে আওড়ান মাঝে মাঝে।—অন্নদাচরণেরও ভাইঝির ভাবী ননদ আর শাশুড়ী লইয়া একটা অন্ধভীতি ছিল। বিকাশ যখন কলেজের ছাত্র, একবার বেলে-তেজপুরে আসিয়াছেন, অন্নদা বোধ হয় গিরিবালার ভবিষ্যৎ লইয়াই আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় কি একটা কাজ হাতে করিয়া গিরিবালা ঘরে প্রবেশ করিলেন।...বিকাশদাদা বলিতেছেন—"হ্যাঁ, ননদ নিয়ে আমাদের মেয়ে-বোনের জন্যে একটু দুশ্চিন্তায়ই থাকতে হয় বৈকি। অবশ্য ভালো ননদও যে না আছে এমন নয়—পিসিমাকেও তো দেখছি, তবে স্টাণ্ডার্ড ননদ যা...।"

তাড়াতাড়ি হাতের কাজটা একরকম অসম্পূর্ণ রাখিয়াই গিরিবালা বাহির হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সভয়ে যখনতখন মনের মধ্যে আওড়াইতে আওড়াইতে কথাটা মুখস্থ হইয়া গেছে। এই সেই 'স্ট্যান্ডার্ড' ননদ নাকি? বিবাহটা হঠাৎ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথাটা যেভাবে তুলিলেন তাহাতে একটা চাপা আক্রোশের গন্ধ আছে, আর এই—কালো, কুচ্ছিৎ কোথা থেকে ধরে নিয়ে আসার কথা!...ননদ সম্বন্ধে যত গল্প শুনিয়াছে সে সবের সহিত যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যাইতেছে ; চলিতে গিরিবালার পা উঠিতেছে না।

অথচ অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে চলিতে হইতেছে,—তাঁহার বয়সের পক্ষেও, আবার তাঁহার এই বধূত্বের পক্ষেও ; কারণ মনোমোহিনী দেবী চলিয়াছেন অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে।

পথে এক আধজন কি প্রশ্ন করিল, যেন শুনিতে পাইলেন না, চণ্ডীচরণ এবং গিরিবালা তাল রাখিয়া আসিতে পারিতেছেন কিনা একবার ফিরিয়া দেখিলেন না। নিঃশব্দে এবং ঋজুগতিতে পথ বাহিয়া চলিলেন।

চলিতে চলিতে চণ্ডীচরণ একবার ঘোমটার কাছে মুখ আনিয়া বলিল—"ভয়ানক চটেছেন দিদি, বৌদি।"

গিরিবালা কোন উত্তর দিলেন না, তবে সমস্ত শরীরটা যেন আরও অবসন্ন হইয়া আসিল; মনে শুধু এক চিন্তা—এই তাহলে বিকাশদাদার 'স্ট্যান্ডার্ড' ননদ নাকি?

সমস্ত ব্যাপারটি বৈকালের দিকে স্বরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

মনের কোন নিগূঢ় নির্দেশে—হয়তো লক্ষ্মণের ভূমিকাটা একটু বেশি বলিয়াই, তাহার সঙ্গে বইটা বেশ শক্ত বলিয়াও—চণ্ডীচরণ ভ্রাতৃজায়াকে দুই দিন হইতে বিদ্যাসাগরের "সীতার বনবাস" পড়িয়া শুনাইতেছে। সুবিধা হয় এই বিকালবেলার দিকটায় ; আর সবাই সামান্য একটু জিরাইয়া লইয়া যখন এক একটা কাজ হাতে করিয়া বৌ-ভাতের আয়োজনে বসিয়া যায়, দেওর-ভাজে গিয়া ভগবতীচরণের গৃহে প্রবেশ করেন। ঘরটি নিরিবিলি।

গিরিবালার সঙ্গে সাতকড়ি আর হারাণের বউ আসিয়াছে। হারাণের বউও কাজে লাগিয়া যায়। সাতকড়ি পাড়াগাঁয়ের ছেলে, নূতন জায়গা দেখিয়া বেড়ায়। তাহা ভিন্ন, বৌদিদির সামনে পৌরুষ দেখাইবার সময় চণ্ডীচরণ তাহাকে যথাসম্ভব বাদ দিয়াই চলে। পুরুষের সামনে পৌরুষ তেমন খোলে না।

চণ্ডীচরণ পড়িতেছে—

"সীতা চিত্রপটের এক অংশে দৃষ্টি সংযোগ করিয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলন, বৎস! ঐ যে পর্বতে কুসুমিত কদম্বতরুশাখায় মদমত্ত ময়ূরময়ূরীগণ নৃত্য করিতেছে, আর শীর্ণকলেবর আর্যপুত্র তরুমূলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, তুমি রোদন করিতে

BanglaBook.org

করিতে উঁহাকে ধরিয়া রহিয়াছ, উহার নাম কি? লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্যে! ঐ পর্বতের নাম মাল্যবান, মাল্যবান বর্ষাকালে অতি রমণীয় স্থান; দেখুন, নবজলধর-সংযোগে শিখরদেশে কি অনির্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে! এইস্থানে...”

এক, লক্ষ্মণ পড়িতেছেন আর সীতা শুনিতেছেন এর বেশি বোধ হয় একবর্ণও বুঝিতেছেন না গিরিবালা; কিন্তু লাগিতেছে বড় মিষ্ট। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—“কি বললেন লক্ষ্মণ ঐখানটায় ঠাকুরপো—”

চণ্ডীচরণ পড়িল, “লক্ষ্মণ কহিলেন, আর্যে, ঐ পর্বতের নাম...”

গিরিবালা দেয়ালে পিঠ দিয়া শুনিতেছিলেন, একটু যেন লজ্জিত ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—“আর্যে মানে কি?”

যতটুকু জানে সেটা প্রকাশ করিবার জন্য চণ্ডীচরণ ব্যাকুলই থাকে, বলিল—“আর্যে বৌদিকেও বলে আবার মাকেও বলে, বৌদিদিও একরকম মা কিনা। বড় ভাই যে পিতৃতুল্য।”

গিরিবালা আর একটু যেন সংকুচিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—“সে জানি, তাই তো ওখানটা ‘বৎস’ বললেন সীতা। ‘বৎস’ ছেলেকে বলে,—যাত্রায় শুনেছি; ছেলেকে কিংবা যে ছেলের মতন তাকে, পড়ো।”

চণ্ডীচরণ পড়িয়া চলিল—“এইস্থানে আর্য একান্ত বিকলচিত্ত হইয়াছিলেন। রাম, শুনিয়া পূর্ব অবস্থা স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে একান্ত আকুলহৃদয় হইয়া কহিলেন, বৎস, বিরত হও, বিরত হও, আর তুমি মাল্যবানের উল্লেখ করিও না, শুনিয়া আমার শোকসাগর অনিবার্যবেগে উথলিয়া উঠিতেছে, জানকীবিরহ পুনর্বার নবীনভাব অবলম্বন করিতেছে...”

গিরিবালা শুনিয়া যাইতেছেন, বুঝিবার বালাই নাই বলিয়া মনোযোগেরও তাগিদ নাই; গম্ভীর রচনার মন্দ্রের সঙ্গে ঐ ‘আর্যে’ কথাটুকুকে লইয়া মনে যে এক সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ভাব উঠিয়াছে—এই প্রায় সমবয়সী চণ্ডীচরণকে ঘিরিয়া, সেইটিতে লীন হইয়া গেছেন। নিজের মাকে আর তাঁর মধ্যেকার ভগ্নীকে, আর বধূকে যেন একসঙ্গে অনুভব করিতেছেন।...বাবা জেঠাইমাকে প্রায়ই বলিতেন—“বৌদিদি, তুমি মায়ের তুল্য গুরুজন, তোমার সামনে মিছে কথা বলছি না” অথচ এই ভণিতাটুকু দিয়া মিছা কথাই বলিতেন। ছেলেমানুষ হইলেও গিরিবালা বুঝিতেন—প্রবঞ্চনাটুকুর মধ্যেই ছিল যত মাধুর্য, কেননা ঐটুকু ছিল রহস্য, ঐখানে মায়ের পাশে যেন বধূটি আসিয়া দাঁড়াইত, মা আর বৌদিদির তফাতটা স্পষ্ট হইয়া উঠিত। এই অদ্ভুত সম্বন্ধটি সব মেয়েই গোড়া থেকে বুঝিতে পারে—কামনা করে শ্বশুরবাড়িতে গিয়া দেবর যেন অবশ্যই পায়; ব্রতে পূজায়, প্রার্থনা জানায়—‘লক্ষ্মণের মতন দেওর হোক।’

দেবর থাকিলে নববধূ মাতৃত্বের খানিকটা সঙ্গে করিয়াই সংসারে প্রবেশ করে; চণ্ডীচরণকে গিরিবালার বড় ভালো লাগিয়াছে। ওর মুখের পানে চাহিয়া শুনিয়া যাইতেছেন। প্রীতি আর স্নেহের দুইটি ধারা একসঙ্গে নামিয়া যেন চণ্ডীচরণের সারাদেহে ধীরসঞ্চারে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

চণ্ডীচরণের সঙ্গটুকু আরও বেশি করিয়া ভালো লাগিতেছে,—তাহার কারণ, আজ ওদিকে প্রায় সমস্তক্ষণই গিরিবালার বড় দুশ্চিন্তা আর অশান্তিতে কাটিয়াছে, —ঘাটের

BanglaBook.org

সেই ব্যাপারটুকুর পর থেকে।—মনোমোহিনী সেই যে চুপ করিয়াছেন, প্রায় সেই ভাবেই এখন পর্যন্ত চলিয়াছে। ভগবতীচরণের পূজার জো করিলেন, অন্য সব কাজও করিতেছেন, কিন্তু কথার ভাগ সংঘাতিক রকম অল্প। গিরিবালা—এড়াইয়া চলিতেছেন সর্বদাই সশঙ্ক। এক একবার মনে হইয়াছে হারাণের বউকে কথাটা বলেন, কিন্তু এত লোকের মধ্যে তাহার সুযোগ একেবারে নাই। তাহা ভিন্ন হারাণের বউ কাজে এমন ডুবিয়া রহিয়াছে, তাহকে একটু আড়ালে পাওয়াই অসম্ভব। গিরিবালা ব্যাকুল-সংশয়ে নিজেকে যথাসাধ্য প্রচ্ছন্ন রাখিয়া বেড়াইয়াছেন, সর্বদাই মনে হইয়াছে এইবার যেন কিছু একটা হইয়া পড়িল...

অবশেষে 'সীতার বনবাস' শুনিতে শুনিতে নিজের মনের রসে যখন ডুবিয়া গেছেন একেবারে, সেই সময়টিতে সেই 'কিছু-একটা' ঘটিয়াই বসিল—

কণ্ঠস্বর শুনিয়া গিরিবালা চিনিতে পারিলেন না, বোধ হইল যেন বাহিরেরই কে একজন বারান্দায় প্রবেশ করিতে করিতে বলিল—"হ্যালা মোনু, লাহিড়ি গিন্নিকে কী বলেছিস সকালে আজ গঙ্গার ঘাটে?—সমস্ত পাড়া মাথায় করে বেড়াচ্ছে..."

বই শোনার মাঝে গিরিবালা চকিত হইয়া বলিলেন—"চুপ কর তো ঠাকুরপো একটু।" মুখটা একটু ঘুরাইয়া কান পাতিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই মনোমোহিনী দেবী গর্জন করিয়া উঠিলেন—"বেশ করেছি বলেছি, একশোবার বলব। নতুন বৌটা সঙ্গে ছিল, নইলে ওর কটা রঙের গুমর আজ এমনি করে ভেঙে দিতুম যে, ঐ উঁচু উঁচু দাঁতের সারি বের করে আর ব্যাখ্যানা করে বেড়াতে হোত না এজন্মে। মুখে আগুন, হিংসেতেই গেলেন। যার পায়ের কড়ে আঙুলের কাছে দাঁড়াবার মুরোদ নেই, রং নিয়ে তার ব্যাখ্যানা করতে এলেন! বুড়ো বয়সে লজ্জাও তো করল না একটু, একটা কচি কনে-বৌয়ের হিংসে করতে!...নেই সাঁতরায় এরকম বৌ, আসেনি বৌ এরকম,—এই আমি গলা ধরলাম, এগুক কে এগুবে! এতবড় সাঁতরার কথা ছেড়ে ও নিজের বৌয়ের গায়ে হাত দিয়ে বলে না কেন? এককাঁড়ি টাকার লোভে যে একটা কালপেঁচি এনে অমন ব্যাটার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, তার কি? ওর কটা রঙের আলোয় বুঝি সেও সুন্দর হয়ে গেল? মুখে আগুন, খেঁদানাকী, পুকুরকপালী আবার একমুখ গুল নিয়ে গদাই-লস্করী চালে হেলতে দুলতে এসে—'রংটা আরও দু'পোঁচ মাজা হলে মানাসই হোত।'...তোর মাজা রঙের নিকুচি করেছে! আবার কাঁদুনি গেয়ে বেড়াচ্ছেন—'মোনু আমায় বললে—' মোনুর বলতে যে এখনও সবই বাকি, বৌভাতের কাজটা একবারে চুকে যাক, তারপর..."

এমন সময় গলিতে একটা গলার উগ্র ঝাঁজ শোনা গেল। ভগবতীচরণ বাড়ি ফিরিতেছেন, কোথায় পরিচ্ছন্নতার কি ত্রুটি বোধ হয় দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, গর্জাইতে গর্জাইতে আসিতেছেন—'এ অনাচার হিঁদুর পল্লীতে—ব্রাহ্মণের পল্লীতে সইবে না—একেবারে পথ চলবার যো নেই! লক্ষ্মীও তাই চঞ্চলা হয়ে উঠেছেন পাড়ার মধ্যে। হবেন না? ব্রাহ্মণপল্লীকে লোকে ব্রাহ্মণপল্লী বলে চিনতে পারে না, এমনি অবস্থা করে তুলেছে..."

বাড়ির মধ্যে সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন— "ওরে দেখ সব ঠিক আছে কিনা।...বৌমা কোথায় গেল, উঠে দেখ বাছা, তোমার শ্বশুর আসছেন, চেঁচাতে চেঁচাতে আসছেন—অনখর উপর অনথ বাধবে...চুপ কর্ মোনু, একটা লোক তেতেপুড়ে আসছে..."

BanglaBook.org

গিরিবালা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"এখন থাক্ ঠাকুরপো, অন্য সময় শুনব'খন। কি চমৎকার গল্প ভাই, না?"

মনোমোহিনী দেবী মায়ের কথায় গলা আরও একটু বাড়াইয়া দিলেন, বলিলেন—"করব না তো চুপ, এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক, আমি যে পথে বেরুতেই আবাগিদের ট্যাঁশটেঁশে কথা শুনব তা পারব না!"

কাজের বাড়িতে—সে-বাড়ি স্বয়ং ভগবতীচরণের হইলেও—অগোছ-অপরিচ্ছন্নতার জন্য বেশি খোঁজাখুঁজি করিতে হয় না, তবু দরজায় প্রবেশ করা মাত্রই ভগবতীচরণ একেবারে চুপ করিয়া গেলেন। গিরিবালা গাড়ু, গামছা লইয়া প্রস্তুতই ছিলেন, ভগবতীচরণ রকে উঠিয়া হাত পা ধুইয়া খড়ম পরিয়া নীরবে নিজের ঘরে গিয়া বসিলেন, গিরিবালা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

মনোমোহিনী দেবী ওদিকে বিনাইয়া বিনাইয়া বকিয়া যাইতেছেন, গলা এতটুকুও খাদে নামে নাই।

ভগবতীচরণ একবার প্রশ্ন করলেন—"কি হয়েছে মা, মোনু এত রাগলে কার উপর?"

নিজের সম্পর্কেই বলিয়া—গিরিবালা একটু লজ্জিতভাবে উত্তর করিলেন, "কি জানি জেঠমশাই!"

ভগবতীচরণ ব্যাপারটা যে আন্দাজ করিতে পারেন নাই এমন নয়, ডাকিলেন—"হ্যাঁরে, কি হয়েছে? অ মোনু, শোন্ তো!"

মনোমোহিনী দেবী একটু আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন,—"হয়নি কিছু! তোমরা দেখবে না শুনবে না, কালোকুচ্ছিৎ, খাঁদাবোঁচা সব ধরে ধরে নিয়ে এসে ছেলের বিয়ে দিবে; বলবে না লোকে? একশোবার বলবে! কিন্তু আমায় কেন?—যারা করেছে তাদের বলুক।..."

গিরিবালা যে অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন ভগবতীচরণের সেটা চক্ষু এড়াইল না। বলিলেন, "এই কথা? আচ্ছা তুই একবার পাখাটা নে দিকিনি, বৌমা ছেলেমানুষ, হাত ব্যথা হয়ে গেছে। তুমি এসো তো মা, আমার কাছে বসো।"

গিরিবালা পাশে আসিয়া বসিলে তাহার মাথাটি কাঁধে চাপিয়া ধীরকণ্ঠে কন্যাকে প্রশ্ন করিলেন—"সত্যিই কি কলোকুচ্ছিৎ খাদাবোঁচা এনেছি? তুই-ই বল। এই বছর খানেকের ভিতর এতগুলো বিয়ে হ'ল সাঁতরায়—কোন্ কনেটা..."

মনোমোহিনীর গলাটা একটু নরম হইয়াছে, কিন্তু ঝাঁজ যায় নাই, বলিলেন—"তুমি ন্যাকা সেজ না বাবা, ঐটি আমার অসহ্যি, কেন, সাতপুরুষ ধরে বাস কচ্ছ সাঁতরায়, এখানকার মানুষ চেন না? যত ভালো নিয়ে আসবে, তত বেশি যে এখানকার লোকের বুক কর্ কর্ করবে। যদি দেবকন্যে নিয়ে আসতে..."

বুকের কাছে গিরিবালা যে আর নিজেকে সামলাইতে পারিতেছিলেন না সেটা ভগবতীচরণ খুব ভালোরকমই টের পাইতেছিলেন, সান্ত্বনাচ্ছলে মাথায় দক্ষিণ হাতটা বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"দেবকন্যাই তো নিয়ে এসেছি, এর মধ্যে আর 'যদি' কি আছে? দেবকন্যা না হলে..."

কিন্তু ফল হইল উল্টা। গঙ্গার ঘাটে উদ্বেগ-আকাঙ্ক্ষা-অভিমানে যে-অশ্রু ঠেলিয়া

BanglaBook.org

উঠিয়াছিল, সংসারে ছোট বড় কাজে, সেবায়, আদরে যে-অশ্রু ব্যাহত হইয়া ভিতরে ভিতরে বোধ হয় আরও বেশি করিয়াই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল তাহাকে আর রুখিয়া রাখা গেল না। শ্বশুরের কাঁধে মুখ লুকাইয়া গিরিবালা অসংবৃতভাবেই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

ভগবতীচরণের মুখের শান্তভাবটা একেবারে বদলাইয়া গেল। অবশ্য চুপ করিয়া রহিলেন, তবে মুখ চোখ যেন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। খানিকটা সেই ভাবেই একদৃষ্টে সামনে চাহিয়া থাকিয়া নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইলেন, গিরিবালার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"চুপ করো মা, চুপ করো ; ছোট মন সব..."

একটু পরে কন্যাকে একটু বিরক্তির সহিতই কহিলেন,—"মেয়েরা কে কি বলে আমায় শোনাস কেন মা? পুরুষ হলে ঘাড় ধরে মাটি চাটাতাম ; স্ত্রীলোকের সঙ্গে তো আর...যত সব নীচ প্রবৃত্তি, হিংসা, দ্বেষ!"

—বলিতে বলিতেই আবার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল।

বাড়িতে বাপ আর মেয়ের এক প্রকৃতি,—কোপনস্বভাব, অসহনশীল। বাঁচোয়া এইখানে যে, একজনকে বেশি রাগিতে দেখিলে অপর জনের রাগ পাড়িয়া যায় ; সামলাইবার জন্য তৎপর হইয়া উঠেন।

মনোমোহিনী তাড়াতাড়ি বলিলেন—"শোনাতে যাব কেন? তুমি এসেছ কি জানি? তাহলে চুপ করেই যেতাম। লাহিড়ি-গিন্নির কথায় নাকি আবার মানষে কান দেয়!...বৌ, বাবার মিছরির পানাটা একটু নেবু দিয়ে নিয়ে আয় ; বাড়ির বড় বৌ হয়ে এসেছেন, তাঁর নাকি বসে বসে কাঁদলে চলে!"

হাতটা ধরিয়া ধীরে ধীরে অন্য ঘরে লইয়া গেলেন।

॥ ৩ ॥

অশ্রু যে এই রকম একটু আধটু না আছে এমন নয়—অভিমান, দুশ্চিন্তা, তাহার উপর একটা মুক্ত জীবন থেকে এই বন্ধন ; শুধু দৃষ্টির উপরই নয়, সমস্ত জীবনটার উপরই এই অবগুণ্ঠন,—অশ্রু আছে বৈকি ; কখনও মনেই জমিয়া থাকে, কখনও আবার নয়ন-পল্লবকেও করিয়া তোলে সিক্ত। তবুও কিন্তু গিরিবালার চৈতন্য যে একটি নতুন ভাবের মধ্যে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, তাঁহার জীবনের দিকবলয় যে বিস্তীর্ণতর হইয়া উঠিয়াছে এটুকু তিনি বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করিতে পারেন। বৌভাতের আয়োজন হইতেছে, এত বড় একটা ব্যাপার যে তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই অনুভূতিটা এক-এক সময় মনের কোথায় যেন পুলকরোমাঞ্চ জাগায়। অবশ্য বেলে-তেজপুরের ব্যাপারটার মাঝখানেও তিনি ছিলেন, কিন্তু তার আকস্মিকতায় অভিভূত হইয়া ; অনুভব করার অবসর পান নাই। তা ভিন্ন মা বাপের কাছে থাকিলে বোধ হয় নিজেকে বড় আলাদা করিয়া অনুভব করা যায়ও না।

আয়োজনের ব্যস্ততায়, ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য বকাবকিতে বাড়িটা গমগম করিতেছে, দেখিতে দেখিতে ঘর দুয়ার হইয়া উঠিতেছে পূর্ণ, আর এতসব দ্রব্যসামগ্রীর উপর একটি অধিকারবোধ জাগিয়া উঠিয়া নিজেকে বোধ হইতেছে বড়, সমৃদ্ধ।

শুধু উৎসবের মধ্যেই নয় তো, মনে যে একটি নূতন স্পন্দন জাগিয়াছে, সাঁতরা সব দিক দিয়াই সেটাকে পুষ্ট করিতেছে। গঙ্গার ঘাটে সেই অপূর্ব অভিজ্ঞতা—একটা যেন নূতন জগতেরই খানিকটা হঠাৎ দেখিয়া ফেলা ; শুধু কি তাই—এখানে আসিয়া প্রকাণ্ড দেয়াল-আরশিতে নিজের যে প্রতিচ্ছবিটা দেখিলেন প্রথম—সেটা পর্যন্ত এই নবমহিমান্বিত জীবনের সঙ্গে একসুরে বাঁধা—সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূর, দেহে একগা গহনা, —নিজের সম্বন্ধে ওকথা ভাবিতে নাই, কিন্তু প্রতিবিম্বটা আচমকা দেখিয়া মনে হইল একটি যেন দেবীমূর্তি আসিয়া পিছনটিতে দাঁড়াইল, বিস্ময়ে একবার ঘুরিয়া দৃষ্টিক্ষেপও করিতে হইয়াছিল।

সাঁতরা যেন বন্ধন হইয়াও মুক্তি। বেলে-তেজপুরের মুক্তির মধ্যে শুধু বেলে-তেজপুরকেই খুঁটিয়া খুঁটিয়া পাওয়া যাইত ; সাঁতরার বন্ধনের মধ্যেও গিরিবালা ক্রমেই একটা বড় জগতের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছেন।

এসবের সঙ্গে ঠিক একই সুরে বাঁধা সাঁতরার বাড়ির পূজাটি। প্রতিদিন ধূপ, ধুনা, সাজিভরা নানারকম ফুল, প্রচুর নৈবেদ্য আর রাঁধা ভোগ দিয়া নারায়ণের পূজা হয়, আরতির সময়ে বাড়ির যে যেখানে থাকে আসিয়া সম্ভ্রমের সহিত ঘিরিয়া দাঁড়ায়, শেষ হইলে প্রণাম করিয়া মনের মধ্যে কি যেন খানিকটা বহন করিয়া স্থির মৌনতায় নিজের নিজের কাজে চলিয়া যায়। বড় আশ্চর্য এবং চমৎকার লাগে গিরিবালার। পূজা করেন ভগবতীচরণ। নিজে সংস্কৃতজ্ঞ খুব বড় পুরোহিত ; শুদ্ধ উদাত্ত মন্ত্রোচ্চারণে, ভক্তির একটি অপার্থিব জ্যোতিতে এমন একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন যে, দেবতাকে যেন নামাইয়া আনিয়াছেন। পূজার সমস্ত আয়োজনটি করেন মনোমোহিনী দেবী, খুব সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া। এই অনুষ্ঠানটির সঙ্গে খুব নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে গিরিবালার মনে একটা প্রবল আকূতি জাগে। সঙ্কোচ কাটাইয়া কাহাকেও মনের কথাটা বলিতে পারেন না, শুধু পূজা আরম্ভ হইয়া গেলে ধূপদানির সামনে বসিয়া অভঙ্গনিষ্ঠায় ধুনার যোগান দিয়া যায়।

বেলে-তেজপুর থেকে আসিবার দিনপাঁচেক পরের কথা। পূর্বরাত্রে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঝাড়া, বাছা, গোছান লইয়া কাটিয়াছিল ; মনোমাহিনী দেবীর মাথাটা ধরিয়াছে, উঠিতে পারিলেন না। গিরিবালাকে ডাকিয়া বলিলেন—“বৌ, তুই চট করে নিয়ে নে ভাই ; বাবার পুজোর যোগাড়টা তুই-ই কর আজ ; পারবি তো? আমার মাথাটা ধরেছে একটু।”

গিরিবালা খুব বড় করিয়া ঘাড় নাড়িলেন, এতবড় সৌভাগ্য যে নিজেই পথ করিয়া আসিবে এ তাঁহার ধারণারও বাহিরে।

মনোমোহিনী দেবী বলিলেন— “তুই ঠাই করে ফুল-নৈবিদ্যিগুলো সাজিয়ে দিবি ; ভোগের দিকে তোকে দেখতে হবে না ; সে মা-ই ঠিক সময়ে দিয়ে যাবেন। দেখ, পারিস তো বল।”

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—“পারব না কেন ঠাকুরঝি? খুব পারব।”

এ দায়িত্বপূর্ণ অভীপ্সিত কাজটুকু পাইয়া তাহার মনটা যেন নিজের মধ্যে আঁটিয়া উঠিতেছে না। সংসারের প্রয়োজনীয়তার একেবারে যেন কয়েক স্তর উঠিয়া গেছেন। বলিলেন, “তুমি একটু ভালো করে ঘুমোও ততক্ষণ। জেঠামশাইয়ের পুজোটা হয়ে গেলেই আমি এসে তোমার মাথাটা টিপে দিচ্ছি।”

BanglaBook.org

যাইতে যাইতে দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া বলিলেন—"আচ্ছা ঠাকুরঝি, দুই রগে একটু আপিন টিপে রাখলে কেমন হয়? ছোট্ট গোল করে কাগজ কেটে, তাতে আপিন লাগিয়ে..."

মুখখানি উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মনোমোহিনী বলিলেন—"আঃ, এ ঠানদিদিকে নিয়ে কি করি বলো দিকিন! তোকে যা বললাম তাই কর্‌গে যা তো। আপিন রগে টিপবো কি, আমার গুলে খেতে ইচ্ছে কচ্ছে তোর গিন্নিত্বের জ্বালায়!"

গিরিবালা অল্প একটু হাসি মুখে লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। স্নান করিয়া একখানা লালপেড়ে গরদ পরিয়া চন্দন ঘষিতেছেন, ফুল বিল্বপত্র আসিল। এ ভারটা চণ্ডীচরণের উপব.; আজকাল সাতু তাহার সঙ্গী জুটিয়াছে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, গাছে চড়ায় দক্ষ, তাই আপোস ব্যবস্থায় বিল্বপত্র চয়নের ভারটা পড়িয়াছে তাহারই উপর। কোঁচড় ভর্তি করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, গিরিবালাকে একলা পূজার চার্জে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল—"দিদি তুই আজ পূজোর জো করছিস?"

গিরিবাবা বাঁ হাতটি চন্দনকাঠের উপর রাখিয়া সেটি আবার ডান হাতে টিপিয়া ধরিয়া যথাপদ্ধতি চন্দন ঘষিতেছিলেন, হাত থামাইয়া যেন এমন কিছুই আশ্চর্য হইবার ব্যাপার হয় নাই এই ভাবে বলিলেন—"শুনছ কথা সাতুর ঠাকুরপো? ঠাকুরঝির শরীর খারাপ, আর কে করবে শুনি?"

বড় হইলেও সাতুর কথার ঢো'টা বদলায় নাই, বোধ হয় অত বড় আর অত রাগী মনোমোহিনী দেবীর পরেই দিদির আসন হইয়াছে দেখিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল —"উরে ব্বাস্‌রে!"

সাতুর এই উচ্ছ্বাসগুলি প্রায়ই অসঙ্গত হয় বলিয়া চণ্ডীচরণের বড় কৌতুক বোধ হয়, মুখ ঘুরাইয়া তাহার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—"আবার সেই উরে ব্বাস্‌রে!"

কোঁচড় উজাড় করিয়া দুইজনে হাসিতে হাসিতে কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

গিরিবালা অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ঢালিয়া আয়োজন করিতে লাগিলেন। অন্যদিনের চেয়ে আরও বেশি করিয়া বোধ হয় আরও ঘন করিয়া দুইরকম চন্দন ঘষিয়া চন্দনপাত্র ভরিয়া দিলেন, নিখুঁতভাবে ধুইয়া ফুল বিল্বপত্র, দুটা আলোচাল আলাদা আলাদা করিয়া পুষ্পপাত্রে সাজাইয়া রাখিলেন। পরাতে খুব নিখুঁত করিয়া আলোচালের চূড়া রচনা করিয়া নৈবেদ্য সাজাইলেন।...বাহিরে কে একজন প্রশ্ন করিল—"হ্যাগা মোনু পড়ে, পুজোর জো কে ক্করছে?"

উত্তর হইল, "বৌমা।"

"পারবে তো, ছেলেমানুষ!"

কি অভিমতটা হয় জানিবার জন্য গিরিবালা হাত থামাইলেন। উত্তর হইল—"তা সেয়ানা আছেন, সব কাজই তো করছেন টুকটাক করে।"

গিরিবালা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়া গেলেন। সাজান উপচারগুলি আরও নরম আঙুলে গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন, আলোচালের চূড়া আরও সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিলেন; আরও কি করিবেন, প্রতিদিনের আয়োজনের উপর কি করিয়া একটু বিশিষ্টতা ফুটাইবেন ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিতে লাগিলেন।...ইচ্ছাটা, জেঠশ্বশুর আসিয়া তাঁহাকে আয়োজন-

BanglaBook.org

নিরতা দেখেন, তাহা হইলে পূজা করিতে বসিয়া বিস্মিত প্রশ্ন করিতে হইবে না—"আজ এমন চমৎকার আয়োজন কে করলে মা?"...সে যে আবার ভীষণ লজ্জায় পড়িয়া যাইবেন গিরিবালা!

শ্বশুরের যেন আজ বেশি বিলম্ব হইতেছে, দিন বুঝিয়া। গিরিবালা ওদিককার কাজটুকু আর কোন মতেই টানিয়া বাড়াইতে না পারিয়া উঠিয়া আসিয়া প্রদীপ আর ধুনার ব্যবস্থা লইয়া বসিলেন। ধুনুচিতে ঘুঁটের আগুন সাজাইয়া পাখা উঠাইয়াছেন, গলিতে ভগবতীচরণের গলার স্বর শুনা গেল, পাড়ার অশুচিতার জন্য অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে আসিতেছেন। বাড়িতে একটু সাড়া পড়িয়া গেল—"ঐ আসছেন...গাড়ু গামছা ঠিক আছে তো?...গৈলের দিকে কে আছে?...বিন্দি, ঝাঁটাটা সামনে থেকে সরিয়ে রাখ্...বঁটিটা কে দাঁড় করিয়ে গেছে গা, আঃ!..."

কাজের বাড়িতে অল্প একটু অপরিচ্ছন্নতার কথা বোধ হয় ধরিয়া লইয়াই ভগবতীচরণ দুইদিন থেকে আর কোনদিকে না চাহিয়া পা দুইয়া একেবারে সোজা পূজার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। ভিতরে আসিলে গিরিবালা বলিলেন—"আজ আপনার একটু দেরি হয়ে গেল জেঠামশাই?"

"হ্যাঁ মা হয়ে গেল একটু দেরি, আর বল কেন? যা সব কাণ্ড, এক পা পথ চলবার জো আছে?"

আসন গ্রহণ করিলেন। গিরিবালা ধুনুচিতে ধুনা ছাড়িয়া দিলেন। আচমনের জন্য গণ্ডূষ তুলিয়াই কিন্তু ভগবতীচরণ হাতটা ধীরে ধীরে নামাইয়া লইলেন ; সমস্ত শরীরটা যেন শুষ্ক হইয়া কাঠের মতো কঠিন হইয়া উঠিল, রুক্ষস্বরে ডাকিলেন—"কোথায় গেলে? শোনো একবার।"

গিরিবালা বিস্মিতভাবে মুখের পানে একবার চাহিয়া আতঙ্কে দৃষ্টি নত করিলেন।

গৃহিণী হাতটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাড়াতাড়ি আসিয়া দরজায় দাঁড়াইলেন, বাড়ির সমস্ত শব্দ একেবারে থামিয়া গেল, সকলে সব কাজ ছাড়িয়া পা টিপিয়া টিপিয়া ভিতর বারান্দায় এখানে ওখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ভগবতীচরণ হাতের জলটা ফেলিয়া দিলেন, দুয়ারের পানে ঘাড়টা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"মোনু আজ পুজোর জো করে নি?"

গৃহিণী বলিলেন—"না, তার মাথাটা ধরেছে তাই..."

ভগবতীচরণ একেবারে ঝাঁজিয়া উঠিলেন—"মাথা ধরেছে তো এতবড় সংসারটায় পুজোর আয়োজন করতে কেউ জানে না? যেমন পাড়ার অবস্থা তেমনি কি বাড়ির অবস্থাও হয়ে উঠেছে?"

গিরিবালা গুটাইয়া একেবারে আড়ষ্ঠ হইয়া গেলেন ; মাত্র একটি বোধ আছে, সমস্ত শরীরটা অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

গৃহিণী শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কি হয়েছে যে...?"

"কিচ্ছু হয়নি! তোমাদের নজরে কিচ্ছু হয়নি, কিন্তু ভগবতী ভট্টাচার্য্যির বাড়ির লোকের জানা উচিত যে, এ-বিল্বিপত্রেও পুজো হয় না, এ দুর্বোতেও পুজো হয় না।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে এক খাবলা বিল্বপত্র গোটাকতক দূর্বা সামনে ফেলিয়া দিলেন। গৃহিণী সামনে আসিয়া ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিলেন—"তা ছেলেমানুষ, অত জ্ঞান

BanglaBook.org

হয়নি যে দ্বিপত্রী বিল্বিপত্র আর তিনপাতের বেশি দূর্বো পুজোয় চলে না। দিচ্ছি বেছে, আসন ছেড়ে উঠো না...”

“ছেলেমানুষ! আর কাউকে বুঝি পেলে না যে শেষে চণ্ডেকে দিয়ে...”

বলিতে বলিতেই গিরিবালার উপর নজর পড়িয়া গেল, বোধ হয় পত্নীর ইশারা লক্ষ্য করিয়াই। মুখটা রাঙা হইয়া বুকের উপর লুটাইয়া গেছে, পাখা হাতে ডান হাতটা আস্তে আস্তে কাঁপিতেছে, শরীরে যেন নিঃশ্বাস লওয়ার স্পন্দনটুকুও নাই। কাঁদিতেছেন না, —সেটা নিশ্চয় অবস্থাটা কান্নার অতীত বলিয়া।

ভগবতীচরণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিত তাঁহার মুখের উপর এক একবার একটা ছায়া পড়িতেছে—যেন একটা মর্মন্তুদ যন্ত্রণাকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। গিরিবালাকে একটিও আশ্বাসের কথা বলিলেন না, চুপ করিয়া আসনটিতে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে মুখের ভাবটা ধীরে ধীরে বদলাইয়া গেল, যন্ত্রণার রেখাগুলি মিলাইয়া গিয়া সমস্ত মুখটা শান্ত হইয়া আসিল। কিন্তু বড় অন্যমনস্ক হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিল, আরও কতক্ষণ কাটিত বলা যায় না, গৃহিণী আসিয়া দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া বলিলেন—“দাও কুষি করে একটু গঙ্গার জল, হাতটা ধুয়ে ফেলি।”

—কুয়ার জলেই তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া গরদের কাপড় পরিয়া চলিয়া আসিয়াছেন।

ভগবতীচরণ যেন একটা ঘোর থেকে উঠিলেন, প্রশ্ন করিলেন—“কেন?”

“দুব্বো বিল্বিপত্রগুলো ঠিক করে দিই।”

“ও! নাঃ, ঠিক করবার আর কি আছে? যাও তুমি।”

আচমনের জন্য জল তুলিয়া গিরিবালাকে বলিলেন—“প্রদীপটা জ্বেলে দাও তো মা।”

তাহার পর আচমন করিয়া পূজা শুরু করিয়া দিলেন। সেদিন একটা ভয় লাগিয়া ছিল বলিয়া গিরিবালা অনেকবার চোখ তুলিয়া শ্বশুরের মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, —যতবারই দেখিলেন মনে হইল মুখটা যেন আরও বেশি করিয়া প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, বড় আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল।

গিরিবালা ছেলেদের বলিতেন—“আরও আশ্চর্য যে অমন রাগী, অমন খুঁতখুঁতে তো?—সে সব যেন একদিনেই কোথায় চলে গেল! অবিশ্যি তখন বাড়িতে কাজের ভিড়, অতটা কেউ লক্ষ্য করেনি, আমি পাণ্ডুল যাবার মুখে আবার যখন সাঁতরায় এলাম, ঠাকুরঝির আমায় নিয়ে কী টানাটানি!

বল্, কি মন্ত্র জানিস? আমি অত খিটখিট করে যাঁর স্বভাব বদলাতে পারিনি, পাড়ার লোকে অত সাবধান হয়েও যাঁকে একদিনের তরেও ঠাণ্ডা রাখতে পারলে না, তুই নিজে দাবড়ানি খেয়ে তাঁর ওপর কী মন্তর ঝাড়লি যে, একেবারে সে মানুষই নেই!...সে টানাটানি ঝুলোঝুলি যদি দেখতিস!” গিরিবালা হাসিতে হাসিতে ছেলেদের বলেন—“হ্যাঁরে, আমি মন্তর কি দোব বল্ দিকিন? ভয়ঙ্কর ভালবাসতেন আমায়, দেখলেন ছেলেমানুষ ভয়ে আঁৎকে গেছি, মনে বোধ হয় খুব লাগল, সেই থেকে বকা-ঝকা ছেড়ে দিলেন। মানুষ তো অমন হয় না, যেমন পণ্ডিত, তেমনি তেজী, তেমনি পরের উপকার করতে ; ঐটুকু বোধ হয় একটু খুঁত ছিল—তাও খুঁতই বা কি?—নিজের জন্যে কেউ একটা কথা কখনও

মুখে আনতে শোনে নি—তা সেটুকুও ছেড়ে দিলেন। অমন হঠাৎ কি পারে না ছাড়তে লোকে? কাকা কি করে তামাক খাওয়া ছাড়লেন একদিনে?"

সে-স্মৃতিতে গিরিবারা একেবারে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিতেন, বলিতেন—"পাগুলের কথা; তোর সেজপিসীর বিয়ের সময়। একে ঠাকুরপো এমনই ভয়ানক অন্যমনস্ক স্বভাবের লোক, তায় বিয়ের গোলমালে কোনদিকেই খেয়াল নেই—একেবারে হুঁকা টানতে টানতে আমাদের ঘরে উপস্থিত! আমি তো একেবারে থ হয়ে গেছি, একি কাণ্ড!—বড় ভাইয়ের সামনে একেবারে হুঁকো টানতে টানতে—তাও—ঠাকুরপোর মতো মানুষ! উনিও কি রকম হয়ে গিয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছেন—ঠাকুরপো, বরযাত্রীদের সঙ্গে কি নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়েছে তাই শুনিয়ে আস্ফালন করে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে কে একজন নাকি ভয়ঙ্কর লম্বা আর বদমাইস—বরের কোন বন্ধু—সেইটে দেখাতে যেমন হাত তুলবেন মশারির দড়িতে কলকেটা লেগে ছিট্‌কে একেবারে ওঁর দাদার পায়ের কাছে...ঠাকুরপো চমক ভাঙতেই তো পড়ি-তো-মরি করে ঘর থেকে ছুট, আমরা আগুন সামলাব কি হাসব—উফ্!..."

গিরিবালা আবার হাসিতে ভাঙিয়া পড়েন। একটু পরে নিরস্ত হইয়া আবার সাঁতরার স্মৃতিতে যান ডুবিয়া। বলেন—"ঠাকুরপোর এটা যেন হাসির কথা, তোদের বড় দাদু কিন্তু আমায় বড় ভালোবাসতেন বলেই দিলেন ছেড়ে অব্যেসটা—বোধ হয় মনে হল আহা, ছেলেমানুষ, চেষ্টার তো কসুর করে নি, বড্ড লেগেছে মনে; বকাঝকার ওপরই কেমন একটা ঘেন্না ধ'রে গেল।"

॥ ৪ ॥

কাল বৌভাত, কাজটা খুব বড় হইবে বলিয়াই কয়েকদিন বিলম্ব হইল। একে একে সবাই কর্মের আবর্তের মধ্যে টানা পড়িতেছে, গিরিবালা পড়িয়া গেছেন একা। চণ্ডীচরণের পর্যন্ত "সীতার বনবাস" পড়িবার অবসর নাই। সাতু কখন কখন তেমন অসধারণ কিছু ব্যাপার হইলে দিদির কাছে তাহার নিজের পদ্ধতিতে রিপোর্ট দিতে আসিতেছে, দিয়া তখনই আবার নতুন বিস্ময় সংগ্রহে ছুটিয়া যাইতেছে!..."এই এত বড় বড় সাতাশটা রুই!—রাঙা টকটকে—উরে ব্বাসরে!...এগারো'শ লোক হবে,—হ্যাঁ, আমি নিজের কানে শুনলাম; তোর শ্বশুরবাড়ি কি বড়লোক দিদি!" দিদি হয়তো বলেন—"চুপ কর সাতু, খুঁড়তে আছে অমন করে?" সাতু একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়ে। তখনই কিন্তু হাসিতে মুখটা উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, বলে—"ব্বাসরে! দিদির গায়ে লাগে!"

বৈকালের দিকে সাতুর আসাও বন্ধ হইয়া গেল। এই নিঃসঙ্গতাকে আরও প্রগাঢ় করিয়া তুলিল আকাশের অবস্থা। একটু একটু করিয়া বেশ মেঘ জমিয়া আসিল; বাড়ির মধ্যে ত্রস্ত ভাবটা বাড়িয়া গেল, চারিদিকে জিনিসপত্র ছত্রাকার হইয়া রহিয়াছে। গিরিবালা একটু বাহিরে আসিয়া সাধ্যমত গুছাইয়া তুলিতে লাগিলেন। হারাণের বৌ একবার কাজের ছুতা করিয়া একটু ঘেঁষিয়া আসিল; চাপা গলায় বলিল—"নিজের কাজে অত খাটতে আছে নাকি? বোস গে; নিন্দে হবে যে!"

গিরিবালা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। মনটা যেন আরও নিজের মধ্যে গুটাইয়া

BanglaBook.org

গেল। উপরে উঠিয়া ছাতের কাছাকাছি সিঁড়ির একটা ধাপে গিয়া বসিয়া পড়িলেন। ছড়্-ছড়্ করিয়া তফাতে খুব বড় বড় ফোঁটায় এক আছড়া বৃষ্টি হইয়া গেল, তারপর একটু বিরাম দিয়াই বেশ সজোরে নামিল।

এই কয়টা দিন যেন একটা প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে কাটিয়াছে,—অপরিচয়ের আশঙ্কার সঙ্গে নব পরিচয়ের আনন্দ, নিত্য-প্রশংসার পাশে পাশে নিন্দার সম্ভাবনার জন্য উদ্বেগ ; সম্মুখে প্রসারিত নূতন জীবন লইয়া আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিস্ময়, সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানিত ভয়...আদরে অশ্রুতে একটা ঘনীভূত চেতনার যুগ। মন থেকে দৃষ্টি সরাইলে বাহিরের কর্মকোলাহল, সেখান থেকে দৃষ্টি সরাইলে এই অনুভূতি-ঘন চেতনা ; একটি যেন নূতন সত্তা।

আজ এই প্রথম একটি প্রশস্ত অবসরের মধ্যে গিরিবালা নিজেকে লইয়া বসিতে পাইলেন। চারিদিকে বর্ষা দিয়ে ঘেরা সিঁড়ির এই জায়গাটুকুতে নিজেকে যেন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পাওয়া গেল। বড় অসহায় বলিয়া বোধ হইল গিরিবালার, কয়টা দিনে যেন কোথা হইতে কোথায় আসিয়া গেছেন, নির্দিষ্ট কোন কারণ না থাকিলেও মনটা হু হু করিতে লাগিল। কিছু বুঝিতে পারেন না, শুধু একটা অবোধ ব্যাকুলতা, একটা অকারণ কান্না ঘনাইয়া উঠিতেছে মনে। এই নিতান্ত অসহায় অবস্থায় যেন একটা অবলম্বন না হইলেই নয়। অথচ কিসের জন্য অসহায়তা, কী-সে অবলম্বন কিছুই বোঝা যায় না।

হঠাৎ এই বৃষ্টির ওপারে একটা আলোর আভাস ফুটিয়া উঠিল, মায়ের হাতে প্রদীপ, আঁচলে আড়াল দিয়া মা রান্নাঘর থেকে পাশেই ভাঁড়ার ঘরে প্রবেশ করিতেছেন। দরজার মুখে দাঁড়াইয়া ও-দাওয়া থেকে বলিতেছেন—"গিরি, দোলাইটা গায়ে দিয়ে নে, আজ একটু গা'টা তেতেছিল তোর।"

বেলে-তেজপুরের কবেকার একটি অর্ধ-বিস্মৃত সন্ধ্যা,—বর্ষাসিক্ত পথে মায়ের বুকের বেদনা উদ্বেগ বহন করিয়া আচমকা আসিয়া পড়িয়াছে। ঝর্ ঝর্ করিয়া গিরিবালার চক্ষে বন্যা নামিল। মনটাকে অশ্রুর পথেই উন্মুক্ত করিয়া দিয়া গিরিবালা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া শুধু কাঁদিলেন—বেশ অনেকক্ষণ ; তাহার পর অঞ্চলের খানিকটা দিয়া মুখটা ঢাকিয়া ঝাপসা আকাশের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

বেলে-তেজপুর আবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, পুরাতন ঘটনার অসংলগ্ন অংশ সব লইয়াও, আবার প্রশ্নের মধ্যেও : এই বর্ষায় বাবা কি করিতেছে?... ঘরটাতে আর সবাই আছে, শুধু গিরিবালাকে দেখা যায় না, কে তামাক দিয়া গেল বাবাকে?—হরিচরণ...জেঠাইমা কি আজকাল আরও কম বাড়িতে থাকেন? ঠিক এখন, এই সময়টিতে কোথায়?...আসিবার সময় বলিলেন,—"ও গিরি, কি করে টেঁকব বাড়িতে মা?"...কিন্তু তবুও তো গিরিবালাকে সাত-তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বিদায় করিয়া দিলেনই...

আবার চক্ষে ধারা নামিল গিরিবালার, ফুলের চারিদিকে মৌমাছির মতো ঐ একটি কথা যেন মনে গুন্ গুন্ করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল—'সাত-তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দিলেনই তো?—সাত-তাড়াতাড়ি বিদেয় করে...'

অশ্রু মুছিয়া আবার মুখে আঁচল দিয়া বসিয়া রহিলেন।

জেঠামশাই...কোথা থেকে ঘুরিয়া আসিয়া এইমাত্র বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। কানে কণ্ঠস্বর আসিয়া লাগিতেছে—"গিরি-মা কোথায় গো?"—তাহার পরই ভুলটা বুঝিতে

BanglaBook.org

পারিয়া চুপ করিয়া গেলেন। গিরিবালা দেখিতে পাইতেছেন—তিনি নাই অথচ তাঁহাকে ডাকিয়া ফেলায় জেঠামশাইয়ের মুখটা যেন কেমন হইয়া গেল। ঘরের মধ্যে গিয়া আবার ভুলিয়া ডাকিলেন।—"গিরি!"

সমস্ত বেলে-তেজপুরটার জন্যে মন কেমন করিতেছে। সাঁতরার মতো এত বড় নয়, এত সমৃদ্ধ নয়, সেইজন্য যেন আরও বেশি করিয়া মায়া হয়, মনটা যেন সেই ছায়াঘন মেটো বাড়ির ছোট গ্রামটির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। গিরিবালা অনুভব করেন বেলে-তেজপুর তাঁহার জীবন থেকে সরিয়া যাইতেছে ; আরও সেইজন্যই যেন দুই বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিতে চান।

নীচে খোঁজ পড়িল—"হ্যাঁগা, বৌমা কোথায়?"..."তাই তো, কনে'বৌ কোথায়?" গিরিবালা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া, আরও কয়েকটা ধাপ নীচে নামিয়া বসিলেন। হাওয়াটা উল্টা দিকে হইলেও বৃষ্টির কণা ভাসিয়া আসিয়া অল্প অল্প সিক্ত করিয়া দিতেছিল। বেলে-তেজপুর ভুলিয়া নীচের দিকে কান পাতিয়া উৎকণ্ঠিতভাবে বসিয়া রহিলেন, এখনই কেহ উপরে আসিয়া পড়িবে।

উপরে ওঠার পদশব্দ শোনা গেল, হারাণের বৌ আসিয়া বাঁ-গালে তর্জনী স্পর্শ করিয়া বলিল—"ওমা দিদিমণি হেতাকে? একা বসে বসে করছ কি?"

"কি আর করব? বেশ ঠাণ্ডা, তাই একটু বসে..."

শেষ করিতে না পারিয়া খানিকটা কাপড় মুখে চাপিয়া গিরিবালা চাপা গলায় কাঁদিয়া উঠিলেন। হারাণের বৌ উঠিয়া আসিয়া পাশে বসিল, বলিল,—"কাঁদ যে দিদিমণি! মায়ের জন্যে মন কেমন করচে!...হ্যাঁগা, তা করবে নি? অতদিনের ঘর ছেড়ে আসা!...ওরা সব বলাবলি করছেন—'বেশ ভুলে আছে শ্বশুরবাড়িতে এসে, বড় হয়েচে তো মেয়ে?'...আমি মনে মনেই বনু—থামো বাপু, উনি আবার যখন কান্না ধরবে, থামান দায় হবে ; মা জেঠাই ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারত নি যে মেয়ে..."

মনোমোহিনী দেবী উঠিয়া আসিলেন, সিঁড়ির মোড়টায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন—"বৌ এখানে? আর আমরা ছিষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি!...কাঁদছে যে!"

গিরিবালা কাঁদিয়া বাড়ির মান বাড়াইয়াছেন, হারাণের বৌ মোটেই ক্ষুণ্ণ নয়...খানিকটা স্বীয় কল্পনাশক্তির সাহায্য লইয়াই বলিল—"কাঁদবেই তো ; বড্ড চাপা মেয়ে, সুবিধা পেলেই এইরকম নুকিয়ে কেঁদে বেড়ায়— কবার তো আমিই দেখনু। জেঠাইয়ের, মায়ের কত অনুগত, মন কেমন করবে নি?..."

মনোমোহিনী একটু রাগিয়াই উঠিয়া আসিলেন, বলিলেন,—"তুমি সরো তো বাছা, খুঁজেপেতে ভ্যালা মানুষ সঙ্গে দিয়েছেন ওঁরা,—ও কাঁদবে আর তুমি আরও উসকে দেবে —ব্যবস্থা মন্দ নয়!...সরো।"

লোকটি তত ভালো নয়, হারাণের বৌ উঠিয়া একটু অপ্রতিভভাবে দেয়াল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মনোমোহিনী গিরিবালার পাশে বসিয়া তাঁহাকে দুই হাতে আলগাভাবে জড়াইয়া ধরিলেন, হারাণের বৌকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন—"কাঁদবেটা কেন শুনি? জেঠাইয়ের মায়ের অনুগত হলেই নিজের বাড়িতে এসে কাঁদবে? আর মা-জেঠাই যেন কতই না দূরে পড়ে রয়েছে! সাঁতরা থেকে হাওড়া, তারপরেই ডুমজুড়, নেমে বেলে-তেজপুর। লোকে দুবেলা যাওয়া আসা করছে। এই তো বোয়ের মামাতো ভাই না কে নেমন্তন্ন

BanglaBook.org

রক্ষে করতে এসেছে ; দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরিয়েছে আর এই,—কটাই বা হবে এখন?"

হারাণের বৌ বেকায়দায় পড়িয়া গিয়াছিল, সুবিধাটুকু আর হাতছাড়া হইতে দিল না ; "ওমা, বিকাশঠাকুর এয়েছেন?—যাই তো, দেখিগে"—বলিয়া তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

হারাণের বৌ চলিয়া গেলে কিন্তু মনোমোহিনী আর ওরকম ছেলে ভোলান গোছের করিয়া বানাইয়া বানাইয়া কিছু বলিলেন না বড়। ভাজকে বুকের কাছটিতে লইয়া একরকম চুপ করিয়াই বসিয়া রহিলেন ; মাঝে মাঝে দু'একবার শুধু বলিলেন—"চুপ কর্ বৌ, চুপ কর্!"

বৃষ্টির দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিজের চক্ষু শুধু সিক্ত হইয়া আসিল। যেন কয়েকবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"যে-স্বর্গ অনেক তপস্যার জোরে পেলি তারই উপর মন বসা বৌ। আমার বড় অলুক্ষণে বাই ছিল—নিত্যি বাপেরবাড়ি, বাপেরবাড়ি, তাই..."

রুদ্ধকণ্ঠ সামলাইয়া লইয়া চুপ করিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে নিজেকে যখন বেশ ভালো করিয়া সামলাইয়া লইয়াছেন, বলিলেন —"ওঠ, তোর দাদার সঙ্গে দেখা করবি চল। তোর বাপের বাড়ির থেকে পাঁচটা বড় মিরগেল পাঠিয়েছে, অমন মিলগেল এদিকে দেখাই যায় না বড় একটা ; দু হাঁড়ি জনাই-এর মনোহরা, আরও কি কি সব।...একটা কথা বলি, শুনে রাখ বৌ।" শেষের কথাটুকু একটু দাঁড়াইয়া পড়িয়া অপেক্ষাকৃত নিচু গলাতেই বলিলেন, গিরিবালা মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"ঝিটাকে শিখিয়ে দিবি দেওয়া-থোওয়া নিয়ে যদি তোর বাপেরবাড়ির নিন্দে করে কেউ তো যেন বেশ মিষ্টি করে শুনিয়ে দেয়। মায়ের আমার খুঁতখুঁতুনি রোগ আছে, নিজের মা বলেই ন্যায্য কথাটা বলতে ছাড়ব নাকি?—তার ওপর আবার ওবাড়ির পিসীর ফোড়ন দেওয়া আছে।...তোমরা সাততাড়াতাড়ি বিয়ে দেবে ছেলের, তারা পেরে উঠবে কোথা থেকে?—গেরস্ত লোক।...কেপ্পন নয় তো, এই তো তত্ত্ব পাঠিয়েছে—একটা ছোটখাটো যজ্ঞি হয়ে যায়।...চল্।"

দুই ধাপ নামিয়া বলিলেন—"থাক্, তোর আর কিছু বলে কাজ নেই ঝিকে, নিন্দে হবে। আমিই মুখ বন্ধ করে দেব'খন। দেখিস্ না—এই যা এসেছে, সেই নিয়ে কেমন মিষ্টি মিষ্টি করে বলব, ও-বাড়ির পিসীকে শুনিয়ে শুনিয়ে—ওঁর ছেলের বিয়ে এই সেই দিন হয়ে গেল কি না।"

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ মনোমোহিনী দেবীর ডান হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া মুখের উপর কাতর দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন —"থাক্‌গে ঠাকুরঝি, লক্ষ্মীটি, আমার মাথা খাও।"

তাঁহার এই ভাব পরিবর্তনে, বিশেষ করিয়া এই আকুলভাবে 'লক্ষ্মীটি' বলিবার ভঙ্গিতে মনোমোহিনী দেবী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"দেখো কাণ্ড, কা'কে যেন এতক্ষণ ধরে বললাম!...তা শোন বসে বসে বাপের বাড়ির খোঁটা,—আমারই যেন যত মাথাব্যথা!"

হাসিতে হাসিতেই ভাজকে সঙ্গে করিয়া নিচে নামিয়া গেলেন।

বিকাশদাদা অনেকগুলি বই আনিয়াছেন, বলিলেন, "তোর বিয়েটা বড্ড তাড়াতাড়ি

হয়ে গেল, কিনা,—পিসেমশাই গিয়ে বাবাকে, বড় পিসীকে বললেন—'গিরির বিয়ে, একটা বোধ হয় হ্যাঙ্গামা বাধবে, তোমরা শীগ্‌গির চলো।'...এরকম কখনও বিয়ের নেমন্তন্ন হয়? যেন ডাকাত পড়েছে, পুলিস ডাকতে এসেছেন।...এই সেদিন গিয়ে নিশ্চিন্দি হয়ে কলকাতা থেকে বইগুলো কিনে নিয়ে এলাম। পড়বি তো?—যত সব মায়েদের কথা আছে এগুলোতে।"

একটু চাপা গলায় প্রশ্ন করিলেন—"কেমন লোক এরা রে?"

গিরিবালা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—"খু—ব ভালো, বিকাশদা, এমন দেখি নি!"

বিকাশের মুখে কি জন্য অল্প একটু হাসি ফুটিল, সেটা ঠোঁটে মিলাইয়া লইয়া বলিলেন—"খুব বড় বংশ, না?"

গিরিবালা আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, মুখটা গম্ভীর করিয়া একটু দুলাইয়া লইয়া বলিলেন—"খুব বড়। জেঠশ্বশুর যে মস্তবড় পণ্ডিত আর শ্বশুর—মানে বাবার সেখানে খুব নাম, সায়েব পর্যন্ত খাতির করে 'সরকার' বলে ডাকে, ওদেশে সরকার মানে মনিব —এত ভালোবাসে সায়েব...। খুব বড় বংশ বিকাশদাদা!"

ভগ্নীর উচ্ছ্বাস দেখিয়া, বিশেষ করিয়া কথার মধ্যে 'খু-ব বড়'-র ছুট্ দেখিয়া বিকাশ কৌতুক অনুভব করিতেছিলেন ; বলিলেন—"আমিও তাই দেখছি।...আমাদের জন্যে তোর মন কেমন করে না, নারে গিরি?"

গিরিবালা ছেলেমানুষের মতো বলিয়া ফেলিলেন—"না, করে না আবার! —এই তো এতক্ষণ কাঁদছিলাম বসে বসে ; ঠাকুরঝি গিয়ে..."

হঠাৎ লজ্জিত হইয়া জড়সড় হইয়া গেলেন। চণ্ডীচরণ আসিল, সাতুর নকল করিতে করিতে—"উরে ব্বাস্‌রে! বৌদিদির বাড়ি থেকে কি বড়্‌কা বড়্‌কা মাছ এসেছে!..."

॥ ৫ ॥

পরের দিন সকালবেলার কথা।

কাজের ব্যস্ততায় ভিতর-বাড়ি, বাহির-বাড়ি গম গম করিতেছে। ভিতরে পাড়ার যত পাকা পাকা রাঁধিয়েরা একত্র হইয়াছে ; চড়ানো নামানো, খুন্তিনাড়া, সাতলানোর সঙ্গে নানা আলোচনা চলিয়াছে, পান দোক্তা গুল দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইতেছে। বাহিরের একদিকে ভিয়ান বসিয়াছে, সেখানে তামাকের জমাট আসর, থেলো হুঁকার গলায় বাঁধা কড়িগুলা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আনা, রাখা, ঘোরাঘুরি—সমস্ত জয়গাটাতে ব্যস্ততা যেন আঁটিয়া উঠিতেছে না ; বাড়ির মধ্যে তিল ছড়াইলে মাটিতে পড়ে না। ঘর বারান্দা আত্মীয়-কুটুম-অভ্যাগতে থই থই করিতেছে। বাহির হোক, ভিতর হোক যেখানেই একটু অবকাশ, ছেলে-মেয়েরা ভরাট করিয়া ফেলিতেছে। প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের মিশ্র কলতানে, কাজের সঙ্গে অকাজের চঞ্চলতায়, উৎসবটা যেন সর্বাঙ্গে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হইল।—

বিপিন উৎসবের মধ্যে ছিলেন না। দুইদিন পরে চলিয়া যাইতেছেন, বোধ হয় বরাবরের জন্যই, তাই এই কয়দিন ধরিয়া সাঁতরাকে যেন নিবিড়ভাবে উপভোগ করিয়া লইতেছেন। ওঁর পশ্চিমে গড়া দেহ-মন শক্তির মধ্যে দিয়াই আত্মপ্রকাশ খোঁজে, তাই

BanglaBook.org

ওঁর জীবনটাই বহির্মুখী। ওঁদের ব্যায়াম সমিতি, ক্রিকেট ক্লাব আছে, ওদিকে সুইমিং ক্লাব, রোইং ক্লাব আছে, সবেরই মুখ্য বিপিন অর্থাৎ ওঁর শক্তিটা সাঁতরার জলস্থল উভয়ত্রই ছড়াইয়া আছে। বাড়ি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে চলে কোথা থেকে ওঁর? বাচ খেলা আর সন্তরণের বার্ষিক প্রতিযোগিতাটা মাস দেড়েক পরে ছিল, চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আগাইয়া আনিতে হইয়াছে; বিপিন এখন গঙ্গা লইয়া পড়িয়াছেন। অবশ্য যতটা সংগোপনে সম্ভব; বাবা আসিয়া পড়িয়াছেন, সময়টাও খুব অনুকূল নয়।

পাড়ার জন তিনেক বন্ধু মিলিয়া স্নান করিতেছিলেন। পথে জেঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা হইয়া গিয়াছিল, বলিয়া দিয়াছেন তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিতে, বাড়িতে কাজ। অন্য দিনের তুলনায় স্নানটা অল্পের উপরেই সারিয়া দেখা গেল হোরমিলার কোম্পানীর শান্তিপুরগামী জাহাজটা আসিতেছে; একজন সাথী বলিল—"ঢেউটা খেয়ে যাবিনি বিপিন?"

বিপিন একটু অগ্রপশ্চাৎ করিতেছিলেন, অপর সঙ্গী বাড়ির কাজ লইয়া একটু বিদ্রূপ করিল। দোমনা ছিলেনই, "চল্ তবে"—বলিয়া ঘুরিয়া আবার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরাদমে সন্তরণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। সঙ্গীদ্বয় অনুসরণ করিল, এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক পিছনে পড়িয়া গেল।

প্রায় যখন মাঝামাঝি আসিয়া গেলেন একবার চোখ ফিরাইয়া দেখিলেন জাহাজটা তখনও বেশ খানিকটা দূরে। হাত থামাইয়া একটু গা-ভাসান দিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, সঙ্গীরা আগাইয়া আসিল।

কিন্তু রক্তে তখন দোল লাগিয়াছে, শরীর এলাইয়া অপেক্ষা করিতে ভালো লাগিল না। সঙ্গীদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"তোরা এই দিকে থাক, আমি ওদিককার ঢেউটা খেয়ে ফিরছি।"

সঙ্গী দুইজনেই ভীত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"পারবি নি পেরুতে বিপিন, জাহাজ এসে পড়ল বলে।"

জাহাজ পূর্ণ বেগে চলিয়া আসিতেছে; নিয়তির সূক্ষ্ম আকর্ষণ—একটা অদ্ভুত উন্মাদনা জাগাইয়া দিয়াছে প্রাণের মধ্যে, রক্তে যেন ফুট্ ধরিয়াছে।

বিপিন একবার চকিতে জাহাজটার দিকে দেখিয়া লইলেন, সঙ্গে সঙ্গে 'খুব পারব' বলিয়া জলে বুকের একটা প্রবল ধাক্কা দিয়া সামনে ঠেলিয়া গেলেন।...জাহাজটা সতর্কতার উৎকট নিনাদ করিয়া উঠিল।

পিছনে আবার শব্দ হইল—"পারবি নি!" বিপিন তখন পূর্ণোদ্যমে হাত পা ছাড়িয়া দিয়াছেন।

জাহাজে যাত্রীদের মধ্যে হৈ হৈ পড়িয়া গেল, কিনারার লোকেরা "গেল গেল" করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, কাছাকাছি যত সব নৌকা ছিল তাহাদের মাঝিরা হাল-দাঁড় ছাড়িয়া একটু স্তব্ধ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই পরিণামটা বুঝিতে পারিয়া জাহাজমুখো হইল।

জাহাজের সারেং ব্যাপারটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে দেখিল লোকটি আসিয়া গা ভাসাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে, বুঝিল ঢেউ খাইয়া ফিরিয়া যাইবে, সারাপথে দুইদিকেই এই ব্যাপার হইতেছে, রোজ। হঠাৎ সামনে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে সে একবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। জাহাজ থামাইবার নির্দেশ দিয়াই ডাইনে মোড় ঘুরাইল। কিন্তু

BanglaBook.org

তখন আর উপায় নাই, মোড় ফিরাইতে ফিরাইতেও বেগমত্ত জাহাজটা নিজের বিপুল আয়তনের ভারে শিকার লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। বিপিনের হিসাব ভুল হইয়াই গিয়াছিল, জাহাজ মোড় ফিরানোয় ক্ষণিক দ্বিধায় পড়িয়া আরও কয়েক সেকেন্ড হারাইয়া বসিলেন। যখন ঘুরিয়া দেখিলেন, জাহাজ হাত চৌদ্দ-পনেরোর মধ্যে, মনে হইল ভীষণ গর্জনের সঙ্গে একটা পাহাড় যেন মাথায় ভাঙিয়া পড়িল। দৃশ্যটা অসহ্য বলিয়া হোক বা প্রাণধর্মের কোন গূঢ় তড়িৎ-নির্দেশেই হোক, বিপিন ডুব দিলেন।

রূপ আর শৌর্যের আকর্ষণে সাতকড়ি ভগ্নীপতির ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সাঁতার দেখিবার জন্য চণ্ডীচরণকে সঙ্গে লইয়া সেও বিপিনের পিছু পিছু আসিয়াছিল, এই ঘটনা-বিপর্যয়ে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল। উৎকট ঔৎসুক্যে আশা-নিরাশার মধ্যে যতটা পারিল দেখিল, তাহার পর ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছুটিল। বেশ খানিকটা দূরেই বাড়িটা; যখন পৌঁছিল তখন আর মুখে রা সরিতেছে না। চণ্ডীচরণ—"দাদা, দাদা,..." করিয়া কয়েকবার ঢোক গিলিল, সাতু হাঁপাইতে হাঁপাইতে অসংলগ্নভাবে বলিল—"মুখুজ্যেমশাই ডুবে গেছেন!"

"জাহাজের নিচে!"—বলিয়াই চণ্ডীচরণ ভিড় চিরিয়া ভিতরের দিকে ছুটিল।

খবরটা যেন বিদ্যুতের বেগে আবালবৃদ্ধবনিতা—সবার কানে পৌঁছিয়া গেল। এত অপ্রত্যাশিত আর এতই ভীষণ একটা দুর্দৈব যে কেহই যেন বুঝিয়া উঠিতে পারিল না প্রথমটা। হাতের কাজ লইয়া সবাই থমকিয়া দাঁড়াইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল একটু, মুহূর্ত কয়েকের জন্য সব যেন নিশ্চল হইয়া গেল, তাহার পরই মেয়েদের কান্নায়, পুরুষদের হাঁকাহাঁকি, বিস্মিত প্রশ্ন প্রভৃতিতে একটা ভীষণ কলরব উঠিল, অলক্ষিতে কে যেন একটা চাবির পাক দিয়া উৎসবের মুখরিত আনন্দ-কলরবটা বিভীষিকার আর্তনাদে রূপান্তরিত করিয়া দিল। হাতের কাজ ফেলিয়া একটা বড় দল গঙ্গাভিমুখে ছুটিল।

গিরিবালা উপর-ঘরে পূজার যোগাড় করিতেছিলেন, হঠাৎ ক্রন্দনের রোলের সঙ্গে একটা অব্যক্ত কোলাহল শুনিয়া চন্দনকাঠ হাতে করিয়াই দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সাতু হন্তদন্ত হইয়া উঠিয়া আসিয়া বলিল—"মুখুজ্যেমশাই জাহাজ চাপা পড়েছেন!"

দিনের সব আলো এক মুহূর্তেই নিবিয়া গেল, একটা অন্ধকার গহ্বর থেকে যেন গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কে?...কি হয়েছে?"

সাতু উত্তর না দিয়াই দুড়দাড় করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নাবিয়া যাইতেছে, শেষ চৈতন্যে গিরিবালার মাত্র এইটুকু ধরা পড়িল, তাহার পর সমস্ত অঙ্গ শিথিল হইয়া গিয়া দেবতার সামনে লুটাইয়া পড়িলেন।

সমস্ত ব্যাপারটা মিনিট দশেকও স্থায়ী হইল না। যাহারা গঙ্গাভিমুখে ছুটিয়াছিল, অর্ধেক যাইতে না যাইতেই দেখিল ওদিক হইতে কয়েকটি ছেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে, দূর থেকেই হাত তুলিয়া বলিল—"বেঁচে গেছে!" এ-দলের কয়েকজন শুনিয়াই বাড়ির পানে ছুটিল, কয়েকজন ব্যাপারটা সবিস্তারে শুনিবার জন্য অগ্রসর হইল। কয়েকজন ছুটিয়া একেবারে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলিয়া গেল। দেখিল একটা সবুজ-রঙের পানসি করিয়া বিপিন প্রায় ঘাটের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। বিশেষ এমন যে ক্লান্ত

BanglaBook.org

ভাব তাহা বোধ হইল না, তবে কতকটা অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"চণ্ডে বুঝি খবর দিয়ে দিয়েছে বাড়িতে?" আওয়াজ শুনিয়া সবার যেন বুকের জোর বাড়িল, একটা মিশ্র কলরব উঠিল—"না, কাজ কি খবর দিয়ে!...তোমার আক্কেলটা!...গোঁয়ারতুমিতে প্রাণটা দেবে একদিন..."

হাসিতে না পারিয়া বিপিন রাগের দিকেই চেষ্টা করিলেন—"কি এমন হয়েছে যে...একটুতেই যেন সব হাত-পা এলিয়ে দেবে! বাবা, জেঠামশাইও খুব রেগেছেন?"

"না, সরবতের বাটি হাতে করে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন।"

পিছনকার দলটাও ঘাটের উপর দেখা দিল; "উঠেছে?" বলিয়া—একটা চিৎকার উঠিল।

এতবড় একটা দলের মধ্যে পথ অতিক্রম করা—তিরস্কার, প্রশংসা আর উৎসুক প্রশ্নাদির জবাব দিতে দিতে—ভাবিতেই বিপিনের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। মনে হইল বাঁচিয়া যেন একটা গুরুতর বিপদের মধ্যে পড়িয়া গেছেন। বলিলেন—"তা বেশ তো তোমরা এগোও, আমি আহ্নিকটা সেরেই চলে আসছি।"

অবশ্য ও চালটা টিকিল না। শুধু আহ্নিকের উপর হঠাৎ শ্রদ্ধার বহর দেখিয়া অনেকগুলি মুখে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ আর শ্লেষের ফোয়ারা ছুটিল মাত্র।

ভগবতীচরণ পূজার জন্য উপরে উঠিতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ কলরবটা উত্থিত হইল। নামিতে যাবেন, তাঁহাকে একরকম ঠেলিয়াই সাতকড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে উঠিয়া গেল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাইবোনের কথাটা উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, নামিতে নামিতে সাতকড়ি তাঁহাকেও সংবাদটা শুনাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়া গেল।

ভগবতীচরণ দুই ধাপ নামিয়াই আবার উপরে উঠিয়া গেলেন। বধূ ফুলের পরাতের উপর শরীরটা লুটাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছে। ভগবতীচরণ প্রায় মনের স্থৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন, একটু ইতস্তত করিলেন—কোন্‌দিকে যাইবেন, তাহার পর খড়ম ছাড়িয়া ভিতরে গিয়া, আস্তে আস্তে পূজার সরঞ্জামগুলা সরাইয়া বসিয়া পড়িলেন এবং আর যেন কোথাও কিছু হইতেছে না এইভাবে বধূর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া মুখে জলছিটা দিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন।

নিচে থেকে সিঁড়ি বাহিয়া কে একজন উগ্রবেগে ঠেলিয়া উঠিতেছে, স্বর লক্ষ্য করিয়া ভগবতীচরণ বুঝিলেন গৃহিণী। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাপারটা আন্দাজ করিয়া লইলেন—স্ত্রীলোকেরা এমন আকস্মিক বিপদপাতে একেবারে কাণ্ড-কাণ্ড জ্ঞান হারাইয়া বসে, দোষটা নববধূর উপর দিয়া কটুভাষে আক্রোশ মিটাইয়া মন হালকা করে; অনেক সময়ে আক্রোশ আরও উৎকট আকারেই দেখা যায়।...উগ্র দৃষ্টিতে দুয়ারের পানে চাহিয়া রহিলেন। গৃহিণী ক্ষিপ্রপদে উঠয়া আসিলেন—শোকে, অসহায়তায় যেন উন্মাদ হইয়া গেছেন। অমন শান্ত চক্ষু দুইটি যেন জ্বলন্ত ভাঁটার মতো হইয়া পড়িয়াছে।

ভগবতীচরণ শান্তকণ্ঠে একবার প্রশ্ন করিলেন—"কি?"

সঙ্গে সঙ্গে বধূকে রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—"নামো, এক্ষুনি নেমে যাও, যা বলবার আমায় বলগে, আমি ওঁর সর্বনাশ করেছি...জেনে শুনে..."

এখানে কর্তাকে দেখিবেন ভাবিতে পারেন নাই, তাহা ভিন্ন বধূকেও অচৈতন্য দেখিবেন

আশঙ্কা করেন নাই, গৃহিণী যেন সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ভগবতীচরণ আবার গর্জন করিয়া উঠলেন—"নামো, নইলে আমি কুরুক্ষেত্র করব, আমার মাথার ঠিক নাই।"

ওঁর উগ্রমূর্তি দেখিয়া স্থগিত ক্রন্দনের আর একটা উচ্ছ্বাস তুলিয়াই গৃহিণী সিঁড়ির মাথায় আছাড় খাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন—শোক আর ক্রোধের রুদ্ধ আবেগটা সহ্য করিতে পারিলেন না।

চিৎকার শুনিয়া মনোমোহিনী দেবী, আরও কয়েকজন উপরে ছুটিয়া আসিতেছিলেন, মূর্ছাহত জননীকে দেখিয়া—"ওরে মা-ও আমাদের ছেড়ে গেলেন!" বলিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।...সমস্ত বাড়িটা যেন ওলটপালট হইয়া গেল।

এই সময় নিচে আর একটা শব্দ হইল—"বেঁচে গেছে!" সংবাদটা সঙ্গে সঙ্গে দূরে কাছে, নানান মুখে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। আবার যেন একটি চাবির মোচড়েই কে সমস্ত দৃশ্যটা পরিবর্তিত করিয়া দিল। প্রতি মিনিটেই নূতনতর খবর আসিয়া পড়িয়া উৎসবের পূর্বভাবটা ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। তখন টুকরা-টাকরা যতটুকু খবর পাওয়া গেল তাহাই লইয়া কল্পনার সাহায্যে চলিল গভীর আলোচনা। কোন কোন মুখে বিপিনের শক্তিরও তারিফ আরম্ভ হইয়া গেল।—"আমি শুনেই বলেছিলাম অসম্ভব—গঙ্গাটাকে তো বিপিন গোষ্পদ করে তুলেছে... ওদের দেশের যা গঙ্গা, তার সামনে এ তো একটা সুঁতী...শুনছি নাকি চলল পশ্চিমে এবার? সাঁতরার আর শক্তি নিয়ে বড়াই করবার কিছু রইল না তাহলে...সাঁতারের প্রাইজটা এবার তাহলে নির্ঘাৎ বালির দল নিলে..."

একসময় বিপিন যখন দলপরিবৃত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কলরবটা আবার একটু মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, মেয়েদের মধ্যে ক্রন্দনটাও আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। খানিক পরে সকলের আবার আসন্ন দায়িত্বের কথা মনে পড়িল, উৎসবের বিভিন্নমুখী কাজ আবার নিজের নিজের পথে চালু হইল।

ভগবতীচরণ অদ্ভুতভাবে শান্ত। গিরিবালার মাথা কোলে লইয়া জলের ঝাপটা দিয়া ব্যজন করিতেছেন। পাশে বসিয়া আছেন মধুসূদন আর মনোমোহিনী দেবী, আর চতুর্থ কেহ উপরে নাই; সিঁড়ির মুখে পর্যন্ত জটলা করিতে বারণ করিয়া দিয়াছেন।

গিরিবালার দুইবার চৈতন্য হইয়াছিল, আবার মূর্ছা গেছেন। মনোমোহিনী দেবীর চাপা কান্না এক একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। মধুসূদন একবার রুদ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"মা একটাকে ফিরিয়ে দিয়ে কি একটাকে নিলেনই দাদা? ডাকি না হয় প্রিয়নাথ ডাক্তারকে।"

ভগবতীচরণ গিরিবালার কপালে খানিকটা চন্দন লেপিয়া দিতে দিতে বলিলেন—"কিছু ভয় নেই মধু, চুপ করো। এ-আসরে আর ডাক্তার আনতে চাই না, দরকারও নেই।"

একটু পরেই আবার গিরিবালার চৈতন্য হইল; ক্রমে জ্ঞান ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল, ঘোমটাটা তুলিয়া দিবার জন্য হাতটা উঠাইবার চেষ্টা করিতে মনোমোহিনী দেবী কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টানিয়া দিলেন।

একটু পরে জ্ঞানটা আরও স্পষ্ট হইয়া গিরিবালার মুখে হঠাৎ একটা উৎকট ভীতির ছায়া ফুটিয়া উঠিল, ভগবতীচরণ যেন অপেক্ষাই করিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি মুখটা

BanglaBook.org

নামাইয়া বলিলেন—"কিছু ভয় নেই মা, বিপিন নেয়ে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছে, তার কি কিছু হতে পারে আর?"

আরও একটু পরে মনোমোহিনী দেবীকে বলিলেন—"যা তোর গর্ভধারিণীকে ডেকে আন, নিয়ে যা বৌমাকে আমার ঘরে। যেন এক্কেবারে গোল না হয় ওধারে।"

মনোমোহিনী দেবী বলিলেন—"পুজোর ফুলটুলগুলো বদলে দেবার ব্যবস্থা করি বাবা?"

ভগবতীচরণ বলিলেন—"ওর মধ্যে একটা কিছুও বদলানো চলবে না ; তবে একটু গুছিয়ে দে। তুই যা বরং, বৌমাই দিচ্ছেন আস্তে আস্তে, কাপড়টা ছাড়া আছে।.. পারবে তো মা?"

গিরিবালা মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—পারিবেন।

উহারা যখন গিরিবালাকে তুলিলেন, মধুসূদনও উঠিতে যাইতেছিলেন, ভগবতীচরণ বলিলেন—"তুমি একটু বোস মধু।"

উহারা নামিয়া গেলে একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলেন—"মধু, সমস্তটা জানা ব্যাপার, আমি এই জন্যেই তাড়াতাড়ি মাকে নিয়ে এলাম ঘরে, নইলে একদিনে কি বিবাহ হয়?"

মধুসূদন একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"না, দাদা, তোমার গণনায় অবিশ্বাস? তবে..."

ভগবতীচরণ যেন নিজের মনেই বলিয়া চলিলেন—"তুমি বোধহয় অতটা লক্ষ্য করো নি যে বিপিনের কুষ্ঠিটা আমি বরাবরই নিজের কাছে রেখে এসেছি, তুমি চেয়েছ কয়েকবার, কাটিয়ে দিয়েছি এ-কথা সে-কথা বলে ; একটা ভয়ানক ফাঁড়া ছিল, তুমি কোনখানে দেখিয়ে চঞ্চল হয়ে উঠবে বলে দিই নি। কন্যার কুষ্ঠিতেও এর কাটান ছিল, কিন্তু সে-কন্যা পাচ্ছিলাম না আমি। শেষকালে বৌমার কুষ্ঠিটা হাতে আসতেই বুঝলাম ওষুধ পাওয়া গেছে। আমি আর একদিনও দেরি করলাম না। অনেকে চটেও গেল। অবশ্য ঠিক যে আজকের দিনটিতেই এটা ঘটবে অতটা ঠাওর করে উঠতে পারি নি। তাহলে আজ আর কাজের হিড়িকটা করি না, তবে বিপদটা যে শীগগিরই আসছে তা আমি জানতাম।"

ভগবতীচরণ একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে একটু আবেগ-কম্পিত-স্বরেই বলিলেন—"মা আমার আশ্চর্য মেয়ে মধু! একটা কথা বলে দিচ্ছি—ওঁর মনে কখনও যেন কষ্ট দেওয়া না হয়। বেহাইরা ভালো দিতে-থুতে পারেন নি,—সাধারণ গেরস্ত, তায় বড্ড তাড়াহুড়োও হয়ে গেল ; কিন্তু এই নিয়ে যেন কখনও ওঁকে কিছু বলা না হয়। ...যাও, দেখো গিয়ে কতদূর কি হচ্ছে।"

॥ ৬ ॥

নিজের কথা সম্বন্ধে গিরিবালার মনের ভাবটা অদ্ভুত গোছের ছিল—কতকটা ঔদাসীন্য, কতকটা কৌতুক। তিনি যেন মাঝে মাঝে আপনা হইতে একটু তফাত হইয়া নিজেকে পর্যবেক্ষণ করিতেন—বিস্মিত কৌতূহলে নিজের পানে চাহিয়া থাকিতেন।

উত্তর জীবনে ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করিতে করিতে বলিতেন,—"সেই থেকে আমি যেন সবার চোখে কী এক অন্য জিনিস হয়ে গেলাম। আমায় দেখবার জন্যে পাড়ায় যেন সব আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিলে। পান সাজছি—'ও বৌমা, একবার বেরিয়ে এসো, এঁরা তোমায় দেখতে এসেছেন।' ঠাকুরপোর কাছে বইপড়া শুনছি—'বৌ, আয় তো একবার...ওপাড়ার নতুনখুড়ি তোকে দেখবেন।'...ছাতে পুজোর জো করতে উঠচি—'বৌদি, ঘোষেদের বৌয়েরা তোমায় দেখতে চাইছে, নেমে এসো তো একবার।'...উনি নিজের খ্যামতায় বেঁচে গেলেন, তার উচ্চবাচ্যও নেই, মাঝে পড়ে নতুন-বৌয়ের যশে গ্রাম ছেয়ে গেল ; যার যশ তার কি রকম মনে হয় বল্ দিকিনি! মনে হয় না কোথা থেকে একটা আপদ জুটে আমার হক্ নষ্ট করছে?..."

গিরিবালা কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া ওঠেন—যেন খুব ফাঁকি দিয়া স্বামীকে তাঁহার একটা ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে, বিপিন যে নিজের শক্তিতেই বাঁচিয়া গেলেন সে-কথায় বিন্দুবিসর্গও সন্দেহের কারণ নাই। শৈলেন স্বকর্ণেই পিতার মুখে গল্পটা শুনিয়াছে—"আমি ঠিক জাহাজটাকে কাটিয়ে আগেই বেরিয়ে যেতাম, কেন না গা-ভাসিয়ে দিয়ে তখন আবার আমার পুরো দম ফিরে এসেছে। কিন্তু ঐ যে একটু যাব কি না যাব দোমনা হয়ে গেলাম, আর ঐ যে ওরা টুকে দিয়ে একটু অন্যমনস্ক করে দিলে, ঐতেই সব গোলমাল হয়ে গেল, তার ওপর আবার সারেংটা জাহাজের মোড় ঘুরিয়ে—যাও একটু আশা ছিল সেটা নষ্ট করে দিলে, আমার আন্দাজ তো সোজা বেরিয়েই যাবে। লোকে চেঁচামেচি করছে, বাঁশী ফুকরে উঠছে, আমি কিন্তু কোনদিকে না চেয়ে প্রাণপণে হাত পা চালিয়ে চলেছি। শেষে হঠাৎ কি মনে হল একবার ফিরে দেখলাম,—না দেখলে আর বাঁচবার কোন উপায়ই ছিল না ; দেখি বনবনিয়ে ছুটে আসছে জাহাজটা, বোধ হয় হাত চোদ্দ-পনেরোর মধ্যে এসে গেছে। আমি তখন একেবারে মাঝখানে, এগুলেও গেছি, পেছুলেও গেছি। হঠাৎ কি মনে হল, যতটা সম্ভব দম বুকে ভরে নিয়ে ডুব দিলাম, আর ডুব দিয়েই মাথাটা নিচের দিকে করে মাটি লক্ষ্য করে হাত টেনে যাওয়া—এইটুকুই মনে আছে, যতক্ষণ বুকে দমের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত ছিল ততক্ষণ ঐভাবে একঠায় টেনে গেছি, তারপর মুখটা বুজে গা ভাসিয়ে দিলাম।"

"মাঝগঙ্গায় পুরো ভাটার টান, জাহাজটা চলেছে উল্টোদিকে, যখন উঠলাম জাহাজটা অনেকখানি দূরে। আমি অবশ্য তখন অজ্ঞান হয়ে গেছি, তবে খুব বেশিক্ষণ অজ্ঞান হইনি ; একেবারে ভাসবার মুখে মুখে হয়ে থাকব, সেই জন্যে পেটে এক আধ ঘোঁটের বেশি জল ঢোকেনি। গুরুবল এই যে, ভেসে উঠলাম একটা নৌকোর পাশে, তক্ষুনি তুলে নিলে। ঘাটে পৌঁছুবার অনেক আগেই আমার ভালো রকম জ্ঞান হয়েছে। তখন ভাবনা হয়েছে বাড়ি ঢুকব কি করে,—বাবা রয়েছেন, জেঠামশাই রয়েছেন, বাড়িতে কাজ, লোকে লোকারণ্য...ঠিক করলাম সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানে-ওখানে নুকিয়ে কাটিয়ে দিয়ে, গা-ঢাকা হলে খিড়কির দোর দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ব। ওরা যখন নামতে বললে, বললাম তোমরা এগোও, সন্ধ্যে-আহ্নিকটা সেরে এক্ষুনি আসছি আমি।"

এই অদ্ভুত প্রস্তাবের কথা মনে পড়িয়া গিয়া পিতা নিজে হইতেই হাসিয়া ওঠেন। বলেন,—"যেন আহ্নিক ভিন্ন আর অন্য ভাবনা ভাববার ফুরসত নেই আমার! কিন্তু তা

BanglaBook.org

কি তারা শোনে কখনও? কি করে যে বলতে পেরেছিলাম কথাটা ভাবলে আমার এখনও হাসি পায়। তাও? 'তোমরা দাঁড়াও, আমি আহ্নিকটা সেরে নিই'—নয়,—'তোমরা এগোও ; আমি সেরে আসছি।' ”

মধুসূদন যতটা তাড়াতাড়ি করিতে চাহিয়াছিলেন ততটা সম্ভব হইল না। প্রথমে গিরিবালাকে বাপের বাড়ি পাঠানো লইয়া গোলমাল হইল। বৌভাতের দু'দিন পরে 'দিন' হইয়াছিল। ঠিক হইয়াছিল সেখানে দুদিন থাকিবেন, তাহার পর বিপিনবিহারীর সঙ্গে সাঁতরায় ফিরিয়া আসিবেন। এখানে আরও দুইদিন থাকিয়া মধুসূদনের চাকরি-স্থান পাণ্ডুলে সকলে চলিয়া যাইবেন, সকলে মানে,—মধুসূদন, বিপিনবিহারী, গিরিবালা আর গিরিবালার বাপের বাড়ির কোন ঝি ; যদি হারাণের বৌ যায় তো সে-ই।

কথা হইতেছে মধুসূদনের পাণ্ডুলে যেরূপ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি, সেখানে তাঁহাকে আর একটা বেশ বড় ভোজের ব্যবস্থা করিতেই হইবে, বৌভাতেরই একটা পুনরনুষ্ঠান। বড়ছেলের বিবাহ দিয়াছেন, শুধু যে ছেলেটিকে লইয়া গিয়া নির্বিবাদে অফিস শুরু করিয়া দিলেন সেটা চলিবে না।

আরও একটা কথা আছে, তাঁহার নিজের পরিবার সব পাণ্ডুলেই রহিয়াছে, এক বিপিনবিহারী আর চণ্ডীচরণ ছাড়া। বিবাহটা এত অকস্মাৎ হইয়া গেল যে তাঁহাদের আর আনা সম্ভব হইল না। সে-যুগে যাতায়াতের এত সুযোগ ছিল না যে একটা খবর দিলেই সবাই এই প্রায় চারশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া কয়েকঘণ্টার মধ্যে চলিয়া আসিবে। বৌভাতের পুনরনুষ্ঠান সেদিক দিয়াও দরকার। যাহাই হউক, তাড়াতাড়ি করা কিন্তু সম্ভব হইল না। ভগবতীচরণ বলিলেন—"দিন তো ঠিক করেছিলাম মধু, কিন্তু একটা ফাঁড়া গেল। বৌমা তো একলা ফিরবেন না, বিপিনকে জোড়ে যেতে হবে—ধীরেসুস্থে আরও একটা ভালো দিন দেখি, এসব কাজে তাড়াহুড়া করে না।"

আসল কথা, গিরিবালা আসিয়াছেন পর্যন্ত জেঠশ্বশুরের নয়নের মণি হইয়া উঠিয়াছেন, বৌভাতের সকালের ব্যাপারটার পর যেন আরও খুঁজিয়া বেড়ান। মধুসূদন বুঝিলেন জ্যেষ্ঠের মনের ভাবটা। বলিলেন—"তাহলে তাই হোক দাদা, আমি যাই, বিপিন আর বৌমাকে পরে পাঠিয়ে দিও। না, তাড়াতাড়ি করার আমিও পক্ষপাতী নই।"

বৌভাতের পরদিন তিনি একাই চলিয়া গেলেন।

বৌভাতের জের কাটিতে আরও দুইটা দিন গেল, তাহার পর সাঁতরার বাড়ির জীবনের ধারা আবার পুরাতন খাতটিতে নামিয়া আসিল।

আসন্ন উৎসবের জন্য যে একটা উত্তেজনা-উৎকণ্ঠার ভাব ছিল, সেটা কাটিয়া গিয়া দৈনন্দিন জীবনের নিরুদ্বেগ গতির মধ্যে গিরিবালা যেন পরিবারের মধ্যে নিজের স্থানটি নূতন করিয়া অথবা আরও স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিলেন। এ-ক'টা দিন তিনি যেন একটা ঘর-সাজানো জিনিস হইয়াছিলেন, সময়ে অসময়ে সবাই আসিয়া দেখিতেছে, সন্তর্পণে আসিয়া মুখের একটি বিশেষ ভাব বজায় রাখিয়া বসিয়া প্রশংসা শুনিতেছেন। চলাফিরা কথা-কওয়ার মধ্যে একটি বিশেষ ছন্দ অনুসরণ করিতে হইতেছে, চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি—কোথাও ত্রুটি ঘটিল কিনা...বৌভাতের পর,—বোধ হয় বৌভাতের দিন বধূ দেখার পালাটা পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার জন্যই, ওদিক হইতে গিরিবালা অনেকটা

BanglaBook.org

ছুটি পাইলেন। বৌভাতের দিন এখানকানা মেয়েদের সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হইয়া গেল, সমবয়সী কয়েকজনের সঙ্গে ভাবও হইল। মনটা একেবারে অবগুণ্ঠনের অবস্থা থেকে যেন একটু বাহির হইয়া আসিল। কুটুম্ব-পরিজন যাহারা আসিয়াছিল তাহার একে একে চলিয়া যাওয়ায় সংসারের সবাইকে যেন আরও একটু বেশি করিয়া পাওয়া গেল —শ্বশুরকে শাশুড়ীকে, মনোমোহিনী দেবীকে, তাঁদের সেবার মধ্য দিয়া কতকগুলি বিশেষ কাজও হাতে আসিল। মনোমোহিনী দেবী বলিলেন—"বাবার কাজগুলো সব তুই-ই কর বৌ, বাবার ভেতরের ইচ্ছেটাও তাই। তবে তাতে আমার পান-দোক্তা যোগাতে যদি একটু এদিক-ওদিক হয় তো ননদ যে কি জিনিস টের পাইয়ে দোব।"

দুপুরে যখন আশেপাশের বাড়ির মেয়েরা জড়ো হয়,—মেজাজ হিসাবে তাসখেলা, নভেলপড়া বা গল্প-গুজব হইতে থাকে, মনোমোহিনী দেবী বলেন —"তুই একটু সেবা কর বসে বসে বৌ, তোর হাতটা খুব মিষ্টি।"

কাজ, কিন্তু এখানকার কাজের মধ্যে অনেকটা নিশ্চিন্ত অবসরের ভাব আছে, তাই বাড়ির কথা আগেকার চেয়ে বেশি করিয়া মনে হয় একটু। পূজার জো করিতে করিতে চোখের পাতা ভিজিয়া আসে। একটি ছোট মেয়েকে দেখিতে পান, বেলে-তেজপুরে চিরপরিচিত ঘরবাড়িতে, চিরপুরাতন সঙ্গীদের মধ্যে আদর, বকুনি, হাসি, অভিমানের আলো-ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সাঁতরায় নিজেকে আলাদা বলিয়া মনে হয়, যেন সম্পূর্ণ এখানকার লোক।...একটা অব্যক্ত বেদনায় মনটা ভরিয়া আসে,—বেলে-তেজপুরের ঐ সঙ্কীর্ণ অথচ মুক্ত জীবনটিকে ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা করে। এদিকে এই নূতন জীবনেরও তো অচ্ছেদ্য মোহ আছে! বেলে-তেজপুর থেকে আলাদা হইয়া গেছেন ভাবিতে কষ্ট হয়, কিন্তু সাঁতরার জীবন থেকে আলাদা হইবার কথা যে ভাবাই যায় না। প্রতিদিন সব যেন বেশি করিয়া আপনার হইতে উঠিতেছে, প্রত্যেক মানুষটি থেকে ঘরবাড়ি, আসবাব-পত্র—সব।...খুব স্পষ্ট করিয়া কিছু ভাবিয়া পাওয়া যায় না, তবে গিরিবালা অনুভব করেন তিনি বড় হইয়া গেছেন, চারিদিক দিয়া ; সুদূর হইয়া গেছেন, আর পিছু ডাকার মতো কোথা থেকে এক অতি ক্ষীণ কান্নার সুর ভাসিয়া আসিতেছে।

আজকাল সাতকড়িও দিদিকে একটু বেশি করিয়া পায়, তাহারও ফুরসত আছে, দিদিকেও সর্বদা লোকে ঘিরিয়া থাকে না। দিদি নিজের ঘর গোছায়, সাতকড়ি বিছানায় বা চেয়ারে বসিয়া সমস্ত দিনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। গিরিবালা গোছানোর মধ্যে ঘোরা-ফেরা করিতে করিতে হুঁ-হাঁ দিয়া যান, এক সময় হয়তো একখানা কাপড় লইয়া জানলার শানটিতে বসেন, কুঁচাইতে কুঁচাইতে অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলিয়া ওঠেন—"আচ্ছা বল্ তো, এতক্ষণ জেঠাইমা কি করছেন সাতু?"

সাতকড়ি হেঁয়ালির উত্তর দেওয়ার মতো একটা আঙুল তুলিয়া বলে—"বলব—বলব?—ঘোষাল ঠাকুরমার সঙ্গে গল্প করছেন।"

কোঁচানো বন্ধ করিয়া গিরিবালা তর্কের ভঙ্গিতে বলেন—"না, কক্ষণও না। আমি বলছি, খোকার হাত ধরে এইমাত্র বাড়ি ঢুকলেন, ওঁর গা ধোয়ার সময় হয়নি? বিকাশদাদা খোকার নাম কিশুরী রেখেছেন, না রে? আমি আসবার দিন শুনলাম।...খোকাকে ঠিক "কিশুরী কিশুরী" বোধ হয়, না রে? বেঁটে, টুক্‌টুক্ করছে রং, হাসি হাসি..."

সাতকড়ি বলে—"কিশুরী নয়, কিশোর।"

BanglaBook.org

"ঐ হল একই কথা। এমন দেখতে ইচ্ছা করে খোকাটাকে! বিকাশদাদা বলছিলেন—'দিদি -দিদি' করে নাকি বড্ড হেদিয়েছে ; কবে যে যাব বেলে-তেজপুরে, মন কেমন কচ্ছে বড্ড।...আচ্ছা এইবার বল্—মা কি করছেন?"

"খিড়কির পুকুরে গা ধুচ্ছেন!"

"এবারেও হল না, ঠিক দেখে নিস্ ; মা এতক্ষণ বাবার ঘরটা পরিষ্কার-টরিষ্কার করছেন, আমি নেই যে ; বাবা এক্ষুনি এসে পড়বেন না?"

হয় তো হারাণের বৌও আসিয়া পড়ে, দরজার কাছটিতে বসিয়া পড়িয়া বলে—"কি গো, ভাই-বোনে তোমাদের কি গপ্প হচ্ছে?...শুনছি এখনও যাওয়ার দিন ঠিক হল না, আর তো ভালো লাগে না ; বাড়িতে কি হচ্ছে কে জানে?"

গিরিবালা বলেন—"এসেছিস, দু'দিন থাকই না হারাণের বৌ ; কেন, জায়গাটা কি মন্দ?"

হারাণের বৌ একেবারে শিহরিয়া উঠে, চিবুকে তর্জনী স্পর্শ করিয়া বলে—"সর্বরক্ষে! গিরিদিদিমণি বলে কি গো! দু'দিনে সাঁতরা এত ভালো হয়ে গেল,...সাতু-ঠাকুর, শুনলে তো?"

এই মাত্র যে বেলে-তেজপুরের কথা হইল বিস্ময়ের ঝোঁকে সেটা সাতকড়ি একেবারে ভুলিয়া যায়, বলে—"দিদি!"

গিরিবালা কথাটা নিতান্ত সাদা মনেই বলিয়াছিলেন, একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়েন এবং অপ্রতিভ হন বলিয়াই নিজেকে সমর্থন করিবার একটা জিদ চাপিয়া যায় ; প্রশ্ন করিয়া বসেন—"মিছে কি বলেছি এমন? মন্দ জায়গাটা?"

"ওমা, কোথায় যাব!" বলিয়া হারাণের বৌ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

নীচে থেকে ডাক আসে—"শালা-বাবু কোথায় হে?"

চণ্ডীচরণের ডাক। খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে অথচ ঠাট্টার দিক দিয়া রেহাই দেয় না।

"এই এলাম"—বলিয়া সাতকড়ি নামিয়া যায়।

গিরিবালার একটু সুবিধা হয় সাতকড়ি চলিয়া যাইতে। একটু ঝাঁজিয়া ওঠেন—"অমনি হাসি ধরে না পোড়ামুখে, যেন কত অন্যায় বলেছি।"

হারাণের বৌ একবার পিছনের দিকে দেখিয়া লয়, তাহার পর দুয়ারের দিকে গলাটা আর একটু বাড়াইয়া বলে—"হ্যাঁগা, তাই কি বল্লু? অন্যায় বলবে কেন? তবে একটু আবার নোকদেকানিও রাখতে হয়, নতুন শ্বশুরবাড়ির সুখ্যেত একটু রেখে ঢেকেই করতে হয়,—নইলে এই তো তোমার সগ্‌গভূমি, এইখানে নাতিনাতকুড় নিয়ে, পাকা চুলে সিঁদুর প'রে..."

গিরিবালা মৃদু ধমক দিয়া উঠেন—"আচ্ছা তুই থাম্, খড়দার মাগোঁসাই, এলেন।"

"মামিমা।" বলিয়া খেতনের বৌ আসিয়া উপস্থিত হয়।...

এদের কথাটা বলাই হয় নাই। বৌ-ভাতের দিন বাড়িতে নতুন দুইটি লোক আসিয়া গিরিবালার বয়স এবং গুরুত্ব হঠাৎ বাড়াইয়া দিল। কয়েকজন সমবয়সীর সহিত পান সাজিতেছিলেন, "মামিমা কোথায় গো?"—বলিয়া একটি প্রায় তাঁহার স্বামীর বয়সের যুবক আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন। দলের মধ্যে যে কয়জন বৌ ছিল তাহারা তাড়াতাড়ি

BanglaBook.org

ঘোমটা নামাইয়া দিল, দুই একজন পাড়ার ঝিউড়ি মেয়েও ছিল, বলিল—"ঐ তোমার মামিমা, খেতনদাদা।"

এই সময় মনোমোহিনী দেবীও আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন—"উঠে আয় বৌ, প্রণাম করুক ; এই আমার ছেলে খেতন।...আয় উঠে। দেখো! মামি হয়ে কোথায় জোর করে প্রণাম আদায় করবে তা নয়, আরও কুঁকড়ে মুকড়ে বসে রইল!"

কতকটা ভয়ে ভয়ে গিরিবালা উঠিয়া আসিলেন। "এখন বড় তাড়াতাড়ি, কিন্তু ঘোমটা চলবে না মামিমা, তা বলে রাখছি"—বলিয়া খেতন প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে মনোমোহিনী দেবী পিছনে মুখ ফিরাইয়া ডাকিলেন—"এবার তুমি এসো বৌমা।"

দুয়ারের পাশে একটি অবগুণ্ঠিতা বধূ দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনোমোহিনী দেবী বলিলেন—"দেখো হলোচাষার মেয়ের কাণ্ড! দাঁড়িয়ে রইলে, মামিশাশুড়ীকে প্রণাম করো।...এই তোর ছেলে-বৌ, বৌ একটু দেখবি শুনবি, আমার তো মরবার ফুরসত থাকে না। দেখবি শুনবি একটু, বড় অভাগ্য ওরা..."

শেষের কথা কয়টিতে গলাটা ধরিয়া যাওয়ায় মুখটা ঘুরাইয়া চলিয়া গেলেন।

অতবড় একটা ছেলের মুখে মা-ডাক শোনায় অত সঙ্কোচের মধ্যেও একটা অদ্ভুত ধরনের ভাব একটা আভাসের আকারে গিরিবালার মনটাকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল। মনোমোহিনী দেবী যখন 'এই তোর ছেলেবৌ'—বলিয়া তাহাদের ভারার্পণ করিলেন, সেই অনুভূতিটি গাঢ় হইয়া ফিরিয়া আসিল যেন। অবশ্য প্রণামের পর গিন্নি-বান্নিদের মতো বধূটির চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন লইতে পারিলেন না, তবে নিবিড় স্নেহে তাহার মাথাটি বুকে একটু চাপিয়া ধরিলেন। সঙ্গিনীদের বলিলেন—"তোমরা ততক্ষণ সাজো ভাই, আমি জামাটামা ছাড়িয়ে আনি বৌমাকে।" বধূকে ডাক দিলেন, "এসো বৌমা।"

সঙ্গিনীদের মধ্যে একজন বলিল—"ওমা, তুমি যে সদ্যসদ্য শাশুড়ী হয়ে বৌয়ের যত্ন-আত্যি করতে লেগে গেলে গো!"

সবাই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিতে গিরিবালা একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন এবং আরও সেই জন্যই ফিরিতে পারিলেন না ; বধূকে লইয়া চলিয়া গেলেন।

খেতন বিপিনবিহারীর চেয়ে বছর দু'একের ছোট, তবু যে তাহার বিবাহ হইয়া গেছে তাহার কারণ তিনি এবাড়ির ছেলে নয়, ভাগ্নে। তিনি মনোমোহিনী দেবীরও পুত্র নয়, তাহার বড় বোন হরমোহিনী দেবীর পুত্র। হরমোহিনী ছেলেকে তিন মাসের রাখিয়া মারা যান। অত ছোট শিশুকে মানুষ করিয়া তুলিয়া মনোমোহিনী দেবীরও মনে পড়ে না যে তিনি মাসি মাত্র, খেতনও ভাবিবার ফুরসত পান না যে উনি মা নয়। তাহার উপর বিধাতা মনোমোহিনীকে নিজের সন্তান দিলেন না—অর্থাৎ এমন কেহ আসিল না যে মাসি-বোনপোর এই ভ্রান্তিটিকে দ্বিধাগ্রস্ত করিতে পারে। শুধু তাহাই নয়, পরের সন্তান পাওয়ায় যে একটি অভিনবত্ব আছে তাহার সহিত নিজের সন্তান না-পাওয়ার বেদনাটা মিশিয়া অনধিকারের মাতৃত্বকে করিয়া তুলিল আরও নিবিড়।

এদিককার ইতিহাস এই যে ভগবতীচরণের পুত্রসন্তান না থাকায় বিবাহের কয়েক বৎসর পর হইতেই মনোমোহিনী দেবী স্থায়ীভাবে পিতৃগৃহেই আছেন। স্বামী টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তিনিও একদিন ছাড়িয়া ছুড়িয়া চলিয়া আসিলেন ও ঘরজামাই হইয়া সাঁতরাতেই কায়েমী হইয়া রহিলেন। অকর্মণ্য গোছের মানুষটি, তর্ক

লইয়াছিলেন, সেটুকু পর্যন্ত বাদ পড়ায় যেন জড়ভরত হইয়া শ্বশুরবাড়ির নিশ্চেষ্ট জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

খেতন বাড়িতে থাকিয়াই কাকার কাছে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন, যেন সম্বন্ধের স্বাভাবিকত্ব ফিরাইয়া আনিবার জন্য—তিনি তো ওঁদেরই। এই সূত্র ধরিয়াই বিবাহও হইল ঐ পরিবারেরই ক্রমপর্যায়ে, নহিলে ছোট খুড়তুত ভাইয়ের পথ বন্ধ থাকে। খেতনের জীবনে অস্বাভাবিকই স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছিল—নিজের বাড়ির প্রবাস অসহ্য হইয়া উঠিল। আবার সেই সাঁতরা, এবার থেকে নিজের করিয়া লইয়াই। এই ব্যবস্থাই পাকা হইয়া গেছে।

"খেতন আসবে...খেতন বৌভাতের দিন আসবে..." এই গোছের কথা একআধবার শুনিয়াছিলেন গিরিবালা ; কিন্তু স্বভাবটা খুব অনুসন্ধিৎসু নয় বলিয়া কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন নাই, এমন তো উৎসব উপলক্ষে কত আত্মীয়-কুটুম্ব যাওয়া আসা করিতেছে।

অতবড় খেতন পরিবার লইয়া আসিয়া তাঁহাকে যে শুধু বিস্মিত ও অভিভূত করিয়া ফেলিল এইটুকুই নয়, বাবা জেঠাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সেই অকাল-মাতৃত্ব যে সুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাকেও যেন ডাক দিয়া জাগাইয়া তুলিল। বধূটি তাঁহার চেয়েও ছেলেমানুষ, বছর-দশে বিবাহ হইয়াছিল, এখন এগারো, মাস দুই তিন বেশি হইবে, দিব্য ফুটফুটেটি কিন্তু রুগ্‌ণ, অসুখে পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়াই আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল। —অর্থাৎ বয়সে এবং স্বাস্থ্যে এমন যে, শুধু করুণাই জাগায় না, নাড়াচাড়া করিতেও কোন অসুবিধা হয় না। গিরিবালা বেশ অনায়াসে এবং খুব তৎপরতার সহিতই শাশুড়ী হইয়া বসিলেন। ধোওয়ানো, মোছানো, সাজানো, দুটো মিষ্টি কথা বলা, প্রয়োজন হইলে একটু ধমকও, ওর সেই খেলাঘরের স্বর্গটাই অন্যরূপ ধরিয়া যেন আবার ফিরিয়া আসিল।

এইবার গোড়ার কথায় ফিরিয়া আসা যাক।—

"মামিমা" বলিয়া খেতনের বৌ আসিয়া প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে গিরিবালাকে জড়াইয়া ধরিয়া কতকটা আবদারের সুরে বলিল—"আমিও যাব।"

গিরিবালা একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় গো।"

"কথকতা শুনতে। মা বলেছেন—বুঝব না সুঝব না মিছিমিছি ভিড়ের মধ্যে গিয়ে কি হবে? দুর্বল শরীর...আমি কিন্তু খুব বুঝব।"

চৌধুরী পাড়ায় গৌরাঙ্গদেবের মন্দিরপ্রাঙ্গণে কথকতা হইতেছে—কাজ থেকে ফুরসত হইয়াছে, আজ এ বাড়ির মেয়েরা যাইবে ; মনোমোহিনী গিরিবালাকে লইয়া যাইবেন বলিয়াছেন। গিরিবালা রীতিমত একজন মামিশাশুড়ীর মতোই বেশ একটু গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন,—"না হয় ধরে নিলুম বুঝবে ; কিন্তু শরীরটা তো দুর্বলই তোমার বৌমা ; চলে তোমার অত লোকের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে বসে থাকা?"

বধূ আরও আবদার ধরিল—"খুব চলে, আমার অব্যেস আছে। তুমি একবার বলো মামিমা, তুমি বললেই হবে।"

"না হয় বুঝলাম—হবে ; কিন্তু আক্কেল খুইয়ে বলব কি করে মা? রোগা মানুষ।"

"আমার তো আজ পাঁচদিন জ্বর নেই।"

গিরিবালা এবার হারাণের বৌকে সাক্ষী মানিলেন—বলিলেন—"শুনলি রামীর মা?

Banglabook.org

পাঁচটা দিন জ্বর নেই বলে উনি আর রোগা হলেন না! এদিকে হাড়-ক'খানা একটি একটি করে গোনা যায়! তুই-ই বল...”

হরাণের বৌ আবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসির মধ্যে টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল—“ওমা, একলা কত হাসব! দুজনেই কনে বৌ, কে কাকে নিয়ে যায় ঠিক নেই,—কী শাশুড়ীগিরির ছিষ্টি গিরিদিদিমণির! কী মুখের ভাব, কথারই বা কী যে বাঁধুনি—বসে বসে ত্যাখন থেকে তাই দেখছি। আমার তো আর তর-সইছে না বাপু, কবে যাব বেলে-তেজপুর, গিয়ে গিরিদিদিমণির গিন্নিপনার কথা শোনাব সবাইকে...”

অপ্রতিভ হইয়া গিরিবালা রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“তুই এক্ষুনি যা পোড়ারমুখী, বেরো। কাজ নেই কম্ম নেই শুধু বসে বসে গেলা আর পরের ব্যাখ্যানা করা। যা বেরো। এবারে গিয়ে হারাণকে বলে যদি তোকে ঝ্যাঁটা না খাওয়াই তো...”

রাগিয়া যাওয়ায় হারাণের বৌয়ের হাসি আরও দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। মুখে আঁচল ঠুসিয়া দিয়াছিল, আঁচলটা একবার একটু বাহির করিয়া বলিল—“তাহলে তার নিজের পিঠে কুলো বেঁধে আসতে বলো...”

স্বামীভক্তির বিস্ময়কর নমুনা দেখিয়া এরা দুজনে অবাক হইয়া চাহিতেই হারাণের বৌ আবার মুখে আঁচল দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

॥ ৭ ॥

ভগবতীচরণের 'দিন' দেখিতে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। ভিতরের কথা, তাঁহার রুক্ষ জীবনটা একদিকে পুত্রবধূ, একদিকে নাতবৌ—দু'জনে মিলিয়া স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। এই সুমিষ্ট সমাবেশটি তিনি ভাঙিতে পারিতেছেন না, গিরিবালাকে আরও কয়দিন থাকিয়া যাইতে হইল। এদিকে যেমন ধরিয়া রাখিলেন, অন্য দিক দিয়া—মুক্তিও দিলেন খানিকটা। মনোমোহিনী দেবীকে বলিয়া দিলেন—“বৌমাকে আর নাতবৌকে মাঝে মাঝে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে আনিস মোনু, 'কনেবৌ কনেবৌ'—করে অত আবদ্ধ করে রাখবার কোন দরকার দেখি না; ছেলেমানুষ হাঁপিয়ে উঠবে যে!”

ছেলেমানুষের পা, চলার জন্য চুলকায়ই, তায় এই আশকারাটুকু পাইয়া দুজনে সমস্ত দিন কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত থাকেন। চর হইয়াছে চণ্ডীচরণ, তাহার সহায়ক সাতকড়ি, খবর আনিয়া হাজির করে।—সাতকড়ি আবার পাড়াগাঁয়ের ছেলে, দূতবৃত্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

আহারাদি সারিয়া ভগবতীচরণ শয্যাআশ্রয় করিয়াছেন, দুই বধূতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—

গিরিবালা শয্যার একপাশে বসিয়া পা দুটি কোলে তুলিয়া লইলেন। নাতবৌ বলিল —“তুমি দুটো পা-ই দখল করে নিলে মামিমা; আমি কি করব?...বেশ্ আমি পাকাচুল তুলি দাদুর।”

ভগবতীচরণ হাসিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ সেই ঠিক, পাকাচুলে খেতুর পাশে টেক্কা দিয়ে দাঁড়াতে পারব কেন?”

BanglaBook.org

বিদ্রূপটিতে দুই বধূতে অলক্ষ্যে একটু হাসির বিনিময় হইল ; তাহার পর আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি ; অর্থাৎ আসল কথাটা কে পাড়িবে? বেশির ভাগ গিরিবালাই পাড়েন। পা টিপিতে টিপিতে বলিলেন—"আজ নাকি কথকতার শেষ দিন জেঠামশাই!"

কিসের উপক্রমমিকা ভগবতীচরণ সেটা বেশ বুঝেন, তবু কি রকম চতুরালির আকারে আসল কথাটি আনিয়া ফেলা হয় সেইটুকু লক্ষ্য করিবার জন্য বলিলেন—"খোঁজ রাখিনি তো মা?"

একটু চুপচাপ গেল। গিরিবালা একটু ভাবিলেন, চণ্ডীচরণের নামটা করিতে চান না। খেতনের বৌকে প্রশ্ন করিলেন—"কে যেন এই রকম বলছিল, না গা বৌমা? তুমি শোন নি?"

বধূ মুখের পানে একবার চকিত দৃষ্টি ফেলিয়া উত্তর দিল—"শুনছিলাম যেন ; তবে হাতে কাজ ছিল ; অত কান দিই নি।"

যুগ্ম চতুরালির সূক্ষ্মতায় ভগবতীচরণের বুকের মধ্যে একটি হাসি গুরগুর করিয়া উঠিতেছে, আত্মসংবরণ করিয়া নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিলেন—"বাঁচা গেল, শেষ হল, যেন বিরক্তি লাগিয়ে দিয়েছিল।"

দুই বধূতে আবার অলক্ষ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি হইল, দৃষ্টি একটু নিষ্প্রভ। একটু পরে গিরিবালা বলিলেন—"বাঁচা গেল তো নিশ্চয়ই, সন্ধ্যেটি হল কি চিৎকার আরম্ভ, —কান যেন ঝালাপালা বাপু!"

একটু পরে বলিলেন—"আর কিছু নয়, শেষটা শোনা হল না, আধকপালে না ধরে ; পরশু আমাদের না গেলেই ছিল ভালো। ঠাকুরঝি বললেন—'না' বলতেও পারলাম না, গুরুজন তো?"

খেতনের বৌ বলিল—"আমার তো আরম্ভই হয়ে গেছে, কপাল-টিপটিপিনি ; তাই ভাবছিলাম, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এরকম।"

গিরিবালা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বধূর পানে চাহিলেন—অর্থাৎ চুপ করো তুমি, বাড়াবাড়ি হইয়া যাইতেছে।

ভগবতীচরণ আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, সজোরেই হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"নাতবৌ, তোর হাতটা একটু সরা ; পাকা চুল তুলবি কি, তোর তাবিজের পুঁটেটা গলায় লেগে সুড়সুড়ি লাগছে।"

গিরিবালাকে বলিলেন—"তাহলে আজও একবার যাবে নাকি?—তা যেও, মোনুকে বলে দেব। নাতবৌয়েরও গেলে ভালো হতো ; কিন্তু..."

খেতনের বৌ একেবারে মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, আর চাতুরির ধারেও না গিয়া সোজাসুজি আবদার ধরিয়া বলিল—"যাব দাদু, আমিও, কেন যাব না? বাঃ!"

ভগবতীচরণ বলিলেন—"তুই যে এই নিজেই বললি মাথা টিপ-টিপ করছে? কি গো বৌমা, বললে না?"

পিঠের উপর দিয়া আবার শুষ্ক মুখে উভয়ে উভয়ের পানে চাহিলেন। গিরিবালা ঠোঁট দুইটি একটু কুঞ্চিত করিলেন—অর্থাৎ, তুমি নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল বসালে যে!

মেয়েটি একে বয়সে একটু বেশি ছোট, তায় অজ পাড়াগাঁয়ের, একটু চুপ করিয়া

BanglaBook.org

বলিল—"তুমি ওষুধ চেন না দাদু, শুনলে—অদ্দেক শুনেই এই আধকপালটা ধরছে আমার, পুরোটা না শুনলে কখনও সারে?"

দুইবার কথকতা শোনা হইল। একদিন লাহিড়িদের বাড়িতে কীর্তন ; একদিন সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া শীতলা ঠাকুরও দেখা হইল।

যেদিন শীতলাতলায় গেলেন, মনটা একটা ব্যাপারে বড় নাড়া খাইল। উঁহারা গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলেন। মন্দিরের প্রায় কাছাকাছি রাস্তাটা রেল লাইনের উপর দিয়া আসিয়াছে, একটা ফটক আছে। একটা মালগাড়ি আসিতেছিল বলিয়া ফটকটা বন্ধ ছিল, গিরিবালাদের দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছেন, এমন সময় একবার পিছনে নজর পড়িতে দেখেন হাতদশেক দূরে একটি স্ত্রীলোক মাঝরাস্তার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া আছে, হাত দুইটি মাথার উপর দিয়া সামনে গিয়া যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। হাতে একটা কাঠি ছিল, তাহা দিয়া ভূমিতে একটা দাগ কাটিয়া কাটিয়া স্ত্রীলোকটি তখনই উঠিয়া দাঁড়াইল। ভিজা কাপড়, ভিজা এলো চুল, কপালে-নাকে-মুখে, কাপড়ে রাস্তার ধূলা লাগিয়া লালচে কাদা হইয়া গেছে ; বয়স গিরিবালার হিসাবে মনে হইল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝামাঝি। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া যে-দাগটি কাটিয়াছিল তাহার উপর আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর আবার ধীরে ধীরে রাস্তার উপর সেইভাবে হস্ত প্রসারিত করিয়া সটান শুইয়া পড়িল। গিরিবালার অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ হইল ; একবার মনে হইল পাগল ; কিন্তু ঘোমটার ভিতর হইতে কয়েকটা মুখের পানে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, আর কাহারও মুখে কোন কৌতূহল বা বিস্ময়ের ভাব নাই, শুধু যাহারা নেহাত সামনা-সামনি পড়িল তাহারা পথ ছাড়িয়া একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। স্ত্রীলোকটি বার কয়েক ঐ রকম করিয়া ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় লাগিল। নিজের মনেই কথাটা একটু তোলপাড় করিয়া গেল। ফটক খুলিল, দুইদিকের অবরুদ্ধ জনতা লাইন পার হইল। ওপারে গিয়া গিরিবালা একবার ঘুরিয়া দেখিলেন স্ত্রীলোকটি তখনও লাইনের উপর শুইয়া আছে। মনোমোহিনী দেবীর হাতে একটা মৃদু টান দিয়া ফিস ফিস করিয়া ডাকিলেন—"ঠাকুরঝি!"

উত্তর হইল—"কি?"

"ও বুড়িটা ওরকম করছে কেন? পেছনে চেয়ে দেখো না।"

মনোমোহিনী দেবী একবার ঘুরিয়া দেখিয়া বলিলেন—"দণ্ডী কাটছে।"

গিরিবালার যেন মনে হইল কথাটা কোথাও শুনিয়া থাকিবেন, স্বরূপটা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় লাগিল। নিজের মনেই কথাটা একটু তোলপাড় করিয়া একটু পরে আবার প্রশ্ন করিলেন—"কেন ঠাকুরঝি?"

"মানত আছে বোধ হয় ছেলেটেলের জন্যে।"

উত্তরের সংক্ষিপ্ততা দেখিয়া গিরিবালা আর প্রশ্ন করিলেন না ; কনেবৌয়ের যে রাস্তায় বাচালতা করিতে নাই ঠাকুরঝি একথা পূর্বে কয়েকবার বলিয়া দিয়াছেন।

মনোমোহিনী শীতলাতলায় দেব-দর্শন করিয়া পূজার জন্য চিনি, সন্দেশ, ডাব আর ফুল পুরুতের পাশে রাখিয়া দিলেন, তাহার পর বাহিরে বারান্দায় আসিয়া জপে বসিলেন।

আজ কি একটা তিথি-যোগ আছে, বেশ ভিড় হইয়াছে। বয়স্থা এবং কয়েকজন অল্পবয়সী বিধবা, যাহারা জপে বসিয়াছে তাহারা একটু আলাদা হইয়া মন্দিরের দুয়ার

Banglabook.org

ঘেঁষিয়া বসিয়াছে। আর সবাই একটু দূরে। ইহারাও পূজা দিতে আসিয়াছে, কাহারও বলিদান মানসিক করা আছে, কেহ সাদাপূজা দিয়া আরতি দেখিয়া চলিয়া যাইবে। ইহাদের মধ্যে যে মাত্র পূজাসংক্রান্ত কথাবার্তা হইতেছে এমন নয়। মনোমোহিনীর নির্দেশে গিরিবালা ইহাদেরই একপাশটিতে গিয়া বসিলেন।

একজন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিল গিরিবালার। বয়স খুব বেশি নয়, বেশ মোটাসোঁটা, টকটকে রং, খুব দামী একটা বেনারসী শাড়ি পরা, গায়ে একগা গহনা। সঙ্গে একটি বছর দু'য়েকের ছেলে, সায়েবের ছেলেদের পোশাক পরা। রং, মুখশ্রী কতকটা মায়েরই মতন। একটু দুরন্ত ছেলে, এর পিঠের উপর দিয়া, ওর কোল মাড়াইয়া, কাহারও খোঁপা টানিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মা উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দু'একবার চাপা স্বরে—"ঝি! ঝি!" করিয়া ডাকিল, উত্তর না পাইয়া সেইভাবেই ছেলেটাকে ডাকিয়া বলিল—"বোস্ এসে, নৈলে আস্ত পুঁতে ফেলব উঠে।"

সমস্ত দলটা যেন শিহরিয়া উঠিল, গিরিবালার বুকটাও ছাঁত করিয়া উঠিল।

কয়েকজন মৃদু ভর্ৎসনাও করিল—"ষাট্ ষাট্...বালাই...ওরকম করে বলে মা?...এই মন্দিরের বসে?"

বর্ষীয়সীদের মধ্যে কয়েকজন একটু রুক্ষ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিল। মেয়েটি কাহারও কথায় কোন উত্তর না দিয়া মুখ বার করিয়া বসিয়া রহিল। ছেলেটির ভ্রূক্ষেপ নাই, ঘুরিতে ঘুরিতে একবার গিরিবালার পাশে আসিয়া হঠাৎ তাহার ঘোমটাটুকু দুইহাতে তুলিয়া ধরিয়া মুখটা ঝুঁকাইয়া বলিল—"বৌমা।"

ছেলেটিকে কোলে লইবার জন্য গিরিবালার বড় ইচ্ছা করিতেছিল, হাতের এত কাছে পাইয়া, তাহার হাতটা ধরিয়া কোলে টানিবেন, "কৈ খোকাবাবু?"—বলিয়া একটি মাঝবয়সী স্ত্রীলোক আসিয়া বারান্দার বাহিরে দাঁড়াইল। বেশ ভালো কাপড় গহনাগাঁটি পরা, ঝি বলিয়া চেনা যায় না।

মেয়েটি ঝাঁঝিয়া উঠিল—"চল্ তুই বাড়ি আজ, থাকিস কোথায়? আমি ঐ হতভাগা আপোদকে সামলাবো, না পুজোর দিকে মন দোব?"

দলের মধ্যে এবার আর বিশেষ কেহ কিছু বলিল না, যেন সবাই গুম্ হইয়া গেছে। একজন শুধু যেন সহ্য করিতে না পারিয়াই উঠিয়া পড়িল, বাহিরে যাইতে যাইতে কহিল —"বললে আবার বাড়ায়!" মেয়েটি কোন উত্তরই দিল না। ঝি ছেলেটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

এই সময় রাস্তার সেই দণ্ডীকাটা স্ত্রীলোকটি বাহিরের রকে আসিয়া সেইভাবে শুইয়া পড়িল। এবার একটু বেশিক্ষণ রহিল। তাহার পর উঠিয়া একটু গলাটা তুলিয়া পাশের ভিড়ের দিকে চাহিয়া ডাকিল—"কৈ গো?"

একটি প্রায় গিরিবালার বয়সের মেয়ে একটি বছর সাত-আটের ছেলেকে সঙ্গে করিয়া পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলেটির হাতে একটি ছোট খুরিতে চিনি, সন্দেশ আর গোটাকতক ফুল; মেয়েটির ডান হাতে একটি ডাব, বাঁ হাতে ছেলেটিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

সমস্ত ব্যাপারটাই গিরিবালার কৌতূহল জাগাইয়াছিল, ছেলেটিকে দেখিয়া তিনি

BanglaBook.org

একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এত রোগা যে মনে হয় যেন হাড়কখানা শুধু চামড়া দিয়া ঢাকা, সমস্ত শরীরে যেন কে কালি ঢালিয়া দিয়াছে, আর তাহার উপর গাঢ়তর কালিতে থোবা-থোবা বসন্তের দাগ। মাথার অবস্থাও ঐ রকম, চুল নাই বলিলেই চলে। দুইজনেরই কাপড় জীর্ণ, তবে বোধ হয় দেবস্থানে আসার জন্য ধার দেওয়া।

এত দ্রষ্টব্য যে সেই সাহেবী পোশাকপরা শিশুটিও কোথা থেকে আসিয়া একটু মুখ তুলিয়া দাঁড়াইল। ঝি আসিয়া আবার তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া গেল।

ইহারা তিনজনে বারান্দায় একটি থাম ঘেঁষিয়া পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল।

গিরিবালা অপলকনেত্রে সব দেখিতেছেন। স্ত্রীলোকটি কি এক অদ্ভুত রকম করুণ দৃষ্টিতে ছেলেটির পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া মাথায় হাতটা বুলাইয়া দিয়া ভিতরে দেবীপ্রতিমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, তাহার পর উভয়ের নিকট হইতে পূজার সম্ভারগুলি লইল। তিনজনে একটু আগাইয়া আসিয়া বারান্দার থাম ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

স্ত্রীলোকটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই কাতরভাবে যাত্রীদের দু'একজনকে কি বলিল, গিরিবালা শুনিতে পাইলেন না। তাঁহার পাশেই একটি মেয়ে কতকটা যেন নিজের মনেই বলিল—"দিক না কেউ একবার কাউকে ডেকে বাপু, পুজোটা এসে নিয়ে যাক।"

ও-পাশের একটি মেয়ে প্রশ্ন করিল—"কি জাত ওরা?"

"কৈবর্ত ; মন্দিরে তো ঢুকবে না।"

একটু চুপচাপ গেল, তাহার পরও পাশের মেয়েটি ছেলেটির পানে চাহিয়া চাহিয়া কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিল—"কি করে বাঁচল ছেলেটা!"

গিরিবালার পাশের মেয়েটি উত্তর করিল—"বাঁচল—মায়ের,..."

ঐসময় আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া ওঠায় সবাই দাঁড়াইয়া পড়িল।

সামান্য দুইটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, আদিও জানা নাই, পরিণামে কি হইল তাহাও জানিতে পারিলেন না, তবু এই দুইটি সমস্ত দিনটা গিরিবালার মনটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। দুইটি শিশুই থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল একটি রুগ্ণ কদর্যতায়, প্রাণহীন শান্ত করুণ দৃষ্টিতে। আর একটি লাবণ্যে প্রাণের পরিপূর্ণ প্রাচুর্যে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের মা,—কোন দিক দিয়াই মিল নাই। গিরিবালার কেবলই মনে হইতেছিল বর্ষীয়সী জননীটির কথা। এতদিন যত মা দেখিয়াছেন তাহাদের মধ্যে তাহাকে বড় বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইল, মায়ে এতও করে? গিলিবালার শুধু জানা ছিল মা হইলে কতকগুলা ব্রত করিতে হয় ; এ যাহা দেখিলেন, তাঁহার কল্পনাতীত। সমস্ত দিন কাজের মধ্যে মধ্যে যখনই মনে পড়িয়াছে—সেই কাদামাখা শান্ত-দৃষ্টি মা,—একটুও নিজের কথা না ভাবিয়া হাজার লোকের পায়ের ধূলার উপর শুইয়া পড়িল—ঐ উঠিল—আবার শুইয়া পড়িল। এই একটা দৃশ্যই জুড়িয়া জুড়িয়া গিরিবালার যেন মনে হইল মায়ের এই বিরামহীন যাত্রা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়াছে। তাহার নিজের কিছু নাই—আহার নাই, নিদ্রা নাই, ভালোমন্দ বিচার নই ; অনশনে অনিদ্রায়, ঐরকম কাদামাখা কাপড়ে, হাতে মুখেও কাদা, দৃষ্টি আর সব হইতে নির্লিপ্ত—শুধু অনন্তপথ ধরিয়া দণ্ডী কাটিয়া চলিয়াছে, শুধুই চলিয়াছে।...ক্রমে আর সবই মিলাইয়া—মুছিয়া গিয়া—শুধু একজন মা রহিল—আর একটিমাত্র শিশু...আর সমস্ত জগতে যেন একটিমাত্র কাজ রহিল—দেবতার চরণ উদ্দেশ করিয়া অবিরাম দণ্ডী কাটিয়া যাওয়া। এখন আরও মা আসিল—দুলাল বাগদীর বৌ—

ছেঁড়া কাঁথায় জড়ান শিশুকন্যাকে লইয়া রসিকলালের পায়ের কাছে লুটাইয়া দিয়া বলিল-–"বাবাঠাকুর গো, বাঁচবে নি!"...আরও মা—গিরিবালাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া কবে একদিন যে-মেয়েটি নির্বাক ইঙ্গিতে কোলের শিশুকে দেখাইয়া একমুঠা ভিক্ষা চাহিয়াছিল, সে। সব মায়ের একই রূপ—নিজের বলিতে কিছু নাই, সন্তানের জন্য দণ্ডী, সন্তানের জন্য লজ্জাসরম ভুলিয়া সন্তানকে পরের পায়ে লুটান, সন্তানের জন্য কাতর অন্নভিক্ষা। কি অব্যক্ত বেদনায় গিরিবালার সমস্ত মন যেন মথিত হইয়া উঠে।...সাজগোজ পরা ছেলেটি হঠাৎ সামনে আসিয়া পড়িল—ঘোমটা তুলিয়া বলিতেছে, "বৌমা!"—কোলের মধ্যে পাইলেন না বলিয়া এমন একটা ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে গিরিবালার মনে সেই থেকে! আহা, ও-ও তো এদেরই মতো, ওপরেই না হয় একটা চাকচিক্য—ভিতরে ভিতরে তো এদেরই মতো অসহায়—যেমন সব মায়ের শিশুই অসহায়।...মা ওর বোঝে না কেন? বড়লোকের বাড়িতে ওরা কি মা হইতে পারে না?

সমস্ত দিন গিরিবালার মনটা কেমন যেন ভার-ভার হইয়া রহিল।—বর্ষীয়সী জননী পূজার দ্রব্য হাতে ছেলে আর মেয়েটিকে লইয়া থামের পাশটিতে দাঁড়াইয়া আছে।...ওর পূজা শেষ পর্যন্ত পহুঁছিল ঠাকুরের কাছে?..গিরিবালার পাশের মেয়েটি উত্তর করিল —"বাঁচলো মায়ের..." তাহার পরেই আরতি আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় কথাটা আর শেষ করা হয় নাই। গিরিবালার মনে একটা প্রশ্ন সেই থেকে লাগিয়া আছে—কোন্ মায়ের কথা বলিতে চাহিয়াছিল মেয়েটি?—ছেলেটির নিজের মায়ের, না মা-শীতলার?...সেই বড় মানুষের বৌটি নিশ্চয় যাইবার সময় মা শীতলার কাছে মাথা খুঁড়িয়া, মানত করিয়া গিয়াছে ছেলের কোন অকল্যাণই হইবার ভয় নাই নিশ্চয়।...না, অকল্যাণ হইবে না, গিরিবালার মন বলিতেছে। "সবাইকে নীরোগ রেখো মা"—বলিয়া যখন তিনি নিজে দেবীকে প্রণাম করিলেন, আর মনে হইল সাঁতরার আর বেলে-তেজপুরের সবাই আসিয়া মাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সেই রোগা ছেলেটি আর এই ছেলেটিও ছিল —মা শীতলা আশীর্বাদের জন্য ডাকিলেন বলিয়াই তো?

॥ ৮ ॥

এইসব দেখাশোনার মাঝে মাঝে কয়েক জায়গায় নিমন্ত্রণও খাইয়া আসিলেন, পরিচয়টা আরও বাড়িল, ষোল দিনের দিন গিরিবালা বেলে-তেজপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

জীবনে যে পরিবর্তনটা আসিয়াছে বাপের বাড়ির মুক্তি আর প্রচুর অবসরের মধ্যে গিরিবালা সেটা আরও ভালো করিয়া উপলব্ধি করিলেন। নিজেকে তো নিজের কাছেই অন্যরকম বোধ হইতেছে, বাড়ির সবার আর পাড়ার সবার মুখেও তাঁহাকে সম্ভাষণ করার, তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা কওয়ার ধরনটা অনেকটা বদলাইয়া গেছে, কতকটা যেন সম্ভ্রমের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। ঘোষালগিন্নির সহিত দেখা করিতে গেলেন। প্রথমটা ঘোষালগিন্নি যেন বিস্মিত হইয়া গেলেন, সে-ভাবটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"এই যে গিরি এয়েছে, কবে এলি গো?...কাল বিকেলে?...মাংবৌ, গিরিকে একটা কিছু পেতে দাও তো বাছা, ওর শ্বশুরবাড়ির গপ্প শুনি?"

বধূ একটি মাদুর লইয়া বাহিরে আসিল ; একেবারে পাতিয়া না দিয়া বলিল—"কেন,

BanglaBook.org

হঠাৎ কী এমন হয়ে এলেন ঠাকুরঝি যে, আসন পেতে দিতে হবে? দরকার পড়েছে নিজে বিছিয়ে নিয়েছে, না হয় ভুঁয়ে বসেছেন; আজ হঠাৎ এ অভ্যর্থনা কেন?"

গিরিবালা তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"এ গঞ্জনাই বা কেন?—এত কি পর হয়ে গেলাম?"

তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন। তাহারই মধ্যে মাদুরটা টানিয়া লইয়া গিরিবালা নিজেই বিছাইয়া লইলেন। ঘোষাল-গিন্নি বলিলেন—"তা সত্যি, নিজের বাড়িতে এল,...তবু কিন্তু হয় বাছা একটু, বিয়ে হলেই যেন মনে হয় একটু আলাদা হয়ে গেল,—হয় না? আদ্যিকাল থেকে চিরদিনই যে এই রকম হয়ে আসছে।"

বাড়িতেও কতকটা এই রকম অবস্থা। আগে প্রত্যহই জেঠামশাইয়ের সঙ্গে আহারে বসিতেন, যেদিন তাঁহার বেশি দেরি হইয়া যাইত সেদিন তিনি আহার করিয়া উঠিলে পাতে বসিতেন, সেদিন দুইবার খাওয়া হইত। অধিকস্থলে দেরিই হইয়া যাইত বলিয়া, পাতে বাসাটাই প্রায় নিয়ম হইয়া গিয়াছিল।

আহারে বসিয়া অন্নদাচরণ ডাকিলেন—"কৈ গো গিরি, আয়, বোস।"

গিরিবালা উপস্থিত হইলে বলিলেন—"একটা পিঁড়ে কি আসন নিয়ে বসবি নি?"

আগের দিনই ঘোষালবাড়ি গিয়াছিলেন, গিরিবালা বলিলেন—"এই বেশ জেঠামশাই, কবেই বা আসন পেতে বসেছি যে..."

অন্নদাচরণ যেন একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—"তা তো বটেই, নিজের বাড়িতে কে আর সর্বদা পিঁড়ে টেনে টেনে...?...কাপড়টা ময়লা হবে তাই বলছিলাম..."

একটু পরে সোজা হইয়া বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"কেমন লোক সব ওরা?...আগে, কেমন নতুন জেঠামশাই পেলি বল।"

গিরিবালা উৎসাহের সহিত বলিলেন—"খুব চমৎকার মানুষ জেঠামশাই, আগে একটু রাগী খিটখিটে ছিলেন..."

ওইখানে নিজের নাকি একটু কৃতিত্ব আছে, গিরিবালা কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়াই চুপ করিয়া গেলেন।

অন্নদাচরণ বলিলেন—"ভালোই হল; পুরনো জেঠামশাইকে শীগ্‌গির ভুলতে পারবি।"

আগে এ ধরনের কথায় যে রকম অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া জবাব দিতেন, গিরিবালা সেরকম পারিলেন না, যদিও আজই নিজের ভুলটা বেশ করিয়া বুঝিতে পারিলেন—এই যে নতুন জীবনের এত বেশি করিয়া প্রশংসা করাটা; বেশি করিয়া কষ্টও হইল। লজ্জিত হইয়া মাত্র একটু মাথা নিচু করিলেন।...গল্প হইল, এর পর উচ্ছ্বাসটা যথাসম্ভব বাদ দিয়াই গল্প করিলেন গিরিবালা—সবাই লোক এমন কিছু মন্দ নয়,—তবে জেঠশাশুড়ী একটু চাপা লোক, কম কথা কন, ব্যবহার অবশ্য মন্দ নয়।...সাঁতরার গঙ্গার ঘাটটি চমৎকার,—তাই বলিয়া কি অমন কোথাও নাই বলিতে হইবে? তবে হ্যাঁ, বেশ জায়গাটি।...

আর উচ্ছ্বাসের দিকে যান না গিরিবালা, তবে শ্বশুরবাড়ির যাহা কিছু সুন্দর তাহার সম্বন্ধে বলিবার জন্য একটা আবেগও জাগে ভিতরে। বলেন— "ভয় ছিল জেঠামশাই,

BanglaBook.org

সেখানে বুঝি সিংহবাহিনীর মতন বড় ঠাকুর-টাকুর কিছু নেই। তা দেখলাম, শেতলাঠাকুর রয়েছেন। দিব্যি মন্দির, ভাঁড়ার ঘর, নাটমঞ্চ ; তা বলে কি বলতে হবে সিংহবাহিনীতলার মতন? তা নয় তবু...”

আহার শেষ হইল। আগে অন্নদাচরণের পাতে কিছু কিছু থাকিত, আবার কিছু কিছু চাহিয়াও লইতেন গিরিবালার জন্য। কিরকম অন্যমনস্ক হইয়া গেছেন, পাতে বিশেষ কিছু তো রহিলই না, যখন চৈতন্য হইল, তখন চাহিতে গিয়া মুখে যেন আটকাইয়া গেল। চকিতে একবার পরিবর্তিতা কন্যার পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন।

পরের দিনও এইরকম গল্প চলিল। আহার যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে বসন্তকুমারী বলিলেন,—“ওগো, গিরির দুঃখু যে তোমার পাতে...”

গিরিবালা জেঠাইমার পানে ফিরিয়া চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—“যাও, কখন বললাম?”

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটিয়াই রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।

বসন্তকুমারী নিজেই দুটি কলা আরও খানিকটা দুধ লইয়া আসিলেন, বলিলেন,—“তোমরা মনে কর, বিয়ে হলেই মেয়ে বড় হয়ে গেল, পর হয়ে গেল, সে আর পাতে খাবার যুগ্যি রইল না, কত কি ; তা কখনও হয় গা?”

“আর কদিনই বা খাবে?” বলিয়া অন্নদাচরণ বাকি দ্রব্যগুলি মাত্র একপ্রকার স্পর্শ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। কপালের ঘাম ঝাড়িবার সময় বসন্তকুমারীর মনে হইল যেন একবার চোখের উপরও আঙুল ক'টা বুলাইয়া লইলেন।

বেলে-তেজপুরে থাকিবার দিন গোনাগুনতি, তাহারই মধ্যে গিরিবালা দেখাশুনার পাঠ যতটা সম্ভব সারিয়া লইলেন। নেহাত আটকে না পড়িয়া গেলে বসন্তকুমারী সঙ্গে থাকেন। গিরিবালারও একলা যাইতে কিরকম বোধ হয়, বসন্তকুমারীরও সাধ, নূতন শ্রীতে দেওর-ঝিকে দেখাইয়া ফিরেন একটু! এ ভিন্ন প্রায় প্রতিদিনই নিমন্ত্রণের হিড়িক লাগিয়াই রহিল—কন্যা, জামাতা উভয়েরই! এমন কি একদিন নিকুঞ্জলালের বাড়িও নিমন্ত্রণ হইল। দামিনী আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেলেন, বলিলেন—“দাদাকে আজ জেলায় যেতে হল, বৌয়েরও শরীরটা খারাপ—ও তো লেগেই আছে, কবে যে ভালো থেকে উপগার করলেন—ভেবেছিলাম দুদিন পরেই খাওয়াব, তা শুনছি ধুলো-পায়েই নাকি জামাই নিয়ে যাবেন গিরিকে?”

খোঁচা না দিলে দামিনীই নয় ; খোঁচাটুকু বরং আরও তীক্ষ্ণ করিয়া দিলেন, একটু ঠোঁটটা কুঁচকাইয়া বলিলেন—“বাবুজী আমাদের পশ্চিমে পালোয়ান, বারণ করে বলতেও বোধ হয় কারুর সাহস হয় না।”

বসন্তকুমারী বলিলেন—“সেই জন্যেই তো বড়ঠাকুর একটি বুড়ো-সুড়ো গোবর-গণেশের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন, উঠতে বললে উঠত বসতে বললে বসত। ওঁরা জ্ঞানী বিচক্ষণ লোক, অনেক দেখেছেন তো?”

আরও একটু খোঁচা দিলেন,—“আর তোমাদের বাড়িতে খাবে, তাই নকি আবার নেমন্তন্ন!—গিরিবালা দুই জেঠাকে কখনও আলাদা ভাবতে শেখেনি,—সুবিধে মতন আবদার করে কেড়েকুড়ে খেয়ে আসত।...ভালোবাসতেন বলেই তো বড়ঠাকুর ভালো ঘরে দেবার যোগাড় করেছিলেন গা?”

BanglaBook.org

একদিন নিমন্ত্রণ হইল পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়িতে। গিরিবালা যেদিন আসিলেন তাহার তৃতীয় দিনে।

যেদিন আসিলেন তাহার পরদিন সকাল থেকেই জোর বৃষ্টি আরম্ভ হইল। খুব জোর বৃষ্টি,—পথ চলার কাজ বন্ধ করিয়া দিয়া সমস্ত গ্রামখানি যেন গৃহাশ্রয়ী হইয়া বসিয়া রহিল। পণ্ডিতমশাই কয়েকবার দাওয়ায় আসিয়া নিচু হইয়া সমস্ত আকাশটা দেখিলেন, বৃষ্টি ধরণের কোনই লক্ষণ না দেখিয়া বাঁশের ছাতাটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

ছাতায় ধারাপাতের শব্দ হইতেই সামনের ঘর হইতে গৃহিণী বাহির হইলেন। পণ্ডিতমশাই বলিলেন—"এই এখুনি আসছি একটু এখান থেকে।"

গৃহিণী নিজের মনেই গর গর করিতে লাগিলেন—"এখুনি আসছি!...চললেন এই বৃষ্টি মাথায় করে রসিকের জামাই দেখতে।...সে তো পালিয়ে যাচ্ছে না।"

যখন পৌঁছিলেন তখন বৃষ্টির ছাটে বেশ খানিকটা ভিজিয়া গেছেন। বাহিরের ঘরে দাওয়ায় উঠিয়া রসিকলালকে ডাক দিলেন। বৃষ্টির আওয়াজের জন্য তিন-চারিবার ডাকিতে হইল। তাহার পর উত্তর হইল—"কে? দাঁড়াও আসছি।"

পণ্ডিতমশাইয়ের বুকটা দমিয়া গেল। অন্নদাচরণের আওয়াজ! রসিকলালের কাব্যচর্চায় ইন্ধন যোগান বলিয়া এ বাড়ির লোকে, বিশেষ করিয়া অন্নদাচরণ যে তাঁহাকে খুব প্রীতির চক্ষে দেখেন না এটা পণ্ডিতমশাইয়ের জানা। তিনি আসেনও না কখন এখানে, আজ আকাশের বারিপাতের মতোই কি একটা আবেগে সব ভুলিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, কেমন অহেতুক ভাবেই মনে হইয়াছিল গিয়াই রসিকলালের সহিত দেখা হইবে, অন্নদাচরণের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনাটাই মনে হয় নাই। কী যে করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

ছাতা মাথায় দিয়া ছপ্ ছপ্ করিতে করিতে অন্নদাচরণ বাহিরে আসিলেন। নিচে থেকেই দেখিয়া বিস্মিতভাবে ক্ষণমাত্র থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া ঘুরিয়া দাওয়ায় উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"পণ্ডিতমশাই, আপনি!"

পণ্ডিতমশাই সঙ্কুচিতভাবে স্খলিতকণ্ঠে বলিলেন—"এই একবার ইয়ের বাড়ি যাচ্ছিলাম—হঠাৎ হুড়-হুড় করে বর্ষাটা নামল—তাই পথ ছেড়ে উঠে পড়লাম।"

অন্নদাচরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—"আমার সৌভাগ্যি; হঠাৎ যে আপনার পায়ের ধুলো পড়বে আজ!...দাওয়ায় দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে চলুন—ছাট আসছে বৃষ্টির..."

এরকম প্রাণখোলা অভ্যর্থনা আশা করেন নাই, পণ্ডিতমশাই একটু বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবু রহস্যপ্রবণ পণ্ডিত লোক, একটু হাসিয়া বলিলেন—"পায়ের ধুলোর কথা বললে অন্নদাচরণ, কিন্তু রয়েছে কাদা; থাক।"

অন্নদাচরণ হাসিয়া উত্তর করিলেন—"কাদা তো আরও বড় সম্পদ পণ্ডিতমশাই, কায়েমী হয়ে থাকবে।...না, সে কি হয়? ভেতরে চলুন। আর কাপড়টাও ছেড়ে ফেলুন। দাঁড়ান..."

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাতুকে একবার ডাকিলেন, উত্তর না পাইয়া নিজেই তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গিয়া একখানি বস্ত্র লইয়া আসিলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে রসিকলালও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন—"এ দুর্যোগে বেরিয়ে আপনি বড় ভুল

BanglaBook.org

করেছেন। আমাদের অবশ্য লাভই, তবে...”

পণ্ডিতমশাই কাপড় ছাড়িলে সকলে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিলেন। দুই ভাইয়ে কৃতার্থ হইয়া গেছেন, রসিকলাল একেবারে নীরব, শুধু মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অন্নদাচরণ বলিয়া চলিয়াছেন—“আপনার আশীর্বাদে আমরা যে কী ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছি জানেনই। শুধু একটা দুঃখু থেকে গেল আপনার নাতনির বিয়েতে আপনাকে পাওয়া গেল না, অথচ আপনিই সব ঠিক করলেন। আমি কিন্তু গিয়েছিলাম পণ্ডিতমশাই, নিজে গিয়েছিলাম আমি আপনার বাড়িতে, গিয়ে শুনলাম, আপনি দু'দিন আগে বাইরে চলে গেছেন। আমার যে কী মনে হল—কোন উপায়ও নেই শুভ কাজ পেছিয়ে দেওয়ার...আর তখন মাথারই কি ঠিক আছে?...সব শুনেছেন তো? যাই হোক, শুভ কাজটা ভালোয় ভালোয়...তা সম্পূর্ণ যে ভালোয় ভালোয় তাই বা কি করে বলি?”

পণ্ডিতমশাই স্মিত হাস্যের সহিত বলিলেন—“একেবারে সুশৃঙ্খলায় তো এ-বিবাহ হবার নয়...বলিনি তোমায় রসিক?”

রসিকলাল মৃদুহাস্য করিলেন।

অন্নদাচরণ বলিলেন—“দেখ, দুজনেই ভুলে বসে আছি!—একটু তামাক চাই যে পণ্ডিতমশাইয়ের জন্যে,—তুমি নিজেই যাও রসিক।...দেখ, ভুলের ওপর ভুল!”

পণ্ডিতমশাইয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন—“আপনার নাতনি-নাতজামাই যে কাল এল বিকেলে!”

“সত্যি নাকি? দেখতে হবে তো, ভায়াকে দেখাই হয়নি।”

“দেখবেন বই কি, আজ সকালেই তাকে আপনার ওখানে নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম, পায়ের ধুলো নেবার জন্যে, বিষ্টিটা এসে পড়ল। তা তার ভাগ্যি ভালো, দেবতা নিজেই ঘর বয়ে এলেন।...রসিক, অমনি বিপিনকেও ডেকে নিয়ে আসবে।”

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—“তা তো হবে না, আমি দুজনকে একসঙ্গে দেখব অন্নদাচরণ, আমার অনেক দিনের সাধ যে। একটু ধরুক বৃষ্টিটা।”

অন্নদাচরণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন, যেন চাওয়ার অতিরিক্ত পাইয়া যাইতেছেন। উঠিয়া বলিলেন—“বৃষ্টি এখন শীগ্‌গির ধরবে কি? আমি নিয়ে আসছি দুজনকে পণ্ডিতমশাই, এসে পড়লাম বলে।”

পণ্ডিতমশাই তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন, বলিলেন—“নাতজামাইকে খানিকটা ভেজাও আপত্তি নাই, বরং খুশী হব ; তবে দিদিকে আর এ দুর্যোগে বাইরে এনে কাজ নেই। বৌমাদের বলে দাও, আমি নিজেই গিয়ে দেখব।”

অন্নদাচরণ কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—“আবার ভিজবেন?”

“নাতনি-নাতজামাই না হয় একটু বেশি সরস হয়েই দেখলাম হে!”

পণ্ডিতী প্রথায় বেশ একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“নাও, দেরি করো না, বলো গিয়ে।”

অন্নদাচরণ যাইবার একটু পরেই রসিক তামাক লইয়া আসিলেন। খুব বেশী কথাবার্তা হইতেছে না ; পণ্ডিতমশাই অতিরিক্ত অন্যমনস্ক, একটা মস্ত বড় সার্থকতার যেন সম্মুখীন হইয়াছেন। একটু পরেই অন্নদাচরণ টোকামাথায় একটা ছাতা লইয়া উপস্থিত হইলেন।

গিরিবালাকে বিবাহের সজ্জায় সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বেনারসী শাড়ি, সাটিনের

BanglaBook.org

একটা বডিস, সমস্ত গায়ে ভারী ভারী গহনা, পায়ে মল, একটা অপূর্ব শ্রী ফুটিয়াছে। বিপিন লজ্জাবশত সাজিতে রাজী হন নাই, রাঙাপেড়ে একটা শান্তিপুরী ধুতি পরিয়া আছেন, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, সেকালের যুবকদের ফেশানমতো মাথায় সুবিন্যস্ত বাবরী চুল, প্রশস্ত রক্তাভ বক্ষের উপর তির্যক রেখায় শুভ্র যজ্ঞোপবীত বিলম্বিত। পণ্ডিতমশাই নিচু মুখেই দাওয়ায় আসিয়া উঠিলেন, ছাতাটা মুড়িয়া চোখ তুলিতেই ওঁদের উপর নজর পড়িল ; মুহূর্তের জন্য যেন একটা নৈরাশ্যের ছায়া মুখে খেলিয়া গেল।—অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষণিক একটা ছায়া—উনি যেন অলোকিক কিছু একটা দেখিবেন আশা করিয়াছিলেন এতক্ষণ —মানুষ নয়, দেবদম্পতি, বোধ হয় সাক্ষাৎ হর-গৌরী হইলেও আশ্চর্য হইতেন না।

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু কল্পলোক থেকে তাঁহার মনটা নামিয়া আসিল, ধীরে ধীরে এই পৃথিবীর অপরূপত্বকে স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিবার যে সহজ শক্তি সেটুকু ফিরিয়া আসিল, মুগ্ধবিস্ময়ে পণ্ডিতমশাই দম্পতির পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, চোখ ফিরাইতে পারিতেছেন না। বিপিন এবং পরে গিরিবালা আসিয়া পদস্পর্শ করিলেন, পণ্ডিতমশাইয়ের চৈতন্য হইল। মনের পূর্ণতায় দুজনের মাথায় হাত দিয়া মনে মনেই আশীর্বাদ করিলেন। তাহার পর বিপিনবিহারীকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া,—নাতজামাই সম্বন্ধে একটা চলতি রহস্যের ভাষা প্রয়োগ করিয়া অন্নদাচরণকে বলিলেন—"...গুমর হবে, তবুও বলতে হল, এত অপরূপ যে, তা আমি আশাই করতে পারিনি।"

অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। একটু থামিয়া বলিলেন—"আমারই ভুল। মধুসূদন বলেছিলেন—তবে নিজের ছেলের সম্বন্ধে আর কত স্পষ্ট করে বলবেন?"

বৃষ্টি ধরিতে একটু বিলম্ব হইল। অন্নদাচরণের ঘরেই বসিয়া সকলে গল্প করিলেন অনেকক্ষণ, গিরিবালা অবশ্য চলিয়া গেলেন, তবে বিপিন রহিলেন। পূর্ণতর করিয়া পরিচয় লওয়া, ওঁদের প্রবাসভূমির কথা—এই সব লইয়া আলোচনা চলিল। শেষে পণ্ডিতমশাই তাঁহার ওখানে নিমন্ত্রণের কথা পাড়িলেন। এই পরিবারটির সম্বন্ধে তাঁহার একটা আশঙ্কা ছিল, সেটা যে শুধু কাটিয়াই গেছে তাহাই নয়, তাহার জায়গায় একটি প্রগাঢ় প্রীতির ভাব আসিয়া গেছে, মনের আকাঙ্ক্ষাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতে আর পণ্ডিতমশাইয়ের বাধিল না ;—ঠিক নিমন্ত্রণ নয়, কেননা মূল রাঁধুনী হইবেন গিরিবালা নিজে। ফাইফরমাস খাটিয়া জোগান দিবেন তাঁহার ঠানদিদি। এ বাড়ির সকলকেই যাইতে হইবে। গিরিবালা সকালেই যাইবেন, রাঁধিয়া বাড়িয়া সবাইকে খাওয়াইয়া তবে তাঁহার ছুটি। পণ্ডিতমশাই হাসিয়া বলিলেন, "গৌরী এবার অন্নপূর্ণা হল, হাতেখড়িটা আমার ওখানেই হয়ে যাক না। ভায়ার মুখটা যেন একটু শুকিয়ে গেল,—হাত পেতে দাঁড়াবার ভয়ে নাকি?"

উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, দুই ভাইয়েতে অল্প হাসিয়া মুখ ঘুরাইলেন, বিপিন সঙ্কুচিত হইয়াই পড়িয়াছিলেন, মৃদু হাস্যের সহিত মুখটা আরও নিচু করিয়া লইলেন।

পণ্ডিতমশাই রসিকলালকে বলিলেন—"তুমি একবার দিদিকে জিগ্যেস করে এস রসিক, নেমন্তন্ন ও আর কাউকে করতে চায় কিনা। আমার শপথ রইল, যেন কোন কুণ্ঠা না করে।"

একটু দেরি হইল, রসিকলাল নিজেও আসিলেন না। হরিচরণ আসিয়া একটু উৎসাহের সহিতই বলিল—"দিদি বললে—দুলো বাগদির বাড়ির সবাইকে বললে ভালো হয়।"

সেই অর্ধভুক্ত বাগদি-পরিবার—দুলাল, তাহার বৌ, কোমরে ন্যাকড়া-জড়ান মেয়ে

BanglaBook.org

লক্ষ্মী, আর অর্ধউলঙ্গ ছোট রুগ্‌ণ ভাইবোন...

একটুখানির জন্য যেন একইভাবের ক্ষণিক ঘোরে দুজনেই স্তব্ধ হইয়া গেলেন, তাহার পর পণ্ডিতমশাই আবার উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"রসিক, গেলে কোথায় হে?—আর দুঃখ করো না, গৌরীদানই হয়েছে ; এই দেখ না, সঙ্গে সঙ্গে ভূতপ্রেত নিয়ে কারবার আরম্ভ হয়ে গেল।"

হাস্যটা ঘরের মধ্যে হইতে বাহিরেও মেয়েদের ভিতর ছড়াইয়া পড়িল। দুয়ারের পাশেই ছিলেন রসিকলাল, হাসিতে হাসিতে প্রবেশ করিয়া বলিলেন— "আর নন্তীর কথাও বললে যে গিরি ; হরিচরণ বুঝি ভুলে গেলি?"

॥ ৯ ॥

পণ্ডিতমশাইয়ের ইচ্ছা ছিল পরদিনই হয় ; কিন্তু তাঁহার নিজের নিমন্ত্রণটা বাকি ছিল, অন্নদাচরণ শুনিলেন না, তাঁহার গৃহিণীকে সুদ্ধ নিমন্ত্রণ করিয়া ওটা নিষ্পন্ন করাইয়া লইলেন। পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির ব্যবস্থাটা তৃতীয় দিনে।

বিপিন প্রথম পরিচয়ের পরই লোকটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেদিন বিকাল থেকে খানিকটা রাত্রি পর্যন্ত ওঁর ওখানেই কাটাইলেন। সন্ধ্যের অব্যবহিত পরেই প্রায় প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী রসিকলালও 'কল'-ফেরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহিরে মাধবীলতার মঞ্চের নিচে শানের বেঞ্চে দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া গল্প করিতেছেন, হারাণের হাতে ঘুড়ির লাগামটা দিয়া রসিকলাল ভিতরে আসিতে আসিতে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। পণ্ডিতমশাই বলিলেন,—"না, না, তোমার ফিরে যাওয়া চলবে না, এসো। বাঃ আমার সন্ধ্যে কাটাবার জন্যে বিধাতা কি বরাবর একজনই বরাদ্দ করে দিয়েছেন নাকি? আর নাতজামাই এসে যদি আমার শিষ্যকে তাড়ায় তো ভারি উপকারই তো করলে তাহলে!"

নিজের পদ্ধতিতে সজোরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। রসিকলাল অল্প হাসিতে হাসিতে সামনের বেঞ্চটিতে আসিয়া বসিলেন।

নিতান্ত হাল্‌কা একটা মেঘের আস্তরণ জ্যোৎস্নাটাকে মলিন করিয়া রাখিয়াছে। একটু গুমটভাব আছে, মাঝে মাঝে একটা হাওয়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে, তবে খুব ক্ষীণ, যেন বহুদূরের যাত্রী, পথ চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনজন অসম বয়সের সঙ্গীর মধ্যে গল্প হইতেছে।...হারাণের মৃদঙ্গ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আবার থামিয়া গেল। কে আসিয়াছে, হারাণ পরিচয় দিতেছে। মৃদু হইলেও তাহার খানিকটা উচ্ছ্বাসের বেগে ভাসিয়া আসিতেছে— "...এখন হবে নি, কাল আসিস্ দেখিয়ে দোব।...নিয়ে আসিস্ তোর রায়েদের জামাইকেও ডেকে, ন্যাজ মুখে করে না ফিরে যেতে হয় তো...হরিপুরের তাদের কথা? সতুনীর খালে তাদের খোঁজ নিগে..." মাঝে মাঝে আবার বোলও জাগিয়া উঠিতেছে।

গল্প বলিতেছেন বেশির ভাগ বিপিনই, ওঁদের প্রবাসভূমির কথা। মাঝে মাঝে একআধটা প্রশ্নে মোড় ফিরিয়া যাইতেছে। বেশির ভাগ প্রশ্নই পণ্ডিতমশাইয়ের। দূরের রহস্য আবার তাঁহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে।..."আসল কথাই জিগ্যেস করা হয়নি। হিমালয় ওখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক বললে না? তা দেখা যায়?...তোমায় বলেছিলাম না রসিক

banglabook.org

যে, জায়গাটা হবে হিমচক্রের মধ্যে?"

বিপিন বলিলেন—"হিমালয়ের নিচের পাহাড়গুলো মাইল পঞ্চাশেক দূরে, ওখান থেকে দিন তিনেকের রাস্তা ; আসল হিমালয় অনেক দূর হলেও কিন্তু দেখা যায়। সব সময় নয় ; শীতের সকালে আর বিকেলে বেশি করে চোখে পড়ে। অনেক দূরে আকাশের কোলে বরফে ঢাকা চূড়াগুলা উঁচুনিচু রেখায় দেখা যায় ; কোথাও নীল, কোথা সাদা, আবার যেখানে সূর্যের কিরণ সামনাসামনি পড়েছে সেখানে সোনার মতন রাঙা, ঝকঝকে। সব চেয়ে সুন্দর দেখায় যদি কখনও এক আধ পশলা বৃষ্টির পর মাঝখানের আকাশটা পরিষ্কার হয়ে যায়। এরকমটা হলেই আমরা কমলানদীর ধারে আমাদের পাহাড় দেখার উঁচু জায়গাটিতে গিয়ে জড়ো হই। মনে হয় হিমালয় যেন একেবারে পঁচিশ ত্রিশ মাইল এগিয়ে এসেছে আমাদের দিকে—পূর্ব থেকে পশ্চিমে যতদূর দেখা যায় পাহাড়ের ওপর পাহাড়—গোড়ার দিকে খানিকটা পর্যন্ত একটা ঢেউ-খেলান সবুজের রেখা এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত চলে গেছে—নিচের পাহাড়গুলো আর কি,—তারপরেই যেন একটা প্রকাণ্ড রুপোর চাপ—যেখানটা বোধ হয় খানা খন্দর, কি জঙ্গল কি যেখানটা সূর্যের একটু আড়ালে পড়েছে সেখানটা নীল, বাকি সমস্তটা ঝকঝক করছে। এত বিরাট, এত অদ্ভুত যে, চোখ ফেরান যায় না।"

পণ্ডিতমশাই বেশী আবেগের জায়গাগুলোয় রসিকলালের পানে আড়চোখে চাহেন, ওঁরা উভয়ে যেন কী একটা ব্যাপার মিলাইয়া যাইতেছেন ভিতরে ভিতরে।

বিপিন বলিয়া যান—"যদি বিকেলের দিকে হ'ল তো আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থাকি। সূর্য একটু একটু করে রাঙা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও সব চমৎকার ব্যাপার হতে থাকে, কোন চূড়ার ওপর রুপোর গায়ে বোধ হয় ঝপ করে একটা সোনার দাগ পড়ল—অল্প অল্প করে সেটা ছড়িয়ে গেল, তার পর আর একটা চূড়ায়, তারপর আর একটা...দেখতে দেখতে সমস্ত রুপোর পাহাড়টা আগাগোড়া সোনার হয়ে গেল। সে এক আশ্চর্য ব্যাপার, না দেখলে ধারণা করা যায় না..."

গুরুশিষ্যে দৃষ্টি বিনিময় হইতে থাকে। বিপিন হাসিয়া বলেন—"আমাদের সব চেনা হয়ে গেছে। যেটাতে প্রথম সোনার রঙের আঁচড় পড়ে, সেটার নাম দিয়েছি যক্ষপুরী, অর্থাৎ কুবেরের বাড়ি আর কি। হাজার হর-গৌরীর ওপর ভক্তি থাকুক, হাজারই তাঁরা মনিব হতে যান না কেন, নিজের বাড়ির ওপর সোনার জলটা তো আগে ছড়িয়ে নেবেনই..."

বিপিন বেশ জোরেই হাসিয়া ওঠেন, এঁরাও যোগদান করেন, হারাণের মৃদঙ্গ বোল বন্ধ হইয়া যায়।

গুরুশিষ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন—জামাই এত উত্তেজিত তো আর কোন প্রসঙ্গেই হন না, কেন?—কারণটা কি?

বিপিন আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়েন, বলেন—"সব চেয়ে যেটা উঁচু হয়তো সেইটেই গৌরীশঙ্কর—সেটার নাম দেওয়া হয়েছে কৈলাস।...সন্ধ্যে যতই এগুতে থাকে আস্তে আস্তে আর একটা পরিবর্তন হতে থাকে ; সোনা যেমন একটু একটু করে ফুটে উঠেছিল তেমনি একটু একটু করে মিলিয়ে আসে ;—প্রথমে একটু একটু করে, তারপর একেবারে ঝপঝপ করে। সোনার নিচে রুপোও আর দেখা যায় না। সব চেয়ে উঁচু যে চুড়োগুলো

BanglaBook.org

তার ওপর তখনও সোনা রয়েছে, শেষ হতে হতে ক্রমে শুধু গৌরীশঙ্করের ওপরটিতে ঝলমল করতে লাগল। আমরা সবাই একদৃষ্টে চেয়ে আছি—সেকেন্ড গুনছি—দেখছি আস্তে আস্তে চোখের সামনে রেখায় রেখায় মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর শেষ বিন্দুটুকুও মিলিয়ে গেল, অতবড় প্রকাণ্ড রুপোর চাপটা যেন একটা ছায়ার মতন আকাশের গায়ে লেগে রইল।”

তাহার পর সন্ধ্যার কথা, এবং সন্ধ্যা যখন গাঢ় হইয়া আসিল তখনকার কথা। একটা আবেগে সমস্তটা বলিয়া বিপিন একসময় চুপ করিয়া যান। একটু লজ্জিতও হইয়া পড়েন, যেন এতক্ষণে চৈতন্য হয় যে একটু ভাবের ঘোরে পড়িয়া গিয়াছিলেন। শ্রোতার মধ্যে একজন যে শ্বশুর আর একজন যে ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসরের বৃদ্ধ সেটা মনে পড়িয়া যায়। একটু চুপ করিয়া থাকেন। ওঁরা দুজনেও চুপ করিয়া থাকেন; যেন স্বপ্নাবিষ্ট।

পরদিন গিরিবালা সকালেই স্নান করিয়া নন্তী আর হারাণের বৌকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিতমশাইয়ের এ-ব্যবস্থাটা যেন খেলাচ্ছলে, অথচ এতগুলি লোককে রাঁধিয়া খাওয়ান নিতান্ত ছেলেখেলা তো নয়। নতুনত্বের কৌতুকের সঙ্গে অনেকখানি দুশ্চিন্তা মিশিয়া গিয়া গিরিবালার মধ্যে বেশ খানিকটা গিন্নিপনার ভাব আনিয়া দিয়াছে। যখন পৌঁছিলেন তখন পণ্ডিতমশাই পূজায় বসিয়াছেন; ওঁরা তিনজনে বাড়ির ভিতর আসিলেন। একটা ছোটখাটো কাজেরই বাড়ি বলিতে হইবে—সব মিলিয়া প্রায় খান কুড়িক পাত পড়িবে। কিন্তু বাড়িতে একটু সাড়াশব্দ নাই, কাহারও দেখা নাই পর্যন্ত। গিরিবালা ভীতভাবে ডাকিলেন—“ঠাকুরমা!”

গৃহিণী ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন; গিরিবালা ভীত ভাবেই বলিলেন —“কিছুর যোগাড় দেখছি না যে ঠাকুরমা, ঝি কোথায়?...আমার তো ভয়ে যেন হাত পা আসছে না!”

গৃহিণী তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—“ছেলেমানুষকে এভাবে বিব্রত করা কেন বল দিকিনি? ও-ও শ্বশুরঘর না দেখতে দেখতেই পাকা গিন্নি হয়ে গেল! সব ঠিক আছে, তুই এসে বোস নিশ্চিন্দি হয়ে, ইটি কে? নিকুঞ্জর মেয়ে বুঝি...এস দিদি, বোস।...আর ইটি?”

গিরিবাবা বলিলেন—“হারাণের বৌ।...আমি তো কিছু যোগাড় দেখতে পাচ্ছি না, ঠাকুরমা! ঝি কোথায়?”

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন—“কি নিগ্রহ দেখ দিকিন? কোথা এসে একটু হেসেখেলে বেড়াবে, না, তার ঘাড়ে একটা ভাবনা চাপিয়ে দেওয়া।...আয় বাপু, তুই দেখেই যা না হয়! ঝি পুকুরপাড় থেকে ঘুঁটে আনতে গেছে, এসে উনুন ধরাবে।”

ভাঁড়ার ঘরে লইয়া গেলেন, গিরিবালা দেখিলেন শাক থেকে অম্বলের কুটনা পর্যন্ত তৈয়ারী—বারকোষ, চাঙারি করিয়া পাশে পাশে সাজান। গিরিবালা গভীর নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠিলেন—“ব্যারে, একি হল!”

ওদিকের বারান্দায় পণ্ডিতমশাইয়ের খড়মের আওয়াজ হইল; প্রশ্ন করিলেন—“দিদিমণি এল?”

গিরিবালা বাহিরে আসিয়া অনুযোগের সুরে বলিলেন—“দিদিমণি এসেই বা কি হল ঠাকুরদা?”

BanglaBook.org

"কেন?"

"কুটন-টুটন সব তোয়ের। তার চেয়ে একেবারে নেমন্তন্ন খেতে এলেই পারতুম।"

পণ্ডিতমশাই হাসিয়া বলিলেন—"এই কথা? তা আমি সমস্ত রাত কত শাস্ত্র ঘাঁটলাম; অন্নপূর্ণা যে নিজে কুটন কুটেও নিতেন এটুকু কোনখানেই পেলাম না। তাই গিন্নিকে বললাম..."

গিরিবালা রাগের ভান করিয়া বলিলেন—"যাও, খালি ঠাট্টা!...নিজে কুটতেন না তো দিতো কে কুটে শুনি?"

'নন্দী কি ভৃঙ্গীর বৌ বোধ হয়।"—বলিয়া পণ্ডিতমশাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। গৃহিণী কপট বিস্ময়ে মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিলেন— "দেখলে কলির বিচার! রাত জেগে সব ঠিকঠাক করে রাখলাম—শেষে হলাম কিনা নন্দী-ভৃঙ্গীর বৌ!"

বিদ্রূপটা প্রকাশ হইয়া পড়ায় আবার একসঙ্গে সকলে হাসিয়া উঠিলেন। হারাণের বৌ ঘোমটাসুদ্ধ মুখটা ফিরাইয়া লইল। এমন সময় বাহিরে বিপিনের কণ্ঠ শোনা গেল—"ঠাকুরদা!"

কাল পণ্ডিতমশাই বিপিনকেও সকাল সকাল আসিতে বলিয়াছিলেন, হিমালয়ের অত স্পষ্ট বর্ণনা ওঁর কল্পনাকেও উদ্রিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, ঠিক করিয়াছিলেন, আজ দুইজনে একসঙ্গে "মেঘদূত" পড়িবেন। "আমাদের জলখাবারটা নিয়ে এস"—স্ত্রীকে আদেশ করিয়া পণ্ডিতমশাই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

গিরিবালা কাজে লাগিয়া গেলেন। গৃহিণীকে বলিলেন—"তোমার তা হলে ওই কুটন কোটাই পর্যন্ত হল ঠাকুরমা; আর এদিকে ঘেঁষতে দিচ্ছি না।"

তরকারিগুলা এক একটা করিয়া হারাণের বৌকে ধুইয়া আনিতে বলিলেন। নন্তীকে বলিলেন—"কোটা ঠিক হয়েছে কিনা তুই একবার দেখে নে নন্তী, না হয়ে থাকে বঁটিটা বের করে বো'স। উনি কুটেছেন বলেই আমায় মেনে নিতে হবে এমন কোন পাট্টা লিখে দিই নি।"

ঝি আসিল, এবং অচিরেই রান্নাঘরের গোলপাতার ছাউনি ভেদ করিয়া ধুঁয়োর কুণ্ডলি উপরের জামগাছটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রান্নার বাসনের ঝনঝনানি, ঝিয়ের গলা, গিরিবালার অযথা ব্যস্ত নির্দেশ, হারানের বৌকে বকুনি—সব মিলিয়া বাড়িটা অল্প সময়ের মধ্যেই কাজের বাড়ির মর্যাদায় জাগিয়া উঠিল।

একটু পরেই লঙ্কার ঝাঁজ, বৈঠকখানা পর্যন্ত সকলের হাঁচি এবং খন্তিনড়ার অবিশ্রান্ত শব্দের মধ্যে রন্ধন-যজ্ঞ সাড়ম্বরে আরম্ভ হইয়া গেল।

পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন, একটু অপেক্ষা করিয়াই আবার যোগদান করিবেন, খন্তিটা নন্তীর হাতে দিয়া গিরিবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কর্মব্যস্ততায়, তদুপরি আগুনের তাতে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে। বলিলেন—"ঠাকুরমা, শাক ভাজাটা প্রায় শেষ হয়ে এল, এইবার শুকতটা চড়িয়ে দেব। ওটা ওদিকে হতে থাক, আমি এদিকে চালটা বের করে দিই। কত দিই বল দিকিন ঠাকুরমা?—মোনখানেক দোব?—না আরও..."

পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী কপালে চোখ তুলিয়াই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

BanglaBook.org

"পনেরোটা মানুষও খেতে হবে না, একমোন চাল? একি অন্নপূর্ণার...।"

গিরিবালা অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁর মুখে হাত চাপিয়া বলিলেন—"চুপ করো ঠাকুরমা, বাইরে শুনতে পাবেন, তুমি চলো ওদিকে বরং।"

উনি ওদিকে ভাঁড়ার ঘরে চাল ডাল বাহির করিয়া দিতে গেলেন, গিরিবালা রান্নাঘরে আসিয়া নন্তীকে বলিলেন—"এবার দে খন্তিটা আমায়, শাকটা ধরিয়ে ফেললি না তো?"

পিসিমা ঐ রকম, মা প্রায় অসুস্থ থাকে,—নন্তীকে মাঝে মাঝে রান্নাটা করিতে হয়, মোটামুটি একটা জ্ঞান আছে ; বলিল—"শাক নাকি ধরে? ওর নিজ থেকে যে জল বের হয় অনেকক্ষণ।"

এখানেও খাটো হইয়া গিরিবালা চটিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, তোকে ঠানদিদি সাজতে হবে না ; শাকে জল বেরোয় সবাই জানে, তুই সর্।"

খন্তিটা লইয়া দুইবার ঘন ঘন নাড়াচাড়া দিয়া বলিলেন, "বড় যে মুড়ুলি করছিস, এতগুলো লোকের কত চাল লাগবে বল দিকিন?"

"কত জন আছে?"

"ধর জন পনেরো, কি জন কুড়ি।"

নন্তী একটু মনে মনে হিসাব করিল ; বলিল—"একপো করে ধরলে ভেসে যাবে। পাঁচসেরের বেশি দরকার হবে না—যদি কুড়ি জনই হয়।"

এত বেয়ান্দাজ যে করিয়া বসিবে, ধারাণাতেই আসে না ;—"এই বুদ্ধি নিয়ে..." বলিয়া নন্তীকে বেশ একটু মিষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিতে যাইতেছিলেন, একটা বড় বারকোষে সের পাঁচেক আন্দাজা চাল লইয়া হারাণের বৌ আসিয়া দাওয়ার নিচে দাঁড়াইল, বলিল —"এই দেখ গো গিরিদিদি, চাল ধুতে চন্নু ঘাটে। বলবে ফাঁকি দিয়ে বেড়াচ্ছে রামীর মা!"

নন্তীর উপরের ঝাঁঝটা হারাণের বউয়ের উপরই মিটাইতে হইল, বলিলেন—"কী রাজ্য রক্ষে করছিস শুনি? বড় মুখ হয়েছে তোর, আসুক হারাণে।"

হারাণের বৌ বারকোষটা তুলিয়া লইল, গিরিবালার চোখের অন্তরালে গিয়া বলিল —"নন্তীদিদি, সে এলে বোলো, ভয়ে দুজ্জোধনের মতন পুকুরে সেঁদো এসে আছি।"

হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। নন্তী একটু হাসিয়া বলিল— "পোড়ার-মুখী রঙ্গ নিয়েই আছে। তুমি কি বলছ, গিরিদিদি,—পাঁচসের চাল বেশি হবে?"

গিরিবালা শাকটা একটা পাত্রে তুলিলেন—তাহার পর কড়াটা আবার উনানে চাপাইয়া বলিলেন—"হবে না বেশি?—ওর মধ্যে কচি ছেলেই তো ক'জন। ভাত যদি না বাঁচে এককাঁড়ি তো..."

পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।—"শাক নামল, এইবার শুকতটা চড়িয়ে দিই, কি বল ঠাকুরমা?...নন্তী, ঠাকুরমাকে পিঁড়েটা দে, দোরগোড়াটায় বসুন। ...মাছটা দুলোকে আনতে দিয়েছেন ঠাকুরদা? না এসে পড়লে নিশ্চিন্দি হতে পারছি না বাপু, সে একটা আস্ত কুঁড়ের বাদশা..."

বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটা চারিদিক দিয়া যেন গম-গম করিয়া উঠিতে লাগিল। কয়জনেরই বা ব্যবস্থা? তবুও দুইটি ছোট মেয়ের তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা আসিয়া গিয়া সেটুকুকেই বেশ গুরুত্ব দিয়াছে। পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী সামলাইয়া দিতেছেন, কিন্তু

পণ্ডিতমশাই প্রায়ই একটা না একটা ছুতা করিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইতেছেন। বিপিনবিহারী উদ্দেশ্যটা বুঝিয়া একবার হাসিয়া বলিলেন—"ওঁকে ছেড়ে দিন ঠাকুরদা, নইলে আজ আর কিছু মুখে দেওয়া যাবে না। যা দুটি পাকা রাঁধুনীর হাতে..."

পণ্ডিতমশাই উত্তর করিলেন—"না ভাই, আজ যে-জিনিসের স্বাদ আশা করে আছি তার মধ্যে পাকামির ভেজাল সেঁদুতে দোব না। ঝরণার জল খাব, সেখানে তোমাদের ফিল্টারের সরঞ্জাম হাজির করলে একেবারে ভেঙেচুরে দোব।"

গলা উঠাইয়া বলিলেন,—"ওগো, শুনলে আমাদের নাতি-ঠাকুরদার কী কথাটা হল? শুনে গিয়ে এই বেলা সাবধান হও, নইলে..."

"মেঘদূত"-এর মধ্যে মাঝে মাঝে এইরকম এক একটা অবান্তর কথা আসিয়া পড়িয়া হাসির হর্‌রা উঠিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেরা আসিয়া বাহিরের দিকটা গুলজার করিয়া তুলিল। সাতু, হরিচরণ, তাহাদের সঙ্গে খানিকটা কিশোরও, ওদিকে দুলোর দুটি ছেলে, তিনটি ছোট ছোট মেয়ে। সমস্ত বাগানটার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহারা কি একটা দুর্জ্ঞেয় খেলায় মাতিয়াছে। ফুল তুলিতেছে, ফল পাড়িতেছে, বাগানের মধ্যে খানা কাটিয়া পুকুরের জল আনিয়া ভরতি করিতেছে। ব্যস্ততায় গিরিবালার চেয়ে কিছু কম নয়, হট্টগোলও কিছু অল্প হইতেছে না।

এরই মধ্যে একসময় রসিকলালের অশ্বিনী 'চি-হি-হি' শব্দ করিয়া মালতী-মঞ্চের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। রসিকলাল উপর থেকেই বলিলেন—"ওরে তোরা করছিস কি? বাগানটা যে লণ্ডভণ্ড করে দিবি দেখছি। পণ্ডিতমশাই নেই নাকি?"

পণ্ডিতমশাই ঘর থেকেই হাঁকিয়া বলিলেন—"পণ্ডিতমশাই আছে, তবে একটা দিনের জন্যে চৌকিদারির কাজ থেকে ছুটি নিয়ে। তুমি সটান চলে এস রসিক।"

খোলা বইয়ের উপর হাতটা ধীরে ধীরে বুলাইতে বুলাইতে বিপিনের পানে চাহিয়া একটু আবেগস্তিমিত কণ্ঠে বলিলেন—"সত্যি বলছি ভায়া, সমস্ত জীবন স্বামী-স্ত্রীতে মিলে শ্মশানের শান্তি আগলাতে আগলাতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। বাড়িতে নিত্য একটু করে অগোছ, একটু ভাঙাচোরা, কচিবুড়ো পাঁচরকম গলার একটু হট্টগোল না হলে বেঁচে থাকা যে কী বিড়ম্বনা!"

ঠিক এই কথাটুকুই সেইদিন বিদায়ের সময় গৃহিণীর মুখ দিয়াও বাহির হইল—অন্যভাবে।—

বহু বৎসর পরের—গিরিবালার শেষ জীবনের কথা। শৈলেনের মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় বাহির হইতে বেড়াইয়া বাড়িতে প্রবেশ করিতেই যেন মাথায় আগুন জ্বলিয়া উঠিল।—অসহ্য হট্টগোল! একটা বিবাহ উপলক্ষে বাহিরে যে যেখানে ছিল সব আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—ছেলে-মেয়েয়, বড়-ছোটয় বাড়িতে এতটুকু জায়গা নাই। সমস্তদিনই অল্প-বিস্তর হৈচৈ লাগিয়া থাকে, সন্ধ্যার সময় বাড়িয়াছে। কে কতকগুলো নূতন রেকর্ড কিনিয়া আনিয়াছে—একটা ঘরে গ্রামোফোন খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোনেদের মেয়েরা কলিকাতায় থাকে, নূতন নাচ শিখিয়াছে, বাড়ির অন্যদিকটায় খোলা ছাতটা ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে। ঝিয়েদের কোলে পাঁচটা-ছয়টা কচি ছেলে-মেয়ে, বাড়ির এখানে-ওখানে রকমারি কান্না জুড়িয়াছে। বাহির থেকে চাকর আসিয়া বৌয়েদের চায়ের

BanglaBook.org

তাগাদা দিতেছে। কী রান্না হইবে জানিবার জন্য পাচক-ঠাকুর নিজের কণ্ঠস্বরকে এই ভিড়ে শ্রুতির উপযোগী করিবার চেষ্টা করিতেছে। এর উপর সমস্ত শব্দকে আবৃত করিয়া বাড়ির অলিগলি, কোণ-কান ভরাট করিয়া উঠিতেছে একপাল ছেলে-মেয়ের কলরব। বাহিরের খেলা শেষ করিয়া আসিয়া তাহারা উঠানটা দখল করিয়া ছড়া-সংযোগে ঘরোয়া খেলা ধরিয়াছে—আনিবানি, কানামাছি আরও রকমারি কী সব।

আর, সমস্তর মাঝে মা গরদের শাড়ি পরিয়া, উঠানের তুলসীমঞ্চে মাথা ঠেকাইয়া অবিচল স্থৈর্যে দাঁড়াইয়া আছেন।

শৈলেন খুব উগ্রভাবে দুই তিন ধমক দিতেই বাড়িটা নিঃশব্দ হইয়া গেল। আবার কোথাও শব্দ ওঠে কিনা শুনিবার জন্য উগ্র দৃষ্টিতেই দাঁড়াইয়া আছে, মা ধীরে ধীরে মাথা তুলিলেন। প্রশান্ত দৃষ্টি, সমস্ত মুখটাতে তৃপ্তি মাখান, উনি যেন এ বাড়িতে ছিলেনই না।

শৈলেন রাগটা মায়ের উপরই মিটাইল, বলিল—"থাকো কি করে এই গোলমালের মধ্যে মা? মাঝে মাঝে একটা ধমক দিলেই তো হয়।"

সেইদিন শৈলেন পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ির নিমন্ত্রণের কথা প্রথম শোনে। মা যেন কোথায় রহিয়াছেন। ধীরে ধীরে একটি অপূর্ব ক্ষমা আর ধৈর্যের হাসি হাসিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন—"এই আমার আশীর্বাদ রে! যেন এর মধ্যেই যেতে পারি। আজ সবাই এক জায়গায় হয়েছে, ঠাকুরমার আশীর্বাদের কথাটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ।"

একটু পরে যখন উপরের ছাদে গেলেন, সব গল্পটা বলিলেন, হাসির মধ্যে, একমোন চালের কথাটাও। শেষে বলিলেন—"খাওয়া-দাওয়া সেরে খানিকটা গল্পগুজব করে আমরা এইরকম সন্ধ্যের একটু পরে পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি থেকে উঠলাম। বেরুবার আগে সবাই জড়ো হয়েছি, পণ্ডিতমশাই ঘরের ভেতর থেকে এলেন। দুটি ছোট ছোট কৌটো খুলে ধরলেন, একটিতে একটা আংটি,—উনি নিজেই ওঁর হাতে পরিয়ে দিলেন। অন্য কৌটোতে দুটি পার্শী মাকড়ি, তখন নতুন ফেশান উঠেছে। ঠাকুরমার হাতে দিয়ে বললেন—'তুমি এ-দুটো দিদিকে পরিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করো।'

"বেশ মনে আছে—যেন এই সেদিনের কথা। ঠাকুরমা পরিয়ে দিচ্ছেন, হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে ; মুখে হাসি, এদিকে চোখের পাতাও অল্প-অল্প ভিজে। আমরা দুজনে দুজনকে প্রণাম করে উঠতে আমার মাথায় হাতটা কয়েকবার টেনে টেনে দিলেন—সে যে কী মিষ্টি টান! তারপর একটু কাঁপা গলায় বললেন—'ওকে আর কী আশীর্বাদ করব? —আমার এই কাঙালের ঘরে এক দিনের তরেও ভরা সংসারের যে সাড়া জাগিয়ে গেল, সেটা ওর নিজের ঘরে যেন নিত্যিকার ব্যাপার হয়ে থাকে।'

"আমায় বকাঝকা করতে বলিস নি শৈল। আমার ভয় হয়, তাঁর আশীর্বাদ এমনি ফলন্ত দেখে যেতে পারবো তো?"

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পর্যায়

॥ ১ ॥

গিরিবালার পাণ্ডুল যাওয়ার স্মৃতিটা একটু নূতন ধরনের।—এপারে বড় লাইনের গাড়ি, তাহার পর ওপারে গিয়া ছোট লাইনের ; শুধুই ছুটিয়া চলিয়াছে মাঠ, বাট, গাছের শ্রেণী, ছোটবড় গ্রাম : ঘাটের বৌ-ঝিয়েরা ; মাঠের চাষা, বলদ,—সব পাক খাইতে খাইতে পিছনে পড়িয়া যাইতেছে। নিজের মাথাতেই মাঝে মাঝে কেমন একটা ঘূর্ণি জাগিয়া উঠিতেছে, স্টেশনের হাঁকডাকগুলাও ফুটিতে না ফুটিতেই আবার গতির শব্দের মধ্যে চাপা পড়িয়া যাইতেছে। তার পর আসিল উঁচুনিচু রাঙামাটির দেশ—দু'ধারের জমি যেন ঢেউ খেলিয়া খেলিয়া পিছনে সরিয়া যাইতেছে।...তাহার পর আসিল পাহাড়। গিরিবালা প্রথমটা দেখিয়াই শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন, যেন হঠাৎ কী একটা ঘাড়ে আসিয়া পড়িল। চণ্ডীচরণ ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল। কী করিয়া সীতার বনবাস—অষ্টপ্রহর মনটা পূর্ণ করিয়া আছে, বলিল—"সেই যে মাল্যবান পর্বতের কথা পড়ে শুনিয়েছিলাম কি না,—এইরকম জিনিস।" পাহাড়ের দল একসময় আরও ঘন হইয়া রেলের দুইটা দিক যেন চাপিয়া ধরিল, তাহার পর রাত্রি বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে অবলুপ্ত হইয়া গেল। কখন একটা ছমছমে ভাবে অভিভূত হইয়া গিরিবালা ঘুমাইয়া পড়িলেন ; সুপ্তির মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দের সঙ্গে গতির একটা ক্ষীণ চেতনা জাগিয়া রহিল।...দুইটা রেলগাড়ির মাঝে খানিকটা জাহাজে চড়া, রেলের পর্ব শেষ হইলে বলদেটানা সাম্পেনি। তিনটা দিনের এই পথ।

এই নিরন্তর গতির মধ্যে কয়েকটা বিশ্রামের স্মৃতিও আছে, অল্প, কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট।

পশ্চিমা চাকর মোহনা। গাঁট্টাগোঁট্টা, কালো কুচকুচে, মোটা কাঁচাপাকা গোঁফ, পরনে একটা বাসন্তীরঙে ছোবান কাপড়, গায়ে হাতকাটা মেরজাই, উপর ডানহাতে ঝকঝকে একটা নীরেট রুপোর অনন্ত, মাথায় এক রাঙা পাগড়ি, বিয়েতে পাইয়াছে, মাথায় জড়াইয়াছে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া যতটা সম্ভব বড় করিয়া। পিতল-বাঁধান লাঠি ঘাড়ে করিয়া গাড়ির সামনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বিপিন বলিলেন—"মোহনার বাহাদুরি দেখ্ চণ্ডী, যেন কত বড় কাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"...তাহার পর যখনই গাড়ি থামিয়াছে, আগে নজর পড়িয়াছে মোহনার উপর। তীব্র বেগের গায়ে ও একটি মন্থরগতি চিত্র। কথা নাই, এদিকওদিক চাওয়া নাই, পাহারা দিয়া যাইতেছে ; বাঁশি দিয়া গাড়ি ছাড়িতেই আবার পাশের গাড়িতে গিয়া উঠিয়া পড়িল।

আর একটা বড় বিরাম গঙ্গা।—

দুপুরের একটু আগে ওঁরা গাড়ি থেকে নামিলেন। প্ল্যাটফরমের উপরেই একটা ঘরে আসিয়া সকলে প্রবেশ করিলেন। বিপিন জামা জুতা ছাড়িয়া বলিলেন—"আমি গঙ্গা থেকে নেয়ে আসি। ওর জন্যে মোহনা জল এনে দিচ্ছে। আমি এলে তোতে মোহনাতে নেয়ে আসবি। এইখানেই খেয়েদেয়ে একটু আরাম করে নিতে হবে ; স্টীমার সেই যার নাম চারটে, তাও যদি লেট না হয়।"

আহারাদি সারিয়া সবাই আরাম করিতেছেন, নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে, একটা চড়া বাঁশির

BanglaBook.org

আওয়াজে গিরিবালার ঘুম ভাঙিয়া গেল। অসহ্য গরম, ঘরের দেয়াল টিনের, টিনের ছাদ, যেন সিদ্ধ করিয়া দিতেছে। পিছনের জানালাটা খোলা, কিন্তু খানিকটা উপরে; বাতাস পাইবার জন্য একটু অগ্রসর হইতেই পিছনের দৃশ্যের উপর নজর পড়িয়া গিরিবালা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।—বহুদূরে, আকাশ যেখানে পৃথিবীর সঙ্গে মিশিয়াছে তাহার কোলে সবুজ পাড়ের মতো একটা টানা রেখা, বাকি সমস্তটাই জল। যেন সম্মোহিত হইয়াই গিরিবালা জানালার নিচে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁদের ঘরটা জলের প্রায় উপরেই; সেই যে সেখান থেকে জল আরম্ভ হইয়াছে, একেবারে সেই সবুজ রেখা পর্যন্ত; বড় বড় ঢেউগুলা ক্রমে ছোট হইয়া একেবারে মিলাইয়া গেছে, কড়া রোদের আলো চঞ্চল ঢেউয়ের গায়ে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। গিরিবালার সমস্ত মনটা যেন থম-থম করিয়া উঠিল। আরও অগ্রসর হইয়া জানালার মধ্য দিয়া গলাটা একটু বাড়াইয়া ডাহিনে-বাঁয়ে চাহিয়া দেখিলেন। বাঁ দিকে খানিকটা দূরে একটা প্রকাণ্ড চড়া, তাহার গায়ে গোটা দুই তিন বালির ঘূর্ণি উঠিয়াছে। চড়ার দুই দিক দিয়া গঙ্গা দুই ধারায় বহিয়া আসিয়াছে, তার এক একটি ধারাই সাঁতরার গঙ্গার বোধ হয় দ্বিগুণ।

গিরিবালা অপলক দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া রহিলেন। শুধু জল, বালি আর আকাশ ছাড়া কিছুই দেখিবার নাই, তাও প্রখর রৌদ্রে দীপ্ত: তবু চোখ ফিরান যায় না। মনটা একটা অদ্ভুত ধরনের শূন্যতায় পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু লাগে ভালো। শুধু মনে হয়—কত বড়!—কত বড়!! বিকাশদাদার কাছে সাঁতরার গঙ্গার গল্প করায় তিনি বলিয়াছিলেন—"ভগবানের সৃষ্টি এই রকমই গিরি—যেটাকে ভাববি খুব বড়, দেখবি তার চেয়েও বড় আছে—তার চেয়েও বড়—আবার তার চেয়েও বড়—কোনখানে পূর্ণচ্ছেদ নেই!" ছেলেমানুষই, তবু নূতন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় মনটা, হঠাৎ খানিকটা বিস্তারলাভ করিয়াছে, সাড়া দেয়, যদিও খানিকটা ছেলেমানুষি লাগিয়া থাকে তাহার সঙ্গে।—ভাবিতে ভাবিতে গিরিবালার চেতনা যেন আপনাকে ছাড়িয়া, একটার পর একটা সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া কোথায় চলিয়া যায়—ভগবানের সৃষ্টিতে তাহা হইলে এর চেয়েও বড় গঙ্গা আছে? যাত্রা করিলে তাহার উপর শুধু যাওয়াই আছে, কোথাও পৌঁছান নাই? ...লোক বলে সমুদ্রের নাকি কূলকিনারা নাই—সে আবার কিরকম, তাহা হইলে...এ ভগবানই বা কি?—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, না মহেশ্বর? গিরিবালার মনে যেন এক ধরনের অস্বস্তি জাগিয়া উঠে—যেই হউন, নিজের সৃষ্টির সামনে তাঁহাকে যেন ছোট মনে হয়: অথচ ঠাকুরকে ছোট মনে করিতেও বাধে। অমীমাংসিত প্রশ্নের বেদনায় মনটা যেন অবসাদ-গ্রস্ত হইয়া পড়ে; গিরিবালা দুটি হাত তুলিয়া প্রণাম করেন, যদিও কাহাকে যে প্রণাম করা তাহাও নিজেই ঠিক বুঝিতে পারেন না।

আর একটি দৃশ্য মনে এমনই স্পষ্ট হইয়া গাঁথিয়া গিয়াছে।—

পরের দিন সকালে খানিকটা বৃষ্টি হইয়া গেলে ওঁরা ছোটগাড়িতে রেলপথের শেষ স্টেশনে আসিয়া নামিলেন। কুটির সাম্‌পেনি আসিয়াছিল, স্টেশনেই একজন পরিচিত বাঙালীর বাসায় স্নানাহার করিয়া যাত্রা করা হইল। সন্ধ্যার সময় নাকি পৌঁছিবার কথা। সাঁতরায় যেমন জুড়িঘোড়ার গাড়ি চড়িয়াছিলেন, সাম্‌পেনি বলদ-টানা হইলেও প্রায় সেইরকমই চলে, কিন্তু কিছুদূর ভালোভাবে চলিয়াই একটা বলদ একটু খোঁড়াইতে আরম্ভ করিল। যখন বিকাল হইল তাহারা একটা ছোট নদীর ধারে আসিয়া পড়িলেন। খেয়া

banglabook.org

ঘাট, একটা বড় চেপ্টা নৌকা করিয়া তাঁহারা সাম্‌পেনি সুদ্ধ পার হইলেন।

ওপারে গিয়া চড়াইটুকু কোনরকমে ঠেলিয়া ঠুলিয়া খোঁড়া বলদটা যে বসিয়া পড়িল, আর কোন মতেই উঠিতে চাহিল না। বিপিনবিহারী মোহনাকে প্রশ্ন করিলেন—"কী উপায় রে মোহনা?" মোহনা বলিল—কুঠির এলাকার মধ্যে আসিয়া পড়া গেছে, আর ভয় নাই, তবে পৌঁছাইতে বিলম্ব হইবে। প্রায় মাইলখানেক দূরে একটা গ্রাম। খোঁড়া বলদটাকে একটা গাছের গোড়ায় বাঁধিয়া, ভালো বলদটা হাঁকাইয়া গাড়োয়ান গ্রামের দিকে চলিল। সাম্‌পেনির সঙ্গে একটা পেয়াদা আসিয়াছিল, সেও গেল, গ্রাম হইতে জোড়া মিলাইয়া একটা বলদ লইয়া আসিবে।

বিলম্ব হইতে লাগিল। বিকাল গড়াইয়া গিয়া সন্ধ্যা নামিয়া আসিতে লাগিল। জায়গাটা তেপান্তর গোছের। যতদূর দেখা যায় চারিদিকে মাঠ আর মাঠ, ধানে ধানে সবুজ একেবারে ; মাঝখান দিয়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের প্রশস্ত উঁচু রাস্তাটা চলিয়া আসিয়াছে। ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে বিপিন বলিলেন—"চণ্ডী আয়, নদীর ধারটায় গিয়ে বসি।"

চণ্ডী প্রশ্ন করিল—"বৌদিদি?"

"ও-ও আসুক না, এ মাঠের মধ্যে অমন জবু-থবু হয়ে বসে থাকবার দরকার কি?"

নদীর ধারে ঘাসে ঢাকা একটা উঁচু জায়গায় তিনজনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপিন বলিলেন—"তোরা বোস, আমি ওদিক থেকে একটু ঘুরে আসি।"

বিপিনবিহারী একটু দূরে চলিয়া গেলে গিরিবালা অবগুণ্ঠন তুলিয়া দিলেন। বহুদূরে কতকগুলা গাছের পিছনে সূর্যাস্ত হইতেছে—ঠিক উপরে কতগুলা ভাঙা ভাঙা মেঘে তাহার রক্তাভা পড়িয়াছে। নিষুত রাতের মতো ঝিল্লীর ডাক ছাড়া চারিদিক নিস্তব্ধ। সামনে নদীর জলে ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে ; গোটা দুই বলদ লইয়া একটু দূরে খেয়ার নৌকাটা পার হইতেছে।...তিন দিনের একরকম অবিশ্রান্ত গতির পর গতিলেশহীন এই প্রকাণ্ড মাঠে নীরব সন্ধ্যাটি বড় ভালো লাগিল গিরিবালার। অল্পে অল্পে মুখর হইয়া উঠিলেন ; একবার বলিলেন—"এ নদীটার নাম কী ঠাকুরপো?"

"জীবছ্।"

গিরিবালা একটু হাসিয়া উঠিলেন—"জীবছ্! জীবছ্ আবার কী নাম!...চাকরের নাম মোহনা, নদীর নাম জীবছ্, অদ্ভুত দেশ তোমাদের!"

সত্যই এমন কিছু অদ্ভুত নাম নয়, কিন্তু মনটা হঠাৎ মুক্ত হইয়া দেবরের সঙ্গে একটু রহস্য-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছে।

চণ্ডীচরণ হাসিয়া বলিল—"আর মশাইয়ের দেশের নদীর নাম কি?"

"কানা-নদী।"

—বলিয়াই গিরিবালা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"না গো ঠাকুরপো, বেশ দেশ তোমাদের, কেমন বনজঙ্গল নেই বেশি, দেখতে দেখতে এলাম কিনা।"

একটু থামিয়াই বলিলেন—"আর এ-জায়গাটুকু আরও চমৎকার। কি ইচ্ছে হয় জান ঠাকুরপো?—এইখানে একটি কুঁড়েঘর বেঁধে থাকি, রোজ এ নদীর তরতরে জলে নাই —সকালবেলা উঠে..."

চণ্ডীচরণ হাসিমুখে গিরিবালার পানে কৌতূহল-দৃষ্টিতে চাহিয়া শুনিতেছিল, বলিল

BanglaBook.org

—"আর ভয় করবে না?"

"ওমা, তোমরাও এই রকম থাকবে যে!"

চণ্ডীচরণ কী একটু ভাবিল, তৎপরে তর্জনী নাচাইয়া প্রশ্ন করিল—"আমি বলব বৌদি?"

"বল না!"

"তোমার মা-জানকীর মতন হবার ইচ্ছে হয়েছে, ওঁরা তিনজনে যেমন পঞ্চবটী বনে ছিলেন, না?—সত্যি কথা বোলো কিন্তু!"

গিরিবালা ও-ভাবিয়া বলেন নাই, তবে চণ্ডীচরণের কথাটা শুনিয়া একটু অন্যমনস্ক হইয়া কী চিন্তা করিলেন, তারপর দেবরের পানে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"বেশ, ধরো যদি তাই হয়, কেমন লাগে তোমার ঠাকুরপো?"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন—"ভালো কথা মনে পড়ে গেল, —এটা তো মা-জানকীর দেশ, না ঠাকুরপো?"

চণ্ডীচরণ মাথাটা ঝুঁকাইয়া একটি গর্বের সহিত বলিল—"হাঁ-ই তো; মিথিলাপুরী!"

ইহার পর বেশ খানিকক্ষণ আর কোন কথা হইল না; গিরিবালা শুধু ধীরে ধীরে মাথা ঘুরাইয়া চারিদিকে চোখ বুলাইয়া যাইতে লাগিলেন, যেন কথাটা মনে পড়িবার পর জায়গাটা আর একবার নতুন হইয়া গেছে। খানিকক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন—"তাঁরা কেউ আছেন বেঁচে এখনো?"

বিপিনবিহারী এদের অলক্ষিতে পিছনে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, বলিলেন—"ওঠ চণ্ডী, বলদ এসে গেছে। কী সব কথা হচ্ছিল দুজনে?"

চণ্ডীচরণ হাসিয়া বলিল—"বৌদি বলছিলেন এইখানে একটা কুঁড়েঘর বেঁধে..."

গিরিবালা চিমটি কাটিয়া দিতে "উঃ" করিয়া হাসিয়া থামিয়া গেল। বিপিনবিহারী বলিলেন—"জানিস্ না?—কবির মেয়ে যে। বেশ তা থাক, মোহনাকে রেখে যাচ্ছি, বেঁধে দেবে একটা কুঁড়েঘর। চলে আয়, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

দ্রুত পা চালাইয়া দিলেন। চণ্ডীচরণ হাসিয়া পা চালাইবার পূর্বেই গিরিবালা "ঠাকুরপো—লক্ষ্মীটি"—বলিয়া বাঁ হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন।

গাড়োয়ান খুব জোরে বলদ হাঁকাইয়া দিল, বেশ খানিকটা অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, রাস্তায় একে একে দুইজন কুঠির ঘোড়সওয়ার আসিয়া পৌঁছিল—মধুসূদন চিন্তাগ্রস্ত হইয়া দৌড় করাইয়া দিয়াছেন। প্রথম জন তখনই ফিরিয়া খবরটা দিতে গেল, দ্বিতীয় জন রাত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই রহিল।

সাম্‌পেনি পৌঁছিতেই একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। সম্পূর্ণ এক নূতন ধরনের ভাষার কলরবের মধ্যে কিছু কিছু বাংলা কথাও শোনা গেল। পরিচিতের মধ্যে শ্বশুরের গলা, —গাড়োয়ানটার উপর ভয়ানক চটিয়াছেন, দুর্বল বলদ কেন লইয়া গিয়াছিল। একটি ছোট মেয়ের গলা—ভিতর থেকে বাহিরে আসিতে আসিতে কথায় টান দিয়া চেঁচাইয়া বলিতেছে—"বাবা, মা এসময় রাগারাগি করতে বারণ কচ্ছে—এ-এ-ন্।" বাংলা আর এদেশী ভাষায় চণ্ডী ও বিপিন নানা প্রশ্নের জবাব দিতেছেন। "বৌদি কোথায়?—বৌদি দেখব" বলিয়া কয়েকটি ছোট মেয়ে একেবারে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আরও সব হুকুম, সতর্ক বাণী—"আলো ঠিক কর্।...দুয়ারি মে সাম্‌পেনি লাগাও। দেখিস কেউ যেন

BanglaBook.org

চাপা না পড়ে সাম্পেনিতে!...”

এই মিশ্র কলরবের উপর হঠাৎ চৌদ্দ পনেরো জন নারীর কণ্ঠে গান উঠিল। মধুসূদন চিৎকার করিয়া উঠিলেন—“গান থামাতে বলো কৈলেস, আমার মাথার ঠিক নেই।”

“গীত বন্ধ কর, গীত বন্ধ কর”—বলিয়া চারিদিক হইতে একটা দাবড়ানি উঠিল। কিন্তু ইতিমধ্যে আরও পাঁচ সাত জন যোগদান করা ব্যতীত কোন ফল হইল না। মধুসূদন আরও চটিয়া উঠিয়াছেন, এমন সময় সেই মেয়েটির গলা। ক্রমাগতই চঞ্চলভাবে ভিতর-বাহির করিতেছে, ভিতর থেকে দরজার কাছে আসিয়া সব্বার উপরে গলা তুলিয়া বলিল —“বাবা, গান করতে দাও ; মা বললেন আজ কারুর মনে কষ্ট দিতে হবে না-আ-আ!...”

বিপিনবিহারী ধমক দিলেন—“তিনি!—অনেক দিন ছিলাম না তাই গলা বেরিয়েছে?”

মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরিল, গলা তুলিয়া একরাশ প্রশ্নে-মন্তব্যে অভিভূত করিয়া দিল—“কেন ছিলে না?— কেন থাক না?—চুপি চুপি বিয়ে করেছ তিনিকে ফাঁকি দিয়ে—মজা দেখাব।...কী এনেছ বিপিন-ভাইয়া আমার জন্য?...”

সাম্পেনির মুখ ঘুরাইয়া সদর দরজার সঙ্গে লাগানো হইল। তবুও যেটুকু অবকাশ রহিল, কয়েকজন লোক দু’ধারে দু’টা কানাৎ দাঁড় করাইয়া সেটা বন্ধ করিয়া দিল। সেই ঘেরা জায়গার মধ্যে বাড়ির মেয়েরা নামিয়া আসিলেন, শঙ্খ আর উলুধ্বনির মধ্যে শাশুড়ী বরণ আরম্ভ করিলেন। বাঙালী বধূবরণ এখানে এই প্রথম। কিছু মৈথিল স্ত্রীলোকও ঢুকিয়া পড়িয়া একদিকে গান করিতেছিল, উলুর অদ্ভুত আওয়াজে একটু অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিয়া একেবারে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। যাহারা উলু দিতেছিল তাহাদের মধ্যে একটি বড় মেয়ে অনুযোগের সুরে বলিল—“দেখো মা, হাসি ভালো লাগে না ; ওদের আদাড়ে গানের জন্য আমরা হাসছি?” তাহার পর শুদ্ধ মৈথিল ভাষায় সোজা তাহাদের সঙ্গেই মৃদু ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল—“ইঃ হসৈছি কিয়া? আঁহা লোকৈন্—অহে-মাহে কি গবৈৎ যাইছি (ইস্ হাসছ কি?—তোমরাই বা আগড়ম বাগড়ম কি গাইছ?)”

হাসিটা আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একজন বলিল—“ই ত মনুখ্যক্ গীত ছিয়েই হে, আঁহা লোকৈন্ গিদড় জাঁকা কি হুক্কি পাড়ৈৎছি? (এ তো মানুষের গান গো, তোমরা শেয়ালের ডাক কি তুলেছ?)”

ঝগড়াটা দুইদিকের হাসির ভিতর দিয়া একটু গড়াইল। রেষারেষির উপর গান আর উলুধ্বনি দুইটাই আরও সতেজ হইয়া উঠিল।

বরণ শেষ হইলে বধূকে লইয়া সকলে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

॥ ২ ॥

পাণ্ডুলের অনুষ্ঠানের মধ্যে বাঙালী প্রথার সঙ্গে খানিকটা এ দেশীয় প্রথাও জড়াইয়া রহিল। এ দেশীয়ের মধ্যে সঙ্গীতেরই প্রাধান্য। বাসার সামনে একটি পুরাতন বট আর একটি অশ্বত্থ গাছ বেশ খানিকটা জায়গা ছায়াচ্ছন্ন করিয়া আছে। তাহার তলায় একটি সামিয়ানার মধ্যে সকাল থেকেই নটুয়ার নাচ আরম্ভ হইয়া গেল। বারো-তেরো থেকে কুড়ি বাইশ

বৎসরের পর্যন্ত ছেলে পুরাপুরি এক বাইজীর সাজ পরিয়া স্ত্রী-জনোচিত হাবভাবের সঙ্গে নৃত্যগীত করে। তাহাদের সঙ্গীতও ঠিক বাইজীর মতোই—দুইপাশে দুইজন সারাঙ্গীওয়ালা, ঠিক পিছনে ডুগিদার কোমরে তাহাদের নিজের নিজের বাদ্যযন্ত্র বাঁধিয়া সঙ্গত করিয়া যায় ; একটি মন্দিরাওলাও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে। নটুয়ারা বাবরী চুল রাখিয়া নর্তকীর আরও খানিকটা নিকটতর হইবার চেষ্টা করে। ওদিকে বয়স একটু বেশী হইয়া গেলে যদি গোঁফ উঠিয়া পড়ে তো গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। মোটের উপর নটুয়া পাঁচমিশেলী কাণ্ড, ছোট বড় সব কাজেই কিন্তু অপরিহার্য।

একধারে বটগাছের নীচে সানাই বসিয়াছে, ঢোলের চামড়া ঢিলা হইয়া গেলেই পাশের ঘুঁটের আগুনে তাতাইয়া লইয়া আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু করিয়া দিতেছে।

ঠিক দরজার কাছে গাহিতেছে ভাট। এরা জাতিতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, কিন্তু কোন বড় হিন্দু কবির, অথবা নিজেদেরই রচিত দেবদেবীর বন্দনা বা অন্যবিধ কোন ছড়া হালকা এক রকম গানের সুরে গাইয়া যায়। ভালো ভাট হইলে সদা-সদ্যও কোন বিষয় লইয়া ছড়া রচনা করিয়া, সুরে টানিয়া শুনাইয়া দেয়। ভাট ধরিয়াছে চলতি এক ছন্দে হরগৌরীর বিবাহ-বর্ণনা, তাহার পর ধরিবে জনকপুরের রামায়ণী বিবাহোৎসব —বিবাহ-ঘটিত উৎসবে এই সাধারণ পদ্ধতি।

এর উপর মেয়েদের গীত আছে, ভিন্ন ভিন্ন পাড়া থেকে সাত আট জন করিয়া দল বাঁধিয়া আসিতেছে, বাসার কাছে আসিয়া গলা জড়াজড়ি করিয়া গীত করিতে করিতে আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিতেছে, গান সমাপন করিয়া বধূ দেখিয়া নিজেদের মন্তব্য করিতেছে ; তাহার পর ইচ্ছামত যে যাহার বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে ; ব্রাহ্মণ আছে, আবার ইতর জাতেরও মেয়ে আছে।

ভিন্নরকম সুরের সংঘর্ষে খুব যে একটা শ্রুতিরোচক কিছু হইতেছে এমন নয়, তবে যে ভাবেই হোক সমস্ত পাড়াটাতে একটা সাড়া জাগাইয়া দিয়াছে। এরা উল্লাসটা একটু উদ্দাম ভাবেই উপভোগ করিতে চায়। বড় মানুষের বাড়িতে উৎসবটা যদি এই আকারে না আসে তো নিন্দা হয়।

রাত্রের উৎসবটা অন্যভাবে হইল। শানাই, ভাট, মেয়েদের গীত বন্ধ রহিল। সামিয়ানা আরও ভালো করিয়া সাজাইয়া আলোক-শোভিত করা হইল। কুঠির আমলা এবং গাঁয়ের ভদ্রলোকেরা আসিয়া ফরাসের উপর বসিলেন, বড় বড় আলবোলায় সুগন্ধী তামাকের গন্ধ উঠিল, রূপার পরাতে সোনার তবক মোড়া পান, জরদা, আতরদানে আতর ঘুরিতে লাগিল। গোলাপপাশে গোলপজল ভরিয়া চারিদিকে সিঞ্চিত করা হইতে লাগিল। আসরের মাঝখানে নটুয়া—সকালের মতো মিশ্র শ্রোতার সামনে যদিচ্ছা সঙ্গীত নয়, রসজ্ঞদের ফরমাইস অনুযায়ী সঙ্গীতে রাত্রের আসর জমিয়া উঠিল। নটুয়ার পরে উঠিল কথক, এখানকার উচ্চারণে কথক্। এরা নটুয়ার মতো গেরস্ত-পোষা আর সুলভ নয়। এদের বয়সও অনেক, সঙ্গীত, অঙ্গভঙ্গি, বিশেষ করিয়া ভাবানুসরণ করিয়া অঙ্গুলিভঙ্গি আর নৃত্যগীতে ইহারা খুবই দক্ষ।...পোশাকে কিন্তু নটুয়ার অনুরূপ, এবং গোঁফের উপর কখন কখন যদি দাড়ি রাখিবার অভিরুচি হয় তো কেহ আপত্তি কিছু দেখে না।

মোটের উপর ছোটখাটো একটু-আধটু অসামঞ্জস্যের কথা ছাড়িয়া দিলে কথকের

BanglaBook.org

মধ্যে বেশ একটা আভিজাত্য আছে।

কথকটি দৈবযোগে পাওয়াও গেছে ভালো। বারাণসীর লোক, শহরে কোন এক বড় মৌফিলে বায়না লইয়া আসিয়াছিল, খবর পাইয়া তাহাকে লইয়া আসা হইয়াছে। সে আসরটা খুব জমকাইয়া দিল।

এই অবিরাম সঙ্গীতের পটভূমিকায় ভোজের আয়োজন হইতে লাগিল। সে এক বিরাট ব্যাপার। বৌভাতের মধ্যে যেটুকু সুদ্ধ বাঙালী অংশ সেটুকু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, মাত্র দুই তিনটি পরিবার লইয়া ব্যাপার, তাহাও দূরস্থিত অন্য কুঠি থেকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা। স্থানীয়দের জন্য আয়োজনটাই আসল।

আয়োজনের মধ্যে সূক্ষ্মতা নাই। একদিন হইবে চিড়া দই চিনি আর আচার, একদিন পুরি আর জিলিপি, গোটাদুই তরকারি থাকিবে। সূক্ষ্মতা নাই তবে নববধূর কড়া পর্দার মধ্যে হইতে গিরিবালা বহর যাহা দেখিলেন তাহাতে শুধু বিস্মিত নয়, কতকটা যেন বিমূঢ়ও হইয়া উঠিলেন, তাঁহার সেই পনেরো জনের জন্য এক মণ চাউলের আন্দাজ সত্ত্বেও। বস্তা বস্তা চিড়া, বস্তা বস্তা চিনি আসিয়া ভাঁড়ার ঘরে জমা হইতেছে ; দই দেশের মতো ছোট ছোট তিজেলে নয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মালসায় ;—এখানে বলে আখ্‌রা।

দেশে চিড়াদইয়ের ফলারের পাট প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তবুও গিরিবালা বার দু'এক দেখিয়াছেন, একবার নিকুঞ্জলালের বাড়ি আর একবার ঘোষালমশাইয়ের বাড়ি, কিন্তু সে এ ধরনের কিছুই নয়। লোক খাওয়াইবার জন্য যে এ-জাতীয় আয়োজন হইতে পারে গিরিবালা ধারণাতেই আনিতে পারিতেছেন না।

পরদিবস দুপুরবেলার কথা। ইঁহারা কয়েকজন সমবয়সী দাওয়ায় বসিয়া পান সাজিতেছেন ; কয়েকজন মৈথিলী মেয়েও সঙ্গে আছে। জান্‌কী, লছ্‌মী, দুলারমন্‌, কৌশল্যা, রামপিয়ারী—পাড়ার ঝিউড়ি মেয়েই সব। এমন আনকোরা বাঙালী নববধূ তাহারা কখনও দেখে নাই। খুব খুশি, তবে সাধারণতই একটু রহস্যপ্রিয় জাত বলিয়া তাহাদের আমোদটা নববধূর সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপের আকারেই প্রকাশ পাইতেছে বেশি, —দেশ লইয়া, দেশের মানুষ লইয়া, কয়েকটা যে বাংলা কথা শিখিয়াছে তাহা লইয়া। গিরিবালা প্রথম দিন ক্লান্তিবশত বলিয়াছিলেন—"ঘুমব", ওদের ভাষায় কথাটার মানে হয় "বেড়াব"।...সেই লইয়া বিদ্রূপ হইতেছে—"ম্যায় গে, কনিয়া অবেৎমাত্র কহৈছতিন্‌ ঘুমব্‌।" (মাগো, কনেবৌ আসামাত্রই বলেন বেড়াতে যাবো।)

বোধ হয় খুব হাসিবার কথা নয়, কিন্তু নির্মল সমবেত হাস্যে বাড়িটা মুখর হইয়া উঠিতেছে। গিরিবালাও হাসির ছোঁয়াচেই হাসিয়া উঠিতেছেন, তাহার পর ননদ মতিবালাকে প্রশ্ন করিতেছেন—"কী বলছে ভাই, মেজ ঠাকুরঝি?"

দ্বিভাষিণীর টীকায় আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিতেছেন—"তাই আমি বললাম! এরা স-ব করতে পারে দেখছি!"

ওরা আবার দ্বিভাষিণীর শরণাপন্ন হইতেছে, তবে সোজাসুজি নয় ; কপট গাম্ভীর্যে বলিতেছে—"কনিয়া হামরা সবকে গাইর্‌ পারৈৎছতিন ; তবু উঠ্‌হে লোকৈন্‌। (কনেবৌ আমাদের গালাগাল দিচ্ছেন ; তাহলে চল্‌ গো সব উঠা যাক্‌।)"

মোতিবালা বলিতেছেন—"না, গালাগাল দেবে কেন?"

গিরিবালার কথার অর্থটা বুঝাইয়া দিতেছেন।

BanglaBook.org

"এরা সব করতে পারে"—এই অভিমতের উপর মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া আরও গম্ভীরভাবে বলিতেছে—"কিয়্যাক্ ন সক্‌বৈ? হুন্‌কা মাথাপর লক টোলা টোলা ঘুম লা সকৈছি, গৌরী থিকি, ঢাকিয়া ঢাকিয়া পুন্ হেতৈ। চলথুন্।" (কেন পারব না? ওঁকে মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় বেরিয়ে আসত পারি, উনি গৌরী, আমাদের চাঙারি ভরা পুণ্যি হবে। ...চলুন না)

আরও জোরে হাসি উঠিল। গিরিবালা কী জবাব দিতে যাইবেন, বাহিরে একটা কলরব উঠিল। একটি মেয়ে বলিল—"বিজো ভেল্ হেতেই।"

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কী বোল্লে গা মেজ-ঠাকুরঝি?"

একটি মেয়ে গিরিবালার প্রশ্নটার পুনরুক্তি করিয়া বলিল—"কী বোল্লে গা মেজো ঠাকুর-ঝি?"

আবার একটা হাসি পড়িয়া গেল। মোতিবালা হাসিয়া বলিলেন—"ব্রাহ্মণদের পাত হয়েছে তাই গোলমাল হচ্ছে। গা তুলতে বলাকে ওরা 'বিজো' হওয়া বলে।" তাহার পর শুদ্ধ মৈথিলীতেই উহাদের তাড়াতাড়ি পানটা সাজিয়া লইতে বলিলেন, এখনই তো দরকার পড়িবে। ভাজের হইয়াও একটু ওকালতি করিলেন—কথায় কথায় যদি সবাই ছল ধরে তো বেচারি যে মারা যায়।

সকলে পান-সাজার হাতটা ত্রস্ত করিয়া দিল। ওরই মধ্যে গল্প-হাসিও অবশ্য চলিল: —তাহারা তো ছল ধরিবেই—'কনিয়া' না খাইয়া রাত জাগিয়া, যে উপায়ে হোক মৈথিলী ভাষা শিখিয়া নিন। নহিলে ছল ধরিয়া পাগল করিয়া তুলিবে। উনি তো এবারে এদের লোক হইয়া গেছেন; আর দেশে যাইতে দিবে নাকি? আর বাংলা কথা বলিতে দিবে নাকি?—ওদের টিয়াকে এবার পিঁজরায় বন্ধ করিয়া মৈথিলী কথা শিখাইবে।

খাওয়াদাওয়ারও কথা উঠিল। গিরিবালা বলিলেন—"ঠাকুরঝি, বল না এঁরা খাবার আর জানেন কি? এই তো দেখলাম—গাবদা গাবদা আটার লুচি, দুটো তরকারি হল কি না হল, তারপরেই জিলিপি, ব্যস সন্তুষ্ট। আমাদের ওখানে অন্তত তিন চার রকম মিষ্টি না হলে চলবে না; তার আগে পাঁচ-ছ দফা তরকারি—শাকভাজা, বেগুনভাজা, ছক্কা, ডালনা, ডাল, মাছ অম্বল..."

উত্তর দিবার জন্য সবাই হাঁ করিয়া চাহিয়া ছিল, একজন টানিয়া টানিয়া বলিয়া উঠিল—"আর ডাঁটাকে চচ্চোড়ি নেই কহলি?" (আর ডাঁটার চচ্চড়ির কথা বললে না?)

সকলে আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; মেয়েটি ঠাট্টা করিয়াই চলিল—লাউ-কুমড়োর ডাঁটাগুলাকে পর্যন্ত কাটিয়া কাটিয়া চচ্চড়ি করিয়া খায়, তারা আবার খাওয়ার গুমোর করে! এরকম লুচি বাংগালীরা হজম করিবে কোথা থেকে। ফুঁ দিলে উড়িয়া যায় —এই রকম দু'এক লুচি খাইয়াই—"মা গো, গেলাম গো!..."

মেয়েটি নিজের পেটটা চাপিয়া, পিঠ বাঁকাইয়া দুলিয়া দুলিয়া অসহ্য যন্ত্রণার এমন নকল করিতে লাগিল যে, আবার একটা হাসির তোড় উঠিল। সেটা থামিলে গিরিবালা বলিলেন—"তা বই-কি, আমাদের বেলে-তেজপুরের ননী আচার্যির খাওয়া যদি দেখে!"

এমন সময় সেজ ননদ ত্রিনয়নী ঝড়ের মত বাড়িতে আসিয়া প্রবেশ করিল এবং গলা ছাড়িয়া—"লোটন ঝা খেতে বলছে-এ-এ-এ..." বলিয়া সমস্ত উঠানে একটা পাক

BanglaBook.org

দিয়া সেইভাবেই বাহির হইয়া গেল।

মেয়েগুলির মধ্যে যাহারা ছোট তাহারা "লোটন ঝা বৈস্‌লা হে!"—বলিয়া হুড়মুড় করিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেল।

যাহারা অপেক্ষাকৃত বড় তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইল, মোতিবালার দিকে চাহিয়া বলিল—"ইঃ নো-নী আচারজী!—যেনা নাম তেহিনা খেতা কি, দেখা দহুন হিন্‌কা লোটন ঝাকে খানাই হে মোতি-দিদি, কহিও নামো নৈ লেতো নোনী আচারজী—কে—নো-নী আচারজী!" ইঃ ননী আচার্যি! যেমন নাম সেইরকমই খাবে তো? ওঁকে লোটন ঝার খাওয়া দেখিয়ে দাও মোতিদিদি, ননী আচার্যির নামও নেবেন না কখনও)

মোতিবালা বলিলেন—"যাবে বৌদি?"

"মা রাগ করবেন, তা না হলে..."

"রাগ করবেন না ; আচ্ছা দাঁড়াও জিগ্যেস করে আসি।"

গৃহিণী নিস্তারিণী দেবী দেখাশুনো করিয়া ফিরিতেছেন, নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন—"তোদের পান সাজা হল? ওদিকে ব্রাহ্মণেরা বসে গেছেন।"

মোতিবালা বলিলেন—"খেতে খেতে হয়ে যাবে'খন ; খাওয়া শেষ হতে তো এক পহর। মা, বৌদিদিকে লোটন ঝার খাওয়া দেখিয়ে আনব, আহা কখনও দেখেননি!"

ভাজের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া মিনতি করার ভাবে নিস্তারিণী হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"তবে আর কি,—মস্ত বড় জিনিস দেখেননি!"

সঙ্গে সঙ্গেই গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"না, ছিঃ ব্রাহ্মণেরা খেতে বসেছেন, কে একমুঠো কম খাচ্ছেন, কে একমুঠো বেশি খাচ্ছেন তা নিয়ে তামাশা করতে নেই, আর ওঁরই কল্যাণে যখন খাচ্ছেন। বলে নারায়ণ ব্রাহ্মণদের হাতে আহার করেন, ওঁরা যত সন্তুষ্ট হন ততই ভালো গেরস্তর।...ছিঃ।"

এই ব্যাপারটুকু লইয়া হাস্যকৌতুক হইতেছিল বলিয়া দলের সকলেই একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। দুলারমন নামে মেয়েটি বলিল—"সে নেই হে চাচী, ভৌজী কহৈৎছেলি হুনকা মুলুকমে কেদন নোনী আচারজী বড্‌ড় খৈন্‌হার ছৎ, তেই হুনকা একবের লোটন ঝাকে দেখা দিতিঅঁও। পাণ্ডৌলসে কক্‌রো হম টপ দেবৈ?" (কাকীমা, তা নয় গো,—বৌদিদি বলছিলেন ওঁর দেশে কে একজন ননী আচার্যি নাকি মস্ত বড় খাইয়ে আছে, তাই ওঁকে একবার লোটন ঝাকে দেখিয়ে দিতাম। কাউকে পাণ্ডুল ছাড়িয়ে যেতে দোব নাকি?)

নিস্তারিণী দেবী জানাইলেন—"এখন তো পাণ্ডুলই ওঁর দেশ হল, তোমাদের মত উনিও পাণ্ডুল নিয়ে গুমোর করবেন। তা বলে কি ব্রাহ্মণের খাওয়া নিয়ে রঙ্গ করে? খাইয়ে একআধ জন থাকে সব জায়গায়, আমাদের দেশে ছিল মুন্‌কে রঘু—একমণের কমে তার পেটই ভরত না,..."

দুলারমন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—"শাশ-পুতৌ এক্কে ভ' গেলি হে, অপনে দেশকে বড়বৈছতিন্‌!" (শাশুড়ী পুত্রবধূ এক হয়ে গিয়ে নিজের দেশকেই বাড়াচ্ছেন গো!) সকলেই সজোরে হাসিয়া উঠিলেন। নিস্তারিণী দেবী পর্য্যন্ত যোগ না দিয়া পারিলেন না। ঠিক এই সময় সেজ মেয়ে ত্রিনয়নী পূর্ব্ববৎ সবেগে প্রবেশ করিল এবং সমস্ত উঠানটাতে পূর্ব্ববৎই একটা চক্র দিয়া জানাইয়া গেল—"লোটন ঝার পাঁচিশটা

বোম্বাই আম হয়ে গেলো-ও-ও-ও-ও!"

সকলে আরও উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, কৌশল্যা বলিল—"আব্ শুনু।"(এবার শোন) ওর ছোট্ট মন্তব্যটুকুতে হাসিটা আরও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। নিস্তারিণী যেন দলবৃদ্ধির জন্য প্রতিপক্ষের নিকট হার মানিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িলেন, বলিয়া গেলেন মস্করা না করিয়া পানটা যেন তাড়াতাড়ি সাজিয়া ফেলে সবাই।

নিস্তারিণী দেবী চলিয়া গেলে দুলারমন মুখটা ঝুঁকাইয়া গিরিবালার পানে চাহিয়া বিজয়িনীর ভঙ্গিতে বলিল—"শুন্‌লি হে কনিয়া? আব পাণ্ডৌলে আঁহাকে ঘর ভ' গেলেই; তেজপুরকে গুমান ছোড়ুঃ।" (শুনলে গো কনেবৌ, এবার পাণ্ডৌলেই তোমার ঘরবাড়ি হল, তেজপুরের গুমোর ছাড়ো।)

গিরিবালা হাসিযা ননদকে বলিলেন—"ওঁদেরও তো বিয়ে হয় গেছে মেজঠাকুরঝি, জিগ্যেস কর তো ওঁরা পাণ্ডুলের গুমোর নিয়ে পড়ে আছেন কেন? শ্বশুরবাড়িরই যশ গান না।"

অল্পস্বল্প বাংলা বোঝে, প্রসঙ্গ ধরিয়া কথাটা বুঝিতে আরও কষ্ট হইল্ না, দুলারমন সোজা হইয়া বসিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল—"বুঝলওঁ হে; পাণ্ডুলের গুমোর নিয়ে —ইঃ পাণ্ডৌল ছোড়্‌ক ককর্ যশ গায়ব?" (বুঝেছি গো বুঝেছি,—পাণ্ডুলের গুমোর নিয়ে...ইঃ, পাণ্ডুল ছেড়ে কার যশ গাইব?)

সেও হাসিয়া উঠিল, এবং তাহার তর্কের ভঙ্গি দেখিয়া বাকি সকলে হাসিয়া উঠিল।

চণ্ডীচরণ আসিল, চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বলিল—"উস্ বৌদি, আজ যদি সাতু থাকতো তো 'উরে ব্বাসরে'—'উরে ব্বাসরে' বলেই তার দম ফুরিয়ে যেত!"

ভ্যাংচাইতে ভ্যাংচাইতে নিজের একটু অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। "উরে ব্বাসরে! লোটন ঝা!..." বলিয়া আবার দৌড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

কাজের কটা দিন অল্প অল্প কাজে, তাহারই মধ্যে নূতন সঙ্গিনীর সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয়ে, হাসি-কৌতুকে কাটিয়া গেল। কাজের জের মিটিতেও কয়েকটা দিন গেল; তাহার পর নিত্যকার জীবন আরম্ভ হইল পাণ্ডুলের।

॥ ৩ ॥

গিরিবালার নূতন জীবন যেখানে আরম্ভ হইল সে জায়গাটির মোটামুটি ধারণা করিয়া লওয়া দরকার।

পাড়া-গাঁ হইলেও পাণ্ডুল বেশ বর্ধিষ্ণু স্থান। এর জীবনের কেন্দ্রস্থল নীলকুঠিটা। জায়গাটা মিথিলার একেবারে মাঝখানটিতে, তায় বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রধান হওয়ায় স্বভাবতই একটু পুরাতন-ঘেঁষা। এরই মাঝে অতি-আধুনিক যন্ত্রযুগের প্রতীক এই নীলকুঠি হঠাৎ কোন সময়ে ঠাঁই করিয়া লইয়া একটা মিশ্র সুরের অবতারণা করিয়াছে। টোলের সংস্কৃত চাপা দিয়া যখন কলের ভোঁ ওঠে, কিংবা ব্রাহ্মণ-পল্লীর মাঠ ভাঙিয়া, পুকুরের পাড় হইয়া সাহেবমেমে ঘোড়ায় চড়িয়া হাওয়া খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন তদারকে বাহির হয়, পুরাতন একটু চকিত হইয়া ওঠে। তবে গা-সওয়া হইয়া আসিয়াছে; আর এই গা-সওয়া হওয়াটাই পাণ্ডুলের বিশেষত্ব—এইখানেই অন্যান্য স্থানের তুলনায় সে

BanglaBook.org

প্রগতিশীল—তাহাদের উপহাসেরও পাত্র আবার হিংসারও পাত্র।

পশ্চিম দিক দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতেই একটা ছোট নদী পড়ে। ঠিক নদী বলা ভুল,—নিজ মিথিলার প্রধান নদী কমলার একটা সুঁতি। স্থানীয় লোকেরা কিন্তু মর্যাদা কমাইতে চায় না, কমলা নদীই বলে। এক ধারে কয়েক বিঘা জায়গা লইয়া কুঠি, সাহেবের বাড়ি ও তৎসংলগ্ন বিস্তীর্ণ বাগান। বাড়ির স্থাপত্যে, বাগানের পরিকল্পনায়, কুঠির প্রাঙ্গণে কিছু কিছু অপরিচিত গাছের জন্যও, সমস্ত পরিবেশটুকুতে একটা বিদেশী ভাব আছে : মনে হয় ওদের নিজের দেশের "ম্যানর হাউস"কে দূর বিদেশে যতটা সম্ভব রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। গ্রাম থেকে অল্প একটু দূরে কুঠিটাও নিজের আভিজাত্য লইয়া তফাতে আছে, গ্রামটাও বিস্ময়শঙ্কান্বিত দৃষ্টিতে দূরে থেকে উহার পানে চাহিয়া আছে। কুঠির পরেই 'জিরাৎ' অর্থাৎ খাস আবাদী, এখানকার মাপের বিঘা শতেকের এক চাকলা ; ক্ষেত বাদ দিয়া আমলাদের বাসা। সব মাটির ; এক জেলা-শহরে গোটাকতক বাড়ি ; আর এখানে-ওখানে নীলকুঠিয়ালদের আস্তানা ছাড়িয়া সে যুগে এ-প্রান্তে কোঠাবাড়ির চলন ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কুঠির সর্বোচ্চ আমলা হিসাবে মধুসূদনের বাসার কতকগুলা দেয়াল কাঁচা ইটের ; সেই একটা মস্ত বড় বৈশিষ্ট্য সেযুগে।

আমলাদের পিছনেই বামহন-টুলি অর্থাৎ ব্রাহ্মণপাড়া—কৌশল্যা, দুলারমন, জানকীদের বাড়ি। মাঝে মাঝে কোথাও গয়লাপাড়া, দুসাদপাড়া, কুর্মিধানুকপাড়া, ক্ষেত, আমবাগান,—আবার ব্রাহ্মণপাড়া আরম্ভ হইয়া গেল। এরাই প্রধান এবং সংখ্যাধিক। জিরাতের বাঁ দিক ঘেঁষিয়া যে রাস্তাটা আমলাপাড়ায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই একপাশে, অর্থাৎ কুঠির সব চেয়ে নিকটে ছুতারপাড়া আর কামারপাড়া। কুঠির দৃষ্টিতে ওদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি, যন্ত্রযুগে ওরা বিশ্বকর্মার প্রতিনিধি ; তাই কুঠির জমিতে, কুঠির তত্ত্বাবধানে আমল্যদের পাশেই ওদের বসতি।

নদীর ধারে কুটির পাশেই হাতিশালা, তাহার পরেই হাট এবং তাহার পরেই টানা বাজার চলিয়া গিয়াছে।

মধুসূদনের বাসার সামনে পাশাপাশি দুইটা পুরান গাছ, একটা বট একটা অশ্বত্থ। এদের সুদূর-বিক্ষিপ্ত শাখাপ্রশাখার নিচে বাঁ দিক দিয়া কুঠির কাঁচা রাস্তাটা, এই রাস্তার পরেই খানিকটা উঠান গোছের, তাহার পরেই মধুসূদনের বাসাটা। একটা বহির্বাটি, একদিকে খানকতক ঘর, দুই দিকে রক, মাঝখানে একটা চৌকো উঠান। তাহার পরেই ভিতর-বাড়িটা, সব মাটির—সে কথা আগেই বলা হইয়াছে।

মাটির বাড়ির প্রসঙ্গে শৈলেনের একটা কথা মনে পড়িয়া যায়। ঠাকুরমার যখন অনেক বয়স—তাঁদের যুগের আর শৈলেনদের যুগের প্রভেদটা যখন নিরতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বিদ্রূপচ্ছলে বলিতেন—"আমাদের সে সময় মাটির বাড়িতে সোনার মানুষ থাকতো, তোদের এসময় দেখছি সোনার বাড়িতে মাটির মানুষ থাকে।"

শহরের মধ্যে, চারিদিকের কোঠাবাড়ির মাঝে নিজেদের কোঠাঘরেই বসিয়া কথা হইত। শৈলেন অবশ্য ছাড়িত না, সম্পর্ক ধরিয়া বলিত—"সে মাটির বাসায় ঠাকুরদাদা ছিলেন বলে তুমি একথা বলছ ঠাকুরমা, এখানেও যদি তিনি থাকতেন, এই তুমিই বলতে সোনায় সোহাগা হয়েছে।"

ওটা হইল ঠাট্টার কথা। যখন ভাবে শৈলেন তখন কি আর তাহার সন্দেহ থাকে

ঠাকুরমার কথায়?—কী আত্মকেন্দ্রিক মানুষের যুগ!—নিজের স্বার্থের চারিদিকে পাক দিতে দিতে খর্ব হইয়া কোথায় যে মিশাইয়া যাইতেছে তাহার কি কোন হিসাব আছে?

গিরিবালার শাশুড়ী নিস্তারিণী দেবী বনেদী ঘরের মেয়ে। জমিদার নয়, বনেদী ব্রাহ্মণ গৃহস্থ, যাঁদের মূলধন ছিল পাণ্ডিত্য, আর সম্পদ ছিল যজমান-সম্প্রদায়। ওঁদের বাড়িতে দোলদুর্গোৎসব ছিল, সদাব্রত পর্যন্ত ছিল, তাই নিস্তারিণী দেবীর চরিত্রের মেরুদণ্ড ছিল ধর্মনিষ্ঠা। দুইটি বংশের মধ্যেই এইদিক দিয়া একটা মিল ছিল। বোধ হয় নিস্তারিণী দেবীর দিকটা আরও একটু উজ্জ্বল ছিল—সে-যুগের বাঙালীর সংবাৎসরিক পূজায়, দানে-ধ্যানে। পাণ্ডুলের জীবনে দোল-দুর্গোৎসব অবশ্য ছিল না, এদেশে সে-যুগে প্রতিমা গড়িয়া মূর্তিপূজার প্রচলন অতটা ছিলও না, তবে সদাব্রতগোছের একটা জিনিস নিস্তারিণী দেবী বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন; খাওয়ানটা মধুসূদনের বাড়িতে একটা নিত্যকার ব্যাপার গোছেরই ছিল।

নিস্তারিণী দেবী ক্ষীণাঙ্গী সুন্দরী, মুখে-চোখে বুদ্ধির দীপ্তি মাখান, কর্মচপল অথচ স্বল্পভাষিণী। ওঁর চরিত্রের মধ্যে দর্প আছে, কিন্তু গুমর নাই; বংশের যদি একটা নিজস্ব ধারা থাকে তো সেটি যেন ওঁকে সর্বক্ষণ বেষ্টন করিয়া আছে।

সন্তানের মধ্যে চারিটি কন্যা, দুই পুত্র। বিপিনবিহারী জ্যেষ্ঠ সন্তান, তাহার পরেই কন্যা বিরাজমোহিনী, তাঁহার কোলে চণ্ডীচরণ। এছাড়া ভাগিনেয় কৈলাসচন্দ্র আছেন। বিপিনবিহারীর চেয়ে বছর বারো বড়; নীলকুঠিতেই মাতুলের সহকারী হিসাবে কাজ করিতেছেন।

গিরিবালা যখন এ বাড়িতে আসিলেন তাহার বছরতিনেক পূর্বে বিরাজমোহিনীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তিনি আসিয়াছেন। ভাজ বয়সে ছোট অথচ সম্বন্ধে বড়,—বিরাজমোহিনী তাহাকে লইয়া যেন একটু দোটানায় পড়িয়াছেন। আরও মুশকিল এইজন্য যে, উনি একটু ঠাট্টা ভালোবাসেন অথচ গম্ভীর—মায়ের গাম্ভীর্যটি চরিত্রের মধ্যে পাইয়াছেন, বলিতেছেন—"রাগটা অবশ্য আমার দাদার উপরই বেশি হচ্ছে, উনি দু'বছর পরে জন্মালেই গোল মিটে যেত; কিন্তু তা যখন হল না, তখন তুমিই না হয় ওঁর দোষটা সামলে নিয়ে বছর দু'তিন আগে জন্মাতে,—তাহ'লে গুরু হলেও অন্ততঃ সমবয়সী তো হতে পারতে।"

বিরাজমোহিনীর পরে মোতিবালা, গিরিবালার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট। স্বভাবটি অত্যন্ত নরম, তাহার উপর বিরাজমোহিনী চলিয়া গেলে সংসারে মায়ের পরেই থাকেন তিনি, তাই বয়স অল্প হইলেও একটু গিন্নিবান্নির ভাব আসিয়া গিয়াছে। এখানে একথাটাও বলিয়া দেওয়া দরকার যে পাণ্ডুলে ও-জিনিসটা মেয়েদের জীবনে দু'দিন আগেই আসে। অবরোধ প্রথাটা এখানে কড়া, বাঙালীদের আবার একটু বেশি করিয়া মানিতে হয়। বিবাহের বয়সের কাছাকাছি আসিলেই বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, খেলাধূলা ঘোরাফিরার পরিধিটা হঠাৎ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া, বয়স্থাদের অবিচ্ছিন্ন সংসর্গে বয়সটাতে যেন অকালে রং ধরিয়া যায়।

অবরোধ একধরনের কবর, তাই দুইটির মধ্যে অনেকটা মিল আছে—অবরোধও ছোট-বড় প্রভেদ মিটাইয়া দেয়, কিশোরীতে আর বর্ষীয়সীতে কোন তফাত রাখে না।

নরম স্বভাব বেশি স্নেহপ্রবণ হয়,—মোতিবালার স্নেহটা মানুষের উপর হইতে

BanglaBook.org

উপচাইয়া একটি রাঙা বিড়ালের উপর জড়ো হইয়াছে। একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেই সেইটি আসিয়া কোল দখল করে।

গৃহিণীপনার ছোঁয়াচ নিস্তারিণীদেবীর তৃতীয় মেয়েটিতেও লাগিয়াছে, তবে অন্যভাবে। এ মেয়েটি যেমন তীক্ষ্ণধী, তেমনি চঞ্চল।—ত্রিনয়নী সর্বত্র আছে, সবার কথায় আছে এবং সব ধরনের কথায় আছে। বাপকে পরামর্শ দেয়, মায়ের কথায় গম্ভীর ভাবে সায় দেয়, দাদাদের কথা কাটে, বোনেদের কথা ধর্তব্যের মধ্যেই আনে না। মেয়েটি বিপিনবিহারীর বড় প্রিয়। বাড়িতে থাকিলে দাদার ঘাড়ে পিঠেই তার জায়গা, চঞ্চল প্রাণের আবেগে ঐ কেন্দ্র থেকেই ছিটকাইয়া পড়ে মাঝে মাঝে—নিত্যন্ত হঠাৎ। হয়তো কামারপাড়ার সঙ্গিনীদের কথা মনে পড়িয়া গেল, ত্রিনয়নী আর বাড়িতে নাই। বাবা কুঠি থেকে ফিরিতেছেন, ত্রিনয়নী ছুটিল ; একটা হাত জড়াইয়া মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরের ভারটা আলগা করিয়া দিয়া রাজ্যের গল্প করিতে করিতে আসিবে—বাড়ির সমস্ত দিনের খুঁটিনাটি খবর একটি বাকি থাকিবে না জানিতে মধুসূদনের, প্রত্যেকটির সঙ্গে থাকিবে ত্রিনয়নীর নিজের মন্তব্য—"জান বাবা? খজনী আবার শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে ; এবার একটা বিহিত করো ; মেয়েমানুষ শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে আসবে এ কোন্ দেশী কথা বাবা, এমন তো শুনিনি কোন কালে!"...কখনও হয়তো লোটন ঝার খাওয়ার মতো ব্যাপার ঘটে, ত্রিনয়নী একলা উপভোগ করিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারে না, দাদার পিঠের উপর থেকে ছুটিয়া গিয়া—সমস্ত বাড়িটায় একটা কৌতুকের হিল্লোল তুলিয়া জানান্ দিয়া আসে—"লোটন ঝার পঁচিশটা আম হয়ে গেলো—ও-ও-ও!"

বিপিনবিহারী নিজেই নাকি ছেলেবেলায় এই ধরনের ছিলেন—প্রাণের প্রাচুর্যে সদা-চঞ্চল। বোনের মধ্যে প্রাণের এই অহেতুক স্ফূর্তি তাই তাঁহার বড় ভালো লাগে। এক এক সময় বলেন—"কেন মরতে তুই মেয়ে হয়ে জন্মালি?—তুই কোনসময় ছেলে মানুষ করতে করতে মিইয়ে গেছিস্—ভাবতেও যেন আমার চোখ ফেটে জল আসে।"

ত্রিনয়নীর পরেই অভয়া। এখনও কোলের শিশু, এই সবেমাত্র নামকরণ হইয়াছে।

বেটাছেলের মধ্যে আরও আছেন কৈলাসচন্দ্র, মধুসূদনের ভাগিনেয়। বিপিনবিহারীর চেয়ে বছর তিন-চারেকের বড় ; কুঠিতে নূতন কাজ শুরু করিয়াছেন। বিপিনবিহারীর মতোই সবল সুস্থ যুবক। মধুসূদন নিজে অতি সুকুমার ; সুখলালিত সেকালের বাঙালী বাবুটি। এ-দেশের শক্তিচর্চার মধ্যে নিজের সেই সৌকুমার্যটা তাঁহার নিশ্চয় পছন্দ নয়, তাই ভাগনে, পুত্র দুই জনকেই এই দিক দিয়া তালিম দিয়াছেন, দস্তুরমত পালোয়ান রাখিয়া।

মোটের উপর পরিবারটি বিশেষ বড় না হইলেও সবদিক দিয়া বেশ ভরাট।

গিরিবালার সবচেয়ে বেশি যাহা চোখে ঠেকিল তাহা এখানে দাসদাসীর বাহুল্য। ক'জন যে আছে তাহার ঠিক মতো হিসাব পান নাই এখনও। সব জিনিসেই এখানে চাকরদাসীর উপর নির্ভর ; বাড়ির মধ্যে যে সাধারণত্ব আছে, সেটা ঐ দিকের অসাধারণত্বে পুষাইয়া গেছে।

মোহনা মধুসূদনের খাস চাকর, তাহা ভিন্ন বাড়ির জন্য একটা আছে ; বাহিরের জন্য যতদূর মনে হয় একটার বেশিই আছে। এতদতিরিক্ত ঝি আছে জনতিনেক, আর রাঁধুনী ব্রাহ্মণীও আছে। প্রধান ঝি খজনীর মা। মাছে-দুধে পুষ্ট মাঝবয়সী মানুষটা, কাজের

BanglaBook.org

বেশি ফোপরদালালি করিয়া বেড়ায়। বাড়িতে মুখ বুজিয়াই থাকে তবে শ্রুতির একটু বাহিরে হইলে রূপার মোটা বাজু খেলাইয়া বলে—"হাম, মাইজীকে খাবাসিন্ ছি হে, ঝাড়ু বাহারণলা নই ছি।" (আমি মাইজীর খাস চাকরাণী, ঘর ঝাঁট দেওয়া আমার কাজ নয় গো!)

মধুসূদন নিস্তারিণীদেবীকে ঠাট্টা করিয়া বলেন—"তোমার পার্শ্বচারিণী মন্থরা।"

খজনীর মার প্রতিপত্তির আর একটা কারণ এই যে, সে সপরিবারে বাড়িটি দখল করিয়া আছে,—বাহিরে খাটে তাহার স্বামী বুধন, ভিতরে মুড়ুলি করে সে নিজে, তাহার উপর তাহার মেয়ে আছে,—খজনী; খজনীর কাজ হইতেছে কচি ছেলে-মেয়েদের আগলান। ওর কাছে এর অর্থ, হাতে কিছু একটা দিয়া নিজে নিদ্রা যাওয়া, অবশ্য বাহিরে নিরাপদ স্থানে লইয়া গিয়া। শিশু যদি নিদ্রায় ব্যাঘাত দেয় তো ভয় দেখাইয়া ঠাণ্ডা করে। খজনীর হাড়কাট মোটা মোটা, রং খুব ক্যালো, চোখ দুইটা একটু উগ্র, বড় বড় দাঁত, —সামান্য চেষ্টাতেই ছেলেপুলে ভয় পাইয়া যায়; ও ঘুমায়। এই করিয়া প্রায় দশ বৎসর চালাইয়া আসিতেছে; সাত-আট বৎসরে প্রবেশ করিয়াছিল এই গৃহে, এখন তাহার বয়স সতেরো-আঠারো। চণ্ডীচরণ হইতে নিস্তারিণীদেবীর সমস্ত সন্তানগুলিকেই আগলাইয়াছে খজনী।

খজনী, আমাদের দেশে যাদের বলে 'হুড়কো' মেয়ে—তাই; শ্বশুরবাড়ি থাকিতে চায় না। জোরজারি করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া হয়, তাহার পর একটু সুযোগ পাইলেই পলাইয়া আসে।

বাহির হইতে কারণটা খুবই স্পষ্ট,—বাবুরবাড়ির ভাত, তায় বাপ-মায়ের আদর, কিন্তু এইটুকুই কারণ কিনা এক একবার সন্দেহ হয় সবার। পলাইয়া আসিয়াই খজনী তাহার প্রতিপাল্য শিশুটিকে বুকে জড়াইয়া ধরে, পা ছড়াইয়া হাপুস নয়নে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে দুলিয়া দুলিয়া গানের সুরে কান্না জুড়িয়া দেয়—"শুগা গেঃ, সোনমা গেঃ, বহীন গেঃ, তোরা ছোড়কে রহবেই কেনা গে—এ—এ?" (টিয়া আমার, সোনা আমার, বোন আমার, তোকে ছেড়ে থাকব কেমন করে রে!)

নিস্তারিণীদেবী বকেন, পাড়ার মেয়েরা যাহারা থাকে উপদেশ দেয়, গঞ্জনা দেয়; নিবারণের চেষ্টা সত্ত্বেও ওর মা আসিয়া নিজে লাথিটা-আসটা বসাইয়া দেয়ই; সবের মাঝে খজনী শুধু আরও নিবিড়ভাবে শিশুকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরে, কান্নার কীর্তনে আরও আখর জুড়িয়া চলে।

এই হইল স্বজন-পরিজন, এ ভিন্ন পাড়াপড়শী আছে। ব্রাহ্মণের বাড়ির মেয়েরা; প্রায় সব টকটকে রং গা-ময় উল্কি পরা, আর কম-বেশি করিয়া রূপার গহনা পরা। কথা গিরিবালা বুঝিতে পারেন না, কিন্তু লাগে বড় মিষ্ট। বাংলার অনেক কথাই কানে আসে, অর্থটা মাঝে মাঝে ধরা দিয়াই যেন হাত ফসকাইয়া যায়। গিরিবালা অর্থ ধরিবার জন্য মন দিয়া শুনেন, যেন একটা লুকাচুরি খেলা চলিতে থাকে।

অন্য জাতের মেয়েরা আসিয়া উঠানে বসে; দেশের তুলনায় নোংরা একটু বেশি, কিন্তু সবাই বেশ হৃষ্টপুষ্ট, আর প্রায় সবাই বেশ সদানন্দ গোছের। একদিন একটু অন্য ধরনেরও মেয়ে দেখিলেন, যদিও এ-দেশীই। ত্রিনয়নী হঠাৎ দুপুরবেলা ছুটিয়া আসিয়া উঠানে চক্কোর দিতে দিতে খবর দিল—"কাদের বাড়ির পাল্কি এসেছে—এ—এ।"

BanglaBook.org

একটি বয়স্থা স্ত্রীলোক, একজন পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের, আর একজন চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের যুবতী আসিয়া প্রবেশ করিল। বেশভূষা অনেকটা আলাদা,—গায়ে আঙরাখা, কাপড় পরার ঢংটাও একটু অন্যরকম, কোঁচা আছে তবুও অনেকটা বাঙালীর মতো। হাতে আর পায়ের পাতায় মেহেদির বুটি তোলা। গায়ে রূপার সঙ্গে এক-আধটা সোনার গহনাও আছে, গড়নও অনেকটা বাঙালীদের গহনারই মতো। কুঠির মুন্সি কুলদীপ সহায়ের পরিবার—স্ত্রী, পুত্রবধূ আর কন্যা।

এরা মগধী, অর্থাৎ পাটনা-গয়া অঞ্চলের কায়স্থ, আচার-ব্যবহারে অনেকটা মুসলমানী আভিজত্যের ছাপ আছে। সঙ্গে বড় পানের বাটা আর সজ্জিত আলবোলা লইয়া একটি দাসীও আছে। কথাবার্তাও একেবারে অন্য ধরনের ; গিরিবালা একেবারেই বুঝিলেন না। নিস্তারিণীদেবী আর বিরাজমোহিনী অবশ্য বুঝিলেন, তবে উত্তর দিয়া গেলেন মৈথিলীতেই।

অভ্যর্থনা, বিদায়, মাপিয়া-জুপিয়া অল্প কথাবার্তা—সবকিছুর মধ্যে বিধিবিধানের একটা কাঠিন্য লাগিয়া রইল। মৈথিলী প্রতিবেশিনীরা যেমন গায়ে পড়িয়া মিশিয়া যাইতে পারে, এ তেমন নয়। মেয়েটি বয়সের কৌতূহলেই গিরিবালার গায়ে হাত দিয়া, গহনা পরীক্ষা করিয়া একটু ভাব করিবার চেষ্টা করিতেছিল, মা ছোট্ট কী একটা বলিতে গুটাইয়া বসিল।

ওরা চলিয়া গেলে গিরিবালা বড় ননদকে বলিলেন,—“মেয়েটি দিব্যি ; কী বললে গিন্নি ওকে গা বড়ঠাকুরঝি?”

বিরাজমোহিনীর কয়েকটা কথার সঙ্গে পরিচয় আছে, বলিলেন—“বললে ‘বদ্‌তমিজি’ —মানে অসভ্যতা হচ্ছে। ওরা বড্ড সভ্যভব্য, একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই।”

গিরিবালা বলিলেন—“তার চেয়ে এরা বেশ : মেয়েটি কিন্তু দিব্যি ছিল।”

বোধ হয় বিদেশে বাঙালী-ঘেঁষা মেয়েটির সঙ্গে অসম্পূর্ণ পরিচয়ের জন্যই ছোট্ট গোছের দীর্ঘশ্বাস পড়িল একটি।

॥ ৪ ॥

এই অভিনব পরিবেশের মধ্যে গিরিবালার নূতন জীবন আরম্ভ হইল।

প্রথম ছয়-সাতটা দিন কাজের গোলমাল আর তাহার জের মিটাইতে গেল। তাহার পর একটা অবসাদ আসিল সবার মধ্যেই। তাহার পর একমাত্র বাহিরের লোকের ভিড় আর উৎসবের কাজের ভিড় একেবারে অপসারিত হইয়া গিয়া সংসারটি যেন নিজের স্থানটিতে আসিয়া দাঁড়াইল। এইবার তাঁহাকে ভালো করিয়া দেখিবার সময় আসিল, নিজের দিকে চাহিবারও অবসর মিলিল।

গিরিবালাকে এইখানেই কাটাইতে হইবে। এই কঠিন অবরোধের মধ্যে এই গোনাগুনতি পাঁচ-সাতটি মানুষ, যাদের তিনি বোঝেন, যারা হয়তো তাঁহাকে বোঝে ; তাহার পরই অপরিচিত মহাসমুদ্র! গিরিবালা যেন হাঁপাইয়া ওঠেন।

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন অলস হইয়া উঠে। বোধ হয় কোন এক দুঃস্বপ্নেই গিরিবালার ঘুম ভাঙিয়া যায়, হয়তো বা বেলে-তেজপুরের কোন একটা দিন স্বপ্নের মায়ায় ভাসিয়া উঠিয়া

BanglaBook.org

মনটাকে হঠাৎ আতুর করিয়া তোলে। বিছানা ছাড়িয়া গিরিবালা জানালার কাছে গিয়া দাঁড়ান। জানালাও নয়, কেননা বাহিরের দিকে জানালা রাখা এখানে রেওয়াজ নয় ; খুব মিহি-বুনট তারের জাল দেওয়া ঘুলঘুলি, জানালা বলিলে তাহার মর্যাদা যতটা বাড়ে তাহার চেয়ে জানালার মর্যাদা কমে ঢের বেশি। সেই ঘুলঘুলির ভিতর দিয়া গিরিবালা বাহিরের দিকে ভীতভৃষিত নয়নে চাহিয়া থাকেন এক ফালি বহির্জগতের দিকে।— অশ্বত্থতলায় কয়েকটি বালকবালিকা খেলাঘর রচনা করিতে ব্যস্ত—বেলে-তেজপুরে নিজেকে যেমন এবং যে বয়েসের বলিয়া মনে হয় সেই রকম। একটি মেয়ে ঠিক যেন নন্তীর মতো—শ্যামবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট, হাসি-হাসি অথচ শান্ত মুখ। আর দূরে জিরাতের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ—তাহার পর কুঠির রাঙা ইটের উঁচু ঘরটা, মোতি-ঠাকুরঝির নিকট শোনা—নীলের গুদাম ; তাহার পাশেই গুলমোহর বা রাধাচূড়ার প্রকাণ্ড গাছটা, ফুলে ফুলে রাঙা হইয়া আছে। তাহার পর সাহেবের বাড়ি, দীর্ঘ ঝাউগাছের শ্রেণী। গবাক্ষপথে ধরা যায় সামনের এইটুকু, পৃথিবীর আর সমস্তই কে যেন মুছিয়া বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।... বাড়ির উঠানে খর রৌদ্র, চোখ ঠিকরাইয়া পড়ে। তারের সূক্ষ্ম আবরণের মধ্য দিয়া সামনের ঐ যৎসামান্য দৃশ্যকণাটুকু কিন্তু বড় মোলায়েম। বিধাতা দয়া করিয়া যেটুকু দিলেন সেটুকু আরও দয়াপরবশ হইয়া একটু মধুর করিয়া দিলেন—একটা কুহেলীর মায়া বুলাইয়া তাহার সব রুক্ষতা মিটাইয়া দিয়া।...গিরিবালা অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকেন। জেঠামশাইয়ের উপর অভিমানে মনটা ভরিয়া উঠে ; ক্রমে বাবা, জেঠাইমা, মা—সবারই উপর। "কী বলে আমায় এ নির্বাসন দিলে তোমরা বাপ হয়ে?"...অভিমানটা গিয়া পড়ে স্বামীর উপরও, —"ঠাট্টা করে নদীর তীরে কুঁড়ে বেঁধে দেবে বলেছিলে, তাই দাও ; এত অনাদর যার বাপ-মায়ের কাছেই, তার প্রাণে সব সইবে।" আঁচল তুলিয়া অশ্রুমোচন করেন গিরিবালা।

আবার বিকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে সংসার ধীরে ধীরে জাগিয়া ওঠে ; এই অবরোধের মধ্যেই যে মাধুর্য আছে, অবগুণ্ঠনকে বেড়িয়া যে মায়া আছে তাদের আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া যাইতে হয়। এক একদিন চণ্ডীচরণ 'সীতার বনবাস' আনিয়া বসে। গিরিবালা বলেন—"দাঁড়াও ঠাকুরপো, মেজঠাকুরঝিকে তুলে নিয়ে আসি, বই শুনতে বড্ড ভালোবাসে গো। একটু দাঁড়াও, লক্ষ্মীটি।"

পাঠ চলিতে থাকে, দুইজনে বসিয়া নিস্পন্দ অভিনিবেশে শোনেন। না-বোঝার নিশ্চিন্ততায় গিরিবালার মনে জাগিয়া ওঠে সাঁতরার ছবি—কর্মব্যস্ততার মধ্যে একটু অবসর লইয়া বাড়িটা শান্ত হইয়া গেছে, তিনি দেয়ালে পিঠ দিয়া, পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, চণ্ডীচরণ পড়িয়া যাইতেছে। মনোমোহিনী দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন কী একটা কাজে। বলিতেছেন—"ভাজকে কী পড়ে শোনান হচ্ছে চণ্ডীবাবুর—নাটক-নবেল নয় তো?—বাবা বড্ড চটা।" চণ্ডীচরণ বলিতেছেন—"হুঁ ; 'সীতার বনবাস' নাটক-নবেল হল!"..."সীতার বনবাসই বা কেন? কিলো, রামচন্দ্র আর দেওর লক্ষ্মণকে নিয়ে বনে যাওয়ার সাধ হয়েছে নাকি?"...মনোমোহিনী দেবীর স্মৃতিটা বড় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। কাহারও সঙ্গে বেশি বনিত না, অথচ গিরিবালাকে অত ভালোবাসিতেন কেন? আসিবার সময় প্রণাম করিয়া উঠিতে বুকে জড়াইয়া বলিলেন—"তোকে কি আর মিষ্টি কথা বলে বিদায় দিতে ইচ্ছে করে? বাবাকে পর্যন্ত আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলি, তবুও একদিনের তরে তোকে একটা কড়া কথা বলে মনের রাগ মেটাতে পারি নি।"

BanglaBook.org

গিরিবালা হঠাৎ চোখে আঁচল দেন। মোতিবালা একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"ওকি বৌদি, কাঁদছ নাকি?"

গিরিবালা বলিলেন—"না, কাঁদব কেন?...তবে এইখানটা শুনলে বড্ড কষ্ট হয় না সীতার জন্যে? শোন না, ঠাকুরপো আবার পড়ছেন।"

বৈকালে যখন নিস্তারিণীদেবী বধূ আর মেয়েদের চুল বাঁধিতে বসেন, পাশের ব্রাহ্মণপাড়া থেকে মেয়েরা এবং কখনও কখনও দুই একজন বর্ষীয়সীও আসে। কেহ যদি না-ই আসে, দুলারমনের উপস্থিতি তো একরকম বাঁধা। ওর কোলে থাকে ওর ছোট ভাই। ফুটফুটে ছেলেটি, কোমরে একটা ঘুনসি, গলার মাঝে মাঝে সাদা জরি জড়ান একটা কালো সূতার মালা—এদেশের ভাষায় বলে 'বদ্ধি'। ডান বাহুতে কালো কিসের বিচি একটা সূতা দিয়া বাঁধা। সমস্ত মাথায় কটা রংয়ের চুলের সঙ্গে তেঁতুলের মতো অনেকগুলি জটা। সেইগুলি দুলাইয়া দুলাইয়া ভাইটি সমস্ত উঠানটায়, ঘরের দাওয়ায় খেলা করিয়া ফিরিতে থাকে, আর দুলারমন ওঁদের চুলবাঁধার সামনে বসিয়া গল্প করিতে থাকে। যেমন হাসি-খুশিতে ভরা তেমনি জীবন সম্বন্ধে এই মেয়েটির কৌতূহল অন্য সবাইয়ের চেয়ে ঢের বেশি। বাঙালীদের বাড়িতে জীবনের যে একটা মুক্ত রূপ দেখিতে পায়, একটা বৈচিত্র্যের সন্ধান পায়, তাহা তাহাকে আকৃষ্ট করে। পাণ্ডুলকে যতই না কেন ভালোবাসুক, পাণ্ডুল সম্বন্ধে মুখে যাই বলুক, তবু পাণ্ডুলের বাইরে যে একটা বড় জগৎ আছে এটা বোধ হয় এই মেয়েটির মতো করিয়া এখানে আর কেহ বোঝে না বা বিশ্বাস করিতে চায় না। এরা বেশ বুদ্ধিমান জাতই, কিন্তু এই মেয়েটির বুদ্ধির বিশেষত্ব এই যে সেটা শুধু অন্তর্মুখী নয় ; জানায়, পাওয়ায়, বোঝায় সেটা বাহিরের দিকে একটা প্রসার চায়।

বেশ ভালো লাগে বাঙালীদের খোঁপা বাঁধিবার ভঙ্গিটি। একরকম বলিতে গেলে রোজই দেখে, কিন্তু তবুও দেখায় শ্রান্তি আসে না। হাতের কাছে পাইলে ত্রিনয়নীকে লইয়া পরীক্ষা করিতে থাকে, অবশ্য ত্রিনয়নীর যেদিন ফুরসত থাকে। বিরাজ, মোতিবালা বলেন—"আয় না দুলারমন, তোরও খোঁপা এই রকম করে বেঁধে দিই।" দুলারমন একটু লুব্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলে—"হুঁ, কিয়্যাক্ ন?—আর বাঙালীন্ বৈন ক দাদিঠাম্ ঝাড়ু খাও গ!" (হ্যাঁ, তা বৈ কি : আর বাঙালী হয়ে ঠাকুরমার কাছে ঝাঁটা খাইগে)

সকলের সঙ্গে নিজেও হাসিতে থাকে।

নিস্তারিণী দেবীও যোগ দেন, বলেন—"ওর ঠাকুমা বেঁচে থাকতে হবার জো আছে? ওর বাপ-মায়েরা তো ভালোই ; মেয়ের ইংরেজী-পড়া ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে—পাণ্ডুলে এখনও কোন বাপ যা করে নি। ওর ঠাকুমাই যে..."

বিরাজমোহিনী কপট বিরক্তিতে মুখঝামটা দিয়া উঠেন—"মরুক না ওর ঠাকুরমা-বুড়ী বাপু, কে বেঁচে থাকতে বলছে, বেচারীর খোঁপা বাঁধা বন্ধ করে?"

আবার সকলে হাসিয়া উঠে। দুলারমনও যোগদান করিয়া বাঁচে, বিবাহের কথায় সে একটু লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছিল। হাসিতে হাসিতে বলে—"যাইছি ন রুঢ়িয়াকে কহে, লাঠি লকঁ দৌগৎ।" (যাচ্ছি বুড়ীকে বলে দিতে, লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসবে'খন।)

একটু সুবিধা পাইলেই বাংলার গল্প শোনে, যাঁর কাছেই সুবিধা হয়। আজকাল গল্পগোষ্ঠী রচনা হয় গিরিবালা আর মোতিবালাকে লইয়া বেশির ভাগ। গিরিবালা একেবারে

BanglaBook.org

নূতন আসিয়াছেন বলিয়া ওঁর গল্প সব টাটকা। বাংলা ভিন্ন ওঁর গতি নাই, দুলারমন তাহাই হাঁ করিয়া শুনিয়া যায়।—কেমন দেশ ওঁদের, সাঁতরা কেমন, আসিবার পথ কেমন...

মোতিবালা যদি এক একবার মৈথিলীতে বুঝাইয়া দিতে যান তো দুলারমন ফোঁস করিয়া ওঠে—"হে, থমু হে মোতি, দুল্‌রিও কিছ্ কিছ্ বাংলা বুঝৈইছেই ; ইঃ, উয়্যা একটা কাবিল্ ভেলি হ্যা।" (থামো গো মোতি, দুলারিয়াও কিছু কিছু বাংলা বোঝে ; ইস্, উনিই এক বিজ্ঞ হয়েছেন!)

—অর্থাৎ অক্ষরে অক্ষরে না বুঝুক, গল্পের স্রোতে ব্যাঘাত চায় না। গিরিবালাকে প্রশ্ন করে—"আর তুমি কোলকাত্তা দেখাইছিস্ গো বৌদি?"

সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া মোতিবালার পানে চাহিয়া বলে—"দেখু, হম্‌হু বাংলা কম্ ন জনৈছি।" (দেখো, আমিও বাংলা কম জানি না।)

সঙ্গে সঙ্গেই তিন জনে হাসিয়া উঠেন। এমন নিষ্ঠাবতী শ্রোত্রী পাইয়া গিরিবালা আর প্রাণ ধরিয়া সত্য কথাটা বলিতে পারেন না, বলেন—দেখিয়াছেন বৈকি, কলিকাতা আর দেখেন নাই?

জেঠামশাই, বাবা প্রভৃতির কাছে শোনা বর্ণনাটা কাজে লাগান—সেখানে গড়ের মাঠ আছে, আজব ঘর আছে, আর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি, পাথর দিয়া বাঁধান রাস্তা, জলের কল আছে, তাহাতে লোহার নলে করিয়া আপনি জল আসিয়া বাড়িতে পৌঁছিয়া যায়...

মোতিবালা বলেন—"কেন দেশের কথা আর কলকাতার কথা এত জিগ্যেস করছে জান বৌদি? ওর বর বলছে কলকাতায় পালিয়ে ইংরেজী পড়বে..."

দুলারমন রাগের ভান করিয়া বলে—"হেঁ হে, ডিগ্‌ডিগিয়া দ'ক কহে গেল হ্যাঁ। আঁহা শুনে গেলি।" (হ্যাঁ গো, ঢেঁটরা পিটিয়ে বলতে গেছে, তুমি শুনেছ।)

মোতিবালা একটু বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিয়া বলেন—"ঢেঁটরা দেবে কেন? যার কাছে বলেছে তার কাছেই শুনেছি।"

দুলারমন আরও রাগে, বলে—"ইঃ, গাল যে করৈৎছতি মোতি!" (ইস্ কি গালগল্পটাই যে করতে পারে মোতি।')

তাহার পর এদিকে যে ভিতরে ভিতরে হাসিটা জমিতে থাকে সেটাকে অন্য ছুতায় প্রকাশ করিবার জন্যই ঘাড়টা একটু দুলাইয়া গিরিবালাকে বলিয়া উঠে—"তুমি তোমার গোল্লো বোলো গে বৌদিদি।"

মুখটা হঠাৎ গম্ভীর করিয়া লইয়া বলে—"আব হম্‌হু বংলেমে বাজব, —এবার হামি বাংলাতেই কোথা বোলবো।"

আবার গাম্ভীর্য ছিন্ন করিয়া হাসি উঠে।

সন্ধ্যার পর বেশ কাজ থাকে খানিকটা, বিশেষ করিয়া মধুসূদন যদি বাসায় থাকেন। তিনি থাকিলে কুলদীপ সহায় প্রভৃতি অফিসের উচ্চস্তরের কয়েকজন আমলা ও ব্রাহ্মণপাড়ার কয়েকজন বন্ধু আসিয়া উপস্থিত হন। বাড়ির সামনেই প্রাঙ্গণটিতে চাকরেরা দুই তিনখানা চৌকি বিছাইয়া জায়গা করিয়া দেয়। মজলিস বসে ; কুঠির বড়সাহেব ঠাট্টা করিয়া নাম দিয়াছে— 'পাণ্ডেলৈ পার্লামেন্ট'। চারিদিককার দৈনন্দিন খবর এইখানেই আসিয়া জড়ো হয়,—সামাজিক, রাজনৈতিক, সব রকম। ধর্মসংক্রান্ত আলোচনাও হয় ;

BanglaBook.org

পাণ্ডুল পণ্ডিতের জায়গা। ধর্ম ভিন্ন সাহিত্য-চর্চাও হয়, একদিকে কালিদাস থেকে জয়দেব, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস পর্যন্ত আর একদিকে পার্সি কবি হাফিজ, গালিব, ফিরদৌসী। কায়স্থরা এদেশে তখন একান্তই উর্দু ফার্সিবিৎ, মৈথিলীদের মধ্যেও মুসলমান যুগের অভ্যাসটা কিছু কিছু লাগিয়া আছে।

এই মজলিসের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করিতে হয় বাড়িতে, আর এটা আছে নিস্তারিণী দেবীর নিজের হাতে ; খাওয়ানর আনন্দটা তাঁহার বংশগত বলিয়াই উনি আর ওখানে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেন না। লুচি, হালুয়া, কোন একটা লবণহীন তরকারি, এই সাধারণ ব্যবস্থা ; লোক একটু অল্প থাকিলে সময় পাইয়া অসাধারণও কিছু একটা যুক্ত হইয়া যায়—পায়স হোক, মালপো হোক, এদেশের খাবার 'পেরাকি' হোক। আমের সময় আম থাকে। ঘণ্টা দুই ধরিয়া নিস্তারিণী দেবী এই লইয়া ব্যাপৃত থাকেন, সঙ্গে থাকে মেয়েরা ; বিরাজমোহিনীর অনুপস্থিতিতে মোতিবালা একাই।

গিরিবালা আসিয়া এইখানটিতে নিজের জায়গা করিয়া লইলেন ; প্রকৃত কাজ পাইয়া যেন বাঁচিলেন। ওঁদেরও শাশুড়ী-বধূ-ননদে এই সময়ে একটু মজলিস বসে—ওদিকে খাইয়েদের মজলিস, এদিকে জোগাড়েদের মজলিস। এঁরা বেলেন অথবা তরকারি কোটেন, ওদিকে রান্নার মাঝে মাঝে বিরাম দিয়া নিস্তারিণী দেবী গল্প করিয়া যান, নববধূকে উপদেশ দেন, প্রয়োজন মতো দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যেই কোনটা লইয়া আলোচনা করেন। নিস্তারিণী দেবী স্বভাবত একটু গম্ভীর প্রকৃতির এবং অল্পভাষিণী, কিন্তু এই সেবার কাজটি নাকি ওঁর বড়ই অন্তরের, তাই এই সময়টা উনি একটু গল্প-প্রবণ হইয়া ওঠেন।

একদিন বলিলেন—"বৌমার পাণ্ডুল কেমন লাগছে গো?"

"লাগছে তো মন্দ নয় মা, তবে আসতেই বড্ড কষ্ট ; চলেছি তো চলেইছি।"

"এখন তো ভালো হয়েছে গো, আমি যখন আসি, শুধু গঙ্গার ওপার পর্যন্তই রেল হয়েছে। নৌকোয়-পার হয়ে গোরুর গাড়িতে এই পঞ্চাশ-ষাট কোশ পথ, ভাবলে এখনও গা শিউরে ওঠে। পাণ্ডুলই কি এমন ছিল? চারিদিকে জঙ্গল, একটা মানুষের মুখ দেখবার জো নেই, কাছে পিঠে বাঘ এসেছে বলেও গুজব উঠতো মাঝে মাঝে, তার তুলনায় এখন তো সগ্‌গ!"

বিরাজমোহিনী লুচি বেলিতে বেলিতে মুখ তুলিয়া মৃদু মৃদু হাসিয়া টিপ্পনী করিলেন —"কি সগ্‌গেই টেনে তুলেছে বৌকে!"

নিস্তারিণী দেবী ভাজা লুচি সাজায় তুলিতে তুলিতে বলিলেন—"তুই এখন শহরে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস—আজ দুমকা, কাল ভাগলপুর, পরশু গোড্ডা, তুই তো নাক সিঁটকোবিই ; আমার সগ্‌গই পাণ্ডুল—এখন যা হয়েছে। কেন, মন্দই বা কি? কী গো বৌমা?"

"বেশ-ই তো মা।"

ননদ-ভাজে মৃদুহাস্যের সহিত একটু আড়ে দৃষ্টিবিনিময় হইয়া যায়।

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"আরও খারাপ ছিল, তোমার শ্বশুর যখন প্রথম আসেন। তখন আবার রেলের নামগন্ধ নেই, রাস্তা পাতা হবে তার জন্যে মোটে গাছ কেটে বাঁধ বাঁধা হচ্ছে..."

বিরাজমোহিনী হঠাৎ বেলন থামাইয়া বলিলেন,—"মা, বৌদিকে সেই গল্পটা বল না।"

BanglaBook.org

"কোন্‌টে।"—বলিয়া মেয়ের মুখের পনে চাহিয়াই নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"যাঃ তোদেরও যেমন, সে-গল্প নাকি আবার শোনে?"

॥ ৫ ॥

বিরাজমোহিনী দেবী ধরিয়া বসিলেন, মোতিবালাও যোগ দিলেন, নিস্তারিণী দেবীরও বিশেষ অনিচ্ছা ছিল না ; একটু মৌখিক আপত্তি করিলেন, তাহার পর কড়ায় খানিকটা কাঁচা ঘি ঢালিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—"উনি বাড়ি ছেড়ে যখন বেরোন তখন বয়েস মাত্র সতেরো বছর। তাই মাঝে মাঝে বিপিন কৈলেসকে বলেন না?—'এখনকার বাঙালী, তোরা বাবু হয়ে গেছিস ; আমরা সেকালে যা করে মানুষ হয়েছি তোরা ভাবতেও পারিস না।'"

"সতের বছর বয়েসে একদিন বাড়িতে কাউকে না বলে না ক'য়ে উনি চাকরির জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওপারে তো তেমন বিশেষ হ্যাঙ্গামা ছিল না, গোরুর গাড়ির ডাক ছিল, পয়সা দিয়ে দিয়ে যতদূর ইচ্ছে চলে যাও। উনি তো মীরাটেই যাচ্ছিলেন—বরাবর গ্যান্‌ট্যাঙ্ক রোড ধরে..."

বিরাজমোহিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া টিপ্পনী করিলেন—"মা গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড বলতে পারেন না।"

নিস্তারিণী দেবী রাগের ভান করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ছল ধরিস তো থাক্‌ গপ্প বাপু। মা সেকেলে মানুষ, পারে না ; তোমরা এখন নাটক-নবেল পড়তে শিখেছ..."

মোতিবালা বলিলেন—"আঃ, দিদি!...বলো মা!"

নিস্তারিণী দেবী বলিতে লাগিলেন—"যাচ্ছিলেন মীরাটেই ফৌজের আফিসে চাকরির আশা পেয়ে, পথে একটি বাঙালীর সঙ্গে পরিচয় হল ; তিনি বললেন—তিরহুতে নীলকুঠিতে তাঁর এক আত্মীয় কাজ করেন, যদি উনি চাকরি করতে চান্‌ তো চিঠি দিতে পারেন। মীরাট অনেক দূর, উনি রাজী হয়ে গেলেন। সেই মানুষটির সঙ্গে তার বাড়ি মুঙ্গেরে এলেন, তারপর সেইখানেই একটা দিন কাটিয়ে তাঁর চিঠি নিয়ে গঙ্গা পার হলেন।

"ওদিকে দিল্লী পর্যন্ত টানা রাস্তা, লোকচলাচল বেশি, কষ্ট হয় নি। এপারে এসে একবারে আলাদা ব্যাপার ;—মাঠ, কাঁচা রাস্তা, কোন্‌টে কোথায় গেছে জানা নেই, এক রাস্তাতেই বোধ হয় দুবার তিনবার করে ঘুরে হাক্লান্ত হয়ে সন্ধ্যের খানিকটা আগে একটা গ্রামের বাইরে এসে পড়লেন। একটা ইঁদারা ছিল, তার চাতালে বসে আছেন, দেখেন একটি আধ-বুড়ো গোছের লোক মাঠ থেকে গাঁয়ের মধ্যে আসছে। ব্রাহ্মণ দেখে রাত্তিরটার জন্যে একটু জায়গার কথা বলবেন বলবেন করছেন, একটি অচেনা দিব্যি ফুটফুটে ছেলেকে অমনভাবে বসে থাকতে দেখে সে নিজেই এগিয়ে এল। একটু ঠাউরে দেখে জিগ্যেস করলে—'কোথায় যাবে?' ভাষা তো বোঝেন না, আন্দাজে ধরে নিয়ে বললেন—'পাণ্ডুল।' পাণ্ডুল শুনে লোকটা মুখের পানে একটু স্থির হয়ে চেয়ে থেকে জিগ্যেস করলে—'মধুবাণী-পাণ্ডুল?'...অতশত জানতেন না, মেলা কথা কইবার ভয়ে বলেন...'হুঁ'। লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করে কী ভাবলে, জিগ্যেস করলে—'ওখানেই বাড়ি?' বলে ফেললেন—'হুঁ।...মৈথিল ব্রাহ্মণ?'

BanglaBook.org

ও নিজের ভাষাতেই 'ছি-ছা' করে জিগ্যেস করে যাচ্ছে, উনি মানেটা আন্দাজে ধরে ধরে উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। দুর্বুদ্ধি,—এতেও ব'লে বসলেন...'হুঁ', ভাবলেন তাহ'লে রাত্তিরে থাকার ব্যবস্থাটা সহজে হয়ে যাবে। বলেই কিন্তু খেয়াল হল মৈথিলী ব্রাহ্মণ তো বলে বসলেন, কিন্তু ওদের ভাষা তো জানেন না। ভুলটা কী করে শুধরে নেবেন ভাবছেন, লোকটা জিগ্যেস করলে—'কোথা থেকে আসা হচ্ছে—নবদ্বীপ থেকে'?"

বিরাজমোহিনী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালার পানে চাহিয়া বলিলেন —"সামলাবেন কি, বাবা এতেও 'হুঁ-ই বলে বসলেন। কি অলুক্ষণে 'হুঁ-তে যে পেয়েছিল বাবাকে সেদিন!"

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"উনি ভাবলেন, সুবিধেই হল, এবার টের পেয়ে যাবে বাঙালী, ভাষা জানেন না ব'লে ভুলে মৈথিল বলে ফেলেছে। ও যে অন্য রাস্তা ধরেছে কী করে জানবেন?...জিগ্যেস করলে —'ন্যায় পড়তে গিয়েছিলে?'

টুপ করিয়া ঠিক তালের মাথায় 'হুঁ' বলিয়া বিরাজমোহিনী আবার এমন ভাবে হাসিয়া উঠিলেন যে লুচিটা বাঁকিয়া গেল। ইহারা তিনজনেও পূর্বাপেক্ষা অধিক জোরে হাসিয়া উঠিলেন। সবার থাকিয়া থাকিয়া হাসির মধ্যেই নিস্তারিণী বলিয়া চলিলেন—"তারপর এমন অবস্থা হল, যা জিগ্যেস করে তাইতেই 'হুঁ'।...'নাম কি?' নাম বললেন—'অমুক'।...'অমুক ঝা'...'হুঁ'...'বাপের নাম কি?'...'অমুক...অমুক ঝা?'...'হুঁ'।...

বর্ধিত হাসির মধ্যে বলিলেন—"একবার ওঁর কাছে শুনো না, হাসতে হাসতে নাড়ি ছিঁড়ে যাবে। বলেন—'হেঁচকি উঠলে যেমন সামলান যায় না, তেমনি যা জিগ্যেস করছে তাইতেই টানা 'হুঁ—হুঁ' করে যাচ্ছি, আর কিছু বেরুচ্ছেই না যেন।'...লোককে ভূতে পায়, ওঁকে সেদিন 'হুঁ'-তে পেয়ে..."

একচোট হাসিয়া লইয়া নিস্তারিণী ধীরে ধীরে আবার শান্ত হইলেন, বলিলেন,—"বাবাঃ, এমন গেরোতেও পড়ে মানুষ! যাই হোক ; লোকটা তো ওকে নিজের বাড়িতে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। তারপর সেখানে আদরের ধুম! উনি বলেন সে আর এক বিপদ। তার পরদিন সকলে তো বেরুতে দিলে না, ভাবগতিকে বোধ হল যেন আরও ক'দিন আটকে রাখতে চায়। উনি তো বিষম দুর্ভাবনায় পড়লেন। ভাষা না জানার ব্যাপারটা তো সামলে নিলেন, বললেন—একেবারে ছেলেবেলা নবদ্বীপে গিয়েছিলেন কাকার সঙ্গে, তাই নিজের ভাষা মৈথিলীটা জানে না মোটেই। কাকা মারা যেতেই চলে এসেছেন। এদের সঙ্গে সংস্কৃততেই কথাবার্তা চালাতে লাগলেন, বড় ভাইয়ের কাছে সংস্কৃতটা খুব ভালো করেই পড়া ছিল। অবস্থা-গতিকে পাকা মিথ্যেবাদী হয়ে যেতে হল আর কি...ওদের বাড়িটাতে কিন্তু তেমন পণ্ডিত কেউ ছিল না ; একটা সুবিধে হল সংস্কৃত ছাড়া বলে না দেখে কেউ কথাবার্তা বেশি কইতে চায় না, শুধু আগলে আগলে থাকে, আর যত্নের তো হিসেবই নেই। যাওয়ার নাম করতেই কিন্তু কেমন কেমন ভাব—'হ্যাঁ করছি ব্যবস্থা, রাস্তা বড্ড খারাপ, একটা গাড়ি আর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে কতকগুলো লোক যোগাড় করছি।'...সমস্ত দিনটা তো কেটে গেল এই করে। সন্ধ্যে যত ঘনিয়ে আসতে লাগল, ভয়ে দুশ্চিন্তায় উনি যেন কেমন হয়ে যেতে লাগলেন। একটা দিন তো এরা দিলেই আটকে, মতলবখানা কি? সমস্তদিন বাড়ি ছেড়ে বেরুতে দেয় নি, একটু যে লুকিয়ে খোঁজ নেবেন কী রকম লোক সে উপায় রাখে নি। দেশে এরকম অনেক ডাকাতের

BanglaBook.org

গল্প শুনেছেন, সে-ধরনেরই নাকি। তাহলে ওঁর কাছে কী নেবে? আর সেরকম হোত তো প্রথম রাত্তিরেই কেন ছেড়ে দিলে? আজ তো নিশ্চয় একটু বেশি জানাজানি হয়ে গেল তাঁর আসার কথাটা?...একবার ভাবছেন ডাকাতের গাঁ-ই নয় তো?—অনেক সময় আবার লোক আটকে তাদের বাড়ি থেকে টাকা আদায় করে, এরকমও শোনা গেছে। না জানেন ভাষা, না চেনেন দেশ, তার ওপর কতকগুলো মিছে কথা বলে এক কাণ্ড করে বসে আছেন—যেন অকূল পাথারে পড়লেন। উনি বলেন,—"বার-বাড়িতে আমাদের বড় ঘরটার চেয়ে একটু বড় দালান, তার পাশেই একটা খুবরি, তাইতে শুতে দিলে ওঁকে রাত্তিরে। সমস্তটা মাটির দেয়াল, তবে দালান আর ঘরের মাঝখানে যে দেয়ালটা সেটা ছ্যাঁচা বেড়ার। খেয়ে দেয়ে তো শুলেন, কিন্তু ঘুম কি আর হয়? খানিকটা যখন রাত হয়েছে, একবার বাইরে বেরুবেন, দেখনে দোরের সামনেই একটা লোক দোর আগলে খাটুলি পেতে শুয়ে আছে। ওঁর দোর খোলবার আওয়াজ হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।—'কী পণ্ডিতজি?' বললেন—'এই একটু বাইরে যেতে হবে।'...'ওরে বাপরে! কখনও একেলা বাইরে যাবেন না এখানে, ভয়ঙ্কর গোখরো সাপের ভয়। বেশি দূরে যাবেন না ; চলুন, আমি লাঠি নিয়ে দাঁড়াই'।"

"পাহারার গতিক দেখে এঁর আরও আক্কেল গুরুম হয়ে গেল। বলেন—'তখন প্রাণের আসা ছেড়ে দিয়েছি একেবারে, কিন্তু বুদ্ধিটা লোপ পায় নি। ঘরে যখন আবার ঢুকলাম, দোরটা আর দিলাম না। দিলাম না বটে, কিন্তু হুড়কা যেন লাগাচ্ছি এইভাবে বেশ জানিয়ে একটা শব্দ করলাম। তারপর ভেজান দোরটা যাতে না খুলে যায় সেইজন্যে খুব আস্তে আস্তে আমার খাটের একটা পায়ার নিচে থেকে ইটটা বের করে নিয়ে নিঃসাড়ে দোরের গায়ে লাগিয়ে দিলাম। খাটেও যেন শুলাম এইভাবে একটা ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ করলাম, তারপরে নিচে বসে সে যে কী ভাবে কাটাতে লাগলাম তা এক ভগবানই জানেন। কী ব্যাপার? কেন এমন ভাবে আগলাচ্ছে? পুঁজি তখন পনেরোটি টাকায় এসে ঠেকেছে ; একবার মনে হচ্ছে সেটা এই ঘরের মধ্যে কোনখানে পুঁতে টুতে রাখি, টাকার জন্যেই তো ভয়? একবার ভাবছি ডেকে দিয়েই দি টাকাটা, ওদের কাড়তে আসবার আগেই। অনেকক্ষণ এদিক-ওদিক করে, একটা মতলব খুব লাগসই মনে হল, ঠিক করলাম দোরের কাছে যে লোকটা শুয়েছে তাকেই ঘুষ দিয়ে বেরিয়ে যাব। লোকটাকে দিনে কয়েকবার দেখেছি, বাড়ির লোক নয়, এদের চাকর বা মুনিষ বলে বোধ হল। গরীব মানুষ, পনেরোটা টাকা পেলে পথ ছেড়ে দিতে পারে। না দেয়, যা হবার ঐ ভাবেই হোক, আর উপায়ও নেই তো।'

"হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না করতে করতে অনেকটা রাত হয়ে গেল। উনি বলেন— 'রাত যখন আন্দাজ বারোটা কি একটা, ঘুষ খাওয়ানই ঠিক করে উনি মনে মনে দুর্গা-শ্রীহরি বলে আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন। দোরের ইটটি আস্তে আস্তে তুলেছেন কি, পাশের দালানে হঠাৎ একটা ফিসফিসিনি আওয়াজ উঠল। উনি বলেন শুনেই বুকটা এমন ধড়াস করে উঠল যে, ইটটা যে পড়ে যায় নি সে-ই আশ্চয্যি। খুব আস্তে আস্তে ইটটা আবার ঠেকিয়ে রেখে পা টিপে টিপে এসে উনি ছ্যাঁচা বেড়ার মধ্যে দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। মিটমিটে একটা ডিবে জ্বলছিল, দেখলেন জনতিনেক লোকে কী পরামর্শ করছে। বুড়োকে আর একটা লোককে চিনলেন ; একজন একেবারে নতুন, একমুখ দাড়ি। উনি বেড়ায়

কান পেতে দাঁড়ালেন। একে ভাষা জানেন না তায় ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা কইছে, প্রথমটা তো কিছুই বুঝতে পারলেন না। তারপর খুব মন দিয়ে অনেকক্ষণ কান পেতে থেকে কতকগুলো ভাঙা ভাঙা কথা ধরতে পারলেন— 'এই ঘরমে...ষোল সতরো বয়স... ব্রাহ্মণ... পাণ্ডুল...নবদ্বীপ...সন্দেহ ছিলই না, পাকা হয়ে গেল যে ওঁকে নিয়ে যেন কী পরামর্শ হচ্ছে, শরীর তো ওঁর একেবারে ঝিমিয়ে এলো। তারপর একটা কথা ওঁর কানে গেল ; দাঁড়িয়ে শুনছিলেন, শরীর একেবারে আলগা হয়ে বসে পড়লেন—কে একজন কী কথার উপর বলে উঠল—'কালী মাইকে কৃপা।'

"উনি বলেন—'আমি সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা কী : মুঙ্গেরের সেই ভদ্রলোকটি বলে দিয়েছিলেন—তিরহুতের ব্রাহ্মণেরা বাঙালীর মতোই তান্ত্রিক, মাছ মাংস খায়, কোন কষ্ট হবে না। তান্ত্রিকেরা তো সুবিধে পেলে মা-কালীর সামনে নরবলিও দেয় শোনা গেছে, আমার আর সন্দেহ রইল না যে এরা তারই ব্যবস্থা করছে। আমার যে তখন কী অবস্থা বলতে পারি না, ভয়ে গলা কাঠ হয়ে এসেছে, নৈলে ইচ্ছে করছে ডাক ছেড়ে একবার কেঁদে উঠি, পাড়ার লোক জড়ো করি।'

"ফিসফিসিনিটা আরও একটু চলল, তারপর সবাই উঠে যেন বাইরে গেল। একটু পরে দুজন আবার যেন ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। উনি প্রাণটি হাতে করে চুপটি করে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছেন,—এই বুঝি ফিরে এল, এই বুঝি ঠেললে দোর। এই করে যখন প্রায় ঘণ্টা তিনেক কেটে গেল, নাক ডাকার আওয়াজ শুনতে পেলেন। প্রথমটা মনে হল, দালানের লোকেদের আওয়াজ বুঝি, তারপর একটু ঠাওর করে টের পেলেন —না, দোরের কাছের লোকটারই। উনি বললেন—'তখন আর আমার ভাববার সময় নেই।' একবার শুধু কান পেতে বুঝে নিলেন—এরা ঘুমুচ্ছে কি না ; শুনতে পেলেন এদেরও বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। আর দেরি করলেন না ; উঠে গামছায় জড়ান কাপড়ের পুঁটলিটা নিয়ে, ইট সরিয়ে খুব আস্তে আস্তে দোরটা খুলে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার, কোন্‌দিকে যাবেন কিছুই জানেন না, তবু বেরিয়ে পড়লেন। দু'পা এগোন আবার পেছনে তাকান ; দু'পা এগোন আবার পেছনে তাকান ; এই করে বাড়িটা আড়াল করে ফেললেন, তারপরেই হন্‌ হন্‌ করে পা চালিয়ে দিলেন। কিন্তু কপালে যার..."

গিরিবালা শেষের দিকে লুচিবেলা থামাইয়া একেবারে উৎকণ্ঠিত হইয়া শুনিতেছিলেন, চোখ-মুখ অন্ধকার করিয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন—"দিলে নাকি বলি মা?"

এঁরা তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন, ননদেরা একটু বেশি করিয়াই ; বিরাজমোহিনী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"ঠিক এই না হোক, এই ধরনেরই একটা কথা শুনেছিলাম কোথায়,—জামাই শ্বশুরবাড়ি গিয়ে আর অন্য কোন কথা না পেয়ে শ্বশুরকে জিগ্যেস করছে—'মশায়ের বিবাহ হয়েছে?'...বাবাকে বলি যদি দিতই তো তুমি কোথা থেকে আসতে বৌদি?"

হাসিটা আর একচোট আলোড়িত হইয়া উঠিল, গিরিবালাও লজ্জিতভাবে যোগ দিলেন। নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"ওরকম হয় কখনও কখনও ভয়ের গল্প শুনলে, বিশেষ করে নিজের কেউ যদি থাকে তার মধ্যে।...'কপাল', বলছিলাম এইজন্যে যে

BanglaBook.org

খানিকক্ষণ ঘুরে ঘুরে আবার দেখেন—সেই-ই বাড়ির সামনে। যাই হোক, গুরুবল, কেউ আর উঠলো না।..."

গিরিবালা লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আবার এই রকম বেফাঁস বলিয়া ফেলিবার ভয়ে বলিলেন—"আর থাক মা সপ্পটা, সত্যিই যেন ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে বাপু। খুন-ডাকাতির গপ্প শুনতে..."

বিরাজমোহিনী আবার হাসিয়া উঠিলেন—"দেখো! মা এদিকে বিয়ের গপ্প বলছেন, বৌদির কানে খুন ডাকাতির..."

আবার বেলন থামাইয়া গিরিবালা "অ্যাঃ!" করিয়া বিস্মিতভাবে শাশুড়ীর মুখের পানে চাহিলেন। মোতিবালা বেলনটা চালাইতে চালাইতে হাসিতে লাগিলেন। নিস্তারিণী দেবীও হাসিয়াই বলিলেন—"বিয়ের কথাই। সেটা টের পেলেন তার পরদিন প্রায় দুপুরের কাছাকাছি।...গ্রামের বাইরে বেরিয়েই তো ছুটতে আরম্ভ করলেন। তারপর দুপুর পর্যন্ত ঐরকম,—কোন গ্রামের মধ্যে ঢুকলেই পা থামিয়ে দেন, তারপর বেরিয়েই আবার ছুট! প্রাণের ভয়, সোজা নয় তো? শেষকালে যখন দুপুর হয়ে এল তখন একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন। সহজ তো নয়,—সমস্ত রাত ঘুম নেই, তারপর ঐ ভয়, তারপর ঐ মেহনত। পুঁটুলিটা মাথায় দিয়ে গাছতলায়..."

গিরিবালা উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করিলেন—"খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয় নি?"

বিরাজমোহিনী বেলার হাতটা একটু ত্রস্ত করিয়া দিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"লুচিবেলাই শেষ হয় নি তো..."

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"কেন শুধু শুধু ওঁর সব কথায়..."

বিরাজমোহিনী বলিলেন—"আচ্ছা, বলবো না মা? বাবার কি তখন খাবার দিকে মন আছে না ফুরসত আছে? বৌদিদির যেমন..."

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়াই বলিলেন,..."নিজের লোকের কষ্ট দেখলে হয় ওরকম মনে। ...পুঁটুলিটা মাথায় দিয়ে একটা গাছতলায় শুতে যাবেন, একটা ছই-দেওয়া গরুর গাড়ি যাচ্ছিল, ভেতরের লোকটা জিগ্যেস করলে—'কোথায় যাবে তুমি বাপু?'

আবার পাণ্ডুলের নাম করে?—উনি অন্য একটা জায়গার নাম করে দিলেন; শিখেছিলেন তো কতকগুলো নাম এর মধ্যে। লোকটা জিগ্যেস করলে—'আসবে এই গাড়িতে? আমিও ঐ পথে যাব।'

"বলে—হ্যাংলা ভাত খাবি, না আঁচাব কোথায়?...উনি আবার যাবেন না! তাড়াতাড়ি পুঁটুলিটা কাঁখে করে তো গিয়ে উঠলেন। উঠেই চক্ষু চড়কগাছ!"

গল্পটা জানা থাকার দরুন—ইঁহারা দুই বোনে অল্প অল্প হাসির সহিত বেলিয়াই চলিলেন, গিরিবালা বেলা থামাইয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন— 'কেন মা!'

নিস্তারিণী দেবী নূতন লুচি ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন—"যাঁদের বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন তাঁদেরই লোক।"

গিরিবালা বেলনাটা একেবারে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"ওরে বাবা! তারপর?"

"গুরুবল এই যে ও লোকটা ওঁকে দেখে নি, উনি ছ্যাঁচাবেড়ার মধ্যে দিয়ে ওঁকে দেখেছিলেন; একমুখ দাড়ি, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, এদেশে পণ্ডিতেরা যেমন পরে। প্রথম ভয়ের ভাবটা কেটে গেলে উনি বুঝতে পারলেন—ও চিনতে পারে নি। পরে

BanglaBook.org

অবিশ্যি কথাবার্তায় বুঝলেন—চিনতে পারবার কথা নয় ওর। কথাবার্তা গোড়া থেকেই সংস্কৃতে হল। উনি পাণ্ডুলের নামটা বাদ দিয়ে এবার আসল পরিচয়ই দিলেন, বাঙালী, এদিকে আত্মীয় আছেন, তারই ওখানে যাচ্ছেন। বেশ ভাব করবার ক্ষমতা বরাবরই ছিল, খুব জমিয়ে নিলেন। তারপর ওর পরিচয় জিগ্যেস করলেন।

বললে—'আমি হচ্ছি পুরুতব্রাহ্মণ, মুঙ্গের জেলায় অনেক্‌গুলি যজমান ছাড়া, তাদেরই একটির মেয়ের জন্যে বিয়ের সম্বন্ধ দেখতে যাচ্ছি।'

ওঁর কি রকম মনে হল, জিগ্যেস করলেন—'ছেলে?'

'একটি বেশ ভালো ছেলে পাওয়া গেছে।'

'পাওয়া গেছে মানে?'

পণ্ডিত একটু হেসে বললে—'সে একটু গোপনীয় কথা। তা আপনি বিদেশী, আপনার কাছে আর গোপনীয় কি?—ছেলেটি মধুবাণী-পাণ্ডুলের খুব বড় এক পণ্ডিতবংশের ছেলে। নবদ্বীপে পড়া শেষ করে ফিরছিল, তাকে আটকে ফেলা হয়েছে।'

যদিও পালিয়ে এসেছেন তবুও কথাটা শুনে ওঁর কাল-ঘাম ছুটে গেল। কী বিপদেই পড়েছিলেন ভেবে গলা শুকিয়ে এল। জিগ্যেস করলেন—'জোর করে বিয়ে দিত?'

পণ্ডিত বললে—'ঠিক যে বলব জোর করে তা নয়, লোভ দেখিয়ে। গঙ্গার ধারে ধারে যে জায়গাগুলো দেখছেন সেখানে ছোট ছোট জমিদার গোছের অনেক ব্রাহ্মণ আছে মৈথিলীই, কিন্তু ওদিককার ব্রাহ্মণদের তুলনায় ছোট, তা ভিন্ন বিদ্যার চর্চাটাও ওদিককার ব্রাহ্মণদের তুলনায় ঢের কম। এরা বেশির ভাগ চাষবাস নিয়েই থাকে। এরা যদি এই রকম ছেলে পায় তো আটকে ফেলে বিয়ে দিয়ে দেয়। এই আমার অবস্থাও ঐরকম। আমার বাড়ি নিজ্ মিথিলায় মধুবাণীর কাছে, এদিকে বিয়ে করেছি, অনেক জমিজমা দিয়েছে, টোল করে দিয়েছে, যজমান আছে বিস্তর, বেশ আছি।'

উনি জিগ্যেস করলেন—"ও করবে না আপত্তি?" বললে—'না বাবু, এমন ভুজংভাজং দিয়ে ঠিক করে নেবে,—লোভ মস্ত বড় জিনিস যে। আর ওর বাপ মা তো টের পাবে না। টের পাবে বিয়ে হয়ে গেলে, তখন আর কি করবে? এই আমি যাচ্ছি, ভেতরে ভেতরে সব খোঁজ নোব—কেমন বংশ, ছেলের গোত্র, রাশি, গণ—তারপর ফিরে এসে বলব, বেয়ে হয়ে যাবে।...কেন, তোমাদের দেশে কুলীনদের মধ্যে তো এরকম হয়। আমি ছিলাম কিনা নবদ্বীপে বহুদিন—এই রকম করে ঘরজামাই করে রাখে।'

ওঁর কিরকম ঝোঁক চেপে গেল—জিগ্যেস করলেন—"যদি না মেলে?"

বললেন—'ওঁদের বাড়িতে অনেকগুলি মেয়ে, নিজের, ভাইয়েদের, দৌহিত্রী—একটা না একটার সঙ্গে মিলে যাবেই তো ; মোটের ওপর ও ছেলেকে তো আর পাণ্ডুলে ফিরে আসতে হবে না।'

দুইজনেই খুব হাসতে লাগলেন। উনি বলেন—'হাসছি তো, এদিকে ভয়ও লেগে রয়েছে—কী জানি, ধরবার জন্যে যদি ঘোড়া দৌড় করিয়েই দেয় ওদিকে।'...বিকেল পর্যন্ত একসঙ্গে গিয়ে ওর সঙ্গ ছেড়ে দিলেন।"

গল্প শেষ করিয়া নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"এই কাণ্ড মা, বলেন বিয়ের ভয়ে আর কারুর বাড়িতে উঠিনি সেই থেকে।"

ত্রিনয়নী ঝড়ের মতো না হোক বাতাসের বেগে আসিয়া উপস্থিত হইল, চাকরানীদের

BanglaBook.org

ভাষায় প্রশ্ন করিল—"পুরি ভেলে হে দুলহীন?" (লুচি হল গা গিন্নি?)

নিস্তারিণী দেবী ঘিয়ের কড়াটা নামাইয়া ফেলিয়া বলিলেন "হয়ে এল। ...দাও তো বৌমা, এবার পটলগুলো ভেজে ফেলি। তাই উনি বলেন না মাঝে মাঝে?—একালের ছেলেরা ঘর থেকে এক পা বেরুতেই হেদিয়ে পড়ে তা মানুষ হবে কোথা থেকে? আমার সব...।'

বিপিন আসিলেন, বলিলেন "হল লুচি?—একালের ছেলেদের সম্বন্ধে কী যেন বলছিলে মা?"

নিস্তারিণী দেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"কিছু বলি নি, যাও।...মোহনাকে পাঠিয়ে দাও, পটলভাজা হলেই দিয়ে দিচ্ছি।"

ত্রিনয়নী প্রায় সমস্তটা আওড়াইয়া দিল—তীক্ষ্ণ কান আছে বলিয়াই তো আট বছরে অমন পাকা গিন্নি, দাদার ডান হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া টান দিতে দিতে বলিল—"বলেছেন, খুব করেছেন,আজকাল ছেলেরা ঘর থেকে এক পা বেরুতেই হেদিয়ে পড়ে, তা মানুষ হবে! আমিও বলছি, উঠতে বসতে বলব।"

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালবেলায় বিপিন এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন।

মধুসূদন বাড়ি ছিলেন না। পাণ্ডুলের অধীনে চৌদ্দটা কুঠি, পালকি করিয়া প্রায়ই তদারকে যাইতে হয়, সকালেই বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বিপিন বাহিরের ঘরে নির্জনে বসিয়া নীচের পত্রখানি লিখিলেন—

কল্যাণীয়াসু—

বিরাজ, তোমার হাতে যখন এই পত্র পৌঁছুবে তখন আমি আর পাণ্ডুলে নেই। কোথায় যে আছি তা জানি না, কেননা আমার এই নিরুদ্দেশ যাত্রার যিনি ডাক দিলেন সেই ভগবান ভিন্ন কেহই জানে না কবে কোথায় কী ভাবে থাকব। নিরাপদে থাকব কি না তাই কি জানি? শুধু ভরসা, বাবাকে যিনি সহস্র বিপদের মধ্যে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, তিনি আমাকেও কখনও ভুলবেন না। ভোলেন, তাঁর ইচ্ছা;—বাবাও তো তাঁরই ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে পা বাড়িয়েছিলেন, তাঁর সন্তান, আমি আর কার ভরসা করব?

ভাববে, দাদার হঠাৎ কেন এরকম মতিগতি হল। তোমরা যেটাকে একটু বেঁকিয়ে, কদর্থ করে 'মতিগতি' বলছ, সেটাকে আমি বলব সুমতি। তোমরা এই ভাবছ, এদিকে আমি ভাবছি এতদিন আমার এ সুমতি হয় নি কেন। তার কারণটা তলিয়ে দেখতে গিয়ে আমার মনে হল আমি মায়ায় প'ড়ে গিয়েছিলাম। কিসের মায়া?—বাবার মায়া, মার মায়া, তোমাদের মায়া। মায়াকে তো চেনা যায় না! সে নিতান্ত অলক্ষ্যেই তার মোহ বিস্তার করে। আমাকে একটির পর একটির বাঁধনে কী করে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলেছিল, টেরও পাইনি। কাল হঠাৎ যখন টের পেলাম তখন শিউরে উঠলাম। আজ সে-সব বাঁধন ছিঁড়ে বেদনায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছি, তবুও লুকোব না, সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির একটা আনন্দও আছে।

জিগ্যেস করবে হঠাৎ টের পেলাম কী করে মায়ার এ মোহের কথা? উত্তর—কাল

মার কথায়—রাত্রে লুচি হল কিনা জিগ্যেস করতে যখন ভেতরে যাই, সঙ্গে সঙ্গে আমার ধমনীতে বাবার দেহের রক্ত দোল খেয়ে উঠল, তেমনি কুনো-ছেলেকে নিয়ে মার মনের এই দুঃখের কথা ভাবতে আমার বিবেকে যেন শত বৃশ্চিক একসঙ্গে দংশন করে দিলে। বিরাজ, মাকে এ-চিঠি দেখিও না, তাঁর বোধ হয় কষ্ট হবে। মার দোষ নেই, সব মায়েরাই চায় তার সন্তান স্বামীর সদগুণের অধিকারী হোক। তোমায় বলে বোঝাতে হবে না যে, এই করেই রাজপুতদের বংশের ধারা বজায় থাকত। কিন্তু মা তো রাজপুতের মেয়ে নয়, প্রাণ ধরে মনের কথাটা বলতে পারেন নি। উনি কিন্তু বড় ভুল করেছিলেন—ইচ্ছাটা যে একটা মস্ত বড় শক্তি, এক সময় না এক সময় ঠেলে বেরিয়ে পড়বেই। সব কথা ভেবে দেখতে গেলে মা যদি কিছুদিন আগে মনের এই ইচ্ছাটা প্রকাশ করে বলতেন তো ভাল হোত ; কেন, তা আর বোধ হয় বুঝিয়ে বলতে হবে না। যাক, আগে বা পরে যখনই প্রকাশ হোক মায়ের ইচ্ছাটা সন্তানের পক্ষে আশীর্বাদ। আমি সেই আশীর্বাদকে মাথায় করে বেরুলাম আজ। তাঁকে বলবে তাঁর মুখোজ্জ্বল করে ফিরতে পারি ভালোই, না পারি সেও তাঁরই আশীর্বাদ।

তুমি যখন চিঠিটা পড়বে তখন আমি কোথায়? ভাবতে বড় কষ্ট হচ্ছে, সেই সঙ্গে এও দেখে শিউরে উঠছি যে, কত দুর্বল হয়ে পড়েছি আমি! পাণ্ডুলের জন্যে বড় মন কেমন করছে, জন্মভূমি! আবার কি ফিরতে পারব?...আশ্চর্য হচ্ছি যে, বাবার বুকে কত শক্তি যে তিনি সতেরো বৎসর বয়সে সাঁতরা ছাড়তে পেরেছিলেন। পাণ্ডুল একরকম বিদেশ, তবুও জন্মভূমি বলে এত আপনার, আর বাবার কাছে সাঁতরা ছিল জন্মভূমি, তার ওপর স্বদেশ! আশ্চর্য হচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গে শক্তিও পাচ্ছি মনে, আমি না এই বাপের সন্তান!

আমার যাওয়ার সময় বিশেষ কিছু বলবার নেই; বলবার শুধু এইটুকু যে, ত্রিনয়নীটাকে তোমরা একটু দেখো। ও বড় হেদুবে, আমি আবার শীগ্‌গিরই ফিরে আসব বলে ওকে ভুলিয়ে রেখো। ও একটু চঞ্চল, সেইজন্য আমার সর্বদা ওকে আগলে আগলে থাকতে হত। বাবাকে আর মাকে বোলো ওকে যেন কেউ কিছু না বলেন, তা হলে যেখানেই থাকি মনে বড় কষ্ট হবে আমার।

আর বেশি লেখার প্রয়োজন নেই, মনের ভাব সংক্ষেপে সবই জানালাম। বাবা এলে চিঠিটা দেখিও, মুখে যাই বলুন, তিনি ভেতরে ভেতরে যে উৎফুল্ল হবেন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বাবাকে আর মাকে আমার প্রণাম জানিও, তোমরা সকলে আশীর্বাদ নিও। মাকে বোলো তাঁরই আশীর্বাদের জোরে যেন তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে ফিরে আসতে পারি। এবার বিদায়।

ইতি
তোমাদের দাদা

পুনশ্চ।

তোমার বৌদিদির বড় ইচ্ছা ছিল জীবছনদীর ধারে একখানি পর্ণকুটীর রচনা করে থাকে। বাবার, মার যদি মত হয় তো একটু ব্যবস্থা করে দিতে বোলো। চণ্ডী যদি সঙ্গে থাকতে চায়, থাকতে পারে।

ইতি

BanglaBook.org

চিঠিখানি মুড়িয়া একখানি খামের মধ্যে বন্ধ করিলেন, তাহার পর লুকাইয়া রাখিয়া ত্রিনয়নীকে ডাক দিলেন।

আসিলে প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা তিনি, বল্—কতগুলো গোলাবজামুন খেতে পারিস?"

গুলাবজামুনটা ক্ষীরের শুকনো পানতুয়া, তখন এসব অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ মিষ্টান্ন। ত্রিনয়নী একটু ভাবিল, তাহার পর বলিল—"একশোটা।"

"একশোটা খেলে মরে যাবি, 'তিনি কোথায়'—'তিনি কোথায়"—বলে কেঁদে বেড়াতে পারবো না আমি।"

"চার শূন্য চল্লিশটা।"

"লোটন ঝা তাহ'লে পাগুল ছেড়ে পালাবে, বলবে কোথা থেকে রাক্ষুসী এসেছে দুলহীনের পেটে, আমায় সুদ্ধু খাবে।...লোকে আর তামাশা দেখতে পাবে না।"

ত্রিনয়নী রাগিয়া গেল ; মাথা নাড়িয়া, দাদাকে এলোধাবাড়ি চড় মারিতে মারিতে নাকিসুরে বলিল—"যাঁও, দেঁবেন না, খাঁলি খাঁলি..."

বিপিন বলিলেন—"দেখো! আমি দেবো নাকি?—একটা পিরেতকে (ভূতকে) মন্ত্র দিয়ে বশ করেছি ; তাকে বলে দেবো সেই রেখে যাবে তোর জন্যে।"

"যাঁও পিঁরেত না হাঁতি, খাঁলি খাঁলি..."

"হ্যাঁ রে, সে এসেছে ঘরে ; দেখ না তোর নাক দিয়ে খোনা খোনা কথা কইছে, নইলে তুই কি লছমনের বৌয়ের মতন গোঙা?"

ত্রিনয়নী একটু ভাবিবার জন্য চুপ করিল, বিপিন বলিলেন—"বলে দিচ্ছি, পাঁচটার ব্যবস্থা করে দেবে, বেঁচে থাকলে আরও অনেক গোলাবজামুন খাবি। দেখ, কটা বেজেছে ঘড়িতে!"

"দশটা।"

"আমি খেয়ে দেয়ে ঘোড়ায় চড়ে অফিস চলে যাচ্ছি। ঠিক যখন দুটো কাঁটাই এই এক দাঁড়ির উপর এসে দাঁড়াবে—যাকে আমরা বলি একটা বেজে পাঁচ মিনিট আর পিরেতরা বলে ঘড়ি ধরে একটা—সেই সময় ঐ র‍্যাকেই—ঘড়ির ঠিক পেছনে একটা বাটি ক'রে পাঁচটা গোলাবজামুন আর তার উপর একটা চিঠি থাকবে ; ঠিক ঐ সময় টেবিলে উঠে..."

ত্রিনয়নী বিস্মিতভাবে শুনিতেছিল, দাদার হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"আমি পারব না পিরেতের গোলাবজামুন খেতে, আমার ভয় করে।"

বিপিন বলিলেন,—"খেতেই হবে যখন একবার বলে ফেলেছ ; নইলে ভূতে ঘাড় মটকাবে,—দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে সে তো আর কালীঘাটের কুকুর হতে পারে না?"

"আমার ভয় করবে। লক্ষ্মীদাদা, সোনাদাদা ; বিপিন হম্মর, ভাইয়া হম্মর..." (বিপিন আমার, ভাই আমার)

কোমড় জড়াইয়া ধরিল।

শেষের এগুলি একেবারে চরম অবস্থার আদর। বিপিন বলিলেন— "আচ্ছা মোহনাকে দাঁড় করিয়ে রাখিস ঘরে ; বেশি ভয় করে, না হয় তাকেই পেড়ে দিতে বলিস। কিন্তু ঠিক একটার সময়,—ভূতের একটা ; মনে থাকবে তো?"

ত্রিনয়নী একটা নিরুৎসাহভাবে ঘাড় নাড়িল।

"আর, একটার আগে দেখতেও যেও না, আর ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু জানিও না। মনে থাকবে তো?"

ত্রিনয়নী আবার বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িল।

"না মনে থাকে আমার বয়েই গেল, পিরেতে বুঝবে।"

বেলা প্রায় দেড়টা হইবে, কি আরও কয়েক মিনিট বেশি, মোহনা একরকম উর্ধ্বশ্বাসেই ছুটিয়া আফিসে প্রবেশ করিল। কৈলাসচন্দ্র সেরেস্তায় কাজ করিতেছিলেন, হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—"বাবু শীগ্‌গির চলুন, বাড়িতে ভয়ানক কান্নাকাটি পড়ে গেছে।"

কৈলাসচন্দ্র হাতের কলম রাখিয়া দিয়া বিমূঢ় ভাবে ফিরিয়া চাহিলেন, প্রশ্ন করিলেন —"কান্নাকাটি! কেন রে?"

মোহনা যেন আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িল, গুছাইয়া কিছু বলিতে পারিল না।—অসংলগ্ন খানিকটা কী বকিয়া গিয়া বলিল—বোধ হয় 'পিরেতে' কিছু করিয়া দিয়াছে সবাইকে, তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল—অবস্থা বড়ই খারাপ—নতুন 'বহুমা' মূর্ছা গিয়াছেন, কে কাকে দেখে তাহার ঠিক নাই।

সেরেস্তার সকলে আসিয়া প্রশ্নে, অভিমতে ভিড় করিয়া দাঁড়াইল।

'পিরেত' এদের একটা মুখের বুলি—সাপে কামড়াইলেও বলে—পিরেতে কামড়াইয়াছে, গাছ থেকে পড়িয়া গেলেও বলে 'পিরেতে' ফেলিয়া দিয়াছে। কৈলাসচন্দ্র উঠিয়া কোটের বোতাম দিতে দিতে কসিয়া একটা ধমক দিলেন, বলিলেন—"গুছিয়ে বল্ কী হয়েছে ; চল্ আয়...কী হয়েছে বলতে বলতে চল্।"

ত্রস্তগতিতে অগ্রসর হইলেন। মোহনা বলিতে বলিতে চলিল—এই একটু আগে তিনি-দিদি আসিয়া তাহাকে বলে যে ভূতে ঠিক একটার সময় ঘড়ির পেছনে একটা বাটি করিয়া পাঁচটা গোলাবজামুন আর একটা চিঠি রাখিয়া যাইবে। মোহনা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই, জিজ্ঞাসা করে কে একথা বলিয়াছে। তিনি-দিদি বলে, সে বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছে ; মোহনার হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া যায়। মোহনা বিশ্বাস করিতে চাহে নাই, কিন্তু তিনি-দিদি জোর করিয়া ঠেলিয়া টেবিলে চড়াইয়া দেয়। মোহনা তখনও বিশ্বাস করিতে চাহে নাই, নামিয়া আসিতেছিল এমন সময় হঠাৎ ঘড়ির পেছনে নজর পড়িয়া যাওয়ায় দেখে সত্যই একটা কাঁসার বাটি চকচক করিতেছে। বাহির করিয়া দেখে —সত্যই পাঁচটা গোলাবজামুন আর তার উপর একটি চিঠি। তখন মোহনার সন্দেহ হইল এবং চণ্ডীচরণকে ডাকিল। চণ্ডীচরণ আসিয়া বলিল—বিরাজদিদির চিঠি। বিরাজদিদিকে চিঠি দিতেই তিনি পড়িয়া 'ও দাদা গো!' বলিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া ওঠেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য ঘর থেকে সবাই ছুটিয়া আসেন—বহুমা আসিতে আসিতে পড়িয়া মূর্ছা যান —আর কালবিলম্ব না করিয়া মোহনা ছুটিয়া আসিয়াছে—তিনি-দিদিকে পিরেতের খাবারগুলা খাইতে মানা করিয়া...

কৈলাসচন্দ্রের শেষের কথাগুলার দিকে মন ছিল না, বিপিনের উল্লেখেই হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িলেন, উৎকণ্ঠিতভাবে বলিয়া উঠিলেন—"বিপিন—!—সে আজ কুঠিতে আসে নি?"

দারুণ উদ্বেগে তাঁহার কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; অথবা অবচেতনার কোন স্তরে একটা ধারণা থাকিয়া গিয়াছিল, বিপিনবিহারী বাসাতেই আছেন। একটা আরদালিকে হুকুম করিলেন, দেখ তো, বিপিন কুঠিতে কোথাও আছে কিনা।

এমন সময় চণ্ডীচরণ ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল—চেহারা প্রায় উম্মাদের ন্যায়, বলিল—"কৈলাসদা, দাদা পালিয়েছেন, দিদিকে একটা চিঠি দিয়ে...বৌদি আবার অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন..."

কৈলাসচন্দ্র কোন্ দিকে যাইবেন ঠিক করিতে না পারিয়া যেন একটু দোল খাইলেন, তাহার পর আবার আফিসের দিকে পা বাড়াইলেন—একরকম ছুটিলেনই বলা চলে। চণ্ডীচরণকে বলিলেন—"তুই শীগ্‌গির ফিরে যা, আমি ঘোড়াতে করে ছুটে আসছি।"

আফিসে প্রবেশ করিয়াই বিপিনবিহারীর নাম ধরিয়া জোরে হাঁক দিলেন। আফিসের আমলারা একটা বড় হলঘরে বসে। হলের পিছনদিকে একটা লম্বা বারান্দা আছে ; তাহার একদিকে একটা মাঝারি সাইজের ঘর, মধুসূদনের দপ্তর ; অন্যদিকে একটা অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর, কিছু কাগজপত্র থাকে। বিপিনবিহারী সাঁতরা থেকে আসা অবধি প্রায়ই আফিসে আসিতেছেন, বারান্দাতেই বসেন ; কাজকর্ম শেখেন। কোন উত্তর পাওয়া গেল না, আমলাদের তরফ থেকে শুধু আবার কতকগুলা উৎসুক প্রশ্ন উত্থিত হইল। কৈলাসচন্দ্র বারান্দার দিকে পা বাড়াইয়া আবার একটা হাঁক দিলেন ; ছোট ঘর থেকে উত্তর আসিল—"কী বলছ দাদা?"

কৈলাসচন্দ্র থতমত খাইয়া মুহূর্তখানেক দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তখনই অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"কী বলছ!...ওদিকে..."

পাশের একটা কেরানীকে বলিলেন—"ঘোড়াটা করে ছুটে গিয়ে খবর দে বিপিনবাবু আছে।"

হল অতিক্রম করিয়া বারান্দায় আসিয়া গেছেন, পিছনে আফিসের কেরানীরা আসিতেছিল, তাহাদের নিজের নিজের কাজে যাইতে বলিয়া ছোট কামরাটার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বিস্মিতভাবে বলিলেন—"কী চিঠি দিয়েছ? বাড়িতে খবর তুমি নাকি পালাচ্ছ?"

বিপিন বলিলেন—"হাঁ, এই ঠিক্‌টা দিয়ে পালাব দাদা।"

এত উৎকণ্ঠার মধ্যেও কৈলাসচন্দ্র হাসিয়া ফেলিলেন, সামলাইয়া লইয়া রাগতভাবেই বলিলেন—"এখনও তুমি ঠাট্টাই করছ! এই ঠাট্টার জন্য একদিন যে মারা যাবে কেউ না কেউ। যাও শীগ্‌গির বাড়ি যাও, সেখানে হুলস্থূল পড়ে গেছে।"

বিপিনবিহারী যখন বাড়ি আসিলেন, তখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। পাড়ার ব্রাহ্মণীরা অনেকে জড়ো হইয়াছিল, কামার, ছুতার পাড়া থেকেও অনেকে আসিয়াছিল ; উনি যখন বাহির বাড়িতে আসিয়াছেন তখন অনেকে ফিরিয়া যাইতেছে ; দুলারমনের ঠাকুরমা বুড়ি খুব একচোট হাত নাড়িয়া বলিল—"রে বিপিন, তোঁহ হন্দ্ ক' দেল্যা...ছি—ছি—ছি...আইকাল্‌কে লড়কা! হিন্‌কা সবকে হাতসে আব লাউৎ ভগবান হমসব বুঢ়িয়া-টুয়রকে।" (তুইও হদ্দ করে দিলি বিপিন—আজকালকার ছেলে!—ভগবান এদের হাত থেকে আমাদের মতন বুড়ো-হাবড়াদের টেনে নিন।)

বাড়িতে প্রবেশ করিতে আবার একচোট গঞ্জনা হইল, পাড়ার বর্ষীয়সীদের কাছে।

BanglaBook.org

মোতিবালাকে লইয়া নিস্তারিণী দাওয়ায় বসিয়াছিলেন, চুপ করিয়া রহিলেন। দুঃখে অভিমানে ভার হইয়া আছেন। বিরাজ বাহিরে আসিলেন—"দাদা!..." বলিয়াই চোখে অঞ্চল দিয়া আবার হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। মোতিবালাও চোখে অঞ্চল চাপিয়া ধরিলেন। নিস্তারিণী থামে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, একটু পরে শুধু আঁচলটা দিয়া দুইটা চক্ষু মুছিয়া লইলেন।

রসিকতা এতদূর গড়াইবে বিপিনবিহারী সেটা আন্দাজ করিতে পারেন নাই;—ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া লইবার জন্য বলিলেন—"ফিরে এসেই দেখছি বেশি ফ্যাসাদ। তিনিটাকে দেখছি না যে?—গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে কোথায় সরলো?"

ত্রিনয়নী গোলাবজামুনের লোভে গোড়াতেই কথাটা না বলিয়া দেওয়ার জন্য একচোট খুব বকুনি খাইয়া কোথায় লুকাইয়া পড়িয়াছে। ইঁহারাও কেহ কিছু উত্তর দিলেন না। বিপিন আর একবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—"বাবার মতন হতে গিয়ে কী বোকামিটাই করেছি!—ভাবলাম মা দুঃখ করে বলেছেন..."

নিস্তারিণী দেবী মুখ খুলিলেন, একটু ঝঙ্কার দিয়াই কহিলেন—"হোগে যা না, কাকে ভয় দেখাচ্ছিস? যেমন গাছ তার তেমনি ডাল হবে তো? আমি বুক বেঁধে আছি, আমায় ভয় দেখাতে হবে না। তবে এই সব মতলব আছে পেটে-পেটে তো আগে বীরত্ব দেখালেই পারতিস—রাজপুত বীর! এখন যে ঐ একটা পরের মেয়ে তিন-তিন বার মুচ্ছো গেল, যদি..."

বিপিন একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আবার মূর্চ্ছা গেছল! কী ফ্যাসাদ! —সেবারে জাহাজের তলায় পড়লাম, তাতেও মূর্ছা গেছল!"

অত দুঃখের মধ্যেও সকলে হাসিয়া উঠিলেন। নিস্তারিণী দেবী বলিলেন —"রঙ্গ ভালো লাগে না, উনি গোঁয়ারতুমি করে প্রাণ দিতে বসলেন, দোষ হল না, যত দোষ হল মুচ্ছো যাওয়ায়!"

বিপিন আস্তে আস্তে গিয়া নিস্তারিণী দেবীর পায়ের কাছে বসিলেন, পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে ধীরকণ্ঠে বলিলেন—"তোমার এমন এক-চোখোপনা ভালো দেখায় মা?"

নিস্তারিণী দেবী একটু বিস্মিতভাবে বলিলেন—"এক-চোখোপনা?"

বিপিন বলিলেন—"প্রাণ দিতে বসার কথা বলছ,—মূর্ছা যাওয়া কি আরও বেশি করে প্রাণ দিতে বসা নয়? তাও তিন-তিনবার করে! কার বকুনি খাওয়ার কথা আর কে খেয়ে মরছে—এক-চোখোমি বলব না?"

রাগের মুখে হাসি আসিয়া পড়িলে রাগটা আরও বাড়িয়াই যায়; উদ্যত হাসিটাকে চাপা দিয়া নিস্তারিণী দেবী বলিলেন,—"নে সর, আমার কাজ আছে; উনি এসে একটা বিহিত করুন, আমার আর সয় না।"

॥ ৭ ॥

পরদিন মধুসূদন আসিলেন, সব শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন—"তা তুমি একালের ছেলের অপবাদ দিয়ে ওকে ঠাট্টা করতে গিয়েছিলে কেন? তুমিই বলো না?"

নিস্তারিণী দেবী মুখনাড়া দিয়া উঠিলেন—"অমনি বাপে-বেটায় একদিকে হয়ে

গেলেন। কলিতে বিচার তো নেই। আসকারা দিয়ে দিয়ে যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটাবেন সেদিকে হুঁস নেই। আমি না হয় একটু ঠাট্টাই করেছিলাম, কথার মাথায় এক-আধটা ও রকম বলে না লোকে? তাই বলে..."

মধুসূদন স্মিতদৃষ্টিতে গৃহিণীর দিকে চাহিয়া নীরবে শুনিয়া যাইতেছিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন—"ও-ও তো ঠাট্টাই করেছে।"

নিস্তারিণী দেবীর হুঁস হইল ; নিজের তর্কের দুর্বলতায় ক্ষণমাত্র থতমত খাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন, তাহার পর আবার রাগিয়া বলিলেন—"আমার ঠাট্টা আর ওর ঠাট্টা সমান হল?—বিদ্‌কুটে ঠাট্টার চোটে বাড়িতে হুলুস্থূল..."

মধুসূদন আবার সেই ভাবে হাসিয়া বলিলেন—"তার মানে ওর ঠাট্টা তোমার ঠাট্টার চেয়ে ভালো, অর্থাৎ লাগ্‌সই হয়েছে ; তুমিই ভেবে দেখো না।"

"বেশ, হয়েছে তো থাক্‌, আর বলতে যাচ্ছি না কারুর কাছে।"

রাগতভাবে চলিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। ফিরিয়া বলিলেন—"কিন্তু কথাটা তো আমার নয়, তোমারই ; তুমিই তো আপসোস কর—আজকালকার ছেলেরা বাড়ি থেকে বেরুতে চায় না, অথচ আমি সতেরো বছর বয়সে..."

হঠাৎ মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"আহা, কী পৌরুষই হয়েছিল!—বাপ, মা, ভাই, বোন,—সবাইকে কাঁদিয়ে..."

মধুসূদন বেশ ভালোভাবেই হাসিয়া ফেলিলেন ; নিস্তারিণী দেবী আবার চলিয়া যাইতেছিলেন, বলিলেন—"শোন।"

ফিরিয়া দাঁড়াইতে বলিলেন—"তেতেপুড়ে এলাম আমি, মাথা গরম হল তোমার, —কাল যে কথা নিয়ে একালের ছেলেদের ঠাট্টা করেছ, আজ ঠিক সেই কথা নিয়ে একালের বুড়োকে ধমক দিচ্ছ।...ঠাট্টা থাক, কথাটা যখন তুললে তখন বলি,—আজকালকার ছেলেদের দোষটা জানি বলেই আমি বিপিনকে অন্যভাবে তোয়ের করেছি। যা যা দোষ অন্যের মধ্যে দেখেছি সে-সব যাতে বিপিনের মধ্যে না এসে পড়ে সেদিকে আমার কড়া নজর আছে,—ও আজকালকার ছেলেদের মতন দুর্বল নয়, প্যান্‌পেনে নয় ; মুখচোরা নয় ; কুনো তো ওর অতি বড় শত্রুও ওকে বলতে পারবে না, সেদিকে ওকে আমি অবাধ মুক্তি দিয়ে দিয়েছি। আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার দরকার ছিল, বেরিয়ে পড়েছিলাম।...টিফিনের সময় স্কুল থেকে এলাম ভাত খেতে, সময়ে তো প্রায় জুটত না। ভাত কমই ছিল, অন্য দিনও যে রোজই বেশি থাকতো তা নয়, অবস্থা বুঝে চাওয়ার অভ্যেসটা আর হতে পারে নি। সেদিন কিন্তু খিদেটা বেশি পেয়েছিল, হঠাৎই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"আর দুটি আছে মা?" জিগ্যেস করেই ভুলটা বুঝতে পারলাম যে, আমায় দিতে হলে মার আর একমুঠোও থাকবে না। কিন্তু তখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে কথাটা—চেয়ে দেখি মা'র মুখ যেন একেবারে সাদা হয়ে গেছে। এখনও সেই মুখটা মনে পড়ছে মায়ের, ছেলের কাছে এমন লজ্জার ভাব দ্রোণাচার্যের মায়েরও বোধ করি হয়নি। কী যে বলবেন ঠিক করতে না পেরে একটু এদিক ওদিক চাইলেন, তারপর বললেন—'আ আমার পোড়া কপাল! তোর আজ বড্ড দেরি হল দেখে ওঁকে খাইয়ে আগেই আমি খেয়ে নিয়েছি। তোর বোধ হয় পেট ভরলো না ; ওবেলা সকাল সকাল রেঁধে দোব'খন'।...মা মুখে মোটা করে পান রেখে আগে থাকতেই প্রমাণ সাজিয়ে

রেখেছিলেন, মুখের ভাবটা সামলে নিয়ে ভালো করে পান চিবুতে লাগলেন।...এত বড় দুঃখের প্রবঞ্চনা কেউ কখনও বোধ হয় করে নি,—ছেলে খায় নি, মা খেয়ে বসে আছে —মা আমায় এইটে বিশ্বাস করাতে চাইলেন! ওঁর মুখের পানকে আমি খুবই চিনতাম —ওটা ছিল ওঁর প্রতিবেশী-ঠকানো...সেদিন মাকে আমাকেও ঐ দিয়ে ঠকাবার চেষ্টা করতে হল।...আমি ভেবেছিলাম এন্‌ট্রেন্‌স্‌টা পাশ করেই বেরুব ; তখন আর মাস-পাঁচেক আছে। কিন্তু আর উৎসাহ রহিল না, তার পরদিনই বেরিয়ে পড়লাম।"

হঠাৎ কী কথা বলিতে যেন কী কথা আসিয়া পড়িল, মধুসূদন একটু অন্যমনস্ক হইয়া নিজের মনেই বলিলেন,—"লক্ষ্মী যদি নিজে গরীব হয়ে পড়েন তো যেরকম হওয়া সম্ভব, মা ছিলেন ঠিক তাই, তাঁর সংসার ছিল—স্বামী, দুই ছেলে, এক মেয়ে ; কিন্তু সংসারের জন্য ভাঁড়ার ছিল না ; যাও বা একটু ছিল, তাও একরকম নেড়েচেড়ে লোকঠকানোর জন্যেই। কিন্তু মা পরের কাছে কখনও দুঃখ করতেন না, বলতেন তাহলে লক্ষ্মী ছেড়ে যাবেন। দারিদ্র্যের গণ্ডীর মধ্যে লক্ষ্মীকে এরকমভাবে আটকে রাখতে আর কেউ কখনও পেরেছে কিনা জানি না। লক্ষ্মী আর কারুর ঘরে এরকম করে পুজো পেয়েছেন কিনা তাও জানি না। লক্ষ্মীর অমর্যাদা হবে বলে মা যে কারুর কাছে হাত পাততেন না, কারুর কাছে দুঃখের কথা বলতেন না, শুধু এইটুকুই নয়—মা ছিলেন পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে আমুদে মানুষ। পানটা ছিল মায়ের বড় প্রিয় জিনিস ; পেটে ভাত পড়ুক না পড়ুক, মুখে পান দিয়ে উনি পাড়াপড়শীদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন, হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম?"

গিরিবালার কাছে শোনা শৈলেনের, প্রসঙ্গক্রমে যখনই মায়ের কথা আসিয়া পড়িত, মধুসূদন তাঁহার পুণ্যস্মৃতিতে ডুবিয়া যাইতেন। কতকটা অবান্তরভাবেই তাঁহার জীবনের কোন-না-কোন একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া খানিকটা বকিয়া যাইতেন—যেন একটা কিসের ঘোরে পড়িয়া গেছেন। গিরিবালা বলিতেন—"মা দাওয়ায় খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, বাবা উঠোনে একটা চেয়ারে বসে বলে যাচ্ছেন, আমি ঘরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে শুনছি। দিদিশাশুড়ীর কথা শুনতে বড় ভালো লাগত। বাবাকে জিগ্যেস করতে পারতাম না, জানতাম তাঁর মনে কষ্ট হয়,—নিজের হতে যখন বলতেন, আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনতাম।" কী বলছিলেন মনে করবার জন্যে একটু চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন—"হাঁ ঠিক কথা, বলছিলাম—আমার দরকার পড়েছিল, বেরিয়ে পড়েছিলাম ; মায়ের আশীর্বাদে বিপিনের ওরকম দরকার পড়ে নি। ভগবান না করুন, যদি পড়ে কখনও দরকার, ও আজকালকার ছেলেদের মতন যাতে ঘরের কোণে না পড়ে থাকে সেইরকম ভাবেই তো গড়েছি ওকে। শুধু তাই বা কেন?—দরকার জিনিসটা মানুষের মেজাজের কথা—আজই হোক পরেই হোক, ও যদি মনে করে, আছে দরকার ওর—পাণ্ডুলের মতন একটা ছোট জায়গায় প'ড়ে থেকে, নীলকুঠির আওতায় ও বাড়তে পাচ্ছে না, তো পড়বে বেরিয়ে, ওতে বারণ করবারই বা কি আছে? পুরুষ হচ্ছে আগুন, তাকে বেঁধে রাখতে যাওয়া মিছে, বেঁধে রাখবার চেষ্টা করলে যদি পড়ে বাঁধা তো বুঝতে হবে সে মাটির ঢেলা।"

গিরিবালা বলেন—"যতক্ষণ শাশুড়ীর কথা হচ্ছিল, মা চুপ করে দাঁড়িয়ে বেশ শুনছিলেন, শেষের কথাগুলো শুনে আবার মুখ ভার হয়ে উঠল, বললেন—'বেশ,

BanglaBook.org

তোমাদের সংসার নিয়ে তোমরা থাকো, আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও ; ছেলে তোমার থাকে, চলে যায় দেখতে আসব না আমি। তোমার মনের জোর আছে, আমার নেই; বিশেষ করে কী—কবে হয়ে বসবে।'

মা আর না দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে এসে আস্তে আস্তে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

আমারও মনের অবস্থা যে কী হল বলতে পারি না। বাবা ওঁকে এইরকম ভাবেই মানুষ করেছেন। কাজে-অকাজে শক্ত শক্ত জায়গায় পাঠিয়ে দিতেন ওঁকে—কথা কইতে শিখুন, লোকের সঙ্গে পরিচয় হোক, ভালো-মন্দ অবস্থায় প'ড়ে বুদ্ধি খুলুক—এই ছিল বাবার ইচ্ছে। কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে করবার শিক্ষা হয় নি ওঁর, এমন কি রোদে কখনও ছাতা পর্যন্ত ব্যবহার করতে দিতেন না। ওঁর মুখেই শোনা—একবার কোথায় গেছেন, ফেরবার সময় যেমন রোদ তেমনি জোর পশ্চিমে হাওয়া। একটা মস্ত বড় মাঠের মধ্যে দিয়ে রাস্তা, জিরুবার একটু জায়গা নেই। বলেন—আগুনের হল্কার মতন পশ্চিমে হাওয়া বুকে এসে লাগছে, তার ওপর তেমনি রোদ—তেষ্টার চোটে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কোন রকমে মাঠটা পেরিয়ে গ্রামে ঢুকতেই দেখেন কতকগুলো স্ত্রীলোক একটা ইঁদারায় জল ভরছে ; আর দাঁড়াতে না পেরে তাদের কাছে জল চেয়ে নিয়ে ঢকঢক করে খানিকটা খেয়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে ঘাম হয়ে একেবারে অজ্ঞান। কাছেই একটা বড়মস্থান ছিল, তাড়াতাড়ি পাড়া থেকে লোক ডেকে ওঁকে সেখানে নিয়ে গিয়ে তুললেন—মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে, হাওয়া করে অনেকক্ষণ পর চাঙ্গা করে তুললেন। তারপর ছায়া পড়লে একটা গাড়ি করে পাঠিয়ে দিলেন। যখন পৌঁছুলেন তোর ঠাকুরদাদা বাইরেই ছিলেন, শুনে শুধু বললেন—"সর্দিগরমি হয়ে গিয়েছিল—তাড়াতাড়ি জল খেতে গিয়ে ; যাক্ ও ভুলটা আর কক্ষনো করো না। যাও, ভেতরে গিয়ে ঠাণ্ডা হও গে।"

এই ধরন ছিল বাবার,—ছেলের কিছু নিয়ে যে হেদিয়ে পড়া—তা ওঁর ধাতেই ছিল না। ছেলেও তেমনি হয়েছিলেন,—আমি এসেও দেখেছি, ঘোড়ায় কখনও জিন দিয়ে চড়তেন না। মার কাছে শোনা সাঁতরায় যাবার আগে পর্যন্ত ঘোড়ার খালি পিঠের ওপর চড়ে এক হাতে লাগাম আর এক হাতে ছিপটি নিয়ে তীর বেগে হাঁকিয়ে গেছেন ঘোড়াকে ; বাবা বসে বসে দেখছেন। কুঠিতে কোনও বদমাইস ঘোড়া এলে সাহেব বলত সরকারের ছেলের কাছে দিয়ে এস। মা বলেন—'সামনে ঐ জিরাতে সেই সব বদমাইস ঘোড়া ছুটিয়ে সায়েস্তা করবার কি ধুম!—ঘুলঘুলির মধ্য দিয়ে দেখে আমার যেন বুক শুকিয়ে যেত, কম ভুগেছি ওকে নিয়ে!'

গিরিবালা বলিয়া যান—"সে সব আমার আসবার আগেকার কথা, আমায় দেখতে হয়নি। মাঝে মাঝে গল্প শুনতাম,—ভয়ও হোত, আবার মন্দও লাগত না,—ভাবতাম যাক কেটে তো গেছে সে সব ঝোঁক, তা ভিন্ন পাণ্ডুলে গঙ্গাও নেই যে সাঁতরার ব্যাপারটা হওয়ার ভয় আছে। সে দিন কিন্তু দরজার আড়াল থেকে বাবার মুখে কথাগুলো শুনে, আমারও যেন ভয়ে হাত পা গুটিয়ে আসতে লাগল—বাপই যদি এইরকম ভাবে বলেন তো, আজ যেটা ঠাট্টা, কাল সেটা সত্যি হতে কতক্ষণ? সমস্ত দিনটা যে আমার কী করে কাটল আমিই জানি। একে মনের এই অবস্থা, তার ওপর আর এক কাণ্ড হল। মার মনটা খুবই খারাপ ছিল, ওঁকে বললেন—ঐরকম ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন, বাবাকে বললেন—বাবার ঐ কথা। রাগটা শেষকালে আমার ওপর এসে পড়ল।"

BanglaBook.org

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"ঐ যে কী কুক্ষণে ঠাকুরপোকে বলেছিলাম—জীবছ্ নদীর তীরে সবাই মিলে ঘর করে থাকতে ইচ্ছে করছে।...খুব যে বকাঝকা করলেন তা নয়, সবে নতুন এসেছি তো?—চুল বাঁধবার সময় বললেন —'বেহাই-বেয়ানের শিক্ষার তো প্রশংসা করতে পারলাম না বাছা, মেয়েছেলের মুখে এইরকম কথা কখনও বের করতে আছে, না মনেই কখনও ভাবতে আছে? কথায় বলে মন, না, মতি। সীতা কি সাধ করে নদীর তীরে কুঁড়ে বেঁধেছিলেন, না তাঁর অবস্থা কেউ কামনা করে?'...এইরকম আস্তে আস্তে ইনিয়ে বিনিয়ে বেশ খানিকটা বকে গেলেন।"

গিরিবালা শৈলেনকে সাক্ষী মানেন—"হ্যাঁরে, নদীর তীরে কুঁড়ে বেঁধে থাকতে যাব কেন বল দিকিন? একঠায় তিন দিন পথ চলে চলে জায়গাটা বেশ ভালো লেগেছিল —ঠাকুরপোকে একটা কথার কথা বললাম—তাই নিয়ে উঠতে বসতে নাকাল হতে হবে জানলে কি তাও বলি? ভয় লেগেই ছিল, মার কথা শুনে যেন আরও কাঁটা হয়ে রইলাম। মেয়েছেলের ননদ আর শাশুড়ী নিয়ে একটা আতঙ্ক থাকেই, মার কাছে এ-কটা দিন আদরই পেয়ে এসেছি,—ভয় হল—এইবার কি আসল শাশুড়ীর রূপ ধরলেন? ভয়টা জানিয়ে কারুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করি তারও উপায় নেই। অনেক ভেবে ঠাকুরপোকেই হাত করা ঠিক করলাম। দুপুরেবেলা সবাই সখন ঘুমিয়েছে খজনীকে দিয়ে বাইরে থেকে ডেকে পাঠালাম, তারপর ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করলাম—'তুমি গুলাবজামুন খেতে ভালবাস ঠাকুরপো?' জিগ্যেস করলেন, 'কেন বল দিকিন?'...বললাম—'এই এমনি, যদি খাও তো ব্যবস্থা হয়।'...ঠাকুরপো ঠায় আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন, তারপর একটু হেসে বললেন—তোমাদের দু'জনে কী হয়েছে বলো দিকিন? পরশু দাদা ভূতকে দিয়ে গুলাবজামুন আনিয়ে তিনিকে ফ্যাসাদে ফেললেন, তোমার হাতে কি পেত্নী আছে নাকি? না বাপু, দরকার নেই।'...আমর আঁচলেই একটা চার-আনি বাঁধা ছিল, খুলতে খুলতে বললাম—'ঠাট্টা নয়, এই নাও, কিনে খেও।' বললেন—'কী ব্যপার বল তো? এই দুপুরে গুলাবজামুন!—তোমার নিজের খেতে ইচ্ছে হয়েছে নাকি?' আমি তখন ওঁর কাছে আসল কথাটা ভাঙলাম—'তোমাকে সেই জীবছ্ নদীর তীরে ঘর করে থাকবার কথাটা তুলে নিতে হবে ঠাকুরপো, আমার ভয়ানক ভয় করছে, মা ভয়ঙ্কর চটে গেছেন; লক্ষ্মীটি, বলবে আমি বলি নি, তুমি নিজে বানিয়ে বলেছ, ওঁকেও সে কথাটা বলে দেবে।'...

ঠাকুরপো চোখ দু'টো বড় বড় করে আমার মুখের পানে চেয়ে বললেন—'ওরে বাবা! আমি প্রাণ গেলেও পারব না, দাদা আর মার কাছে একথা বলতে, তুমি এই বিদ্যে শেখাচ্ছ আমায়?'...দুড় দুড় করে পালিয়ে গেলেন।

একেবারে উল্টো-ফল হল দেখে আমি তো অকূলপাথারে পড়লাম।—যা হবার তা তো হয়েই ছিল, এখন ভয় হল ঠাকুরপো আবার এই কথাটা বলে দেবে। তাহলে আর আমার কিছু বাকি থাকবে না এ বাড়িতে। সে যে আমার মনের অবস্থা কী হল তোকে কী বলব। সমস্ত দিন ঠাকুরপো আমায় এড়িয়ে এড়িয়ে চললেন—একবার সুবিধে মত দেখা পেলাম না যে, অন্তত এবারের এ-কথাগুলো বলতে মানা করে দিই। বুকে কান্না ঠেলে ঠেলে উঠছে, কাঁদতেও পারছি না; এদিকে আতঙ্ক রয়েছে—হল বলে বাড়িতে আর একটা হৈচৈ, বাবা থাকতে থাকতেই।

BanglaBook.org

বিকেলবেলা কাঁদবার একটু সুবিধে হল, যেন বাঁচলাম। বেলে-তেজপুর থেকে একটা চিঠি এল। হরিচরণের লেখা—আর সব খবরের মধ্যে খবর—বাবার ঘুড়ীটা ক'দিন থেকে খাচ্ছে না, বোধহয় আর বেশিদিন বাঁচবে না।"

গিরিবালা আবার সজোরে হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"চিঠি পড়ে আমার সে কী কান্না! ত্রিনয়নী ঠাকুরঝি চিঠিটা এনে দিয়েছিলেন, অমন করে হঠাৎ কেঁদে উঠতে দেখে দৌড়ে গিয়ে খবর দিলেন, মা, বড়ঠাকুরঝি, মেজঠাকুরঝি ছুটে এলেন। চিঠিতে কিছু মন্দ খবর আছে কিনা দেখবার জন্যে বিরাজঠাকুরঝি একবার চিঠিটা মনে মনে পড়ে জোরে মাকে পড়ে শোনালেন। কাঁদবার যুগ্যি কিছু না দেখে মা আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করতে লাগলেন —'কাঁদছ কেন বৌমা, চিঠিতে কিছু তো নেই—চিঠি পেয়ে সবার জন্যে মন কেমন করছে?' মাথা নেড়ে বললাম—'না, তার জন্যে নয়।' মা কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বুঝিয়ে বললেন—"ঠিক তাই করছে, মন ওরকম উথলে ওঠে কখনও কখনও ; তা দুঃখু কি? শীগ্‌গিরই তো যাবে মা।'

এই সময় বাবা আফিস থেকে এলেন, বললেন—'ওকি, মা আমার কাঁদছে কেন?' তিনি চিঠির কথা শুনে নিজে একবার পড়লেন, তারপর হেসে উঠে বললেন—'ধরেছি, ঘুড়ী খাওয়া ছেড়েছে বলে ঘোড়-সওয়ারের বেটির আমার শোক উৎলে উঠেছে।' মা'র কাছ থেকে আমায় নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—'ঠিক করে বলবে, নুকোলে আমি রাগ করব।' আমি মুখটা বাবার বুকে লুকিয়ে মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললাম—'বড্ড ভালো ঘুড়ী ছিল।'

খুব একচোট হাসি পড়ে গেল, বাবাও একটু না হেসে পারলেন না, তারপর পাছে বেশি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি, সবাইকে একটু ধমক দিলেন। জামা জুতো যখন ছাড়াতে লাগলাম, নানারকম গল্প করে ভোলাবার চেষ্টা করতে লাগলেন আমায়। সে-ঝোঁকটা তো সামলালাম, কয়েকদিন ধরে কিন্তু একটা খ্যাপান্ উঠে গেল।

গিরিবালা আবার হাসিয়া বলিলেন—"তা দোষও দিতে পারি না কারুর বাপু,—কোথায় চারশ কোশ দূরে ঘুড়ী খাওয়া ছেড়েছে বলে অমন হাপুসনয়নে কাঁদা—অন্য লোক হলে আমিও খ্যাপানিতে যোগ দিতুম। একটা সামঞ্জস্য থাকা চাই তো মানুষের?"

বেশ খানিকটা হাসেন গিরিবালা, তাহার পর আবার গম্ভীর হইয়া যান, কী একটি প্রীতির রসে সমস্ত মুখটি নরম হইয়া আসে, বলেন—"সেইবারে তোর কাকার মন দেখেছিলাম। আমায় তো—'এই বিদ্যে শেখাচ্ছ?'—বলে অমন করে চলে গেলেন, তারপর আমার কান্না দেখে, খ্যাপানির মধ্যে ঐরকম অপ্রস্তুত হয়ে যেতে দেখে উনি ঠিক কখন মাকে গিয়ে বলেছেন সে জীবছ নদীর কথা উনি নিজে বানিয়ে বলেছিলেন। বোধহয় দিন দুয়েক পরের কথা, রান্নাঘরে কী করছিলাম, মনে হল যেন মা রেগে কাকে কী বলছেন। বেরিয়ে দেখি এদিককার দাওয়ায় ঠাকুরপো দেয়ালে ঠেস দিয়ে কাঁচুমাঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর মা বকছেন ; আমার কানে গেল—'তুই তাহলে বানিয়ে বলতে গেলি কেন?—সবার কাছে মিছিমিছি নাকাল হচ্ছেন ছেলেমানুষ...'

আমায় দেখে ঠাকুরপো প্রথমটা আরও যেন কিরকম হয়ে গেলেন, তারপর একটু ঝেঁঝেই বললেন—'বা-রে ঠাট্টা করব না?—মাংনির বৌদি হতে এসেছেন!'—বলেই

BanglaBook.org

লাফিয়ে নেমে দুড় দুড় করে বাইরে পালিয়ে গেলেন।"

পুরান কথা বলিতে গিয়া গিরিবালা মাঝে মাঝে একটু করিয়া থামিয়া যান, বিশেষ করিয়া সেইসব জায়গায় যেখানে দরদটা একটু ঘন ; যে প্রসঙ্গটা শেষ করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে একটু ছোট্ট মন্তব্য করেন, তাহার পর আবার নতুন প্রসঙ্গ আরম্ভ করেন। বলিলেন —"মনটা ঠাকুরপোর বরাবরই এই রকম, দেখলাম কিনা এই এত বচ্ছর। যাক্, ঘুড়ীর দোহাই দিয়ে আর ঠাকুপোকে মিথ্যে বলিয়ে ও ঝোঁকটা তো একরকম সামলে ওঠা গেল, কিন্তু কপালে যার দুর্ভাবনা লেখা তার কোথা থেকে এসে যে জোটে বলা যায় না তো। এক ভাবনা যদি বা গেল, ভাবনা হল—ঘর-পালানোর বংশ—তোরা যখন হবি তখন তোদের আবার এরকম ঝোঁক হবে না তো? মা কড়া মানুষ, তাঁরই এত ভয়, তোরা যদি আবার ওরকম হোস তো আমার দশা কি হবে!...মাথা নেই মুণ্ড নেই, সে যে আবার কী ভাবনা বলে বোঝাতে পারি না। তাই কি এক আধ দিন রে? প্রায়ই হত ভাবনা, বাইরের দিকের ঘুলঘুলিটার কাছে দাঁড়িয়ে আকাশ পাতাল ভাবতাম।"

শৈলেনের জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়িয়া যায়, তার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলেন—"গেলোও কি শেষ পর্যন্ত ফলে রে! কী যে বংশের ধারা!"

মাতা-পুত্র উভয়েই হাসিতে থাকেন।

॥ ৮ ॥

মাসখানেক পরে বিরাজমোহিনী চলিয়া গেলেন।

বয়সে একটু বড় হইলেও সম্বন্ধে ছোট। বয়স আর সম্বন্ধ—এই দুয়ের মধ্যে একটা রফা করিয়া লইয়া উনি বাড়িতে সবচেয়ে অন্তরঙ্গ সাথী হইয়াছিলেন, ওঁর যাওয়ায় গিরিবালার কাছে বাড়িটা যেন অর্ধেক খালি হইয়া গেল। বাকি রহিলেন মোতিবালা, বাহিরে রহিলে দুলারমন।

দুলারমন এক একদিন দুপুরেও আসে, সেদিন নিদ্রা ছাড়িয়া বাঘবন্দী খেলা হয়, মোতিবালাও থাকেন, রাঙা বেড়ালটাও আসিয়া কোল দখল করে। সঙ্গে সঙ্গে গল্প চলে, মাঝে মাঝে ছড়াযোগে মোতিবালার বেড়ালের আদর। একটু রঙ্গ করিবার ইচ্ছে থাকিলে খজনীকে ডাকিয়া লওয়া হয়। পালের মতো মোটা কাপড়ে একটা খসখসে আওয়াজ করিতে করিতে এবং কাঁসার মল বাজাইতে বাজাইতে খজনী অভয়াকে লইয়া উপস্থিত হয়। ঘুমের জের লাগিয়া আছে, দাওয়ার খুঁটিতে ঠেস দিয়া বসিয়াই একটা হাই তোলে।

একদিন বাঘবন্দী খেলার মধ্যেই গিরিবালা বলিলেন—"এবার খজনী চলল আমাদের কাঁদিয়ে।"

খজনী উঁচু দাঁতের উপর ঠোঁট দুইটা কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—"হে, কাঁহা হে কনিয়া?"(কোথায় গো কনে-বৌ)

"শ্বশুরবাড়ি, আর কোথায়? এবার শুনছি তারা দলবল নিয়ে আসবে—তোকে বেঁধে নিয়ে যাবে।"

খজনী সাদা সাদা চোখ পাকাইয়া শরীর দুলাইয়া কতকটা ভ্যাংচাইয়া বলিল—"ইঃ, বেঁধে নিয়ে যাবে! গায় ছি কি মহিষ ছি হে?" (আমি গরু কি মহিষ গো!)

BanglaBook.org

মোতিবালা ঘুরিয়া বসিলেন, ঝাঁজিয়া বলিলেন—"যাবি নি পোড়ারমুখী—বুড়ো বয়স পর্যন্ত পালিয়ে পালিয়ে আসবি? এদিকে আবার গুমর্ করা চাই—আমার শ্বশুর সমস্ত জেতের মোড়ল, বাড়িতে দুটো ধানের মড়াই, দুটো হাল, গাই, মহিষ—"

"যেনা ঝুট বজেইছি!" (যেন মিছে কথা বলি।)

"কিন্তু তোর তাতে কি—যদি রাজাই হয় তোর শ্বশুর?"

"মানা করেইছি?—রাজা হউৎ উজীর হউৎ, হাম্‌রা ছোড় দেথুন্।" (মানা করছি? রাজা হোন, উজীর হোন, আমায় ছেড়ে দিন কিন্তু।)

তাহার তর্কের ঢং দেখিয়া তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন, মোতিবালা বলিলেন—"কেন ছাড়বে? খরচ করে বেটার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে, বাপের বাড়িতে ফেলে রাখতে চাইবে কেন শুনি?"

খজনী নাক সিঁটকাইয়া আকাশে তুলিল, বলিল—বাঃ, তাহার বাপও তো খরচ করিয়াছে, সেই বা কেন বাপের বাড়ি ছাড়িতে যাইবে?

আবার হাসি পড়িয়া গেল, মোতিবালা বলিলেন—"শুনুহে দুলারমন!"

দুলারমন গম্ভীর হইয়া বিজ্ঞের মতো মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া কহিল—ঠিকই তো বলিয়াছে খজনী, বাপ পয়সা দিয়া জামাই কেনে, শ্বশুর পয়সা দিয়া বৌ কেনে, গায়ে গায়ে শোধ হইয়া গেল, যে যার বাড়ি বসিয়া থাকুক। দুলারমনও তো যাইবে না এবার লইতে আসিলে। যদি জবাবদস্তি লইয়া যায় তা সেও পলাইয়া আসিবে।

খজনীকে প্রশ্ন করিল—"কেনা ভাগৈছ গে খজনী বাতা দে ত।" (কি রকম করে পালাস বলে দেতো খজনী।)

—হাসি চাপিয়া মনোযোগের ভঙ্গিতে খজনীর সঙ্গে মুখোমুখি হইয়া বসিল। খজনী বলিল—"ইঃ, হিন্‌কা বুতে হোত্যান্:" (ইঃ, এঁর দ্বারা হবে!)

দুলারমন বলিল—"তু কহিত।" (তুই বল্‌ই তো।)

খজনী বলিল—একরকম উপায় করিলে হয় না কি—উহারা সাবধান থাকে না? একবার তো টের পাইয়া রাস্তা থেকে ধরিয়া লইয়া যায়। একবার পলাইয়াছিল শেষরাত্রে, বেটাছেলের মতো কাপড় পরিয়া, মরদাবার' (বরের) পাগড়ি আর পিরান চড়াইয়া,—হাতে তাহার লাঠিটা লইয়া। একবার পলাইতে তাহার কিছু বেগ পাইতে হয় নাই। ওর বাবা এখান থেকে ওকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া লইয়া গেল। ওর শ্বশুর খুব খুশি, 'সম্‌ধি'কে (বেহাইকে) একদিন ধরিয়া রাখিল। তাহার পরদিন রাত্রে 'সম্‌ধির' খাতিরে একটা ভোজের আয়োজন হইল। নেশারও ব্যবস্থা ছিল। যখন সবাই খাইতে বসিয়াছে, শাশুড়ী, ননদ, জা—এরা সব সদরদরজা থেকে তামাশা দেখিতেছে, খজনী খিড়কি দিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর বন, বাদাড়, ক্ষেত ভাঙিয়া ছুট—ছুট—ছুট...

খজনী হাতটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এমনভাবে বর্ণনা করিতে লাগিল যে, ইঁহারা সব হাসিয়া লুটোপুটি খাইয়া গেলেন। গিরিবালা বলিলেন—"কি গেরো বাবা! আরও অনেকদিন পরে গেছে বলেই সে বেচারারা মনের ফুর্তিতে ভোজের জোগাড় করেছে, আর..."

মোতিবালা বলিলেন—"যার জন্যে জোগাড় সেই রাতদুপুরে খানা খন্দর ডিঙিয়ে বাড়ি পালাচ্ছে। মর কালামুখী—উঃ!"

—হাসি সামলাইয়া ওটা দায় হইয়া পড়িয়াছে।

খজনী একটু চাহিয়া দেখিল, হাল্কাভাবেই কথা হইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ যেন স্বরটা তাহার একটু ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল—"তোঁ নেই কহ হে মোতি।"

মোতিবালা তর্কের ঝোঁকে রুখিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"কেন বলবো না আমি? তুই পালাবি আর আমার বলতেই যত দোষ?"

খজনী বলিল—পালায় সে কি নিজের জন্যে? মোতিবালা এখন বড় হইয়াছে, মাতব্বর হইয়াছে, দু'দিন পরে নিজেই শ্বশুরবাড়ি যাইবে, গরীব খজনীকে ঠাট্টা করিতে শিখিয়াছে, তাহার কথা না তোলাই ভালো; তবে আজ ত্রিনয়নীকে, অভয়া-বউয়াকে খজনীর সঙ্গে করিয়া দিক, সে যদি আবার পলাইয়া আসে তো তাহাকে যেন ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। মোতিকে কেন সে বলিতে যাইবে?—আর তো খজনীকে দরকার নাই তাহার; কিন্তু যখন হামাগুড়ি দিতে শিখে নাই তখন থেকে এই খজনীর কোলেই মানুষ হইয়াছে। ...দুলারমন বড় হাসিতেছে এখন; শ্বশুরবাড়ি গিয়া যখন কোলের ভাইটির কথা মনে পড়িবে তখন কেমন এই হাসি মুখে লাগিয়া থাকে দেখা যাইবে; খজনীর বেলায় হাসিতে তো আর পয়সা খরচ হয় না। খজনী তো যাইবে মধুবাণী দুলারমনের শ্বশুরবাড়িতে, গিয়া বলিবে 'বউয়াঃ—(খোকা)—'গে দুল্‌রি, গে দুল্‌রি' বলিয়া হেদায়, খায় না, রোগা হইয়া গেছে,—খজনী দেখিবে সেসব শোনার পরও শ্বশুর-শাশুড়ীর আদর কত মিষ্টি লাগে দুলারমনের...

বলিতে বলিতে খজনী হঠাৎ গিরিবালার পানে চাহিল, সাদা সাদা চোখ নাচাইয়া মাথা দুলাইয়া বলিল—"আর, আঁহা বড়ে হঁসৈছি হে কনিয়া, পরশু খিড়কি লগ কে সুশুক্ সুশুক্ক' কনৈৎছলেই দুপহরিয়ামে?" (তুমি আজ বড় হাসছ গো কনে-বৌ,—পরশু দুপুরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল?)

সুর কাটিয়া যায়; সবাই মেয়েছেলে,—যাহার বিবাহ হইয়াছে তাহারও, যাহার হয় নাই তাহারও বুকে ধক্ করিয়া লাগে! তবুও সহজ ভাবটা বজায় রাখিবার চেষ্টাই করিতে হয়, গিরিবালা একটু ধমকের সুরে বলিলেন—"তুই দেখেছিলি আমি কাঁদছিলাম!—আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে!"

খজনী উত্তর দিল—"নই, কাঁহা দেখ্‌লি?" (না, কৈ আর দেখেছি?)

মোতিবালা বলিলেন—"কেঁদেছিল, এবার বাপের বাড়ি পালাবে তোর মতন।"

দুলারমন হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—সে তো বলিলেই, শ্বশুরবাড়ি আর যাইবে না; খজনী যে মধুবাণীতে যাইবে, তাহাকে পাইবে কোথায় যে বিনাইয়া বিনাইয়া খোকার কথা বলিতে যাইবে?

খজনী চোখ নাচাইয়া বলিল—ইঃ, যাইবে না! বর দেওর ছুটিয়া আসিয়া চ্যাং-দোলা করিয়া লইয়া যাইবে—একজন হাত ধরিবে, একজন পা ধরিবে...

দুলারমন বলিয়া উঠিল—"গোড় ধরৈৎ ত তোঁহু যৈত্যা।" (পায়ে ধরলে তো তুইও যেতিস্।)

সকলেই আবার একটু হাসিয়া উঠিলেন।

কিছুদিন গেল; বিরাজমোহিনীর অভাবটা গা-সওয়া হইয়া আসিয়াছে এমন সময়

BanglaBook.org

একদিন বামনটুলিতে মেয়েদের ঐক্যসঙ্গীত উঠিল। মোতিবালা বলিলেন—"দেখতোরে খজনী, কারুর বিয়ে নাকি? রামপিয়ারীর ছোট বোনটার হবার কথা হচ্ছিল।"

খজনী বামনটুলি পৌঁছিবার পূর্বেই ত্রিনয়নী লঘুভাবে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহার স্বাভাবিক মুক্তকণ্ঠে বলিল—"বৌদি, তোমার দুলারমন চললেন শ্বশুরবাড়ি; দ্বিরাগমন হচ্ছে!"

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিরাগমন সম্বন্ধে একটা চলতি এদেশী ছড়া সুর করিয়া আওড়াইতে আওড়াইতে আবার বোধ হয় বামনটুলির দিকেই ছুটিয়া গেল। গিরিবালা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া কী জিজ্ঞাসা করিতে যাইতছিলেন, দাওয়ার খুঁটিটা ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তিনদিন ধরিয়া জোর গান চলিল। আসন্ন বিচ্ছেদের পূর্বে দুলারমনকে দেখিতে বড় ইচ্ছা করে। খজনীকে বলেন—"একবার ডেকে আন না খজনী? যাওয়ার আগে দেখাটা একবার হবে না?"

খজনী নিদারুণ বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করিয়া নিজের গালে একটি লঘু করাঘাত করে, বলে—"আহি গে দইয়া! হে, দুলাহ্ য়্যাল ছথিন, কোনা অব্থিন্ দুলারমন?" (মাগো মা! ওর বর এসেছে—কেমন করে আসবেন দুলারমন?")

"কেন,—এসেছে তো কী হয়েছে? আমাদের দেশে তো বেড়িয়ে সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে আসে।"

খজনী এত কৌতুক বোধ করে, আর এত আশ্চর্য বোধ হয় তাহার যে, মোতিবালাকে না ডাকিয়া পারে না, বলে—"শুনুহে মোতি, দুল্হাকে দেখা-দেখা ক' ঘুমৈচেই হিন্কা দেশমে! কহিও ন শুন্লে ছলি।" (একবার শোন গো মতি, বরকে দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরে বেড়ায় এঁদের দেশে! কক্ষণও শুনিনি এমন কথা!)

বসিয়া পড়িয়া দুলিয়া দুলিয়া এত হাসে যে, চিকিৎসার দরকার হইয়া পড়ে। গিরিবালা কতকটা রাগে, কতকটা অপ্রতিভ হইয়া বলেন—"দাও তো পোড়ারমুখীর পিঠে গোটাকতক কিল বসিয়ে...ঠাকুরঝি। মরণ!—বুড়ো মাগী, শ্বশুরবাড়ি থেকে পালিয়ে পালিয়ে আসতে দোষ নেই, কেউ যদি দু'পা হেঁটে সঙ্গে সঙ্গে দেখা করে আসে তাইতেই যত দোষ হল!"

অবশ্য দুলারমন আসিল দেখা করিতে, কিন্তু যেভাবে আসিল তাহাকে চেনা দায়। একা নয়, একটি সঙ্গীতমুখর দলবেষ্টিত হইয়া,—মা আছে, কাকী আছে, পাড়ার কয়েকজন বর্ষীয়সী আছে, পাশে পাশে কয়েকজন সঙ্গিনীও আছে। দুলারমনের সমস্ত অঙ্গটি গোলাপী রেশমের শাড়ি, পিরান আর রূপার ভারী ভারী গহনায় মোড়া। চোখে গাঢ় করিয়া কাজল টানা! কপালের মাঝখানে ছোট ছোট চুমকি বসান একটি ডাগর গোছের টিকুলি। কানে বেশ বড় দুইটি রূপার ঝুমকা। বেশ জবজবে করিয়া এদেশী পদ্ধতিতে চুল বাঁধা; সামনের কতকগুলা চুল নামাইয়া তেল আর কী এক রকম মসলা সহযোগে কপালের উপর অর্ধবৃত্তাকারে সাঁটিয়া বসান; মাঝখানে বিভক্ত করিয়া তেল মাখাইয়া মেটে সিঁদুর...অতিরিক্ত অলঙ্করণের মধ্যে এমন একটা পুতুল-পুতুল ভাব ফুটিয়াছে, দুলারমনকে যেন অনেক ছেলেমানুষ দেখাইতেছে। গিরিবালার বড় অদ্ভুত বোধ হইতেছিল। এ তাহাদের রোজকার সাথী হাস্যচপলা দুলারমন নয়। একটি যেন শিশু-

BanglaBook.org

বধূ। হঠাৎ কী মনে হইল, গিরিবালা নিস্তারিণী দেবীর কাছে সরিয়া গেলেন, চাপা গলায় প্রশ্ন করিলেন—"মা, সীতাও কি এই রকম ছিলেন নাকি?"

নিস্তাতরিণী দেবী হাসিয়া উঠিলেন। বলিলে—"শোন কথা বৌমার!"

দুলারমনের মা প্রশ্ন করিল—"কি হে দুলহীন?"

নিস্তারিণী দেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বৌমা জিজ্ঞেস কচ্ছেন—সীতাও এইরকম ছিলেন নাকি? হ্যাঁ গা, এই দেশেরই মেয়ে অন্যরকম হবেন? দেখো জ্বালা!"

দুলারমন সঙ্কুচিত হইয়া ছিলই, আরও যেন গুটাইয়া শুটাইয়া গেল। চারিদিকে যে একটা মৃদু হাসির তরঙ্গ উঠিল তাহাতে গিরিবালাও একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। সে ভাবটা কিন্তু শীঘ্রই কাটিয়া গিয়া মনটা আবার কৌতুকে পূর্ণ হইয়া উঠিল; এই তাহা হইলে আসল সীতাররূপ। কত তফাত যাত্রার দলে দেখা তাঁহার পরিচিতা সীতা হইতে। ...অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঈষৎ তির্যক-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন,—নূতনে-পুরাতনে, জানায়-অজানায় মিশিয়া কি একটা অদ্ভুত ব্যাপার যেন চোখের সামনে ঘটিয়া চলিয়াছে—যাত্রার অশোকবনের, কি বাল্মীকি আশ্রমের পরিচিতা সেই মা-জানকী—বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদার সুর কানে ভাসিয়া আসিতেছে,...আর, সামনের এই অভিনব বেশ, অভিনব সজ্জায় দুলারমন—এ যেন কতযুগ পূর্বে এদেশেরই প্রথায় সংগঠিত বিদায় দৃশ্যকে একেবারে অন্তরঙ্গ করিয়া প্রাণের কাছে আনিয়া দিল। যেন এই সামনেই হইতেছে,—একটা বিপুল বিচ্ছেদ আর বিরহের জীবন সামনে করিয়া, দুই বিন্দু অনপনেয় অশ্রু চক্ষুপুটে বহন করিয়া এমনি নববধূরূপে মা-জানকী পা বাড়াইলেন...স্থিতি নাই, শান্তি নাই, শুধুই চলা, শুধুই কাঁদা...মা-জানকী সরিয়া আবার দুলারমন স্পষ্ট হইয়া ওঠে, কিন্তু মা-জানকী যেন বিদায়ের অশ্রুবিন্দু দুইটি দুলারমনের চক্ষে ভরিয়া একটি চিরবিষাদময় জীবনের উত্তরাধিকার দিয়া যান।...এ অশুভ কল্পনা কেন? গিরিবালার মনটা হঠাৎ টন টন করিয়া ওঠে। বেশ তো দেখিতেছিলেন—কাপড়ে-গহনায় ঢাকা তাঁহাদের প্রতিদিনের সাথী দুলারমনের নূতন রূপ কেমন অদ্ভুত লাগিতেছিল,—অদ্ভুত অথচ কত সুন্দর একটা ছবি। হঠাৎ এ অমঙ্গল চিন্তা কেন?

নিস্তারিণী ভিতরে গেলে, বাক্স খুলিয়া পাঁচটি টাকা আনিয়া দুলারমনের আঁচলটি তুলিয়া ধরিয়া বলিতেছেন—"যা কেনবার ইচ্ছে টিচ্ছে কখনও হবে, কিনবি দুলারমন। তুই চললি, মোতির, বৌমার..."

নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই কী যে হইল, গিরিবালা হঠাৎ চক্ষে অঞ্চল তুলিয়া একেবারে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সকলে বিস্মতভাবে চাহিয়াই অবস্থাটা বুঝিয়া যেন কিরকম হইয়া গেল। দুলারমন আঁচলটা নিস্তারিণী দেবীর হাতে ছাড়িয়া দিয়া আরক্তমুখে নতনয়নে দাঁড়াইয়াছিল। ক্রন্দনের শব্দ কানে যাইতেই একবার চোখ তুলিয়া গিরিবালার পানে চাহিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরিয়া মাকে জড়াইয়া গিরিবালার মতোই ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"তোরা সবকে ছৈড়কে' কোনা রহবৈ গে মাইয়া?" (তোদের সবাইকে ছেড়ে কেমন করে থাকব গো মা?)

কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না। আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে একজন বর্ষীয়সী বলিল—দুলারমন বাড়িতে এ পর্যন্ত কাঁদে নাই—সঙ্গিনীকে ছাড়িয়া যাওয়া আরও কষ্টকর

BanglaBook.org

যে! ক্রমাগতই মুখে এককথা ছিল—'নয়কী দুলহীন—নয়কী দুলহীন'...প্রথম দিনকতক মনটা থাকিবেই যে ভারভার...

নূতন জীবন ; যাহারা ছিল একেবারে পর, অচেনা, তাহারা আপন হইয়া গিয়া নূতন বেদনার সৃষ্টি করিতেছে। বিরাজমোহিনী গেলেন, দুলারমন গেল। চণ্ডীচরণের সাঁতরার স্কুল থেকে নাম কাটাইয়া আনা হইয়াছিল ; অত দূরে থাকিয়া পড়াশুনা করার অসুবিধা ছিল, তবে এতদিন উপায় ছিল না। এবার একটু সুবিধা হইয়াছে, বিরাজমোহিনীর শ্বশুরালয় ভাগলপুর, স্থির হইয়াছে চণ্ডীচরণ দিদির কাছে থাকিয়াই পড়াশুনা করিবে। কয়েকদিন পরে বিপিনবিহারী গিয়া তাহাকেও রাখিয়া আসিবেন। পাণ্ডুল যেন মরুভূমির মত বিরস হইয়া উঠিল। প্রতি মুহূর্তটি গুনিয়া গুনিয়া দিন কাটান,—কবে কাহার দু'ছত্র চিঠি আসিবার কথা, কবে বাড়িতে একটি ছোট উৎসব হইবে, কবে আবার নূতন করিয়া বাপের বাড়ি যাওয়ার দিন হইয়াছে—এইসব সামান্য সামান্য অবলম্বনগুলিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা,—একটা যেন অপরিসীম ক্লান্তি আসিয়া পড়িয়াছে জীবনে।

একদিক দিয়া এই। আবার আশ্চর্যের কথা—এই বিরস জীবনেই কোথা থেকে আসিয়া পড়িতেছে মাধুর্য ; নিতান্ত অলক্ষ্যে জীবন তাহাতে ধীরে ধীরে সিঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। জীবনের তো ধর্মই এই,—অতৃপ্তির পাশে কখন্ কিভাবে যে তৃপ্তি আসিয়া দাঁড়ায় বুঝা যায় না। কিন্তু দাঁড়ায়, আর দাঁড়ায় বলিয়াই শত দুঃখের মধ্যেও থাকে একটা সান্ত্বনা, বাঁচায় থাকে একটা আনন্দ, জীবনের গতি থাকে অটুট।

মেয়েদের জীবনে এ-ধর্ম আরও প্রবল। তাহাদের মধ্যে যে লতার নমনীয়তা বর্তমান, অল্পকেও বেশ জড়াইয়া নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে!...তবুও যাদের জড়ান গেল, তারা যখন যায়, তখন অনেকগুলি তন্তুই ছিন্ন করিয়া যায়। বিরাজমোহিনী আর দুলারমনের যাওয়ার মধ্যে বেদনা আরও গভীর এইজন্য যে, ওঁরা দু'দিনের জন্য গেলেন না, গিরিবালা বুঝিলেন ওঁরা পাণ্ডুলের জগৎ ছাড়িয়া নিজের নিজের জগৎ রচনা করিবার জন্য, দিনদিন সুদূর হইতে সুদূর হইয়া চিরতরেই গেলেন, পর হইয়া গেলেন ; গিরিবালা যেমন আসিয়াছেন তেজপুর থেকে।...ওদের স্মৃতি থেকেই কী করিয়া বেলে-তেজপুরের কথা সব মনে আসিয়া জড়ো হয়,—সেই থেকে মেয়েমাত্রেরই অদ্ভুত জীবনের ধারার কথা।—এই তো তিনি বেলে-তেজপুর ভুলিতে বসিয়াছেন—কবার মনে পড়ে তার কথা? —বাবা, জেঠামশাই, মা, জেঠাইমা, সাতকড়ি, পুতি, হরিচরণ, খোকা—ক'বারই বা ভাবেন এদের কথা দিনের মধ্যে?

আবার ভাবেন না বলিয়াই, কর্মচঞ্চলতার মধ্যে পাণ্ডুলই মনটা পরিপূর্ণ করিয়া থাকে বলিয়াই, অলস মধ্যাহ্নের মুহূর্তগুলি এরা আসিয়া ভরাট করিয়া ফেলে, মধ্যাহ্নের পাণ্ডুল যেন আরও হইয়া ওঠে অসহ্য। এদিকে জীবনটাকে আরও দুর্বহ করিয়া যাওয়ার দিন যাইতেছে ক্রমাগতই পিছাইয়া। একমাসের মধ্যে ফিরিয়া যাইবার কথা শুনিয়া আসিতেছিলেন, সে একমাস তো বহুদিনই পিছনে পড়িয়া গেছে। ক্রমাগতই একটা না একটা বাধা। প্রথম প্রথম দু'একবার যাওয়ার দিন কোন কারণে বাতিল হইয়া গেলে কাছাকাছি দিন স্থির হইত। এখন সে ভাবটাও গিয়া ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে যাওয়ার দিনটা জুড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল। দুর্গাপুজার পরেই হইল না বলিয়া শীতে হইল না। নূতন দেশ থেকে আসিয়াছেন, এদেশের হাড়ভাঙা শীতের মধ্য দিয়া চারশ মাইল পথ

BanglaBook.org

অতিবাহিত করিয়া যাইতে পারিবেন না। বাস্তবিক, শীত যখন পড়িল তখন মনের অভিমানকে ধরিয়া রাখিবার আর অবসরই দিল না গিরিবালাকে। রাত্রিগুলো তো এত ঠাণ্ডা যে, মনে হয় ঘর ছাড়িয়া একবার বাহিরে গেলে আর ফিরিতে পারিবেন না। একদিন একটা জ্বলন্ত কাঠের গুঁড়ির সামনে বসিয়া নিজের মুখেই বলিয়া ফেলিলেন—"ভাগ্যিস মা এসময় যাওয়ার দিন করেননি, ইচ্ছে করে না যে, এই আগুনটুকু ছেড়ে এক পা নড়ি। আবার মাঝখানে অতবড় গঙ্গা পেরোন—ভাবতেই গা শিউরে ওঠে।"

শীত এখানে ফুরাইতে না ফুরাইতে দেশ হইতে পত্র আসিল যে, সেখানে বসন্তের প্রকোপ দেখা দিয়াছে।

ফাল্গুন-চৈত্রের মাঝে যাওয়া না হওয়ায়, দিন ধার্য হইল একবারে আষাঢ়ের গোড়াগুড়ি। চৈত্রের মাঝামাঝি হইতে জ্যৈষ্ঠের প্রায় শেষ পর্যন্ত এদিকে সমস্ত দেশটার উপর দিয়া অতিশয় রুক্ষ পশ্চিমে হাওয়া চলে ; উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ঠিক 'লু' না হইলেও কাছাকাছি একটা ব্যাপার। গিরিবালা বাংলাদেশ হইতে নূতন আসিয়াছেন, অভ্যস্ত নন, সহ্য হইবে না। দু'একবার বৃষ্টিপাত না হওয়া পর্যন্ত যাওয়ার কথা স্থগিত রহিল। ...যখন গরম পড়িল, বাস্তবিক সে এক নূতন ধরনের গরম, দ্বিপ্রহরে দুয়ার জানালার ছিদ্রপথেও যেটুকু হাওয়া প্রবেশ করে, যেন আগুনের হল্কা; উত্তাপ কমিতে কমিতে রাত্রি অনেকখানি গড়াইয়া যায়। একদিন শীতকালের মতোই গিরিবালার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"ভাগ্যিস এই সময় যাওয়ার দিন ঠিক হয় নি মা!"

ওদিকে বেলে-তেজপুর মনের পথেও অনেক দূর হইয়া পড়িতেছে। বাড়ির চিঠি আর মাসে একটা করিয়া আসে কি না আসে, অভিমান হয়, যখন মনে পড়ে ; কিন্তু মনের এটা খেয়াল নাই যে, তাঁহার নিজের চিঠি লেখা কমিয়া গেছে।

সমস্ত বর্ষাটা যাওয়া হইল না। কয়েক পসলা বৃষ্টি পড়িতেই গরমটা একটু কমিল বটে ; কিন্তু পাহাড়ের দিকে অতি বৃষ্টির দরুন কমলা আর জীবছে এমন দারুণ বন্যা নামিল যে, দেশটাকে তো ভাসাইয়া দিলই, রাস্তার কয়েকটা পুল পর্যন্ত ভাঙিয়া দিল। কমলার খাত গভীর নয়, বন্যাটা একটুতেই নামে এদিকে, কিন্তু এবার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হইল। বাড়ির উঠানে পর্যন্ত জল প্রবেশ করিয়া কয়েকদিন সবাইকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। গিরিবালা গুমর করিয়া ওঁদের 'বড়নদী' দামোদরের বন্যার গল্প করিতেন কখনও কখনও, মেতিবালা বলিতে লাগিলেন—"তুমিই সঙ্গে করে এনেছ এ বন্যে বৌদি।"

বন্যার জল সরিয়া গিয়া পথ-ঘাট একটু শুকাইতে না শুকাইতেই, এদিককার জল নামিল। একদিন সজল অপরাহ্নে গিরিবালার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে নিস্তারিণী দেবী বলিলেন —"বৌমার আসার ঠিক একবছর হল।"

গিরিবালা আর মোতিবালার মধ্যে বামনপাড়ার নূতন বিবাহের কথা লইয়া গল্প হইতেছিল, তাহারই একটি ছোট বিরতির মধ্যে কতকটা অবান্তর ভাবেই নিস্তারিণী দেবী বলিলেন কথাটা।

গল্পটা খানিকক্ষণ থামিয়া গেল। হঠাৎ কথাটা বলিয়া যে ভুল হইয়া গেছে, সেটুকু বুঝিয়া নিস্তারিণী দেবীও চুপ করিয়া রহিলেন। গিরিবালা আনমনা হইয়া গেছেন, মোতিবালার দিকে চাহিয়া গল্প করিতেছিলেন, দৃষ্টিটা বিপরীতমুখী হইয়া গেছে। মোতিবালা সেইদিকে একবার চকিতে চাহিয়া লইয়া একটু অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া মা'কে বলিলেন

BanglaBook.org

—"কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে কী উবগারই করলে বৌমার!"

কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত নিস্তারিণী দেবী উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহার পর বলিলেন—"কেন, জলে তো পড়েন নি। আমিও যখন প্রথম আসি, দু'বছর নড়তে পারি নি। আর তখনকার কথা আর এখনকার কথা? পাণ্ডুল তখন বাঘ-ভাল্লুকের আড্ডা ছিল বললে ভুল হয় না, এত বন-জঙ্গল..."

মোতিবালা বলিলেন—"তুমি কত বড় বীর-পুরুষের মেয়ে!"

তিনজনই হাসিয়া উঠিলেন। গিরিবালা মুখ ঘুরাইয়া যে দু'বিন্দু জল কোন রকমে চোখে এতক্ষণ আটকাইয়া রাখিয়াছিলেন, ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। বাধ্য হইয়া আঁচল তুলিতে হইল। মায়ে-মেয়েতে একটু দৃষ্টি-বিনিময় হইল।

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"যাবেন এবার ; পুজোর সময়টা আর হল না, অঘ্রাণ মাসে বিপিন গিয়ে রেখে আসবে, ফেরবার সময় বিরাজকে নিয়ে আসবে। তারও তো একবছর হয়ে গেল। আসল কথা করাই বা যায় কি? দেশ নয় তো কাউকে পাঠিয়ে দিলাম, গরুর গাড়ি কি নৌকো করে নিয়ে এল—আজকাল গাড়ি হয়ে আরও সুবিধে। এখানে লোকেরও তো অভাব, কৈলেশ নিয়ে যেতে পারবেই না ; এক উনি কি বিপিন। ওঁর কথা ছেড়ে দাও — নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না ; এই চার বছর পরে গেছলেন দেশে, তাও বছরখানেক থেকে ভেবে ভেবে আর নিতান্ত জিদ করে যে, বিয়েটা এবার দিয়ে আসবোই..."

মোতিবালা বলিলেন,—"ওঁরাও তো নিয়ে গেলে পারেন,—তালুইমশাই, কি বৌদির জেঠামশাই..."

নিস্তারিণী দেবী বধূকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কথাবার্তার ছলে আসল অবস্থাটা বর্ণনা করিয়া যাইতেছিলেন, কৃত্রিম রোষের সহিত একটু মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"কেন বল দিকিন তখন থেকে ওঁর যাওয়ার কথা নিয়ে ঘ্যানর ঘ্যানর করছিস? তাড়াতে পারলে বাঁচিস্ নাকি?—পাঠাব না আমাদের বৌ, তা যত বড় মদ্দসবই নিতে আসুন।"

রাঙী আসিয়া মোতিবালার কোলে লুটাইয়া শুইল। কিছু তুক আছে বোধহয়, বিড়ালটার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে পারিলে মোতিবালার কৌতুকবৃত্তিটা প্রবল হয়। একটু হাসিয়া বলিলেন—"দিদিকেও ওরা পাঠাবে না ; আমিই চুপি চুপি বারণ করে লিখে দেব।"

"তা দিস্, ইস্ ভয় দেখাতে এসেছে! থাক 'দিদি' তাদের ওখানেই। তোর বিয়ে হলে তোকেও আনব না, তিনির বিয়ে হলে তিনিকেও না, অভির বিয়ে হলে তাকেও না,—পর-ভোলানী মেয়ে তার আবার গুমর! যারা আমার ঘর আলো করে রাখবে, বড় বৌমা, চণ্ডীর বৌ, তাদের..."

"ঘরে বেঁধে রাখবে!"

"রাখবোই তো।"

"শেকল দিয়ে!"

কথার রেষারেষিতে বেশ একটু হাসি পড়িয়া যায়—তিনজনের মধ্যেই। নিস্তারিণী দেবী বলেন—"হ্যাঁ, শেকল দিয়েই, নয় তো কি—একটি একটি করে সোনার শেকলের পাব্ আমার হাতে আসবে ; বেঁধে রাখবার জন্যেই তো এনেছি ঘরে আদর করে..."

রাঙী আরামে ঘড় ঘড় করিতেছে, গায়ে একটা লম্বা টান দিয়া মোতিবালা বলেন

BanglaBook.org

—"কি সর্বনেশে আদর বাবা —ভেতরে ভেতরে এই মতলব, আর..."

এবার তিনজনে বেশ জোরেই হাসিয়া ফেলেন।

কিন্তু হাসি এক আধবারেই, আর সে হাসিও একটা বেদনারই বিকৃত রূপ। দিন দিন বিন্দু বিন্দু করিয়া অশ্রুই জমিয়া আসিতেছে। আরও একটি বৎসর ঘুরিয়া গেল। বসন্ত রোগও ছিল না, বন্যার বাধাও না, তবে অন্য অন্য বাধা বেশ সহজেই আসিল। একবার যাওয়ার ঠিক কয়েকদিন এদিক-ওদিকে বিপিনবিহারী অসুখে পড়িয়া গেলেন। বছর দু'একের মাথায় মাথায় একবার যাওয়া লইয়া বেহাইয়ে-বেহাইয়ে খুব চিঠিপত্র চলিল দিনকতক,—সাতকড়ির পৈতা, তা ভিন্ন বহুদিন যান নাই গিরিবালা, সকলে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ঠিক সেই সময় এখান থেকে কাহারও যাওয়া সম্ভব হইল না। ওদিককার মুশকিল হইতেছে যে, কন্যার সন্তানাদি না হওয়া পর্যন্ত রসিকলাল বা অন্নদাচরণের বেহাইবাড়ি আসা চলিবে না। তখনকার দিনে এ-নিয়ম খুব কড়াকড়িভাবেই প্রতিপালিত হইত। আর কিছু চিঠিপত্র বিনিময়ের পর স্থির হইল গিরিবালার মামা অখিলচন্দ্রই আসিয়া লইয়া যাইবেন।...একটি উৎকট প্রতীক্ষায় আর আনন্দে কতকগুলো দিন কাটিয়া গেল গিরিবালার—একটা অদ্ভুত আনন্দ—তাঁর সংসারে আসিবেন মামা...মামাকে আলাদা করিয়া নিজের সংসারে দেখা, যত্ন করা, সেবা করা...

দিন যখন সন্নিকট, আশায় আশায় মনটা উদগ্র হইয়া আছে, খবর আসিল, সাতকড়ির পৈতা আপাতত স্থগিত রাখিতে হইল, তাহার মাতামহের স্বর্গলাভ হইয়াছে।

বধূর এ নিদারুণ আশা-ভঙ্গের আঘাতটুকু শ্বশুর-শাশুড়ী উভয়েরই বুকে খুব বাজিল। ঠিক ঐ দিনটা আর হইল না, তবে দিন দশ-বারো পরেই একটা দিন ধার্য হইল, ঠিক হইল বিপিনবিহারী গিয়া রাখিয়া আসিবেন।

বিপিনবিহারী চাকরিতে এপ্রেনটিসি করিতেছিলেন, কয়েকদিন হইল মধুসূদন বাহিরের কুঠি তদারকে গেছেন: একদিন বিপিনবিহারী কুঠি থেকে একটু সকাল সকাল ফিরিয়া নিস্তারিণী দেবীকে প্রণাম করিলেন, তিনি চিবুক-স্পর্শে চুম্বন করিয়া স-প্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিতে বলিলেন,—"সায়ের আমায় কাজ করবার হুকুম দিয়ে দিলে মা, আসছে মাসের গোড়া থেকেই, আজ এ-মাসের হল সাতাশ তারিখ, আর দিন চারেক বাকি।"

নিস্তারিণী দেবী বাড়িতে চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিয়া দিলেন পরদিন হইতেই। এক সপ্তাহ পাঠের পর সত্যনারায়ণ পূজা হইবে। বাড়িতে একটু বেশি মৃদুগোছের আনন্দগুঞ্জন উঠিল। তৃতীয় দিনে মধুসূদন ফিরিলেন। সন্ধ্যার খাওয়ার আয়োজনটা একটু বর্ধিত আকারেই চলিল কয়েকদিন। একদিন বৈকালে অফিস হইতে আসিয়া মুখহাত ধুইয়া উঠানে একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন, গিরিবালা জলযোগের আয়োজন করিয়াছেন, মোহনা তাওয়াদার-তামাকের বন্দোবস্তটাকে যথাসাধ্য আড়ম্বরপূর্ণ করিয়া ঘোরাঘুরি করিতেছে, নিস্তারিণী দেবী দাওয়ায় মোতিবালার চুল বাঁধিতে বাঁধিতে গিরিবালার যাওয়ার কথা তুলিলেন।—আর দিন নাই বেশি, প্রথমবার বাপের বাড়ি যাওয়ায় একটু হাঙ্গামা আছে তো?

মধুসূদন একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন, মুঠায় মুখটা চাপিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নিস্তারিণী বলিয়া চলিয়াছেন—"সঙ্গে কে যাবে? একলা বিপিন কি পারবে?"

ত্রিনয়নীও ছিল। দুই বছরে তাহার মুখের বুলি আরও পাকা হইয়াছে, কপালে ভ্রূযুগল তুলিয়া বলিল—"খবরদার, খবরদার ;—বিপিন তোমায় মাঝপথে ফেলে কোন দেশে উধাও হবে!"

সকলেই তাহার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নিস্তারিণী দেবী বলিলেন —"তুই বড় ডেঁপো হয়েছিস, মরবি আমার কাছে ঠ্যাঙানি খেয়ে কোন্ দিন।"

দুই বছর আগের ঘটনা উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—"দাদাটি যেন না পারে তা করতে! —কিন্তু সে কথা তো বলছি না, বলছি প্রথম বাপের বাড়ি যাচ্ছেন, কিছু জিনিসপত্তর সঙ্গে থাকবে তো, ভালো করে একটা তত্ত্ব পর্যন্ত করা হয় নি এ পর্যন্ত বেহাই বাড়িতে, তার ওপর তিনদিনের পথ—একটা লোক না সঙ্গে থাকলে..."

মোহনা তাওয়ায় টিকা বসাইয়া ফুঁ দিয়া অগ্নিসঞ্চার করিতেছিল, এ-সব ব্যাপারে সেই হক্‌দার বলিয়া নিতান্ত অভ্যাসবশেই কাঁচাপাকা গোঁফে একবার হাতটা বুলাইয়া একটু গলাখাঁখারি দিল। মোতিবালা একটি হাসি চাপিয়া বলিলেন,—"মা, শুনলে তো?"

নিস্তারিণী দেবীও একটু মৃদুহাস্য করিলেন। বিপিনবিহারী সদরের দিকে ছিলেন, রেওয়াজ মতো নামের সঙ্গে একটা গালাগালি জুড়াইয়া ত্রিনয়নীকে ডাক দিতে সে ছুটিয়া একটা ছড়া কাটিতে কাটিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল —"বড়কী যাবে বাপের বাড়ি সঙ্গে যাবে কে? বাড়িতে আছে মোহনা-হুলো কোমর বেঁধেছে—এ-এ!"

বড়কী এ প্রান্তে বড় বউয়ের সাধারণ নাম, বড়কী, মেজকী, ছোটকী—এই পর্যায়ে চলে ; রহস্যের মতো মনের অবস্থা হইলে ত্রিনয়নী বৌদি চাড়িয়া এই নামটি ব্যবহার করে।

গিরিবালা তেপাইয়ের উপর জলযোগের সরঞ্জাম রাখিয়া গেলেন। একটু পরেই মোহনা গড়গড়াটা পাশে রাখিয়া নলটা চেয়ারের হাতলে জড়াইয়া দিয়া বাহিরে বিপিনবিহারীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল—যাওয়ার কথাটা উঠিয়াছে, তাহারই ষোল আনা সম্ভাবনা, তবু তুলসীদাস বলিয়াছেন—নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলে হাতের মুঠার জিনিসও ফসকাইয়া যাইতে পারে!

নিস্তারিণী দেবী চুলবাঁধার সঙ্গে যাত্রার ব্যবস্থার কথাই বলিয়া চলিয়াছেন। জলযোগ একটু আধ-ঘ্যাঁচড়া করিয়াই সাঙ্গ করিয়া মধুসূদন গড়গড়ার নলটা উঠাইয়া লইলেন। নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"ওকি, একেবারে ছুঁলে না যে?"

কোন উত্তর না দিয়া মধুসূদন গড়াগড়ায় গোটাকতক টান দিলেন, তাহার পর নলটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন,—"বলছ বটে, কিন্তু ভাবছি এই নতুন চাকরিটা হল, সঙ্গে সঙ্গেই ছুটি নেওয়াটা কি ঠিক হবে?"

আবার নলটা অধর-সংলগ্ন করিলেন।

নিস্তারিণী দেবীর হাত বন্ধ হইয়া গেল, স্বামীর মুখের পানে বিস্মিতভাবে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—"এ যে আবার নতুন কথা শুনছি!"

মোতিবালার বিড়ালকে দোল খাওয়ানো বন্ধ হইল, গিরিবালা ঘরে কী একটা করিতেছিলেন, উৎকণ্ঠিতভাবে দুয়ারের পিছনটিতে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মধুসূদন সটকায় গোটাকতক টান দিয়া বলিলেন—"নতুন কথাই তো, কিন্তু নতুন

BanglaBook.org

অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে। দাসত্বের ধারাই এই, কী করা যায় তুমিই বল? এখন সায়েবের কাছে যদি ছুটির কথা তুলি, মুখটা গম্ভীর হয়ে যাবে। তাও এক আধ দিনের কথা নয় তো, খুব কম করে ধরলেও হপ্তা-তিনেকের কমে হবে না। তুমিই ভেবে দেখো না।"

নিস্তারিণী দেবী একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছেন, কিঞ্চিৎমাত্র চিন্তা না করিয়া বলিলেন —"দেখেছি ভেবে। একটা মত দুটো দিন কায়েম থাকে না। ঐ যে একটা কচি মেয়ে ঝাড়া দু'বছর বাপ মায়ের মুখ দেখলে না—ওর কথা ভাববার কেউ নেই। মুখটি শুকিয়ে শুকিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কাউকে কিছু বলতে পারে না, কিন্তু নিজেদের তো আক্কেল হওয়া চাই..."

মধুসূদন মন্থরভাবে গড়গড়া টানিয়া চলিয়াছেন।

নিস্তারিণী দেবী একটু বিরতি দিয়া বলিলেন—"বেশ, বিপিন না যেতে পারে অন্য ব্যবস্থা করো।"

"অন্য ব্যবস্থা আর কী হবে? কৈলেস তো নিয়ে যেতে পারে না। আমার কথা ছেড়েই দাও, সালতামামির সময় যমে ডাকলেও এখন যাবার উপায় নেই। আর কী বন্দোবস্ত হতে পারে, তুমিই ভেবে বলো না হয়।"

কথাটার মধ্যে এতটুকু অযৌক্তিকতার সন্ধান পাওয়া যায় না, এবং পাওয়া যায় না বলিয়াই নিস্তারিণী দেবীর উষ্মাটা আরও বাড়িয়া গেল। মোতিবালার বেণীটাকে যা তা করিয়া একটা খোঁপার আকার দিয়া তাড়াতাড়ি গোটাকতক কাঁটা গুজিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন,—বলিলেন—"আমার ভেবে বলবার দরকার নেই। আমি শুধু এইটুকু বলব যে, এ প্রবঞ্চনার মধ্যে থাকতে চাই না। তোমাদের বৌ তুমি যা ব্যবস্থা হয় কর।"

উঠিয়া কার্যান্তরে বা কোন বিশেষ কার্য উদ্দেশ না করিয়া চলিয়া গেলেন।

মধুসূদন সন্ধ্যার পর হইতে বাহিরেই থাকেন, সেদিন একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া ভিতর বাড়িতেই প্রবেশ করিলেন। বাহিরের জন্য লুচিভাজা হইতেছিল, বলিলেন,— "বৌমা, তুমি একটু আমার তামাকটা সেজে দাও তো মা, ওরা ততক্ষণ চালিয়ে নিচ্ছে।"

জামা জুতা ছাড়িয়া, ঘর থেকে খানিকটা দূরে তুলসীমঞ্চের কাছে একটা চেয়ার লইয়া বসিলেন। একটু পরে গিরিবালা তামাক সাজিয়া আনিলে হুঁকাটা হাতে লইয়া বলিলেন—"তুমি এই দিকটায় এস তো মা, আমাদের মায়েবৌয়ে একটু সংসারের কথা হোক, ওরা লুচি নিয়ে থাক ততক্ষণ।"

গিরিবালা আসিয়া ডানদিকে চেয়ারের পাশটিতে দাঁড়াইতে পিঠে ধীরে ধীরে কয়েকবার হাতটা টানিয়া বলিলেন—"যাওয়াটা বন্ধ হল, মনটা খারাপ হয়েছে, না?"

গিরিবালা একটু কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—"না..."

"হয়েছে। আমরাও মা'কে মিছে কথা বলছি, মা'ও আমাদের মিছে কথা বলছে।"

গিরিবালা আরও লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—"মিছে কথা কেন বলবেন বাবা; হয়ে উঠছে না, অনেক দূর..."

মধুসূদন কোন কথা না বলিয়া তামাক টানিয়া গেলেন খানিকক্ষণ, হাতটা গিরিবালার পিঠে মৃদু সঞ্চারিত হইতেছে। একটু পরে প্রশ্ন করিলেন—"তোমাদের তেজপুরের পণ্ডিতমশাইকে মনে আছে মা?"

BanglaBook.org

গিরিবালা মাথাটি নাড়িয়া বলিলে—"হ্যাঁ বাবা, আছে।"

"আমার সঙ্গে দু'বার দেখা হয়েছিল গাড়িতে। মস্তবড় পণ্ডিত আর সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ। তিনিই সম্বন্ধটা ঠিক করলেন, দুঃখের বিষয় বিবাহের সময় তিনি থাকতে পারেন নি।"

একটু বিরতি দিয়া বলিলেন—"তোমার ওপর তাঁর মস্তবড় একটা আশীর্বাদ আছে, মা ; আশীর্বাদই বল বা তোমার সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণীই বল।"

গিরিবালা লজ্জায় আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। মধুসূদনের হাতের টান স্নেহে যেন আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে ; বলিলেন, "ফলবে, অমন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মুখের কথা ফলতে বাধ্য। ফলবে বলেই তোমায় একটা কথা আজ বলে রাখি মা, চিরদিন তো থাকব না ; মনে করে রেখ বুড়ো ছেলেটা একদিন বলেছিল। শুধু ঘুষ দিয়েই কেউ কখনও বড় হয় না, যে বড় হবে তাকে অনেক বেদনা, অনেক আশাভঙ্গ সহ্য করতে হবে। বড় হওয়া মানে নিজের চারিদিকে একটা বড় জিনিস গড়ে তোলা—সে গড়ার ক্ষমতা ভগবান তাকেই দেন যে ছোট বড় ক্ষতি-বৃদ্ধি, দুঃখ-নিরাশ—এই সবের মধ্যে অটল হয়ে থাকতে পারে। সে ক্ষমতাও দেন ভগবানই। তবে একেবারে দেন না, প্রতিদিনের ছোট সুখ-দুঃখের মধ্যে দিয়ে দিতে থাকেন।—যার একটু একটু করে সওয়া নেই, সে একেবারে একটা বড় ঝাপটা সইবে কী করে?"

দুইজনেই একটু চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু হুঁকার মন্থর শব্দ হইতে লাগিল। মধুসূদন আবার বলিতে লাগিলেন—"তাঁর উদ্দেশ্যটা আমরা আমাদের সামান্য বুদ্ধি নিয়ে বুঝে উঠতে পারি না ; সব চেয়ে ভালো কথা তাঁর বিধানটা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেওয়া।...যা নিয়ে আমাদের কথাটা উঠল—এই তোমার না যাওয়া—সেইটেই ধরা যাক। আমাদের বুদ্ধিতে কত একটা সহজ কথা আসে দেখো—বিপিনের চাকরির জন্যেই তো সেটা বন্ধ রইল আপাতত?—বেশ, দিন কুড়ি, কিম্বা হচ্ছে আর একমাস পরে, বিপিন সেই তোমায় রেখে ফিরত, তখন সায়েবের এই সুবুদ্ধিটুকু হলেই পারত তো। সমস্যার কত সহজ একটা সমাধান, একটা বালকের মাথাতেও আসে বোধ হয়, কিন্তু তিনি তা হতে দিলেন না। ওর চাকরিটার ব্যবস্থা মাসখানেক আগে করে দিয়ে এ-আনন্দটুকুর পাশে তোমায় বেশ একটু বেদনা দিলেন—আমাদেরও হয়েছে দুঃখ, কিন্তু সেকথা না হয় ছেড়েই দাও ; —ঠিক তোমাকে দিয়ে যেন একটি ব্রত করিয়ে নিচ্ছেন, নয় কি?"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা বলে এ ভেবে মন খারাপ করো না যে, আমি নিশ্চিন্দি আছি। যত শীগ্‌গির পারি ব্যবস্থা করছি তোমায় পাঠাবার। আমি তোমায় এতগুলো কথা বললাম এইজন্যে যে, ভগবান আশীর্বাদের সঙ্গে যদি কখনও দুঃখ দেন তো সেই দুঃখটাকে যেন আশীর্বাদেরই অঙ্গ বলে চিনে নিতে পার।"

BanglaBook.org

দু'একটা বাধার মধ্যে দিয়া আরও প্রায় একটা বৎসর কাটিয়া গেল—সাতকড়ির পৈতা, এমন কি পুতির বিবাহ পর্যন্ত হইয়া গেল। অবশেষে বিচ্ছেদের বেদনা যখন এত গাঢ় সেই সময় ভগবানের নিকট হইত তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ আসিল—প্রথম সন্তানের রূপ ধরিয়া।

গিরিবালা ছেলেদের কাছে গল্প করিতেন।—"বাবাঃ, ঠিক তিন বচ্ছর এগারো মাস,

কী যে অবস্থা হয়েছিল প্রথমবার এসে! বাবা নিজের ছেলের বেলায় অমন দরাজ, নাতির বেলায় সে কী কড়াক্কড়ি! তখন প্রায় বাড়ির দরজা পর্যন্ত রেলগাড়ি এসে গেছে, তিন দিনের পথ গিয়ে দেড় দিনে দাঁড়িয়েছে—বিশেষ কোনই কষ্ট নেই আর—না, আর একটু বড় হোক, বড্ড কচি—না, আরও একটু বড় লোক, বড্ড কচি...শেষে শশাঙ্কর যখন এক বছর উৎরে গেল, তখন গিয়ে ছাড়পত্র পেলাম, বাবাঃ!...''

তৃতীয় পর্যায়

॥ ১ ॥

গিরিবালার পাণ্ডুল হইতে প্রথমবার বেলে-তেজপুরে আসার কথা বোধ হয় পূর্বে কোথাও বলিয়া থাকিব।

বৈকাল বেলা। দুই বাড়িরই পুরুষেরা বাহিরে। আশ্বিন শেষের পড়ন্ত রোদে কয়েকজন উঠানের মাঝখানে শানের উপর বসিয়া আছেন ;—বসন্তকুমারী, বরদাসুন্দরী, নিকুঞ্জলালের স্ত্রী, পাড়ার আরও কয়েকজন স্ত্রীলোক। গ্রামে একটা যাত্রার দল আসিয়াছে, হারাণের এক দূর সম্পর্কের সম্বন্ধী তাহাতে দোয়ারকি গায়। তাহাকে আনিয়া হারাণের বৌ হাজির করিয়াছে, আগমনী ধরিয়াছে—

মা, গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী।
লয়ে যুগল শিশু কোলে, 'মা কৈ মা কৈ' বলে,
ডাকছে মা তোর শশধরবদনী।
মাগো ত্রিভুবনে মান্যে, ত্রিভুবনে ধন্যে।
তোর মেয়ে সামান্যে নয় গো রাণি...

অতি সুমিষ্ট করুণ গলায় সুরটা টানিয়া তুলিয়াছে, চার বৎসরের দেশান্তরিতা কন্যার বিচ্ছেদ-বেদনায় দুই জায়ের চক্ষু সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে "জেঠাইমা কই গো?" বলিয়া শশাঙ্ককে কোলে করিয়া গিরিবালা সদর দুয়ার পার হইয়া উঠানে পা দিলেন। এত পরিবর্তন, তাহার উপর আবার যোগাযোগটা এতই বিস্ময়কর যে, প্রথমটা কেহই যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সকলেই মুখে একটিমাত্র ভাব ফুটাইয়া চাহিয়া রহিলেন। কথা কহিল প্রথমে হরিচরণ, সে উঠানের একপার্শ্বে বেড়ার ধারে কী একটা গাছ পুঁতিতেছিল, "দিদি যে গো! ওমা খোকা!"—বলিয়া ছুটিয়া আসিল।

গিরিবালা ততক্ষণে শিশুকে কোলে লইয়াই জেঠাইমাকে প্রণাম করিতে ঝুঁকিয়াছেন। একেবারেই মাকেও এবং গুরুস্থানীয়া আরও দু'একজনকে যতক্ষণে প্রণাম করিয়া উঠিলেন, ততক্ষণে ইঁহাদের ঘোরটা কাটিয়াছে। বসন্তকুমারী রুদ্ধকণ্ঠে শুধু—"মনে পড়লো মেয়ের!"—বলিয়া গিরিবালাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বরদাসুন্দরী শশাঙ্ককে কোলে করিয়া—অশ্রু-সিক্ত-মুখে কয়েকটি চুম্বন করিয়া বলিলেন—"কী চমৎকারটি হয়েছে রে!"

বিপিনবিহারী পাল্‌কি হইতে জিনিসপত্র দেখিয়া শুনিয়া নামাইতেছিলেন, এমন সময়, কাহার মুখে খবরটা শুনিয়া অন্নদাচরণ বারোয়ারিতলা হইতে দ্রুতপদেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহারা দুইজনেই ভিতরে আসিয়া পড়ায় কন্যার সঙ্গে প্রথম মিলনটা নীরব এবং উচ্ছ্বাসহীনই রহিয়া গেল। বিপিনবিহারী অগ্রসর হইয়া শাশুড়ীদের পদস্পর্শ করিলেন। "ওঁকে জিগ্যেস করো বাড়ির সব ভালো তো?—বেহাই, বেয়ান, ছেলেমেয়েরা..."— স্বামীর আড়াল দিয়া বসন্তকুমারী নিজেই অস্ফুটস্বরে প্রশ্নাদি করিলেন। উত্তর দিয়া বিপিনবিহারী জেঠশ্বশুরের সঙ্গে ঘরে গিয়া উঠিলেন।

ওঁরা সব জড়ো হইয়াছেন রসিকলালের ঘরের দাওয়ায়। উল্লাসটা কোন্ পথে যে আত্মপ্রকাশ করিবে যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। গিরিবালা বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন—"আয় নন্তী!—নন্তীটা কত বড় হয়ে গেছে মা? কে বলবে যে..."

একে উচ্ছ্বসিত প্রকৃতির মানুষ, তায় প্রথম ঝোঁকে বাধা পাইয়া বসন্তকুমারী হাঁপাইয়া উঠিতেছিলেন, উত্তর করিলেন—"না, তুমি সব ভুলেভালে সেখানে মাথার চুল পাকাও, আর এখানে যে যার বয়েস আঁকড়ে ব'সে থাক্— ! বাবাঃ, আজ গেছে?—পণ্ডিতমশাই যে বলেছিলেন—হুট বলতেই মেয়েকে দেখতে পাবে না, তা কি এমনি করেই ফলতে হয় কথাটা গা!...দে ছোটবৌ, দেখি তো..."

খোকাকে বরদাসুন্দরীর হাত হইতে লইলেন, চোখ বড় বড় করিয়া মুখের পানে চাহিয়া ঠাট্টার ভঙ্গিতে মাথাটা একটু দুলাইয়া বলিলেন—"ইস্, বড় কত্তা কী হয়েছেন! —কী কেশের বাহার! কি রং!...কত বয়স হল নটবরের—এগারো মাস না?"

গিরিবালা একটু লজ্জিতভাবে পুত্রের পানে আড়ে চাহিয়া বলিলেন—"জানি না বাপু এগারো মাস কি এগারো বছর—চিৎকারের চোটে মাথারই ঠিক থাকে না, তা বয়সের হিসেব রাখবে!"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"এগারো মাসই হল, আমার ঠিক হিসেব আছে ; গেল কার্তিকের সাতাশে..."

প্রতিবেশিনীদের মধ্যে একজন ঠাট্টা করিয়া বলিল—"ওরে বাস্‌রে, তুমি যে একটি একটি করে দিন গুনছিলে গো!"

এক ঝলক হাসি উঠিল। গিরিবালা আর একবার পুত্রের পানে চাহিয়া বলিলেন —"বাজে কথা রেখে কাজের কথা বলো দিকিন আগে, আমি তো হাঁপিয়ে উঠেছি ; —পণ্ডিত ঠাকুরদা কেমন আছেন!—ঠাকুরমা, ঘোষাল-ঠাকুরমা, ও বাড়ির দামু পিসিমা —বাঃ, ও-বাড়ির পিসিমাকে তো দেখছিই না!"

নন্তীর মা বলিলেন—"তিনি তিত্থি করতে গেছেন।"

"কবে গেলেন?—বাঃ, আমি এদিকে এলাম, আর তাঁর তিত্থি করবার সময় হল! তারপর—চাটুয্যে খুড়ি কেমন আছেন?—আর—হ্যাঁ—হারাণের বৌ কেমন আছে মা?"

বরদাসুন্দরী বলিলেন—"ভালো আছে, দুটি ছেলে হল তার এদিকে।"

"অনেকদিন দেখিনি। বাবাঃ, সাঁতরায় আমায় কি জ্বালানটাই জ্বালিয়েছিল পোড়ারমুখী! আর—আর..."

হঠাৎ বিরক্তভাবে মুখটা কুঞ্চিত করিয়া লইয়া বলিলেন—"বাবার কি রুগী দেখা শেষ হবে না?" তাঁহার এই ব্যাকুল বিশৃঙ্খল ভাবটা সবাই স্মিতহাস্যের সহিত উপভোগ

BanglaBook.org

করিতেছিলেন, বসন্তকুমারী বলিলেন—"একটু গুছিয়ে বল্ দিকিন কার কথা আগে শুনতে চাস?"

বাপের প্রশ্ন কয়েকবারই হইয়া গেছে ইহার মধ্যে, গিরিবালার হাসি হাসি ভাবটা এক মুহূর্তেই অন্তর্হিত হইয়া গেল, চোখ দুইটি ডবডব করিয়া উঠিল, মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"গুছিয়ে বল্!...চারবচ্ছর বিদেয় দিয়ে ভুলে থাকলে..."

পাশেই নন্তীর মা, কান্নাটা সামলাইতে না পারিয়া তাহার কাঁধে মুখটা গুঁজিয়া চাপাকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, সবার মধ্যেই একটা থমথমে ভাব আসিয়া পড়িল। দুই জাও চোখে অঞ্চল দিলেন। সহানুভূতিতে আরও কয়েকজন অঞ্চল তুলিল, একজন দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—"মা জেঠাইয়ের কি সাধ মা? তায় আবার অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে..."

আনন্দের মিলন, অশ্রু বেশিক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। বসন্তকুমারী অশ্রু মুছিয়া বলিলেন—"ঠাকুরপো এই এলেন বলে। খবরটা দেওয়া থাকত, তাহলে কি বেরুত আজকে?"

গিরিবালা ধরা গলায় বলিলেন—"বয়ে গেছে খবর দিতে তাঁদের, পিঁজরের পুরে রাখতে পারলেই হল।"

আবার বুঝি ভেজে চোখ, বুদ্ধিমতী গোছের একজন প্রতিবেশিনী বলিলেন—"সেখানকার কথাও একটু বল দিকিন শুনি, বেলে-তেজপুর তো আছেই।...ভয়ঙ্কর নাকি কড়াক্কড়ি পর্দার—বাইরে বার হবার জো নেই? আর বড্ড নাকি শীত—শীতকালে নাকি জল পর্যন্ত জমে যায়?"

"বাবাঃ। সে দেশের কথা আর তুলো না খুড়িমা, ভাবতেও যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। চারটি বচ্ছরের মধ্যে...কেউ না হয় জেঠামশাইকেও ডেকে দিক না, সাতু এরা কোথায় গেল?...নন্তী, তুই-ই না হয় যা না ভাই!"

নন্তীর মা বলিলেন—"জামাই একলা থাকবেন?"

"আর আমি যে..."—বলিয়া বেশ মুখনাড়া দিয়াই গিরিবালা কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় হরিচরণ সাতকড়ি, আর কিশোরকে লইয়া উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল; কখন ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া দুইজনকে খুঁজিয়া পাতিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে।

আরও চার বছর বয়স বাড়িয়াছে বটে কিন্তু সাতকড়ির মুদ্রাদোষটা এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই; সেকেন্ড কয়েক বিস্মিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চক্ষু বড় বড় করিয়া বলিল—"উরে ব্বাসের, দিদি!—দিদির ছেলেটাও এসেছে! কী টকটকে রং!..."

তাহার ধরনটা দেখিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালা বলিলেন— ওকে আমি কোথায় রেখে আসতাম বল তো জেঠাইমা? একটুও বদলালো না সাতকড়ি।"

এমন সময় বাহিরে ঘুড়ীটা শব্দ করিয়া উঠিয়া রসিকলালের আগমন ঘোষণা করিল। তিনজনেই পড়ে তো মরি করিয়া খবরটা দিতে বাহিরে ছুটিয়া গেল। "দেখি, বাবা এলেন বুঝি।"—বলিয়া গিরিবালা উঠয়া পড়িলেন। বসন্তকুমারী একটু চাপা গলায় বলিলেন—"ঘরে জামাই রয়েছেন।"

"থাক্, তা বলে আমি এখানেও পা মুড়ে বসে থাকতে পারব না। আমি এদিকটা

দিয়ে ঘুরে যাচ্ছি।”—বলিয়া সামনে দিয়া না নামিয়া দাওয়ার পাশ দিয়া নামিয়া গেলেন। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া যান ছেলেবেলার মতো, কিন্তু হঠাৎ অনুভব করিলেন পা যেন আড়ষ্ট হইয়া গেছে ; এমন কি চৌকাঠের বাহিরেও যে পা দিবেন সেটুকুও হইয়া উঠিল না। পাগুলের অভ্যাসমতই চৌকাঠের কাছে গিয়াই গতিবেগটা আপনা হইতে নিঃশেষ হইয়া গেল। প্রতিপদেই উৎসাহে-কুণ্ঠায় যেন ঠোকাঠুকি হইতে যাইতেছে। কথা পর্যন্ত আগে রসিকলালই কহিলেন—“গিরি!—তুই কখন এলি গো?”

গিরিবালা ঈষৎ হসিয়া বলিলেন—“আজ নয়। তোমার রুগী দেখা আর শেষ হয় না বাবা। দাঁড়াও একটু।”

প্রণাম করিয়া উঠিতে হারাণ আসিয়া সামনে দাঁড়াইল, বলিল—“দাঁড়াও দিদিমিণি, একটু পায়ের ধূলা নেব।”

গিরিবালা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“ওমা, শোন কথা বাবা, হারাণ বলে আমার পায়ের ধুলো নোব!”

হারাণ ততক্ষণে ঝুঁকিয়া পদস্পর্শ করিয়া উঠিয়াছে, বলিল—“তা নোব নি?—কি লক্ষ্মী প্রীতিমের মতো রূপ হয়েছে তোমার দিদিমণি!”

রসিকলাল হাসিয়া গিরিবালাকে বলিলেন—“তা তোর একটু কেমন ঠেকবেই, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, কিন্তু...দেখো, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি—আমার স্যাঙাৎ কোথায়? আগে তার সঙ্গে মোলাকাতটা করি—তোর ছেলের কথা বলছি গো...”

সাতকড়ি প্রভৃতি ‘স্যাঙাৎ’ ‘মোলাকাত’ কোন কথাটাই বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ভাবে চাহিয়াছিল, ছেলের উল্লেখেই আবার হুড়াহুড়ি করিয়া তাহাকে লইয়া আসিতে ছুটিল। গিরিবালা লজ্জিতভাবে একটু দৃষ্টি নত করিয়া অভিমানের সুরে বলিলেন—“আমি যে এতদিন পরে এলাম খোঁজই নেই,—নাতির জন্যে...যাও বাবা!...”

একটু চাপা হইলেও বসন্তকুমারীর গলাটা স্পষ্টই শোনা গেল— “ঠাকুরপোর আগে মেয়ের সঙ্গে শলা-পরামর্শ করে নিয়ে তবে বাড়ির চৌকাঠ টপকাবার পুরনো অব্যেসটা গেল না নাকি এখনও গো?”

মেয়েদের মধ্যে একটু হাসির শব্দ উঠিল। লজ্জিত হইয়া গিয়া রসিকলাল প্রকৃতই এমনভাবে কন্যার পাশে পাশে প্রবেশ করিলেন যে, সত্যই পাঁচসাত বৎসর পূর্বেকার কোন একটি দিনের কথা মনে পড়িয়া যায়।

সাতকড়ি আনিয়া খোকাকে হাজির করিল, স্পর্শ-গৌরবের জন্য হরিচরণ তাহার একটা পা ধরিয়া আছে। একটা কিছু বলিবার গৌরবটা কিন্তু অর্জন করিল কিশোর ; চোখ বড় করিয়া বলিল—“ছ'টা দাঁতও হয়েছে!”

কোলে লইতে লইতে রসিকলাল বলিলেন—“তবে আর কি, এবার আমার ঘুড়ীটাকে বিদেয় করে দি...”

বসন্তকুমারী ঠোঁট চাপিয়া হাসিয়া বলিলেন—“মরছি না, কে কাকে ঘোড়া করে দেখতেই পাব!”

আবার একটু চাপা হাসি উঠিল। খোকাকে একবার একটু দূরে ধরিয়া দেখিয়া লইয়া রসিকলাল বুকে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন—“কী সুন্দরই হয়েছে গো, আর শান্তও তো!”

BanglaBook.org

কোলে লইয়াই নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াইলেন। বলিলেন, "আয় গিরি গল্প করি...বিপিন কোথায় বৌদি?"

নূতন মায়ের অনুভূতি, মনের কোন্ গভীরে গিয়া যে দোলা দেয় কে বুঝিবে? খানিকক্ষণ সে অনুভূতিকে চাপা দিবার কোন কথাই যোগাইল না গিরিবালার, তাহার পর রসিকলাল ঘরের দিকে খানিকটা আগাইয়া গেলে একবার একটু ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিয়া লইয়া, মাথায় ছোট্ট একটি ঝাঁকানি দিয়া অনুযোগের সুরে বলিলেন—"হল, গিরির আদর উঠল বাড়ি থেকে। এমন জানলে তাঁদের কাছেই রেখে আসতাম আমি, আনতাম নাকি ঘাড়ে করে বয়ে?"

॥ ২ ॥

স্বপ্ন অনেক সময় প্রত্যক্ষের ঠিক বিপরীত গতি লইয়া চলে। সকালবেলার দিকে গিরিবালা স্বপ্ন দেখিতেছিলেন শ্বশুর পাণ্ডুল থেকে লইতে আসিয়াছেন। খজনীর পরামর্শেই গিরিবালা পালঙ্কের পায়াটা জড়াইয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছেন, শ্বশুর অনেক চেষ্টা করিয়া হার মানিয়া খোকাকে লইয়া চলিয়া গেলেন।...তারপর খোকাকে ব্যাকুলভাবে খোঁজাখুঁজির একটা অত্যন্ত গোলমেলে আর কষ্টকর ব্যাপারের পর গিরিবালা পাণ্ডুলে আসিয়া উঠানের মধ্যে দাঁড়াইলেন।...পাণ্ডুলের দেয়ালগুলি কী উঁচুই করিয়া দেওয়া হইয়াছে! —যেখানটা দুয়ার ছিল সেখানটা পর্যন্ত দেয়াল!...

ঘুমটা ভাঙিয়া গিয়া খানিকটা পর্যন্ত মাথাটা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বাস্তব জাগিয়া উঠিল—বেলে-তেজপুর—মোটে কাল তো আসিয়াছেন, থাকার এখনও সমস্তটাই বাকি। আর এ থাকার সমস্তটাই মুক্তি ; চলার মুক্তি, বলার মুক্তি, হাসার মুক্তি...এখনও সমস্ত জিনিস দেখিতে বাকি আছে, চার বৎসর পরে কত পরিবর্তন হইল।

ঘুমন্ত খোকার মুখে জানালা দিয়া নূতন রৌদ্র আসিয়া পড়িয়াছে।...কী ভয়ঙ্কর স্বপ্ন!...গিরিবালা খোকার কেশবহুল মাথা ধীরে ধীরে ডান হাতে চাপিয়া চুমু খাইলেন ; ভিতর থেকে যেন কান্না ঠেলিয়া ওঠে, মনে মনে বলেন —"হে ঠাকুর, আমি যেন খোকাকে হারাবার এরকম স্বপ্ন দেখি না কখনও, তাহলে ঘুমের মধ্যেই মরে থাকব...হে মা সিংহবাহিনী!..."

প্রভাতের স্ফুটমান আলোয় রাত্রের ভয়টা কিন্তু একটু একটু করিয়া একেবারে কাটিয়া যায়। এই কয়েকমাস লইয়া যে মায়ের জীবন সেটা যেন আর সব কিছু থেকেই বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহাদের দুইটিকে ঘিরিয়া ফেলে—কালকে খোকার নূতন আদরের ছবিগুলি সুদ্ধ। বুকে খোকাকে চাপিয়া নিঝুমভাবে পড়িয়া থাকেন। তন্দ্রায় একটা অদ্ভুত মিষ্ট আর ফিনফিনে হাল্কা গোছের স্বপ্ন স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে—তিনি খোকা—কি এক অদ্ভুত ধরনের আলো—শুধুই আদর —এমন সময় তন্দ্রাটা ভাঙিয়া গেল, কিশোর দরজায় অল্প ঘা দিয়া ডাকিতেছে —"দিদি, দিদি, তোর খোকা ঠাকুর দেখতে যাবে না?"

খোকাকে কোলে লইয়া গিরিবালা বাহিরে আসিলেন, কিশোরের কোলে দিয়া বলিলেন—"যা ইচ্ছে কর ভাগ্নেকে নিয়ে, মস্তবড় সম্পত্তি হয়েছে! আমি দায়ে খালাস বাপু। তুই যখন পারবিনি সামলাতে কিশোর, জেঠাইমার কাছে দিয়ে দিস—বেশ তো?

BanglaBook.org

আমার অনেক কাজ আছে ভাই।"

দাদাদের আওতায় থাকিলে কিশোর মুখ খুলিবার তত সুযোগ পায় না। এখন একা, খোকার মাথাটা নিজের কাঁধে একটু চাপিয়া বলিল—"হুঁঃ, একে সামলানো ভারি তো শক্ত!"

গিরিবালা মাথা একটু দোলাইয়া বলিলেন—"এখনও নিজরূপ ধরেননি তাই; খজনীর অমন গতর তো, হিমসি খাইয়ে দিত!"

কিশোর চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইল; কৌতুকদীপ্ত চোখে চাহিয়া বলিল—"খজনী কে? ওমা; কী নাম তোর শ্বশুরবাড়িতে সবার দিদি!—খজনী!—খজুনী বাজায় নাকি বসে বসে?"

"ওর দাসী। বাবুর পেছনে একটা গোটা দাসী আছে—নবাবি কত!"

খোকার গাল দুইটা টিপিয়া ধরিয়া—"নবাবি কত!—নবাবি কত!" বলিয়া চোখ পাকাইয়া নিজের মাথায় ঝাঁকানি দিতে খোকা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। "যাই, তোমার সঙ্গে হুরুদ্দুম করলে চলবে না আমার!"...বলিয়া গিরিবালা চলিয়া গেলেন।

তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধোয়া সারিয়া, আধ ঘন্টার মধ্যে তৈয়ার হইয়া বাহিরের দিকে যাইতেছেন, বরদাসুন্দরী প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় চললি এত সকালে?"

"দ্যাখো, পেছনে ডেকে দিলেন!"

"মায়ে ডাকলে দোষ নাই। কিন্তু চলিল কোথায শুনি?"

গিরিবালা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"অনেক জায়গায়; নন্তীকে সঙ্গে করে।"

"শোন, দু'দিন পরে দেখাশোনা করে বেড়াবি'খন; জামাই রয়েছেন, কোথাও দেখে ফেলবেন—পথে ঘাটে..."

"বেরুতে জিও না মা।"—কাতরভাবে একবার ঘাড় কাত করিয়া আবার অগ্রসর হইলেন।

"শোন কথা মেয়ের। ওর জন্যে জামাইকেই বেরুতে দোব না।" বলিয়াই ব্যবস্থাটার অপরূপত্বে বরদাসুন্দরী হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"কিছু মুখে দিয়ে বেরো গিরি, নৈলে দিদি উঠে আমার আর কিছু..."

"নন্তীদের বাড়িতেই খেয়ে নোব।"

বরদাসুন্দরীকে সদর পর্যন্ত যাইতে হইল। বলিলেন—"আর ফিরবি শীগ্‌গির, রোদ কড়া না হতেই; বেশি দূর যাবি নি।"

গিরিবালা ঘাড় নাড়িয়া নিকুঞ্জলালের বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন।

পৌঁছিয়া দরজার বাহির হইতেই ডাকিলেন—"কি লো নন্তী, কী কচ্ছিস?"

চার বৎসর পরে এই প্রথম মুক্তকণ্ঠের আওয়াজ, বিপিনবিহারী থাকায় বাড়িতেও ততটা সম্ভব হয় নাই। ভরাট আওয়াজটা নিজের কানেই যেন অপূর্ব ঠেকিল গিরিবালার, যেন হারাইয়া যাওয়া একটা জিনিস হঠাৎ ফিরিয়া পাইয়াছেন। একটু দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাহার পর কণ্ঠের আনন্দের জন্যই আবার ডাকিলেন—"জেঠাইমা উঠলে নাকি গো?"

নন্তী ওঠে নাই এখনও, জেঠাইমা খিড়কির দিকে, কাহারও উত্তর পাওয়া গেল না। —"এঁদের এখনও রাতদুপুর নাকি?"—বলিতে বলিতে চৌকাঠটা পার হইয়াছেন, পাশের পড়ো জমিটার পরেই চাটুয্যেদের বাড়ি থেকে গিন্নির গলার আওয়াজ আসিল —"কে গো, আমাদের গিরির গলা না?"

BanglaBook.org

দেখা যায় না, একটু দূরেই পড়ে, কথা হইতে লাগিল কিন্তু—"হ্যাঁ গো ঠাকুরমা, গিরি।"

"শুনলাম কাল এয়েছিস ; কাল আর হয়ে উঠল না, আজ যাব বিকেলে পাট-সাট সেরে। আছিস কেমন?"

লোক জাগার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীটা ক্রমশ মুখর হইয়া উঠিতেছে—মুক্তকণ্ঠের পরিচিত বাংলা কথা—কেউ ডাকে, কেউ উত্তর দেয়, কেউ বকে ; কাহারও বাড়িতে শিশু বোধ হয় কী অনিষ্ট করিয়াছে—একটি কিশোরীকণ্ঠে টানা ভর্ৎসনার স্বর উঠিল—"ও—মা—গো!' —বোধ হয় বোন, রাগের কথায় স্নেহের ঝঙ্কার ছিটকাইয়া পড়িতেছে।...বিদ্যুৎ-ছবির মতো চার-পাঁচটি অর্ধবাক্ অন্তঃপুরিকা লইয়া পাণ্ডুলের বাড়িটি একবার মনে পড়িয়া গেল।

গিরিবালা বলিলেন—"আছি ভালো ঠাকুরমা, আমিও আসছি একটু পরে।"

"আয় ; কতদিন দেখি নি যে তোকে।"

নন্তীর মা রাইমণি বাড়ির মধ্যেই কাহার প্রশ্নে উত্তর করিলেন—"আমাদের গিরি, গো, কাল এল যে।"

গামছা নিংড়াইতে নিংড়াইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, বলিলেন—"বোস্ গিরি, উঠ্‌ল না নন্তীটা এখনও? কাল রাত্তিরে বলা হল সক্কালেই গিরিকে নিয়ে..."

একেবারে ও-প্রান্তের ঘর থেকে চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নন্তী বাহির হইয়া আসিল, একটু হাসিয়া রাগের ভান করিয়া বলিল—"ওর সকাল যে কাক-কোকিল না ডাকতেই হয় কে জানবে বলো?"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"না, মাথার ওপর সূয্যি এলে হবে! দু'চোখ বোজ ভালো করে, সক্কালবেলা একচোখ দেখিয়ে ঝগড়া করতে করতে উঠল দেখো না!...ঝট করে নে।"

নন্তী উঠানে নামিতে নামিতে বলিল—"হবে না ঝগড়া? নিজের মুখেই এই স্বীকার করছিস সক্কালবেলা উঠলাম, আবার ওদিকে দুপুর হয়ে বলে বদনাম..."

"যা শীগ্‌গির—নয় তো..." বলিয়া গিরিবালা ধমকাইয়া উঠিলেন।

নন্তীর তৈয়ার হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না, কিন্তু যাওয়া সঙ্গে সঙ্গেই হইল না। এইবার দুইজনে বাহির হইবেন, রান্নাঘর থেকে নন্তীর মায়ের আওয়াজ আসিল,—"গিরি, একটু কিছু মুখে দিয়ে যাবি, রোস।"

গিরিবালা—"ওমা।" বলিয়া বিস্মিতভাবে নন্তীর পানে চাহিলেন। তাহার পর গলা তুলিয়া বলিলেন—"আমি যে খেয়ে বেরুলাম।"

উত্তরটা কী হয় শুনিবার জন্য মাথাটা একটু ঝুঁকাইয়া কান পাতিয়া রহিলেন। রাইমণি বলিলেন,—"মিছে বকিস নি।...এখুনি হয়ে গেল আমার।"

গিরিবালা নিম্নস্বরে নন্তীকে বলিলেন—"শুনে ফেলেছেন রে!"

রান্নাঘরের সামনে আসিয়া রাইমণিকে বলিলেন—"শুনে ফেলেছ বুঝি? আমি রেহাই পাবার জন্যে মাকে বললাম, কে জানে বাপু তুমি খিড়কির দোরে কান পেতে আছ!...আর একি কাণ্ড!"

"না শুনলে যেন দুটো ভেজে দিতে নেই!...নে হাতেনাতে সেরে নে দিকিন। তুই পটল ক'খানা কুটে ফেল, নন্তী ময়দাটা মাখ।...দাঁড়া, দুটো কেলেজিরে এনে দিই ; এই

BanglaBook.org

সঙ্গে গোটাকতক নিমকিও করে দিই, গিরি ভালোবাসে। তোরা নে, আমি ততক্ষণ হালুয়াটা করে নিই...”

“তবেই বেড়ান হয়েছে! আমার ওদিকে পা নিস্‌পিস্‌ করছে!”

রন্ধন আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে গল্প হইতে লাগিল। নন্তীর বিবাহাদির কথা কাল শুনিয়াছিলেন, তাহারই জের তুলিলেন,—‘হ্যাঁগা জেঠাইমা, দুই বোনের কি সব উল্টো হতে হয়? এদিকে বিধেতার অবিচার! আমায় সেই কোন্‌ ধাড়-ধাড়া গোবিন্দপুর পাঠিয়ে দিয়ে, নন্তীর শ্বশুরবাড়ি করলেন কিনা ঠিক বাড়ির কানাচেই...”

নন্তী মুখ তুলিয়া টিপ্পনী করিল—“হিংসে হয় গিরিদির।”

গিরিবালা বেলন থামাইয়া বলিলেন—“ওমা, হবে না? দু’বেলা মায়ের আদর খাচ্ছিস, আর মা বাপ যে কী জিনিস আমি এদিকে ভুলে যেতেই বসেছি।”

রাইমণি খুন্তিসুদ্ধ মুঠাটা কপালে চাপিয়া ফিরিয়া বসিলেন, বলিলেন,—“সুবিধে আছে বৈ-কি, নেই কেমন করে বলি। কোশ দুয়েকও নয়; খবরটা-আসটা নিত্যই পাই, পাঠানতেও তেমন কড়াক্কড়ি নেই। কিন্তু ঐ মস্ত বড় দোষ—খোকাটাকে কোনমতেই পাঠাতে চাইবে না। নেহাত যদি পাঠালে তো দুয়েক দিনের বেশি রাখবে না...”

গিরিবালা বলিলেন—“শুনলাম। তাই তো ভাবছিলাম—থাকে কেমন করে নন্তীটা।” লজ্জিত হইয়া মাঝখানেই চুপ করিয়া গেলেন।

নন্তী বলিল—“ওর ঠাকুরমা যে ভয়ঙ্কর ভালবাসে, একদণ্ডও চোখের আড়াল...”

রাইমণি মৃদু ধমক দিয়া উঠিলেন—“চুপ কর, শাশুড়ীর হয়ে আর ওকালতি করিস নি তুই।...হ্যাঁরে গিরি, ঠাকুমাই সব, দিদিমা কেউ নয়? একটু কাছে কাছে রাখতে ইচ্ছে করে না তার?...‘বড় হয়েছে—দু’ বছরের হয়েছে—এখন তার মা ছেড়ে থাকার কষ্ট কি?’ শুনে রাখিস্‌ গিরি,—দু’বছরের শিশু, সে হল মস্ত বড়, তার আর মা ছেড়ে থাকতে কষ্ট হবার কথা নয়!...”

গিরিবালার মনে একটা অন্তঃসলিলা বহিতেছিল—কথাগুলো ভাসা ভাসা কানে আসিতেছে; তাহার পাশেই জাগিয়া উঠিতেছে—খোকা, শ্বশুরবাড়ি, শ্বশুরের অসম্ভব রকম আদর...খোকা বড় হইলে তাহারও নন্তীর অবস্থা করিবেন নাকি?—নন্তীর তবুও তো হাতের কাছেই, তাহার যে একবার গেলে চার বৎসরের ব্যবধান হইয়া যায়...”

রাইমণি শুনিবার লোক পাইয়া বেহানের উপর কতকটা আক্রোশেই বলিয়া যাইতে লাগিলেন—“হক্‌ কথা বলব বাপু, তা যেই যাই মনে করুন; নিজেকেও কিছু বাদ দিয়ে বলছি না; হাজার বলি আমি দিদিমা, আমার বাড়া কেউ সোহাগ করতে পারে না, —তুমি হাজারই বল—তুমি ঠাকুরমা, বাপের মা, গুরুর গুরু—নাতি তোমার নয়নের পুতুলি—হ্যানত্যান—কিন্তু মায়ের কাছে কেউ নও বাপু;—তুমি নয়, আমিও নয়। তার কাছ থেকে কি আলাদা রাখা উচিত কচি ছেলেকে?...কিগো গিরি, মিথ্যে বলছি?”

ওদিকে অন্তঃসলিলা বহিতেছে—ভোরে অমন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন কেন গিরিবালা? সত্যিই শ্বশুর নাতির জন্য ছুটিয়া আসিবেন না তো?—বলে, ভোরের স্বপ্ন নাকি ফলে...অন্যমনস্কতার মধ্যে রাইমণির কথার সবটা ধরিতে পারেন নাই, গিরিবালা কোনরকম একটা উত্তর দিবার জন্যই বলেন—“লোক কী রকম এদিকে?”

“লোক যে নিতান্ত মন্দ বলব তা না। তবে ঐ, আমি হচ্ছি শাশুড়ী, আমার কথার

কাছে কার কথা? দিদি থাকলে তবুও মাঝে মাঝে আনে ছেলেটাকে—রাশভারী মানুষ তো?...আমায় তো গেরাহ্যির মধ্যেই আনে না, এই দেড়মাস গেছেন দিদি, একটিবার পাঠিয়েছিলেন এর মধ্যে।...কে জানে বাপু,—বৌয়ের শাশুড়ী হবার ভাগ্যিও হল না...”

নন্তী হঠাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠে।

রাইমণির হুঁস হয়—বেহানের প্রতি মনের রাগ আর ঈর্ষাটা একটু বেশি করিয়াই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে, প্রশ্ন করেন—“হাসলি যে?”

হাসার কারণটাও ওই। আসলে শাশুড়ীটি তাহার বড় ভালোই—আর যাই দোষ, শাশুড়ীগিরি ফলাইবার দোষটা মোটেই নাই। নাতি লইয়া একটু দুর্বলতা আছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে এও আছে যে, নাতি ঠাকুরমা ছাড়া একদণ্ডও থাকিতে পারে না। নাতির এ দোষটা ভুলিয়া সুবিধা পাইলে রাইমণি তাহার ঠাকুরমাকে লইয়া পড়েন। অশোভন হয় বলিয়া নন্তী অনেক কষ্টে হাসি চাপিবার চেষ্টা করে, না পারিলে একটা মনগড়া জবাবদিহি দিয়া দেয়। বলিল—“হাসব না গিরি-দি? মার এখন ইচ্ছেটা আমি মেয়ে না হয়ে ছেলে হতাম, উনি ঘরে বৌ এনে খুব শাশুড়ীগিরি ফলাতেন—ছেলে আটকে রেখে, বৌকে বাপের বাড়ি যেতে না দিয়ে...”

রাইমণি কৃত্রিম রাগের সহিত অল্প হাসি মিশাইয়া বলেন—“তাই যেন করতাম! —সবাই তোর শাশুড়ীর মতন কিনা!...তোর শ্বশুরবাড়ির গল্প বল গিরি—হ্যাঁরে, সত্যিই বাড়ির বাইরে পা বাড়াতে দেয় না? কোথায় বাপ মা —এমন দেশও আছে ভূ-ভারতে?”

ভাসমান লুচির উপর ঝাঁজরা দিয়া গরম ঘি ছড়াইয়া ঝাঁঝরা তুলিয়া ঘুরিয়া বসেন।

জলখাবার শেষ হইতে, আহার করিতে দেরি হয়, সঙ্গে সঙ্গে পাণ্ডুলের গল্প চলে। রাইমণি মাঝে মাঝে এক একটা প্রশ্ন করেন—“হ্যাঁলা, সত্যি মা জানকীর দেশ? তবে অমন কেন? তাঁর কেউ আছে বেঁচেবর্তে এখনও?...পঞ্চাশটা ঐ আম খেয়ে ফেললে! তোর শ্বশুর পাঠিয়েছিল, খেলাম কিনা, একটা সামলাতেই হিম-সিম খেয়ে যেতে হয়...”

ছুতোর পাড়ার ভূত-খেলান, খজনীর শ্বশুরবাড়ি থেকে পালান, নীলকুঠির মেমসাহেবের ঘোড়ায় চড়া, একবার কুঠির একটি হাতী ক্ষেপিয়া কি দৌরাত্ম্য করিয়াছিল, এই সব অনেক কথাই হয়। গল্পের ঝোঁকে খাওয়ার পরও অনেকটা সময় গড়াইয়া যায়।

আঁচাইতে আঁচাইতে গিরিবালা হঠাৎ একবার উৎকর্ণ হইয়া ওঠেন। নন্তী প্রশ্ন করে —“কী হল?”

“না, আমি ভাবলাম খোকাটা বুঝি কাঁদছে!”

“না, চাটুয্যে গিন্নির নাতি।”

“তাই দেখছি। উনি কান্না ধরলে পাড়া মাথায় করতেন। কী চিলের মতো চিৎকার ভাই! পালাই পালাই ডাক ছাড়িয়ে দেয়।”

আসল কথা খোকা মনটা জুড়িয়া বসিয়াছে। এগারো মাসের মধ্যে এই প্রথম এক নতুন ধরনের অনুভূতি উদয় হইয়াছে গিরিবালার মনে—খোকা যে বরাবর তাঁহার কোলে কোলেই রহিয়াছে এমন নয়, বরং শ্বশুর, শাশুড়ী, ভাসুর, ননদ—এঁদের আদর কুড়াইয়া মায়ের কাছে খুব কম সময়ই থাকিতে পায় খোকা—তাহার উপর খজনী আছে, একবার যদি বাহির হইতে পারিলে তো ঘণ্টা দু'য়েকের কম বাড়ি ঢুকিতে জানে না—। কাজের

BanglaBook.org

মধ্যে এক একবার উদ্বিগ্নও হইয়া উঠেন গিরিবালা ; কিন্তু সে সবই এক অন্য ধরনের ব্যাপার। রাইমণির গল্প শোনার পর থেকে আজ যেমন হঠাৎ একটা হারাই-হারাই ভাব উঠিয়াছে, আর কখনও এমনটা হয় নাই। একটা অব্যক্ত বেদনা, কোন কারণ নাই, তবুও আয়োজন, আহার, গল্প—সব ঠেলিয়া প্রাণটা মাঝে মাঝে যেন আই-ঢাই করিয়া উঠিতেছে। কুণ্ঠার বশে পারিতেছেন না ; তবুও এক একবার মনে হইতেছে—দেখিয়া আসি খোকাটাকে।...আতঙ্কে, অনুকম্পায়, বেদনায়, বুক নিঙ্ড়ান স্নেহে—একটা মিশ্র অনুভূতি—তাহার মধ্যে ভোরের স্বপ্নটাও আছে, নন্তীর মা ছাড়া দুই বৎসরের শিশুটি আছে, এই নতুন জায়গায় আসিয়া কতকটা বিহ্বল ভাবাপন্ন খোকা আছে। একটা কথা মনটাকে যেন আরও ব্যথিত করিয়া তুলিতেছে—এর আগে তিনি থাকিতেন বাড়িতে, খোকা দূরে দূরে থাকিলেও যেন তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিত,—আজ তিনিই খোকাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন...

নন্তী পান সাজিতেছে। বারান্দায় দাঁড়াইয়া গিরিবালা ধারণাটাকে স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন—খোকাকে ছাড়িয়া আসা—কী করিয়া সম্ভব হয় সেটা ? খোকা রহিল বাড়িতে পড়িয়া, আর তিনি রহিলেন বাহিরে—কত দূরের দৌড়—ঘোষাল-ঠাকুরমার বাড়ি, আরও দূরে পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি, হাজার চিৎকার করিলেও সেখানে খোকার আওয়াজ পৌঁছিবে না।

খোকার কান্নার জন্য কানটা উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। চিন্তায় যেন ভয়ের জোয়ার আসিয়া কূল ছাপাইয়া উঠিতেছে—কত মায়ে তাহাদের খোকাদের ছাড়িয়া মরিয়াও তো যায়, যদি...

নন্তী আসিয়া পান দিতে একটু রাগের ভাব দেখাইয়া অনুযোগ করিলেন—"যা দেরি করলি তুই, জেঠাইমা আবার তাতে যোগ দিলেন। বেলা এদিকে চচ্চড় করে বেড়ে উঠেছে..."

"তাহলে ?"

"তাহলে আর কি?—বেশি দূর এবেলা আর যাওয়া চলবে?"

"কাজ নেই তবে ; আর মুখজ্জেমশাই রয়েছেন, ভালও হবে না বেশি দেরি করাটা ; কাছেপিঠে একটু দেখাশোনা করে বরং ফিরে চল্।"

সমর্থন পাইয়া গিরিবালা অন্তরে অন্তরে খুশি হইলেও, বাহিরে কপট রাগ দেখাইয়া বলিলেন—"থাম্, দেরি করিয়ে দিয়ে এখন গুরুঠাকরুন হয়ে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে!"

কাছেপিঠে থাকলেও একটু একটু করিয়া দলে পুষ্ট হইয়া এ-বাড়ি সে-বাড়ি ঘুরিতে বেশ অনেকখানি বেলা হইয়া গেল। বসন্তকুমারী একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"কতদূর গেছলি গো? যে দুটো দিন জামাই আছেন..."

গিরিবালা বলিলেন—"এইখানেই তো ছিলাম বাপু, না বিশ্বাস হয় নন্তীকে ডেকে জিগ্যেস্ করো।...না, দু'দিন আর কারুর কোথাও বেরিয়ে কাজ নেই!"

বসন্তকুমারী হাসিয়া বলিলেন—"তুই ঘুরিস না কত ঘুরবি, মায়ে-ঝিয়ে ঐ কাজই করব শুধু এর পর। নে, চুল খুলে চানটা করে নে তাড়াতড়ি, বেলা হয়ে গেছে। কচি ছেলে, মাকে শুকিয়ে থাকতে নেই।"

গিরিবালা খোকাকে খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু মুখ ফুটিয়া প্রশ্ন করিতে পারিতেছিলেন

BanglaBook.org

না, প্রসঙ্গটা ওঠায় অবহেলার স্বরে বলিলেন—"সেটা কোথায়? বাড়ি যে এখনও মাথায় করেনি?"

"কিশোর না কে বোধ হয় বাইরে নিয়ে গেল, তুই নিগে যা নেয়ে গিরি!"

অল্প ঘোরা হইলেও অভ্যাসের অভাবে একটু অবসাদ আসিয়াছে, তায় আশ্বিনের দিন, এমনিই একটু অবসাদ লাগিয়াই থাকে। বিপিনবিহারী, সাতকড়ি, হরিচরণ আরও পাড়ার কয়েকজনকে সঙ্গে করিয়া বড়-পুকুরে স্নান করিতে গেছেন, ফিরিতে বিলম্ব আছে, জেঠাইমার তাগাদা সত্ত্বেও গিরিবালা শিথিলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—নূতন-পুরাতন জিনিস সব দেখিয়া,—এটার কাছে দাঁড়াইয়া, ওটা পরীক্ষা করিয়া—কোনটাতে পুরাতন কোন স্মৃতি জাগাইয়া তুলিতেছে, কোনটা এই চার বৎসরের বেলে-তেজপুরের জীবনের নূতন ধরনের পরিচয় দিয়া কেমন একটা কৌতুক-মিশ্রিত বিস্ময় জাগাইতেছে। ...সাতকড়িকে লেখা তাঁহার একটি চিঠি হাতে পড়িল। পড়িতে লাগিলেন, পাণ্ডুল থেকে তাঁরই লেখা চিঠি বেলে-তেজপুরে আসিয়া তিনিই পড়িতেছেন—এমন অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। কবে লিখিয়াছিলেন? মনে পড়িতেছে একটু একটু,—দুপুরবেলা মেঝেয় বসিয়া লিখিতেছেন—পাশে খজনী নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে—খোকা আসিয়া দোয়াতটা উল্টাইয়া দিল—এই চিঠির কোণটায় খানিকটা কালির ছাপ রহিয়াছেও।

লেখাপড়ার কথা থেকে মনটা কী করিয়া বাবার পদ্য লেখার কথায় গিয়া পড়িল, এখনও লেখেন নাকি বাবা? সেই পেতেটা খুঁজিয়া বাহির করিলেন। সহজেই যে পাওয়া গেল এমন নয়, যখন পাওয়া গেল তখন তাহার বাহ্যশ্রী দেখিয়া গিরিবালার মনটা বিষণ্ন হইয়া গেল ; ধূলায়, মাকড়সার জালে সমাচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে পোকায় কাটিয়া এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া দিয়াছে, একটা সস্তা তালা লাগান, বোধ হয় তিনিই যে শেষবার লাগাইয়া গিয়াছিলেন আর খোলাও হয় নাই এই চার বৎসরে। মরিচা ধরিয়া একেবারে জীর্ণ হইয়া গেছে, একটু নাড়া পাইতে খুলিয়া গেল। ভিতরের অবস্থা দেখিলে যেন চোখ ফাটিয়া জল আসে—বাবা কি এ পাট একেবারেই উঠাইয়া দিয়াছেন?

অন্তরের সমস্ত দরদ ঢালিয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া গুছাইয়া রাখিতেছেন, একটা পদ্যে চোখ দুইটা হঠাৎ আটকাইয়া গেল। সেই বর্ষার পদ্যটা। গিরিবালা মনে মনে পড়িতে লাগিলেন—

অম্বর ঘিরি একি গম্ভীরে বাজে আজি
শাখে শাখে কদম্ব শিহরে,
শঙ্কর হর বুঝি ডম্বরু করে লয়ে
ভূতসাথে সদম্ভে বিহরে।
তাণ্ডবে ক্ষিতিতল টলমল টলমল...

সেইদিনটি সবসমেত আসিয়া তাঁহাকে যেন ঘিরিয়া ফেলিতেছে—সেই অবিশ্রাম বর্ষা, বাবার হাঁটু দুইহাতে জড়াইয়া তিনি মুখের উপর চোখ ফেলিয়া পদ্য শুনিতেছেন —বাবার মুখে যেন একটা নূতন আলো আসিয়া পড়িয়াছে— মা হঠাৎ সেই রান্নাঘর থেকে আসিয়া বকুনি, মুখের দীপ্তি যেন এক ফুৎকারেই নিবিয়া গেল—তাহার পর গিরিবালার সেই কান্না...

"কৈগো গিরি!" গিরিবালা বাল্যস্মৃতির ঘোর থেকে জাগিয়া উঠিয়া গ্রীবা ঘুরাইয়া

BanglaBook.org

বাহিরের দিকে চাহিলেন। জেঠামশাইয়ের কোলে ছোট একটি ছেলে, আপাদমস্তক রঙচঙে সাজে বোঝাই, সমস্ত উঠানটা যেন ঝলমল করিতেছে। "ওমা, কাদের ছেলে —কী চমৎকারটি দেখতে জেঠাইমা!" বলিয়া ছুটিয়া আসিতে আসিতে গিরিবালা চৌকাঠের কাছে লজ্জিতভাবে দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার দুয়ারের আড়াল হইয়া পড়িলেন। অন্নদাচরণ ডাকাডাকি করিতে কুণ্ঠিতপদে দুয়ারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ওদিকে বসন্তকুমারী রান্নাঘর থেকে বাহির হইয়াছেন, বরদাসুন্দরীও দুয়ারের আড়ালে দাঁড়াইয়া মুগ্ধনেত্রে নাতির পানে চাহিয়া আছেন। বসন্তকুমারী বলিলেন—"আমাদের বড়কর্তা! আমি বলি—কাদের চমৎকার ছেলের কথা বলে উঠল গিরি!...বাপরে, একবার দেমাকটা দেখো সায়েবের!"

গিরিবালা নতদৃষ্টি দু'একবার তুলিয়া দেখিলেন, গরবে লজ্জায় কী যে একটা অসহ্য অবস্থায় পড়িয়াছেন স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায় না। ঘরের দিকেই ফিরিয়া যাইতেছিলেন, অন্নদাচরণ প্রশ্ন করিলেন—"কিগো, পছন্দ হল কিনা জিনিসগুলো বললে না তো!"

গিরিবালা ভিতরে যাইতে যাইতে একটু ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, "ওকে ঐসব ভালো ভালো জিনিস দেয় নাকি জেঠামশাই?—তোমারও যেমন হয়েছে!...নিত্যি ছিঁড়ছে–মিছিমিছি কতগুলো খরচ..."

আড়াল হইয়া যেন বাঁচিলেন, কাগজগুলো গুছাইতে গুছাইতে কেবলই আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল—সেই খোকাই আজ সকাল থেকে চারিদিক দিয়াই নতুন হইয়া উঠিল কী করিয়া? এতদিন কি তাহা হইলে তাহাকে চোখ মেলিয়া দেখাই হয় নাই?

॥ ৩ ॥

বৈকালে অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল সকালই রোগী দেখা থেকে ফিরিয়া রসিকলাল উঠানে পা দিতে দিতেই বলিলেন—"কী যে বাই দাদার, সমস্ত দিন গিরির ছেলেটাকে একরাশ রংচঙে জামাকাপড় পরিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কী যে..."

ভাজ ছিলেন না, বরদাসুন্দরী ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিলেন—"আজ সকাল সকাল যে বড়?"

"ফিরলাম একটু সকাল সকালই। দাদার বাইয়ের কথা বলছিলাম,—নাতিকে একরাশ রংচঙে জামাকাপড় পরিয়ে..."

"না, নাতিকে কেন? তোমায় পরিয়ে পাড়ায় পাড়ায় দেখিয়ে বেড়াবেন!...নাতি হবে, মানুষের কত বড় একটা সাধ;—কথায় বলে আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি।"

"মিষ্টি তো, কিন্তু খরচের দিকটাও তো আবার দেখতে হবে; খুব কম করে ধরলেও ঐ একটি কচি ছেলের..."

বরদাসুন্দরী চোখ টিপিয়া হাত নাড়িয়া থামিতে ইশারা করিলেন, কী একটা বলিবার মতো করিয়া মুখ নাড়িয়া ওদিককার ঘরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। রসিকলাল কথা বন্ধ করার সঙ্গে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, কাছে আসিয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন —"জামাই আছেন নাকি?"

"গিরি!"

BanglaBook.org

রসিকলাল অপ্রতিভ হইয়া নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিলেন। বরদাসুন্দরীও পিছনে পিছনে আসিয়াছেন, হাত দুইটা পিঠের দিকে ঘুরাইয়া দুয়ারে ঠেস দিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন—"শুধু খরচ দেখলেই চলে? তোমারও তো দেওয়া উচিত।"

রসিকলাল মুখটা গোঁজ করিয়া জামার বোতাম খুলিতে লাগিলেন।

"উত্তর দিলে না যে?"

"দোব যে বোলছ..."

গিরিবালার কথা ভুলিয়া ঝাঁঝিয়াই উঠিতেছিলেন, সামলাইয়া লইয়া চাপা বিরক্তিতেই হাত নাড়িয়া গলা নামাইয়া বলিলেন—"দোব যে বোলছ—দেবার জায়গা রেখেছেন একটু-—পায়ে জুতো তার ওপর মোজা, তার ওপর নেকার-বোকার, তার ওপর টুপি, তার ওপর আবার..."

এতক্ষণে রাগের কারণ বুঝিতে পারিয়া, আর সেটা প্রকাশ করিবার ভঙ্গিতে বরদাসুন্দরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রসিকলাল বলিলেন—"হাসছ তুমি? হাতে চারগাছা করে চুড়ি পর্যন্ত উঠেছে, গোবিন্দ কাকার ওখানে দেখলাম যে। যেন খুঁজে খুঁজে কোথায় একটু খালি আছে কোন রকমে ভরতি করে দেওয়া। বলো না, বেটাছেলের হাতে চুড়ি পরায়?"

মুখের ভাবটা বদলায় না দেখিয়া বরদাসুন্দরী মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া আর একবার হাসিয়া উঠিলেন, তাহার পর "কি জ্বালা বাবাঃ!" বলিয়া হাসিটা সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"বড্ড আনন্দ হয়েছে—গিরির ছেলে, গিরিঅন্ত প্রাণ একেবারে। তা তুমি একসেট দিও না হয়।"

"থামো, তাহ'লে আর রক্ষে থাকবে না। বকুনির ধুম পড়ে যাবে—একসেট হয়েছেই, তার ওপর আবার একসেট কিনবার দরকার কী ছিল?—টাকা হয়েছে, ওদিকে সংসারের..."

বরদাসুন্দরী শান্তকণ্ঠে বলিলেন—"তাই কি পারেন কখনও বলতে?"

রসিকলাল নিঃশব্দে জুতাজামা খুলিলেন। মুখের ভাবটা নরম হইয়া আসিয়াছে; সোজা হইয়া একটু চুপ করিয়া বসিলেন; বরদাসুন্দরী স্বামীকে ভালো রকমেই চেনেন, বলিলেন—"কি যেন বলবে বলবে মনে হচ্ছে?"

"নাঃ, বলছিলাম—বিপিনকে দেখছি না, কোথায় গেলেন?"

"সাতকড়ি আর হরিচরণকে সঙ্গে করে বারোয়ারি তলার দিকে গেলেন।'

উত্তরটা দিলেন, কিন্তু বেশ বুঝিলেন স্বামীর মনে যে কথাটা তোলপাড় করিতেছে তাহা এ নয়। একটু আড়চোখে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। রসিকলাল যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—"ভাবছিলাম একটা কাজ করলে কেমন হয়—স্যাকরার দোকানে একটু কিছু ফরমাশ দিয়ে আসলে?..."

যেন অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছেন। বরদাসুন্দরী বলিলেন—"ভালোই তো, তাই না হয় দিয়ে এস না।"

রসিকলাল আবার রাগিয়া উঠিলেন, কণ্ঠটা যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিলেন—"আরে তারই কি যো আছে?—গিয়ে দেখি—একটা হারের ফরমাশ দিয়ে বসে আছেন। নাও, গলাটা খালি ছিল, সেটুকুও...কী দিই কী দিই করে শেষে একজোড়া বালার..."

স্বামীর বিপর্যস্ত ভাব দেখিয়া বরদাসুন্দরী এবারে একেবারে হাসিয়া উঠিলেন, পাছে

BanglaBook.org

জামাই বা কেহ আসিয়া পড়েন এই ভয়ে—“কী জ্বালাতেই পড়া গেল!” বলিয়া তাড়াতাড়ি ওদিককার ঘরে চলিয়া গেলেন।

গিরিবালা ঘর গুছাইতেছিলেন ; বাপের কণ্ঠস্বর শুনিয়া হাতের পাটটুকু ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিবেন, ছেলের উপর অতিরিক্ত খরচের অনুযোগে যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিবাহ হইয়া গেলেই মেয়ে একটু পর হইয়া যায়, তাহার উপর আবার তিনি চার বৎসর অনুপস্থিত ; বাবা, মা, জেঠাই—সবাই বাহিরে বাহিরে ঠিক সেইরকমই আছেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটুও বদলান কি সম্ভব নয়? লজ্জায় কুণ্ঠায় গিরিবালার যেন মাটিতে মিশাইয়া যাইবার ইচ্ছা হইল! আরও কিছু কথা হইতেছে কিনা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। তাহা শোনা গেল না ; কিন্তু শোনা গেল না এইজন্য যে, কথাবার্তা যাহা হইতেছে তাহা চাপা গলায় হইতেছে। অবশ্য দুই-তিনবার মায়ের হাসি শোনা গেল, কিন্তু তাহাতে গিরিবালার মনের কুণ্ঠা একেবারে গেল না। যেন নিজের কাছেই নিজের লজ্জাটা লুকাইবার জন্য এটাসেটা নাড়া চাড়া করিতেছেন এমন সময় বরদাসুন্দরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চোখেমুখে হাসির জেরটা তখনও লাগিয়া আছে। রসিকলালের প্রথম দিকের কথাগুলা গিরিবালার কিছু কিছু শুনিয়া থাকা সম্ভব বলিয়া বেশ সহজ ভাব অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—“উনি এসেছেন গিরি, যা তুই, আমি এ ঘরটা ঠিক করে নিচ্ছি।”

গিরিবালার জড়তাটা কাটে তো নাই-ই, মা সামনে আসিতে যেন বাড়িয়াই গেল ; এর পরে আবার বাপের সামনে গিয়া দাঁড়ান—সে যেন অসম্ভব বলিয়াই মনে হইল। কথাটা এখন বলিবেন, কি অন্য সময়, কি একেবারে চাপিয়াই যাইবেন—যেন শোনেনেই নাই, চাপিয়া যাওয়াই ভালো। চিন্তার মধ্যেই জড়োসড়ো হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মা একটু অলক্ষিতে চাহিয়া আবার তাগাদা দিলেন—“গেলি নি?”

গিরিবালা যেন গা-ঝাড়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন—“এই যাই।...একটা কথা বলছিলাম মা...”

সেটা যে কী হওয়া সম্ভব কতকটা আন্দাজ করিয়া লইয়া বরদাসুন্দরী স্পষ্ট দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—“কী?”

“নাঃ, থাক।”

বলিয়া পা বাড়াতেই বরদাসুন্দরী বলিলেন—“বল গিরি, মাথা খাস আমার।”

গিরিবালা না ফিরিয়াই মুখটা নিচু করিয়া বলিলেন—“জেঠামশাইকে আমিও বলব মা—কতকগুলো মিছে খরচ...”

বরদাসুন্দরী বলিলেন—“যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে!—হ্যাঁরে, এতদিনেও চিনলি না মানুষটাকে? উনি কি তাই ভেবে বললেন?—বাপ্, বড়ঠাকুর গায়ে এমন জায়গা রাখেননি যে নিজে একটা কিছু দেন কিনে। আর ঐ যে অষ্টপ্রহর কোলে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন! —কাল থেকে তো ছুঁতে পারছেন না কিনা।...যা-না, একবার গিয়ে তুলগে যা না খরচের কথা।”

গিরিবালার মনটা অনেক হালকা হইয়া গেছে ; আবার পা বাড়াইয়া একটা কিছু যেন বলিবার জন্যই জিদের সহিত একটু হাসিয়া মাথা দুলাইয়া কহিলেন, “জেঠামশাইকে আমি বলবোই দেখো ; বাজে খরচ নয় তো কী?”

BanglaBook.org

"না, খবরদার ; ভয়ঙ্কর মনে কষ্ট হবে তাঁর।"

গিরিবালা লঘুগতিতে ততক্ষণ ওঘরে। রসিকলাল তখনও মুখের উপর ধীরে ধীরে হস্ত চালনা করিতে করিতে কী ভাবিতেছেন, গিরিবালা বলিলেন—"জামাটামা ছাড়ো বাবা, মুখ হাত ধোও।"

কোট, কামিজ আলনায় রাখিয়া আসিয়া, সামনে খড়ম পাতিয়া জুতা খুলিতেছেন, মুখোমুখি না হইবার সুবিধায় রসিকলাল বলিলেন—"তোর গর্ভধারিণীকে বললেই এক্ষুনি গরগর করবে, কিন্তু কাজটা আর এমন কী অন্যায় করলাম বল না?"

এ ধরনের ভূমিকা হইলেই বুঝিতে হইবে বাবা কিছু একটা কাণ্ড করিয়া আসিয়াছেন ; গিরিবালা ফিতার জোট খুলিতে খুলিতে একটু বিস্মিতভাবেই মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কী বাবা?"

"এমন কিছু নয়, তুই খোল ফিতেটা। পণ্ডিতমশাইকে আসার খবরটা দিতে গেলাম, একটু দেরি হলেই আবার অভিমান হয় কিনা ওঁর। যেতে যেতে মনে হল—খবর শুনলেই তো সেই নেমন্তন্ন করে বসবেন, সেটা কি হতে দেওয়া ভালো? আর তো নোতুন উপার্জন নেই..."

"দাও নি বাবা খবর তাঁদের?"

"না দিলে নাকি রক্ষে থাকবে?...তাই ভাবলাম, খবরটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিই অমনি নেমন্তন্নটাও করে দিই, খরচটা তো বাঁচবে বুড়ো মানুষের..."

জুতা দুইটা পা থেকে গলাইয়া লইয়া প্রফুল্ল দৃষ্টিতে চাহিয়া গিরিবালা বলিলেন—"বেশ করেছ বাবা, আমি আজই যাব ভেবেছিলাম, রামীর মাকে পেলাম না। কখন বলেছ বাবা, কাল সকালে না রাত্তিরে?...উঃ কতদিন যে!..."

রসিকলালের মুখটা আবার একটু নিষ্প্রভ হইয়া গেল, একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—"ভাবলাম যখন বলতেই হবে তখন ও হ্যাঙ্গাম মিটিয়ে দেওয়াই ভালো ; —তাই আজ রাত্রের কথাই বলে এলাম। শাস্ত্রে বলেছে কিনা শুভস্য শীঘ্রম্। যত শীগ্গির হ্যাঙ্গাম মিটে যায় ততোই ভালো।"

গিরিবালা বিস্মিতভাবে বলিলেন—"আজ! হয়ে উঠবে বাবা? একটুও সময় যে হাতে নেই।"

রসিকলাল বলিলেন—"সমস্ত আয়োজনের ব্যবস্থা না করে আমি বাড়ি এসেছি নাকি? তক্ষুনি সেখান থেকেই হারাণকে টাকা দিয়ে বাজারে পাঠিয়ে দিলাম ; কাঁচা কাজ করি আমি!"

"তা বেশ করেছ, আর মাত্র দুজন তো লোক, কী বলো বাবা? রোসো, আমি মাকে বলে আসি।"

যাইতেছিলেন, রসিকলাল বলিলেন—"গিরি, শোন!"

ফিরিয়া দেখেন বাবার মুখটি আবার যেন কী রকম হইয়া গেছে। কী কহিবেন একটু চিন্তা করিয়াই কহিলেন—"বলছিলাম...একটু তামাক সেজে দিবি নি আগে?"

গিরিবালা কলিকাটা লইয়া টিনের কৌটা থেকে একটু তামাক বাহির করিয়া সাজিয়া টীকা ধরাইতেছেন, রসিকলাল দুইবার কাশিয়া বলিলেন—"ফিরছি, পথে ঘোষালকাকার সঙ্গে দেখা, বাড়ির সামনের গাছটা থেকে—"

BanglaBook.org

গিরিবালা উৎসুকভাবে প্রশ্ন করিলেন—"কেমন আছেন বাবা ঘোষালঠাকুরদা? আজ সকালে যাব মনে করলাম, কিন্তু নস্টাটা এত দেরি করিয়ে দিলে যে..."

"আছেন ভালো, সেই কথাই তো বলছি...দেখি সামনের গাছ থেকে নারকেল পাড়াচ্ছেন। দাদা সকালে বুঝি খোকাটাকে নিয়ে গেছলেন, সে কী প্রশংসা ছেলের! —'খাসা নাতি হয়েছে তোমার রসিক, যেমন রং তেমনি চুল—তা হবে বৈকি, বেঁচে থাক্'। আমি মনে মনে বলছি—ওরে বাসরে! স্যাঙাতের যে আসতে না আসতেই সুন্দর বলে নামডাক বেরিয়ে গেল!"

গিরিবালা হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া লজ্জিতভাবে অনুযোগের স্বরে বলিলেন—"ওঃ, ভারি সুন্দর! কী বাই বল দিকিন জেঠামশাইয়ের,—সমস্ত দিন ঘাড়ে করে নিয়ে..."

রসিকলাল নিজের কথাটুকু কী ভাবে বলিয়া দিবেন তাহার আটঘাট বাঁধিতেছেন, গিরিবালার কথার উপর কোন মন্তব্য না করিয়া বলিলেন—"তখন আমার একটু বুদ্ধি করে বলতেই হল—ঘুড়ী থেকে নেমে ফটকের মধ্যে গিয়ে বললাম—কাকা, আজ রাত্রে একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে, সেই কথাই বলতে এসেছিলাম।"

গিরিবালা যেন বিব্রত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রসিকলাল পাছে অপ্রস্তুত হইয়া পড়েন, সেইজন্য সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—"তা বেশ করেছ বাবা ; তিনটি লোকের ব্যবস্থা একরকম করে হয়েই যাবে'খন। মাকে বলে আসি কিন্তু।"

রসিকলাল তাড়াতাড়ি হুঁকায় গোটাদুই টান দিয়া বলিলেন—"একটু থেমে যা গিরি। ঠিক করেছিলাম তিনজনের ব্যবস্থাই করবো, সময় অল্প তো? এমন সময় দেখি নারকেল নেবার জন্যে ঘোষাল-গিন্নি উপস্থিত, কাজেই জুড়ে দিত হল—সবাইকে নিয়ে যেতে হবে ঘোষালকাকা, নৈলে গিরি বড্ড দুঃখু করবে..."

গিরিবালা এত বিপদের মধ্যেও হাসি সংবরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন—"করেছ কী বাবা! তোমাদের নাতিকে কে একটু প্রশংসা করেছে, কে তার কাছে আবার নারকোল নিতে এসেছে—সবাইকে নেমন্তন্ন করে এসেছ? বৌয়ে, মেয়েয়, ছেলেয়, ওঁদের বাড়িতে ছ'সাত জনের কম নয় যে!"

"তা সেই রকম ব্যবস্থা করে যে হারাণকে বাজারে পাঠালাম। প্রশংসার কথা নয় —কত যে উপকার পেয়েছি ওঁদের কাছ থেকে তোর বিয়ের সময়, তা তো সব জানিস না..."

বরদাসুন্দরী ওঘরের পাঠ সারিয়া উপস্থিত হইলেন, বাপ-মেয়েকে অনেক দিন একসঙ্গে দেখেন নাই,—জামাই, ভাসুর, জা না থাকায় একটু সুযোগ হইয়াছে। বলিলেন —"মায়ে-পোয়ে কী এত কথা হচ্ছে তোমাদের গো? হাসছিস কেন রে গিরি?"

দুইজনেই চুপ করিয়া গেলেন। তাহার পর মেয়ের এত সামনা-সামনি স্ত্রীর কাছে দুর্বলতা বড় অশোভন হয় দেখিয়া রসিকলাল যেন মরীয়া হইয়াই এক দমে সমস্ত কথাগুলা বলিয়া গেলেন, বরং একটু বাড়াইয়াই বলিলেন—"অনেক কথা, আর দরকারী কথা ; বলব আর কাকে?—এতগুনো লোক খেতে, বৌদিদি রায়েদের বাড়ির দুর্গোৎসবের বড়ি দিতে গেছেন, তোমার এখন এদিককার পাট সারাই হয় নি!"

আগাগোড়া সমস্তটা এক দমে বলিয়া কর্তাব্যক্তির মতো খুব জোরে জোরে তামাক টানিতে লাগিলেন,—যত বড়ই ঝড় উঠুক, তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত আছেন।

সমস্ত ঘরটাতে একটা থমথমে ভাব ছাইয়া রহিল। গিরিবালা মাকে জানেন, প্রতি মুহূর্তেই উগ্ররকম একটা কিছুর আশঙ্কা করিতেছিলেন, উপরদিকে তাকাইতে সাহস হইতেছে না।...ওদিকে রসিকলালের হুঁকার আওয়াজ ক্রমেই দ্রুত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বরদাসুন্দরীর বিবেচনার এতটা অভাব হয় না ; বাড়িতে জামাই আসিয়াছেন, তাহা ভিন্ন গিরিবালার মনের দিকটাও দেখিতে হয় ;—সমস্ত রাগ একটি কথায় নিঃশেষ করিয়া মৃদু কণ্ঠে শুধু বলিলেন—"মরিঃ।"

তাহার পর সমস্ত ব্যাপারটাই মন থেকে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"তা করেছ ভালোই করেছ, কাল সকালে বললে একটু যোগাড়ের সুবিধে হত আর কি!"

রসিকলালই যেন বিজয়ী, মুখে একটু রাগের ভাবই আনিয়া বলিলেন— "কেন যে কাল বলি নি বুঝিয়ে বলরে গিরি, আমার অত ধৈর্য নেই। আর বলে দে আমি কোন ব্যবস্থাই বাকি রাখি নি, কত সব কাজের লোক দেখছি তো!"

বরদাসুন্দরী কিছু বলিলেন না, 'যাই দিদিকে ডেকে পাঠাই'—বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন। সেখান হইতেই গিরিবালাকে ডাকিয়া বলিলেন—"গিরি, তুইও আয় মা।"

রসিকলাল বলিলেন—"একটু বসে যা গিরি, একটা কাজের কথা আছে। তোরা বড় হয়েছিস, বুঝতে শিখেছিস, তোদের না বলে বলবো কাকে?"

এর পরেও বাকি আছে কথা!— গিরিবালা ভিতরে ভিতরে দারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়া খাটে ঠেস দিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে একটা শঙ্কা জাগিতেছিল—চার বছর তিনি নাই, এর মধ্যে সংসারে কিছু হইল নাকি? বরদাসুন্দরীর যেখানে জ্বলিয়া উঠিবার কথা সেখানে যে অমন নিরীহভাব ধারণ করিয়া প্রায় বিনা বাক্যব্যয়েই বাহিরে চলিয়া গেলেন, এটা তাঁহার একটু নতুন ঠেকিয়াছিল, এখন রসিকলালের কথায় এটা উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।...রসিকলাল হুঁকা টানিতেছেন, গিরিবালা অস্বস্তির সহিত দাঁড়াইয়া আছেন।

রসিকলাল বলিলেন—"মাছটা আনতে দিলাম দুলাল বাগ্দিকে, চমৎকার মাছ যোগাড় করতে পারে, সেবারে পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়িতে সে-ই যোগাড় করেছিল কিনা...সে তো তুই জানিসই।"

গিরিবালা বলিলেন—"ঠিক কথা, দুলাল আছে কেমন বাবা? কতবার তার কথা জিগ্যেস করব করব কচ্ছি, একটা না একটা অন্য কথা এসে পড়ছে।"

"আছে একরকম। গরিবের আর থাকা মা, নেহাত থাকতে হয় বেঁচে, থাকে। কী যে বলতে যাচ্ছিলাম তোকে—হ্যাঁ, ঐ সঙ্গে ওদেরও খেতে বলে দিলাম। বলতাম না, বুঝছি তো বড় তাড়াতাড়ি হল, আতান্তরে পড়বে সব, তবে নেহাত তাকেই নাকি মাছটা আনতে বলতে হল..."

"ও বাবা, তুমি করেছ কি! একগুষ্টি যে তারা!"

বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতুকও মিশিয়া গিয়াছে, একটু হাসি হাসি মুখেই বাপের পানে চাহিয়া রহিলেন। রসিকলাল অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"তাহ'লে কাজ নেই, এলে মানা করে দোব। একেবারে যে পাকা করে বলেছিলাম তা নয়, সে লোকই নয় আমি—বুঝছি কিনা বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে—"

গিরিবালার বড় ভালো লাগিতেছিল! ধীরে ধীরে বহুদিনের সুপ্ত একটি আনন্দ-

BanglaBook.org

উৎসের মুখ যেন খুলিয়া গেছে ; সেই পিতা, নিত্য ভুল আর বেহিসেবের জন্য মা হইয়া যাঁহাকে আগলাইয়া ফিরিতে হইত—চার বৎসরে একটুকু বদলান নাই। এদিকে 'কাজের কথাটা' যে দুলালদের নিমন্ত্রণ করার অতিরিক্ত কিছু নয়—তাহাতেও মস্ত বড় একটা আশ্বাস আনিয়া দিয়াছে। নিজের অভিমতটুকুতেও সত্যের রূপ ফুটাইবার জন্য কতকটা যেন রাগিয়াই বলিলেন "হ্যাঁঃ, তোমার ঐ এক রোগ বাবা, একবার বলে আবার বারণ করে দেওয়া! আহা গরিব মানুষ, সবার যোগাড় যদি হয় তো ওদের হতেই যত আটকাবে! ...আমি কিন্তু বাবা দেখি ওদিকে, আর বসে থাকলে চলবে না।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই বাড়িতে আয়োজনের চঞ্চলতা পড়িয়া গেল। একটু বেশি করিয়াই পড়িল,—একেবারেই কেহ প্রস্তুত ছিল না, তাহার উপর আবার লোক অনেকগুলি। বসন্তকুমারী আসিয়া রাইমণি আর নন্তীকে ডাকিয়ে আনাইলেন, কিশোর গিয়া হারাণের বৌকে ডাকিয়া আনিল। বাড়িতে জিনিসপত্র যাহা ছিল সেইসব লইয়াই কাজ আরম্ভ হইয়া গেছে, এমন সময় নাতিকে বুকে লইয়া অন্নদাচরণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, পিছনে একটা বড় বেতের চাঙারিতে জিনিসপত্র লইয়া হারাণ।

স্বামীকে দেখিয়া বসন্তকুমারী খবরটা দিতে যাইতেছিলেন, অন্নদাচরণ বলিলেন —"আর বলতে হবে না, জানি।"

একটু চকিত হইয়া গলা নামাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"জামাই বাড়িতে নাকি?"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"না, ফেরেন নি এখনও।"

অন্নদাচরণ হাসিয়া বলিলেন—"কপালে যেটুকু লেখা আছে খণ্ডন হবে না তো? ভাবলাম জামাই এসেছেন, কালকে একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করি,—করতে হয় তো? —ওমা, ঘোষালকাকাকে বলতে গেলাম, মুখের পানে আশ্চর্য হয়ে চেয়ে জিগ্যেস করলেন —কেন, আজ কি হল?"

আমি তো ভ্যাবাচ্যাকা মেরে গেছি—এ আবার কী জিগ্যেস করা ঘোষালকাকার। একটু চেয়ে থেকে বললেন—"বলছিলাম, রসিক যে এইমাত্র আজকে রাত্রের কথা বলে গেল?"

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, হাসির মধ্যে অন্নদাচরণ বলিতে লাগিলেন—"বোঝ তখন আমার অবস্থাটা! নেমতন্ন করব কী, কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচি। বললাম—ভায়াকে বলে দিয়েছিলাম যদি মাছটা পেয়ে যায় তো আজই ব্যবস্থা করতে, বলে আমি ময়রা পাড়ায় চলে গিয়েছিলাম ; তাহলে পেয়েছে নিশ্চয়।"

"আর দাঁড়ায় সেখানে? মিত্তিরদের বাড়িটা ঘুরেই পা চালিয়ে দিলাম, পথে দুলাল বাগ্দির সঙ্গে দেখা। 'হ্যাঁরে, তোদের বামুন ডাক্তারদা কোথায় বলতে পারিস?'...'তিনি তো আমায় মাছের কথা বলে ময়রাপাড়ার দিকে গেলেন।'...'কত মাছ আনতে বলেছে তোকে?'...দশ সের, বারো সের যা পাই।' ...'তোদের নেমন্তন্ন করেছে তো?' 'না করলেও বসে থাকতাম নাকি দা'ঠাকুর? কার খাচ্ছি?—কার কিরপেয় বেঁচে আছি'?"

"মনে মনে বুঝলাম আজ ভায়া দয়ে মজাবেন আমায়। দুলালকে তাগাদা দিয়ে ছোট্ সোজা নিতাইয়ের দোকানে। দেখি হারাণবাবু আমাদের মাচানের ওপর গদিয়ান হয়ে কলকে হাতে করে লম্বা-চওড়া গল্প..."

হারাণ জিনিসপত্তরগুলো চ্যাঙারি হইতে নামাইয়া, বান্ডিলগুলা খুলিয়া দিতেছিল,

BanglaBook.org

বলিল—"হারাণের বলে মাথার ঠিক ছেল না এদিকে। যত বলি অত তাড়াহুড়ো করে না বাবাঠাকুর, দু'দিন পরেই হবে, তার শুনতে বয়ে গেছে! সামালাতে সামলাতে চোখের সামনে তিনটে বাড়ি নেমন্তন্ন হয়ে গেল—তার মধ্যে একটা আবার দুলো বাগ্দি—রাক্ষসের ঝাড়। হারাণকে ঢালোয়া হুকুম হল, তুই নিতাইয়ের দোকান থেকে মালপত্তর কিনে নিয়ে আয়।...বললাম 'কত কী একটা আন্দাজ করে দাও ঠাকুর।' ..ঐ তো লোক দেখলি, আরও জনকতক ওর ওপর চাপিয়ে নিয়ে আয় না নিতাইয়ের দোকান থেকে, আমারই চারিদিক দেখতে হবে তার মানে কি?...জিগ্যেস করলাম 'পথে যেতে আর কাউকে বলবে নাকি?' তার জবাব হল—'এখানে দাঁড়িয়ে পথের কথা কী করে বলব?'...মাথার গায়ে কুকুর পাগল হয়ে নিতাইয়ের দোকানে গিয়ে বললাম 'আদ্দেক গাঁ নেমন্তন্ন, হিসেব করে মালপত্তর ওজন করে দাও তো নিতাইমামা।" মাথাটা পষ্কের করবার জন্যে হুঁকো থেকে কলকেটা নিয়ে একটু গুছিয়ে বসেছি, এমন সময় ঘুরে দেখি বড়বাবাঠাকুর; দৌপদীর বস্ত্রহরণের সভায় যেন শিকিষ্ণ এসে পৌঁছলেন—ধড়ে প্রাণ এল বড়-মাঠাকুর, মিথ্যে বলছি নে..."

'শ্রীকৃষ্ণ' অন্নদাচরণ অবশ্য ছিলেন না। 'ওর বক্তার শুনলে চলবে না; যেম্নি মনিব—তেমনি চাকর—আমি একবার ময়রাপাড়াটা ঘুরে আসি'—বলিয়া গোড়াতেই বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। বিবরণ সাঙ্গ করিয়া রসিকলালের আহ্বানে হারাণ তামাক সাজিতে চলিয়া গেল। বিচিত্র নিমন্ত্রণ-কাহিনীর আলোচনায় হাস্যকৌতুকের মধ্য দিয়া কাজ আগাইয়া চলিল।

অনেক রাত হইল, একটি আনন্দ-মুখর রজনী। কেহ জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইল না কত রাত্রি হইয়াছে। চার বৎসর অতীত হইয়াছে, পণ্ডিমশাইয়ের ললাটে বলিরেখার আরও বৃদ্ধি হইয়াছে, কেশ-শ্মশ্রুর মধ্যেও বার্ধক্যের বিজয় অভিযান আরও সুস্পষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষটি যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছেন। বিপিনবিহারীর মনে পড়িল পাণ্ডুলের দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝার কথা। এইসব এক ধরনের লোক—স্পষ্ট দেখা যায় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এরা অভ্রান্ত পদক্ষেপে স্বর্গের কাছে পৌঁছিয়া যাইতেছে—আরও কাছে—ক্রমেই আরও কাছে...যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ কি এই ধরনের একটা কিছু ব্যাপার?

পণ্ডিতমশাই হাসিয়া বলিলেন—"ভুলিনি ভায়া পাণ্ডুলের কথা। কোন্ দিন দেখবে 'অয়মহম্ ভোঃ!' বলে ঠেলে উঠেছি, মরবার আগে ওদেশ একবার আমায় দেখতেই হবে, হিমালয়ের যা বর্ণনা দিয়েছ তুমি!"

"সে এক অপূর্ব দেশ ঘোষাল,"—বলিয়া বিপিনবিহারীর মুখে যেরকম শুনিয়াছেন নিজেই সেইভাবে খানিকটা বর্ণনা করিয়া যান; তাহার পর বলেন "তুমিও চলো।"

ঘোষালমশাই বলেন—"লোভ তো হচ্ছে, কিন্তু মরবার আগে কি হয়ে উঠবে?"

আনন্দের মজলিসে অল্প হাসির কথাতেই হাসি ঘন হইয়া ওঠে। বিপিনবিহারীর ঠাট্টার সম্পর্ক, তাহা ভিন্ন নিতান্ত যে মিনমিনে লাজুক প্রকৃতির জামাই তাহাও নয় তিনি—ঘোষালমশাইয়ের পানে চাহিয়া একটু অনুযোগের কণ্ঠে বলেন—"এত সুখ্যেতি শুনেও আপনি আমাদের দেশটকে যমপুরী না বলে ছাড়লেন না ঠাকুরদা!"

আমার হাসির ওপর হাসি ভাঙিয়া পড়ে। উঠানের মাছ লইয়া যে মজলিস বসিয়াছে, সেখানে প্রতিধ্বনি পৌঁছায়, হারাণের বৌ বলে—"জামাই কী বললেন, তাইতেই হাসি। তাড়াহুড়োর মধ্যে হল বিয়ে, কিন্তু গাঁয়ে আর এমন একটি জামাই এল না। সাঁতরাতেও

BanglaBook.org

দেখতাম কিনা—য্যাতক্ষণ বাড়িতে থাকতেন, হাসিতে হুল্লোড়ে বাড়িটা যেন গমগম করত। সাত্থক জামাই হয়েছে ঠাকরুনদের।"

দুলালের বৌ মুড়া কাটিতে কাটিতে সমস্ত ঝোঁকটা বঁটির উপর দিয়া বলে—"হবেনি? —ধম্মঠাকুরের চৌকাঠে অতকরে কপাল কুটনু মাংনায় নাকি? ...কত বড় জাগ্‌গত দেব্‌তা! ওনার হাত থেকে নাকি মিনমিনে জামাই বেরুতে আছে?"

॥ ৪ ॥

বিপিনবিহারী তিনদিন পরেই সাঁতরায় চলিয়া গেলেন, চার বৎসর পরে আসিয়াছেন, পূজাটা ঐখানেই কাটাইবেন। তিনি যে বিশেষ একটা বাধা হইয়াছিলেন এমন নয়, তবে যাইতে গিরিবালার বেড়ানটা আরও বাড়িয়া গেল। জেঠাইমা প্রায় সঙ্গে থাকেন, একটু দূর যাইলে তো নিশ্চয়ই, না হয় হারাণের বৌ থাকে; নন্তী যতদিন রহিল, সে তো নিত্য-সঙ্গিনী হইয়াই রহিল।

খোকা বাড়িতেই থাকে, তাহার খদ্দের অনেক—দুই দাদামশাই, দুই দিদিমা, মামারা। ছোট দিদিমা কাজের মধ্যে ফুরসত কম পান, অন্য সবাইয়ের মধ্যে কিন্তু কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। অন্নদাচরণের নাতিকে বাহিরে দেখাইয়া বেড়াইবার পালাটা শেষ হইয়াছে, এখন উল্টা অবস্থা, নিজেই আগেকার চেয়ে কম বাহির হন, নাতির সঙ্গে বাড়িতেই জমাট মজলিস বসে। রসিকলালও নাতির টানে মাঝে মাঝে সকাল সকাল ফেরেন, দাদা না থাকিলে দখল করিয়া বসেন। বসন্তকুমারীর পাড়া বেড়ানর সাথী হয় খোকা মাঝে মাঝে; এমন আবদার ধরিয়া বসে মা ভিন্ন কাহারও কাছে থাকিতে চায় না। বসন্তকুমারী বলেন—"নে সঙ্গে করে, আর কি করবি? ঝিয়ের কোলে ছেড়ে দিয়ে ছেলেকে বারমুখো করে দিয়েছিস, ওকি পারে থাকতে?"

গিরিবালা একবার জিদের উপর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন—খোকার কান্না যখন শোনা গেল না তখনও যেন পিছনে পিছনে ঘুরিতে লাগল। খোকার আবদার জিনিসটা অদ্ভুত—সামনে থাকিলে সত্যই বিরক্তি ধরে, রাগ হয়। এদিকে রাগ হয় বলিয়াই একটু আড়াল হইলে প্রাণটা যেন আরও বেশি আইঢাই করিতে থাকে। সেই একদিনের অভিজ্ঞতার পর খোকা বায়না ধরিলে আর ছাড়িয়া যান না। জেঠাইমার কথায় বলেন —"তা থাকুকগে না ঝিয়ের কাছে। কে ওকে আসতে বলেছে? চার বচ্ছর কয়েদের পর লোকে একটু বেড়াবে, না পায়ের বেড়ি পায়ে পায়ে..."

বসন্তকুমারী সত্যই রাগিয়া ওঠেন, বলেন—"চুপ কর্ গিরি, বড্ড মুখ হয়েছে তোর! ষাট! ছেলে হল পায়ের বেড়ি!— চল্ ফিরে, যেতে হবে না তোকে বেড়াতে..."

গিরিবালা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলেন—"চলো, চলো, হয়েছে; সবাই নাতির দিকে, গিরির কথাটা কেউ বুঝবেন না; বায়না না ধরলে আর কবে কী বলেছি?"

বহুদিন আগের কথা, শৈলেনের তখন নূতন কলেজ জীবন চলিতেছে। শিবপুর থেকে পড়ে। মনে পড়ে একদিন শীতের দুপুরে শহর ছাড়িয়া একটু ভিতরের দিকে চলিয়া যায়—কাজটা যে কী ছিল এখন আর স্মরণ নাই। বিদ্যুৎ-বাতি ছাড়িয়া রাস্তায় কেরোসিন তেলের ল্যাম্পপোস্ট, মিউনিসিপ্যালিটির খোয়া বিছান রাস্তা, অবহেলিত হইয়া

ক্রমে প্রায় কাঁচামাটিতে দাঁড়াইয়াছে, পাকা বাড়ির পাশে পাশে গোল-পাতায়-ছাওয়া মেটে বাড়ির সংখ্যা ক্রমেই চলিয়াছে বাড়িয়া, আর সেই সঙ্গে সবুজের বন্যা। কিছু নয়, অথচ লাগে অপরূপ।

এই আবেষ্টনীর মধ্যে একটি ছোট দল দেখিয়াছিল—একটি সাত-আট বছরের ছোট ছেলে, একজন বর্ষীয়সী বিধবা মহিলা আর একটি বড় মেয়ে, বোধ হয় বছর উনিশ-কুড়ি বয়স হইবে। রাস্তার ধারে একটা একতলা বাড়ির সবুজ রং করা দুয়ার খুলিয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিল। ঘাসে ভরা ছোট্ট একফালি জায়গা পার হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছে, ঘরের জানলা হইতে একটি ছোট মেয়ে ডাক দিল—"দিদি তোর ছেলে উঠেছে।"

মেয়েটি একবার ঘুরিয়া দেখিয়া বর্ষীয়সীর পানে চাহিয়া বিপর্যস্তভাবে কতকটা নাকীসুরে বলিল—"ঐ দেখো, তোমরা তো বলো! — বাড়ি ছেড়ে বেরুবার জো আছে আমার?"

বর্ষীয়সী একটু হাসিয়া বলিলেন—"নিয়ে আয় না বাছা, কতদূরই বা যাচ্ছিস।"

এ ফিরিয়া যাইতে যাইতে যে মেয়েটি ডাকিয়াছিল সে একটি শিশুকে লইয়া দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মা গিয়া কোমরের দুই দিকে হাত দিয়া ঝগড়া করিবার ভঙ্গিতে দাঁড়াইল, শিশুটির দিকে চাহিয়া হঠাৎ সামনে একটু ঝুঁকিয়া বলিল—"তোর কি টনক নড়ে নাকি? টনক নড়ে?"

শৈলেন বেশ খানিকটা দূরে ছিল, ছবিটি এত মিষ্ট লাগিল যে অলস গতিকে আরও শ্লথ করিয়া দিল—অবশ্য উদ্দেশ্যটা কেহ না টের পায়, এমনভাবে। ছেলেটি মায়ের রকম দেখিয়া দুইটি দাঁতে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, আবার সেই রকম দোলানি, আবার এক ঝলক হাসি।...শৈলেন সময় লইবার জন্য রাস্তার ধারে একটা বাড়ির নম্বর মনোযোগ সহকারে দেখিতে লাগিল।...বর্ষীয়সী স্মিতহাস্যে চাহিয়া আছেন, বোধ হয় পুরনো মায়ে নূতন মায়ের খেলা দেখিতেছে। বলিলেন—"আয় সরী, আর দেরি করিস নি।"

মেয়েটি দুই হাত শিশুর দুই গালের উপর বুলাইয়া লইয়া তাহাকে বুকে চাপিয়া লইল। দুই তিন বার আলগা দিয়া আবার চাপিয়া ধরিয়া একটু যেন কুঁজো হইয়া অল্প একটু ছুটিতে ছুটিতে বর্ষীয়সীর নিকট উপস্থিত হইল। আসিয়া বুক থেকে শিশুটিকে বাঁ কাঁকালে লইল, তাহার পর সেই মাতৃত্বের ভার-নির্জিত গতি,—মন্থর, অল্প অল্প দোলা লাগা; বর্ষীয়সীর সঙ্গে গল্প হইতেছে তাহার মধ্যে এক-একবার প্রেমলুভ শিশুর গাল দুইটি টিপিয়া ধরা, বলা—"তুই চুপ কর দিকিন, না দেবে কোথাও যেতে, না দেবে দুটো কথা কইতে।" ভর্ৎসনার পরেই বোধ হয় দুইটা চুম্বন—"চুপ কর, চুপ, দুষ্টু ছেলে..."

বহুদিন পূর্বের কথা, তবু নব-মাতৃত্বের ঐ ছবিখানি শৈলেনের জীবনে যে শাশ্বত হইয়া গেছে, যখনই মায়ের বেড়াইবার কথা ভাবে, কলেজ জীবনের ঐ ছবিখানি কী করিয়া আসিয়া মায়ের সঙ্গে যেন মিশিয়া যায়।

আজ দৌড়টা পণ্ডিতমশাইয়ের বাড়ি পর্যন্ত। পথে কিছু কিছু প্রশ্ন উত্তর, যার সঙ্গে যেমন দেখা—পথের উপরই, বা বাড়ির দরজায়, বা গবাক্ষ পথেই। গতি মন্থর ; শশাঙ্কর জন্যও বটে, তা ভিন্ন সব মাটিটুকু মাড়াইয়া চলিতে ভালোও লাগিতেছে গিরিবালার পৌঁছিয়া, শানের বেঞ্চির ওপর থেকে ঝরিয়া পড়া মালতী ফুল তুলিয়া লইয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে ডাক দিলেন—"ঠাকুমা কৈ গো? আমরা এলুম।" হাসিমুখে

BanglaBook.org

পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রী আগাইয়া আসিলেন—"এস দিদি, ওমা এই যে বড় বৌমাও এসেছেন।" গিরিবালা বলিলেন—"আপনিই নাকি এসেছেন? ধরে নিয়ে এলুম, তবে এলেন।" বসন্তকুমারী পণ্ডিতমশাইয়ের স্ত্রীকে সাক্ষী মানিয়া বলিলেন—"হ্যাঁগা খুড়িমা, আর কি তেমন হুট বলতে বেরুতে পারি—তুমিই বলো না বাছা?—তখন তুই বাড়িতে ছিলি, খুঁটিনাটি কাজগুলো সামলাতিস, ছোটবৌ ওদিকটা সামলাত, জেঠাইমা টহল দিয়ে বেড়াত। আর কি ওর ঘাড়ে সমস্ত ঝক্কিটা ফেলে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো চলে —শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেড়েও তো উঠছে সংসারটা।"

বেড়ানোর কথা থেকেই বেড়ানো যেখানে অসম্ভব সেই পাণ্ডুলের কথা ওঠে। ও ধরনের অভিজ্ঞতাটা পণ্ডিতমশায়ের স্ত্রীরও আছে খানিকটা, গল্প অল্পেই জমিয়া ওঠে। নথ অল্প অল্প দুলাইয়া বলেন—"সে তুলনায় তুই তো ঘরের কাছে আছিস, উজ্জৈন কি এখানে?—সাতটা মাস যে কি করেই কেটেছিল?" আবার কথা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন —"তা হোক দিদি, ঐ তোমার এখন সগ্‌গ, মা মঙ্গলচণ্ডী ঐ বাড়িই ভরে দিন তোমার, মেয়ে-মানুষের আর কামনা কী বল?"

ওদিককার ঘর থেকে অস্ফুটস্বরে কোন সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে পণ্ডিতমশাই গিয়া বাইরের বারান্দায় দাঁড়ান, বোধ হয় কোন কাব্য পড়িতেছিলেন তাহারই জের। এদিককার রক থেকে সামনা-সামনি দুইটা জানালার মধ্য দিয়া কিছু কিছু দেখা যায় —বিরাট সৌম্যমূর্তি, একটা ভাবের ঘোরে মুক্ত আকাশের পানে চাহিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। একটু পরে প্রায় সেইভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—"হ্যাঁগা, গিরি দিদিমণি এসেছে মনে হল যেন?" গৃহিণী বলিলেন—"এই তো এল।" পণ্ডিতমশাই আবার যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। ইহারা যেন অন্য প্রশ্নের অপেক্ষা করিয়া আছেন ; গৃহিণী বসন্তকুমারীকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"ঐ রোগ, কী পড়েছেন, কি, কিছু একটা নিকবেন—মাথার মধ্যে ঘুরছে।"

একবার গিরিবালার পানে চাহিয়া বলেন—"গিরি নাকি নন্তীকে বলেছে নাতজামাই বড় নির্ভয় মানুষ, ঘোড়ার চড়া সাঁতার কাটা এইসব নিয়ে থাকেন, ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। সে ঢের ভালো বাবা, পড়তে এইরকম আজগুবী মানুষের পাল্লায়।...আজকাল যেন আবার বেড়েছে।"

বসন্তকুমারী বলেন, "ও না পড়ুক, ওর মা পড়েছে—এই মানুষেরই শিষ্যি তো ওর বাবা?"

একটি মৃদু হাস্য ওঠে। পণ্ডিতমশাইয়ের চমক ভাঙে যে, তিনি একটি নূতন প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন। বলেন—"আজ আর হবে না ; রসিক আর তর্কালঙ্কারকে আসতে বলেছি, কাল সকালে গিরিকে এখানে খেতে বোলো।—বিপিনের কাছে তো শুনলাম, ওর মুখে একবার ওর শ্বশুরবাড়ির কথা শুনতে হবে।...হিমালয় দেখেছে?"

গিরিবালা মুখ টিপিয়া অল্প হাসিয়া কতকটা স্বগতভাবেই বলেন—"দেয়ালের বাইরে কী কী গাছ আছে তাই দেখিনি তো হিমালয়!"

গৃহিণী হাসিয়া কথাটা স্বামীকে বলিতে যান, গিরিবালা তাড়াতাড়ি মুখটা চাপিয়া বলেন, বলেন—"আঃ, তুমি আমার নেমন্তন্নটা নষ্ট করবে নাকি?"

হাত ছাড়িয়া আবার সেইভাবে মুখটা টিপিয়া হাসিয়া বলেন—"গাড়ির দুই ধারে

BanglaBook.org

বড় বড় উইটিপির মতো পাহাড়গুলো দেখলাম কী করতে? আমি ঠিক কাল চালিয়ে নোব, দেখই'খন।"

কণ্ঠস্বর তুলিয়া বলেন—"হিমালয় তো নিত্যই দেখছি ঠাকুরদাদা; একদিনের নেমন্তন্নে বলা শেষ হবে না।"

সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠ নামাইয়া বলেন—"না মিললে বলব, তোমার নাতজামাই-ই মিথ্যেবাদী।"

হাসি চাপিতে গিয়া ওঁরা দুইজনে দুলিয়া ওঠেন।

পূজা আসিয়া পড়িল। গ্রামে সাতখানা পূজা, তাহার উপর বারোয়ারি আছে। প্রায় সমস্তদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিমা দেখিয়া বেড়ানো, রাত্রে যাত্রা অপেরা; জেঠাইমা বলেন—"কচি ছেলে কোলে, অসুখে পড়ে যাবি যে মা—বেহিসেবী কাণ্ড হচ্ছে যে!"

গিরিবালা বলেন—"বেহিসেব হলে তবে তো মা-দুর্গা ফেলবেন অসুখে? আমার সেদিকে ঠিক আছে, চার বচ্ছরের পুজো, একসঙ্গে দেখছি যে আমি।"

জেঠাইমার কথাই ফলে কিন্তু।

মা-দুর্গার দোষ দেওয়া যায় না—চার বৎসরের যত বেড়ানো, যাত্রা, অপেরা, কথকতা চারদিনে উসুল করিতে গেলে সে-হিসাবের গোঁজামিল দেওয়া তাঁহারও সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। বিজয়ার দুইদিন পরেই গিরিবালা জ্বরে পড়িয়া গেলেন। ছেলেমানুষের মতো লুকাইবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন। রায়েদের বাড়ি কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত কথকতা, চাটুজ্জে-গিন্নি, রাইমণি, রাণীর মা প্রভৃতি কয়েকজন উঠানে অপেক্ষা করিতেছেন, জেঠাইমা বাড়ি নাই,—তাড়াতাড়ি সাজগোজ করিয়া লইয়া বাহির হইবেন, মায়ের সামনে পড়িয়া গেলেন। বরদাসুন্দরী খিড়কির পুকুর থেকে উঠিয়া আসিতেছিলেন, মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"তোর মুখটা যেন থমথমে ঠেকছে কেন রে গিরি? শরীরটা ভালো আছে তো?"

"ভালো থাকবে না তো কী থাকবে?—তুমি সর্বদাই থম্‌থমে দেখো!"

একটু ব্যাজারের ভঙ্গিতেই কথাটা বলিয়া মুখটা একটু ঘুরাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবেন, বরদাসুন্দরী বলিলেন—"দাঁড়া, বোধ হচ্ছে যেন কেমন..." অগ্রসর হইয়া রাইমণিকে বলিলেন—"আমার হাতটা ভিজে, একবার দেখো তো কপালটা দিদি। হুঁ, মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে..."

রাইমণি কপালে হাত দিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—"কপাল যে পুড়ে যাচ্ছে লো!...কিছু টের পাসনি?"

ধরা পড়িয়া গিরিবালার জ্বরের তাড়সে রাঙাপানা মুখটা যেন রক্তহীন হইয়া গেল, বলিলেন—"কী করে বুঝব?...একটু সর্দির মতো হয়েছিল শুধু।"

বরদাসুন্দরী গম্ভীরভাবে বলিলেন—"টের ভালো রকমই পেয়েছ, নুকুচ্ছিলে। ...হ্যাঁগা, ছেলের মা, এখনও কচি মেয়েটির মতন..."

চুপ করিয়া গিয়া সহজকণ্ঠে বলিলেন—"ফেরো, ঢের কথকতা হয়েছে।...আমি গোড়া থেকেই পই পই করে..."

আবার চুপ করিয়া গেলেন। রাগটা যেন চাপিয়াও চাপিতে পারিতেছেন না। সকলেই

BanglaBook.org

ফিরিলেন, চাটুজ্জে-গিন্নি চোখের ইশারা করিয়া বড় মেয়েকে আর বেশি কিছু বলিতে মানা করিয়া দিলেন। বিছানায় আসিয়া একটু ঢাকা-ঢুকি পড়িতেই জ্বরটা বেশ জানান দিয়া আসিয়া পড়িল। ছেলেরা কেহ বাড়িতে নাই, রাণীর মা বসন্তকুমারীকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

প্রথম দিনটা একেবারে আচ্ছন্নভাবেই কাটিল—প্রায় অচৈতন্য অবস্থাতে। দ্বিতীয় দিন থেকে একটা অবসাদ আসিল। পাণ্ডুল হইতে বাহির হওয়ার পর থেকে মনে যে একটা উন্মাদনা আসিয়াছিল, বেলে-তেজপুরের অবাধ মুক্তির মধ্যে যেটা উগ্রতর হইতে হইতে যেন চরমে পৌঁছিয়া গিয়াছিল—সেটা একেবারে স্তিমিত, নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এর সঙ্গে কোথা থেকে আসিয়া পড়িল একটা ক্ষুব্ধ অভিমান। কাল জ্বরের কথা প্রকাশ হইয়া পড়ার থেকে মা, বাবা, জেঠাইমা, জেঠামশায়ের মুখ থেকে যে কয়টি অনুযোগের কথা বাহির হইয়াছে, যতই মৃদু হোক না কেন—সবগুলি মনে যেন ঘনাইয়া ঘনাইয়া ফিরিতে লাগিল। ঠিক তিরস্কার কোনটাই নয়, তবু মন যেন কথাগুলোকে ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া, তিরস্কারেই দাঁড় করাইতে চায়—গিরিবালা যে চার বছর পরে বাড়িতে পা দিলেন, চার বছর তাঁহার কথা তো কেহ ভাবেন নাই...এখন শুধু গঞ্জনা, কথায়-কথায় গঞ্জনা...দিয়া সাধ মিটাইয়া নিন যে কটা দিন আছেন গিরিবালা এখানে...আর এবার গিয়া আর ফিরিবেন নাকি?—সে দেশ থেকে ফেরে মানুষ?...কেনই বা ভাবিতেছেন গিরিবালা? —না ফিরিলেই বা কাহার কী আসিয়া যায়? এই চার বৎসরের প্রবাসে তো সে-কথা স্পষ্টই হইয়া গেছে।

অভিমানের জের ধরিয়া মৃত্যুর কথা আসিয়া পড়ে, মনটা পরম বন্ধুর মতো মৃত্যুকে যেন জড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে চায়—ওর কমে যেন আশা মেটে না। যাহাদের কাছে ভালোবাসা পাইয়াছেন হেতু-অহেতু নির্বিশেষেই, কেমন মনে হয়—তাহাদের সবার চক্ষে যদি বন্যা বহাইয়া চলিয়া যান তো ভালো হয়। মনটা গিরিবালা-হীন গিরিবালার জগতের পানে চাহিয়া পড়িয়া থাকে—বাবা, মা, জেঠামশাই, জেঠাইমা, শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, মনোমোহিনী, দুলারমন, ঠাকুরপো—এলোমেলোভাবে শূন্য দৃষ্টিতে শূন্য জগৎটির পানে চাহিয়া আছে—জ্বরের ঘোরে বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায় একটা...বিনাইয়া বিনাইয়া কত কথা ভাবা, চোখের জল গড়াইয়া বালিশে পড়ে, বেশ লাগে।...বালিশ ভিজাই থাক্— জেঠাইমা আসিয়া প্রশ্ন করিবেন—'তোর বালিশ ভিজে কেন রে গিরি? কাঁদছিলি নাকি?' গিরিবালা শুধু উত্তর দিবেন—'আমি বোধ হয় আর বাঁচব না জেঠাইমা!'...এই আঘাতটুকুর কল্পনায় মনটা যেন একটা মিষ্টিরসে জরিয়া আসিতে থাকে।

জ্বরের ঝোঁকে একটা রাস্তা ধরিয়া মনটা খানিকক্ষণ চলে, তাহার পর হঠাৎ দিক পরিবর্তন হয়।...কিন্তু খোকা?

গিরিবালা না থাকিলে খোকার কী হইবে? ওর যে মাকে না হইলে এক দণ্ড চলে না। ও যে অসহায় শিশু—নিজের গতি নাই, দৃষ্টি নাই, ভাষা নাই—প্রতি মুহূর্তেই মায়ের কাছে এইসব ঋণ করিয়া ওর চলা, কখন ক্ষুধাটুকু পাইবে সেটুকুরও হিসাব রাখিতে হইবে মাকে—খোকাকে ছাড়িয়া গিরিবালা যান কী করিয়া! কিন্তু যদি যাইতেই হয়? —গিরিবালার মনটা হঠাৎ হু হু করিয়া উঠে; এতক্ষণ মৃত্যু ছিল একটা সাধ, খোকার চিন্তাতে যেন হইয়া উঠে আতঙ্ক। একটা বিরাট অদৃশ্য-শক্তি, যাহার সামনে খোকার

BanglaBook.org

চেয়েও তিনি শতগুণে অসহায়। কোন প্রয়োজনের দিকে না তাকাইয়া সে যদি নিজের প্রয়োজনে, নিজের অমোঘ শক্তিতে তাঁহাকে খোকার কাছ থেকে ছিনাইয়া লইয়া যায়! অনিয়ন্ত্রিত পদক্ষেপে অবোধ অন্বেষণে খোকা ডাকিয়া বেড়াইতেছে—চোখে জল, গায়ে ধুলো...খোকার চোখে জল! মোছয় এমন লোক নাই!

দৃশ্যটার উপর গিরিবালার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া যায়। খোকাকে বুকে করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন ; খোকার জন্য, সমস্ত শরীর নিংড়াইয়া যত স্তন্য আছে—তাহার মধ্যে যেন একটা আলোড়ন জাগে।...

খোকাকে আনাইয়া লন গিরিবালা, যেখানেই থাকে খোকা, আনিয়া নিতে হইবে। যেন ছাড়িয়া যাইতেছেন, আর লজ্জা করিলে চলিবে না।...পিঠে হাত বুলান, চুলে হাত বুলান, পেটটি অল্প অল্প টিপিয়া টিপিয়া দেখেন, যে অবস্থাতেই থাক্, বলেন—"ওর ক্ষিদে পেয়েছে জেঠাইমা, পেটটা পড়ে আছে।"

জেঠাইমা বলেন—'তা দিই একটু খাইয়ে দুধ, মা'র দুধ তো এখন খেতে মানা কিনা।"

॥ ৫ ॥

যথেষ্ট দুর্বল করিয়া দিয়া এবং একটা যেন নূতন জগতে ঘুরাইয়া আনিয়া এগারো দিনের মাথায় জ্বরটা ছাড়িল ; জের সামলাইতে কিন্তু প্রায় দিন পনেবো লাগিয়া গেল। বহুদিন পরে জ্বরটা আসিয়াছিল, আর আসিয়াছিলও খুব তোড়ে আর অনেক রকম অত্যাচারের পথ ধরিয়া—দেহে মনে নিজের অধিকারের অনেকগুলি নিদর্শন রাখিয়া গেল।

বিপিনবিহারী সাঁতরা থেকে দুইবার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন। শেষের বার তিন দিন থাকিয়া গিরিবালা পথ্য গ্রহণ করার পর চলিয়া যান। অসুখের খবর পাইয়া নন্তী আসিয়াছিল, বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"আশা করেছিলাম, আরও কিছুদিন পড়ে থাকব...আপিস থেকে ছুটি নেবার খুব সুবিধে করে দিয়েছিল কিনা।"

এবার দেরি করিয়া পূজা, অল্প অল্প শীত পড়িয়াছে। বৈকালে দাওয়ায় কম্বল পাট করিয়া একটু জায়গা করিয়া দেওয়া হয়, রোদটুকু গায়ে করিয়া গিরিবালা বসিয়া থাকেন। বসন্তকুমারী প্রায়ই কোন একটা কাজ লইয়া পাশে বসিয়া থাকেন।—কাঁথা সেলাই, কি ডাল বাছা, কি গ্রামের কোন নিঃসহায় প্রসূতির জন্য 'ঝাল"-এর মসলা তৈয়ার ; এ-বাড়ির কেউ-না-কেউ দু'একজনও কাছে থাকে। গল্প চলিতে থাকে। উঠানে কিশোর তাহার দল লইয়া খেলা করিতে থাকে, সমস্ত বাড়িখানাতে কর্মব্যস্ত মায়ের এদিক-ওদিকে আনাগোনা চলিতে থাকে—কখনও কোন একটি গল্পের জের টানিয়া আসেন, কখনও স্বামীর কোন একটা বেহিসাবীপনা লইয়া অনুযোগ...বেশ লাগে গিরিবালার। স্বাস্থ্যটি অল্পে অল্পে ফিরিয়া আসিতেছে, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে একটি পুরনো জগৎ যেন আবার নতুন হইয়া তাঁহার চোখের সামনে জাগিয়া উঠিতেছে। আসিয়া পর্যন্ত বরাবরই একটা মস্ত ব্যস্ততার মধ্যে কাটিতেছিল বলিয়া বাপের বাড়িকে এমন করিয়া পান নাই। বেশ লাগে, এই সচলতার মধ্যে শুধু নিজে প্রায় বঞ্চিত বলিয়া, স্থাণু বলিয়া—একটু কথা, চলা, একটু হাসি, সব কিছুকেই মনের সমস্ত প্রীতি দিয়া জড়াইয়া ধরেন।

BanglaBook.org

"তোমার মনে আছে জেঠাইমা? এই কামিনীতলায় আমরাও খেলতুম—আমি, নন্তী, হরিচরণ, পুতি—আশ্চির্যি নয়?"

"হ্যাঁ, আর এখন তোর ছেলে খেলা করছে। নন্তীর ছেলেটি থাকলে আরও চমৎকার হত।"

বরদাসুন্দরী একটা কাজ হাতে করিয়াই ঘর থেকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়ান, বলেন —"ওমা মনে আবার থাকবে না! কি খেলার বাই-ই ছিল মেয়ের! একটা কাঠের পুতুল ছিল,—নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, অষ্টপহর ছেলের পিছনে হয়রান মেয়ে। 'ওরে গিরি খাবি আয়, রোদে তেতে মুখ যে তোর সিঁদুরবর্ণ হয়ে গেল।' ...কে কার কথা শোনে? ...এখন ছেলে হল তো তার হেনস্তা দেখ না!"

গিরিবালা অভিযোগের কণ্ঠে বলেন—"জ্বালাতন করে যে বড্ড! নাতির দোষটা তো দেখবে না!"

বসন্তকুমারী বলেন—"না, কাজ কি জ্বালাতন করে? কাঠের পুতুলের মতো একটা নুলো-জগন্নাথ ছেলে হত, চলত না, ফিরত না, জ্বালাতন করত না,—খুব আদর খেত মায়ের!"

কথাগুলোর সঙ্গে বসন্তকুমারীর বলিবার ভঙ্গি মিলিয়া সবাইকে হাসাইয়া তোলে।

এক একদিন এমনও হয় যে বসন্তকুমারী থাকেন না, ছেলেরা থাকে বাহিরে। কর্মচঞ্চল মায়ের সঙ্গে ছাড়া ছাড়া দু'একটা কথা কহিতে কহিতে গিরিবালা পড়ন্ত বেলার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। এই রকম দিনগুলাতে মনে পড়ে পাণ্ডুল। অনেক দিন পরে অসুখের প্রথম অবস্থায় মোতিবালার এক পত্র পাওয়া গিয়াছিল। শ্বশুর মাঝে একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সে সময় বৌমার খোঁজই বেশি করিতেন, আর খোকার। খোকা নাই বলিয়া খজনীর বাপ-মা ওকে জোর-জবরদস্তি করিয়া শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছিল, আবার পলাইয়া আসিয়াছে, মোতিকে বলিয়াছে এবার এরা যদি বেশি গাজুরি করে তো ও পলাইয়া একেবারে খোকার মামার বাড়ি চলিয়া যাইবে। বলে, এখন তো রেল হইয়াছে, কে কার তোয়াক্কা রাখে? ত্রিনয়নী দাদার জন্য অত্যন্ত হেদায়, হেদাইয়া হেদাইয়া জ্বরে পড়িয়াছিল, এখন ভাল আছে...

গিরিবালার মনটি পাণ্ডুল পাড়ি দেয়—এখন কেমন আছেন শ্বশুর, কে জানে! মাই বা কেমন আছেন? আসিবার সময় বড় কাঁদিয়াছিলেন। মাকে বাহিরে বাহিরে মনে হয় শক্ত মানুষ, তিনি যে অত কাঁদিতে পারেন জানা ছিল না।...অল্প গণ্ডি লইয়া সমস্ত পাণ্ডুলটি আসিয়া হাজির হয়। মনটা দোটানার মধ্যে পড়িয়া যেন হাঁপাইয়া উঠিতে থাকে। পাণ্ডুলের মায়ায় বেলে-তেজপুর যেন কতকটা ফিকা হইয়া যায়। জীবনের এ-সমস্যায় একটা অস্বস্তি ওঠে মনে, পাণ্ডুলে থাকিলে বেলে-তেজপুরের দিকে মনটি পড়িয়া থাকিবে, বেলে-তেজপুরে আসিলে মনে হইবে পাণ্ডুল ছাড়িয়া থাকা শক্ত। গিরিবালা ভাবিয়া সারা হন—এর সমাধান কোথায়?

জ্বরের ঘোরটা যখন খুব প্রবল তখন মামা একবার আসিয়াছিলেন, গিরিবালার আবছায়া আবছায় মনে আছে। তাহার পর লোক পাঠাইয়া আরও কয়েকবার খোঁজ লইয়াছেন, গিরিবালাকে লইয়া যাইতে অত্যন্ত ব্যস্ত!

পথ্য পাইবার ঠিক ষোল দিন পরে গিরিবালা, রসিকলাল, সাতু আর হরিচরণের

BanglaBook.org

সঙ্গে সিমুরে গেলেন, হারাণ অবশ্য রহিলই।

ইঁহারা গাড়ির মধ্যে, হারাণ কতকটা পথ গাড়োয়ানের পাশে বসিয়া অতিবাহিত করিল, কিন্তু চুপ করিয়া বা কিছু না করিয়া কাটানো তাহার ধাতে সয় না ; এদিকে হাত নিসপিস করিতেছে, অথচ রসিকলালের ঠিক কানের কাছে তবলা বাজানো দায়, তবু ভুলক্রমে গাড়োয়ানের পিঠে একটা বোলের খানিকটা তুলিয়া ফেলিয়া হারাণ একসময় টুপ করিয়া নামিয়া পড়িল।

গাড়ির পিছন দিকটায় গিরিবালা আর সাতু, মাঝখানে খোকা। গাড়িতে চড়িয়া মনটা তাহার খুব খুলিয়া গেছে, হাত ছুঁড়িয়া বেজায় ফূর্তি লাগাইয়া দিয়াছে। মা, বাবা, দাদু প্রভৃতি গোটা পাঁচ-সাত কথা যা আয়ত্ত করিয়াছে সেই ক'টি লইয়াই প্রবল উৎসাহে ভাঁজিয়া চলিয়াছে। হারাণ গল্প করিতে করিতে গিরিবালাকে প্রশ্ন করিল—"ছেলেকে তোমার কী করবে গিরিদিদিমণি?"

গিরিবালা বলিলেন,—"তুই চুপ কর দিকিন বাপু ; ছেলে কোথায় তার ঠিক নেই, এখন থেকে তাকে কী করবে?"

হারাণ একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিল, কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল —"আমায় দাও খোকাবাবুকে গিরিদিদিমণি।"

রসিকলাল হাসিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন, তুই নাপতে-গিরি শেখাবি নাকি?"

গিরিবালা, সাতু, কেষ্ট তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন। হারাণ আবার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"তাই বলনু নাকি? নাতিকে ঠাট্টা করবে তা হারাণকে সুদ্যু টেনে।"

হাত দুইটা বাড়াইয়া বলিল—"সতু দা'ঠাকুর দাও তো খোকাবাবুকে। গাড়ির ঝাঁকনিতে ওনার ক্লেশ হচ্ছে। বলতে তো শেখেনি, বোঝাবারও মানুষ নেই।"

বাপের ঠাট্টাটার এইভাবে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেওয়ায় গিরিবালা হারাণের মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে, এখনও অব্যেস গেল না! তোর কি দশা হবে হারাণ?"

হারাণ কিছু না বলিয়া খোকাকে কাঁধে চড়াইয়া লইল এবং ছোট একটি দল পাইয়া গতি মন্দ করিয়া দিয়া তাহার সঙ্গে মিশিয়া গেল। গাড়িটা একটু আগাইয়া পড়িল।

একেবারে কোন দূর গাঁয়ের দল, একজন প্রশ্ন করিল—"কাদের বাড়ির ছেলে হ্যাঁ কত্তা?"

"বেলে-তেজপুরের বাঁড়ুজ্জেদের,—দৌহিত্তির।"

পরিচয় দেওয়ার ঘটায় কেহ আর 'কোন্ বাড়ুজ্জে'—এ প্রশ্ন করিয়া খেলো হইতে চাহিল না। ঘুরিয়া ঘুরিয়া খোকার পানে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। একজন মন্তব্য করিল—"খাসা ছেলে।"

অপর একজন বলিল—"তা হবে না? অত বড় ঘরের দৌহিত্তির!"

সিগারেটের রেওয়াজটা নূতন চলিয়াছে, পিরান গায়ে দিয়া বাহিরে কোথাও যাইতে হইলে হারাণ সস্তা মার্কার একটা বাক্স পকেটে রাখিয়া দেয় ; কম্পূন্ডার, কি বড় ঘরের নফর বলিয়া পরিচয় দিতে জিনিসটা খুব সাহায্য করে ; রসিকলালের গাড়িটা মোড় ঘুরিয়া একটু আড়াল হইয়াছে, "বড় ঘরের দৌহিত্তির" কথায় হারাণ খোকাকে মাথাটা একটু ধরিয়া থাকিতে বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইল। একটু যে পিছাইয়া গেল, পা চালাইয়া আবার দলের পাশে আসিয়া পড়িল।...মুশকিল হইয়াছে এমন উৎকট সম্ভ্রম জাগাইয়াছে,

BanglaBook.org

কেহ আর কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিতেছে না যে, সে ফলাও করিয়া পরিচয়টা দেয়। শেষে নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল—"দূরের লোক বলে মনে হচ্ছে কর্তাদের!"

"আমরা সব মৌরিহাটার লোক। আসছি বাজিৎপুর থেকে।"

"মৌরি-হাটা—বড় নদীর ওপাড়ে তো? সে তো—বহুৎ দূর?"

"হ্যাঁ, কত্তার যাতায়াত আছে নাকি ওদিক পানে?"

"ডাক্তারের কম্পুণ্ডার—হয় বৈকি মাঝে মাঝে যেতে সে রকম কেস্ থাকলে।"

একটু চুপচাপ গেল, একজন প্রশ্ন করিল—"ডাক্তারটি কে?"

"বেলে-তেজপুরের ডাক্তার রসিক বাড়ুজ্জে; বাড়ির ছোট কর্তা, নাম শোনা নেই?"

ছিল না শোনা নামটা, কিন্তু হারাণ যেরকম বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল তাহাতে 'না' বলিলে নিজেকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর প্রতিপন্ন করা হয়। লোকটা একটু থতমত খাইয়া বলিল—"নাম শোনা আছে বৈকি, তবে চোখে দেখার সৈভাগ্যি হয় নি কখনও। গাড়ির মধ্যে যাঁকে দেখলাম তিনি নাকি? তা..."

এই সময় আরও একটা মোড় ঘুরিয়া গাড়িটা সামনে হইল। রসিকলাল হেলান দিয়া থেলো হুঁকো টানিতেছেন। হারাণ একবার দেখিয়া লইয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া উঠিল, বলিল—"তবেই হয়েছে! রসিক বাঁড়ুজ্জে ঐ রকম গোরুর গাড়িতে ঠ্যাং কাৎ করে শুয়ে টহল দিয়ে বেড়াবে? তানার বলে ঘোড়া থেকে নামবার ফুরসত নেই; সায়েব বাড়ির ঘোড়া;—বিজিট সেরে বাড়ি ফিরতেই ভুঁয়ে নুটিয়ে পড়ে—দুটো সহিসে চাঙ্গা করে তুলতে হিমসিম খেয়ে যায়।"

লোকটা একটু কাচুমাচু করিয়া বলিল—"আমরা ভাবলাম স্বয়ং ডাক্তারবাবুই বুঝি চলেছেন, চেহারা দেখা নেই কিনা। উনি তাহলে?"

হারাণ একটুও ভাবিল না, উত্তর করিল—"বাড়ির সরকারমশাই।"

সাতকড়ি ডাকিল—"হারাণ। কাকা ডাকছেন, শীগগির আয়।"

হারাণ একটুও সঙ্কুচিত না হইয়া বলিল—"চলো খোকাবাবু, সরকার কাকা ডাকছেন।" সঙ্গে সঙ্গে গতিবেগ বাড়াইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে দলটিকে পিছনে ফেলিয়া গাড়ির কাছে গিয়া হাজির হইল এবং রসিকলাল কিছু বলিবার পূর্বেই গিরিবালাকে বলিল—"আর সব বাদ দিয়ে খোকাবাবুকে তুমি মোক্তার করো দিদিমণি;—কি কথার তোড় ছেলের! ঐ অতগুলো লোকের একেবারে তাক্ লাগ্যে..."

রসিকলাল ধমকের স্বরে বললেন—"কথার তোড়? ও ঢুলছে দেখে তোকে ডাক দিলাম, শেষে কাঁধ থেকে গড়িয়ে না পড়ে!"

হারাণ বলিল—"তুমি একটু ক্ষমা দাও বাবাঠাকুর, মোক্তারে যেন ঢোলে না, একবার আমতার কাছারিতে মোক্তারখানাটা দেখে এসো গিয়ে! কি কথা ছেলের! তুমি ঐ করো গিরিদিদিমণি, জামাইবাবু এলেও আমি বলব'খন।"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"জজ গেল, মুৎছুদ্দি গেল, ডাক্তার গেল,—মোক্তার! হারাণের কামনাটা একবার দেখছ বাবা?"

রসিকলালও হাসিয়া বলিলেন—"তা বুঝলিনি? ও বেটা পরামাণিকের আর কত বুদ্ধির দৌড় হবে?...এক চাষা গেছল বর্ধমান, ফিরে আসতে সবাই জিজ্ঞেস করলে,

BanglaBook.org

'কি গো মোড়লের পো, কেমন দেখলে বল?' 'না, দেখলাম বই কি, স্বয়ং রাণীমা একটা প্রকাণ্ড সোনার হাঁড়িতে গোবর গুলে ঘর নিকুচ্ছেন, পাশে ইয়া ব্বড়া এক ধামার মধ্যে মুড়ি :—আমি যেতে'..."

সকলে হাসিয়া উঠিল। রসিকলাল হাসির মধ্যেই প্রশ্ন করিলেন—"খোকাবাবু মোক্তার হয়ে শামলা মাথায় দিয়ে কি করবে রে হারাণে?"

হারাণ মুখটা একটু গোঁজ করিয়া চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল —"একে মনিব তায় বামুন, বললে অপরাধ হয়, বলতে চাই না। ডাক্তার দেখে তো হাড় কালি হল। ডাক্তার হয়ে দাদা-মহাশয়ের মতো শুধু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবে বৈ তো নয়। তার চেয়ে মোক্তার হয়ে জোচ্চোর বেটাদের কাছ থেকে যদি বাকি বিজিটের অদ্ধেকগুলোও ট্যাকা আদায় করতে পারে তো পূর্বপুরুষের বাপের পাশ্চিত্তির হয়, হারাণকেও বুড়ো বয়েসে হক্কের ট্যাকা উসুল করতে পায়ের সুতো ছিঁড়তে হয় না।"

হারাণকে চটাইয়া আরোহীদের হাসির মধ্যে গরুর গাড়ি অগ্রসর হইতে লাগিল।

মামার বাড়িতে অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। প্রথম দিদিমা মারা গেছেন। খবরটা পাণ্ডুলে থাকিতেই গিরিবালা জানিতে পান, মনটা অনেকটা প্রস্তুত ছিল, তবু যতই কাছে আসিতে লাগিলেন হু হু করিয়া উঠিতে লাগিল, পৌঁছিয়া খুব একচোট কাঁদিলেন। দ্বিতীয় পরিবর্তন, বিকাশদাদার বিবাহ হইয়াছে। বধূটি বাপের বাড়িই ছিল, গিরিবালা আসিতেছেন বলিয়াই তাহাকে আনানো হইয়াছে। এগারো-বারো বৎসরের ফুটফুটে মেয়েটি, সম্পর্কের হিসাবে পায়ের ধূলা লইয়া গিরিবালা বয়সের হিসাবে স্নেহভরে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন ; অল্প সময়ের মধ্যেই ভাব হইয়া গেল। কিরকম সম্পূর্ণ নূতন একটা মিশ্র অনুভূতি--বিকাশদাদার কাছে গিরিবালা যে অপ্রমেয় স্নেহ পাইয়া আসিতেছেন, সেইটেই যেন এই মেয়েটির উপর উৎসারিত হইয়া পড়িতেছে, শুধু কোথা থেকে—টানিয়া আনা খানিকটা ভক্তিরসের সঙ্গে মেশানো,—খেলা-ঘরের পুতুলকে গুরুজন বলিয়া ধরিয়া লইলে যেমন একটা শখের ভক্তি আসে কতকটা সেইরূপ। বড় কৌতুকপ্রদ ব্যাপার।

সবচেয়ে বড় পরিবর্তন, যাহা এতদিন পরের মিলনে সমস্ত মাধুর্যটিকে বিস্বাদ করিয়া দিল তাহা এই যে মাসিমা কাত্যায়নী দেবী এখানে নাই। তিনি যে একআধ দিনের জন্য কোথাও গেছেন এমন নয়, একবারেই সিমুর ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস করিতেছেন। এটা তো জানা খবর, মনটা প্রস্তুতই ছিল, কিন্তু তবু যেন গিরিবালা হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিলেন। একদিক দিয়া বাড়িটার আরও বরং শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, মামার চাকরিরও উন্নতি হইয়াছে, বিকাশদাদাও তিনটি পাস দিয়া নিকটের আমতার স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছেন, বাড়িঘর সাজসজ্জা—সব দিক দিয়াই সংসারটা পূর্বের চেয়ে ঢের বেশি গোছোনো, নূতন বৌটি যেন সবটুকুর উপরে আরও আলো ছড়াইয়াছে ; কিন্তু গিরিবালার চক্ষে তবু যেন সব পূর্ণতাকে অর্থহীন করিয়া মস্ত বড় একটা শূন্যতা রহিয়াছে একা কাত্যায়নীর অভাবে। বর্তমান প্রত্যক্ষকে ঠেলিয়া, কাত্যায়নী দেবী দিয়া পূর্ণ পূর্বের দিনগুলি সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেছে।

মামীমা বলিলেন—"ঠাকুরঝিকে দেওয়া হয়েছে খবর গিরি ; আর বড় একটা আসেন না, তা তুই এসেছিস শুনেছেন, নিশ্চয় এসে পড়বেন এবার।"

BanglaBook.org

একদিন গেল, দুইদিন গেল, গিরিবালার বিস্ময় এবং অভিমান যখন কানায় কানায় পূর্ণ, তখন তৃতীয় দিনে, কাত্যায়নী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু বোধ হয় না আসিলেই ছিল ভালো, গিরিবালার জীবনের একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ বজায় থাকিয়া যাইত।—

কাত্যায়নীর অমন চাঁপা ফুলের মতো রঙের উপর কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে, সামনের একটা দিক ঘেঁষিয়া একখামচা চুল পাকিয়া গিয়াছে চোখের কোলে গাঢ় কালির ছোপ। এগুলো তবুও একরকম করিয়া সহ্য করা যায়, সব চেয়ে দুঃসহ হইয়াছে কাত্যায়নীর চোখের দৃষ্টি। যে দুইটি চোখে হাসি সর্বদাই ছলছলিয়া থাকিত তাহাতে যেন বিশ্বের ক্ষুধা সহজ ক্ষুধা নয়, তৃপ্তির কোন আশাই না থাকিলে যে একটু অপ্রসন্ন জ্বালাময় ক্ষুধা থাকে সেই ক্ষুধা। মনটা যেন সমস্ত জিনিসের উপরেই জিভ বুলাইয়া ফিরিতেছে, আর সবই বিস্বাদ বলিয়া নিদারুণ হতাশা আর বিরক্তিতে নিজের মধ্যে ক্রমাগতই গুটাইয়া যাইতেছে।

আসিয়াছেন শুনিয়া গিরিবালা তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেই আগেকার আব্দার-আনন্দের সুরে—"মনে পড়ল গিরিকে?"—বলিয়া আগাইয়া গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন। নিষ্প্রভ মুখে প্রশ্ন করিলেন—"এ কি চেহারা তোমার মাসিমা?"

"আর চেহারা মা!" বলিয়া নামিয়াই গাড়িটার দিকে ঘুরিয়া তিক্তকণ্ঠে ঝঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"এইদিক দিয়ে নেমে মরো না, মুয়ে আগুন!"

একটি বছর তিনেকের ছেলে, রংটা ফ্যাকাশে-কালো, রোগা ডিগডিগে, পেট-জোড়া পিলে, তাহারই উপর একটা সবুজ সাটিনের জামা আর তাঁতের কাপড়ে সাজানো। কি ভাবিয়া গাড়োয়ানের কোলে সামনের দিক দিয়া নামিতে যাইতেছিল, কাত্যায়নীর ধমকে মুখ কাঁচুমাচু করিয়া এদিকে সরিয়া আসিয়া হাত বাড়াইল। "ল্যাংবোট নিয়ে আর পারি না!"—বলিয়া বেশ একটু রূঢ় হস্তেই ছেলেটিকে নামাইয়া দিয়া কাত্যায়নী যেন বেশ চেষ্টা করিয়াই নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন। গিরিবালার দিকে চাহিয়া ক্লান্ত এবং কতকটা আবেগহীন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কেমন আছিস গিরি? গেলি তো যেন সবাইকে ভুলে গেলি একেবারে!"

মামীমা, বিকাশের স্ত্রীও আসিয়া পিছনে দাঁড়াইয়াছেন, গিরিবালা যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এতক্ষণে সম্বিৎ প্রাপ্ত হইয়া প্রণাম করিলেন। হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"যা সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারে পাঠিয়েছেন গিরিকে!...তোমার শরীর এ কি হয়ে গেছে মাসিমা?"

"আর শরীর মা! আয় ভেতরে চল।...কাসিম, এগুলো ভেতরে নিয়ে এসো। ...বাগানের কিছু তরিতরকারি হয়েছে, ভাবলাম গিরি এসেছে, ভালোবাসে। ওরকম হাড়গিলের মতো দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আয়?"

ছেলেটি বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়াছিল, গিরিবালা আগাইয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন, প্রশ্ন করলেন, "কার ছেলে মাসিমা?"

বিকাশের বৌ আসিয়া প্রণাম করিতেছে—"এস মা, চির এয়োস্ত্রী হও"—বলিয়া কাত্যায়নী আশীর্বাদ করিতেছিলেন, মামীমাই উত্তর দিলেন—"মেজঠাকুরঝির দেওর-পোর ছেলে!"

BanglaBook.org

"বাঃ!..." বলিয়া ছেলেরই হোক বা তাহার পরিচ্ছদের হোক একটা মনরাখা প্রশংসা করিতে যাইতেছিলেন গিরিবালা, এমন সময় বিকাশ খোকাকে কোলে লইয়া উপস্থিত হইল, দীপ্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"কার ছেলে বলো দিকিন পিসীমা? গিরির!'

কাত্যায়নী কষ্টেসৃষ্টে যেটুকু হাসিখুসির ভাব আনিয়াছিলেন, এক মুহূর্তেই যেন উবিয়া গেল। কিন্তু মুহূর্তের জন্যই ; প্রাণপণে সেটাকে আবার ফিরাইয়া মৃতের হাসি মুখে টানিয়া বলিলেন—"গিরির? বাঃ!..."

তাহার পর নিতান্ত ভুল শোধরানো গোছের করিয়াই অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"দে আমার কোলে দে।"

কোলে লইয়া একটা চুম্বন দিয়া বলিলেন—"বাঃ কী চমৎকারটি হয়েছে! তা হবে না?"

বিকাশের স্ত্রী তাড়াতাড়ি দাওয়ায় একটা মাদুর বিছাইয়া দিল, তাহার উপর বসিয়া গল্প আরম্ভ হইল। এতদিনের পর দেখা, তাও দেখা কাত্যায়নী দেবীর সঙ্গে—হাজার রকমের কথা চারিদিক দিয়া ভিড় করিয়া আসিবার কথা, কিন্তু এমন সুর কাটিয়া গেছে, কিছুই যেন যোগাইতেছে না। বসিয়া মিনিটখানেক অতিবাহিত হইবার পর গিরিবালা বলিলেন —"আমি এসে পর্যন্ত তোমার খোঁজ করছি মাসিমা, আজ তুমি না এলে চলেই যেতাম ভেবেছিলাম।"

কাত্যায়নী দেবী ক্লান্তস্বরে বলিলেন—"যা পায়ের বেড়ি মা, আসবার কি যো আছে? তোর মামীমাকেই জিগ্যেস কর না, কবার এসেছি এর মধ্যে! গোরু, বাছুর, ক্ষেত-খামারগুলো রয়েছে, কিন্তু নিজে যেদিকটা না দেখছি সেদিকটাই পণ্ড : দেওর সেই রকম, আর দেওর-পোর কথা..."

প্রসঙ্গটা তুলিয়াই ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"তাই কি ছাই নিজের শরীরই ভালো যে...।"

মামীমা গিরিবালাকে বলিলেন—"আমরা সবাই বারণ করেছিলাম, ও ম্যালেরিয়ার মধ্যে যেয়ো না তুমি, শরীর টেকবে না, তা..."

কাত্যায়নী যেন একবার সাজানো বাড়ি আর সুস্থ মুখগুলির উপর লুব্ধ দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া গিরিবালাকে সাক্ষী মানিয়া বলিলেন—"ভাবলাম শ্বশুরের ভিটে অপোগণ্ডগুলোর হাতে পড়ে বরবাদ যাচ্ছে, একটু গোছাগাছ করে দিগে।...আর ভাইয়ের গলগ্রহ হয়েই বা কতদিন থাকি, তুই-ই বল না গিরি?"

খোকা কোলের উপর বসিয়া আছে, একে অপরিচিত কোল, তায় না একটু আদর, না একটা কথা, অস্বস্তিটা জমিয়া জমিয়া প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিয়াছে, গিরিবালা বলিলেন—"ওকি, কান্না কেন, বোকা ছেলে। দিদিমা হন যে। ওমা দেখ, ঠোঁট কেঁপে উঠেছে ছেলের!...আয় তবে আমার কাছে।..."

কাত্যায়নীর অস্বস্তিটা বোধ হয় আরও প্রবল ছিল, একবার খোকার পানে ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিলেন—"থাকতে চাইছে না বুঝি? নতুন মানুষ দেখেছে কিনা।...শালা মেড়োর কাছে নতুন মানুষই হব বৈকি!"

রসিকতার সঙ্গে একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া—খোকাকে গিরিবালার দিকে আগাইয়া দিলেন। বিকাশের বৌকে বলিলেন—"তুমি বনমালীকে নিয়ে গিয়ে মুখ হাত ধুইয়ে কিছু

BanglaBook.org

একটু খাইয়ে দাও গে তো বৌমা; গল্পগুজবে আবার আমরা ভুলে যাব।"

কথাটার মধ্যে খোঁচা দেওয়ার ভাবটা এতই স্পষ্ট যে, এদের মামীভাগনী দুইজনেরই গায়ে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল, কচি বৌ হইলেও বিকাশের স্ত্রী যেন একটু কী রকম হইয়া গেল। মামীমা একটু তিক্তকণ্ঠেই বলিলেন—"যাও না বৌমা; দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

গিরিবালা যেন নিজের চক্ষু-কর্ণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। হঠাৎ এ কি ব্যাপার! তাঁহার মনটা ক্রমাগতই অতীতে ছুটিয়া যাইতেছে—যখন মামার বাড়ি মানেই এক হিসাবে ছিল কাত্যায়নী দেবী, কথায় কথায় আবেগভরে বুকে চাপিয়া ধরা—বিনা প্রয়োজনে উচ্ছ্বসিত আলাপ—গিরি আসিয়াছে, একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেছে,—দিদিমা বলিতেছেন—"হ্যাঁরে কাতু, গিরিকে তুই একলাই দখল করে রাখবি?" আজ চার বৎসর পরে এ কি উচ্ছ্বাসলেশহীন মিলন! শুধু তাহাই নয়,—গিরিবালার চারিদিকে, তাঁহার সমৃদ্ধিকে ঘিরিয়া এক একটা বিষ-বায়ুর প্রবাহ!...বাড়িতে মা একবার বলিয়াছেন—"মেজদিদি শুনেছি একটু যেন কী রকম হয়ে গেছেন।" আজই সকালে মামীমা একটা "কিন্তু" দিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—মেজঠাকুরঝি আসছেন বটে, কিন্তু...

ব্যাপারখানা কী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া গিরিবালার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

সমস্ত দিন এইরকম আবহাওয়ার মধ্যেই কাটিল। কাত্যায়নী যেন সমস্ত শক্তি দিয়া সহজ ভাব আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য সেই পুরনো দিনের এক একটা হাসির ঝলক যেন আসিয়াও পড়িতেছে, তাহার পর আবার বনমালীকে উপলক্ষ্য করিয়া হোক বা যে কোন একটা সামান্য ছুতা অবলম্বন করিয়াই হোক, মনের গ্লানিটা যেন উপচিয়া পড়িতেছে। গিরিবালা আসিয়া দুই দিন বাহির হন নাই, সাধ ছিল মাসিমা আসিলে তাঁহার সহিত পুর্বের মতো বেড়াইতে যাইবেন—এবার আবার গিরিবালার সঙ্গে খোকার পরিচয়—সবার আদরে প্রশংসায় খোকা যেন বোঝাই হইয়া যাইতেছে—কল্পনাতে গিলিবালার বুকটা যেন ভরিয়া উঠিতেছিল...আর বাস্তব এই,—খোকা পর্যন্ত একটু আদর পাইল না মাসিমার কাছে।...গিরিবালার কণ্ঠটা মাঝে মাঝে অশ্রুরুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে—একটা প্রশ্ন ঠেলিয়া উঠিতেছে—'এ কি!—এ রকম কেন?'

॥ ৭ ॥

উত্তরটা বিকাশ দিলেন।

পরের দিন সকালে উঠিয়া কাত্যায়নী অপ্রত্যাশিত ভাবেই যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া লাগাইয়া দিলেন। ভাই, ভাজ, গিরিবালা তিনজনেই বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"সে কি!"

কাত্যায়নী বনমালীকে দেখাইয়া বলিলেন—"থাকবার জো আছে? ওই ল্যাংবোট, ওর হ্যাপা কম?...যখন আবার কখনও আসবি, আমি যেন খবর পাই গিরি, নৈলে বড্ড রাগ করব।"

সূর্যোদয়ের ঘন্টাখানেকের মধ্যে চলিয়া গেলেন, সকলেই অনুভব করিল তিনি যেন বাঁচিলেন।...এঁরা সকলেও যে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন একথা নিজের মনে মনে কেহই

অস্বীকার করিতে পারিলেন না।

পরদিন ছিল রবিবার, বিকাশের ছুটি বটে, কিন্তু এই দিনটিতেই অবসর সবচেয়ে কম। ওঁর কি সব নানারকম সমিতি আছে, সংঘ আছে, মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহের ব্যাপার আছে, ঔষধ বিতরণ আছে—সেই সব লইয়াই সাতদিনের কাজ এই একটা দিনে ওঁকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলে। সক্কালবেলা বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, দুপুর গড়াইয়া গেলে একবার আসিয়া খুব তাড়াতাড়ি স্নানাহার সারিয়া আবার বাহির হইয়া গেলেন। আহারের সময় গিরিবালা খোকাকে লইয়া একটু আটকাইয়া গিয়াছিলেন, তাড়াতাড়ি পাখা হাতে করিয়া আসিয়া দেখেন বিকাশ দুধের বাটিতে চুমুক দিতেছেন। বিস্মিতভাবে পাখাটা একটু তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন—"ওমা, একি! আমি কোথায় আসছি হাওয়া করতে করতে বিকাশদাদার সঙ্গে একটু গল্পসল্প করব...আর একি খাওয়ার ছিরি!"

বিকাশ উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"বড্ড ব্যস্ত আছি গিরি, রবিবার—মরবার ফুরসত থাকে না। তা তুই আছিস, সকাল সকালই ফিরব'খন, তাড়াতাড়ি একটা পান দে দিকিন্।"

পান লইয়া আসিল বধূ, বলিল—"দিদি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন।"

বিকাশ পানটা লইয়াই পা বাড়াইয়াছিলেন, ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলেন—"কাঁদছে!—কেন?"

সঙ্গে সঙ্গে একটু অন্যমনস্ক হইয়া বলিলেন—"হুঁ, কাঁদবেই এবারে, সে-আদরটা পাচ্ছে না কিনা, পিসিমার কাছে খুব ধাক্কা খেলে, তারপর আমিও... পোড়া চাকরি যে হয়েছে কাল...চলো তো কোথায় দেখিয়ে দেবে!"

দুই পা অগ্রসর হইয়া বলিলেন—"না, থাক্ এখন। ওকে বুঝিয়ে বোল—এখনও জন তিরিশেক লোক বসে আছে ওষুধের জন্যে। পারবে?...বোল আমি আজ শীগ্গিরই আসব, অনেক গল্প বাকি রয়েছে কিনা গিরির সঙ্গে—এইভাবে বোল।" দুয়ারের নিকট আর একবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন— "আর মাকেও একটু আড়ালে বলে দিও যেন কাছে কাছে রাখেন...হবেই অভিমান একটু ওর।"

অবশ্য শীঘ্র ফেরা হইল না। তবে অন্য মানুষ হইয়া ফিরিলেন, একথা ঠিক।—

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়া একটু রাত্রিই হইয়াছে। হেমন্তের কুহেলীলিপ্ত জ্যোৎস্নায় উঠানটা ভরিয়া গিয়াছে। কোণের শিউলি গাছটা থেকে আধফোটা ফুলের গন্ধ উঠিয়াছে। দাওয়ায় একটা মাদুরে বসিয়া গিরিবালা, খোকা, বিকাশের বধূ। গল্প হইতেছে ; এমন সময়—"গিরি, কী করিস রে, অ্যাঁ?"—বলিয়া বিকাশ মন্থরগতিতে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া শিউলি গাছটার দিকে অগ্রসর হইয়া গোটাকতক ফুল সঞ্চয় করিলেন, সেগুলোকে লুফিতে লুফিতে, শুঁকিতে শুঁকিতে দাওয়ার কাছে আসিয়া বলিলেন—"গল্প করছিস? মস্তবড় সঙ্গী পেয়েছিস তো!" বধূ উঠিয়া গেল।

বিকাশকে অদ্ভুত দেখাইতেছে। সকালবেলার সে উৎকট বাস্ততার জায়গায় একটি সমাহিত শান্তি তাঁহার মুখে, চোখে, দীর্ঘচ্ছন্দ দেহটিকে ছাইয়া আছে। সমস্ত দিন অনুপস্থিত থাকিবার কারণ গিরিবালা বধূর কাছে, মামীমার কাছে খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া শুনিয়াছিলেন, বিকাশদাদার উপর এমনি তাঁহার যে সহজ প্রীতি আর ভক্তি সেটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। এখন দেখিয়া মনে হইল, সত্যই অনেক সেবা, অনেক কৃচ্ছ্রের পুণ্য লইয়া

BanglaBook.org

বিকাশদাদা যেন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কোন গ্রন্থ পড়িয়া উঠিলে যেমন পণ্ডিতমশাইকে দেখায়, পূজা করিয়া উঠিলে দেখায় যেমন জেঠ-শ্বশুরকে—বিকাশদাদাকে ঠিক সেই রকম দেখিতে হইয়াছে। কিন্তু সেকথা অবশ্য বাহিরে বলিবার মেয়ে নন, সকলের অভিমান টানিয়া বলিলেন...“কী করবো, যাঁদের ভালো বলে গুমর তাঁরা নিজের পুণ্যির যোগাড়েই ব্যস্ত। আমার ওই ভালো, গবীরেব রাঙ্ইই সোনা!”

“রাগ করেছিস? না, রাগ করিস নি গিরি ; ছ'টা দিন চাকরির পরে, এই একটা দিন নিজের বলে পাই...”

পাশ থেকে একটা টুল টানিয়া লইয়া বসিয়া কতকটা নিজের মনেই বলিলেন—“বড্ড গরীবের, বড্ড কষ্ট, হাজার বচ্ছর হয়ে গেল পায়ের থেঁৎলানি খাচ্ছে কিনা...”

বেশ অন্যমনস্ক হইয়া গেছেন। গিরিবালা টুকিলেন না। অবশ্য হাজার বৎসরের থেঁৎলানি খাওয়া যে কী বিশেষ কিছু বুঝিলেন না, তবে আনন্দ হইল সেই ছেলেবেলার বিকাশদাদা যেন ফিরিয়া আসিতেছেন : নীরবে প্রতীক্ষ করিয়া রহিলেন।

একটু পরেই যেন এ-ভাবটা চেষ্টা করিয়াই মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বিকাশ বলিলেন—“আমি এবার তোর সঙ্গে ভালো করে কথা কইতে পারিনি, মনে এখন পর্যন্ত পারিনি, তবে কাল ছুটি নিয়েছি, তুই এসেছিস বলেই ; তা ভিন্ন তোর ছেলেটার সঙ্গে ভাব করতে হবে। পারিনি তেমন কথা কইতে, কিন্তু তোকে যে না দেখছি, তোর কথা যে না ভাবছি এ মনে করিস নি গিরি।”

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—“কেতাত্ত হয়ে গেলাম।”

বিকাশও হাসিল, বলিল—“ঠাট্টা নয়, সত্যি।”

তাহার পরই ধীরে ধীরে মনের উৎসটা যেন খুলিয়া গেল। বিকাশ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার ভগ্নীর পানে চাহিলেন, তাহার পর খোকার দিকে চাহিয়া উঠিয়া বলিলেন—“দে ওকে আমার কোলে, আসবে?”

“তা কোল-ক্যাংলা আছে।—” বলিয়া গিরিবালা খোকাকে বিকাশের হাতে তুলিয়া দিলেন। বিকাশ আবার টুলে বসিয়া খোকার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—“বেশ হয়েছে এটা।...আর একটা কি কথা জানিস?—তুই লজ্জা পাবি, তবু বলি—এ হয়ে তোকে যেন আরও মানিয়েছে,—তোকে দেখে আগে শুধু স্নেহ হোত, এখন শ্রদ্ধা হচ্ছে গিরি। তোরা মা হয়ে যে কী আশ্চর্য রকম বদলে যাস আর বেড়ে যাস! আমার কি মনে হয় জানিস? পুরুষের বাপ হওয়া আর মেয়েছেলের মা হওয়া এক ধরনের ব্যাপার নয়। পুরুষ বাপ হয়েও যা ছিল তাই থাকে, মেয়েছেলে মা হয়ে একেবারে অন্য জিনিস হয়ে যায়। শুনলে তোর হাসি পাবে—বয়স যখন কম, আমি এক একবার ভাবতাম মেয়েছেলের পৈতে হয় না কেন! রাগ হোত পুরুষদের একচোখোমিতে—নিজে একেবারে দ্বিজ হয়ে গেলেন, ঢাক ঢোল পিটিয়ে, ও বেচারিরা ‘নমঃ ছেড়ে—‘ওঁ’ বলবারও অধিকার পেলে না। তারপর একদিন মনে হল, না, ওদের দ্বিজত্বের ব্যাপারটা যে ভগবান নিজের হাতে রেখেছেন, মা করে যে ওদের আরও বদলে দেন, একেবারেই একটা নূতন আর ঢের বড় জীবন দেন, পুরুষ যে জীবনের নাগালই পায় না।...তুই লজ্জা পাচ্ছিস গিরি, থাক, আর না হয় বলব না। কি জানিস? কথাগুলো যখন মনে জাগে, তোর কথা মনে পড়ে, আশা আমার মস্তবড় কিনা যে, তুই আদর্শ মা হবি। মস্তবড় আশা একটা...”

BanglaBook.org

অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন, যাকে উপলক্ষ্য করিয়া বলা, সে বুঝিল কি না বুঝিল, যেন খেয়াল থাকে না; কতকটা উত্তেজিত ভাবেই বলিয়া ওঠেন—"উঃ, সেদিন পড়ছিলাম ভিক্টোর হিউগো...ফ্যানটাইন!—মেয়ের খরচের জন্যে নিজের দু'সারি দাঁত বিক্রি করে দিলে—কাঁচা দু'সারি দাঁত! একবার বড় ইচ্ছে হয় ভগবানের সভায় গিয়ে ফ্যানটাইনকে দেখি—লক্ষ কোটি পুণ্যবলে মহাপুরুষ— পুণ্যের প্রভায় সূর্যের মত ভাস্বর, তাদেরই পাশে ফ্যানটাইন—কাপড়-ছেঁড়া; চুল ছেঁড়া; নিদন্ত কুৎসিত মুখ দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে, চোখে সন্তানের জন্য পাগলের দৃষ্টি...দেখি সেদিনকার জ্যোতির মুকুট কার মাথায় তুলে দেন ভগবান, সেই চরম মায়ের কাছে কোন্ যোগলব্ধ পুণ্য না নিষ্প্রভ হয়ে যায়..."

"ভগবান তোদের চেনেন। মায়ের জাত এখানে চিরকাল—যুগ যুগ ধরে কষ্ট পেলে, যত রকম কষ্ট আসতে পারে পুরুষের কল্পনায়; কিন্তু যে তোদের গড়লে সে তোদের চেনে। আমার কথাগুলো একটু কেমন কেমন শুনতে হয়, কিন্তু দেখ না, পুরুষ যতদিন বাপ হয় মেয়েছেলেকে তার চেয়ে ঢের বেশি দিন মা হয়ে থাকতে হয়—মায়ের দরকারই বেশি যে তাঁর দৃষ্টিতে।"

একটু চুপ করিলেন, সেও যেন উচ্ছ্বাসের একটা রূপ—কথা নিজেদের ভিড়েই যেন আবদ্ধ হইয়া গেছে।...খোকা মুখটা হেলাইয়া দুলাইয়া নতদৃষ্টি জননীর মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। ধীরে ধীরে তাহার রেশমের মতো কুন্তলে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"রাগ ধরে না?—সব কবিই আজ পর্যন্ত মেয়েদের প্রেয়সী রূপটাকেই বড় করে গেল..."

তাহার পর আরও আত্মগতভাবে বলিলেন—"ওর চেয়ে উঁচুসুরে বীণা বাঁধবে—সে শক্তিই বা কোথায়?"

এরপর চুপ করিলেন একটু বেশিক্ষণ পর্যন্ত। গিরিবালা মাদুরের একটা কাঠি খুঁটিতেছেন—এমন গুরুভার একটা প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে কী করিয়া বাহির হইয়া আসিবেন চিন্তা করিতেছেন, বিকাশ বলিয়া উঠিলেন —"গিরি, এবারে তোর বড্ড কষ্ট হল এখানে এসে, না?"

গিরিবালা মুখ তুলিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"সেকি কথা! কেন?"

"হয়েছে কষ্ট।"

গিরিবালা প্রায় ভীত হইয়াই বলিলেন—"কেন? তুমি থাকতে পারছ না বলে বিকাশদা?...তুমি অতগুনো ভালো কাজ নিয়ে..."

"আমার না-থাকবার জন্যে নয়, আমি তো ছুটিও নিলাম, কাল খালি তোর সঙ্গে গল্প করব, তোর শ্বশুরবাড়ির কথা বাকি আছে, তুই বলে উঠতে পারবি না।...তুই কষ্ট পেয়েছিস মেজপিসির জন্যে।"

গিরিবালা যেন কূল পাইলেন, আগ্রহান্বিত কণ্ঠে বলিলেন—"সত্যি বিকাশদাদা, মাসিমা কী হয়ে গেছেন!—কেন বল তো?"

বিকাশ একটু ভাবিয়া বলিলেন, "খুব সোজা কথা গিরি;—পিসিমা মেয়ে হয়েও মেয়ে হওয়ার সার্থকতা পেলেন না। তারপর অর্ধেক জীবন ধরে অক্লান্ত ভাবে নানান দিক দিয়ে পিসিমা সেই সার্থকতাকে খুঁজেছেন। যাকেই পেয়েছেন, খালি বুক দিয়ে তাকেই

BanglaBook.org

জড়িয়ে ধরতে গেছেন। আমি অত আদর কারুর কাছে পাইনি, তুইও নিশ্চয় সেই কথা বলবি।—শুধু তাই নয়, আমাদের সমস্ত সংসারটা ছিল মাত্র একজনের সংসার—মেজপিসিমার। তোর বিয়ের আগে পর্যন্ত এই অবস্থা ছিল, পিসিমা নিজের মনের গুণে পরকে আপন করে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সংসার করে যাচ্ছিলেন, কিন্তু উনি বুঝতে পারেন যে, সেটা ওপরে ওপরে। ওঁর মনের মধ্যে ঘুণ ধরে গিয়েছিল। একটু অদ্ভুত শোনাবে; কিন্তু আমাদের সংসারই ওঁর মনে সেই ঘুণ ধারালে, যে আনন্দটুকু উনি এখানে পাচ্ছিলেন, সে আনন্দটুকুই যেন ওঁকে পথ দেখিয়ে বলে দিলে তাকে এক জায়গায় আরও নিবিড়ভাবে পাওয়া যেতে পারে। বাপের বাড়ির চেয়ে শ্বশুরবাড়িই মেয়ের ঢের বেশি আপন, কেননা সেইখানে তার সৃষ্টির সার্থকতা। সেই আপন সংসার পাতবার নেশা চাপল মেজপিসিমার, এই নেশার ঝোঁকেই একদিন তোর সর্বনাশ করতে বসেছিলেন, অবশ্য নিজের মনকে না জেনে।"

সেই পুরনো স্মৃতিটাই যেন বিকাশের মুখটা বন্ধ করিয়া দিল; আবার বলিতে লাগিলেন—

"উনি তখনও বুঝতে পারেন নি যে, উনি আসলে কী চান। পিসিমা আসলে খুঁজেছিলেন ওঁর পেটের সন্তানকে—যে সন্তানের জন্যে ওঁর বুকের দুধের সঙ্গে ওঁর বুকে স্নেহ জমান ছিল। আমি পিসিমাকে কম ভালেবাসিনি, কম ভক্তি করিনি, এখনও—ওরকম হয়ে গেলেও—একরত্তি কম করি না, কেননা আমি পিসিমার জীবনের যা বিড়ম্বনা তা ভালো রকমই বুঝি। তা সত্ত্বেও উনি একদিন মেয়েমানুষের সহজ চৈতন্য দিয়ে বুঝতে পারলেন—ওঁর অন্তরাত্মা যা খুঁজছে আমি তা নয়, হতে পারি না—আমার দেওয়া তৃপ্তিটা খাঁটি নয়,— সেই অমৃত নয় যার শক্তিতে মেয়েমানুষ নিজের উদ্দেশ্যে বাঁচে সংসারে। নিরাশ হয়ে ওঁর মন ছুটল মেয়েমানুষের আপন জায়গায়—শ্বশুরবাড়িতে। দেওরপোকে নিয়ে সংসার গড়বার নেশা চাপল; দেওর-পো হল স্বামীর ভাইয়ের ছেলে, নিজের ভাইয়ের ছেলের চেয়ে নিশ্চয় কাছে। এই নেশার ঘোরেই পিসিমা তোকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন, উনি পারলেন না, তার কারণ ক্ষিদেয় ওঁর মধ্যকার আসল মানুষটি তখনও মরে যায় নি, সে মরবার আগে তার শেষ জয় নিষ্পন্ন করে গেল।"

"তারপরেই কিন্তু পিসিমা বদলে গেলেন। অত্যন্ত ক্ষিদেতে যেমন করে মানুষ খুব বেশি খেয়ে মরে না?—পিসিমার তাই হল। অপদার্থ দেওরপোর ওপর নিজের সব স্নেহ উজোড় করে, নিজের সব সম্পত্তি উজোড় করে, তার বিয়ে দিয়ে, নাতি-নাতনীর মুখ দেখে একেবারে হৈ হৈ করে ঘর-সংসার আরম্ভ করে দিলেন—তার সমস্ত অত্যাচার ছেলের অত্যাচারের মতোই অঙ্গের ভূষণ করে নিয়ে। দু'আড়াইটা বছর কাটিয়ে দিলেন যেন একটা ঘোরের মধ্যে, ক্রমাগতই নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে—পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি, এতদিনের খোঁজা সার্থক হয়েছে।"

"তারপর ক্লান্তি এল, বুঝতে পারলেন এখানেও আলেয়ার পেছনে এতদিন ছুটোছুটি করেছেন মাত্র।...ধোঁকা খেয়ে খেয়ে ওঁর এখন সমস্ত পৃথিবীটার ওপর এসে গেছে আক্রোশ, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস। নাতিটার প্রতি ব্যবহার দেখলি না? অবস্থাগতিকে ছাড়তে পারেন না, কিন্তু দু'চক্ষের বিষ, পাশে থেকে ও শুধু যেন মনে করিয়ে দেয় সমস্ত সংসারটা এই রকম—অথচ ছাড়বার জো নেই—আলেয়া শুধু নিরাশ করে নি—উলটে তাড়া করে

BanglaBook.org

বেড়াচ্ছে...তুই এই অসহায় অবস্থায় পিসিমাকে দেখলি।"

"পিসিমাকে দুষিস্ নি গিরি। নিঃসন্তান বালবিধবার এই জীবন,—কেউ উপায় নেই জেনে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে—সেইভাবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়, কেউ হাতড়ে হাতড়ে বেড়ায়,—'পেয়েছি' বলে অনেক ধরতে ধরতে ক্লান্ত হয়ে বিরূপ হয়ে ওঠে। পিসিমা তাই।"

"পিসিমাকে দুষিস্ নি। শুধু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিস উনি যেন আর না বাঁচেন; এখন তবুও কিছু আছেন, আর বাঁচলে পিসিমা হয়ে উঠবেন ভয়ঙ্কর—যদি একান্তই উন্মাদ হয়ে না যান।"

"অথচ সমস্তর গোড়ায় মাত্র একটি কথা;—পিসিমা সন্তানের মা হতে পারেন নি।"

॥ ৮ ॥

সমস্ত শীতটা বেলে-তেজপুরে কাটাইয়া—ফাল্গুনের মাঝামাঝি গিরিবালা পাণ্ডুলে ফিরিয়া আসিলেন।

বিপিনবিহারী গিরিবালার অসুখ ছাড়িবার দুই তিন দিন পরেই পাণ্ডুলে চলিয়া যান। ফাল্গুনের গোড়াতেই মধুসূদন সাঁতরায় আসিলেন; বাড়িতে খানকতক ঘর বাড়ান হইতেছে, একবার দেখিয়া যাওয়াটা উদ্দেশ্য: সেই সঙ্গে গিরিবালাকে লইয়া যাওয়া। দিন সাতেক সাঁতরায় কাটিল। এবারে সাঁতরা ভালো লাগিল না,—মনোমোহিনী দেবী, তাঁহার পুত্রবধূ, খেতন—ইঁহারা কেহই নাই, মনোমোহিনী দেবীর কোনও দেওরপোর বিবাহ, সেই উপলক্ষে শ্বশুরালয়ে গিয়াছেন। একে বাড়ি ছাড়িয়া আসিতে এবারে প্রথম বারের চেয়ে কষ্ট হইয়াছে, (হয়ই, কেননা প্রথমবার উৎসবের পরিমণ্ডল আর অভিনবত্বের ঔৎসুক্য বিচ্ছেদের বেদনাটাকে অনেক চাপা দিয়া রাখে) তায় না বৌ, না মনোমোহিনী দেবী—বড়ই ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। জেঠশ্বশুরের আদরটা পাইলেন,—ঐ একমাত্র অবলম্বন রহিল। মনোমোহিনী দেবী থাকিলে সেই আদর ভাঙাইয়া যাত্রা, কথকতা নানান রকম উৎসব দেখিয়া বেড়াইবার যে সুবিধাটা ছিল সেটার অভাব বড় অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহা ভিন্ন ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি,—এক কাত্যায়নী দেবী ভিন্ন অত দরদঢালা আদর জীবনে কাহারও নিকট পান নাই। এবার আবার সেখানে অমন ধাক্কাটা খাইয়া মনোমোহিনী দেবীর জন্য মনটা যেন আরও উন্মুখ হইয়াছিল।

জেঠশ্বশুরের মধ্যে এবার একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসিয়াছে। প্রথম আসিয়া জেঠশ্বশুরকে দেখিয়া পণ্ডিতমশাইয়ের কথা বড় মনে পড়িত,—দুইজনেই পণ্ডিত মানুষ আর দুইজনের মধ্যে একটা তেজ দেখা যাইত। একটু বেশি জানার পর জেঠশ্বশুরের যখন উগ্র শুচিবাইয়ের কথা ধরা পড়িল, তখন ঐ দিক দিয়া আবার যেন আলাদা হইয়া পড়িলেন; এক দিক দিয়া যেমন মিলটা রহিল, অন্য দিক দিয়া তেমনি গরমিলটা ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। অবশ্য সেই দুর্বাবিল্বপত্র বাছার ব্যাপারটার পর হইতে জেঠশ্বশুর আবার বদলাইয়া যাইতেছেন এটা গিরিবালা দেখিয়া গিয়াছিলেন।

এবার দেখিলেন যেন সে-মানুষই নয়।—পাণ্ডিত্য তো কমিবে না, পূজার্চনা সেই

BanglaBook.org

রকমই হইতেছে, কিন্তু অতি-শুচিতার সেই উগ্র রুক্ষতা সরিয়া গিয়া এমন একটি স্নিগ্ধ ক্ষমার ভাব আসিয়া গেছে যে, প্রতি পদেই যেন পণ্ডিতমশাইয়ের কথা মনে করাইয়া দেন। স্নেহের পরিমাণ সেই রকমই আছে ; কেননা গিরিবালার মনে হয়, তাহার চেয়ে বেশি হওয়াই সম্ভব নয় ; কিন্তু সব কিছুর উপরই এই ক্ষমা-স্নিগ্ধ ভাবটুকুর জন্য সেই স্নেহটুকুকে আরও নিবিড় করিয়া পাওয়া যায়। পূজার সময় খোকা গিয়া পিঠের উপর পড়িয়া দোল খাইবার চেষ্টা করে। গিরিবালা অনাচারের ভয়ে তাহারই তল্লাসে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান,—"ও জেঠামশাই, আমি ছুঁই কী করে ও ভূতকে? কি হবে?"

ভগবতীচরণ সস্মিত দৃষ্টিতে একবার নাতির দিকে চান, তাহার পর পূজার যে পর্যায়ে আছেন সেটুকু শেষ করিয়া হাসিয়া বলেন—"থাক্ মা, যখন ভর করেছে ভূতে, ঘাঁটিয়ে কাজ নেই ; আরও উপদ্রব বাড়াবে।"

"ওর গায়ে যে রাজ্যের ধুলো, আপনি ঠেলে দিন বাঁ হাত দিয়ে, আমি ধ'রে নিচ্ছি।"

"কচি ছেলের গায়ের ধুলো ধুলো নয় ; ও থাক্, একটা ঝোঁক ধ'রেছে, কেটে গেলেই আপনি চলে যাবে ; তুমি কি কাজ করছিলে করগে।"

গিরিবালা আরও ব্যাকুল হইয়া পড়েন, বলেন—"ব্যাঘাত হবে যে পুজোর আপনার!"

ভগবতীচরণ একটু বেশি হাসিয়াই বলেন—"ব্যাঘাত হচ্ছেই, কিন্তু সে ওর জন্যে নয় ; তুমি যাও দিকিন, লক্ষ্মী মা আমার।"

আচমন করিয়া আবার পূজায় লাগিয়া যান!

গিরিবালা জেঠশাশুড়ীর কাছে গিয়া পড়েন, বলেন—"ও জেঠইমা, এ কি হল জেঠামশাইয়ের! সে-ই মানুষ?"

জেঠশাশুড়ী হাসিয়া বলেন—"পাড়ার সবাইকে গাল দেওয়ার প্রাশ্চিত্তির করাচ্ছে নাতি।...ওরা জন্মালে কি আর সে ভাব থাকতে দেয় মা? ভোলানাথের সঙ্গী সব, সব-কিছুই দেয় ভুলিয়ে।"

একা পড়িয়া গেলেও, উহারই মধ্যে কাছের প্রতিবেশী-কুটুম্বদের কয়েকজন মেয়ে-বৌয়ের সঙ্গে ভাব হইল। দুইদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। নিত্য উৎসব-অনুষ্ঠানের জায়গা সাঁতরা—একদিন যাত্রা দেখা হইল। একদিন জেঠশাশুড়ীর সঙ্গে ছেলেকে লইয়া পূজা দিতে শীতলাতলায় গেলেন। শীতলাতলায় কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। ক্রমাগতই একটা ভয়-ভয় ভাব—একটা ত্রুটি, একটুখানি ভুল যদি কোন রকমে হইয়া যায়, খোকার উপর পড়িবে যে! মনে হইতে লাগিল সেবারের সেই ধনীঘরের বৌয়ের সন্তানের প্রতি অবহেলার ভাবটা এখনও যেন মন্দিরের হাওয়ায় মিশিয়া আছে। সেই সঙ্গে মনে পড়িল সেই অতি গরীব নীচ জাতের স্ত্রীলোকটিকে—দণ্ডী কাটার জন্য ভিজা শাড়িতে পথের রাঙা ধূলি কাদা হইয়া লিপ্ত, কপালে কাদার ছোপ ; বাইরের বারান্দায় থামের পাশে রোগ-জীর্ণ ছেলেটিকে লইয়া দীন নয়নে দেবীমূর্তির পানে চাহিয়া আছে ; হাতে একটা ছোট সরায় চিনি, সন্দেশ আর গোটাকতক ফুল—ভিড়ের মধ্যে কেহ যদি দয়া করিয়া পুরোহিতের কাছে পৌঁছাইয়া দেয়।...গিরিবালার মনে হইল তিনজন

BanglaBook.org

মায়েই তাঁহারা যেন একসঙ্গে মন্দিরের মধ্যে রহিয়াছেন—একজনের চক্ষে ধৃষ্টতা, একজনের চক্ষে মিনতি, তাঁহার নিজের দৃষ্টিতে শঙ্কা। প্রণাম করিবার সময় খোকার মাথা ধীরে ধীরে শানের উপর চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন—"মা দোষ নিও না, তোমার পায়ে রইল খোকা ; যদি কোন দোষ হয়ে থাকে তো আমায় দণ্ড দিও।"

কিসের এমন দোষ ভাবিয়া দেখিবার অবসর থাকে না। মন্দিরের অতীন্দ্রিয় পরিমণ্ডলের মধ্যে একটা অহেতুক আশঙ্কা খোকাকে ঘিরিয়া যত রকমের কাল্পনিক অনিষ্টের সৃষ্টি করে, আর কেবলই মনে হয়, খোকার সব বালাই নিজের সর্বাঙ্গ দিয়া মাখিয়া লই।

ঠিক পাঁচ মাস পরে গিরিবালা পাণ্ডুলে ফিরিয়া আসিলেন।

বাড়িটা এতদিন বেশ একটু নিঝুম মারিয়া ছিল, বিশেষ করিয়া খোকার অভাবে ; শুধু তাহাকে লইয়াই বাড়িটা খানিকটা মাতিয়া উঠিল। এদিক থেকে একটু ফুরসত হইলে খজনী তাহাকে দাদামশাইদের দেওয়া পোশাকে-গহনায় বোঝাই করিয়া পাড়ায় পাড়ায় লইয়া গিয়া বাহিরেও একটা রীতিমত সাড়া জাগাইয়া দিল।

পাণ্ডুলের জীবনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন নাই ; পাঁচ বছরেও বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইবার জায়গা নয়, এ তো মাত্র পাঁচ মাসের কথা! চোখে পড়িল অভয়া, ত্রিনয়নী, মোতিবালা আরও একটু করিয়া মাথাঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। ত্রিনয়নীর, ভিতর-বাহির এক করিয়া ছুটিতে ছুটিতে রুচিকর খবরের টুকরা-টাকরা চারাইয়া বেড়াইবার অভ্যাসটা কমিয়াই আসিতেছিল, এখন আর একেবারেই নাই। কোথাও বলা হইয়াছে এখানে মেয়েদের বাল্য অবস্থাটা টানিয়া-টুনিয়া বছর এগার পর্যন্ত থাকে, তাহার পর পর্দার চাপে তাহারা একেবারে ভারিক্কে হইয়া পড়ে। তবু, তেমন তেমন অবস্থায়, ত্রিনয়নী সব ভুলিয়া এক একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে—ভিতর-বাহিরের পার্থক্য রাখিতে পারে না,—যেমন বৌদিদি আসিবার দিন পারে নাই, খোকা হঠাৎ একটা নতুন কিছু বলিলে বা করিলে পারে না। নিস্তারিণী দেবীর কাছে বকুনি খায়—"ফের তিনি!—লজ্জা বলে কোন পদার্থ নেই তোর?"

মাঝে বিরাজমোহিনী আসিয়াছিলেন। গিরিবালা খবরটা চিঠিতে পাইয়াছিলেন, শুনিলেন তাঁহাকে দেখিবার জন্য বড়ই আকুলিবিকুলি করিয়াছিলেন ; আরও বিশেষ করিয়া এই জন্য যে, খোকাকে দেখেন নাই। তাঁহার নিজের একটি কন্যা সন্তান হইল, গিরিবালা আসিবার দিন পনেরো আগে বিরাজমোহিনীকে চলিয়া যাইতে হইল। শাশুড়ী দেশে যাইতেছেন, নতুন নাতনীকে একবার দেখিয়া যাইতে চান ; ভাগলপুর থেকে হঠাৎ চিঠি আসিল, তাহার দুইদিন পরেই জামাই আসিয়া লইয়া গেলেন।

বিকালে চুল বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মিলিয়া গল্প হইতেছিল। খোকা একবার এ-কোল একবার ও-কোল করিয়া আদর কুড়াইয়া বেড়াইতেছে, মাঝে মাঝে গল্পের মধ্যে তাহার অসংলগ্ন ভাষা দিয়া ছোট বড় বাধা সৃষ্টি করিতেছে। নিস্তারিণী দেবী বিরাজমোহিনীর যাওয়ার প্রসঙ্গটা ধরিয়া বলিলেন—"পনেরোটা দিন মেয়েটাকে রাখলে না মা! বলিহারি শাসন!"

খোকা তাহার পিঠের উপর পড়িয়া একবার এ-পায়ে একবার ও-পায়ে ভর করিয়া

BanglaBook.org

দোল খাইতেছিল, গলা জড়াইয়া মুখের সামনে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—"ঠাম্মা!"

কথাটা নূতন শিখিয়াছে। নূতন মুখে নূতন ডাক, মিষ্টতাটুকু মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে ; চুলবাঁধা ছাড়িয়া নাতিকে কোলে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন —"না বৌমা, এবার তুমি যখন যাবে এটাকে যেতে দোব না, কী কষ্টেই যে কেটেছে এ ক'টা মাস!"

কোলে তাঁহার নিত্যসঙ্গী বিড়াল, আরামে চক্ষু মুদিয়া ঘড়্ ঘড়্ শব্দ করিতেছে, পায়ের দোল দিয়া মোতিবালা গম্ভীরভাবে বলিলেন—"নিজের বৌয়ের ছেলে আটকে রেখে বিদেয় করলে তো শাসন করা হল না!"

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। ত্রিনয়নী—"নিজের বেলা" বলিয়া মন্তব্য করিতে যাইতেছিল, নিস্তারিণী দেবী হাসিতে হাসিতেই হাত উঁচাইয়া তাঁহার দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন —"বেরো, নইলে দিলুম বসিয়ে ; দুই বোনে মিলে ঝগড়া করতে এলেন দেখো না!"

বিরাজমোহিনীর পরে আরও অন্য সব প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল,—পাণ্ডুলের অচপল জীবনে যাহা কিছুই একটু স্পন্দন আনিয়াছে তাহারই একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে —খজনী এই পাঁচ মাসের মধ্যে যে তিনবার শ্বশুরবাড়ি হইতে পলাইয়া আসিয়াছে, বিপিনবিহারীর হোমিওপ্যাথি ঔষধ না থাকিলে একটা বিশেষ দিনের ভোজ-খাওয়া যে লোটন ঝার শেষ ভোজ-খাওয়ায় দাঁড়াইত, একদিন হস্তী ক্ষেপিয়া বদ্ধ অবস্থাতেই কাহাকে শুঁড়ে করিয়া একটা ডাল ছুঁড়িয়া মারিয়াছিল, এই সব কথার আলোচনা লইয়াই চুলবাঁধার কাজ বিলম্বিত হইয়া যাইতে লাগিল।

উহারই মধ্যে মোতিবালা একবার সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"আর মা, বৌদিকে তো আসল কথাই বলা হল না—দুলারমনের কথা!...আহা..."

একটা হাসির প্রসঙ্গ কী করিয়া মনে পড়িয়া গেছে মোতিবালার ; নিস্তারিণী দেবীর মুখখানি একমুহূর্তেই যেন মলিন হইয়া গেল, নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলিলেন—"বড় বলবার কথা কিনা...আহা যেমন হাসি-খুশি ছিল, তেমনি..."

গিরিবালা দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত দুইজনের পানেই চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কী মা?...কী হয়েছে গা ঠাকুরঝি?"

দুইজনের একটু দৃষ্টিবিনিময় হইল, ত্রিনয়নীও মায়ের মুখের পানে চাহিল ; প্রতি মুহূর্তেই একটা চরম সংবাদ শুনিবার ভয়ে গিরিবালার চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে সূচি-তীক্ষ্ণ। নিস্তারিণী বলিলেন—"না, বালাই ষাট, তত খারাপ নয়...তবে কমই বা কি বল? সিঁথের সিঁদুরটুকু না হয় বজায় আছে, বয়েসের সাধ-আহ্লাদ সবই তো ঘুচল। জামাইটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না,—দুলারমনের গয়না-গাঁটি সব নিয়ে সে যে কোথায় উধাও হয়েছে কেউ বলতে পারছে না। ছেলেটি একটু অন্য ধরনের ছিলই তো? একটু বাঙালীঘেঁষা, কলকাতায় গিয়ে পড়াশুনা করবার ঝোঁক, কথাটা এখন তাই থেকে গেছে আরও বেড়ে —শত্রুর তো অভাব নেই, কে রটিয়ে দিয়েছে গয়নাগাঁটি বেঁচে কিছু টাকা হাতে করে জাহাজের খালাসী হয়ে নাকি বিলেতে চলে গেছে, কী তালিম নিয়ে ফিরবে।...কে জানে মা ; তবে যা রটে তার কিছুটা বটে—মা দুর্গা না করুন, কিন্তু যদি তাই হয় তো মেয়েটার কপাল তো চিরকালের তরে ভাঙল, আহা!"

নিস্তারিণী থামিতে মোতিবালা বলিলেন—"আর ওকেই যে দুষছে সবাই।"

BanglaBook.org

নিস্তারিণী বলিলেন—"হ্যাঁ, সে আবার এক বিপদের পর বিপদ হয়েছে। ছেলেটা বাক্স ভেঙে টাকা চুরি করা, কি অন্য কারুর গয়নায় হাত দেওয়া— সে-সব কিছুই করে নি, শুধু দুলারমনের গয়নাগুলো নিয়ে গেছে। সর্বদা তো আর গায়ে দিয়ে থাকত না, একটা কাঠের প্যাটারিতে বন্ধ থাকত, একটা ছুতো করে চাবিটা নিয়ে গয়নাগুলো একটা পুঁটুলিতে বেঁধে রাতারাতি সড়ে পড়েছে। এখন দোষটা গিয়ে পড়েছে দুলারমনের ওপর —শুধু তোরই গয়না যখন নিয়ে গেছে তখন তোর এর মধ্যে যোগ-সাজোস আছে, তুই সব জানিস, বল্ কোথায় গেল..."

গল্পটা খুব জমিয়াছে, সবারই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মুখস্থ, একটা বড় কথা ছাড়িয়া যায় দেখিয়া ত্রিনয়নী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া একটু চাপা গলায় বলিল—"আগে তো ওরা চাপতে চেয়েছিল!—সে কথা বললে না বৌদিকে?"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"তাই চাইবেই কিনা, বাড়ির একটা কলঙ্ক,—যদি বিলেতেই গিয়ে থাকে তো জাতকুল নিয়েই টানাটানি, এখানে যে আমাদের দেশের চেয়েও কড়াক্কড়ি। মামার বাড়ি গেছে, মেসোর বাড়ি গেছে, পশুপতিনাথ গেছে,—এই করে ক'টা মাস চেপে রাখলে কথাটা, দুলারমনের বাপের বাড়িতেও কাউকে জানতে দিলে না, অথচ তুমি দেশে যাওয়ার প্রায় পাঁচ-ছ'মাস আগে হয়েছে ব্যাপারটা। কিন্তু কথা কখনও চাপা থাকে? আস্তে আস্তে বেরিয়েই পড়ল। তখন নিরুপায় হয়ে বললে, কলকাতাতেই পড়তে গেছে। শত্রুরা পেয়ে বসল—কতরকম ফিকড়ি বেরুতে লাগল, বললাম না?—এখন নাকি আবার কে কলকাতা থেকে ফিরে এসে রটিয়ে দিয়েছে ছেলে জাহাজের খালাসি হয়ে বিলেতে চলে গেছে—নাকি গির্জায় গিয়ে খেরেস্তানও হয়ে গেছে। সত্যি-মিথ্যে ভগবানই জানেন, মেয়েটার দিকে কিন্তু আর চাওয়া যায় না, আহা শুনছি এই একটা বছর ধরে নাকি নিগ্রহের আর কিছু বাকি রাখে নি, এই তো সেদিন খবর পেয়ে বাপ গেছল, পাঠিয়ে দিয়েছে, আর নাকি নেবে না।"

গিরিবালার মনটা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। দুলারমন আসে না, গিরিবালা নিস্তারিণী দেবীকে অনুরোধ করিতে তিনি বলিলেন—উহারা স্পষ্ট করিয়া অবশ্য বলে না, তবে ভিতরে ভিতরে চায় না যে দুলারমন বাঙালীর সঙ্গে মেলামেশা করে। গিরিবালা খজনীকে দিয়া ওকে, ওর মাকে খুব কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিয়া পাঠাইতে আসিবার দিন ছয়েক পরে একদিন দুপুরে ছোট ভাইকে সঙ্গে করিয়া আসিল।

সত্যই আর চাওয়া যায় না তাহার পানে,—অমন যে সাজিয়া গুছিয়া থাকিতে ভালোবাসিত, কপালে সিঁদুর আর হাতে চারি গাছি করিয়া এদেশের প্রচলিত গালার চুড়ি ছাড়া আর কিছুই নাই। চুল কোনো-রকমে বাঁধিয়া ছাঁদিয়া কতদিন আগে যে মাথায় একবার টাঙাইয়া রাখিয়াছে আর যেন ফিরিয়া দেখে নাই। সে রঙের কিছুই নাই, অমন ভরাট মুখ শীর্ণ হইয়া লম্বাটে হইয়া গেছে, চোখের চারিদিকে কালি, দৃষ্টিতে রাজ্যের শ্রান্তি। দুলারমন যেন বয়েস ডিঙাইয়া বুড়ী হইয়া গেছে একেবারে।

গিরিবালা খানিকটা প্রস্তুতই ছিলেন, তাই দুলারমন এসবে ততটা বিস্মিত করিতে পারিল না, যতটা করিল তাহার প্রথম সম্ভাষণে, উঠানে আসিয়াই মুখে একটা হাসি টানিয়া প্রশ্ন করিল—"মনে পড়লেই গো নয়কী দুলহীন?"

যেন একটা হাসির আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার জন্যই তাহার নিজস্ব বাংলাতেই আরম্ভ

করিল। গিরিবালার প্রথমটা মুখে কোন কথাই যোগাইল না, তাহার পর বলিলেন—"আমার মনে অনেক দিনই পড়েছে, তোমাকেই ডেকে ডেকে পাওয়া যায় না।"

"বাঃ, আমি কি যে-সে আছি? কোতো তপস্যা করতে হোয় আমার জন্যে!"

বলিয়া এবার একটু বেশি করিয়া হাসিয়া উঠিল, বুকের দুর্বলতা থাকিলে হাসির শেষের দিকে যেমন একটা টান্ ওঠে, সেই রকম একটা টানের সঙ্গে হাসিটা থামিয়া যাইতেই ঘাড়টা একটু এলাইয়া পড়িল।

দুলারমন এইটুকু দমের ব্যয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, অথচ সে ছিল হাসির অফুরন্ত উৎস। কয়েক সেকেন্ড বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া গিরিবালা আবার নিজেকে সামলাইয়া লইলেন, একটু হাসির চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"তাই দেখছি, তপস্যাই বটে, বোস।"

একটা মাদুর আনিয়া বিছাইয়া দুইজনে বসিলেন। কী করিয়া যে কথাটা পাড়িবেন বুঝিতে পারিতেছেন না। দুলারমন কিন্তু কোনরূপ সুযোগই দিল না, বসিয়া নিজের ভাইটিকে তুলিয়া কোলের কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিল—"খোঁকা কোথায়?"

গিরিবালা অন্যমনস্ক ভাবটা কাটাইয়া বলিলেন—"অ্যাঁ, খোকা? ঘুমুচ্ছে।... তারপর?..."

দুলারমন দুষ্টামি করিয়াই প্রশ্নটার অভীপ্সিত অর্থটা গ্রহণ করিল না ; চিন্তা করিবার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়া বলিল—"তারপোর? তারপোর? মোতি কোথায়?"

"ঠাকুরঝিও ঘুমুচ্ছেন।"

"তারপোর—ত্রিনয়নী কোথায়, তারপোর অভয়া কোথায়?"

ডুবন্ত লোকের কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রক্রিয়া জাগাইতে জাগাইতে সেটা শেষ পর্যন্ত যেন সত্যই আসিয়া পড়ে, দুলারমনের যেন সেইরকম ব্যাপার হইয়াছে, গিরিবালার প্রশ্নটা ঘুরাইয়া রঙ্গ করিতে করিতে শেষের দিকে সত্যই হাসিয়া উঠিল, বিশেষ করিয়া তাঁহার বিপর্যস্ত ভাবটা লক্ষ্য করিয়া। বুকে টানটা আরও বেশিক্ষণ পর্যন্ত আটকাইয়া রহিল, আয়াসে পাণ্ডুর মুখটা একটু রাঙা হইয়া উঠিল।

গিরিবালা হাসিয়া বিরক্তির ভান করিয়া বলিলেন—"মরণ! রঙ্গ আর যায় না, আমি জিগ্যেস করছি—তারপর আছ কেমন, না, কথাটা বেঁকিয়ে..."

বোধ হয় ওর হাসির চোটেই ঘুম ভাঙিয়া গিয়া থাকিবে,—"দুলারমনের হাসি না?"—বলিতে বলিতে মোতিবালা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

দুলারমন দু'চারবার হাঁপাইয়া লইয়া—হাসির জেরটা বন্ধ করিয়া লইল, উলটিয়া নিজেই রাগের ভান করিয়া বলিল—"তোঁহি কহু ত হে মোতি নৈহর সে ঢাকিয়া ঢাকিয়া গপ্ আনলখিন্ ভৌজী, সে এক্কেটা হামরা কিয়াক নে কহতিন?" (তুমিই বল তো মোতি —বৌদি বাপের বাড়ি থেকে ঝুড়িঝুড়ি গল্প এনেছেন, তা আমাদের একটাও শোনাবেন না কেন?)

মোতিবালা এর মধ্যে দু'একবার দেখিয়াছেন, সুতরাং দুলারমনের চেহারা দেখিয়া আর বিস্মিত হইলেন না; তবে হাসি দেখিয়া হইলেন একটু বৈকি, বলিলেন—"তুই আর আসিস না কেনরে দুলারমন? সেই একদিন এসে...আমি যদি ছাড়া পেতাম সর্বদাই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতাম।"

"উঃ, 'ঘুরে বেড়াতাম'!"

BanglaBook.org

মোতির কথাটা লইয়া ভেংচাইয়া দুলারমন গিরিবালার পানে চাহিয়া বলিল—"বোলো গো বৌদি, দেশকে গোপ্পো বলো।"

বিষয়টাও নিজেই যোগাইয়া দিল, ভাইটিকে টানিয়া লইয়া গুটাইয়া সুটাইয়া গল্প শুনিবার ভঙ্গিতে বসিয়া বলিল—"নন্তীকে গপ কহু, কঁহা বিয়া ভেলেই, বেটাবেটি কি ছেই..."

বিড়ালটা আসিয়া মোতিবালার পায়ে খুব আড়ম্বরের সহিত গা ঘষিতেছে, দুলারমন একটু হাসিয়া বলিল—"তুমিও অপ্পন্ বেটিকে কোলে নিয়ে বোসো গো মোতি।"

সখী হিসাবে সখীদের কাছে নন্তীর গল্পই বেশি করিতেন গিরিবালা, গল্পটা অল্পের মধ্যে বেশ জমিয়া উঠিল, তাহার ওরই প্রসঙ্গ ধরিয়া অন্য সব কথা আসিয়া পড়িতে লাগিল। যতক্ষণ কৌতুক হাসির চটপট জবাবের মধ্যে কাটিতেছিল, ততক্ষণ বেশ কাটিতেছিল ; একতরফা, একটানা গল্পের মধ্যে দুলারমন মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতে লাগিল,—"কী ভেলেই? কে কী বোল্লে?" বলিয়া মাঝে মাঝে গল্পের হারানো খেই-টা ধরিয়া লইতে লাগিল। এক এক সময় আবার খুব মনোযোগী, যেন চেষ্টা করিয়া সমস্ত মনটাকে একত্র করিয়া গল্পশোনায় লাগাইয়া রাখিয়াছে,—এক একটা মন্তব্য করিতেছে, এক এক ঝলক হাসি তুলিতেছে, আবার অন্যমনস্ক,—সামনে, পাশে যেন একটা কিছুর উপর গিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, পাণ্ডুর মুখটা আরও হইয়া উঠিতেছে যেন পাণ্ডুর।

একবার মোতিবালা বলিয়া উঠিলেন—"তুই শুনছিস কৈ দুলারমন? মিছিমিছি বকাচ্ছিস বৌদিকে।"

দুলারমন ঝাঁঝিয়া উঠিল—"না, শুনিতে হইলে যে গল্প বলিতেছে তাহার মুখে কান লাগাইয়া বসিতে হইবে! তাহা হইয়া মোতিবালাও তো শুনিতেছেন না!"

গিরিবালার পানে চাহিয়া বলিল—"তুমি বোলো গো বৌদি।"

গিরিবালা বলিলেন—"না, তুমি এবার তোমার শ্বশুরবাড়ির গল্প বল দুলারমন, একলা কত বকব? আবার অন্য দিন শুনো।"

খুব সেয়ানা মেয়ে, একলা হইলেও খুব সতর্ক থাকিয়া দুলারমন নিজের গল্প বলার সম্ভাবনাটাকে এড়াইয়া আসিতেছে,—মোতির মুখে থাবা দিয়া, গিরিবালার গল্পের মোড় ফিরাইয়া। এবার যেন কোণঠাসা হইয়া তাহার মুখটা শুকাইয়া গেল। তবু একবার শেষ চেষ্টা করিয়া সামলাইয়া লইল, হাসিয়া বলিল—"বাঃ, হামি বাপের বাড়িকে গোপ্পো শুনলাম, শ্বশুরবাড়িকে গোপ্পো কেনো বলব?"

দুজনে হাসিয়া উঠিলেন ; এবং এই হালকা হাসির জন্যই দুলারমনের অন্তরের বেদনার দিকে কাহারও দৃষ্টিটা যেন যাইতে পারিল না। লঘু তর্কের ঝোঁকেই দুইজনে হাসিয়া উঠিলেন, মোতিবালা বলিলেন—"শ্বশুরবাড়ির গল্প ভালো বলে বলবি ;—কার মাথাব্যথা পড়ে গেছে যে, তোর ঠাকুরমা খুড়ীর ঘ্যানঘ্যানানির কথা বসে বসে শুনবে? বৌদি যদি তোকে এখানকার কথা—ধর খজনীর কথা, শোনাতেন বসে বসে..."

মজ্জমান যেমন খড়ের কুটোটা আঁকড়াইয়া ধরিতে যায়, খজনীর নাম হইতেই একটা কিছু যেন পাইয়াছে এইভাবে সচকিত হইয়া উঠিল দুলারমন, মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"হামি শ্বশুরবাড়িকে কথা একটুও জানি না।"

BanglaBook.org

মোতিবালা হাসিয়া মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন বল্ তো?"

দুলারমন হাসিবার যেন একটা অন্তিম চেষ্টা করিল ; লজ্জা, ক্ষোভ, অভিমান সমস্ত আসিয়া মুখে জড়ো হইয়াছে, তাহারই মাঝে, ঠোঁটের নিতান্ত এককোণে একটু কুঞ্চনের আভাস প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া ফুটাইয়া রাখিয়াছে, মোতিবালার পানে চাহিয়া বলিল—"বা রে, হামিও তো খজনী আছি, পালিয়ে এলুম কেমোন চালাকি..."

আর অগ্রসর হইতে পারিল না, এ বাড়ির দরজা মাড়ানো ইস্তক যে-অশ্রুকে অত সতর্ক হইয়া হাসির মধ্যে, গল্পের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, যখন সে নামিল একেবারে যেন বাঁধ ভাঙিয়াই নামিল। সমস্ত মুখটা অঞ্চলে ঢাকিয়া দুলারমন ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, দুই সখীর চোখে জল নামিয়াছে, মুখে সান্ত্বনার কোন কথাই নাই, শুধু মাঝে মাঝে—"চুপ রহু দুলারমন...দুলারমন চুপ কর্।"

নিস্তারিণী উঠিয়া দেখিলেন শোক আর সহানুভূতির ছবির মতো তিনজনে দাওয়ায় বসিয়া আছেন, কাহারও মুখে কথা নাই। বুঝিয়া আর বিশেষ কিছু প্রশ্ন করিলেন না, শুধু একটা কিছু বলিবার জন্যই বলিলেন—"দুলারমন যে, কখন এলি?" থাকাও দুষ্কর বলিয়া কার্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

পুরুষদের অফিস হইতে ফিরিবার সময় হইয়া আসিতে দুলারমন উঠিল। গিরিবালা বলিলেন—"মাঝে মাঝে এস দুলারমন।"

মোতিবালা বলিলেন—"হ্যাঁ, বাড়িতে বসে শুধু গুমরে মরবি, তার চেয়ে আসিস মাঝে মাঝে।"

॥ ৯ ॥

পাণ্ডুলের জীবনের অধিকাংশটাই নীলকুঠিকে কেন্দ্র করিয়া, অন্তত এই পরিবারের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধটা তো খুবই ঘনিষ্ঠ, সেইজন্য ওর মোটামুটি একটা ইতিহাস এইখানে দিয়া গেলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

নীলকুঠি ইংরাজ রাজ্যের মধ্যে ছিল খণ্ডরাজ্য, প্রভেদ এই যে, সমগ্রটার মধ্যে একটা বাঁধুনি ছিল, খণ্ডগুলার মধ্যে তাহার ছিল সম্পূর্ণ অভাব। ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করে, সে উৎখাত হইল, কিন্তু নির্বংশ হইল না, তাহার আদি লীলাভূমি বাংলা-বিহারে নিজের বংশধরদের বসাইয়া গেল। মহারানী এবং তাঁহার বংশধরদের শাসন নীলকুঠি পর্যন্ত পৌঁছায় নাই কেন বলা শক্ত, তবে পৌঁছায় নাই যে, এটা অবিসংবাদিত সত্য। পৃথিবী হইতে দাস-প্রথা উচ্ছেদে ইংরাজের কতকটা হাত ছিল ; কিন্তু সে-গৌরবের পাশে তাহার ললাটে খানিকটা কলঙ্ক-কালিমাও থাকিয়া গেছে সে নীলকুঠি ঘুচায় নাই, অন্তত সে অগ্রণী ছিল না। নীলকুঠি বাংলা হইতে ঘুচাইবার যশ কয়েকজন সাংবাদিক আর একজন নাট্যকারের, বিহারের যশটা বহুলাংশে একজন "নগ্ন ফকিরের" প্রাপ্য। দৈবক্রমে বিজ্ঞান এঁদের সহায় হইয়াছিল, নতুবা ফলাফলটা যে কী হইত সেটা এখনও গবেষণার বিষয় হইয়া আছে।

এ-যুগে নীলকুঠির অত্যাচারের পুরানো কাসুন্দি ঘাঁটিয়া লাভ নাই, এক কথায় এইটুকু বলিলেই চলিবে—ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বংশধরেরা যে কীর্তি করিয়া গিয়াছে

তাহাতে পিতৃপুরুষের স্বর্গবাসে এক মুহূর্তের তরেও কোন অতৃপ্তির কারণ ঘটিতে দেয় নাই।

এর মধ্যেই কিন্তু পাণ্ডুলের ইতিহাসটি একটু অন্যরূপ ছিল। মধুসূদন পাণ্ডুল উদ্দেশ করিয়া বাড়ি হইতে বাহির হন নাই। তাঁহার কাম্য ছিল মীরাটে কমিসরিয়েটের চাকরি। একরকম আকস্মিক ভাবেই তিনি গঙ্গা পার হইয়া পাণ্ডুলে আসিয়া পড়েন। অবস্থাবৈগুণ্যে চাকরির প্রতি লোভ ছিলই, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভয়ও ছিল যে, তিনি বোধ হয় অত্যাচারীর সহায়ক হইয়া জীবনকে কলুষিত করিতে চলিয়াছেন। বাংলায় তখন কুটিয়ালদের লইয়া খুব ঘাঁটাঘাঁটি চলিয়াছে।

চাকরি লইলেন। প্রথম বছরখানেক যে স্তরে রহিলেন সেখান হইতে অত্যাচারের রূপটা ঠিকমতো চোখে পড়িবার কথা নয়। জমিদারের, রায়তের, শ্রমিকের সাধারণ স্বত্বটা কি এবং কতটা হইলে সে স্বত্ব অতিক্রান্ত হইয়াছে বলা যায়, তাহার সঠিক ধারণা হইতে একটা সদ্য স্কুলছাড়া সতেরো বৎসরের ছেলের সময় লাগে; অনেক সময় অত্যাচারটাকেই স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া ভ্রম হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। প্রথমটা এই ভাবেই কাটিল, তাহার পর চাকরির একটু উন্নতির সঙ্গে রহস্যটার ভিতরে প্রবেশাধিকার ঘটিল, এদিকে গল্প-পরম্পরায় অন্যান্য অনেক কুটির অত্যাচারের কথা কানে আসিতে লাগিল। মধুসূদন আশ্বস্ত হইলেন। পাণ্ডুল অনেক কুঠির তুলনায় ভালো এই জ্ঞানটা যতদিনে নিঃসন্দেহ ভাবে আসিল ততদিনে চাকরিও বেশ কিছুদিন হইয়া গেছে; মায়া বসিয়াছে, রস পাইয়াছেন, উন্নতিও হইয়াছে। অর্থাৎ যদি দেখিতেনও যে, তিনি একটা প্রবল অত্যাচারেই অঙ্গস্বরূপ, আর পরিত্রাণ ছিল না; ক্রমে অত্যাচারের উগ্র উন্মাদনার মধ্যে মধুসূদনও হয়তো অনিবার্য ভাবেই নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেন।

কিন্তু তাহা হইতে পারিল না। মীরাট না যাওয়ার মধ্যে যে একটা আকস্মিকতা ছিল, অন্য কুঠি ছাড়িয়া পাণ্ডুলে আসিয়া পড়ার মধ্যে সেই আকস্মিকতা কার্যকরী হইল। আকস্মিকতা দৈবেরই নামান্তর;—যে অজ্ঞেয় শক্তি পাণ্ডুলের মধ্য দিয়া মধুসূদনের জীবনে স্পস্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাকে তিনি চিরদিনই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিয়া আসিয়াছেন।

অবশ্য নীলকুঠি নীলকুঠিই, তবু উহারই মধ্যে পাণ্ডুলের একটা সুনাম ছিল।

এই সুনামের একেবারেই গোড়ার কথা এই যে ইহার তৎকালীন স্বত্বাধিকারী নিজে লোক ছিল ভালো এবং সেই সঙ্গে আরও একটা কথা এই ছিল যে, সে নিজেই কুঠিতে থাকিত। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ হতই যে, যে স্বত্বাধিকারী সে থাকিত বিলাতে; কর্মচারীরা তাহার কুঠি চালাইত। এরূপ ক্ষেত্রে অত্যাচারটা প্রায়ই বড় বেশি হইত। অনেকগুলো কারণ ছিল, তাহার একটা এই যে, অর্থবান স্বত্বাধিকারীরা যে-শ্রেণীর লোক হইত, বেতনভোগী কর্মচারীরা সে-শ্রেণীর কাছ দিয়াও প্রায় ঘেঁষিত না। প্রায় দেখা যাইত তাহাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি বলিয়া কোন বালাই থাকিত না। নিজের নামের বানান ভালো করিয়া জানিত না এমন লোকও আসিয়া পদস্থ কর্মচারী হইয়া বসিয়াছে নীলকুঠিতে, এমন দুর্ঘটনা খুব দুর্লভ ছিল না। এরা ছিল চলিত ভাষায় যাহাদের বলা হয়—'বাপে খেদান মায়ে তাড়ান ছেলে।' ভারতে আসিয়া কেষ্ট-বিষ্টু হইয়া ইহাদের মাথা বিগড়াইয়া যাইত, এমন কাজ ছিল না যাহা ইহাদের অকরণীয় ছিল। এক কথায় ইহারা ছিল এই সব খণ্ডরাজ্যের ক্লাইভ।

স্বত্বাধিকারী নিজে উপস্থিত থাকিলে ব্যাপারটা অনেক ক্ষেত্রেই একটু অন্যরকম হইত ; কেননা কুঠিয়াল হইলেও তাহাদের একটা আভিজাত্য ছিল, খানিকটা কৃষ্টি ছিল এবং অনেক সময় একটা দরদও থাকিত বলিলে অমার্জনীয় মিথ্যা বলা হয় না। পাণ্ডুলের কথাই ধরা যাক। সেই প্রায় আইন-বর্জিত যুগে একটা গোটা জেলাব্যাপী চোদ্দখানা কুঠির মালিক যে অর্থে ভালো হওয়া সম্ভব, পাণ্ডুলের সাহেবও অবশ্য সেই অর্থেই ভালো ; তবু অনেকটা প্রভেদ হইত। পাণ্ডুলের দুর্নামটা তত বেশি ছিল না।

এ সাহেব যখন বিলাতে চলিয়া গেল, ছেলেকে নিজের তখ্‌তে বসাইয়া গেল। তখন গুণগ্রাহী মনিবের নেকনজরে পড়িয়া মধুসূদন কুঠির বড়বাবু। উপযুক্ত লোক দেখিয়া ঢিলা দিতে দিতে প্রায় সমস্ত ক্ষমতাই তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। সেজন্য একদিনের তরে সাহেবকে অনুতাপ করিতে হয় নাই। যাইবার সময় অন্যান্য উপদেশের মধ্যে একটা বিশেষ উপদেশ পুত্রকে এই দিয়া গেল যে—কুঠি পরিচালনায় সে যেন সব দরকারী বিষয়েই মধুসূদনের পরামর্শ গ্রহণ করে। চঞ্চলমতি যুবকের এমন একজন বিচক্ষণ কর্মচারী পাশে থাকায় সুবিধা ছিল। প্রথম কয়েক বৎসর সে বাপের উপদেশটা একটু বেশি করিয়াই পালন করিয়া মধুসূদনের হাতে প্রায় সমস্তটাই ছাড়িয়া দিল—জেলা-শহরে তাহার ক্লাব আছে, এখানে-ওখানে পার্টি আছে, কুঠিতে যখন থাকিত তখন কুঠির কাজ দেখার চেয়ে জজিয়তি করার প্রতি তাহার বেশি আকর্ষণ ছিল। সে-যুগে ছোট-মাঝারি দেওয়ানী আর ফৌজদারী কেস্‌গুলা এই কুঠিয়ালরাই নিষ্পত্তি করিত ;—সাজার মধ্যে মাস দুই তিন জেল পর্যন্ত ইহারাই দিত—কুঠিতেই তাহার ব্যবস্থা ছিল। জরিমানা করিত, কুঠিতে তাহার আলাদা হিসাব থাকিত, জজের মন ভালো থাকিলে বাদী কিছু অংশ পাইত। এই সব স্বয়ম্ভু জজের উপর মহারাণীর জজেদের কোন কথা চলিত না ; কেহ কুঠির বিরুদ্ধে নালিশ লইয়া উহাদের দ্বারস্থ হইতে সাহসই করিত না ; সাহস করিলেও কিছু হইবার সম্ভাবনা ছিল না। জেলায় তখন দেওয়ানী আদালতেরও পত্তন হয় নাই ; ব্যবস্থাটা ছিল পঞ্চাশ মাইল দূরে ডিভিসন-শহরে। জজেদের হাত অত লম্বা ছিল না যে, এত দূরের গণ্ডী পারাইয়া নিজের শক্তির পরিচয় দেয়। দিতে গেলে রায়তের পক্ষে ফলটা উলটা হইত।

একটু অবান্তর কথা আসিয়া পড়িতেছে। মোটের উপরে সাহেব এই সব বিচার সালিসি লইয়া থাকিতেই ভালোবাসিত। অনধিকারের প্রতিপত্তিই তো আসল প্রতিপত্তি। যৌবনের তাগিদ মিটাইতে আর এই অনধিকারের প্রতিপত্তি জমাইতেই সাহেবের সময় ব্যয়িত হইয়া যাইত ; কুঠির দিকে শুধু ব্যালেন্সশীটের উপর নজর বুলাইয়া গেলেই চলিত, সেদিকে না ছিল নৈরাশ্যের কারণ, না ছিল সন্দেহের।

তাহার পর আসিল কুঠির নীলের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সিনথেটিক অর্থাৎ কৃত্রিম নীল। যে নীল মণকরা তিনশত টাকা দরে বিক্রয় হইতেছিল তাহার দর হু-হু করিয়া নামিতে লাগিল। কুঠিয়াল মহলে একটা সামাল সামাল রব পড়িয়া গেল। পার্টি এবং জজিয়তির ব্যসন ছাড়িয়া সাহেবকে একটু অন্তর্মুখী হইতে হইল, মধুসূদনই অনেকটা বুঝাইয়া মোড়টা ফিরাইলেন। এর পর হইতে খুব গুরুতর বিষয় লইয়া উষ্ণরক্ত মনিবের সহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটির কখনও কখনও মতান্তর হইত। যখন সাহেব কোনমতেই একমত হইতে পারিত না তখন ব্যাপারটায় পরিণামে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিলে মধুসূদন বিলাতে

BanglaBook.org

তাহার পিতার অভিমত লইবার পরামর্শ দিতেন। সাহেব বাপের সমসাময়িক বিশ্বাসী প্রবীণ কর্মচারীর এই শেষ পরামর্শটা ঠেলিত না। ফলে মধুসূদনের প্রতিপত্তির সঙ্গে চারিদিক দিয়া কুঠির জীবনের সামঞ্জস্যটা রক্ষা হইয়া যাইতেছিল। পাণ্ডুলের সুনামের এই ইতিহাস।

অবশ্য পূর্বেই বলিয়াছি 'সুনাম" কথাটা নীলকুঠির মাপকাঠিতেই ধরিতে হইবে। চারিদিকে অমানুষিক অত্যাচার, তাহার মধ্যে পাণ্ডুল আর হয় তো এক আধটা কুঠি শাসনের সুরটা একটু নরম পর্দায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। পাণ্ডুলের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক দু'একটা কারণের সঙ্গে একজন শিক্ষিত ব্রাহ্মণের কুলগত সংস্কারের যোগ ছিল। অত্যাচারের দ্বারা নিজের বিত্ত আর প্রতিপত্তি বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি না দিয়া তিনি নিজের সমস্ত শক্তি অত্যাচারীকে শমিত করিতেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন...অত্যাচার বিষয়ে কুঠিয়ালদের মস্তিষ্ক অদ্ভুত রকম উর্বর ছিল। মাঠে কাজ করিতে কেহ অস্বীকার করিলে, অথবা নীলের জন্য জমি দিতে না চাহিলে তাহারা অনেক সময় যে শাসন উদ্ভাবন করিত —তাহাতে কাজের সঙ্গে তাহাদের উগ্র রহস্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যাইত। একটা দণ্ড নাকি এই ছিল যে, লোকটাকে ঠাণ্ডা গারদে রাখিয়া মাথা মুড়াইয়া দেওয়া হইত এবং সেই ক্ষেত্রতুল্য মুণ্ডিত মস্তকে এঁটেল মাটি চাপড়াইয়া দিয়া তাহাতে নীলের বীজ পুঁতিয়া দেওয়া হইত। গারদেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে যখন মাথার উপর নীলের অঙ্কুর হইত তখন নীলচাষের সবল প্রতিবন্ধকটিকে উদাহরণ হিসাবে গ্রামে গ্রামে টহল করাইয়া ফিরান হইত। এই ধরনের আরও মৌলিক সাজা অনেক ছিল।

পাণ্ডুলে এ ধরনের সাজা প্রবর্তিত হইতে পায় নাই কখনও।

তবে সাহেবের বিচারের দিকটা মধুসূদনের এলাকার বাহিরে ছিল। সেখানে যে ব্যাপার হইত তাহার 'সু' বা 'কু' অনেকাংশে নির্ভর করিত সাহেবের তৎকালীন মেজাজের উপর। কিন্তু সেখানে একটা কথা ছিল—তোমার আমার ঝগড়া, ইংরাজের কোন স্বার্থ নাই, সেখানে তাহার বিচারে সুনাম আছে। হয় তো বা একদিন একটু কড়া হইল, একদিন অপেক্ষাকৃত নরম—তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। জরিমানার টাকাগুলার মোটা অংশ যে কুঠির সিন্দুকে আশ্রয় লাভ করিত সেটা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়। আমি রাম রাজত্বের ইতিহাস রচনা করিতেছি না।

মধুসূদন সতেরো আঠারো বৎসর বয়সে পাণ্ডুলে আসেন। ন্যূনাধিক ছিয়াল্লিশ সাতচল্লিশ বৎসর এক কলমে কাজ করিয়া চাকরি অবস্থাতেই মারা যান। সৌভাগ্যক্রমে পূর্ব হইতেই পাণ্ডুলের একটা ভালো ট্র্যাডিশন ছিল; তাঁহার কৃতিত্ব এইখানে যে, তিনি একদিনের তরেও সেটা ম্লান হইতে তো দেনই নাই, পরন্তু নিজের সমস্ত মানসিক ও চরিত্রগত শক্তি নিয়োজিত করিয়া সেটাকে দিন দিন উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিয়াছিলেন।

আপাতত নীলকুঠির বিশেষ করিয়া পাণ্ডুলের নীলকুঠির এইটুকু ইতিহাস এই কাহিনীর পক্ষে প্রয়োজন ছিল; আরও একটু বলা প্রয়োজন হইবে; সে যথাস্থানে।

BanglaBook.org

আরও তিনটা বৎসর গড়াইয়া গেল। ইহার মধ্যে গিরিবালা দুইবার দেশ ঘুরিয়া আসিলেন। প্রথমবার কিশোরের পৈতা উপলক্ষ্য করিয়া। থাকিতে পারিলেন খুব অল্পদিনই, তাহার পর ফিরিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মোতিবালার বিবাহ স্থির হইল, সকলে মিলিয়া আবার সাঁতরায় গেলেন।

এবারেও থাকা খুব অল্পই হইল। বিবাহটা হইল নীল-মাড়াইয়ের সময় ; মধুসূদন, বিপিনবিহারী কেহই থাকিতে পারিলেন না। উৎসবের উন্মাদনার মধ্যে ক'টা দিন যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল, যেন বুঝিতেও পারিলেন না। সাঁতরাকে এবারে যেন পাওয়াই গেল না একেবারে। কনেবৌয়ের যুগে উহারই মধ্যে অবসর মিলিত। এখন তাঁহাকে বাড়ির বড়বধূ হিসাবে নানা কাজেই লিপ্ত থাকিতে হইল। তাহার উপর তিনি এখন দুটি সন্তানের জননী, ছোটটি নিতান্তই কোলের ; এক রকম বলিতে গেলে প্রায় শ্বাসপ্রশ্বাস লইবার সময় রহিল না।

উহার মধ্যে কষ্টে-সৃষ্টে শ্বশুর-শাশুড়ীদের নিকট দুইটা দিন ভিক্ষা করিয়া লইয়া একবার বাপের বাড়ির ভাত খাইয়া আসিলেন।

দিন সাতেক থাকিয়া সকলে ফিরিলেন, আবার পাণ্ডুল-জীবনের মন্থর প্রবাহ আরম্ভ হইল।

কিছুদিন গেল, তাহার পর এই প্রায় একটানা সুখের সংসারটিতে একটা গাঢ় সঙ্কটের ছায়া পড়িল।—

মধুসূদনের বাগানের শখ ছিল। কার্তিস মাস, শাকসবজি মরশুমী ফুল প্রভৃতির বীজ ফেলিবার সময়। সাহেবের বাগানের জন্য প্রতিবৎসর বিলাত হইতে নানাবিধ বীজ আসে, সাহেব মধুসূদনকেও কিছু কিছু দেয়। এবার অন্যান্য বীজের সঙ্গে এক বোতল মটরের বীজ দিয়াছে।

বাড়ির পাশেই বাগান। অফিস হইতে আসিয়া জলযোগ প্রভৃতি সারিয়া মধুসূদন দৈনন্দিন প্রথামত একটা চেয়ার লইয়া বাগানের সামনে বসিলেন। মালী কাজ করিতেছে, বিপিনবিহারী একটা কাঁচি হাতে কাটাছাঁটা করিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার শখটা বাপের চেয়েও বেশি।

মোহনা তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকাটা দিল। মধুসূদন বলিলেন—"মটরের যে বোতলটা এনেছি, নিয়ে আয়।"

বোতলটা বিলাতি কায়দায় সীল-মোহর করা, মুখের কাছে সামান্য একটু চিড় খাইয়া গেছে। বাবুর খাস চাকর মোহনা, কাজ করিতে হয় কম, সেইজন্য ছোট বড় যেটুকু কাজই পায় সাধ্যমত একটু পৌরুষের সঙ্গে করে। উপরকার রাংতাটা খুলিতে বাঁহাতের একটা আঙুল একটু কাটিয়া ফেলিল, হাতটা পিছনে লুকাইয়া বোতলের মুখের সঙ্গে মেলান বড় ছিপিটা কী করিয়া খুলিবে চিন্তা করিতে লাগিল। মধুসূদন বিপিনবিহারীর সহিত কথা কহিতেছিলেন, ফিরিয়া তাহার বিমূঢ় ভাব দেখিয়া একটু ধমক দিয়া বলিলেন— "কর্ক-স্ক্রুটা নিয়ে আয় না...মস্ত একটা দুর্ভাবনায় পড়ে গেল একেবারে!"

আঙুলে একটু চিনি দিয়া পটি বাঁধিয়া লইতে একটু বিলম্ব হইল, মধুসূদন একবার ডাক দিলেন, তাহার পর তাঁহার একটি হাতিয়ারের উপর নজর পড়িল। হুঁকার নলটা

BanglaBook.org

পরিষ্কার করিয়া মোহনা লোহার শিকটা পাশেই ফেলিয়া রাখিয়াছিল, মধুসূদন সেইটা উঠাইয়া লইলেন।

নল-পরিষ্কার-করা শিকের মুখটা সূচাল এবং ইস্ক্রুপের মতো পাত দেওয়া থাকে। কর্ক-স্ক্রুর জন্য বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া মধুসূদন এই নূতন অস্ত্র দিয়াই ছিপিটা খুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সূচাল হইলেও মুখটা কর্ক-স্ক্রুর মতো অত সূচাল নয়, জোর দিতে হইল। মনটা আছে মটরে, দৃষ্টিটা আছে ছিপিটার উপর, বোতলের মুখটা যে একটু ফাটা আছে সেদিকে আর খেয়াল হইল না। দু'একবার একটু ঝোঁক দিয়া জোর দিতেই মুখটা ফাটার কাছে হঠাৎ ভাঙিয়া গিয়া মোটা কাচের একটা ফলক ডান হাতের কব্জিতে বিঁধিয়া গেল।

বিপিনবিহারী একটা গাছের আড়ালে ছিলেন, 'উঃ!' করিয়া শব্দ হইতেই ফিরিয়া দেখেন মধুসূদনের কব্জির নিকট হইতে দুইটি ধারায় রক্ত একেবারে ফিনিক দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতেছে। তৎক্ষণাৎ দৌড়াইয়া গিয়া দেখেন হাতটা এলাইয়া গেছে এবং কব্জির শিরার একটা একেবারেই দ্বিখণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। হৈ হৈ পড়িয়া গেল, কৈলাসচন্দ্র সদর বাড়িতে ছিলেন, ছুটিয়া আসিলেন, চারিদিককার লোক জড়ো হইয়া গেল, ছিন্নমস্তার মতো রক্তের ধারা দেখিয়া সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল, বাড়ির মেয়েরা সদরে আসিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন। তাঁহারা রক্তস্রাব যাহাতে দেখিতে না পান, কৈলাসচন্দ্র এইভাবে কৌশলে ভিড়টা সরাইয়া একটা অন্তরালের সৃষ্টি করিয়া দিলেন। বিপিনবিহারী নিজের কাপড় ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থান বাঁধিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কাপড় ভিজিয়া জবজবে হইয়া উঠিতেছে। মধুসূদন ক্রমেই এলাইয়া পড়িতেছেন, রক্ত যদি বন্ধ না হয়, তাঁহাকে বেশিক্ষণ রাখা যাইবে না। দুই ভাইয়ে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেছেন, হাত তুলিয়া ধরিতেছেন, উপরের শির টিপিয়া ধরিতেছেন—কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছে না। কৈলাসচন্দ্রের হঠাৎ সংবিৎ হইল, মুখটা তুলিয়া একবার ভিড়ের পানে চাহিয়া বলিলেন —"সাহেবকো খবর দেও, দৌড়ো।"

একসঙ্গেই কয়েকজন ছুটিবার উপক্রম করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া জানাইল —সাহেব এই দিকেই টমটম হাঁকাইয়া আসিতেছেন।

এক একটা কাজ এক এক সময় মানুষ যেন দৈবনির্দিষ্ট হইয়া করিয়া ফেলে। মোহনার অত উপস্থিতি বুদ্ধি হইবার কথা নয়, কিন্তু বাহিরে আসিয়া রক্তের ঘটা দেখিয়া তাহার মনটায় কী হইল সে একেবারেই সাহেবের কুঠিতে ছুটিল। সাহেব ভ্রমণে বাহির হইবার আয়োজন করিতেছিল, বাহিরে টমটম সজ্জিত রহিয়াছে, মোহনা একেবারে পায়ের কাছে হাতজোড় করিয়া পড়িয়া বলিল—"সরকার খুন হো গিয়া হুজুর।"

হাত কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে বলিলে সাহেব বোধ হয় প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং উপদেশাদি দিয়া তাহাকে আগাইয়া যাইতে বলিত, খুনের কথায় অন্য প্রশ্ন না করিয়া র‍্যাকে টাঙান রিভলভারটা লইয়া সে কামিজপরা অবস্থাতেই ছুটিয়া টমটমে চড়িল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

অকুস্থানে আসিয়া তাহাকে রিভলভার ব্যবহার করিতে হইল না বটে ; কিন্তু জমিতে এবং তিনজনের গায়ে-কাপড়ে রক্তের অবস্থা দেখিয়া ও সামনে ভাঙা বোতল দেখিয়া ক্ষণমাত্র চিন্তা না করিয়াই মধুসূদনকে নিজের ঘাড়ে তুলিয়া টমটমে বসাইয়া দিল এবং কৈলাসচন্দ্রকেও সঙ্গে যাইতে বলিয়া ঘোড়ার মুখ ঘুরাইয়া তীরবেগে মধুবাণীর রাস্তায়

টমটম ছুটাইয়া দিল। মধুসূদন তখন প্রায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছেন।

আজকালকার বিজ্ঞানে বলিবে—চেতনার স্তরে ছোট কাজটুকু সর্বদাই সাড়ম্বরে সম্পন্ন করিবার মোহনার যে অভ্যাস, একটু উগ্র অনুভূতির মুহূর্তে সেইটাই অবচেতনার স্তরে কার্যকরী হইয়া মধুসূদনের জীবন বাঁচাইল—নয় তো খুনও হয় নাই, এবং ব্যাপারটা যে সত্যই অত উৎকট একটা দেখিবারও ফুরসত হয় নাই মোহনার। যাই হোক, এই চিরসেবাপরায়ণ ভৃত্যের জন্য মধুসূদন বাঁচিয়া গেলেন সে-যাত্রা, বলিতেন—"ভগবান আমার জীবন ওর জিম্মায় রেখেছিলেন।"

বাঁচিয়া গেলেন, কিন্তু মধুসূদনের দক্ষিণ হস্তটি চিরতরেই নষ্ট হইয়া গেল। একটি শিরা একেবারেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং অপরটি আংশিকভাবে ছিন্ন হইয়াছিল। মধুবাণীর হাসপাতালে প্রায় মাসখানেক রহিলেন, বিশেষ কিছুই উন্নতি হইল না। জেলা-শহরের হাসপাতালে যখন আসিলেন, ডাক্তার বলিল বিলম্ব হইয়া গেছে। তবে চেষ্টা চলিল, মাসখানেক পর, হাতটা যে একেবারেই অবশ হইয়া পড়িয়াছিল, সে-ভাবটা গিয়া খুব অল্প একটু একটু নাড়াচাড়া করিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু সেটা কাজের কিছুই নয়, জিনিসটা যে অঙ্গবদ্ধ আছে তাহার অতি ক্ষীণ একটি পরিচয় জাগিয়া রহিল মাত্র, তাহাতে বোধ হয় সামান্য একটু সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তাহার অতিরিক্ত কিছুই হয় না। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া কুঠির কল্যাণে যে লেখনী একনিষ্ঠভাবে চালাইয়া আসিয়াছেন তাহাকে আর তুলিয়া লইতে পারিলেন না।

সাহেব অবশ্য ছাড়িল না, পূর্বের বেতনেই তাঁহাকে কুঠির সর্ববিষয়ে পরামর্শদাতার সম্মানিত পদ দিয়া পাণ্ডুলেই বসাইয়া রাখিল। মধুসূদনের স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গিয়াছিল, তবু উপরপড়া হইয়া বাহিরের কুঠিগুলা তদারক করিবার কাজটাও ধরিয়া রাখিলেন।

॥ ১১ ॥

একটানা সাফল্যের যা দোষ মধুসূদনের জীবনে সেটুক ঘটিলই।

কম-বেশি করিয়া ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ বৎসরের অবিরাম অর্থাগম, অপ্রতিহত প্রতিপত্তি আর অটুট সম্মানের মধ্যে মধুসূদন একটু চিন্তার অবসর পান নাই। একদিক দিয়া অর্থ আসিয়াছে, আর একদিক দিয়া দানে, ধ্যানে, ভোজে, আতিথ্যে বাহির হইয়া গেছে। অতি-চঞ্চল একটা কর্মস্রোতে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন ; বিনিময়ে সেও তাঁহাকে প্রচুর সুখ-সম্পদ দিয়া পুষ্ট করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কর্মছাড়া একদণ্ডের জন্য নিজের পানে দৃষ্টিপাত করিতে দেয় নাই।

শেষে চিন্তা যখন আসিল একেবারে অভিভূত করিয়াই আসিল। সাঁতরার বাড়িতে গোটাকতক ঘর বাড়ানো ছাড়া কিছুই করেন নাই ; তাহাতেও যে বাড়িটা বর্ধনশীল দুইটি পরিবারের মাথাগুঁজিবার মতো হইয়াছে তাহাও নয়, 'হচ্ছে-হবে' করিয়া অতবড় দরকারী কাজটুকুও সমাপ্ত করা হয় নাই। একটি পয়সা সঞ্চয় নাই, বিবাহ-যোগ্য দুইটি কন্যা ঘাড়ে ; বিপিনবিহারীর কাজ হইয়াছে কয়েক বৎসর, কিন্তু কুঠির আর সেদিন নাই এবং মধুসূদন দিব্যচক্ষেই দেখিতে পান এখন যেটুকুও আছে, দু-দশবৎসর পরে সেটুকুও থাকিবে না—কুঠিয়ালকে অচিরেই কৃষিজীবী হইতে হইবে।...এটা মনে মনে জানিতেন

BanglaBook.org

বলিয়াই বিপিনবিহারী যখন একবার পলাইবার অভিনয় করেন, মধুসূদন নিস্তারিণী দেবীকে বলিয়াছিলেন—"আজ হোক, পরেই হোক, ও যদি কখনও মনে করে পাণ্ডুলের মতন একটা ছোট জায়গায় পড়ে থেকে নীলকুঠির আওতায় ও বাড়তে পারছে না তো পড়বে বেরিয়ে। তাতে বারণ করবারই বা কী আছে?"...এখন মধুসূদন সশঙ্ক দৃষ্টিতে দেখেন, এই ক্রমম্রিয়মাণ নীলকুঠিই বিপিনের একমাত্র আশ্রয়।—আশ্রয় হইয়াও বিপদ, না হইলে আরও বিপদ।...এখন বিপিনবিহারী নূতন জীবন আরম্ভ করিতে তাহারই মতো বাহিরের জগতে পা বাড়াইয়াছেন—এ-কথা ভাবিতেও মধুসূদনের বুকটা যেন ভিতরে ভিতরে কাঁপিয়া ওঠে। একটি আঘাতে নিজে দুর্বল আর অসহায় হইয়া পড়িয়া নিজের সবাইকেই দুর্বল আর অসহায় বলিয়া মনে হইতেছে। এই হয়, মানুষ যে নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক। তাহার জগতের আলো তাহা হইতেই বিকীর্ণ হয় ; তাই নিজের আলো কোন কারণে স্তিমিত হইয়া আসিলে মনে হয় জগৎটাই মলিন হইয়া আসিল।

অথচ মানুষের মজ্জাগত স্বভাব আছে, সঙ্কোচ আছে ;—অতিথি অভ্যাগত সেই মতোই রহিল, প্রার্থীও কমিল না ; অবসরের অভাবে যতগুলি পারিষদ্ জুটিত—কর্মের অভাবে তাহার চেয়ে বেশি করিয়াই জুটিল। পাণ্ডুলে বসিয়াই পাণ্ডুলের 'মধ্ব বাবু" আর অন্য কেহ হইতে পারিলেন না। সেই 'যত্র আয় তত্র ব্যয়'ই পূর্ণোদ্যমে চলিল। তফাত শুধু এই মাত্র যে, একসময় যেখানে ছিল পূর্ণ শক্তির সঙ্গে অপরিণামচিন্তার আনন্দ, এখন সেখানে আসিয়া পড়িল অক্ষম নিরুপায়ের নিষ্ফল পরিণাম-চিন্তা।

মদ্সূদন সুবিধা পাইলেই কৈলাসচন্দ্র ও বিপিনবিহারীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। সে পরামর্শের একটা বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে অমন দরাজ কণ্ঠস্বরটা আপনা হইতেই মন্দ হইয়া আসে, আশেপাশে—বিশেষ করিয়া মেয়েদের মধ্যে কেহ শুনিয়া ফেলিল কিনা নজর রাখিতে হয়। বিপিনবিহারীকে বলেন—"অত ভাবতে গেলে চলে না,—'হচ্ছে-হবে' করে সুযোগ নষ্ট হচ্ছে, সময় তো আর অপেক্ষা করে থাকবে না?—আমি সাহেবকে বলে মাস দুয়েকের ছুটি করিয়ে দিচ্ছি ; তুমি দুটোরই বিয়ের ঠিক করে এস। দাদাকেও লিখেছি ; তাগাদাও দিচ্ছি, তবে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরাফেরাও দরকার, আর মেয়ে দুটিকেও নিয়ে যেতে হবে সেখানে। শুধু কুষ্ঠি দেখেই তো হবার নয়। আর কুষ্ঠি নিয়েও দাদার বড় খুঁৎখুঁতুনি, তুমি সামনে থাকলে সেদিকটা অনেকটা সামলাতে পারবে...দেরি হয়ে পড়ছে বড্ড, বিপিন...তোমার গর্ভধারিণীর পুরনো গহনাও খানকতক নিয়ে যাও, তাই ভেঙে, কিছু কিছু আরও দিয়ে...বুঝলে কিনা...কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে...একেবারে ঠিকঠাক করে আমায় টেলিগ্রাম দিয়ে দেবে...আর বাড়িটাও আরম্ভ করে দাওগে—আরও খানতিনেক ঘর—মাথা গোঁজবার একটা জায়গা চাই যে...টাকা আমি যোগাড় করে দিচ্ছি—এখনও কিছুদিন বাঁচব, শোধ করে যেতে পারব। তবে বিয়ের হ্যাঙ্গামটা আগে চুকিয়ে ফেল।"

অন্তরের উৎকণ্ঠায় বাক্যগুলা যেন অসংলগ্ন ভাবে বাহির হইতে থাকে, বেশি কথা কহিলে আরও বেশি করিয়া অসংলগ্ন হইয়া পড়ে, দুর্বল শরীরটা কাঁপিতে থাকে। বিপিনবিহারী অন্য দিক দিয়া চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। পিতা যতটা ভারই দিয়া যান তাঁহার বহিবার ক্ষমতা আছে। সে উৎসাহ আর কর্মোদ্যম এতদিন বহির্মুখী ছিল, সংসারের প্রয়োজনে সেটা অন্তর্মুখী হইয়া আসিতেছে : তিনি অনুভব করেন ; আর সে অনুভূতি

BanglaBook.org

তাঁহার আত্মপ্রত্যয়কে দিন দিন পুষ্ট করিয়া তুলিতেছে।...চিন্তা সেদিক দিয়া নয়, চিন্তা পিতার জন্য। এত সবল যুবক, কিন্তু পিতার আয়ুর কথা ভাবিয়া তাঁহার যা উৎকণ্ঠা তা সংসারের কথা ভাবিয়া মধুসূদনের উৎকণ্ঠার চেয়ে শতগুণে অধিক। ঐদিক দিয়া তাঁহার মন পিতার মনের মতোই দিন দিন দুর্বল আর অসহায় হইয়া পড়িতেছে।...পাণ্ডুল ছাড়িয়া এখন নড়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব।

অবশ্য পিতাকে সেকথা বলেন না, 'হচ্ছে-হবে' করিয়াই কাটাইয়া দেন। যদি কখনও মুখে ব্যয়-সঙ্কোচের কথা বলেন মধুসূদন, তো তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দেন। জানেন, ওদিকে কাঁট-ছাঁট করিতে গেলে পিতার যে আঘাতটা লাগিবে, দুইটা শিরা কাটিয়া যাওয়া তাহার সামনে বিশেষ কিছু নয়। হাসিয়া বলেন—"কী এমন হয়েছে বাবা, যে তোমার এগুলোর দিকেই এত লক্ষ্য? ঐখানে তোমার কথার আমি বাধ্য হতে পারলাম না, মাফ করো আমায়।"

মনের এক এক সময় একটা এমন অদ্ভুত শৈথিল্যের অবস্থা আসে যখন কাজের জন্য খুব বেশি আঁকপাঁকু করা যায়, কিন্তু ঠিক কাজটার সম্মুখীন হইতে পারা যায় না। মধুসূদন যেমন পুত্রকে তাড়াতাড়ি সব দরকারী কাজগুলো সারিয়া লইতে বলেন, তেমনি চেষ্টা করিলে স্বচ্ছন্দে সাহেবের নিকট হইতে ছুটির ব্যবস্থা করিয়া এবং এদিকেও উদ্যোগী হইয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিতে পারেন দেশে। কিন্তু সেটা তো করেন না বরং বিপিনবিহারীর দীর্ঘসূত্রতায় যেন একধরনের নিশ্চিন্ত তৃপ্তিই অনুভব করেন। কাজ মোটেই এগোয় না, যেখানকার সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকে। মনের এ বৈচিত্র্যের রহস্য কে উদ্‌ঘাটন করিবে?

মেয়েদের মধ্যে মধুসূদন অন্যরকম—নিস্তারিণী দেবীর কাছে পর্যন্ত মনের উদ্বেগটা প্রকাশ করেন না। বিপিনবিহারীকেও বারণ করেন, বলেন—"ওদের প্রকৃতিটা দুধের মতো বিপিন, একটু ভাবনার তাপ লাগলেই ওরা উথ্‌লে ওঠে, মনে হয় ঐ করলেই ভাবনার গোড়া মেরে দেওয়া হবে। ফলে খানিকটা ভাপ আর ছাইয়ে একটা বিটকেল ব্যাপারের সৃষ্টি হয় মাত্র...আমি এখনও রয়েছি, তোমার চাকরি হয়েছে, চণ্ডীও বছর দেড় দু'য়েকের মধ্যে পাস দেবে—এত ঘাবড়াবার কী দরকার?"

ভুল বোঝেন মধুসূদন—যেখানে কঠিন পর্দা সেখানে মেয়েদের মাত্র আধাআধি পাইয়া সব লোকই চিরকাল যেমন ভুল বুঝিয়া আসিয়াছে। মেয়েদের বিপদ উপলব্ধি করিবার সহজ বৃত্তি দিয়াই নিস্তারিণী দেবী থেকে বোধ হয় অভয়াটি পর্যন্ত সবাই বুঝিতে পারে, সংসারের উপর একটা গাঢ় ছায়া দিন দিন ঘনাইয়া আসিতেছে—তবে নিশ্চয় কম বেশি করিয়া। ওদিক থেকেও ঐ ধরনের একটা লুকোচুরি চলিতে থাকে। পিতার প্রায় পুনর্জন্ম হইয়াছে, হাসপাতাল থেকে ফিরিবার পর শ্বশুরবাড়ি থেকে বিরাজ, মোতিবালা আসিয়াছেন, চণ্ডীচরণও স্কুলের ছুটি লইয়া আসিয়াছেন। মধুসূদন বাইরে থাকিলে সদর দরজার দিকে কান রাখিয়া নিস্তারিণী দেবী সুযোগ পাইলেই বলেন—"তোরা যেমন চিরকাল হেসে খেলে এসেছিস সেইরকমই থাক্ বাপু; বুঝছি তো সবই, তবে তোরা সুদ্যু মুখ চুন করে ঘুরে বেড়ালে কি আর রাখতে পারা যাবে মানুষটাকে?...কী আর আছে শরীরে?..."

গিরিবালাকে বলেন—"তোমায় রোজই বলছি বৌমা, বিপিনের কাছে সংসারের কথা কখনও তুলতে যেও না, এমনই ভেবে ভেবে অমন শরীর কালি হয়ে গেছে। পুরুষ

সংসারের কী বোঝে গা? আর তাও এই কি বয়স ওর?"

এ ধরনের প্রসঙ্গে কণ্ঠ শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ হইয়াই আসে।

সবাই আসিয়া পড়িয়াছে, তাতে সময়ও প্রচুর, তা ভিন্ন এমনি সবাইকে আজকাল একটু বেশি করিয়া কাছে পাইতে ইচ্ছা করে। বৈকালে উঠানের রৌদ্র সরিয়া গিয়া যখন ছায়া পড়ে, চৌকির উপর একটা কম্বল আর চাদর বিছাইয়া দেওয়া হয়, সবাই একত্রিত হন। মধুসূদন একটা বড় তাকিয়া হেলান দিয়া বসেন, মোহনা গড়গড়ায় করিয়া তামাক দিয়া যায়। এই সময় মধুসূদন হাতে একটা কবিরাজী তেল মালিশ করেন। মালিশটা করেন গিরিবালা, গোড়া থেকে তিনিই করিতেছেন, একটা অধিকার জন্মাইয়া গেছে ; অন্যান্য সবাইয়ের কেহ পায়ে হাত বুলায়, কেহ মাথার পাকা চুল বাছে ; গল্প চলিতে থাকে।

খজনী নাতি দুইটিকে ছাড়িয়া দিয়া নিদ্রার জন্য কোথায় গিয়া একটা নিরাপদ স্থান বাছিয়া লয়। শশাঙ্ক সমস্ত উঠানে নিজের খেলায় মাতিয়া ওঠে, ছোটটি চৌকির উপর একের পর এক করিয়া সবার আদর কুড়াইয়া ফেরে, সেদিকে একটু ফুরসত হইলেই গড়গড়ার নল লইয়া ঠাকুরদার সঙ্গে বিরোধ ঘটায়।

গ্রীষ্মের এই ছায়াস্নিগ্ধ অপরাহ্নগুলি মধুসূদনের নিজের জীবনের অপরাহ্নের সঙ্গে কী এক অপরূপ মাধুর্যে মিলিয়া যায়। দুঃখের মধ্য দিয়াই আসুক, কিন্তু এ ধরনের অনুভূতির তিনি পূর্বে সন্ধান পান নাই—সমস্ত জীবনের মধ্যে এই সুরটি গভীরভাবে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে। মধুসূদন আরও সতর্ক হইয়া ওঠেন, নিজের জীবনের যা ট্র্যাজেডি সেখান থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস উঠিয়া যেন এদের মুখের হাসি এক লহমার জন্যও না মলিন করিয়া দেয়।

যে কোন একটা সূত্র ধরিয়াই গল্প আরম্ভ হইয়া যায়। তবে যে ভাবেই আরম্ভ হোক না কেন উদ্দেশ্যটা থাকে ঐ লুকোচুরি। এ সময়টা ডাক আসিবার সময়। হয়তো সাঁতরা হইতে চিঠি আসিয়াছে—পড়িয়া মধুসূদন বলিলেন—"এই পড় বিরাজ, বৌমাও পড়ো, দাদার ভাবনা আর যেতে চাইছে না। বুড়ো মানুষ, ঠেলে আসতে চাইছিলেন, সেটা যদি কোন রকমে বন্ধ করা গেল তো...অথচ আমি তো দিব্যি আছি, সবার সেবা খাচ্ছি, গল্প করছি, শখ হল একবার অফিসে গিয়ে চেহারাটা দেখিয়ে এলাম।"

মোতিবালার কোলের বিড়ালটার দিকে চাহিয়া বলেন—"যেন মোতির কোলের পুষিটি।"

মোতিবালা লজ্জিত হইয়া বলিলেন—"যাও, তুলনা দেওয়ার আর কিছু পেলেন না!"

মধুসূদন হাসিয়াই বলিলেন—"বরং আরও বেশি আরাম ; পুষি তো মোটে দুটো হাতের সেবা খেতে পায়...অথচ দাদার ভাবনা ঘুচছে না।"

গিরিবালা মনটা অবশ্য জেঠামশায়ের দুশ্চিন্তাতেই সায় দেয়, তাঁহাদের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের কথা স্মরণ করিয়া ভিতরে ভিতরে আরও বিমর্ষ হইয়া যায়, বাহিরে কিন্তু সেটা গোপন করিয়া বলেন—"দূরে রয়েছেন, তাই আরও..."

মধুসূদন বলেন—"তা নয়, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না। এবার তোমরাও লেখো। আমি তো জানি আমি দিব্যি রয়েছি। সতেরো বছর বয়স থেকে পা দু'টো ঘর ছেড়ে ট্যাঙস্ ট্যাঙস্ করে ঘুরে বেড়িয়েছে, আর হাতটা কলম পিষেছে, তাদের যে এমন দুর্দিন আসবে..."

BanglaBook.org

বিরাজমোহিনীর এতটা সহ্য হয় না, বলিয়া ওঠেন—"তা বলে তুমি আর কখনও শিশি খুলতে যেও না বাপু!"

হঠাৎ রাগের ভান দেখাইয়া এমনভাবে বলেন যে, অমন মোক্ষম কথাটাতেও সকলে হাসিয়া ওঠেন। মধুসূদন হাসিয়া বলেন—"শাসনটা একবার দেখো বৌমা, মা হয় কিনা।"

সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হইয়া ওঠেন, বলেন,—"সেকথা বলছি না ; ভগবান দুঃখের মধ্যে দিয়েও এক এক সময় সুখ এনে দেন। একটু ভেব দেখ্ না বিরাজ, গবর্নমেন্টের চাকরি করলে এতদিন কবে থেকে পেন্‌শ্যান্ ভোগ করছি। একটা কষ্ট ভোগ ছিল—অদৃষ্টকে তো আর এড়ান যায় না, কিন্তু ওটুকু না হলে এই যে বসে পুরো মাইনেটা পাচ্ছি—অথচ সবই আগেকার মতো বজায় রয়েছে, কোন ভাবনা নেই...কী বলো বৌমা তুমি?"

গিরিবালা একটু সমস্যায় পড়িয়া বলেন—"হাতটা না কাটলেই হত বাবা..."

মধুসূদন আবার হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"দ্যাখো অন্যায় আবদার! হাতটা না কাটলে ভগবান..."

বিরাজমোহিনী বলিয়া ওঠেন—"তা হাত না কেটে ভালো করবেন না, ভগবানেরই বা এ কোন ন্যায়বিচার বাবা?"

সকালবেলা মালিশের সময় গিরিবালা প্রায় একলাই থাকেন। কথাবার্তায় একটু গুরুত্ব থাকে, প্রায়ই সংসারের কোন একটা সমস্যা লইয়া আলোচনা হয়, বেশির ভাগ মেয়েদের বিবাহ লইয়া। মধুসূদন বলেন—"বিপিনকে রোজই বলছি এবার ছুটি নিয়ে যাক, গড়িমসি করছে। তুমি দেখেছ বলে বৌমা?"

বারণ সত্ত্বেও বিপিনবিহারী স্ত্রীর সহিত এসব আলোচনা করেন কিনা যাচাই করিবার জন্যই তোলা কথাটা, মধুসূদন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পুত্রবধূর মুখের পানে চাহিয়া থাকেন।

গিরিবালা বোধ হয় একটু নীরব থাকিয়া যান, তাহার পর বলেন—"এত তাড়াতাড়ি কী বাবা? তা ভিন্ন জেঠামশাই তো করছেনই চেষ্টা, ঠিক হলেই জানাবেন।"

বোধ হয় সন্দেহ থাকে একটু,. তবুও মধুসূদন একটু প্রবঞ্চিত হইয়াই, বলেন—"না, তাড়াতাড়ি অন্য কোন কারণে নয়, তবে বয়েস হয়েছে তো ওদের ; বিশেষ করে ত্রিনয়নীর —বছর বারো হল তো..."

গিরিবালা বলেন—"বারো বছর তিন মাস যাচ্ছে।"

সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসিয়া একটু আবদারের ভঙ্গিতে বলিয়া ওঠেন—"তা হোগ গে বাবা; এখন থাকুন, বড্ড একলা পড়ে যাব।"

মধুসূদনও হাসিয়া ওঠেন,—বলেন, "চমৎকার কথা বৌমার!...আচ্ছা, চণ্ডীর বিয়ে দিয়ে তোমার সঙ্গী করে দোব, একটু লাগো দিকিন সবাই এদিকে উঠে পড়ে।"

গিরিবালা হাসিয়া বলেন,—"সঙ্গী যত বাড়ে ততই ভালো বাবা ; কমাবার চেষ্টা করতে যাব কেন?"

এবারে দুজনেই বেশ হাসিয়া ওঠেন। মধুসূদন বলেন—"কবি মানুষের মেয়ে, ওঁর সঙ্গে এঁটে ওঠবার জো আছে?"

BanglaBook.org

তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলেন—"তা নয়; আমারও তো বয়েস হয়ে আসছে মা, প্রায় চৌষট্টি হতে চলল..."

বয়েসের কথায় গিরিবালার সত্যই রাগ হয়, এরপরেই হইবে—"কতদিন আর বাঁচব?"—তাহার পরেই "সবাইকে ভালোয় ভালোয় রেখে যেতে পারলে বাঁচি।" তাহার পর আরও অনেক সব কথা। গিরিবালার সত্যই খারাপ লাগে।

বলেন—"থামুন বাবা আপনি, চৌষট্টি বছর আবার একটা বয়েস! আমার আই-মা একশ উনিশ বছর বেঁচেছিলেন। বাঙলাদেশ, তায় তিনি মেয়েমানুষ, আর এ তো পশ্চিম, তা ভিন্ন..."

মধুসূদন এবার খুবই উচ্চৈঃস্বরেই হাসিয়া ওঠেন—নিস্তারিণী দেবীকে ডাক দিয়া বলেন,—"ওগো শোনো এসে বৌমার কথাটা একবার!"

হাসিতে হাসিতেই গিরিবালার পানে চাহিয়া বলেন—"তোমার হিসেবমতো আমার তো তাহলে তোমার কোলের ছেলে হয়ে ছোট দাদুটির সঙ্গে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে বেড়াবার কথা মা।..."

॥ ১২ ॥

হাসির প্রাচুর্যই আছে, তবু কিন্তু সেটা উপরে উপরেই থাকিয়া যায়। বরং হাসি দিয়া চাপা দিতে যাওয়ায় দুশ্চিন্তার বেদনাটা আরও বেশি করিয়া অন্তস্তলে প্রবেশ করে। হাসপাতাল থেকে মধুসূদন বাড়ি ফিরিলেন গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, শীত আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃদ্‌রোগ দেখা দিল। একটু ভুলও হইল, কয়েকমাস ধরিয়া চাপা দেওয়ার একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, প্রথমটা লুকাইয়া রাখিলেন কথাটা। ভুলের উপর ভুল এই করিলেন যে, বিপিনবিহারীর নিকটও লুকাইবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে একদিন অফিস থেকে আসিয়াই শয্যাগ্রহণ করিতে হইল। তখনও লুকাইবার চেষ্টা করিলেন মধুসূদন, বলিলেন—"হ্যাঁ, এই দিন দু'য়েক থেকে মনে হচ্ছে যেন বুকে এই সময়টা একটা ধড়ফড়ানি ওঠে, তবে ও কিছু নয়, ভাববার কিছু নেই।"

এবার কিন্তু যাহাতে হাত কাটার সময়ের মতো ভুল না হইয়া যায় সেজন্য একেবারেই তাঁহাকে জেলা-শহরে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানকার ডাক্তার এবারও বলিলেন—অন্তত পনেরোটা দিন বিলম্ব হইয়া গেছে। বাঙালী ডাক্তার, দেশে লইয়া গিয়া একবার কবিরাজিটা চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিলেন—যদি কোন ফল পাওয়া যায়। আর কালবিলম্ব না করিয়া সকলে দেশে চলিয়া গেলেন।

পূর্ববঙ্গীয় এক প্রাচীন কবিরাজের হাতে চিকিৎসার ভার দেওয়া হইল। অতিশয় বিচক্ষণ কবিরাজ, কিন্তু অন্য চিকিৎসা-ব্যবসায়ীদের প্রতি অত্যন্ত দুর্মুখ। উহার মধ্যে আবার একটা তুক ছিল; রামচন্দ্র কবিরাজ রোগীর নাড়ি দেখিয়া অ্যালোপ্যাথ আর হোমিওপ্যাথদের যদি গাল পাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন তো সে রোগীর সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তার কারণ থাকিত না।

প্রথম দিন সাতেক কিছুই ঠাহর করিতে পারা গেল না। কবিরাজ দুই বেলা আসিয়া চুপ করিয়া নাড়ি ধরিয়া বসেন, মাঝে মাঝে ঔষধ বদলান, পথ্যাদির উপদেশ

BanglaBook.org

দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যান। সঙ্কটের ছায়াটা গাঢ়তম হইয়া উঠিতেছে। যে কোন মুহূর্তেই সব শেষ হইয়া যাইতে পারে এমন অবস্থা।...সাতদিনের দিন রামচন্দ্র কবিরাজ নাড়ি ধরিয়াই অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তারদের উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেন মন্ত্র উচ্চারণের কাজ হইল, এক মুহূর্তেই সমস্ত বাড়িটা যেন একটা দুঃস্বপ্ন থেকে জাগিয়া উঠিল।

তাহার পর দিন দিন উন্নতির লক্ষণ সব প্রকাশ পাইতে লাগিল। এক মাস হইয়া গেলে মধুসূদন বিপিনবিহারীকে পাণ্ডুলে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন।

রাজী করিতে বেগ পাইতে হইল, কেননা, পিতার সমস্ত সেবাটা বলিতে গেলে তিনি নিজের হাতে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। তবুও যাইতে হইল। বাঁচিয়া যাওয়ায় মধুসূদনের চারিদিককার ভাবনাগুলা আবার নূতন করিয়া দেখা দিতেছে, বিশেষ করিয়া ভাবনা হইয়াছে চাকরিটার জন্য—নিজের কর্মশক্তির উপর চাকরি নয় তো, মনিবের নিতান্তই একটা অনুগ্রহ।

বিষয়ী লোক, মধুসূদন পুত্রকে বিস্তর করিয়া বুঝাইলেন, বলিলেন—"অনুগ্রহ জিনিসটা বড় পলকা জিনিস বিপিন, এর পর প্রার্থীকে সর্বদাই দীর্ঘশ্বাসের তাপ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। অবশ্য কৈলেস আছে সেখানে, খুব সতর্কই আছে, তবু ছেলে হিসেবে তোমার সেখানে থাকাটা নিতান্ত দরকার, সায়েবের একটা আঠা থাকে আর কি। তারপর আমি তো এসেই পড়ছি শীগ্গির।"

রোগটা খুবই কঠিন হইয়াছিল, এই সবে আশা হইয়াছে একটু। পিতার সান্নিধ্য ছাড়িয়া নড়িতে বিপিনবিহারীর একেবারেই মন সায় দিতেছিল না। যাচ্ছি-যাব করিয়া দিন বাড়াইতেছিলেন। একদিন ভগবতীচরণ বলিলেন— "বিপিন, আমি তোমায় বলিনি এতদিন যেতে, মধু এখন আমায় ধরেছে, বলে—বিপিন টালমাটাল করছে, তুমি বুঝিয়ে বল দাদা। কবিরাজমশাইকে জিগ্যেস করেছিলাম—ভয়ের আর কিছুই নাই...তবে সময় একটু নেবে—পুনর্জন্মই তো?...আমি লক্ষ্য করে দেখছি ওর চাকরির ভাবনাটা বড্ড বেশি, এই সারবার মুখে সর্বদাই একটা দুর্ভাবনা লেগে থাকাটা বেশ ভালো বলে মনে হয় না। ...আসল কথা আমি পরামর্শ দোব কী আমার নিজের মাথারই ঠিক নেই, তবে আমরা সবাই তো রয়েছি, আর কিছু না হোক, অন্তত ঘুরেই এসো একবার।"

কথাগুলা ফেলিয়া দিবার নয়, তাহা ভিন্ন বিপিনবিহারী নিজেও লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, চাকরিকে কেন্দ্র করিয়া আর সব দুর্ভাবনাগুলাও ক্রমে বেশি করিয়া মনে জাঁকিয়া বসিতেছে যেন পিতার। বিপিন একলা থাকিলেই সেই সব কথা—মেয়েদের বিবাহ বাকি রইল—বাড়ি করা হইল না—সঞ্চয় নাই কিছু...ঠিক হাসপাতাল থেকে ফিরার পর যেমন বাই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—যাহার ফলে এই নিদারুণ ব্যাধি। বিপিনবিহারী বিশেষ চিন্তিতই হইয়া পড়িলেন; তাহার পর সাতপাঁচ ভাবিয়া সকলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একবার ঘুরিয়া আসাই স্থির করিলেন।

তবুও ভালোভাবে স্থির করিতে আরও পনেরোটা দিন লাগিয়া গেল।

যাইবার দিনের কথা। নিস্তারিণী দেবী খলে করিয়া ঔষধ লইয়া আসিয়াছেন, মধুসূদন শুইয়া ছিলেন, সেবন করিবার জন্য উঠিয়া বসিয়াছেন, বিপিনবিহারী প্রস্তুত হইয়া উপস্থিত হইলেন। মধুসূদন বলিলেন—"এই যে ভাবতেই এসে পড়েছে বিপিন।"

BanglaBook.org

নিস্তারিণী দেবীকে বলিলেন—“আজকের ওষুধটাও বিপিনই খাইয়ে দিয়ে যাক, ওরই হাতে দাও।”

গিরিবালা বিছানায় বসিয়া সেবা করিতেছিলেন, উঠিয়া যান দেখিয়া বলিলেন—“না, তুমিও বসে থাকো মা।”

কী যেন ভাবিয়া একটু থামিয়াই হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—“দেখো তো কেউ, ছোটদাদু কি কাঁদছে? না, ভুল শুনলাম? কানটাও গেছে তো?”

মনোমোহিনী ছিলেন, উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া তখনই বাহির হইয়া গেলেন।

শশাঙ্ক ছিল না। ছোটটিকে কোলে করিয়া আনিয়া বলিলেন—“কাঁদে নি, কিন্তু বাপ গেলেই ধরবে কান্না।...বৌ, বসিয়ে রাখ্ তোর কাছে।”

মধুসূদন চুপ করিয়া লজ্জানত-দৃষ্টিতে পুত্র আর সন্তান-পাশে পুত্রবধূর দিকে চাহিয়া চাহিয়া কয়েকবার দেখিলেন। পরিপূর্ণ চিত্রটি মনটা যেন ভরাট করিয়া দিয়াছে। ঔষধ সেবন করাইয়া বিপিনবিহারী যখন প্রণাম করিয়া উঠিলেন, মাথায় আঙুল কয়টি চাপিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন—“যেতে বিপিনের মন সরছে না, তাই নয়?”

বিপিনবিহারীর গলাটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল, কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, পরিষ্কার করিবার চেষ্টায় দুটি হ্রস্ব শব্দ হইল মাত্র।

মধুসূদন পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—“দুঃখু কিসের?—আমিও শীগ্‌গির আসছি।”

মধুসূদন ছেলের কাছে কথা রাখিয়াছিলেন।—

খালি বাড়িতে মধুসূদনের চিন্তাটাই যেন অষ্টপ্রহর ঘিরিয়া ঘিরিয়া থাকে বিপিনবিহারীকে, সেদিন মনটা অহেতুক ভাবেই যেন বেশি ভারাক্রান্ত ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত জাগিয়া জাগিয়া তন্দ্রা আসিয়াছে, হঠাৎ মনে হইল মধুসূদন সামনে দাঁড়াইয়া; বলিলেন—“বিপিন, আমি এসেছি।”

বাড়ির ব্যাপার নয়, কুঠির আফিসে ঢুকিতে যে ফটকটা আছে যেন সেইখানটা। হালকা ঘুমটা ছাঁৎ করিয়া ভাঙিয়া গেল। মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে, কিন্তু স্বপ্নটা এত স্পষ্ট যে, বিপিনবিহারী যেন সম্মোহিতের মতোই ঘরের দুয়ার খুলিয়া উঠানের দুয়ার খুলিয়া, রাস্তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কোথায়ও একটু শব্দ নাই। শীত-শেষের অল্প কুয়াশাচ্ছন্ন ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভরিয়া আছে। জিরাৎক্ষেত্রটার ওধারে গুলমোহর গাছটার নিচে সাদা ফটকটার পানে বিপিনবিহারী ঠায় চাহিয়া রহিলেন; ওটা নেহাতই স্বপ্ন ছিল বিশ্বাস করিতে একটু বিলম্ব হইল।

পরদিন টেলিগ্রাম আসিল মধুসূদন আর ইহজগতে নাই।

BanglaBook.org

স্বর্গাদপি গরীয়সী

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পর্যায়

॥ ১ ॥

মাকে শৈলেনের প্রথম মনে পড়ে একটি বর্ষার সন্ধ্যায়। সব মিলাইয়া যেমন মনে হয়, ওর নিজের বয়স তখন বোধ হয় সাত থেকে আটের মধ্যে। ওর ছোট ভাই অহি একটু জন্মরুগ্‌ণ গোছের ছিল; মা তুলসীমঞ্চের সামনে দাঁড়াইয়া তাহার মাথাটা মঞ্চের আলসেতে আলগা ভাবে চাপিয়া প্রণাম করাইতেছেন—বিশ্বাস, ঐ করিলে অহি নীরোগ হইয়া যাইবে। শৈলেন ওদিককার ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল—"মা, আমিও।"

প্রণামের জন্য নয়, যদিও সেটাও একটা কম হুজুগ নয় সে-বয়সে; আসল কথা তুলসীর মাটি খাইতে হইবে। মূলে পাতা ঝরিয়া শুকাইয়া গিয়া মাটির সঙ্গে মিশিয়া বেশ সোঁদা-সোঁদা গন্ধ আনে, শৈশব-রসনার কাছে খুব একটা উপাদেয় বস্তু। মঞ্চটা উঁচু, তাই মায়ের উপর নির্ভর।

"তা হলে আয় শিগ্‌গির"—বলিয়া ফিরিয়া চাহিতেই এক ঝলক আলো কোথা হইতে আসিয়া মা'র মুখের উপর পড়িল।

"ও মা! এখনও সুয্যি ডোবে নি,—আর আমি এদিকে সন্ধ্যে জ্বেলে বসলাম!" —বলিয়া মা আকাশের পানে চাহিলেন, মুখে বিস্ময়ের সঙ্গে অল্প অল্প হাসি লাগিয়া আছে —যেন সূর্যদেবের এই লুকোচুরির জন্যই।

ঠাকুরমা পশ্চিমের দাওয়ায় মালা জপিতেছিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন— "পশ্চিম দিকে মেঘটার বুঝি গোড়া কেটে গেল?"

আরও কিছু কিছু ঘটনা মনে পড়ে—কোন কেনটাতে শুধুই মা আছেন, কোনটা মায়ের সঙ্গে অল্প-বিস্তর জড়িত, কোনটা বা সম্পূর্ণই আলাদা।...একবার কি একটা দুষ্টামির জন্য শৈলেনের উপর রাগিয়া শাসন করিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছেন—একটা পা সামনে বাড়ানো, ডান হাতটা উঁচানো, মুখে হাসি।...পূর্বে বোধ হয় কোথাও বলা হইয়াছে, গিরিবালার রাগের সঙ্গে হাসির একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ছিল, ওঁর নিজের মায়ের কাছ থেকে পাওয়া বোধ হয়।

খজনীর কথাও খুব বেশি করিয়া মনে পড়ে। গোল-গোল চোখ, দাঁত একটু উঁচু, অসম্ভব রকম কালো; কিন্তু কি অসম্ভব রকম ভালো লাগত খজনীকে! তখনকার জীবনে সেই যেন ছিল সব-কিছু। শৈলেনের স্মৃতিটা যখন থেকে একটু স্পষ্ট সে সময়ে একেবারে কোলের ছেলে বলিতে ওর ছোট ভাই অহি, মাঝখানে আর একটি ভাই হরেন, সেও বড় হইয়া খজনীর কোল ছাড়িয়াছে। তাহার মানে শৈলেনের সঙ্গে খজনীর আর কোন

BanglaBook.org

সম্পর্কই না থাকিবার কথা। একটি করিয়া শিশু আসিতেছে, খজনীর কোল অধিকার করিতেছে, বড় হইয়া পরের শিশুটিকে জায়গা ছাড়িয়া দিতেছে, খজনী আবার নবাগতকে অন্তরের সমস্ত উত্তাপ দিয়া জড়াইয়া ধরিতেছে—এই ছিল খজনীর জীবনের ইতিহাস। ক্রমাগতই বিদায় দিতে দিতে ওর স্নেহ বিদায় দেওয়ায় যেন অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, শুধু শৈলেন আসায় একটা ব্যতিক্রম ঘটিল। স্নেহ তো প্রকৃতই একটা অভ্যাস নয় —যখন মনে হয় সে একটা অভ্যাসের পথ ধরিয়া সামনেই চলিয়াছে, হঠাৎ দেখা যায় তাহার সাধ হইয়াছে একটিকে আশ্রয় করিয়া বাসা বাঁধিবার। তাই মাঝে অনেক শিশু আসিয়া গেল, কিন্তু শৈলেনের সঙ্গে সম্পর্কটা ঘোচে নাই খজনীর। শিশু আর কিছু না চিনুক, স্নেহ চেনে ; নবপরিত্যক্ত স্বর্গের স্বাদ আছে কিনা তাহাতে ; তাই শৈলেনেরও খজনী না হইলে এক দণ্ড চলিত না, সেই অন্ধকার মূর্তি এক দণ্ড না দেখিলে তাহার নিজের চোখে আলো যেন নিবিয়া যাইত।

খজনীর মতো মিষ্ট ছিল খজনীর বাড়ির মেড়ুয়ার রুটি। প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা ছোট একখানা চাটুর মতো কালো রঙের রুটি তাহার বাড়িতে খুব নিচু ছ্যাঁচা বেড়ার ঘরের মধ্যে লুকাইয়া বসাইয়া খজনী খাইতে দিত, সঙ্গে থাকিত একটু শাক, কি বেগুনের একটা তরকারী—টকে, ঝালে, নূনে গরগরে ; কখনও বা চুনো মাছ। বেশ মনে পড়ে শৈলেনের —খজনী নিজে খাইতেছে, ভাঙিয়া ভাঙিয়া তাহার মুখে দিতেছে, ঝালে এক একবার তাহার সাদা সাদা গোল গোল চোখ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। খুব গল্প জমিয়াছে —"তুই আমিকে বেশি ভালবাসিস না তোর মাকে রে খোঁখা?" শৈলেন বলিল—"তোকে ; মাকে কিন্তু বলিসনি খজনী।"..."কেনো রে?"..."মা তাহলে মরে যাবে।" খজনীর চোখ দুইটা আয়ত হইয়া ঈষৎ হাস্য সহযোগে অদ্ভুত দেখাইতেছে, মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল—"হুঁ, তুই বড় বেইমান আছিস খোঁখা, দুলহিনকেই বেশি ভালোবাসিস তুই ; আমিও তোরে ছেড়ে মরে যাবো, তখন সমঝাবি, হুঁ!"

তাহার পর উভয়-সমস্যায় পড়িয়া শৈলেনের মুখের কাঁদ-কাঁদ অবস্থা দেখিয়া রুটি তরকারীর হাতেই তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকে জড়াইয়া ধরিল, দুলিয়া দুলিয়া বলিয়া উঠিল —'নই রে বউয়া, তোরা ছোড় ক' নই মরবেই রে!"

নিজের অংশ থেকে আরও খানিকটা মাছ দিল ; খাওয়া হইলে এঁটো মুখটা নিজের কাপড়ে মুছাইয়া, অহিকে কোলে লইয়া তাহারা শৈলেনদের বাসামুখো হইল।

রুটি-অভিযানের কথা চাপা থাকিত না, ঠাকুরমা শূদ্রের বাড়িতে খাওয়ার জন্য হৈ-হৈ বকাবকি করিতেন, পিসিমারা গঞ্জনা দিতেন, মা ভয় দেখাইতেন, এবার নিশ্চয় মরিয়া যাইবেন। বিপিনবিহারীর কানে উঠিলে তিনি একেবারে জাতে ঠেলিবার ব্যবস্থা করিতেন। শৈলেনের বেশ মনে আছে, পিতা খুব আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনয়টির তোড়জোড় করিতেন—ছেলেকে জাতিচ্যুত করা হইতেছে বলিয়া নিস্তারিণী দেবী হইতে আরম্ভ করিয়া সবাইকে উঠানে জড়ো করা হইত শেষ দেখা দেখিয়া লইবার জন্য। শৈলেন অসহায় ভাবে দাঁড়াইয়া আছে, পাশেই খজনী, সেই জাত খাইয়াছে, তাহাকেই বিলাইয়া দেওয়া হইবে। শৈলেন এক একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেছে, যাহার মুখের দিকেই চায়—গম্ভীর। ঘরের দুয়ারে মা দাঁড়াইয়া ; ঘোমটার মধ্যে মুখটি দেখা যায় না বলিয়া অশ্রু ভিন্ন আর কিছু কল্পনার মধ্যেই আসে না। দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া বিষণ্ন দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া বড় ভাই

BanglaBook.org

শশাঙ্ক ; ভাইকে হারাইবার ভয়ে মুখখানি শুকাইয়া গেছে। এখন শৈলেন বুঝিতে পারে ঐ একটি মাত্র লোক তাহারই মতো হইত প্রতারিত।

ব্যাপারটাতে সত্যের রূপ ফুটাইবার জন্য এক এক সময় আবার মোহনা চাকরকে বামনপাড়ায় পুরুতঠাকুরের নিকট দৌড় করাইয়া দেওয়া হইত, সে অল্প সময়ের মধ্যে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিত—পণ্ডিতজীও বিধান দিলেন শূদ্রের বাড়ির রুটি খাইয়াছে, এ-ছেলেকে জাতের বাহির করিয়া দেওয়া ভিন্ন কোন উপায় নাই।

দৃশ্যটা অবশ্য বেশিক্ষণ এভাবে থাকিত না। এ-মুখ ও-মুখ চাহিয়া কোনখানেই আশার বিন্দুমাত্র সঙ্কেত না দেখিয়া শৈলেন ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিত। এইটুকুরই অপেক্ষা, অশ্রু নামিলেই চারিদিক্ থেকে বিপিনবিহারীর নিকট সুপারিশ পৌঁছিত—"থাক্, তাহলে না হয় এবার ছেড়ে দে বিপিন...এবারটা থাক্ দাদা, আর খাবে না, এবারে না হয় আমরা একটু গোবর খাইয়ে জাতে তুলে নিচ্ছি...আবার যদি খায় তা ওর খজনীকে হেঁটোয় কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে পুঁতে ফেলা হবে..."

খজনীর গঞ্জনাটা আগেই একপ্রস্থ হইয়া যাইত, এ সময়েও কয়েকটা ঝাপটা গিয়া তাহার উপর পড়িত—"তুই পোড়ারমুখী যা-তা খাওয়াস কেন ওকে অমন করে? তোর রাক্কুসে পেটে হজম হয় বলে সবার পেটেই সইবে ঐ সব!"

শৈলেনকে প্রতিজ্ঞা করানো হইত—না, সে আর কখনও খাইবে না—কখনও নয় —এ জন্মে নয়। সেদিনটা আর হয় না ; বোধ হয় তাহার পরদিনও নয়, তেমন সুযোগ না পাইলে বোধ হয় আরও এক-আধটা দিন যায়। তাহার পর আবার সেই গোপন পরামর্শ, গোপন অভিযান, ধরা পড়া, আবার সেই সব ব্যাপারের পুনরাবর্তন।

স্মৃতির আলোড়নে কথাগুলা সব এলোমেলো হইয়া আসিতেছে। মায়ের কথা মনে পড়ে বেশি করিয়া। বাহিরে একটু দূরে গিয়া পড়িলেই মা'র জন্য মনটা কেমন করিতে থাকিত। খজনী সঙ্গে আছে, এদিকে মেড়ুয়ার রুটির মতো অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ চলিতেছে—এমন দুর্লভ যোগাযোগে বোধ হয় থাকিত খানিকটা অন্যমনস্ক, তবুও একটু ফাঁক পাইলে মনটা মায়ের কাছে গিয়া পড়িত। তাহার কারণ ছিল—ছেলের ধাতটা একটু ঘরছাড়া গোছের দেখিয়া গিরিবালা প্রায়ই শাসাইতেন—"তুই বটতলা কি অশথ-তলার ওদিকে গেলেই আমি মরে যাব, এসে আর দেখতে পাবি নি।"...সে এক অসহ্য রকম দোটানা অবস্থা—বাহিরে না গিয়াও উপায় ছিল না, অথচ সর্বদাই মাকে হারাইবার একটা ভয়। শুধু দূরে গেলেই নয়, বাড়ির কাছে থাকিলেও এ-ভয়টা মনের কোথায় যেন জড়াইয়া থাকিত। মোট কথা, বাড়ির বাহিরে পা দিলেই মনটা বাড়িতে ফিরিয়া যেন মায়ের পাশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে চাহিত—একটা অবুঝ আশঙ্কায় আগলাইয়া আগলাইয়া। ...ঐ একজন যাহাকে কতভাবে যে পাওয়া গেল জীবনে! কেহ তো বলিয়া দেয় নাই যে সব চেয়ে নিকটতম, তাহা ভিন্ন একে একে ছোট ভাই-বোনেরা আসিয়া অল্প অল্প করিয়া কাছে থেকে দূরে—আরও দূরে করিয়া দিয়াছে, আর ওদিকেও জ্ঞানত খজনীর চেয়ে কেহই আপনার ছিল না, কেহই প্রতি-পদে অত অপরিহার্য ছিল না, তবু সদা হারাইবার ভয়ের মধ্যে, শুধু মাত্র আছেন এই ভরসার মধ্যে, কি অপূর্ব যে ছিলেন ছেলেবেলার মা!...মায়ের মুখে, ঠাকুরমার মুখে যত সব দুঃখিনী মায়ের গল্প শুনিত, সবার সঙ্গে মাকে মিলাইয়া ফেলিত শৈলেন। মাকে যেন ঐতেই মানায় বেশি ; হাসি আছে, সবই আছে,

BanglaBook.org

তবু বেদনাই যেন মায়ের প্রাণ। তাই সেদিনকার সন্ধ্যার ছবিটি মনে পড়িয়া পড়িয়া মনের সঙ্গে একেবারে গাঁথিয়া গিয়াছিল শৈলেনের—রুগ্‌ণ, ক্ষীণজীবী অহিকে লইয়া মা তুলসীমঞ্চের কাছে দাঁড়াইয়া আছেন—মুখে সূর্যের শেষ অস্তরাগ আসিয়া পড়িল।...কৈ, কারুণ্যে-মাধুর্যে অমন একটা ছবি তো আর চোখে পড়িল না জীবনে।

একটা বেশ কৌতুকের কথা মনে পড়ে শৈলেনের—ভালবাসার চুল-চেরা বিচার করিতে করিতে খজনী একবার নিজের একটা চোখের নিচেটা টানিয়া ধরিয়া বলিল—"তুই জানিস্ না, দেখ্ খোঁখা, তুই আমির আঁখের ভিতরে রয়েছিস।" সত্যই খজনীর চোখের মধ্যে একটি ছোট্ট মানুষের প্রতিচ্ছবি, শৈলেন একটু ডাইনে বাঁয়ে দুলিতে সেও দুলিল। একটা কৌতুকময় আনন্দের সঙ্গে শৈলেনের মনটা বেশ খানিকটা চিন্তাকুল হইয়া রহিল। বাড়ি আসিল। গিরিবালা অহিকে কোলে শোওয়াইয়া কাজল পরাইতেছিলেন, শৈলেন আসিয়া মায়ের মুখের কাছে মুখটা লইয়া গিয়া বলিল—"তোমার চোখ দেখি তো মা।" নিজেই চোখের নিচেটা টানিয়া ধরিল।...আছে, মায়ের চোখের মধ্যেও সে আছে।...গিরিবালা ব্যাপারটা বুঝিবার আগেই সে নাচিতে নাচিতে বাহিরে চলিয়া গেল। এর বেশি কৌতূহল কখনও হয় নাই—তাহার প্রশ্নের ঐখানেই ছিল অবধি, তাই রহস্যটা কখনও ভাঙে নাই—সমস্ত ছেলেবেলা জুড়িয়া একটা বিস্ময় আর আনন্দ ছিল—যে ভাবেই হোক, শুধু খজনীই নয়, মাও তাহাকে যত্ন করিয়া চোখের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

ঠাকুরদাদাকে মনে পড়ে না, পড়িবার কথাও নয়। ঠাকুরদাদাকে লইয়া এ-পরিবারের যে জীবনাংশ সেটা তখন ইতিহাসের সামিল হইয়া গেছে। শুইবার সময়, কিংবা শীতকালে আগুনের কাছে বসিয়া, কিংবা কোন বর্ষার দিনে, খেলার পাঠ যখন বন্ধ থাকিত শৈলেনরা ঠাকুরমার, কিংবা মা'র হয়তো বা কোন পিসিমার কাছে গল্প শুনিত। ঠাকুরদাদা খুব সুপুরুষ ছিলেন, পায়ের চেটো, হাতের চেটোর রং ছিল যেন দুধে-আলতা—খুব নাকি বড় হওয়ার লক্ষণ। অশেষ প্রভাব ছিল এই পাণ্ডুলে তাঁহার—তাঁহার পুণ্যময় জীবনের কাহিনী সব, যখন যেটা মনে পড়িত বক্তীর। এ বাড়ির অবস্থা খুব ভাল ছিল, অনেক দাসদাসী-অতিথি-অভ্যাগত। সেই সঙ্গে আসিয়া পড়িত বাবা, কাকা, পিসিমাদের বাল্য-কথা ও মা কি করিয়া আসিলেন এ-সংসারে। তন্দ্রার অস্পষ্টতা, কি বাহিরের শীত, ঘরের মধ্যে মিঠা উত্তাপ, কি অঝোর-ঝরা বাদল—এই সবের মধ্যে নিজেদের অতীত জীবনের রোমান্স মূর্তি ধরিয়া উঠিত...এই সেজ পিসিমা কি এই রকম ছিলেন?—সমস্ত উঠানে চক্র দিয়া বলিতেন—"লোটন ঝা খেতে বসেছে—এ—এ—এ, লোটন ঝার পঞ্চাশটা বম্বাই আম হয়ে গেল—ও—ও—ও..."

শশাঙ্ক, শৈলেন, হরেন হাসিভরা কৌতূহলের দৃষ্টিতে চায় পিসিমার দিকে ; ত্রিনয়নী কপট রাগের সহিত বলেন—"আচ্ছা, হয়েছে, এত মিছে কথাও আসে তোমাদের! আমি নাকি ঐ রকম ছিলুম!"

কথা-কাটাকাটির মধ্যে কতকটা অযথাই সবার মুখে হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।

এখন অবস্থাটা যে আগের চেয়ে খারাপ, ঠাকুরদাদার গল্প না শুনিলে সে জ্ঞান হইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল না। প্রথমত তখন সে বয়স নয়, দ্বিতীয়ত তখনও এমন একটা কিছু ছিল যাহার জন্য আশেপাশে সবাইয়ের চেয়ে নিজেদের একটু বিশিষ্ট বোধ

হইত।...বাবা কুঠিতে চাকরি করিতেন, কুঠিতে যাওয়া বারণ ছিল বলিয়া কুঠিটা ছিল একটা অভেদ্য রহস্য। বৈকালে পিতা ফিরিবার সময় হইলেই তিন ভাইয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে গুলমোহর গাছের নিচে সাদা ফটকটার দিকে চাহিয়া থাকিত, এবং তিনি বাহির হইলেই হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইত। সমস্ত দিনের পর বাবাকে পাওয়া একটা আনন্দ তো ছিলই, তাহার উপর ছিল ফুলের লোভ। বাবার খুব ফুলের সখ, সাহেবের বাগান থেকে অনেক রকম ফুল লইয়া আসিতেন—শীতকালে কত রকম বিচিত্রবর্ণ মৌসুমী ফুল, অন্য সময়ে গোলাপ, আরও নানারকম ফুল। সেইগুলা ভাগাভাগি করিয়া তিন ভাইয়ে লইয়া আসিত বাড়িতে। আত্মসাৎ করিবার উপায় ছিল না, তবে বাড়ি পর্যন্ত এই যে লইয়া আসা, তাহার মধ্যেই কী যে একটা উম্মাদনা ছিল! আর, প্রতিদিনের একটা রুটিন—পড়া বা জোর দুপুরবেলা ঘুমানোর মতো অপ্রীতিকর রুটিন নয়—বাবাকে পাওয়া, বাড়ির ভালো-মন্দ খবর আগেভাগে পৌঁছাইয়া দেওয়া, ফুলের সমারোহ—সব মিলিয়া এ রুটিনে একটা অভিনব মাদকতা ছিল, সময় যত অগ্রসর হইতে থাকিত, খেলার মধ্যে তিন ভাইয়ে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত।

ওদিককার বিবাহের পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছিল—দুই পিসিমার, কাকার, সকলেরই। শৈলেনের স্মৃতির শেষ রেখায় তাহাদের সংসারের যে চিত্রটি দুলিতেছে তাহাতে রহিয়াছেন ঠাকুরমা, বাবা, মা; এদিকে তাহারা চারভাই, ছোট পিসিমা।

ছোট পিসিমার বিবাহ হইয়া গেছে, কিন্তু তিনি তখনও পাণ্ডুলেই, হয়তো যে-সময়ের স্মৃতিটা উজ্জ্বল হইয়া আছে সেই সময়টায় তিনি শ্বশুরবাড়ি থেকে কিছুদিন যাবৎ এখানে আসিয়া আছেন—মোটের উপর তাঁহাকে সে-সময়ের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে পড়ে।...কাকা চণ্ডীচরণ কাছেই রৈয়ামে কুঠিতে কাজ করিতেছেন। কাকিমা বেশি দিন পাণ্ডুলেই থাকেন, কখনও যখন রৈয়ামে যান, কেহ সঙ্গে যায়। শৈলেনরাও কখনও কখনও যান, পাণ্ডুলের বৈচিত্র্যহীন জীবনে সে একটা উৎসব-গোছের। কাকিমার আসাটাও একটা উৎসবের অঙ্গ—টুকিটাকি কি সব কিনিয়া আনেন, আসিলেই ইহারা সবাই ঘিরিয়া দাঁড়ায়, যাহা পায় তাহারও অতিরিক্ত লোভ থাকে। কাকিমার সেটা জানা বলিয়া থাকেন সতর্ক, বিশেষ করিয়া হরেনের কাছে। সে-সময়ের কাকিমার মধ্যে একটা ছেলেমানুষিও মনে পড়ে শৈলেনের। সতর্কতার মধ্যে থেকেও হরেন বোধ হয় চিলের মতো ছোঁ মারিয়া একটা জিনিস লইয়া গেল—একটা হাড়ের বল্‌ই সবচেয়ে লোভনীয় ছিল—কাকিমা টপ করিয়া বাক্সর ডালাটা ফেলিয়া চাবিটা ঘুরাইয়া দিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিলেন। বাড়ির বৌ, দৌড়াইয়া ধরিবার তো উপায় নাই-ই, চেঁচামেচি করিবারও পথ বন্ধ, নিরুপায়ভাবে শশাঙ্ক আর শৈলেনের সাহায্য চায়—কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলেন—"যা বাবা, ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আয়, আমি ওটা দিতে পারব না—তোদের জন্যে তো এনেছি কিনে কত কি...যা বাবা, লক্ষ্মীটি, শৈলেন, তুই-ই যা বাবা, শশাঙ্ক পারবে না আঁটতে ও ডাকাতের সঙ্গে..."

কখনও বোধ হয় গিরিবালা আসিয়া পড়েন, বকেন—"কেন ও হতভাগাকে ডাকিস? তোরও যেমন বাই!...দাঁড়া, দেখি।"

কাকিমা জাকে ধরিয়া ফেলেন, ভীত ভাবে বলেন—"না দিদি, তুমি থামো, এক্ষুনি মা, বড়ঠাকুর টের পাবেন। শৈলেন যাচ্ছে। এলেই জানি কাকিমা বলে ঘিরে দাঁড়াবে

—মন কেমন করে না?—ফিরিওলা এলেই একটা একটা করে কিনে রাখি...না, আমি বলটা দিতে পারব না কিন্তু...”

শৈলেনের দিকে চাহিয়া বলেন—“তুই যা বাবা, বলবি হরেন বড় হলে ওকেই দিয়ে দোব—সত্যি ওর জন্যেই তো রেখেছি...তদ্দিন আমার কাছে থাক্‌ ওটা—”

শৈলেনের মনে পড়ে, এক এক সময় চক্ষু পর্যন্ত ছল ছল করিয়া উঠিতেছে যেন কাকিমার। গিরিবালা রাগিয়া বলেন—“খুড়িমা—কোথায় বেশ রাশভারী হয়ে থাকবি তা না—ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষ সেজে...জানি না বাপু!”

শৈলেন বরাবরই পাণ্ডুলে দুইটি বাঙালী পরিবার দেখিয়া আসিয়াছে, এক তাহাদের নিজের আর এক জেঠামশাইদের। কৈলাসচন্দ্রের পরিবারেও মনে পড়ে জ্যাঠাইমা, বড় দাদা, ছোড়দিদি, মেজদাদা—এঁরা তিনজনেই শশাঙ্কদের চেয়ে বড় ; তাহার পর শৈলেনের সঙ্গী তারাপদ, তাহার পর বিজয়। দুইটি পরিপূর্ণ জ্ঞাতি পরিবার, একেবারেই গায়ে গায়ে বাড়ি। বিদেশের কঠিন পর্দা বাঁচাইয়া যাহাতে সর্বদাই মেয়েছেলেদের যাওয়া-আসা চলে তাহার ব্যবস্থা রহিয়াছে। বছরের মধ্যে দৈবাৎ কবে অন্য কুঠির এলাকা থেকে কোন বাঙালী পরিবার দেখা করিতে আসিলে বাঙালীর মুখ দেখিবেন—সে আতুর ভাবটা আর নাই গিরিবালার জীবনে।...সে তো হইয়াও গেল বহু দিন, গিরিবালা এ বাড়িতে পা দিয়াছিলেন বয়স যখন তেরো, বারো-তেরোটা বৎসর অতীতও হইয়া গেল—একটা যুগ। হাজার মন্থর হইলেও পাণ্ডুলের জীবনের একটা গতি তো আছেই, খানিকটা পরিবর্তন তো হইবেই।

গিরিবালার জীবনের তৃতীয় অধ্যায়—সংসারে তাঁহার গৃহিণীপনার যুগ যে পরিবর্তিত সমাবেশের মধ্যে আরম্ভ হইল, তাহার মোটামুটি একটা পরিচয় দেওয়া রহিল।

॥ ২ ॥

মধুসূদনের মৃত্যুর পর নিস্তারিণী দেবী সংসারটা পুত্রবধূর হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। পাণ্ডুল তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না, তবু যে কোন রকমে চোখ-কান বুজিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার কারণ, গোড়াতেই একটা ব্যাপার হইয়া গিয়াছিল যাহাতে নিস্তারিণী দেবী দোটানার মধ্যে পড়িয়া যান। সাঁতরার ঘটনা,—মধুসূদনের শ্রাদ্ধাদির পর বিপিনবিহারী যখন মায়ের কাছে সকলের পাণ্ডুলে প্রত্যাগমনের কথা বলিলেন, নিস্তারিণী দেবী বেশ খানিকটা বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন—“সকলের গিয়ে কি হবে? শুধু শুধু এককাঁড়ি টাকা খরচ তো বাবা।”

বিপিনবিহারী মায়ের চেয়ে কিছু কম বিস্মিত হইলেন না, খানিকক্ষণ মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—“বুঝলাম না মা কথাটা!”

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—“আরে পাণ্ডুলে কি রইল যে সেখানে ফিরে যাব বাবা? তুই একলা যা, যা কুড়িয়ে-বাড়িয়ে আনবার আছে নিয়ে আয়, তারপর এখানে একটা কিছু যোগাড়-যন্ত্র করে বোস, আর পাণ্ডুল কেন?”

সময়টা এমন যে সব কথা পরিষ্কার করিয়া বলা যায় না। পিতার মৃত্যুর পরও যে সংসারের দাবিগুলি যথাপদ্ধতি মিটাইতে হইবে, বেটাছেলে হইয়া বিপিনবিহারী

BanglaBook.org

সেটা বুঝিলেও বেশ সবিস্তারে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করিতে পারিলেন না। কিছু কিছু করিলেন, কিন্তু যে-শোকটা দুজনের পক্ষেই জীবনে সব চেয়ে নিষ্ঠুরতম, তাহার মধ্যে কথা বাধিয়া যাইতে লাগিল। ফল হইল, এক দিকে পাণ্ডুলে ফিরিবার জিদে আর এক দিকে না-ফিরিবার জিদের মধ্যে পড়িয়া মাঝখানে খানিকটা ভুল ধারণা রহিয়া গেল। বিপিনবিহারী স্থির করিলেন, একাই পাণ্ডুলে যাইবেন, তাহার পর যে কি করিবেন সেটা আর প্রকাশ করিলেন না।

কথাটা মা-ছেলের মধ্যেই রহিল, তাহার পর জানাজানি হইল যাওয়ার আগের দিন, যখন যাত্রার আয়োজন করিবার সময় হইয়াছে। ভগবতীচরণের স্ত্রী নিস্তারিণী দেবীকে বলিলেন—"বউ, তুই করছিস কি এ? বিপিন ওর বাপ হারিয়েছে, তাঁর আয়ু ছিল না; কিন্তু তুই জ্যান্ত থাকতেই তোকে হারালে যে আজ। এ যে বাপ-মা হারা হয়ে যাচ্ছে..."

নিস্তারণী দেবী বলিলেন—"ও তেমন কিছু তো বলে নি দিদি, বৌমাকেও তো রেখে যাচ্ছে।"

"কত বড় যে ওর অভিমান সেটা বুঝতে পারিস নি বউ। ওর এখন যে কথায় কথায় অভিমান হবে হাজার শোকেও এটা কি তোর ভোলা চলে? ওর যা বয়েস তাতে শোকটাকেও বাপের ওপর অভিমান করেই দেখবে—বেয়াক্কিলের মতন কটি ছেলের ঘাড়ে এত বড় সংসারটা ফেলে দিয়ে গেল ঠাকুরপো। তুই রইলি বাকি, তোর কথায় কি ব্যবহারে একটু এদিক-ওদিক হলে সেটা যে ও অভিমানের ভাবেই নেবে এটা বুঝতে পারছিস না? তোর মাথার ঠিক নেই বুঝি, তবু ঠাকুরপোর সব জিনিস বজায় রেখে যাবার জন্যে যে জোর করে ঠিক রাখতে হবে মাথা।"

নিস্তারিণী দেবী অশ্রু-দ্রব কণ্ঠে বলিলেন—"অভিমানের আমি তো কিছু বলিনি দিদি, আমার কথাটা বুঝবে না বিপিন? চল্লিশ বছর আগে আমি পাণ্ডুলে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঘর বাঁধতে ভয় পাই নি; আজ পাণ্ডুল শহর হয়েও আমার পক্ষে যে জঙ্গলের চেয়েও..."

বড়-জা অঞ্চলে চক্ষু মুছাইয়া দিয়া নিজের অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"সব ভোল বউ, মেয়েদের অদেষ্ট যে কত বড় কঠিন তা কি বলে দিতে হবে? বুক জ্বলে গেলেও আমাদের হাসি টেনে রাখতে হয় মুখে, নইলে—এ প্রবঞ্চনাটুকু না করলে সৃষ্টি নষ্ট হয় যে। মনে যাই থাকুক তুই এখন যা। যদি সাঁতরায় চলে আসাই ঠিক মনে হয় তো কাছে থেকে আস্তে আস্তে বোঝাতে হবে বিপিনকে, ও নিজেও বুঝবে। জবরদস্তি করতে গিয়ে হাতের কাজটুকু খুইয়ে যদি আরও দিশেহারা হয়ে পড়ে...বরং সেও ভালো কিন্তু বাপের সঙ্গে মা-ও ঠেললে—এই ভাব যদি বসে যায় ওর মনে তো সর্বনাশের আর ওষুধ খুঁজে পাবি নি বউ এ জন্মে।"

তাহার পর কয়েক বৎসর গড়াইয়া গেছে, কিন্তু যতই দিন গেছে নিস্তারিণী দেবী উত্তরোত্তর নিজে আরও ভালো করিয়াই নিজের ভুলটা উপলব্ধি করিয়াছেন। পাণ্ডুলের সে প্রতিপত্তি নিশ্চয়ই নাই, তবু পাণ্ডুল বজায় ছিল বলিয়াই সেই অবস্থা থেকে নিজেকে অল্পে অল্পে টানিয়া তুলিয়া পুত্র দুইটি ভগিনীর বিবাহ দিল, ছোট ভাইকে একস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অল্প করিয়া একটু ভবিষ্যতের পথও করিয়া লইতেছে। বিপিনবিহারী বলেন—"মা, কথাটা তাহলে বলি, জানি না রাগ করবে কিনা! সাঁতরায় বাবা ছেলেবেলায় অতি দুঃখে পায়ের ধুলো ঝেড়ে এসেছিলেন, আর পাণ্ডুলে

BanglaBook.org

আছে বাবার আশীর্বাদ।...কি জানি আমি বোধ হয় পাণ্ডুলকে ভালোবাসি বলেই বলছি কথাটা, কিন্তু এখানে আমার মনে হয়, বাবা যেন কুঠি থেকে বাড়ি পর্যন্ত সব জায়গায়, আর উদয়াস্ত প্রত্যেকটি কাজে আমায় ঘিরে রয়েছেন।"

বিপিনবিহারীর ওটা অনুমান, কিন্তু নিস্তারিণী দেবী যেন সেটা প্রত্যক্ষ করেন, প্রথম শোকের উচ্ছ্বাসটা গিয়া ওঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে। তবু হাসিয়া বলেন—"তুই যেখানেই থাকিস, তাঁর আশীর্বাদ সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ; তবে হ্যাঁ, নিজের হাতে-গড়া জায়গায় মানুষটারও মাহাত্ম্য জড়িয়ে থাকে বৈকি—একটা সামান্য পুতুল গড়লে তাতে কারিগরের মনের ছাপ লেগে থাকে যখন..."

কিন্তু এগুলো হইল বিচারের কথা। একটা জায়গা থেকে মন উঠিয়া গেলে বিচার আসিয়া সে-মনকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। বিপিনবিহারী সেটা বুঝিতেন। মা পাণ্ডুল ছাড়িতে চাহিলে তিনি সে তর্কের জোরে বা অভিমানের ভিতর দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেন না এটা স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। নিস্তারিণী দেবী যেমন ওদিকে বুঝিয়াছেন পাণ্ডুলে আসাটা ভালো হইয়াছিল সে সময়, এদিকে তেমনি বিপিনবিহারীও উপলব্ধি করিবার অবসর পাইয়াছেন যে মায়ের পক্ষে পাণ্ডুলে আসা, পাণ্ডুলে থাকার মধ্যে কী গভীর বেদনা—পুত্রের অভিমান-ভরা মুখ দেখিয়া কী পরিপূর্ণ ভাবেই না নিজেকে ভুলিয়াছিলেন মা।

বিপিনবিহারী যতটা সাধ্য চেষ্টা করেন মায়ের মনটা ভুলাইয়া রাখিতে। সংসারের যে-সমস্যাগুলিতে শুধু নিরুপায় চিন্তাই আছে, যেগুলা সমাধানের সম্ভাবনা নাই, স্বামী-স্ত্রীর কেহই সেগুলা মায়ের গোচরে আনেন না ; যতটা পারেন মা তাঁহার পূজা লইয়া থাকুন। এমন কি যতটা সাধ্য তাহারও অতিরিক্ত করিয়া মাসের মধ্যে এক-আধ বার বাবার সময়ের এক-আধটা দিন ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন : যে-ভোজটা ছিল প্রাত্যহিক, এক একদিন তাহার অনুষ্ঠান হয় ; আহ্নিক তাড়াতাড়ি সারিয়া নিস্তারিণী দেবী লুচি ভাজিতে বসেন ; গিরিবালা, ছোট বৌ প্রভাবতী, কন্যা অভয়া কেহ চাকি-বেলন, কেহ বঁটি লইয়া বসেন, দাওয়ার নিচে কামারটুলি থেকে বোধ হয় পড়াউয়ের বৌ, কি শনিচরার মা আসিয়া বসে, নানা রকমের গল্প হয়।...বিপিনবিহারী আসিয়া অভয়াকে উপলক্ষ করিয়া বলেন—"তোরা মাকে কেন টানতে গেলি?— নিজে সামলাতে পারলি না একটু?"

নিস্তারিণী দেবী বলেন—"তা হোক, পাঁচটা ব্রাহ্মণের মুখে যাবে, চুপটি করে মালা নিয়ে বসে থাকতে কি লাগে ভালো বাবা?"

"ভালো লাগলেও বসে থাকতে দোব না ; কিন্তু আগে আশীর্বাদ করো মা, কাজগুলো যেন তোমার যুগ্যি করে করতে পারি।—বাবার আমলে যেমন হত।"

স্মৃতির আলোড়নে একটু বেদনার সুর ওঠে বুকে, তবুও কিন্তু বেশ লাগে—পুরনো একটা দিনের সৌরভ ভাসিয়া আসে। ভাবের পূর্ণতায় যদি মুখ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতে না-ও পারেন নিস্তারিণী দেবী তো সে আশীর্বাদ অন্তরে আরও ভাব-ঘন হইয়া ওঠে।

বিপিনবিহারী যতটুক করেন তাহার উপর সময় খানিকটা যোগান দিয়া অনুকূলতা করে। আগেকার সেই প্রয়োজনের বেশি চাকর-দাসী, লোক-লস্করের অভাব পূরণ করিয়া

BanglaBook.org

তুলিতেছে আপন জনে। নাতিরা বাড়ি ক্রমে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হোক ছোট, হোক সংখ্যায় কম, কিন্তু মন থেকে আরম্ভ করিয়া বাড়ি-ঘর-দুয়ার পূর্ণ করিবার ক্ষমতা তাহাদের অশেষ—এক দিক দিয়া চারিটিতেই চল্লিশের সমকক্ষ। তাহার পর যখন বড় মেয়েদের কেহ আসে, সব মিলাইয়া ঘর-দুয়ারে আর জায়গা থাকে না ; পূজা হইতেও সময় কাটিয়া সবাইকে বণ্টন করিতে হয়!—নিস্তারিণী দেবী অভাব ভোলেন ; শুধু এইটুকু মনে করিয়া প্রাণটা হয়তো গুমরাইয়া ওঠে যে, আরও একজন যাহার এই সব, সেই রহিল কোন্ সুদূর অজ্ঞাত পথের শেষে।

সাতটা বৎসর গেল, তাহার পর নিস্তারিণী দেবীর মনে পাণ্ডুলের প্রতি গোড়ার দিকে সেই নিস্পৃহতা হঠাৎ একদিন ভীতির আকারে দেখা দিল।—

মাকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য বিপিনবিহারী যে যে পন্থা অবলম্বন করিতেন তাহার মধ্যে একটা ছিল মাঝে মাঝে তাঁহাকে সাঁতরা ঘুরাইয়া আনা। বছরে প্রায় একবার করিয়া হইতই, কখনও নিজে গেলেন, কখনও কৈলাসচন্দ্রকে যাইতে দেখিয়া সঙ্গে করিয়া দিলেন, কখনও বা চণ্ডীচরণ গেলেন। দেখাশোনা, কাছেপিঠের তীর্থ, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি সারিয়া কিছুদিন কাটাইয়া নিস্তারিণী দেবী ফিরিয়া আসেন। কোন সময় যদি দূর তীর্থের যাত্রী পাওয়া গেল, ফিরিতে বিলম্ব হয়। বেশ খানিকটা বৈরাগ্য ও মুক্তির মধ্যে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া অনভ্যাসকাতর বিহঙ্গীর মতো শান্ত-মনে নিজের পিঞ্জরে আসিয়া বসেন।

এবার পূজার পর সাঁতরা থেকে ফিরিয়া আসিবার কয়েক দিন পরে একটা ব্যাপার ঘটিল। এখানে কার্তিকী পূর্ণিমায় স্নানের খুব একটা ঘটা হয়। বেশির ভাগই কমলা নদীতে যায়, তবে আজ-কাল গাড়ির সুবিধা হওয়ায় গঙ্গাস্নানার্থীর সংখ্যাও খুব বাড়িয়া গেছে, দিনকতক আগে থেকেই বেশ সাড়া পড়িয়া যায়।

নিস্তরিণী দেবী আসিবার পর বামনপাড়া, ছুতোরপাড়া, কামারপাড়ার বর্ষীয়সীরা দেখা করিতে আসিল। একদিন আসিল দুলারমনের মা, সঙ্গে দুলারমন। এই পরিবারটির সহিত বেশি হৃদ্যতা, কিন্তু দুলারমনের দুর্ভাগ্যের পর হইতে সমস্ত পরিবারটি কেমন যেন মনমরা হইয়া গেছে। এই রকম একটা বিশেষ উপলক্ষ না হইলে বাড়ির বাহির হয় না বড় একটা। বউটির বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হইবে। কন্যা দুলারমনের মতোই স্বভাবটা একটু হাস্যচপল, এখন অবশ্য তাহার উপর একটা বিষাদের আবরণ পড়িয়াছে। আসিল একটু সন্ধ্যা ঘেঁষিয়া ; নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"এস, আমি জিজ্ঞেস করছিলাম সবাইকে—দুলারমনের মা এখনও এল না কেন!"

গিরিবালা একটা কম্বল পাতিয়া দিয়া দুলারমনকে লইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন ; সে আজকাল আরও দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে।

গল্প আরম্ভ হইল ; শাশুড়ী ভালোই আছে, আরও খিট্‌খিটে হইয়া পড়িয়াছে। না, জামাইয়ের কোন তল্লাস পাওয়া গেল না এ পর্যন্ত ; মেয়েটার কপাল চিরতরেই পুড়িয়াছে, আর তো চাওয়া যায় না ওটার দিকে। শাস্ত্রের বিধান মতো বারো বৎসর পরে কপালে ঐ যে সিঁদুরটুকু আছে ওটাও ঘুচিয়া যাইবে। দুলারমনের মা চোখ দুইটি মুছিয়া বলিল —"মা হয়ে কথাটা মুখে আনতে বাধে, দুলহীন, কিন্তু মনে মনে সতীরাণী মা-জানকী যেন তার আগেই ওকে সরিয়ে নেন, দুলারীকে আমার যেন সাদা কাপড়ে না দেখতে হয়।"

খানিকটা অশ্রুমোচন করিয়া বুকটা হালকা হইল। নিস্তারিণী দেবী সান্ত্বনা দিলেন,

অমঙ্গলের কথা ভাবতে বারণ করিলেন, তবে বেশ জোরের সঙ্গে নয়, এমন কি শুষ্ক চোখেও নয়। বুক বেশ খানিকটা হালকা হইলে কথা অন্য দিকে ঘুরিল। দুলারমনের মা একবার প্রশ্ন করিয়া উঠিল—"এবার বেশ পুজোর সময়ই দেশে গেলে, আসতেও দেরিও হল, কার্তিকী পূর্ণিমার গঙ্গাস্নানটি সেরে এলে না কেন দুলহীন? আমরা সবাই বলাবলি করছিলাম।"

এবার দল পাইয়া নিস্তারিণী দেবী সেতুবন্ধ-রামেশ্বর পর্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন ; তাহার পর শরীরটা এত ক্লান্ত হইয়া পড়িল যে, কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত সাঁতরায় আর থাকিতে ভালো লাগিল না। এ কথাটা বলিলেন না, বলিলেন—"মা-গঙ্গা না মনে করলে হয় না দুলারীর মা, পাপের শরীর তো?"

দুলারমনের মা কৃত্রিম রোষের সহিত বলিল—"অমনি আরম্ভ হল দুলহীন পাপের শরীর—পাপের শরীর!...সাধ করে কি আসতে চাই না?"

তাহার পর একটু হাসিয়া বলিল—"আমি জানি গঙ্গা-মাই কেন আটকে রাখেন নি তোমায় দেশে।"

চটুল দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া থাকিয়া বলিল—"আমি এবারে বুড়িকে রাজী করেছি, দুলারীর বাপকেও করেছি রাজী দুলহীন, গঙ্গাস্নানে যাব।"

নিস্তারিণী দেবীর উপর সংবাদটার প্রতিক্রিয়ার জন্য সামান্য একটু বিরতি দিয়াই দুলারমনের মা একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—"অনেক দিনের সাধ দুলহীন, এবার যাবই আমি।...তুমিও চলো...না, ও-রকম ফাঁকির হাসি চলবে না, যেতেই হবে ; ঠিক এই জন্যেই গঙ্গা-মাঈ তোমায় দেশে আটকে রাখেন নি, নৈলে পূর্ণিমার স্নান ছেড়ে নাকি তুমি চলে আসবার মেয়ে! চণ্ডীকে ছুটি নেওয়াও ; চলো দুলহীন, আমার মাথার কিরা —চমৎকার হবে। তুমি যাবেই ; এত দিন পরে গঙ্গা-মাঈ আমার ওপর মুখ তুলে চেয়েছেন যখন ; ভালো করেই চেয়েছেন ; তোমায় সঙ্গী করে দেবেনই..."

হঠাৎ স্বরটা নামাইয়া দিয়া, দৃষ্টি আরও চটুল করিয়া বলিল—"আমি গঙ্গা পর্যন্ত গিয়েই ছেড়ে দোব ভেবেছ নাকি? গঙ্গাজির নাম করে বেরুচ্ছি শুধু..."

নিস্তারিণী দেবীর বড় কৌতূহল হইল, প্রশ্ন করিলেন—"তবে?—জামাইয়ের মতন পালাবে নাকি?"

দুলারমনের মা হাত নাড়িয়া বলিল—"আরে দুৎ, দুলহীন কিছু বোঝেন না।"

আরও গলা নামাইয়া বলিল—"আমি যাব গঙ্গা-সাগর, মনে মনে এঁচে বসে আছি। একবার তো গঙ্গাজির নাম করে বেরুই...তাই তো না, আট দশ দিন আগে বেরুব।"

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"তোমার পেটে পেটে কম মতলব নয় তো দুলারীর মা! কিন্তু দুলারীর বাপ তো সঙ্গে যাবে, রাজী হবে কেন?"

দুলারমনের মা ঠোঁট চাপিয়া নিস্তারিণী দেবীর পানে আড়চোখে চাহিয়া এমন একটা হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে মুখটা ঘুরাইয়া লইল যে-হাসি শুধু মেয়েছেলেতেই বোঝে ; একটু ব্যঙ্গের টানে বলিল—"ঈস্ হবে না রাজি! চিরজন্মটা..."

আর বলিবার দরকার হয় না ; হাসিটাকে আর একটু স্পষ্ট করিয়া শেষ করিয়া ফেলিল, তাহার পর আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—সাগর-সঙ্গমে সে যাইবেই ; সে নাকি বড় অপরূপ স্থান—মা-গঙ্গার কূল-কিনারা নাই একেবারে, আর সামনে সমুদ্র—যত দূর

BanglaBook.org

দৃষ্টি যায় খালি নীল জলের বড় বড় ঢেউ—হাজার হাজার যাত্রীরা স্নান করিতেছে, বড় অপূর্ব জায়গা নাকি—দুলারমনের মা যে যাইবেই তাহাতে আর সন্দেহ নাই, রাত্রে স্বপ্ন পর্যন্ত দেখিয়াছে কতবার গঙ্গামাঈয়ের দয়া হইবে বলিয়াই তো, নৈলে মিছে লোভ দেখাইবার দরকার কি তাঁর?...নিস্তারিণী দেবীকেও যাইতে হইবে। বিপিনবাবুকে বলা নয়, তাহার পর বাহিরে গিয়া চণ্ডীচরণকে মানাইয়া লইলেই হইবে...।

নিস্তারিণী দেবীর কৌতুকের অবধি থাকে না, প্রশ্ন করেন—"কিন্তু তোমায় এ-সব মতলব দিলে কে দুলারমনের মা? গঙ্গাসাগরের ও রকম বর্ণনাই বা পেলে তুমি কোথা থেকে?"

দুলারমনের মা'র মুখটা হাসির আভাসে আবার উজ্জ্বল হইয়া ওঠে ; এবার গলাটা আরও খাটো করিয়া বলে—"তবে বলব সব কথা? কিন্তু কাউকে বলো না দুলাহীন, মাথার কিরা।...ওই শাশুড়ী বুড়ি—এত দিন চেপে রেখে সেদিন আপিনের ঝোঁকে সব বড় বড় করে বলে ফেললে—আজকাল শরীরটা একটু বেশ খারাপ, আপিনের মাত্রাটা বাড়িয়েছে কিনা।...তখন বয়স অনেক কম, বুড়োবুড়ি যুক্তি করে এই রকম গঙ্গাস্নানের আর বৈদ্যনাথ দর্শনের নাম করে একেবারে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত।"

আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, তাহারই মধ্যে দুলিয়া-দুলিয়া বলিতে লাগিল —"দুলহীন্ মনে করছেন দুলালীর মার এটা নূতন মতলব...এ বংশের যে ধারাই এই তা..."

তিন দিন পরে বামনপাড়ায় হঠাৎ কান্নার রোল উঠিল। হাতের কাজ ফেলিয়া নিস্তারিণী দেবী আর গিরিবালা উৎকর্ণ হইয়া উঠিলেন। কাহাদের বাড়ি কি হইল? এখানে রোগ-লুকানো আবার মস্তবড় একটা ব্যায়রাম সকলের। খজনীর মাকে পাঠাইতেছিলেন, এমন সময় খজনী আসিয়া খবর দিল—দুলারমনের মা মারা গিয়াছে। ডাইনে পাইয়াছিল, খুব কম্প দিয়া জ্বর আসে, কাল সমস্ত দিন ভুল বকে, আজ সমস্তক্ষণ অজ্ঞান ছিল ; ঝাড়-ফুঁকে কিছুই ফল হইল না।

সকাল দশটা-এগারোটার সময় মারা গেল দুলারমনের মা। নিস্তারিণী দেবী সমস্ত দিন গুম হইয়া রহিলেন। আহারে বসিলেন মাত্র। এত বড় দুর্ঘটনাটা লইয়া সবাই আলোচনা করিল, উনি অন্যমনস্ক হইয়া শুধু—'হ্যাঁ—না' বলিয়া দু-একবার সায় দিলেন।

পরদিন বিপিনবিহারী সকালে অফিস যাবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, নিস্তারিণী দেবী আসিয়া দুয়ারে ঠেস দিয়া দাঁড়াইলেন।

বিপিনবিহারী বলিলেন—"মা তুমি কাল রাত্তিরেও খাওনি শুনলাম, শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"না, শরীর ঠিকই আছে। বলছিলাম— আমায় সাঁতরায় পাঠিয়ে দে বিপিন, আর মোটেই দেরি করিস নি ; আজ ছুটি নিয়ে আয় অফিস থেকে।"

বিপিনবিহারী অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া তাকাইলেন।

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"না বাবা, আর একটুও অমত করিস নি। তা যদি বললি —জীবনে আমি কখনও ছেলেমেয়েদের—যাকে হুকুম বলে তা করি নি, আজ তোকে

BanglaBook.org

এই প্রথম করছি। তুই বড়-ছেলে, কথাটা কাটিস নি। আটটা বছর কাটাতে আমার যেমন কষ্ট হয় নি, আর কিন্তু একটা দিনও আমার অসহ্যি হয়ে উঠেছে এখানে।...আমি ভিটে আর গঙ্গা ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারছি না বিপিন।”

বুঝিয়া দেখিতে গেলে ব্যাপারটা কিছুই আশ্চর্য নয়। জীবনে যে সব চেয়ে প্রিয় সে যখন ছাড়িয়া যায় তখন মানুষ আর সবই ভাবিতে পারে, শুধু নিজের মৃত্যুর কথাটুকুই ভাবিতে পারে না। নিরুপায় ক্ষোভে, অভিমানে শুধু এইটুকুই মনে হয়—ও বেশ গেল, অন্যায় করিয়া, ফাঁকি দিয়া ; আমাকেই দীর্ঘজীবনের পূর্ণ মেয়াদটা খাটিয়া শেষ করিতে হইবে, একা অসহায় ভাবেই ; ওর ছাড়িয়া-যাওয়া বোঝা পর্যন্ত মাথায় বহিয়া। অবশ্য বোঝা বওয়ার আর গা থাকে না, মৃত্যুর প্রতীক্ষাতেই সে জীবনের গুণ টানিয়া চলে ; কিন্তু মৃত্যুর আকস্মিকতার কথাটা ভাবিতে পারে না। অন্তর্নিরুদ্ধ অভিমানে আর এই নিরানন্দ আশায় মনে হয় এই ভাবেই চলিতে হইবে—দূর—দূর—বহু দূর, অভিশপ্ত এই দীর্ঘায়ুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। মৃত্যু যাহার আশীর্বাদ সে কি মাঝপথে হঠাৎ সাক্ষাৎ পায় তাহার কখনও?

সাত বৎসর পরে দুলারমনের মা'র জীবনে মৃত্যুর আকস্মিকতা দেখিয়া নিস্তারিণী দেবী শিহরিয়া উঠিলেন। মৃত্যু যদি যে-কোন মুহূর্তেই এমনি করিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে তো তাঁহাকেও দুলারমনের মায়ের মতোই হা-গঙ্গা হা-গঙ্গা করিয়াই মরিতে হইবে। গঙ্গার তীরের মেয়ে তিনি, গঙ্গার তীরের বধূ—মায়ের উপর কন্যার অধিকারের মতই তাঁহার একটা সাহস ছিল ; একটা সহজ বিশ্বাস ছিল—মধুসূদনকে তিনি ডাকিয়া লইয়াছেন, নিস্তারিণী দেবীকেও ভুলিবেন না। দীর্ঘ অবসাদের পর সময় আসিবে, মধুসূদনের দায় কাঁধ থেকে নামাইয়া নিস্তারিণী দেবী শেষ শান্তির জন্য মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইবেন। শত দুঃখেও মধ্যের নিশ্চিন্ততাটুকু ছিলই।

দুলারমনের মায়ের মৃত্যু সব ধারণা দিল উল্টাইয়া।

দেখিলেন যে-মৃত্যু তাঁহার আশীর্বাদ, সে হঠাৎ যে-কোন মুহূর্তেই অভিশাপ হইয়া দেখা দিতে পারে—তাঁহার এত বড় অধিকার থেকে তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া!

॥ ৩ ॥

ছুটি লইতে, আয়োজন করিতে সপ্তাহ-খানেকের আগে হইয়া উঠিল না, একটা ভালো দিনও দেখিতে হয়। একটা প্রতিক্রিয়াও ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। পাণ্ডুলেরও তো একটা মায়া আছে?—এত দিনের দীর্ঘ প্রবাস। শুধু প্রবাসই নয়—জীবনের সব চেয়ে সুখের দিনগুলা কাটিল এখানে, হৃদয়ের তন্তুগুলা যেখানে যেখানে গিয়া জড়াইয়াছিল টান পড়ায় ব্যথায় জগিয়া উঠিল, এবং সেই তন্তুদল যে ছিঁড়িয়া যাইতে হইবে এই চিন্তায় মনটা ক্রমেই বিষণ্ণতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সাঁতার নিস্তারিণী দেবীর পরকাল,—গঙ্গা আছেন, তীর্থের সুযোগ, স্বামীর চিতাভস্মও এইখানেই—এদিক দিয়া পরকালের সঙ্গে যোগটা আরও নিগূঢ় ; কিন্তু ইহকাল বলিতে যাহা কিছু সে সমস্তই তো পাণ্ডুল : এত সহজে কি তাহাকে জীবন থেকে ঝাড়িয়া ফেলা যায়?

টান পড়িতে বেদনার মধ্যে দিয়া আরও একটা জিনিস স্পষ্ট হইয়া উঠিল—ভাঁড়ার ছাড়িয়া, দিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব থেকে মুক্ত হইয়া গেলেই সংসার থেকে মুক্ত হওয়া চলে না। ইচ্ছা ছিল ও-সময়টা ভগবানের চরণে অর্পণ করা। তাহার আড়ম্বর ছিলই; কিন্তু দেখা গেল চারটি নাতিতে একে একে আসিয়া কখন নিঃসাড়ে সেই উদ্বৃত্ত সময়টুকু অপহরণ করিয়া লইয়াছিল। থাকার কালে যে-চুরিটা ধরা পড়ে নাই, যাওয়ার সময় সেটা আত্মপ্রকাশ করিল। বরং আরও শঙ্কার কথা—পূজায় বসিয়া কেমন অন্যমনস্ক হইয়া যাইতে লাগিলেন নিস্তারিণী দেবী, তাহাতে বেশ টের পাইলেন ওরা চারজন ভগবানের প্রাপ্য নিয়মিত সময়টুকুতেও অধিকার জমাইয়াছে।

রাত্রে গল্প শুনিবার জন্য জুটিয়াছে সবাই। জায়গা লইয়া কাড়াকাড়ি হইতেছে, গিরিবালা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ধমক দিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, যা দুটো দিন আছেন, তোরা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খা। আরও তাড়াতাড়ি পালান মা।"

নিস্তারিণী দেবী সব চেয়ে দুষ্টুটির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তুমি ওই বলছ বৌমা, আর আমি কি ভাবছি জানো? ভাবছি থাকব কি করে সাঁতরায় গিয়ে। মুখে আনতে বাধে বটে, কিন্তু সত্যিই এক-একবার মনে হচ্ছে, যাচ্ছি বটে মা-গঙ্গার লোভে, কিন্তু এদের এই উপদ্রবের লোভটাই বড় হয়ে উঠে আমায় না আবার টেনে আনে।"

গিরিবালার বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ফুটিল, বলিলেন—"ওমা, ঐ ভূতেদের দিয়ে যদি অন্তত সে-উপকারটুকুও হয় তাহলে যে আমি বাঁচি; বল না মা, ওদের আমি আরও লেলিয়ে দিচ্ছি।"

নিস্তারিণী দেবীও হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"অমনিতেই যা অবস্থা করেছে তার ওপর আবার..."

একটু চুপ করিয়া গেলেন; সামনে একটু চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল। গিরিবালা ঘরের কাজটুকু সারিয়া ফিরিতেছিলেন, নিস্তারিণী দেবী একটু ধরা গলায় বলিলেন—"মনের কথা লুকিয়ে রাখা পাপ, বলে একজনকেও অন্তত শুনিয়ে রাখা ভালো: আমি বড্ড দোটানার মধ্যে পড়ে গেছি বৌমা, কি করে থাকব এই সব ছেড়ে? আমার কি মনে হয় জানো বৌমা?—আমার সংসারের সাধ মেটবার আগেই উনি ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন। মেটেনি, আমার সাধ মেটেনি বৌমা, আমি এ-মন কি করে মা-গঙ্গার পায়ে দোব? উনি আমায় নানা দিক্ দিয়ে বঞ্চিত করে গেলেন বৌমা!"

নূতন বিচ্ছেদের মুখে স্বামীর শোক নূতন করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। গিরিবালাও সারা দিন চোখ মুছিয়া মুছিয়া বেড়াইতেছিলেনই, শ্রোতাদের বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে শাশুড়ী-বৌ উভয়েই চোখে অঞ্চল চাপিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।...

ব্যবস্থাটা কি মধুসূদনই করিলেন? যেমন ভাবে যোগাযোগটা ঘটিল তাহাতে সেই রকমই একটা সন্দেহ হয় বটে। নাতিরা বড় হইলে নিস্তারিণী দেবী গল্পপ্রসঙ্গে বলিতেন—"যেমন করে দিলাম খোঁটা তোদের ঠাকুরদাদাকে, ব্যবস্থা করতে পথ পেলেন না তিনি। একেবারে পাগুল-ছেড়ে যাওয়া সেই প্রথম, তোরা দুটো না থাকলে, গঙ্গা ছেড়ে পালাবার লজ্জা ঢাকতে বোধ হয় আমায় গঙ্গায় ডুবে মরতে হত।"

ব্যাপারটা এইরূপ—

BanglaBook.org

যাইবার দুই দিন আগে বিপিনবিহারী বেশ একটু সকাল সকাল অফিস থেকে বাহির হইলেন। মা যাইতেছেন বলিয়া দুপুরবেলা বিরাজমোহিনী আসিয়াছেন। বৈকালে রৈয়াম হইতে চণ্ডীচরণ আসিবেন; এর মধ্যে অনেকগুলা গোছগাছও করিবার আছে। ...ছুতারটুলির সামনে আসিয়া একটা দৃশ্য দেখিয়া রাগে, ক্ষোভে, নৈরাশ্যে বিপিনবিহারীর সমস্ত শরীরটা যেন জর্জরিত হইয়া উঠিল। বড় রাস্তা থেকে বাহির হইয়া একটা অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা ভিতরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহার দুইদিকে ছাড়া-ছাড়া ভাবে ছুতার-কামারদের বাড়ি। খানিকটা দূরে—রাস্তার প্রায় মাঝামাঝি দশ-বারো জন অর্ধ-উলঙ্গ নোংরা ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার নিজের তিনটি পুত্র! একটা মস্ত বড় হুল্লোড় চলিয়াছে, মিশ্র কলরবের সঙ্গে একটা ছড়ার অংশ উদ্ধার করা যায়— "পড়াউ লড়াউ বকড়ি চড়াউ, ধিয়াপুতাকে বেচ্ বেচ্ খাউ।"...পড়াউ নামে একটা বৃদ্ধ কালা ছুতারমিস্ত্রি আছে, তাহারই খ্যাপান্; অর্থটা হইতেছে পড়াউ ছাগল চড়ায় এবং ছেলেপুলেদের বেচিয়া বেচিয়া প্রাণধারণ করে। মাতনটাকে যথেষ্ট উগ্র করিয়া তুলিবার জন্য ধূলা ছোঁড়াছুঁড়ি চলিতেছে, তাহাতে সবার চেহারার এমন অবস্থা হইয়াছে যে চিনিয়া ওটা দায়। শশাঙ্ক একটু দূরে 'বঢ়মতয়া' (ব্রহ্মোত্তর) নামক জায়গায় গুরুজির পাঠশালায় যায়, পলাইয়া আসিয়া এই কাণ্ড করিতেছে। ছেলেটাকে শান্ত বলিয়াই জানে সবাই, হয়তো গুরুজি ক্ষেত তদারকে গিয়া থাকিবে, ফাঁকতালে খানিকটা মুক্তির আনন্দ লুটিয়া লইতে আসিয়াছে ছাত্র!

দুপুরের দৈনন্দিন ইতিহাসটা তাহার হইলে এই? ছোটটা একটু দুরন্ত আর ছোটলোক-ঘেঁষা হইয়াছে, এ সংবাদটা মাঝে মাঝে আসে বিপিনবিহারীর কাছে। বেত আরম্ভ করিতে হইয়াছে, একটু একটু ফলও পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু বড়টা যে ইতিমধ্যে এত দূর আগাইয়া গেছে, বিপিনবিহারী কল্পনাতেও আনিতে পারেন নাই কখনও। চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া একবার যে চোখ পড়িয়া গেল, সেইটুকুই; তাহার পর লজ্জায় অপমানে বিপিনবিহারী আর দাঁড়াইতে পারিলেন না সেখানে। ডাকিলেন না পুত্রদের, চিন্তিতভাবে মাথাটা নিচু করিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন।

মনের যা অবস্থা তাহাতে তিনটাকে ধরিয়া আনাইয়া উত্তম-মধ্যম দেওয়াই হইত স্বাভাবিক, কিন্তু বিপিনবিহারী এবারে সে-ধরনের কিছুই করিলেন না; তাঁহার মনটা ও রাস্তাই লইল না, পরন্তু এই উপলক্ষ করিয়া মায়ের উপর অভিমানে ভরিয়া উঠিল, যদিও নিস্তারিণী দেবী যাওয়ার কথাটা তোলা পর্যন্ত প্রসন্ন ভাবেই তিনি সব আয়োজন করিয়া যাইতেছিলেন। বাড়িতে আসিতে, অতিরিক্ত বিষণ্ণতা দেখিয়া মা যখন একটু চিন্তিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বিপিনবিহারী একটু চুপ করিয়া রহিলেন। মনের ভাবটা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, মনের দুঃখ নাকি খুবই বেশি, পারিলেন না; একটু হাসিয়া বলিলেন —"মা, বাবা আমার ঘাড়ে দুটো বোন চাপিয়ে বেশ গেলেন চলে; তোমাদের দুজনের আশীর্বাদে বেশ উঠলামও সামলে-সুমলে কোন রকম করে, এখন তুমি কি ঘাড়ে চাপিয়ে সাঁতরায় যাচ্ছে, দেখো।"

BanglaBook.org

অবসন্ন কণ্ঠে চাকরটাকে কামারপাড়া থেকে ছেলে তিনটেকে ধরিয়া আনিতে হুকুম করিলেন, যেমন আছে ঠিক সেই অবস্থাতেই।

চাকরের পিছনে পিছনে তিনটিতে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। বিপিনবিহারী মায়ের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আমি এখন পেটের সংস্থাপন করি কি

এদিকে সামলাই বল?...যাক্, আর ভাবতে পারি না, বাবা ছিলেন পাণ্ডুল-কুঠির সর্বেসর্বা, আমি হয়েছি কেরানী, ওরা কুলিগিরি ভিন্ন আর কি করবে? নিজের নিজের অদৃষ্ট!"

জামা-জুতা ছাড়িবার জন্য ঘরের ভিতরে চলিয়া গেলেন।

শৈলেনের বেশ মনে পড়ে দৃশ্যটা : উহারা তিন ভাইয়ে মনরাখ্না চাকরের পিছনে পিছনে হেঁটমাথায় প্রবেশ করিয়া একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, নটুয়ার নাচ দেখার জন্য যেমন উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে লোকে, সেইভাবে সকলে তাহাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে, অবশ্য ঠাকুরমা, মা, আর বড় পিসিমা ছাড়া। ঠাকুরমার মুখে কি রকম একটা চিন্তান্বিত অপ্রতিভ ভাব, মা আর পিসিমার মুখে ভয়, মা আধা-ঘোমটা টানিয়া দুয়ারের চৌকাঠের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছেন। বাকি সবাই উৎসুক দর্শনার্থী ; কম কয়টি নয়—পিসিমার মেয়ের দল, ও-বাড়ির বড়দাদা, ছোট দিদি প্রভৃতি অনেকগুলি। বাবার হাতে নাকালটা যে সবার কিরূপ উপভোগ্য হইবে, কল্পনা করিতে করিতে তিনজনে আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইল। পায়ের নখ থেকে মাথার টিকি পর্যন্ত ধূলায় ধূলায় আচ্ছন্ন, হরেন আবার উৎসাহের মাথায় কামারপাড়ার খানিকটা কয়লার ছাই হাতের কাছে পাইয়া গিয়াছিল, ঘামে, ধূলায়, ছাইয়ে তাহার রংটা গঙ্গা-যমুনা-গোছের দাঁড়াইয়াছে ; তিনজনকে লইয়া চাকরটাও উদ্ব্যস্ত থাকে বলিয়া একটা কণা কাহাকেও দেহ হইতে খসাইতে দেয় নাই।...শশাঙ্কর চোখে বালি পড়িয়া জল নামিয়াছিল, মুছিবার অবসর না পাওয়ায় সে-ও একটা অপরূপ জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

অভিমান ব্যর্থ বুঝিয়া বিপিনবিহারীর রাগটা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, জামা-জুতা ছাড়িতে ছাড়িতে ঘর থেকেই হুকুম করিলেন—"মনরাখনা, একঠো ছড়ি লে আও।"

বাহিরে আসিতে আসিতে বলিলেন—"এই দেখ মা, তা ভাবনার আমিও কিছু রাখব না, তোমার সামনেই শেষ করে দিচ্ছি তিনটাকে।"

ব্যাপার যে এত গুরুতর ভাবিতে পারে নাই শৈলেন, একবার ঠাকুরমার মুখের পানে চাহিল, কাঠের পুতুলের মধ্যে ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ঠাকুরমার মুখের চেহারা এমন কখনও দেখে নাই শৈলেন।...দর্শকেরা খুব উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছে, ভালো জায়গার জন্য একটু একটু ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেছে।

অবশেষে বিরাজমোহিনী সাহস করিয়া অগ্রসর হইলেন। বিপিনবিহারী বলিলেন —"বিরাজ, তুমি সরে যাও, ওদের বাঁচাতে পারবে না।"

বিরাজমোহিনীর কোলে তাঁহার শিশু-কন্যাটি, দাদার বারণ না শুনিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠানে নামিয়াছেন, মেয়েটি হঠাৎ মুখটা ঘুরাইয়া কাঁধে চাপিয়া ধরিল, এবং তিনি অতটা খেয়াল না করিয়া আরও দুই পা অগ্রসর হইতে আর একবার তিনজনের পানে চাহিয়া ভয়ে একেবারে আঁৎকাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

উৎকট হাসির বেগ চাপিতে সবার মুখ রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। বিরাজমোহিনীর মেজ মেয়েটি একটু গিন্নিবান্নি গোছের, নামিয়া আসিতে আসিতে বলিল—"ভয় কি খুকু? আক্কোস নয়, চুড়েল নয় ; ওরা দাদা হয়, মামির ছেলে, কত সন্দেশ দেবে।"

বোধ হয় সত্য সত্যই তিনটাতে আবার সন্দেশ দিতে অগ্রসর হইয়াছে কিনা একবার দেখিয়া লইবার জন্য ঘাড়টা ঘুরাইয়াই খুকি আর একটা উৎকটতর চিৎকার করিয়া দিদির

কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তাহার আশ্বাস দেওয়ার ভঙ্গিতেই সবার হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইয়াছিল, এবার আর কেহই সেটাকে মুক্তি না দিয়া পারিল না। বধ্যভূমির সমস্ত গাম্ভীর্য এক মুহূর্তে নষ্ট হইয়া গেল, বিপিনবিহারী হালকা হইবার ভয়ে ভিতরে চলিয়া গেলেন। বিরাজমোহিনী নিজের এবং আর সবাইয়ের আধ-চাপা হাসির মধ্যে ভাইপোদের তাড়াতাড়ি নাহিবার ঘরের দিকে লইয়া গেলেন।

হাসিলেন না শুধু নিস্তারিণী দেবী। ছেলের কথাটা একটু লাগিয়াছে প্রাণে। উহারই মুখ চাহিয়া সাতটা বছর তো কাটাইলেন এখানে, চিরকালটাই কি আগলাইয়া থাকিতে হইবে? তাঁহার পরকাল নাই? আর, ছেলে যদি দুরন্তপনা করে, তিনি স্ত্রীলোক, বাড়ির মধ্যে থাকিয়া করিতেই বা কতটা কি পারেন?...তা নয়, ছেলে একটা ছুতা, বিপিনবিহারী আসলে চান মা চিরকাল এই সংসারে মুখ গুঁজিয়া থাকুন। প্রসন্নভাবে সমস্ত আয়োজনের মধ্যে ভিতরে ভিতরে তাঁহার একটা অভিমানের ধারা বহিয়া চলিয়াছে, সেটা একটু পথ পাইয়াই প্রকাশ হইয়া পড়িল।...কথাটা লইয়া যতই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই সেটা শাখা-প্রশাখায় বিস্তারিত হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাদেরই বর্ধমান জটিলতার মধ্যে কোন এক সময় তাঁহার মনেও অভিমান ঘনাইয়া উঠিল। সন্ধ্যার সময় যখন চণ্ডীচরণ আসিলেন, মাকে দেখিলেন বড় গম্ভীর। আসন্ন যাত্রার লক্ষণ মনে করিয়া কিছু প্রশ্ন করিলেন না। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর যখন যাওয়ার কথা উঠিল, নিস্তারিণী দেবী মুখটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন—"যাব বললেই কি যাওয়া হয় বাবা? তোরা মুখভার করলেও যেদিন থাকার উপায় থাকবে না, সেই দিন যাব একেবারে।"

যতক্ষণ সবাই জাগিয়া রহিলেন, আলোচনা চলিল, ততক্ষণ এইরকম অভিমানের কথাই বাহির হইতে লাগিল। তাহার পর সকলে যখন নিদ্রাগত, রজনী নিস্তব্ধ, বিনিদ্র-শয্যায় শুইয়া শুইয়া সমস্ত ব্যাপারটা শান্তভাবে বিচার করিবার সময় পাইলেন নিস্তারিণী দেবী। দুলারমনের মা মরিয়া আ-ঘাটায় মরার যে কী একটা ভয় দেখাইয়া গেল—একটা যেন উভয় সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে ক্রমে ক্রমে। প্রথম আয়োজনের ঝোঁকে যাওয়াটা তিনি যতটা সহজ ভাবিয়াছিলেন আসলে নয় ততটা। শুধু আজ হঠাৎ-প্রকাশ-হইয়া-পড়া ছেলের অভিমান নয়, তিনি কি এসব ছাড়িয়া সেখানে শুধু গঙ্গা আর তীর্থ লইয়া থাকিতে পারিবেন? সেদিন পুত্রবধূর কথায় বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—"আমার কি মনে হয় জানো বৌমা?—আমার সংসারের সাধ মিটিবার আগেই উনি ফাঁকি দিয়ে চলে গেলেন।" কথাটা যে কী একান্ত ভাবেই মনের কথা ওঁর সেটা যেন অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিলেন। এর উপর বিপিনের অভিমান—অভিমানভরা মুখে তাকে যেন শিশুর মতোই অসহায়, প্রতিপাল্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যাহাকে বুকের উত্তাপ দিয়াই বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। মনে পড়িল বড় জায়ের কথা—"তুই মেজলি বাকি; তোর কথায় কি ব্যবহারে একটু এদিক্ ওদিক্ হলে ও যে সেটা অভিমানভরেই নেবে।"...তাই যে লইতেছে বিপিন, শিশুর মতোই অবুঝ আর প্রতিপাল্য বলিয়াই তো?

কিন্তু থাকাই কি সহজ? আজ চণ্ডীচরণকে কথাটা বলিলেন—সঙ্গে সঙ্গে যেন মুখখানা শুকাইয়া গেল বেচারির। বিপিনও শুনিয়াছে নিশ্চয় ; আহারের সময় ও-প্রসঙ্গটাই তুলিল না ; অথচ ওর তো উৎফুল্ল হইয়া উঠিবারই কথা। এই অভিমান—হয়তো রাগই

—থাকিয়া-যাওয়ায় ছেলের মনে কিসের অন্তঃশীলা শুরু হইয়াছে কে জানে?...এ কি অসহ্য রকম ভুল-বোঝা বুঝির পালা চলিয়াছে!

আরও একটা কথা—সত্যই এখানেই বাঁধা পড়িয়া থাকিতে হইবে তাঁহাকে? এখানেই মরিতে হইবে? স্বামী যেখানে গেছেন সেখানকার একটু মাটির জন্য মনটা যে অবাধ্য ভাবেই কাতর হইয়া ওঠে।

নিস্তারিণী দেবী সমস্ত রাত আর চক্ষু বুজিতে পারিলেন না।

পরদিন মাতাপুত্রে যখন দেখা হইল তখন উভয়ের মনই বেশ প্রসন্ন, মনে হয় বিপিনবিহারীও মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছেন। অফিস যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছিলেন, নিস্তারিণী দেবী বিরাজমোহিনীর কোলের মেয়েটিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। বিপিনবিহারী বলিলেন—"বেটি তোমার বড় ন্যাওটো হয়ে উঠেছে দেখছি মা।"

নিস্তারিণী দেবী উত্তর করিলেন—"আমিই ওর ন্যাওটো হয়ে উঠেছি; কাল যা করে ছেলে তিনটেকে তোর হাত থেকে বাঁচালে!"

দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন। বিপিনবিহারী বলিলেন—"সত্যি বড্ড রাগ ধরেছিল...ঠিক কথা, তুমি নাকি রাগ করে থেকে গেলে মা?...বাঃ, কেন?"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন,—"রাগ করিয়ে চলে যাওয়ার চেয়ে রাগ করে থেকে যাওয়াটাই ভাল হবে না?"

বিপিনবিহারী জোরে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"না, না, আমি রাগ করব কেন? তুমি যাও।...মা, ভেবে দেখলাম তুমি এখন নিত্য গঙ্গাস্নান করে ওদের আশীর্বাদ করো, তাইতেই ওদের মঙ্গল। তোমায় বঞ্চিত করলে ওদের কি করে ভালো হবে?"

হাসিয়াই বলিলেন নিস্তারণী দেবী—"এও এক ধরনের রাগের কথাই হল বিপিন; হয়তো সেটা তুই ধরতে না পেরে বলেছিস্। তা ভিন্ন তুই আমার দিক্‌টা ভালো করে ভেবে দেখিস্ নি।"

বিপিন জামা পরিতেছিলেন, থামিয়া, কতকটা ভীত ভাবেই বলিলেন —"সে কি মা?"

"তা বৈ কি; গঙ্গা না পেলেই বঞ্চিত হব, ওদের না-পাওয়াটা বঞ্চিত হওয়ার মধ্যে পড়ে না?...ওসব নয়, আমি কাল ভেবে ভেবে ঠিক করেছি, আমি কোনও দিক্ থেকে বঞ্চিত হব না—শশাঙ্ক আর শৈলেনকে আমার সঙ্গে দে, চণ্ডী যেমন সাঁতরায় পড়াশোনা করেছিল, এরাও সেই রকম করুক; সত্যি, এখানে থাকলে বিগড়ে যাওয়ারই কথা এদের। চণ্ডীর যতটা সুবিধে ছিল, আমি রইলাম, তার চেয়ে এদের বেশি সুবিধেই হবে। পড়াশোনার তেমন বুঝি না, কিন্তু আমার মনে হয় এরা এমনই অনেকটা পেছিয়ে গেছে; সেই কবে হাতেখড়ি হয়েছে, কী-ই বা করেছে এর মধ্যে? বড়ঠাকুর নেই, তেমনি খেতন রয়েছে, স্কুল পাঠশালা—যেমন সুবিধে হয় ভর্তি করে দেওয়া যাবে— নিয়মের টানে পড়াশোনা আপনি হয়ে যেতে থাকবে।"

ছেলেকে দ্বিধা-সঙ্কোচের কোন অবসর না দিবার জন্যই নিস্তারিণী দেবী যেন এক নিঃশ্বাসে তাঁহার প্রস্তাবের স্বপক্ষে যা যা আছে সব বলিয়া গেলেন, তাহার পর একটু থামিয়াই বলিলেন—"আরও একটা কথা এইসঙ্গে বলেই দিই—আমিও তাহলে টেঁকতে

BanglaBook.org

পারব বাবা। একটু স্বার্থপরের মতন শোনাচ্ছে বোধ হয়, কিন্তু তুই একবার চারিদিক্ ভেবে দেখ্।”

বিপিনবিহারী জামার একটা বোতাম দিতে দিতে থামিয়া গেছেন, মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আছেন, মস্ত বড় একটা সমস্যা মিটিয়া যাওয়ায় একটা মৃদু হাস্যের সঙ্গে মুখটি যেন আলোয় ছাইয়া গেছে, বলিলেন—“মা...”

তাহার পর মনটাকে গুছাইয়া লইয়া বলিলেন,—“আমার মাথাতেও কথাটা কেন যে আসে নি তাই ভাবছি। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ভয়ও যে হচ্ছে মা— তোমার ঘাড়ে আবার এই বোঝা চাপিয়ে দোব?—কোথায় একটু হাল্কা হয়ে যাবে, না...”

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—“বোঝাটা তোরও নয় আমারও নয় বিপিন ; যাঁর বোঝা তিনিই আড়ালে থেকে ব্যবস্থা করেছেন। সত্যিই সামান্য কথাই, কাল সমস্ত রাত জেগে জেগে শেষকালে যখন হঠাৎ মনে হল, মনে হল খুব খানিকটা ভাবিয়ে ভাবিয়ে তিনি এক কথাতেই সমস্যাটা যেন পূরণ করে দিয়ে গেলেন।...তুই আর অমত করিস্ নি বিপিন।”

॥ ৪ ॥

সম্পূর্ণ নিজে হইতেই যে সংসার চালাইবার বয়স হয় নাই গিরিবালার এমন নয়, অভিজ্ঞতাও হইয়াছিল যথেষ্টই, কেননা, নিস্তারিণী দেবী তাঁহার হাতেই সব ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এদিকে, তবু একটা মস্ত বড় ভরসা ছিল যে শাশুড়ী মালা হাতেই হোন বা নাতি-কোলেই হোন, নিকটেই আছেন।...বেশ খানিকটাই দিশেহারা হইয়া পড়িলেন।

আবার এই সময়টিতেই আসিল পুত্রের নিকট হইতে প্রথম বিচ্ছেদ : একটা অদ্ভুত অনুভূতি—সবই আছে তাহার মধ্যে এরা দুইজনে না থাকিয়া মনটাকে যেন অষ্টপ্রহর অধিকার করিয়া রহিল—নিজেরাই একটা শূন্যতা সৃষ্টি করিয়া নিজেদের জীবনের সহস্র খুঁটিনাটি দিয়া সেই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। এ-সময়ের কথাটা উত্তরকালে গিরিবালা প্রায়ই শশাঙ্ক-শৈলেনের কাছে বলিতেন—“সে কী যে অসহ্য অবস্থা, মনে পড়লে আমার এখন পর্যন্ত যেন মনটা কি রকম হয়ে যায়। মা-ও গেলেন চলে, কিন্তু হঠাৎ হলেও আমি কতকটা তোয়ের ছিলাম। তোরা যেতে আমি যেন কি করব ভেবে উঠতে পারলাম না। আরও মনটা আইঢাই করতে লাগল ; এই জন্যে যে আমি শেষ পর্যন্ত যদি কান্নাকাটি করতে থাকতাম তো বোধ হয় হত না যাওয়া—বাহাদুরি দেখিয়ে রাজী হলাম বলেই ওঁর সুবিধা হয়ে গেল। মা-ই তুলেছিলেন কথাটা, কিন্তু আমার মনের অবস্থা দেখে প্রথমটা দোমনা হয়ে পড়লেন, তারপর আমি নিজে গিয়ে যখন রাজী হয়ে বললাম মাকে...”

গিরিবালা থামিয়া, ছেলেদের বিস্মিত দৃষ্টির পানে চাহিয়া হাসিয়া ওঠেন, বলেন —“হ্যাঁ রে, আমিই গিয়ে নিয়ে যেতে বললাম মাকে—আর জ্বালার কথা বলিস কেন? তবে এ-ও বলি, সে কি আমি বললাম? বলালেন আমার মুখ দিয়ে উনি। আমার তো তখন এক রকম মাথার ঠিক নেই ; মা চলে যাচ্ছেন তার ওপর তোদের যাওয়ার কথা

BanglaBook.org

শুনে একেবারে পাগলের মতন হয়ে গেছি ; একবার ঠাকুরঝিকে ধরছি—একবার ও-বাড়ির দিদিকে গিয়ে ধরছি, একবার ছোট ঠাকুরঝিকে ধরছি—বলো তোমরা বুঝিয়ে—একে মা যাচ্ছেন, তার ওপর এ-দুটো গেলে আমি বাঁচব না—ওরা ফিরে এসে আমায় দেখতে পাবে না।—মাকে বলতে পারছি না ; তিনিই তুলেছেন কথাটা, একলা থাকতে কষ্ট হবে এ-ও বলেছেন, এর ওপর নিজের মুখে গিয়ে বললে ভাববেন ছেলের ওপর জোর খাটাচ্ছে—মাথার ঠিক নেই, কি বলতে কি বলব, রাগ করেই বোধ হয় ছেড়ে যাবেন। দিদি, ঠাকুরঝিদেরও মাকে বলতে বারণ করে দিয়েছি—ওঁরা ওঁকে বলুন, উনি মাকে বলুন ; ওঁর ঘাড় দিয়ে ফাঁড়াটা কাটিয়ে নিতে চাইছি আর কি।...এমন কি, ঘরের কোণে একবার কাঁদতে দেখে মা জিগ্যেস পর্যন্ত করলেন —'বৌমা কাঁদছ—ছেলে দুটোর জন্যে মন-কেমন করছে?'...তাড়াতাড়ি চোখ মুছে বললাম—'না মা, তুমি চলে যাচ্ছ'—বলেই হাপুস নয়নে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলাম।

সেদিন ওঁর বাইরে কি একটা কাজ ছিল, খুব রাত করে খেতে বসলেন। ঠাকুরপো, ঠাকুরজামাই আগে খেয়ে নিয়েছিলেন। মার একাদশী ছিল, খাবার সময় ওঁর কাছে বসতে পারলেন না। ঠাকুরঝিও মার গা-হাত-পা টিপে দিচ্ছিলেন ; আমাকেই বসতে হল। ভাবলাম মন্দ হল না, একটু সুবিধে পেলেই তোদের যাওয়ার কথাটা পাড়ব, যাতে বন্ধ করে দেন।

খুব যেন অন্যমনস্ক হয়ে খাচ্ছিলেন, একবার হঠাৎ মুখটা তুলে বললেন—'মা শশাঙ্ক আর শৈলেনকে নিয়ে যাবেন না বলছেন।'

মুখটা বেশ রাগ-রাগ।

একটু দমে গেলাম, বললাম, 'কৈ, আমি তো কিছুই বলি নি।'

বললেন—"বলতে হয় না, সমস্ত দিন যেরকম কেঁদে-কেটে বেরিয়েছ তাতেই অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। ছেলেগুলো আকাট মুখ্যু হয়ে রইল।'

আমি চুপ করে রইলাম। উনিও চুপ করে খেয়ে যেতে লাগলেন, তারপর একবার মুখ না তুলেই বললেন—'তুমি মাকে আবার বুঝিয়ে বলো, যাতে নিয়ে যান।'

কোন উত্তর না পেয়ে একবার একটু চোখ তুলে আমায় দেখে নিলেন, বোধ হয় মুখের ভাবটা দেখে বুঝলেন গতিক সুবিধের নয়। চুপ করে আবার খেয়ে যেতে লাগলেন। —'বোঝ, কোথায় আমি চেষ্টা করছি ওঁর ওপর দিয়ে বন্ধ করব যাওয়া, উনি মতলব আঁটছেন আমিই গিয়ে মাকে বলে ব্যবস্থা করি!"

গিরিবালা হাসিতে থাকেন। হাসিতে হাসিতেই বলেন—"কিন্তু কি করে জিতলেন শোন্ না, আমি কি পারি এঁটে উঠতে কখনও?...ভাবটা কি বোঝবার জন্যে ঠায় মুখের দিকে চেয়ে আছি—উনি ঘাড় হেঁট করে খেয়ে যাচ্ছেন—দেখি, আস্তে আস্তে রাগের ভাবটা গিয়ে মুখটা সহজ হয়ে এল। আলুর দম হয়েছিল, একটা মুখে দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে তক্ষুনি আর একটা মুখে ফেলে দিলেন, জিগ্যেস্ করলেন—'এটা কি বিরাজকে দিয়ে রাঁধিয়েছ নাকি?'

গিরিবালা এখানটা একেবারে জোরে হাসিয়া ওঠেন, হাসির ঝোঁকে চোখে জল জমিয়া যায়, মুছিয়া বলেন—সেদিন মনের ঠিক নেই, আলুর দমটা নুনে একেবারে পুড়িয়ে ফেলেছিলাম, ঠাকুরজামাই ঠাট্টা করে বললেন পর্যন্ত—যাতে কখনও নেমকহারামি না

BanglaBook.org

করতে পারি বৌদি তার পাকা ব্যবস্থা করে রেখেছেন আজ। সেই আলুর দমের প্রশংসা। মতলবটা আমার ধরে ফেলা উচিত ছিল, কিন্তু মেয়েছেলের রান্নার প্রশংসা হলে তো আর তার জ্ঞানগম্যি থাকে না, বললাম—'কেন?—ঠাকুরজামাই বলছিলেন বড্ড নুন-খরো হয়েছে, মুখে দেবার জো নেই বুঝি?'

উনি সে-কথার উত্তুর না দিয়ে আরও দুটো মুখে ফেলে দিয়ে বললেন—'ঠাকুরের হাতে খেয়ে খেয়ে তারুর জিব পানসে হয়ে গেছে ; আলুর দমতো লাউডালনা নয় —তাতে নুন চাই একটু ; নুন আর ঝাল।'

চুপ করে খেয়ে যেতে লাগলেন। আমার মন তখন ভিজে গেছে—একটু পরে জিগ্যেস্ করলাম—'দোব আর দুটো?'

বললেন—'দাও, তাহলে আর দুখানা রুটিও এনো।'

ভুলেও কখনও একখানা বেশি রুটি খাবার মানুষ নন, আমি মনে মনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে গোটা আষ্টেক আলু আর দুখানা এনে পাতে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। নুনের চোটে জিভ হেজে গিয়েছিল, সেটা কিন্তু আমায় এক বছর পরে বললেন। তখন এমন ভাবটা করে খেয়ে যেতে লাগলেন, যেন কী অমৃত না খাচ্ছেন!

আলুর দম খাবার সময় কথাটা তুললে আমি হয়তো মতলবটা ধরে ফেলতে পারি, সেইজন্য এ-কথা-সে-কথা পেড়ে কখন বেলে-তেজপুরের কথা এনে ফেললেন, তার পর একেবারে দুধ খাবার সময় রুটি মাখতে মাখতে বললেন— 'বিকাশ দাদার কথা মনে আছে তোমার?'

বললাম—'তাঁকে রোজই মনে পড়ে বোধ হয়।'

বললেন—'মনে পড়বার মতন মানুষই। তোমার তো দাদাই, পড়বেই মনে।'

দু-এক গরস খেয়ে বললেন—'তুমি একবার বলেছিলে—তাঁর বড় ইচ্ছে তোমার ছেলেরা মানুষের মতন হোক ; কেউ উপযুক্ত হয়ে উঠছে দেখলে তিনি নাকি খুব আনন্দ পান।'

এইটুকু বলেই এক লেকচার—এখনই বলছি লেকচার, তখন আর কি ধরতে পেরেছিলাম?—উপযুক্ত মায়ের কাজ সোজা নয়—ছেলেদের মুখ চেয়ে তাদের অনেক সময় বুক বাঁধতে হয়—আজ যেটা আদর, আজ যেটা মায়া, এক সময় বোধহয় সেটা ছেলের পক্ষে বিষ হয়ে উঠতে পারে—বিশেষ করে কচি বয়সে মা-ই সব কিছু ছেলের পক্ষে, আর ছেলেবেলাটা শেখবার সময় বলে ছেলের জীবনে মায়ের দায়িত্বটাই বেশি —বিকাশ দাদা আমার মধ্যে নিশ্চয় কিছু দেখেছিলেন, তাইতেই তো অমন আশা করে বলেছিলেন আমার ছেলেদের তিনি বড় দেখবেন একদিন।

এই রকম আস্তে আস্তে বিনিয়ে বিনিয়ে একরাশ বলে গেলেন, অত কি মনে থাকতে পারে? শেষকাল হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন—'এই দেখ আমার ভুল!—হঠাৎ কি করে বিকাশ দাদার কথাটা মনে পড়ে গেল—তুমি না আবার ভেবে বস তুমি পাঠাতে নারাজ বলে তোমায় পাকে-প্রকারে রাজী করবার চেষ্টা করছি...'

ভালো তরকারির দোহাই দিয়ে মনটা ভিজেই ছিল, তার পর বিকাশ দাদার কথা এনে আকাশে তুলে দেওয়া—আমি দিলাম ফাঁদে পা বাড়িয়ে, বললাম— 'নারাজ হতে যাব কেন? তবে...'

BanglaBook.org

চুপ করে গেলাম। উনি একবার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে বললেন—'তাহলে বলবে মাকে?'

আমি চুপ করে রইলাম দেখে বললেন—'তাহালে আমিই বলব মাকে, কি করব? —তুমি যখন চাও না বলতে তখন তো জবরদস্তি নেই; তবে ফল হবে না। মা বলবেন—ওরা চলে গেলে তুমি কেঁদেকেটে অনর্থ করবে।'

বলে ফেললাম—'কান্নাকাটি কেন করতে যাব?'

বললেন—'নাই কর, কিন্তু মা তো করবে বলেই ধরে নেবেন?'

আবার একটু বোধ হয় চুপ করে গেলাম, তার পর বাহাদুরি দেখিয়ে বললাম—'আমি না হয় বলব'খন। ওদের ভালোটা আগে দেখতে হবে তো?'

উনি আস্তে আস্তে দুধের বাটিতে চুমুক দিয়া উঠে গেলেন।

গিরিবালা আবার একচোট হাসিয়া ওঠেন, ছেলেদের জিজ্ঞাসু নয়নের পানে চাহিয়া বলেন—'তার পর আর কি? তার পর আমিই গিয়ে মাকে বললাম; কী বোকাই যে বনেছিলাম সেবার!'

মা বললেন—'বেশ করে ভেবে দেখ বৌমা, পারবে তো থাকতে? না হয় এর পর কেউ গিয়ে ওদের রেখে আসবে'খন।'

বললাম—'না মা, লেখ-পড়ার কথা যখন, তখন আর দেরি করে কাজ নেই, আবার কবে সুবিধা হবে না হবে...'

যেন পাঠাবার জন্য আমারই জিদ, আর কেউ গা করছে না!—ঐ যে, উপযুক্ত মা হওয়ার কথা হয়েছে, আর রক্ষে আছে?"

একটু হাসিয়াই সেদিনের অসহ বিচ্ছেদযাতনার স্মৃতিতে যেন অভিভূত হইয়া বলেন—"তার পর তোরা চলে যেতে যে কি অবস্থা আমার—যেন পাগলের মতো হয়ে গেলাম! তোদের কাউকে ছেড়ে কক্ষণও থাকি নি—যে ঘরেই যাই, যে কাজেই হাত দিই—প্রাণ যেন আইঢাই করে ওঠে—কেন মরতে বলতে গেলাম মাকে—আবার উলটে বাহাদুরি করে জিদ করেই পাঠিয়ে দিলাম। বাড়িতে টেঁকতে পারি না; ও-বাড়িতে দিদির কাছে বসি, হাউ-হাউ করে কাঁদি। দিদি এক একবার বোঝান, এক একবার ধমক দেন, —বলেন—তোর এই দশাই হবে। দুগ্ধপোষ্য শিশু দুটো, কি বলে তুই কাছছাড়া করলি? আমরা তুললাম কথাটা মামীমার কানে; তিনি যদি মত বদলালেন তো উনি গিন্নিপনা করে জিদ ধরে বসলেন—নিয়ে যাও।...এখন কাঁদলে কি হবে?"

দিদির হাতে পায়ে ধরে বলি—'তুমি বড়ঠাকুরকে বলে একটা ব্যবস্থা করো। না হয় তার করে দিন আমি মরণাপন্ন, ওদের ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।'...ঠাকুরঝিকে বলি—'আমার দুর্বুদ্ধি হোল তো তোমরা কেন সামলে নিলে না? মা যাচ্ছেন, আমার কি মাথার ঠিক ছিল?'

যখন কাছে ছিলি, কিছুই খেয়াল করতাম না। এখন, কবে কি একটু বলেছি, কবে বোধ হয় রাগের মাথায় একটু গায়ে হাত তুলেছি, কবে কিসের জন্যে মুখটি চুন করে এসে দাঁড়িয়েছিস্, কাজের মধ্যে বোধ হয় জিগ্যেস্ করাও হয় নি, কখন চলে গেছিস্—সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনে পড়তে লাগল আর মনটাকে যেন তোলপাড় করতে লাগল। শৈলেন একবার অসুখ-শরীরে বিছানায় শুয়ে কয়েকবার ডেকে ডেকে চুপ করে

BanglaBook.org

গিয়েছিল ; মার ঘরে আমি কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম, কাজটা শেষ হতে গিয়ে দেখি ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখ দিয়ে একটু একটু জল গড়াচ্ছে। তখন অত ভাবি নি, কিন্তু শৈলেনের সেই ঘুমন্ত মুখ মনে পড়ে পড়ে আমায় যেন অতিষ্ঠ করে তুলতে লাগল। কেবলই অমঙ্গল মনে হতে লাগল—শৈলেন সেখানে অসুখে পড়ে এই রকম করে ডাকবে আমায়, আমি শুনতেও পাব না! অত যে বাহাদুরি করে পড়াশোনার জন্যে পাঠানো—তা একবারও কি মনে হল রে যে তোরা খুব পড়া করছিস, সুখ্যেত হচ্ছে, উপযুক্ত হয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিস্? তা হলেও তো একটা বল পেতাম মনে। এ শুধু পাণ্ডুলের পুরনো কথা সব, আর ও-দিকে সাঁতরার কথা মনে হলেই অমঙ্গলে ভাবনা—সে যে কি গেছে ক'টা বচ্ছর!...”

শৈলেনেরও সে সময়ের কথাটা বেশ মনে পড়ে। প্রথম দিক্‌টা মাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া যে বিশেষ কোন কষ্ট হইয়াছিল এমন মনে পড়ে না। রেলে চড়িতে পারিবে সেই আনন্দের সঙ্গে একটা নূতন জায়গায় নূতন জীবনের রোম্যান্সে মনটা ডুবিয়াছিল। আর সবে দুই দিনের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা হইয়া গেল বলিয়া সেই আনন্দ আর রোম্যান্সটা ছিল এত ঘনীভূত যে অন্য চিন্তা প্রায় আসিবার ফাঁক পায় নাই একেবারে।...নাপতে ডাকাইয়া দুই ভায়ের চুল একটু ভদ্র করিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া হইল। বাজার থেকে ভালো ছিট কিনাইয়া আনিল, দরজি আসিয়া মাপ লইয়া গেল, যাওয়ার আগের দিন রাত্রে ভালো করিয়া খাওয়ার ব্যবস্থা হইল, তার মধ্যে বাসমতী ধানের চিড়ার পায়সের স্বাদ যেন এখনও মুখে লাগিয়া আছে। ভবিষ্যতের স্বপ্নের সঙ্গে এই সব নগদ প্রাপ্তির উম্মাদনায় দুইটা দিন যেন কোথা দিয়া চলিয়া গেল। নিজের সম্বন্ধে এই, কিন্তু আশ্চর্য হইলেও ওরই পাশে দাদার সম্বন্ধে মনের ভাবটা ছিল অন্য রকম, এও বেশ মনে পড়ে। দাদা একটু নিরীহ গোছের, শরীরেও একটু দুর্বল, এবং সাধারণত শৈলেনের চেয়ে মা-ঘেঁষা। নিজের উল্লাসের মধ্যে শৈলেনের এক একবার দাদার জন্য মন কেমন করিতেছিল—বড় ভাই দুর্বল, ভালমানুষ হইলে তাহার প্রতি যেমন ছোট ভাইয়েরই ভাবটা আসে—শৈলেনের এক-একবার মনে হইতেছিল—আহা দাদার কষ্ট হবে, দাদার এখানে থাকলেই ভালো...

বেশ মনে পড়ে পাণ্ডুলের বাহিরে দাদাকে যেন কল্পনাতেই আনিতে পারিতেছিল না।

যাওয়ার আগে পর্যন্ত দুইটা দিনের এই ইতিহাস ; অন্তত এইটুকুই স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে। আশ্চর্যও লাগে—বাড়ি থেকে একটু দূরে গেলেই যে মার কাছে মনটা পড়িয়া থাকিত, সেই মাকে ছাড়িয়া অত দূরে যাওয়ার কথায় কোন বেদনা ছিল না কেন প্রথম প্রথম!

তাহার পর যাত্রার মুহূর্ত থেকে সব যেন উল্‌টাইয়া গেল। নূতন কাপড়-জামা পরিয়া ভরা ঘটির সামনে প্রণাম করিয়া মাকে প্রণাম করিতে আসিল। মা আঁচলে চোখ মুছিতেছিলেন, দুই ভাইয়ে একসঙ্গে প্রণাম করিবার জন্য নত হইতে হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। দুই ভাইয়েই উঠিয়া অপ্রতিভভাবে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া নতদৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর কে আগে আরম্ভ করিল মনে নাই, তবে দুইজনেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মা দুইজনেরই কোঁচার খুঁটে একটা করিয়া সিকি বাঁধিয়া দিয়া

BanglaBook.org

কান্নার মধ্যে ভাঙাভাঙা স্বরে বলিলেন—"চুপ কর বাবা, নৈলে আমার বড্ড কষ্ট হবে; খুব মন দিয়ে পড়বি, খুব বড় হবি..."

অস্পষ্ট স্বরেই বলিতেছিলেন, বেশ মনে পড়ে—"বড় হবি" বলিতেই মা'র গলার স্বরটা স্পষ্ট আর বিকৃত হইয়া উঠিল, তাহার পর মুখে ঘোমটা চাপিয়া কান্না। ঐ কথা দুইটির উপরই ছিল যে যত অভিমান।

ছাড়াছাড়ির মধ্যে শৈলেন মাকে সেই প্রথম নূতনভাবে খুব স্পষ্ট আরও নিকটে করিয়া পাইল। কোথায় গেল ওর আনন্দের রোম্যান্স, মনটা হঠাৎ যেন অসাড় হইয়া গেল—মনে হইল মাকে যেন হঠাৎ নূতন করিয়া, বেশি করিয়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গেই হারাইয়া ফেলিল। সে যে কী কষ্ট—শিশু-হৃদয়ের কী হা-হুতাশ—বেশ স্পষ্ট মনে আছে। এ-ভাবটা কবে পর্যন্ত যায় মন থেকে তাহা মনে পড়ে না, তবে এটা স্মরণ আছে যে অত সাধের রেল চড়া বিস্বাদ করিয়া দিয়া ক্রমাগতই মায়ের মুখ ভাসিয়া ভাসিয়া উঠিতেছিল। উত্তর-জীবনে ব্যাপারটাকে মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া, জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে, এই বিচ্ছেদের গোধূলি আলোয় মাকে নূতন করিয়া—অত অদ্ভুত ধরনের আপন জানিয়া পাওয়া, নিজের আত্মারই যেন একটা নূতন উন্মেষ, একেবারে এক নূতন-লোকের আলোকের সম্মুখীন হওয়া— মনটি একটি পুণ্য-বিষাদে ভরিয়া উঠিয়াছে।

দিনটি মায়ের কাছেও, শৈলেনের কাছেও খুব স্মরণীয়।

॥ ৫ ॥

সন্তান লইয়া কি একরকম বিড়ম্বনা?

দিন-দশেক পরে বিপিনবিহারী সাঁতরা থেকে ফিরিয়া আসিলেন। বোধ হয় মনের কোনখানে এক পাই আন্দাজ আশা ছিল যে তাঁহার অবস্থার কথা শুনিয়া কৈলাসচন্দ্র ছেলেদের ফিরাইয়া আনিবার জন্য তার করিয়া দিবেন, কিংবা কোন প্রকারে কিছু ঘটিবে, যাহার জন্য বিপিনবিহারীকে ছেলেদের ফিরাইয়া আনিতে হইবে—অহেতুক আশা গভীর দুঃখের যে চিরসাথী। স্বামীকে একলা ফিরিতে দেখিয়া গিরিবালার শোক আবার এক-চোট উথলিয়া উঠিল। খানিকটা অভিমানও হইল। কতকটা কতকটা দুই কারণেই অনেকক্ষণ স্বামীর সম্মুখীন হইলেন না; রান্নাঘরে, ভাঁড়ার-ঘরে একটা-না-একটা ছুতা করিয়া কাটাইয়া দিলেন। বিরাজমোহিনী, অভয়া গিয়া দাদার সহিত কথাবার্তা কহিলেন, পান-তামাক যাহা দরকার পড়িল যোগাইয়া দিলেন, তাহার পর রেলের কাপড়েই একবার হাজরিটা দিয়া আসিবার জন্য বিপিনবিহারী তাড়াতাড়ি অফিসে চলিয়া গেলেন, একটা দিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

খানিকটা সময়ও গেল, তাহা ভিন্ন বোধ হয় এও একটু মনে হইয়া থাকিবে যে, স্বামী ক্ষুণ্ন হইয়াই ধূলাপায়ে আপিসে চলিয়া গিয়াছেন; ফিরিয়া যখন জামাজুতা খুলিতেছেন, গিরিবালা গিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহির হইতেই একটু আড়চোখে দেখিয়া লইয়াছেন—না, স্বামীর মুখে রাগের কোন লক্ষণ নাই। প্রসন্নভাবেই গল্প করিয়া গেলেন—সাঁতরার কি খবর—মায়ের থাকিবার ব্যবস্থা কোন্ ঘরে হইল—মনোমোহিনী দেবী গিরিবালাকে একবার দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—খেতন বলে সবাইকেই

BanglaBook.org

দেশে রাখিয়া তুমি একলা পাণ্ডুলে থাকো, পুরুষানুক্রমে কি পাণ্ডুলেই পড়িয়া থাকিতে হইবে?...ছেলেদের নাম লেখানো হইল—শশাঙ্ককে সিদ্ধেশ্বরী মাইনর স্কুলে, শৈলেনকে মহাদেব মাস্টারের পাঠশালায়—গিরিবালার বোধহয় মনে পড়িতে পারে—গঙ্গার ঘাটে যাইতে ঠিক মোড়ের উপর পাঠশালাটা পড়ে, একটা বাদামগাছের তলায়...

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"খুব কান্নাকাটি করতে লাগল দুই ভাইয়ে তুমি চলে আসবার সময়?"

বিপিনবিহারী চকিতে একবার স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া লইলেন, তাহার পর নিতান্ত অবহেলার স্বরে বলিলেন—"কিচ্ছু না ; কান্না?—তারা খুব ফুর্তিতে আছে—একটা ভালো জায়গা, আর মনোদিদির যা আদর! একবারও কি বুঝবার জো রেখেছেন যে পাণ্ডুল ছেড়ে রয়েছে? আসবার সময় একবার মনের ভাবটা বোঝবার জন্য বরং জিগ্যেসও করলাম—যাবি তোরা পাণ্ডুল? শৈলেনটা তো মনোদিদির কোল আঁকড়ে এরকম করে বসল যেন সত্যি আমি তাকে জবরদস্তি নিয়ে আসছি! কান্না?—বয়ে গেছে তাদের কাঁদতে—"

মাথা নিচু করিয়া জুতার ফিতা খুলতে খুলিতেই বলিতেছিলেন, শেষ করিয়া উঠিতেই গিরিবালার মুখে দৃষ্টি পড়িতে দেখেন, তাঁহার মুখটা যেন কি-রকম হইয়া গেছে। ...এ যে উল্টা ফল হইল। কিন্তু কথাটা ভাবিয়া দেখিবার পূর্বেই ও-বাড়ি থেকে বৌদিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন, গিরিবালা চলিয়া গেলেন।

বিচ্ছেদের ব্যথা অবশ্য মায়ের মন থেকে মেটে না, তবু খুব বড় একটা আঘাত লাগিল গিরিবালার বুকে।—সন্তানেরা এতই শীঘ্রই ভোলে?—কি করিয়া সম্ভব হয় ওদের দিক্ থেকে? তাঁহার নিজের মুখে তো দুই দিন একেবারেই অন্ন ওঠে নাই, ও-বাড়ির দিদি টের পাইয়া তৃতীয় দিন হইতে ডাকিয়া নিজের সঙ্গে খাওয়াইতেছেন। শৈলেন না হয় ছোট, অবুঝ, শশাঙ্ক তো বড় হইয়াছে, মা-অন্ত প্রাণ ছিল—আসিতেই চাহিল না? —পিসিমার যত্নে মা পর হইয়া গেল?...অভিমানের পাশেই ক্ষমা আসিয়া দাঁড়ায়, গিরিবালা নিজের মনকে বোঝান—আহা, এই রকমই হয় বোধ হয়, বেটাছেলেরা যে আবার বেশি বারমুখো। ওরা ভালো থাক্—হে মা-শীতলা, ওরা তোমার কাছে গেছে, ওদের ভালো রেখো, মাকে ভোলা তো কোন অপরাধ নয়, যদি ভুলেই থাকে ভালো তো, তাই থাক্। যদি এতে কিছুও অপরাধ হয় তো ওরা সু-ভালয় ভালয় ফিরে এলে আমি বুকের রক্ত দিয়ে তোমার পুজো দোব—যদিই কোন দোষ হয়—একটুও—সামান্যও তো, আমি সে নিজের মাথায় তুলে নিচ্ছি...

কেমন করিয়া মনে পড়িয়া যায় কবে কোথায় কোন্ ছেলে মা'র মনে পীড়া দিয়াছে--নানা ভাবেই—কেহ কটু বলিয়া—সে-দিন কামারপাড়ায় লোটনা স্ত্রীকে লইয়া বুড়ি মা হইতে আলাদা হইয়া গেল, কত কান্নাকাটি করিল বুড়ি। ...এই যে অহি—চিররুগ্ণ হইয়া মায়ের গর্ভে আসিয়াছে, চিরকাল দিবে বেদনা।...শ্বশুরের কথাও মনে পড়িয়া গেল —দরিদ্র জননী, দুইটি ছেলে মাত্র সম্বল, একটি একদিন আদৃশ্য হইল। শ্বশুরের নিজের মুখেই শোনা—কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের একটি চোখ চিরতরেই নষ্ট হইয়া যায়।...না, ওদের ওপর অভিমান করিতে নাই, অমঙ্গল হয় সন্তানের—মা নাড়ীর রক্তে পুষ্ট করুক, সমস্ত শরীর নিংড়াইয়া বক্ষের ক্ষীর উজাড় করিয়া মুখে দিক, কিন্তু সব দেওয়ার সঙ্গে যেন

BanglaBoi.org

অভিমান এতটুকু সন্তানের উপর না পড়ে—অমঙ্গল হইবে। "হে মা শীতলা, তারা যেন ভাল থাকে, যেমনটি নিয়েছ, ফিরিয়ে দিও; তোমায় বুকের রক্ত দিয়ে পুজো দোব।"

কি করিয়া নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িয়া যায়—সন্তানরূপিণী গিরিবালার দিকে। মনে পড়ে জেঠামশাই, জেঠাইমা, বাবা, মা—একসঙ্গে সবাইকে। উঃ, কত দিন দেখেন নাই, চিঠি আসিয়াছিল জেঠামশাইয়ের অসুখ; বেশ তো ভুলিয়া আছেন সবাইকে!...হইবে না? সন্তান যে!

খজনী বলিল—"দুলহীন্, খোঁকা, বড়কা-খোঁকা—ই সব..."

বিশেষ কিছু প্রশ্ন নয়; এই সে-দিন গেল, কীই বা প্রশ্ন আছে এমন? খজনীর প্রশ্নটা যেন অনির্দিষ্টভাবে মাঝপথে এলাইয়া গেল।

অন্যমনস্ক ভাবেই গিরিবালা যেখানটায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন সেদিকটা কলতলা। দাওয়ার ওপর দাঁড়াইয়া আছেন; খজনী বোধ হয় অহিকে দুধ খাওয়াইবার জন্য একটা বাটি আনিয়া মাজিতে বসিয়াছে।

গিরিবালা নিজেকে খুব সামলাইবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর একেবারে ধরা-গলায় বলিয়া উঠিলেন—"খোঁখা সব হমরা ভুল গেলেই গে খজনী!"

অত করিয়া সন্তানের পক্ষ লইবার চেষ্টা বিফল হইল। হাতে আঁচলের একটা তাল পাকাইয়া মুখে চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বিরাজমোহিনী চলিয়া যাইবেন বলিয়া তাহার পরদিন ও-বাড়িতে সকলের নিমন্ত্রণ ছিল। দুপুরবেলা এঁরা অফিসে চলিয়া গেলে ননদ-ভাজে মিলিয়া চারজনে আহার করিতে বসিয়াছেন, কৌনির পায়স লইয়া শশাঙ্কর কথা উঠিল। জিনিসটা চালের খুদের মতো এক রকম শস্য, এর পায়স শশাঙ্কর বড় প্রিয় ছিল। অভায়া দেবী বলিলেন—"আহা, দেশে আবার এসব জিনিস পাওয়া যায় না, শশাঙ্ক বড্ড ভালোবাসতো গো!"

বড় জা মুখটা ভার করিয়া রাগিয়া উঠিলেন—"না বাপু, মনে করি কিছু বলব না, কিন্তু না বলেও পারি না;—নিজে জিদ করে ছেলে দুটোকে পাঠিয়ে দিলে গা!—ধন্যি বলি মায়ের প্রাণ! কাল ঠাকুরপো যখন বলছিলেন এমন রাগ ধরছিল তোর উপর বৌ! বলেন—'কখনও ওদের গর্ভধারিণীর কাছ-ছাড়া হয়নি। থাকতে কি চায় বৌদিদি? যে কটা দিন ছিলাম, সঙ্গে নিয়ে আসব বলে ভুলিয়ে রেখেছিলাম, তা যখনই দেখা হয় —'কবে যাবে বাবা? কখন যাব মার কাছে?' শৈলেনটা ছোট, আরও হেদিয়ে পড়েছে। —আসবার দিন কাটা ছাগলের মতন দুটোতে উঠোনে গড়াগড়ি দিতে লাগল..."

গিরিবালা হাত বন্ধ করিয়া শুনিতেছিলেন, বলিয়া উঠিলেন—"দিদি!"

কৌতুকে, বিস্ময়ে এবং তাহার সহিত একটা অদ্ভুত আনন্দের হাসিতে মুখটা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

জা অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কিলো?"

গিরিবালা একটু জোরেই হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"আর তোমার দেওর আমায় কি বললেন জানো? তারা বেশ আছে, দিব্যি আছে, কত করে বললেন তবু আসতে চাইলে না।...কী মানুষ বাপু, এ রকম করে মিথ্যে!...আর আমি ভাবছি জোর করে বিদেয় করলাম বলে তারা বুঝি সত্যি আমায় ভুলে..."

BanglaBook.org

প্রায় অলক্ষ্যেই হাসিটা মিলাইয়া গিয়া চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল ; কথা বন্ধ হইয়া গেল। বুকের বেদনাটা একটা দীর্ঘশ্বাসে হালকা করিয়া বলিলেন—"একটা দোষ করেছি বলে কি সত্যিই তারা আমায় অমন করে ভুলবে দিদি?"

অদ্ভুত হাসির মধ্য দিয়া কথাটা এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িল যে, সকলেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিলেন, জা আঁচলে চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিলেন—"চুপ কর্ বৌ, আমার কথাটা বলাই ভুল হয়ে গেছে। ঠাকুরপো একটা ভেবে তোকে বানিয়ে বলেছিল ও-রকম করে ; ভুল হয়ে গেছে আমার, জানতাম না তো। চুপ কর্, খেতে বসে চোখের জল ফেলতে নেই, অকল্যাণ হয়..."

তাহার পর আহারটা নীরবেই হইল। পায়সের বেলায় গিরিবালা বলিলেন—"আর কিছু খেতে পারব না দিদি, পেট ভরে গেছে।"

কেহ জিদ করিল না, অবশ্য নিজেও কেহ স্পর্শ করিল না।

কিন্তু এ-ও এক জ্বালা, কোন্ দিকেই বা যায় মা?—ছেলেরা ভুলিয়া বেশ ভালো আছে, নিশ্চিন্ত আছে—এতেও দুঃখ, ক্ষোভ, অভিমান ; আবার এখন সব কাজের মধ্যেই মনে হয় দুই ভাইয়ে মায়ের অভাবে মুখ চুন করিয়া নিরুপায় ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, উঠানে পড়িয়া কাটা ছাগলের মতো ছটফট করিতেছে।...কত রকম ছুতা করিয়া ক্রমাগতই চক্ষে অঞ্চল চাপিয়া ধরিতে হয়।

তবুও সংসার সংসারই, ছেলেদের চিন্তা চাপা দিয়া দায়িত্বের বোঝা আনিয়া ঘাড়ে ফেলিল।

কার্তিকের মাঝামাঝি নিস্তারিণী দেবী গেলেন, অগ্রহায়ণ থেকে খামারে ধানের বোঝা পড়িতে আরম্ভ করিল। মাড়াই হইয়া বোরাবন্দী হইতে কিছুদিন গেল, তাহার পর গিরিবালার অধীনে আসিয়া পড়িল। এ একটা অত্যধিক কর্মচঞ্চল জীবন। উঠানে প্রত্যহ শুকাইয়া প্রত্যহ জড়ো করিবার ব্যবস্থা করা, বেশিভাগ সিদ্ধ করানো, মারাইয়ে তুলিবার ব্যবস্থা করা, ধান কোটাইয়া চালের ব্যবস্থা করা, চালের ঘরে বড় বড় মাটির কুটিতে তুলিয়া রাখানো—প্রায় দুই মাস ধরিয়া একটু নিঃশ্বাস ফেলিবার জো থাকে না। অবশ্য বাহির হইতে খানিকটা সাহায্য হয়, তবু প্রায় সমস্তটাই মেয়ে-মজুর লইয়া এবং বাড়ির মধ্যেকার ব্যাপার বলিয়া গিরিবালারই এলাকায় পড়ে। ছুতার কামারপাড়া হইতে অনেক মেয়েছেলে আসিয়া পড়ে, না দেখিলে ফাঁকি দেওয়ায় সুদক্ষ। তা ভিন্ন বিলক্ষণ হাতটান আছে, অষ্টপ্রহর চারিদিকে চোখ রাখিয়া না চলিলে উপায় নাই। অন্যবার শাশুড়ী থাকিতেন, অনেকটা সাহায্য হইত। গিরিবালা অবশ্য বলিতেন—"মা তুমি বসো, পুজোর ব্যাঘাত হবে", কিন্তু নিস্তারিণী দেবী নামিয়াই পড়িতেন কর্মক্ষেত্রে। মালাটা হাতেই থাকিত, তবে ঘোরানোয় যে বিঘ্ন হইতেছে সেটা অস্বীকার করিতেন না, হাসিয়া বলিতেন—"মা লক্ষ্মীকে ঘরে তুলছি বৌমা, এও তো পুজো, বরং আসল পুজো। মানুষের কি দোষ জান বৌমা? মা সাক্ষাৎ রূপ ধরে এলে তাঁকে চিনতে পারে না—এই তো এসে দাঁড়িয়েছেন মা!" এবারে শাশুড়ী নাই, কিন্তু তাঁহার কথাগুলো, তাঁহার শ্রদ্ধা মনে গাঁথিয়া আছে গিরিবালার। সাক্ষাৎ রূপই বটে মায়ের।...মধুসূদনের জমির দিকে ঝোঁক ছিল না, নিশ্চয়ই অবসরও ছিল না, যখন গেলেন সংসারটিকে একরূপ কপর্দকশূন্য করিয়াই গেলেন, এই ধান্যরূপা লক্ষ্মীর জোরেই তো বিপিনবিহারী সেই মহাসঙ্কট কাটাইয়া প্রতিষ্ঠার

BanglaBook.org

পথে দাঁড়াইয়াছেন। এ-বাড়ির সবাই চেনে এ-রূপকে। গিরিবালা ছোট জাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন, অভয়া দেবী আছেন, তিন ননদ-ভাজে অষ্টপ্রহর লক্ষ্মী তোলায় ব্যস্ত থাকেন, কাঁধে ষোল আনা ভার পড়ায় উৎসাহ আরও যেন বাড়িয়া গেছে। নিস্তারণী দেবীর পত্র আসে—আর সব প্রশ্নের মধ্যে ধানের প্রশ্ন আগে—কোন্ ধান কত হইল এবারে—চাল কত উঠিল কুটিতে—নবান্নের অমুক দিন, পাঁচ রকম চাল দিয়া যেন নবান্ন করা হয় —চালের ইতর-বিশেষ করা এ বাড়ির নিয়ম নয়...

উত্তর দিতে হয় সবিস্তারে ; ধান তোলা-পাড়া, সিদ্ধ করানো, চালছাঁটা এই সবের মধ্যে তিনজনে বসিয়া খুঁটিয়া-খুঁটিয়া চিঠি পড়িয়া একটি একটি কথার উত্তর তৈয়ারি করেন। অভয়া দেবী বলেন—"বাবাঃ, সেই যে কথায় বলে ঢেঁকি সগ্‌গে গেলেও ধান ভানে, মারও হয়েছে তাই, ওঁর আবার ঘটা করে গঙ্গাস্নান আর তীর্থ করা!"

খুব হাসি পড়িয়া যায়। ছোট বধূ লেখেন, অভয়া দেবী বলেন—"লেখো—তোমার মাঝের কুটি খাঁ খাঁ করছে—যেটাতে তোমার আদরের বাসমতী চাল থাকত ; এক্কেবারে হয় নি ও-ধান এবারে। দেখ না, মা-গঙ্গা, মা-শেতলাকে ছেড়ে যদি 'হা-বাসমতী হা-বাসমতী'—বলতে বলতে না ছুটে আসেন তো..."

কর্মের আনন্দের মধ্যে হাসির জন্যই মনটা থাকে উন্মুখ, ধান-কোটার শব্দ আর মজুরনীদের মুখরতার মধ্যে সুবিধাও অনেক, হাসির মধ্যে আর এতটুকু কুণ্ঠা বা খাদ থাকে না।

ধান-চালের পাট সারিতে শীতের অর্ধেকটা একরকম করিয়া কাটিয়া গেল। ছেলেদের কথা মনে পড়ে নিশ্চয়, তবে কর্মের খরস্রোতে কোন কিছুরই গোড়া বসিতে পায় না। কোন একটা অলস অবসাদ-মুহূর্তে হয়তো মনটা চঞ্চল হইয়া পড়ে, চক্ষু দুইটি সজল হইয়া ওঠে, তাহার পর—'হে দুলহীন' বলিয়া কেহ একটা কাজের তাগিদ লইয়া উপস্থিত হয়, চোখের জলের সঙ্গে স্মৃতির আমেজটুকু মুছিয়া ফেলিয়া কর্মস্রোতে আবার গা ভাসাইয়া দিতে হয়।

ধান-চালের হাঙ্গাম মিটিলে আসিল অবসর, কর্মচঞ্চলতার পর আলস্যে মনটা যেন আরও উদাস করিয়া ফেলে। শীতের অপরাহ্নটুকু স্বল্পায়ু—সন্ধ্যা আসিলেই নিত্যদিনের কাজ আসিয়া পড়িয়া চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু ঐ একটুখানি সময় কাটানোই প্রতিদিনের একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। শুধু এদের চিন্তা, আর তার সমস্তটাই দুশ্চিন্তা। এক একদিন গিরিবালা খজনীকে দিয়া দুলারমনকে ডাকিয়া পাঠান ; দুলারমনের নিজের একটা ব্যথা রহিয়াছে বলিয়া তাহার সঙ্গটা লাগে ভালো। সে নিজের কথা খামকা তুলিতে চায় না, তবে গিরিবালার বেদনা-আশঙ্কার ইতিহাস চুপ করিয়া শোনে, ভিজা মন বলিয়া চোখে শীঘ্র জল জমিয়া আসে।...দুলারমন আর আগেকার দুলারমন নাই, আগে ঠিক যেন এখনকার উল্টা ছিল। ওর মুখের হাসি অবশ্য শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পাছে তাহার জীবনের কথা আসিয়া পড়ে এই ভয়ে ক্রমাগতই কথার মোড় ফিরাইয়া নিজের সেই পুরানো কালের হাস্যমুখরতার একটা অবিচ্ছিন্ন ধারাপ্রবাহ রাখিয়া যাইবার চেষ্টা করিত। মায়ের মৃত্যুর পর ও-চেষ্টাটাই যেন একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।...ও যেন নিজের অদৃষ্ট-দেবতার সঙ্গে একচোট প্রাণপণে লড়িল, তাহার পর মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে হারিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

তবে আসে বেশি আগেকার চেয়ে ; ডাকলে তো আসেই, নিজে হইতেও আসিয়া পড়ে কখনও কখনও। গিরিবালাকে অত্যন্ত ভালোবাসিত, আজকাল যেন আরও বাসে। মনটা আজকাল বড় তরল হইয়া পড়িয়াছে, তাহা ভিন্ন লোক কম বলিয়া বোধহয় সুযোগ বেশি। খামোকা নিজের কথা তোলে না বটে, তবে একবার তুলিলে, পূর্বে যেসব কথা বলিত না, আজকাল মনের কোণকান্ হাতড়াইয়া বাহির করিয়া বলে। একদিন ছেলেদের কথা একটু ঘোরালো হইয়া উঠিল—চিঠি আসিয়াছে, শশাঙ্কর আমাশয় হইয়াছিল—শৈলেনটা একটু দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, খেলার মাঝে কোন ছেলের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিল। আবেগের মাথায় ভুল করিয়াই গিরিবালার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"হলেও জ্বালা দুলারমন, একরকম ভালো আছ তুমি।"

দুলারমন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"তার যে হওয়া না-হওয়া দুরকমেরই জ্বালা—অতি বড় শত্রুরও যেন এমন না হয়।"

গিরিবালা চমকিয়া চাহিলেন, বলিলেন—"কৈ, শুনি নি তো!"

দুলারমনের চোখে দুই বিন্দু জল জমিয়া উঠিল, সে দুটাকে যেন ধরিয়া রাখিবার জন্যই চিবুক একটু তুলিয়া বলিল—"কেউই জানে না ; মাস তিনেকের হইয়া নষ্ট হইয়া গেল। ওঁদের পাহুন (কুটুম অর্থাৎ জামাই) ওরকম করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে শ্বশুরবাড়ির সবাই বড্ড কষ্ট দিয়াছিল ; তাঁর জিনিস দুলারমন রাখিতে পারে নাই। সেটাও যদি বাঁচিয়া থাকিত তবু এত কষ্টের মধ্যে কোন রকমে..."

বিন্দু দুইটি চিবুক বাহিয়াই নিচে গড়াইয়া পড়িল।

খজনী আসিয়া উপস্থিত হইল ; কোথা নিদ্রা দিতেছিল, কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া যাইবার জড়তা লাগিয়া আছে, কোলে অহি ; জানাইল—"কোনমতে থাকিতেছে না।"

গিরিবালা বলিলেন—"বসিয়ে দে না এখানে।"

তাহার পর দুলারমনকে অন্যমনস্ক করিবার জন্যই হুকুম করিলেন—"নিয়ে আয় তো কতকগুলো সুপুরি, দুলারমনকে দিয়ে কুঁচিয়ে নিই—যখন পেয়েছি।"

খজনী ঘর থেকে এক আঁজলা সুপুরি আর দুইটা জাঁতি আনিয়া চৌকির নিচেটায় বসিল।

সুপারি কুঁচাইতে কুঁচাইতে গিরিবালা দুলারমনের মনটা একেবারে পরিষ্কার করিয়া ফেলিবার জন্য বলিলেন—"তা যদি বললে তো সব চেয়ে খজনীই ভালো আছে।"

খজনী নিচের ঠোঁট দিয়া ওপরের ঠোঁট ঈষৎ ঠেলিয়া মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল —"কী ভালো আঁছে গো দুলহীন? আমি জানি খজনীর কথাই হচ্চিল। খোঁকাকে মুলুকে পাঠিয়ে দিয়ে—'খজনী খুব ভালো আছে'।...ই—স্!"

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"তাই তো খোকার জন্যে বেচারির ঘুম হয় না।"

দুলারমনও তাহার সদ্য-মর্দিত, নিদ্রালস চক্ষুর পানে চাহিয়া একটু হাসিয়া আবার সুপারি কুঁচাইতে লাগিল।

খজনী চোখ দুইটা নাচাইয়া নাচাইয়া বলিল—হ্যাঁ, করুন ঠাট্টা, যাহার পেটের ছেলে তাহারই যখন ঘুমের ব্যাঘাত হয় না, সেই যখন নিজে জিদ করিয়া বিদেশে পাঠাইয়া দেয়...

দুলারমন একটু বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ধমক দিল—"তোঁ চুপ রহ্ত।"

BanglaBook.org

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"বলতে দাও না দুলারমন।...বেশ তো, প্রাণে লেগেছে তো ভালোই হয়েছে, এবার তুমি নিশ্চিন্দি হয়ে ঘর করগে যা, তোর বর তো নিতেও এসেছে শুনলাম।"

খজনী আবার তাচ্ছিল্যের সহিত উপরের ঠোঁটটা ঠেলিয়া ধরিয়া বলিল— "ই-স, ওকে লইয়া যাইবে! ওই এখন ক'ঘাটের জল তাকে খাওয়ায় দেখবেন এঁরা!"

বিষাদের হাওয়াটা একেবারে কাটিয়া গেছে, গিরিবালা বলিলেন—"দু-একটা ঘাটের নাম কর্ না খজনী, শুনতে বড় ইচ্ছে করছে।"

খজনী চুপ করিয়া রহিল, তারপর তাগাদা খাইয়া বলিল—হ্যাঁ, বলিতে গেল ওঁদের। ফিরিয়া আসুক, তার পর আপনেই টের পাইবেন উঁহারা।

সত্যিই একটা কিছু রহস্য আছে টের পাইয়া, সুপারি-কাটা বন্ধ করিয়া দুজনেই চাপিয়া ধরিলেন।

খজনী মুখ গুঁজিয়া কয়েক বার—'না-না' করিয়া ক্লিষ্ট স্বরে বলিয়া উঠিল—"হামি খোঁখাকে ছোড়্‌ক থাকতে পারব না গো দুলহীন—আমি তার কাছে ভাগব—সে ছাড়া —মনে যাব হামি—হামি মরে যাঁচ্ছি—হামি খোঁখার জন্যে নিজের সবকুচ্ ছেড়েছি। তবু আমায় একবার কেউ পুছল না পর্যন্ত—খোঁখাও বেইমান, যাবার সময় হামি সাম্পেনির কাছে গিয়ে খাড়া হলাম, একটা কোথাও বললে না...রে খোঁখা! রে খোঁখা! রে বেইমান!..."

হাতের আঁজলায় মুখ ঢাকিয়া খজনী ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তখনও দুইজনের মনে বরকে সাত ঘাটের জল খাওয়ানোর হাসিটা জাগিয়া আছে, তাহার ভিতরে যে এত ব্যথা কে জানিত? দুজনেই যেন একটু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন। গিরিবালা বলিলেন—"চুপ কর্ খজনী, চিঠি এসেছে—তারা শিগ্‌গির আসবে; চুপ কর, কাঁদিস্ নি।"

॥ ৬ ॥

এই ভাবে একটা বৎসর কাটিয়া গেল। পাণ্ডুলের জীবন সেই একই রকম—দুলারমন —খজনী—ও-বাড়ি—হরেন গুরুজির পাঠশালায় যায়, দৌরাত্ম্য করে,—খেত থেকে কোন নূতন ফসল উঠিল—মাঝে মাঝে এক-আধটা ভোজ, ও-বাড়িতে বা এ-বাড়িতে—কোন অতিথি সমাগম হইলে হয়তো কোনদিন মধুসূদনের যশের জের; মাঝে একবার মোতিবালা দেশ থেকে আসিলেন, মাস-দুয়েক থাকিয়া আবার চলিয়া গেলেন।

বাপের বাড়ির জীবনে কিন্তু মস্ত বড় পরিবর্তন হইয়াছে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় বৎসরের গোড়া থেকে: জেঠামশাই অন্নদাচরণ মারা গেলেন, এবং এই একটি মানুষ যাইতেই বেলে-তেজপুরের বাড়ির ভিৎ যেন আল্‌গা হইয়া গেল। সাতকড়ির কিছুদিন আগে শিবপুরে একটা জুটমিলে চাকরি হইয়াছিল, মৃত্যুর কিছুদিন পরে হরিচরণ এবং কিশোরও চলিয়া আসিলেন, চাকরির চেষ্টায়। দেশে রহিলেন শুধু দুই জা এবং রসিকলাল। সে-থাকার মধ্যেও একটা নিস্পৃহতা লাগিয়া রহিল। একটু কারণ ছিল—ঘোষালমহাশয় পূর্বেই মারা গিয়াছিলেন, অন্নদাচরণ যাইতে নিকুঞ্জলাল জো পাইয়া

BanglaBook.org

বসিলেন। তাঁহার আক্রোশের বহর এবং শক্তির পরিমাণ—দুইটারই আন্দাজ পাওয়া গেল অন্নদাচরণের শ্রাদ্ধের দিন। কোথা দিয়া যে কি হইল, গ্রামে দুইটা দল হইয়া গেল এবং ভোজের প্রায় অর্ধেকটা অংশ বাগদিপাড়ায় বিতরণ করিয়া দিতে হইল ; রসিকলালের দুর্বল মনটা চিরকালই দাদার কাঁধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাঁহার মৃত্যুতে এমনই ভাঙিয়া পড়িল, তাহার ওপর নিকুঞ্জলালের স্বরূপ প্রকাশে তাঁহার আর সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, বেলে-তেজপুরের মাটি আঁকড়াইয়া থাকা আর চলিবে না ; এমন কি, আঁকড়াইয়া ধরিবার মাটিটুকু পর্যন্ত আর দখলে থাকিবে কি না তাহাও সংশয়ের বিষয় হইয়া উঠিল।

নিকুঞ্জলালের স্ত্রী রায়মণি মারা গিয়াছেন, বোন দামিনী নিজের খুড়শ্বশুরের এক নাতনীর সঙ্গে ভাইয়ের বিবাহ দিবার মতলব আঁটিতেছেন। খুড়শ্বশুর বার দুয়েক সিংহবাহিনী দর্শনের নাম করিয়া এর মধ্যে দেখা দিয়া গিয়াছেন, একবার নাতনীটিকে লইয়া।...নিকুঞ্জলালের ভাবটা ঠিক বোঝা যাইতেছে না—বাহিরে বাহিরে মালা, মামলা, আর ভগবান গীতায় কবে কি বলিয়াছেন তাহাই লইয়া থাকেন।

সাতকড়ি, হরিচরণ এবং শ্বশুরের হাতের চার-পাঁচখানা চিঠি হইতে সমস্ত খবরটা সংগ্রহ করা বিপিনবিহারীর। হরিচরণের লেখাটা খুব সরস—বিশেষ করিয়া নিকুঞ্জলালের সম্পর্কে যে খবরগুলা দেন, খুব সরস করিয়াই দেন, যদিও কথাগুলা দুঃখেরই। জেঠামশাই অর্থাৎ অন্নদাচরণের শ্রাদ্ধে দলাদলির অমন গুরুতর সংবাদটাও বেশ হাসির ভাষাতেই লিখিয়াছিলেন। চিঠির শেষ পংক্তিটা ছিল—"নিকুঞ্জ জেঠাকে নেমন্তন্ন করতেই হয়েছিল, কোন উপায় ছিল না তো? কিন্তু তার দ্বারা আমাদের যে পাপটুকু হয়েছিল জেঠামশাইয়ের পুণ্যির জোরে সেটা সদ্য-সদ্যই কেটে গেল—নিকুঞ্জ-জেঠার দলের বামনদের জায়গায় পাড়ার বাগদিদের খাইয়ে।"

এতগুলা খবরের মধ্যে মাত্র সাতকড়ির শিবপুরে চাকরি হওয়ার খবরটা গিরিবালা পাইলেন। অন্নদাচরণের মৃত্যুর খবরটা দেওয়ার উপায় ছিল না ;গৃহস্থালী ভাঙনের মূলেও এই মহীরুহপাত, তাই হরিচরণের কথা পর্যন্ত বলিলেও, কিশোরের শিবপুর-প্রবাসের কথা বলা হইল না। বাপের বাড়ির এত-বড় দুর্যোগের যেটুকু ইতিহাস যে ভাবে পাইলেন তাহাতে গিরিবালা কতকটা উৎফুল্ল হইয়াই বলিলেন—"বড় চমৎকার হল, না? সাতকড়ির চাকরি হল, জেঠামশাইয়ের বোঝাটা অনেক হালকা হল, শেষ বয়সেও যে ভগবান একটু মুখ তুলে চাইলেন, এও তাঁর কত দয়া।"

খবরটা টের পাইলেন মাস আষ্টেক পরে, তাঁহার পঞ্চম সন্তান পূর্ণেন্দু যখন দুই মাসের। শীতকাল, তাহাকে লইয়া রোদে বসিয়া আছেন, এমন সময় হরেন আসিয়া বলিল —"মা, একটু গোহুমের ময়দা দেবে?...হ্যাঁ, দাও মা!"

নিম্নশ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মেশে বলিয়া কথাগুলায় হিন্দীর ছুট খুব বেশি। জিনিস যা চায় অপরের জন্য, সব সময় যে চাহিয়া লয় এমনও নয় ; গিরিবালা বলিলেন— "না, ময়দা নেই, যাঃ।"

হরেন আবদার ধরিয়া বসিল—"হ্যাঁ, দাও মা, লেই বানাব, গুড্ডি করব।"

গিরিবালা রাগিয়া বলিলেন—"ঘুড়ি করবি কাগজ কোথায় পেলি শুনি? ওঁর টেবিল থেকে সরিয়েছিস্ তো?"

BanglaBook.org

হরেন বলিল—"না, রদ্দি কাগজ, বাবার টেবিলের নিচে পড়েছিল, এই দেখ বরং।"

ও-বাড়ি যাইবার রাস্তায় কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ময়দার লোভে আনিয়া হাজির করিল। আগাগোড়া লেখা একটা বেশ বড় কাগজ। চিঠির কাগজ নয়, তবে হরেনকে কাছে ডাকিয়া দেখিলেন চিঠিই এবং হরিচরণের হাতের লেখা। কখনও হাতে পড়ে নাই এ চিঠি, একটা কৌতূহল হইল, বলিলেন—"দে তো দেখি!"

হরেন পিছাইয়া গেল, বলিল—"না, এ রদ্দি কাগজ, আমার গুড্ডি হবে।"

ফেরত দিবার অঙ্গীকার করিয়া এবং ময়দার লোভ দেখাইয়া গিরিবালা চিঠিটা লইয়া পড়িতে লাগিলেন। অদ্ভুত চিঠি আর অদ্ভুত তার সব খবর!... 'মেয়ে সেদিন এসেছিল তার ঠাকুরদার সঙ্গে, চণ্ডীদিদির মেয়ের সঙ্গে খেলা করছিল, দেখলুম...শুনছি নিকুঞ্জ-জেঠার পছন্দ হয়েছে...কিশোরের পড়া ছাড়াতে হল,...শ্রাদ্ধের ব্যাপার থেকে বাবা ভয় পেয়ে গেছেন...'

গিরিবালা দারুণ বিস্ময়ের সহিত পড়িয়া যাইতেছিলেন, শ্রাদ্ধের কথায় বুকটা ধক্ করিয়া উঠিল। আরও উৎকণ্ঠিতভাবে পড়িয়া চলিলেন, পূর্বের ও পরের অনেক পত্রের মাঝখানে এই একখানা চিঠি, সংবাদের ল্যাজা-মুড়া, কোনটার বা মাঝের অংশটাই বাদ পড়িয়া যাইতেছে – কি এক গোলমেলে ব্যাপার। হরিচরণেরই লেখা, তবে ঐ বেলে-তেজপুরেরই খবর নাকি?—কোন্ দামিনী পিসিমা কোন্ নিকুঞ্জ-জেঠার জন্য ঘটকালি করিতেছেন? বাবার একলার সামলাইবার কথা কোথা থেকে আসিল?...হাত কাঁপিতেছে, মনটা যেন পাগলের মতো অক্ষরগুলার ওপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; হঠাৎ শেষের দিকে একটা লাইনের উপর আসিয়া আটকাইয়া গেল—'জেঠামশাইয়ের বাৎসরিক শ্রাদ্ধের সময় নিকুঞ্জ-জেঠা যে কি করবে আবার! আর তো মোটে মাস কয়েক আছে...'

গিরিবালা যেন একটা কিছু অবলম্বন করিয়াই চেঁচাইয়া উঠিলেন—"হরেন!"

মায়ের মুখের ভাব দেখিয়া হরেন অনেকক্ষণ সরিয়া পড়িয়াছে। বিপিনবিহারী অসময়ে এবং একটু ব্যস্ত হইয়াই প্রবেশ করিলেন,—সোজা ঘরের দিকে চলিয়া যাইতেছিলেন, গিরিবালার হাতে চিঠিটা দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। একটু রাগিয়াই বলিলেন—"তুমি চিঠিটা কি করে পেলে? আমি ছুটে আসছি—ভুলে বোধ হয় বাইরে ফেলে গেছি..." সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া সংযত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"সবটা পড়ে ফেলেছ নাকি?"

গিরিবালা খুব বেশি কাঁদিতে পারিলেন না—এমন অদ্ভুতভাবে পাওয়া সংবাদটা আর প্রায় এক বৎসরের পুরানো হইয়া এমন একটা অদ্ভুত আকার লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তদুপরি চারিদিকে অদ্ভুত পরিবর্তনে এমন একটা জটিলতার মাঝখানে পড়িয়া গেছে যে মনটা হঠাৎ যেন অসাড় মারিয়া গেল; ঠিক যেন একটা নূতন জগতের সামনে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন—মনের উপর প্রভাব হইবে কি করিয়া?—বিশ্বাস করিয়া সংবাদটা মনে গ্রহণ করাই শক্ত।

যে জলটা একটা পথ ধরিয়া বেগে বাহির হইয়া যাইতে পায় না, সেটা ধীরে ধীরে অনেকখানি মাটিকে ভিজাইয়া তোলে; ভালো করিয়া কাঁদিবার সুযোগ হইল না বলিয়া জেঠামশায়ের জন্য শোকটা জীবনকে যেন খুব ব্যাপক ভাবে ছাইয়া রহিল।

ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি একটা শুভ খবর আসিল, সাতকড়ির বিবাহ। কত দিন যাওয়া হয় নাই দেশে, আর কত দরকার যে যাওয়া একবার! কিন্তু কোলের শিশুটি মাত্র চার মাসের। গিরিবালার মনে পড়িল—বিরাজমোহিনীর সঙ্গে একবার ঠাট্টার তর্ক করিতে করিতে নিস্তারিণী দেবী তাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"হ্যাঁ, রাখবই তো বেঁধে—সোনার শেকল দিয়ে—একটি একটি করে শিকলের পাব্‌ আমার হাতে আসবে।"...গিরিবালা অভিমান করিয়া বলেন—"বাবা-জেঠাইমারাও আমায় ঠেলে দিয়েছেন, সব জেনে-শুনেও এইসময় বিয়ের ব্যবস্থা হল—আর দিন ছিল না?...'গিরিকে নিশ্চয় নিয়ে আসবে।' ব্যস, চিঠিতে দু'অক্ষর লেখা হয়ে গেল, আর কি? দায়ে খালাস হয়ে গেলেন।"

বলিলেন বটে কথাটা, কিন্তু যাইতে পারিলেন না বলিয়া মন যে খুব খারাপ হইয়া রহিল এমন নয়। একটু অভিমান হইল, স্মৃতি একটু সচেতন হইয়া উঠিল কিছুক্ষণের জন্য, তাহার পর আবার কাজের মধ্যে সব তলাইয়া গেল।...মেয়েছেলের শ্বশুরবাড়ি তাহার বাপের বাড়িকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

সদ্য সদ্য অত ভাবিলেন না, কিন্তু পরে এক দিন কথাটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর হইল। ছোট জা প্রভাবতী দেবী রৈয়াম থেকে আসিলেন ; যেদিন আসিলেন তাহার পরদিনই দেশ থেকে কিশোরের পত্র আসিল ; নূতন বৌদিদি পাইয়াছে, খুব আহ্লাদ করিয়া বিবাহের, বৌভাতের, কুটুমবাড়ির, নূতন বৌদিদির বর্ণনা দিয়া খুব দীর্ঘ একখানা পত্র দিয়াছে। তিনজনে বসিয়া বসিয়া পড়িলেন, প্রভাবতী দেবী বলিলেন—"তুমি গেলে না কেন দিদি? পড়ে আমারই মন উলসে উঠছে—মনে হচ্ছে থাকতে পারলে দিব্যি হত। আর তোমার তো বাপের বাড়িই।"

বিবাহের পত্র পাইয়া যতটা হোক না হোক ; এখন বর্ণনা পড়িয়া সত্যই গিরিবালার মনটা একটু চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে—সমস্ত জিনিসটা চোখের সামনে জাগিয়া উঠিয়াছে। জিনিসটা আশার আকারে, সম্ভাবনার আকারে যখন আসিয়াছিল, এরকম ছিল না, এখন অনুতাপের আকারে আসিয়া মনটা যেন মথিত করিয়া তুলিল। অনুভব হইল—প্রথম ভাইয়ের বিবাহ—বাড়িতে প্রথম বধূ আসার উৎসব, ঠিক এ-জিনিসটা আর আসিবে না বাড়িতে কখনও, তাঁহার জীবনে চিরতরেই বাদ পড়িয়া গেল। আরও একটা কথা মনে হইল ; এর আগে যা কিছু ভাবিয়াছিলেন তা নিজের দিক দিয়াই, আজ হঠাৎ মনে হইল —আর একজনের কথাও ভাবিবার আছে এর মধ্যে, সে সাতকড়ি—তাহার অভিমান জীবনে মিটিবে না।

জায়ের কথার উত্তর দিলেন—"যাওয়া কি সহজ বোন? একটা চার মাসের শিশু রয়েছে!"

"খুব শক্ত! চার মাসের শিশু গাড়িতে চাপাচুপি দিয়ে আর নিয়ে যাচ্ছে না যেন লোকে! না হয় আমিই এসে দেখতাম, ও তো আর মা চিনতে পারে নি এখনও, দুধ আছে এমন একটা মাগিকে বামনপাড়া বা কামারপাড়া থেকে ধরে আনলেই হত—কিছু পয়সা দিয়ে।"

গিরিবালা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"তা হত বটে, বড্ড ভুল হয়ে গেছে।" অবশ্য প্রভাবতী দেবীর জন্য আর অন্য কোন উত্তর ছিল না, তিনি এখনও সন্তানের মা হন

BanglaBook.org

নাই, তাঁর বলা চলে ও কথা। যাওয়া চলিত, খোকাকে লইয়াই, কামারপাড়ার কোন মাগির দুধের ভরসায় ছাড়িয়া দিয়া নয়। তবু গেলেন না কেন?...

সেদিন রাত্রে ও-বাড়িতে খাওয়া ছিল। দুই বাড়ি লইয়া ছোট ভোজ। রান্নাঘরে বসিয়া সকলে আয়োজনে লাগিয়াছিলেন, গল্প হইতেছিল, এমন সময় এ-বাড়িতে কান্নার আওয়াজ শোনা গেল।

বড় জা বলিলেন—"বৌয়ের ছেলে উঠেছে।"

অভয়া বলিলেন—"খজনী আছে, ঠুকে-ঠাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে'খন।"

বাপের বাড়ির কথা লইয়া আজ গিরিবালার মনটা যেন অতিরিক্ত ছল-ছল করিতেছে, সব জিনিসের উপর মায়াটা বাড়িয়া গেছে ; উঠিতেই যাইতেছিলেন, অভয়া দেবীর কথায় বসিয়া গেলেন ; মনে স্নেহটা আজ বেশি তরল বলিয়া প্রকাশ করিতে যেন কুণ্ঠা বোধ হইতেছে। খোকার কান্নাটাও ওদিকে থামিয়া গেল।

মনটা কিন্তু ঐদিকে পড়িয়া রহিল। একটু পরেই আবার কান্না উঠিল—"নাঃ, দিলে বসতে তো?"—বলিয়া ময়দার হাত ঝাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন।

বাড়িটা নিস্তব্ধ। একবার ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় খজনী গাঢ়তর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, খোকার কান্নার সঙ্গে সমান তালে নাক ডকিয়া যাইতেছে।

খোকা ভিতরে বাগ মানিল না বলিয়া গিরিবালা তাহাকে লইয়া বাহিরে আনিয়া দাওয়ায় বসিলেন। স্তন্যপান করিয়া খোকা একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল।

কৃষ্ণপক্ষ ; রাত বেশি হয় নাই, বোধ হয় আটটা হইতে ন'টার মধ্যে, কিন্তু কানের কাছেই এক গাঢ় নিদ্রার শব্দ ছাড়া কিছুই নাই বলিয়া মনে হইতেছে, যেন নিযুপ্ত হইয়া গেছে। চৈত্র মাস, নূতন গ্রীষ্মের একটা একটানা হাওয়া বহিয়া চলিয়াছে, চারিদিকে পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মাথায় অসংখ্য নক্ষত্র—ছোট, বড়, পুঞ্জীভূত, একক—হাজারে হাজারে ঝিকমিক করিতেছে, অথচ অন্ধকার এতটুকুও কমে না। এই অনাহূত অন্ধকার, ঐ আলোকপুঞ্জ, নিস্তব্ধতা—সব মিলিয়া গিরিবালার বড় আশ্চর্য বোধ হইতে লাগিল, ঘুমন্ত শিশু-কোলে চুপ করিয়া সামনে বসিয়া রহিলেন অনেকক্ষণ। ছেলে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া গেছে, ও-বাড়িতে অভয়া বলিলেন—"বৌদি আসেন না যে, ডাকতে পাঠাব?"

প্রভাবতী বলিলেন—"থাক্, হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে, ভাইয়ের চিঠি পেয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে আজ।"...এই আলোচনাই চলিল একটু একটু।

এমন একটা রাত্রির নিকষে এমনই উদাস দৃষ্টির সামনে কোথা থেকে পুরনো স্মৃতির দাগ পড়ে। আজ সমস্ত দিনে সব চেয়ে যা বড় প্রশ্ন সেইটি লইয়া মনে তোলপাড় করিতে ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করিয়া এক একটি ঘটনা গিরিবালার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। ঠিক এমনি আর কখনও হয় নাই।—নিজেকে যেন আগাগোড়া দেখিতে পাইলেন একবার। ও-প্রান্তে একটি সাত-আট বছরের মেয়ে পুতুল-সন্তান লইয়া ব্যস্ত, আর আজ এ-প্রান্তে শিশুক্রোড়ে পাঁচটি সন্তানের জননী—মাঝখানে তারই কত বিচিত্র রূপ! গিরিবালা কিন্তু অনুভব করিলেন দুই-ই এক হইলেও পূর্বাপর যোগ নাই—সমস্ত শৈশবটা যেন আলাদা হইয়া গেছে জীবন থেকে—ঠিক কোন্ জায়গাটিতে ছেদ পড়িয়া, কোথায় কবে কেমন করিয়া, ধরা যায় না, তবে আজকের গিরিবালার সঙ্গে ছেলেবেলার

গিরিবালার যোগ নাই; বেলে-তেজপুর আর পাণ্ডুলের জীবন—দুইটি আলাদা হইয়া গেছে। মনে পড়িল প্রথম-প্রথম আসিয়া বেলে-তেজপুরের জন্য সে কী অসহ্য ব্যাকুলতা! গ্রীষ্মের দুপুরে সবাই যখন ঘুমাইয়া, জানালার সামনে একটু ছিদ্র দিয়া বাহিরের উত্তপ্ত রোদের দিকে চাহিয়া আছেন—আজ যেমন অন্ধকারের গায়ে, সেদিন তেমনি ঝলমলে রোদের গায়ে বেলে-তেজপুর ভাসিয়া উঠিয়াছে—বাপ, মা, জেঠামশাই, জেঠাইমা—মনে হয় ডানা থাকে তো উড়িয়া পালাই!..কোথায় গেল সে ব্যাকুলতা? কবে থেকে গেল? কত দিন পরে, আজ এই প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সের মাথায় বেলে-তেজপুর এমন সবিস্তারে মনে পড়িয়াছে! সব মেয়েরই এই জীবনকাহিনী নাকি? তাই নিশ্চয়, মা বাপেরবাড়ি যাইতে না পারিলে প্রায়ই বলিতেন—"মেয়েদের বাপেরবাড়ি কুটুমবাড়ি মা—কুটুমবাড়িরও বাড়া"—আরও মনে পড়ে বাবার মুখে শোনা—পণ্ডিতমশাই নাকি বলিয়াছিলেন—"গৌরী চাইলে কি বাপেরবাড়ি ঘন-ঘন আসতে পারে না রসিক? চায় না তাই আসে না, বছর বছরে একবার করে তেরাত্তির কাটাবার ব্যবস্থা করে রেখেছে—একটা ঠাট বজায় রাখা কোন রকম করে।"—ঠিকই তো, সব মেয়েই দুর্গার হাতে গড়া, ইচ্ছা করিয়াই ভোলে বাপের বাড়িকে...সাতুর বিবাহ—সাতুর—বাড়ির প্রথম ছেলের!—দিদি বলিতে অজ্ঞান হইত; গিরিবালা গেলেন না!

একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল, চিন্তা একটু অন্য পথ ধরিল।—কেন হয় এমনটা? কে ভুলাইয়া দেয়?—ছোট জা তো বেশ আছে...

প্রশ্নটা আপনা-আপনিই যেন উত্তর পাইয়া গেল। গিরিবালা একটু ঝুঁকিয়া ঘুমন্ত শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন—এরাই—এরাই; এক একটু করিয়া আসে আর ওদিকে খানিকটা খানিকটা করিয়া ব্যবধানের সৃষ্টি করে; এদের লইয়া অনবরত চিন্তা করিতে করিতে আর কিছু মনে থাকে না—সুখের চিন্তাও আছে, আবার দুঃখের চিন্তাও আছে। ...অদ্ভুত এরা—এক সময়ের যে আদরের মেয়ে তাহাকে একবার মা করিয়া লইয়া একেবারেই আত্মসাৎ করিয়া লয়, কী যাদুই যে জানে!

এদের কেহ নাই বলিয়াই তো খজনী বাপেরবাড়ি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে পারে, জা প্রভাবতী বলিতে পারিল—"একটা ব্যবস্থা করে চলে গেলে না কেন?"...গিরিবালা বুঝিলেন তাঁহারও না যাওয়ার মধ্যে কোথাও একটু লুকান আশঙ্কা ছিল—খোকার কষ্ট হইবে, অহি বড় দুর্বল—তাই হয়তো জন্মিয়া ওরা যে বাপেরবাড়ির সম্বন্ধটা দুর্বল করিয়া দিয়াছে সে-সম্বন্ধ লইয়া অত চিন্ হয় নাই। জা প্রভাবতী এ রহস্য কি করিয়া বুঝিবে?

গিরিবালার বুকের কোথায় কি একটা হয়—আনন্দ কি বেদনা ঠাহর করিতে পারেন না। খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরেন; মনে মনে বলেন—এরা এমনি করে অনেক জিনিসই নেবে—তা নিক্—নিক্...

BanglaBook.org

॥ ৭ ॥

পাণ্ডুলের কুঠির ইতিহাস এক জায়গায় খানিকটা দেওয়া হইয়াছে; আবার একটু দেওয়া প্রয়োজন, কেননা ইতিহাসের ধারাটা আগের তুলনায় খানিকটা বদলাইয়া গেছে। পূর্বেই

বলা হইয়াছে পাণ্ডুলের কুঠির শাসন ছিল একটু নরম সুরে বাঁধা—অবশ্য অন্য কুঠির তুলনায়। মধুসূদনের পর কৈলাসচন্দ্রের হাতে ভার পড়িল, এই সুরটি যাহাতে বজায় থাকে তাহার জন্য তিনি খুব সচেষ্টই রহিলেন। ওদিকে সাহেব-মহলেও একটু পরিবর্তন হইয়াছে। মনিবরা নাই, এখন ম্যানেজার সহকারী ম্যানেজারের হাতে কুঠি। সুনাম আর দুর্নাম একটা বিষয়েরই দুই দিক্! রায়তের কাছে পাণ্ডুলের কুঠির যেটা ছিল সুনাম, কুঠিয়াল সম্প্রদায়ের মধ্যে সেইটাই ছিল দুর্নামের কারণ। 'নেটিভ'দের কি প্রাপ্য, তাহাদের কি করিয়া ঠাণ্ডা রাখিতে হয় সে-সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে একটি মাত্র ধারণা ছিল। একটা কথাই চলিয়া গিয়াছিল—'আগে লাৎ পিছে বাৎ'। পাণ্ডুল এবং পাণ্ডুলের মতো আরও দু-একটা কুঠি যাহারা 'নেটিভ'দের মানুষের সমশ্রেণী করিয়া লইয়া বাজার নষ্ট করিতেছে, ক্লাবে, পার্টিতে তাহাদের প্রচ্ছন্ন বা প্রকট বিদ্রূপ শুনিতে হইত। মনিবেরা চলিয়া গেলে যখন ম্যানেজারদের শাসন আরম্ভ হইল তখন বিদ্রূপটা বোধ হয় একটু বাড়িলই। সূর্যের অতটা তাত না থাক, তা বলিয়া বালিরও দাহিকা-শক্তি থাকিবে না—এ কেমন কথা!

কিন্তু একটা ট্রাডিশন চট করিয়া ভাঙা যায় না। পুরাতন পদ্ধতি ধরিয়া নূতন বাবুর আমলেও বেশ চলিয়া যাইতেছে, তাহা ভিন্ন সময়ও বদলাইয়াছে—সম-ব্যবসায়ীদের কথা বড়সাহেব গায়ে মাখিত না।

কিন্তু ছোটসাহেব অন্য প্রকৃতির। তাহার রক্ত উষ্ণতর, সে কুঠির শাসনের সুবর্ণ যুগটি ফিরাইয়া আনিতে চায়। তাহার নিজের সব থিয়োরি আছে—বাংলায় কুঠিয়ালদের প্রতিপত্তি কেন গেল, বিহারেই বা কেন যাইতে বসিয়াছে— এর প্রতিবিধান সম্বন্ধেও তাহার থিয়োরি অন্যরূপ, বড়কর্তার গা এলানো ভাবটা তাহার পছন্দ হয় না। ছোকরা একটু মিন্‌মিনে গোছের ; বড়সাহেবকে সোজাসুজি কিছু বলিতে পারে না, বা বলে না ; কৈলাসচন্দ্রের উপর প্রতিপত্তি জমাইবার চেষ্টা করে, সুবিধা হয় না। কেননা এ-বালখিল্যকে আমল দিবার পাত্র তিনি নহেন। ভিতরে ভিতরে খিটিমিটি হয়, এবং একটু ঘোরালো হইলেই কথাটা বড়সাহেবের কানে পৌঁছায়। তিন-চারবার এই-রকম হইয়া গেল ; বড়সাহেব একটু একান্তে ডাকিয়া বলিল—

"Leave it to the Babu Mr..." (বাবুর হাতেই এসব ছেড়ে দাও)

তিন-চারবারই কথাটা এইভাবে বড়সাহেবের কাছে গিয়া চাপা পড়িতে কৈলাসচন্দ্র বুঝিলেন, তাঁহারই জিৎ চলিতেছে ; কিন্তু তবু ব্যাপারটা তাঁহার খুব প্রীতিপ্রদ হইল না। একদিন বিপিনবিহারীকে বলিলেন—"গতিক তেমন সুবিধের নয় বিপিন, অবশ্য মনে হচ্ছে বড়সাহেব ছোটসাহেবকে নেহাৎ যদি দাবড়ানি না দিয়েও থাকে তো উৎসাহও দেয় নি—যেমন করে মুখটি চুন করে থাকে ; কিন্তু Blood is thicker than water—আজ স্বার্থ আছে, আমার কথাই বজায় রেখেছে, কান ভাঙাতে ভাঙাতে এ-ভাবটা কতদিন স্থায়ী হবে বলতে পারি না। তা ভিন্ন এ-ব্যাটাই যে একদিন ঐ চেয়ারে বসবে না কে জানে?—চান্স তো তারই বেশি। তাই বলছিলাম সাবধান হওয়াই ভালো, অর্থাৎ বাইরেও একটু নজর রাখতে হবে এবার থেকে।"

বছর দুয়েক গেল, তাহার মধ্যে বড়সাহেব আরও বার-দুয়েক ঐ Leave it to the Babu বলিয়াই নিষ্পত্তি করিলেন, তাহার পর কৈলাসচন্দ্রের কথা বলিল :

বামনটুসির পিছনে বিঘা-তিনেকের একটা চাকলা ছিল। জমিটা একটানা নয়,

banglabook.org

খানিকটা আঁকাবাঁকা। এ অংশটা গ্রামের ভিতরের পানে চলিয়া গেছে ; বাকিটা—প্রায় বিঘা-খানিক হইবে—সামনের দিকে পড়ে এবং সেটা কুঠির জিরাত অর্থাৎ খাস-আবাদির পাশেই বলিয়া বহুদিন হইতে তাহাতে নীল চাষ হইয়া আসিতেছিল। একটি ব্রাহ্মণ-বিধবার সম্পত্তি ; পূর্বে নীলের যখন দর ছিল তখন কুঠি যাহা দিত তাহাতে ধানের মতো লাভ না থাক্, বিশেষ লোকসান ছিল না—চলিয়া যাইতেছিল।

চলিয়া যাওয়ার মধ্যেও একটা ব্যাপার ছিল। মধুসূদনের সময়ে এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্রের আমলে বিধবা স্ত্রীলোকটি কয়েকবার বাড়িতে আসিয়া কর্ত্রীদের ধরে—ওটুকু জমি কুঠি হইতে ছাড়াইয়া তাহাকে ইচ্ছামতো ধান বা অন্যরকম ফসল তুলিতে দেওয়া হয় তো তাহার বিশেষ উপকার হয়। উপকার যে হয় এটা সবারই জানা ; কিন্তু একটু বিপদের সম্ভাবনা ছিল। যে অংশটা গ্রামের ভিতরে চলিয়া গেছে সেটাও যে এই চাকলার সামিল সাহেবের এটা খেয়াল ছিল না। ঐ সামনের জমিটুকু লইয়া কথা উঠাইতে গেলেই বাকি অংশটা—যেটা এতদিন আত্মগোপন করিয়া আছে সেটার কথাও উঠিবে নিশ্চয়। যেখানে কুঠির স্বার্থ সুপ্রকট, সেখানে সুবিচার সুনিশ্চিত নয়। হয়তো সাহেব ছাড়িয়া দিতে পারে, কিন্তু অপর পক্ষে এও সম্ভব যে, যদি আলোচনা প্রসঙ্গে বাকি অংশটুকুর সন্ধান পায় তো সেটাও গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে। ঐটাই বড় অংশ,—দুই বিঘা ; সুতরাং এ-বিষয়ে আপাতত যেমন আছে সেইরূপ ব্যবস্থাই থাকিতে দেওয়া সমীচীন—এইরূপ পরামর্শ দিয়া মামা-ভাগনে উভয়েই স্ত্রীলোকটিকে নিরস্ত করিতেন ; বুঝাইয়া দিতেন কুঠির সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে এ-ও একটা সুবিধা—আত্মীয়-স্বজনের উৎপীড়ন থেকে বাঁচিয়া আছে। স্ত্রীলোকটি চলিয়া যাইত, আবার আত্মীয়-স্বজনের পরামর্শ দিত, মাইজিদের কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িত। এই করিয়া চলিয়া যাইতেছিল।

স্ত্রীলোকটির একটি পুত্র ছিল। মধুবাণী স্কুল হইতে এনট্রান্স দিয়া মোক্তারী পড়িতেছিল, বছর-দুয়েক হইল পাস করিয়া প্র্যাকটিস্ করিতেছে। সে একদিন জমিটার জন্য কৈলাসচন্দ্রকে আসিয়া ধরিল। ছেলেটি বুদ্ধিমান, নিজে হইতেই স্বীকার করিল যে, ইহারা দুইজনেই বুদ্ধি করিয়া এবং দয়াপরবশ হইয়া জমির বেশির ভাগই কুঠির কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং এখনও কথা তুলিতে গেলে আগে যে বিপদের ভয় ছিল সেটা আসিয়া পড়িতে পারে। তবে পূর্বের তুলনায় আইন অনেকটা সুপ্রতিষ্ঠিত—জেলায় দেওয়ানি কোর্ট আসিয়া গেছে, এমন কি মহকুমা মধুবাণীতে পর্যন্ত একজন মুন্সেফের চৌকি পড়িয়াছে। সাহেব যদি গা-জুরি করিতে চায়, সে আদালতের সাহায্য-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইবে ; মধুবাণীর কয়েকজন উকিল তাহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।—বেশ খোলাখুলি অথচ ধীরভাবে আলোচনা করিল যুবক।

ব্যক্তিগতভাবে ইহাদের সহানুভূতি ছিলই বিধবাটির দিকে ; এখন তাহার পুত্র উপযুক্ত, সে যদি ঝক্কিটা লইতে রাজী থাকে তো কৈলাসচন্দ্রের আর আপত্তি কি? বাড়িতে বুড়ি আসিয়া কান্নাকাটি করে, অন্তত সেটুকু থেকে নিষ্কৃতি পান। বলিলেন, তিনি বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিবেন, একটা দরখাস্ত দেওয়া হোক।

সাহেবের কাছে যখন দরখাস্তটা পেশ করিলেন, সেখানে ছোটসাহেব ছিল। সব শুনিয়া একটু ব্যঙ্গ হাস্যের সহিত বড়সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিল—"Why must we reverse an arrangement that has been standing so long)—Just because

BanglaBook.org

her son has become a mukhtear? We cannot afford to be coward!" (বাঃ এত দিন যে ব্যবস্থাটা চলছিল সেটা রদ করে দিতে হবে? কেন, ওর ছেলে মোক্তার হয়ে এসেছে বলে? আমাদের কাপুরুষ হলে চলবে না তো!)

বিপিনবিহারীও কি একটা কাজ হাতে করিয়া পূর্ব হইতেই দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহার মুখটা একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল ; কিন্তু দুই সাহেবেরই পিছনে থাকায় তাহারা দেখিতে পাইল না।

সহকারীর কথায় বড়সাহেব কৈলাসচন্দ্রের পানে চাহিলেন। কৈলাসচন্দ্রেরও মুখটা গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিল, খুব কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া প্রথমে বিপিনবিহারীকে একটা কাজের ছুতা করিয়া সরাইয়া দিলেন, তাহার পর যুক্তির স্বরেই বলিলেন—"The factory has a prestige of its own. It won't be quite elegant if it were dragged to the court of justice." (কুঠির একটা সম্ভ্রম আছে, যদি তাকে আদালতে টেনে নিয়ে যায় তো সেটা তার পক্ষে বেশ শোভন হবে না।)

ছোটসাহেব এবার কৈলাসচন্দ্রের দিকেই ফিরিয়া চাহিল, বলিল—"Personally I fail to see Babu how it affects our prestige so long as we fight for our rights ; that's what a law-court stands for." (ব্যক্তিগতভাবে আমি তো বুঝতে পারি না যে যতক্ষণ ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়ছি ততক্ষণ মর্যাদাহানি কি করে হয়। কোর্টের তো কাজই এই।)

বড়সাহেব একটু যেন সমস্যায় পড়িয়া গেছে। মুখটা নিচু করিয়া একটা কলম দিয়া ব্লটিংকাগজ আঁচড়াইতে লাগিল। কৈলাসচন্দ্র একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর ছোটসাহেবের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—"If you knew the history of the factory, you would not speak in this vein Mr :.... Till recently she combined in herself the authority of law-court also. (তুমি কুঠির ইতিহাস জানলে আর এ কথাটা বলতে না; সে দিন পর্যন্ত কুঠি আদালতের কাজ করে এসেছে।)

বুদ্ধির জয় হইল ; কৈলাসচন্দ্র এমন জায়গাটিতে ঘা দিলেন যে, ছোটসাহেব তো চুপ করিয়া রহিলই, বড়সাহেবের মনটাও খানিকটা গর্বে খানিকটা দুঃখে ভিতরে ভিতরে বিচলিত হইয়া উঠিল ; কিন্তু মনটা কৈলাসচন্দ্রের কথায় সায় দিলেও ছোটসাহেবকেও বাঁচাইতে হইল : প্রশ্ন করিলেন—"But are you sure we have no case Babu?—Supposing we have to resort to law or are dragged into it?" (তুমি কি নিশ্চয় জান, আমাদের জেতবার আশা নেই—ধর যদি আমাদের আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়, অথবা বাধ্য হয়েই যেতে হয় সেখানে?)

কৈলাসচন্দ্র বলিলেন—"I am absolutely sure, sir". (আমি খুবই ঠিক জানি।)

বড়সাহেব ব্লটিঙে কয়েকটা আঁচড় কাটিয়া আবার খানিকটা চিন্তা করিলেন, তাহার পর হঠাৎ মাথা তুলিয়া বলিলেন—"Best thing—let Mr....enquire and report." (সব চেয়ে ভাল হবে মিস্টার...অনুসন্ধান করে একটা রিপোর্ট দিন।)

কৈলাসচন্দ্রের মুখটা নিষ্প্রভ হইয়া গেল। কি একটা বোধ হয় বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বড়সাহেব হঠাৎ উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"Well Babu, so much for the present ; I would go and inspect the jirat." (আপাতত এই পর্যন্তই থাক্, আমি একবার গিয়ে জিরাত পরিদর্শন করব।)

বাহির হইয়া গেলেন।

বিপিনবিহারী নিজেদের অফিস-ঘরের দুয়ারের কাছেই। কৈলাসচন্দ্র সাহেবের কামরা থেকে বাহির হইতে প্রথমেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল, প্রশ্ন করিলেন—"সব শুনেছ বোধ হয়?"

"হ্যাঁ দাদা, ছোটসাহেবকে এনকোয়ারী করতে দিলে।"

"আমি তোমায় একদিন বলেছিলাম—বাইরে নজর রাখতে হবে—এখানে আর বেশি দিন নয়। বুঝলে অন্যায় করছে, শুধু সাদা চামড়ার প্রেস্টিজ রাখবার জন্যে এই হুকুমটা দিলে। দ্বারভাঙ্গার বাড়িটা ওরা বিক্রি করবে বলছিলে না? তুমি তো বলছিলেও নিয়ে নিতে। সামনের রবিবারে একবার চলে যাও, দরদস্তুর কর। মামার মর্যাদা যত দিন রাখতে পারব ততদিনই তাঁর চেয়ারে বসব; পাণ্ডুলের নীলকুঠির প্রেস্টিজ যে আসলে কার প্রেস্টিজ ওদের বুঝিয়ে দেব এক দিন।"

দ্বারভাঙ্গা-বাসের সেই গোড়াপত্তন হইল, পাণ্ডুলের শিকড় আলগা হইল।

কৈলাসচন্দ্রের দুই পুত্র দ্বারভাঙ্গায় একটি বাড়িতে থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিলেন। খবর পাওয়া গিয়াছিল বাড়ির মালিক বাড়িটি বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। বিপিনবিহারীর ইচ্ছা ছিল দাদা লন বাড়িটা, কিন্তু কৈলাসচন্দ্র দোমনা হইয়াছিলেন এত দিন, এই ঘটনার পর মন স্থির করিয়া ফেলিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বাড়িটা কেনা হইয়া গেল।

এদিকে বিপিনবিহারী নিজেও যে কি করিবেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। সাঁতরায় ছেলেদের রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইবার যে পরীক্ষাটা করিতেছিলেন সেটা চারিদিক্ দিয়াই বিফল হইবার মতো হইয়া আসিতেছিল। বড় ছেলের স্বাস্থ্য টিকিতেছে না, মেজটির উপর একটু কড়া নজর রাখা দরকার, এখান থেকে সেটা অসম্ভব, ওখানে মা আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। চাকরি যদি এখানে যায়ই তো দেশে যাইয়া চাকরি করা পোষাইবে না, এইদিকেই অন্যত্র কোথাও খুঁজিয়া-পাতিয়া লইতে হইবে, পারতপক্ষে কোন নীলকুঠিতেই। প্রতিপত্তির কেমন একটা নেশা যেন রক্তের মধ্যে আসিয়া গেছে দুই পুরুষের নীলকুঠি-জীবনে, অন্যত্র চাকরির কথা যেন ভাবাই যায় না। পাণ্ডুলে সম্পত্তিও আছে কিছু, তাহা ভিন্ন পাণ্ডুল যে হাতছাড়া হইবেই তাহারই বা স্থিরতা কি? এ সাহেব গিয়া ভালো সাহেবেও তো আসিতে পারে আবার,—এমন তো কয়েক বারই হইল তাঁহার জীবনে। পাণ্ডুলের মাটির উপর একটা মায়াও জন্মিয়া গেছে—ইচ্ছা করে কাছে-পিঠেই থাকি।

দ্বারভাঙ্গায় একটু সুবিধা হইল। কৈলাসচন্দ্রের বাড়ির পাশেই খানিকটা জায়গা পাওয়া গেল। সুযোগটুকু ছাড়িলেন না, বিপিনবিহারী জায়গাটি কিনিয়া রাখিলেন।

পাণ্ডুলের চাকরি পূর্ব্ববৎই চলিল। বড়সাহেব লোকটা ধূর্ত। কুটির বেশ সুদিন যাইতেছে না—এমনই সময় পুরাতন এবং বিচক্ষণ কর্মচারীদের ক্ষুণ্ন করা সমীচীন হইবে না, এটা তিনি ভালো রকমই জানিতেন। ও-হুকুমটা ছোটসাহেবের মান রাখিবার জন্য ঐভাবে দিলেন বটে, তবে তাঁহারই ইঙ্গিতে ছোটসাহেব অনুসন্ধান করা আর রিপোর্ট দেওয়ায় গড়িমসি করিতে লাগিল। দিন-কুড়ি অপেক্ষা করার পর বড়সাহেব অজ্ঞতার

BanglaBook.org

ভান করিয়া একদিন কৈলাসচন্দ্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ছোটসাহেব কি ও-বিষয়টা লইয়া অনুসন্ধান শুরু করিয়াছেন—তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?

কৈলাসচন্দ্র জানালেন যে, তখন পর্যন্ত করে নাই।

সাহেব যেন একটু বিরক্তভাবেই বলিলেন—"O, he will never find time to do it. Put up the file Babu, I will pass orders." (ওর আর সময় হবে না; তুমি ফাইলটা নিয়ে এসো বাবু; আমি হুকুম দিই।)

ফাইলটা হাজির করা হইলে বৃদ্ধার জমিটা ফিরাইয়া দিবার হুকুম দিয়া দিলেন।

এবারেও জিত; কিন্তু ঐ যে মাঝের অংশটুকু—ছোটসাহেবেকে রিপোর্ট দিতে বলা—তাহার গ্লানিটুকু এঁরা ভুলিলেন না; দুই ভাইয়ে সতর্কই রহিলেন।

॥ ৮ ॥

শশাঙ্কদের সাঁতরায় যাইবার প্রায় বছর দেড়েক পরের ঘটনা এটি। আরও মাস-ছয়েক গেল এবং ইহার মধ্যে শশাঙ্কর শরীর আরও ভাঙিয়া পড়িল। পেটের ব্যামো—অ্যালোপ্যাথি এবং কবিরাজির পুরাতন চিকিৎসায় আর ফল পাওয়া গেল না, রসিকলাল বেলে-তেজপুর থেকে একবার আসিয়া দেখিয়া-শুনিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। পেটটা ধরিল, কিন্তু দুর্বলতাটা যাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল।

দুইটা বৎসর কাটিয়া গেছে, মা-বাপের মুখ দেখা নাই। বড় জায়গা, নিজের স্কুল-জীবন তো আছেই, এ ছাড়া পাঁচটা হুজুগও আছে—যাত্রা, অপেরা, কথকতা, গঙ্গায় বাচ-খেলা; সমাজপতিত্ব লইয়া গোঁসাই লাহিড়ীদের দলাদলি সম্পর্কে আরও পাঁচটা হুজুগ—অন্য সময় অতটা কষ্ট হয় না। তাহা ভিন্ন আগে যতটা হইত, এখন অভ্যাসের জন্যও ততটা হয় না। কিন্তু অসুখের সময় মা ভিন্ন কাহাকেও মনেই পড়ে না। অন্য সময় মায়ের মুখটা অবছায়া-আবছায়া হঠাৎ কখনও চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে, কিন্তু অসুখের সময় সেই মুখ নিজের বেদনার মধ্য দিয়া বড় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। অভিমান হয়; নিস্তারিণী দেবী গায়ে হাত বুলান, শশাঙ্ক মুখ ফিরাইয়া চুপটি করিয়া পড়িয়া থাকে, যে-আদর পাইতেছে তাহার মধ্যে তৃপ্তি পায় না। ঠাকুরমায়ের চেয়ে মাকে সাধারণভাবে যে বেশি ভালবাসে এমন নয়, তবে পাইবার উপায় নাই বলিয়া মনটা সেইখানে পড়িয়া থাকে।...এক এক সময় মুখ ঘুরাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে। নিস্তারিণী দেবী ব্যাকুল হইয়া পড়েন; পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলেন—"আসুক, এসে নিয়েই যাক, কি যা-হয় একটা ব্যবস্থা করুক; বুড়ো মায়ের পর ছেড়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্দি আছে। আমারও যে অদৃষ্টে কি আছে—নিজে ঘাড় পেতে যে কেন নিতে গেলাম!"

শশাঙ্ক ফোঁপানোর মধ্যেই বলে—"আমি যাব না!"

একে নিরীহ প্রকৃতির তায় রোগ-দুর্বল, অল্প কথাতেই অভিমান আসিয়া পড়ে।

শৈলেন একটু অন্য ধরনের। তাহারও অভিমান যে না হয় এমন নয়, তবে শরীরটা সুস্থ বলিয়া তাহার অবসরটা কম। তাহা ভিন্ন যখন হয় অবসর অভিমানের, তখন তাহার সঙ্গে এক ধরনের আক্রোশ মিশানো থাকে একটু। ওর মনটা নাটকীয় সুরে বাঁধা বলিয়া কেমন করিয়া একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেছে যে উহাদের দুই ভাইকে নির্বাসন দেওয়া

হইয়াছে। কাজটা খুবই অন্যায় হইয়াছে, তবে শৈলেনের তাহাতে বিশেষ দুঃখ নাই—ও নিজের কল্পনা লইয়া বেশ এক রকম থাকে। মনে হয়, দাদার সঙ্গে রামচন্দ্রের বেশ সাদৃশ্য আছে—ঐ রকম ভালো মানুষ দুর্বল ; নিজে যেমন দয়া-পরবশ, তেমনই আবার দয়া জাগানও অপরের মনে—ভাগ্যিস, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব, জাম্বুবান প্রভৃতি ছিল, নহিলে কী অবস্থাটাই যে হইত ! দাদাও সেই রকম ; ভালোমানুষ বলিয়া আসলে নির্বাসনটা দাদাকেই, শৈলেন যেন লক্ষ্মণ-ভাই হইয়া স্ব-ইচ্ছায় আসিয়াছে। ভাবিতে বেশ লাগে ; একটু ভবঘুরে গোছের ধাতটা, পাঠশালার অতিরিক্ত সময়টা এখানে-ওখানে, পুকুরধারে, পড়ো ভিটায়, আগাছার জঙ্গলে ঘুরিয়া মনের ভাবটিকে পুষ্ট করিয়া ফেলে। পঞ্চবটী, দণ্ডকারণ্য, এমন কি—গ্রামে হনুমানের যথেষ্ট উপদ্রব থাকায়—কিষ্কিন্ধ্যারও অভাব হয় না। দাদাকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য বাবার ওপর যে অভিমানটা হয় তাহাতে এক ধরনের আক্রোশও মিশিয়া থাকে। এইখানে মূল রামায়ণের একটু রকমফের হয়—শৈলেন এক একবার ভাবে এমন কিছু একটা ঘটিবে—কিছু একটা—যাহা রামায়ণেও কস্মিন্‌কালেও ঘটে নাই—যাহার জন্য বাবার আর আপসোসের শেষ থাকিবে না। বাল্মীকির আশ্রমে লব-কুশ দুই ভায়ের কাছে রামচন্দ্রের সম্মুখ-যুদ্ধে পরাজয়ের কথাটা কল্পনার সাহায্যে রাম-লক্ষ্মণের কাছে দশরথের পরাজয়ের রূপান্তরিত করিয়া বেশ তৃপ্তি পাওয়া যায়। যদি কখনও আক্রোশের চেয়ে অভিমানের ভাগটা বেশি থাকে, তখন লক্ষ্মণের মৃত্যুতে দশরথের শাস্তির কথাই ভাবিতে ভালো লাগে। বাবা অনুতপ্ত হইয়া লইতে আসিয়াছেন দুই ভাইকে—আসিয়া দেখেন শৈলেন নাই, হঠাৎ কি হইয়াছিল, যেদিন পৌঁছিলেন বাবা, তাহার আগের দিনই মায়া কাটাইয়া চলিয়া গেছে। শৈলেন কল্পনাকে পূর্ণ মুক্তি দিয়া কোনদিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। মনে একটি কথাই ক্রমাগত প্রতিধ্বনি হইতে থাকে—বেশ হয়—বেশ হয় তাহলে—বেশ হয়...আসিয়া শৈলেনকে দেখিতে পাইতেছেন না, সবাই বলিতেছে—"দাদাকে বড্ড ভালবাসত বলে অভিমান করে চলে গেছে..."

চাহিয়া চাহিয়া মনটা গুমরিয়া উঠে—বাবা আসিয়াছেন, শৈলেনকে ডাকিতেছেন—আওয়াজ পর্যন্ত যেন শুনিতে পায় শৈলেন।

মায়ের ওপর অভিমান হয় না, ঠিক যে-কারণে কৌশল্যা বা সুমিত্রার উপর কোন অভিমান ছিল না লক্ষ্মণের। মায়ের জন্য কষ্টই হয়। মা এদেরই দলে, নিতান্তই অসহায়, এদেরই দুই ভাইয়ের মতোই শক্তিমান বাবার অন্যায়ের লক্ষ্য। মনে পড়ে আসিবার সময় মায়ের মুখখানি—চোখে জল, জানলার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, শাম্পেনির মধ্যে থেকে শৈলেন দেখিতে লাগিল অনেক দূর পর্যন্ত, তাহার পর শাম্পেনিটা হঠাৎ মোড় ঘুরিল।

মহেশের রথের মেলা চলিয়াছে। শশাঙ্কর শরীরটা রসিকলালের ঔষধ খাইয়া এদানি ভালো আছে, কিন্তু তাহার যে এখানে থাকা চলিবে না এটা সবাই বুঝিয়া গেছে, বিপিনবিহারীকে লেখাও হইয়াছে কয়েক বার। ভালো আছে ; কিন্তু পাছে কোথাও যাইয়া কোন রকম অনাচার করে সেই জন্য তাহাকে চোখে চোখে রাখা হইয়াছে, বাড়ির বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না।...রথের মেলায় আর কিছু নয়—পাঁচুর মায়ের পাঁপরভাজা আর ফুলুরি বিশেষ লোভনীয়। প্রথমটা শৈলেন রাজী হয় নাই, তাহার পর দাদার কাতরানির জন্য গোপনে কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেয় ; আজ বিকাল থেকে দাদার পেটের ব্যথাটা আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। শৈলেন বসিয়াছিল দাদার কাছে খানিকক্ষণ, তাহার পর

BanglaBook.org

ঠাকুরমা আসিতে উঠিয়া আসিয়াছে। প্রথমত দাদার খাবার চাওয়ার কাতরানি অপেক্ষা দাদার পেটের যন্ত্রণার কাতারানি শোনা বেশি ক্লেশকর, তদুপরি ঠাকুমা আসিয়া গেছেন, কতরানির কারণ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান চলিবে। শৈলেনের মনটা খুবই বিষণ্ন আজ। দাদার কষ্টের বৃদ্ধির জন্য বাবার উপর অভিমান আর আক্রোশটা খুবই বাড়িয়া গেছে। পাঁপর-বেগুনি যোগাইয়া দিবার কথা ভুলিয়া ঐ দুটি অনুভূতিকেই পুষ্ট করিয়া লইয়া অলসভাবে পায়চারি করিতে করিতে, রেলের চরখির পাশে যে নিচু দেওয়ালটা আছে তাহার উপর আসিয়া শৈলেন বসিল। সন্ধ্যা হয়-হয় ; আকাশে মেঘ থাকায় ছায়াটা আরও গাঢ় বোধ হইতেছে, মনের সঙ্গে আকাশের সুর তানে-লয়ে একেবারে যেন মিশিয়া গেছে। লক্ষ্মণের মৃত্যুর কথা আজ চক্ষু দুইটিকে অশ্রুপূর্ণ করিয়া এমন একটা তৃপ্তি দিতেছে যে, শৈলেন খুব ফেনাইয়া ফেনাইয়া সেই চিন্তাটাকেই মনের কোণ পর্যন্ত প্রসারিত করিয়া দিতেছে...বেশ হয় যদি আজই মরিয়া যায় শৈলেন।...একটা গাড়ির সিগ্‌ন্যাল দিয়াছে —দূরে শ্যাওড়াফুলির দিকে লাইনের বাঁকে ইঞ্জিনের মুখ দেখা গেল—হুস্ হুস্ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে—বেশ হয় যদি হঠাৎ এমন কিছু হয় যে গাড়িটা লাইন ছাড়িয়া শৈলেনের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। ব্যস, খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না যে শৈলেন কোথায় গেল,...ও স্বর্গে থেকে শুনিবে বাবা ওর নাম ধরিয়া ডাকিয়া ফিরিতেছেন।...গাড়িটা আসিয়া পড়িল বলিয়া ; শৈলেন দেওয়ালের মাথা ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় নিরাপদ স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল—হুস্ হুস্ করিয়া করিয়া গোটাকতক দ্রুত উগ্র শব্দ ; হঠাৎ সেটা ভেদ করিয়া একটা টানা শব্দ উঠিল—কে ডাকিল—"শৈলে—ন!"

শৈলেন ইঙ্গিতটা যেদিক্ থেকে আসিতেছিল সেইদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মনে হইল শব্দটা যেন পিছন দিক্ থেকে আসিল। সে সচকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল—"কে!"

যতদুর পর্যন্ত দৃষ্টি যায় তাহাকে ডাকিবার মতো কেহ নাই ; ঘুরিয়া চারিদিকে দেখিল, কেহই নাই। শৈলেন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতোই আর একবার হাঁকিল—"কে ডাকলে!—কে!" সঙ্গে সঙ্গে তাহার গা ছম্-ছম্ করিয়া উঠিল। সামনে চৌধুরীদের অপরিচ্ছন্ন বাগানটা —লম্বা লম্বা কতকগুলা দেবদারু গাছ, তাহার পিছনদিকে মুখজ্জেদের পোড়ো বাড়িটা। পোড়ো মানে ভাঙা-চোরা নয়—একটা কি দোষ আছে, ভাড়াটে হয় না।

একটা হাওয়া উঠিয়া মেঘের উপর আর এক পরদা মেঘ আনিয়া ফেলিয়া সন্ধ্যাটাকে হঠাৎ আরও মলিন করিয়া ফেলিল। রাস্তায় লোক নাই বলিলেই হয়, খুব দূরে এক-আধ জন আসন্ন বর্ষার ভয়ে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতেছে ; শৈলেন যে কি করিবে যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। আকাশ-বাতাস, সেই অকারণ শব্দ, নির্জনতা, পোড়ো বাড়ি—সব মিলিয়া অবস্থাটা এমন দাঁড়াইল যে মনে হইল, যে-মৃত্যুকে শৈলেন খুঁজিতেছিল সে যেন হঠাৎ বিকৃত মূর্তিতে তাহার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখা যায় না কিন্তু কি এক রকম অদ্ভুত ভাবে অনুভব করা যায়।...শরীরটা ঝিম-ঝিম্ করিতে লাগিল। জোর হাওয়ায় বাগানটা আর পোড়ো বাড়িটা হঠাৎ শব্দমুখর হইয়া উঠিল—শৈলেনের আহত চৈতন্যে যেন মনে হইল—সামনে, পিছনে, চারিদিকেই চাপা হিস্-হিস্ শব্দ হইতেছে—শৈলেন!—শৈলেন!—শৈলেন!!—শৈলেন!!!...

বাড়ির দিকে পা বাড়ানো অসম্ভব—পোড়ো বাড়ি আর বাগানটা টানা ঐদিকেই চলিয়া গেছে। এদিকে হাত-পা ক্রমে অবশও হইয়া আসিতেছে। কি হইত বলা যায় না, তবে

এই সময় দাশুর-মাকে আকাশকে গাল পাড়িতে পাড়িতে শৈলেনদের বাড়ির দিক্ থেকেই হন্ হন্ করিয়া আসিতে দেখা গেল। সে বাড়ি বাড়ি গঙ্গাজল যোগায়, কাঁখে একটা ঘড়া রহিয়াছে। কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল—"শৈল ঠাকুর যে গো—অসময়ে এখানে?"

শৈলেন বলিল—"এই একটু ছিদামের দোকানে যাব, বাতাসা কিনতে।"

"তা এ দুজ্জোগে যাবে কেন? আমায় পয়সা দ্যাও, বাড়িতে দিয়ে এসবো'খনি।"

বিপদে শৈলেনের বুদ্ধি যোগাইয়া গিয়াছিল—ছিদামের দোকানটা গঙ্গার ধারেই; সঙ্গে যাওয়া হইবে আবার সঙ্গেই ফিরিয়া আসা হইবে। দাশুর-মায়ের প্রস্তাবে একটু থতমত খাইয়া গিয়া বলিল—"না, হরির-লুটের বাতাসা কিনা, আমায়ই নিয়ে আসতে বলেছেন, একটু গঙ্গাজলের ছিটে মাথায় দিয়ে।"

"তা চল তবে।"—বলিয়া দাশুর-মা অগ্রসর হইল। দুই পা গিয়া বলিল —"ভট্চায্যি বামুনের বাড়ি, তোমাদের সবই একটু বাড়াবাড়ি বাপু তা হক্ কথা বলব। আমি নে এসলেই যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত!"

লোক পাইয়া শৈলেনের একটু ভূতের চর্চা করিবার ইচ্ছা হইল; কথাবার্তাও হইতে থাকে, তাহা ভিন্ন ভয়ের সম্ভাবনা না থাকায় ভয়ের কথা কহিতে লাগেও ভালো। শৈলেন প্রশ্ন করিল—" 'এখানে অসময়ে'—তুমি অমন কেন বললে দাশুর-মা?—অসময়টা কিসে হল? ও-বাড়িটায় বুঝি রাত্তিরে যাঁদের নাম করতে নেই তাঁরা থাকেন?—আর সন্ধ্যে হলেই..."

"ওমা থাকেন না? সাঁতরায় একথা কে না জানে গো?"—বলিয়া দাশুর-মা কাহারা কবে ও বাড়িতে ভাড়ায় আসিয়াছিল, তাহাদের কি অনিষ্ট হইয়াছিল, তাহার একটা দীর্ঘ ইতিহাস দিয়া গেল।

শৈলেন দাশুর-মা'র গায়ের কাছে খুব ঘেঁষিয়া হন্-হন্ করিয়া চলিতেছিল, ওদিকে পাড়ার মধ্যেও আসিয়া পড়িয়াছে, সব শুনিয়া বলিল—"একটা কথা বলব দাশুর-মা —দোষ হবে না তো?"

"কি কথা? গঙ্গাতীরে আবার দোষ কি?"

"আমায় কে যেন ডাকলে এখানটায়, ঐ বাড়ি থেকে।"

দাসুর-মা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল, বলিল—"সব্বরক্ষে। উত্তুর দ্যাওনি তো?"

"হুঃ, আমি উত্তর দেবার ছেলে কিনা। জানি না নাকি যে তিন বার না ডাকলে উত্তুর দিতে নেই?"

"ভাগ্যিস্!—দিলে আর দেখতে হোতনি।"

বাড়ি ফিরিয়া দেখিল বাবা আসিয়াছেন। শশাঙ্কর শয্যার পাশে বসিয়া ঠাকুরমা, মনোমোহিনী পিসিমা, খেতন দাদা প্রভৃতির সঙ্গে গল্প করিতেছেন, দাদাও অনেকটা সুস্থ, বোধ হয় বাবাকে পাইয়াই। বিপিনবিহারী শৈলেনকে কাছে টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলেন —"পেয়েছিলি শুনতে?—তোকে চরখির কাছে যে ডাকলাম গাড়ি থেকে!"

শৈলেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—পাইয়াছি; তাহার পর কত পুরনো কথার সঙ্গে সদ্য অর্জিত অভিজ্ঞতা মিশিয়া তাহার বুকটা আলোড়িত করিয়া দিল—"মার কাছে যাব

BanglaBook.org

আমি”—বলিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাবা যে-কটা দিন রহিলেন কী আনন্দেই যে কাটিল বলিয়া শেষ করা যায় না। দুই বৎসরের যত অপূর্ণ সাধ প্রাণ ভরিয়া মিটাইল—খাওয়া-পরা সব দিক দিয়াই ; বরং এমন অনেক কিছু হাতে আসিল যাহার সে কল্পনা করিতে পারে নাই। শুধু একটা সাধ মিটানো হইয়া উঠিল না। চেষ্টা করিয়াছিল, এবং তাহার আলোচনাটা বহু দিন ধরিয়া পরিবারে চালু ছিল বলিয়া এখনও মনে আছে শৈলেনের—

স্টেশনে যাইবার দুইটা পথ ছিল, একটা পথ দুই দিকে গোঁসাইদের বাড়ি রাখিয়া গঙ্গার ধার দিয়া চলিয়া গিয়াছে। দ্বিপ্রহরের অলস অভিযানে যখন শৈলেনের স্টেশনে যাইবার ইচ্ছা হইত, এই পথ দিয়াই যাইত। জমিদার গোঁসাইদের বড় বড় অট্টালিকাগুলার মধ্যে অসীম বিস্ময় ছিল, বিশেষ করিয়া দুপুরে সেগুলা যখন নিস্তব্ধ হইয়া থাকিত। বাঁদিকে বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাইত গঙ্গা—জাহাজে, নৌকায়, ওপারের লাট-সাহেবের বাগানে, আর জোয়ার-ভাঁটার হ্রাস-বৃদ্ধিতে নিত্য নূতন ; এই পথটাই ভাল লাগিত। কিন্তু এই পথে সব চেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল সম্পূর্ণ এক অন্য জিনিস। রাস্তাটা যেখানে ঘুরিয়া খালের উঁচু পুলটা পার হইয়াছে সেইখানে একটু ভিতরে গিয়া ডানদিকে একটা দোকান। খোলার চালের নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন দোকান, ধুঁয়ায় ভিতরকার চাল, দেওয়াল সব অন্ধকার ; সেই অন্ধকারে মাঝখানটিতে অয়েলক্লথ-বিছানো টেবিলের উপর কতকগুলি আর আর দ্রব্যের মধ্যে একটা এনামেলের থালায় থাকিত আস্ত ডিমের কি অদ্ভুত ‘মেওয়া’। টকটকে লঙ্কার টুকরার সঙ্গে খুব গাঢ় উবড়া-খাবড়া কি এক রকম মসলা লাগানো। এদের নধরকান্তি আর সোনার রঙে সমস্ত দোকানটা যেন আলো করিয়া আছে। কি যে ছিল ওগুলার মধ্যে—এত জিনিসের মধ্যে কোনটাই শৈলেনের কল্পনাকে অমন করিয়া উদ্রিক্ত করিতে পারিত না। বিধবার বাড়ি, ডিম আসিত না বলিয়া ডিমটাই একটা অমূল্য সম্পদ্‌ ছিল, তাহার উপর আবার ঐ রূপ। অনাচারের ভয়ে দুই ভাইয়ের কাহারও হাতেই পয়সা দিতেন না ঠাকুরমা। যদি বা কোন রকমে দু-একটা পয়সা আসিল তো ও-ধরনের অসম্ভব রকম মূল্যবান্‌ জিনিসের কাছে ঘেঁষিতে সাহস হইত না। আরও না ঘেঁষিবার কারণ ছিল —দোকানদারের চেহারা এবং তাহার খদ্দেরের চেহারা। কেমন যেন অদ্ভুত গোছের। ছিদাম ময়রা বা সহদেব মুদির দোকানের সামনে যেমন স্বচ্ছন্দে গিয়া দাঁড়ানো যায় এ যেন সেরকম নয়—লোভের পাশে পাশে গা'টাও ছমছম করে। কিন্তু সে অসম্ভব লোভ—এদিক্‌ দিয়া যাইলেই পুলের রেলিঙে ঠেস দিয়া শৈলেন সতৃষ্ণ নয়নে সেই হলদে-হলদে ডিমের স্তূপের পানে চাহিয়া থাকিত। কী অপরূপই না স্বাদ হইবে! ভাঙিলে ভিতর থেকে যে সোনার গুঁড়ার মতো বাহির হয়, এ ডিম ভাঙিলে কি সেই রকমই বাহির হইবে, না অপূর্ব অপূর্ব আরও কিছু? বইয়ে হাঁসে সোনার ডিম দিত বলে যে কাহিনী পড়িয়াছে, সে কি এই ধরনের কিছু একটা, না আরও অদ্ভুত? তাই যদি হয় তো কল্পনা সেখানে পৌঁছুতে পারে না।...লোকেরা আসে, বসে, কেনে, খায়—শৈলেনের মনে হয় যেন কল্প-লোকের জীব সবাই। পকেটে পয়সা থাকিলে এক একবার লুব্ধ আবেগে মুঠাইয়া ধরে, পা বাড়াইতে ইচ্ছা হয়, তাহার পর সাহস ভাঙিয়া পড়ে। কম বয়সের ছেলেও যে একটা নাই—যেমন ছিদামের দোকানে থাকে। ...কত রকম কি ভাবিয়া, কতবার পা উঠাইয়া এক সময় খুব বড় একটা দীর্ঘশ্বাস

BanglaBook.org

ফেলিয়া চলিয়া যায়...প্রায় দুই বৎসর এই করিয়া চলিতেছে।

আসিয়া অবধি বিপিনবিহারীর আদরটা যেন শৈলেনকে ঘিরিয়াই বেশি। শশাঙ্কর উপরও আছে, তবে শৈলেনকে জিজ্ঞাসাবাদ বেশি ; সে যাহা চাহিতেছে তাহার এক-আধটা শশাঙ্কর জন্য আসিতেছে, এক একটি জিনিস বোধ হয় বাদ পড়িয়াও যাইতেছে শশাঙ্কর ভাগ্যে। খাওয়ার জিনিসের সম্বন্ধে তো কোন কথাই নাই...শশাঙ্কর পেটই খারাপ। দাদার উপর একটু দয়া হইতেছিল, তবে লাগিতেছিল মন্দ নয়—যাই হোক, স্নেহেরও তো একটা বিজয়দর্প আছে...আমায়ই বাবা বেশি ভালবাসেন।

পরে কারণটা জানিয়াছিল ; শৈলেনকে অবশ্য বলিয়াছিলেন দুইজনেই যাইবে পাণ্ডুল, কিন্তু লইতে আসিয়াছেন শুধু শশাঙ্ককে।

চার-পাঁচ দিন পরে বলিলেন—"কেমন শৈলেন, সব তো হল, ছবির বই, জামা, জুতো, মার্বেল, লাট্টু—আর কিছু চাই নাকি! এই বেলা বল।"

পাণ্ডুলে বাবা ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী, এত সাধিয়া প্রশ্ন করা তো অসম্ভবই তাঁহার পক্ষে, আবদার করিয়া উত্তর দেওয়াও শৈলেনের সাহসে কুলাইত না। এখানে বহু দিন পরে ছেলেদের দেখিয়া বাবাও অন্য রকম হইয়া গেছেন, শৈলেনেরও বিদেশে কেমন একটা মুক্ত ভাব—যে-কথাগুলো মায়ের মধ্যস্থতা ভিন্ন হইতে পারিত না, এখন বেশ বাবাকে অনায়াসে বলা যাইতেছে।...মায়ের অভাবে বোধ হয় ছেলেরা বাপের মধ্যে মা আর বাপ উভয়কেই পায়।

শৈলেন বলিল—"একটা জিনিস খাব বাবা।"

মনোমোহিনী দেবী আর নিস্তারিণী দেবী কাছেই ছিলেন, দুইজনেই হাসিয়া উঠিলেন। মনোমোহিনী দেবী বলিলেন—"ও পেট-সর্বস্ব দামোদর—ওর আবার জামা, বই!"

বিপিনবিহারী হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"জিনিসটা কি শুনি?"

সে-সময় আর কোনমতেই বলিতে পারিল না শৈলেন। লজ্জিত হইয়া প্রথম সুযোগেই কোথায় গা-ঢাকা দিল।

বিকালবেলা বিপিনবিহারী একা শৈলেনকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। ছিদামের দোকানের কাছাকাছি গিয়া, পিঠে হাত দিয়া মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন —"কি খেতে চাইছিলি রে শৈলেন? বল্, লজ্জা কি? খাওয়ায় লজ্জা মেয়েছেলেরা করে, বেটাছেলে খুব খাবে, খুব হজম করবে, খুব হুটোপাটি করবে—তবে তো। তোদের বয়সে আমি খুব খেতুম, তাই তো আর একটু যখন বড় হয়েছি, গঙ্গা পেরিয়ে গেছি, না বিশ্বাস হয় ছিদাম ময়রাকে জিগ্যেস্ করবি চল্। একবার জাহাজের মুখে পড়ে কি রকম বেঁচে গিয়েছিলাম—সে গল্প বলব আজ তোকে। খাবি, তার আবার লজ্জা!...ছিদামের দোকানে কিছু?"

শৈলেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

"তবে?"

"গোঁসাইপাড়ার রাস্তায়।"

বাপবেটায় গোঁসাইপাড়ার রাস্তা দিয়া চলিলেন। পাড়ায় ঢুকিতেই একটা বেশ বড় দোকান, বিপিনবিহারী কাছে আসিয়া প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, শৈলেন আস্তে আস্তে বলিল—"এ দোকানে নয় বাবা।"

BanglaBook.org

এই দোকান হইতেই গোঁসাই-জমিদারের দেউড়িতে খাবার-টাবার যাইত বলিয়া মনে পড়ে বিপিনবিহারীর। তাহা হইলে আরও ভালো দোকান হইয়াছে নাকি ইদানীং?

প্রশ্ন করিলেন—“এ দোকানে নেই সে জিনিস?”

শৈলেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

কৌতূহল হইল—ছেলের উঁচু-নজর দেখিয়া মনে মনে প্রীতও হইলেন। রাস্তার মোড় ফিরিয়া শৈলেন বাবার সঙ্গে পুলের উপর উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া কুণ্ঠিত ভাবে মুখ নিচু করিল। বিপিনবিহারী একটু বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—“এখানে দাঁড়ালি যে?”

শৈলেন দোকানের পায়ে-হাঁটা রাস্তাটা যেখান থেকে কালের পাশে-পাশে নামিয়া গিয়াছে সেইখানে গিয়া আবার মাথা নিচু করিয়া দাঁড়ইয়া পড়িল।

রাস্তার ওপারে গঙ্গার ধারে সুরকির কল, এদিকে খালের ধারে নোংরা বস্তির মতো খানিকটা—এমন তো কোন দোকানই চোখে পড়ে না যাহার জন্য সাঁতরা থেকে এই মাইলখানেকের কাছাকাছি পথ হাঁটিয়া আসা চলে। বিপিনবিহারী বলিলেন—“কৈ শৈলেন, এখানে তো কোন ময়রার দোকানই...”

চোখের সামনে ডিমের গুষ্টি অত বাহার করিয়া থাকিতেও যখন বাবার নজরে পড়িতেছে না, তখন কিছু একটা গলদ আছে বলিয়া সন্দেহ হইল শৈলেনের, চুপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একেবারে থার্ড ক্লাস পল্লী, বিপিনবিহারীর গা ঘিন-ঘিন করিতেছিল, একটু বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি যেন একটু আলোকরশ্মি দেখিতে পাইলেন, প্রশ্ন করিলেন—“তুমি ঐ ডিমের কথা বলছ না তো শৈলেন?”

শৈলেনের মধ্যে তখন আর শৈলেন নাই, ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

বিপিনবিহারী শুধু বলিলেন—“বাড়ি চল, ছি!”

রাস্তায় একটি কথাও হইল না ; শৈলেন যেন একটা কলের পুতুল, কে দম দিয়া দিয়াছে—খট্ খট্ করিয়া পা ফেলিয়া চলিয়াছে।

পরে কথাটা যত পুরনো হইতেছিল সেটা লইয়া ততই হাসি হইত। বিপিনবিহারীই শাখাপ্রশাখা-যোগে বর্ণনা করিতেন—টের পাইয়াছিলেন ওটা আর কিছুই নয় ; শিশুর নির্দোষ রসনাবিকার মাত্র। সেদিন কিন্তু তাঁহার মনের অবস্থাটা অন্য রকম ছিল। শৈলেন সেটা টের পায় মনোমোহিনী পিসিমার মুখে। রাত হইয়া গেছে, বাবা, খেতন-দাদা বাহিরে গেছেন, পিসিমা শৈলেনকে ছাদে লইয়া গিয়া গলা নামাইয়া বলিলেন—“হ্যাঁ রে শৈল, তুই সুরকির কলের সামনে চাটের দোকানে ঐসব খেতে যাস নাকি? ছি-ছি ;—ওসব দোকানে কলের মজুররা নেশা করে যা-তা খায়। ওদের সঙ্গে মিশিস না তো তুই? আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর দিকিনি...দাদাকে নিয়ে সেইখানে টেনে তুলেছে গা! কী হবে, কী ঘেন্নার কথা!”

BanglaBook.org

বাবার সঙ্গে এক দিন দুই ভাইয়ে বেলে-তেজপুর বেড়াইয়া আসিল। এক দিন গেল শিবপুরে। আদরের যেন একটা মরসুম পড়িয়া গেছে। কয়দিন ধরিয়া বাবার আদর নানা দ্রব্যসম্ভারে যেন মূর্তি ধরিয়া উঠিয়াছে। মামারবাড়ির আদরটা পাওয়া গেল আবার দুই জায়গায় ভাগ করিয়া। এর পরে সামনে রহিয়াছে পাণ্ডুল। এত পাওয়ার মধ্য দিয়া দিনগুলা হইয়া পড়িয়াছে যেন একটা স্বপ্নরাজ্যের দিন ; এমন অদ্ভুত সব ব্যাপারও ঘটে জীবনে

—এত অল্পদিনের মধ্যে ঠাসাঠাসি করিয়া।

এই আনন্দ-বিস্ময়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িল মোহভঙ্গ—একেবারে যেন ঝুপ করিয়া। বৈকালে গাড়ি, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শৈলেন জানিতে পারিল তাহার যাওয়া হইবে না। বাবা অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন, তাঁহারও যাওয়ার কথা ছিল, তবে মহাদেব মাস্টার জোর করিয়া বলিলেন এ ক'টা দিন থাকিয়া যাইতে, পরীক্ষার পর একেবারে নূতন ক্লাসে উঠিয়া যাইবে। আর কুল্যে দুই মাস, দুই মাস পরেই বিপিনবিহারী নিজে আসিয়া লইয়া যাইবেন। আরও যাহা যাহা ইচ্ছা কিনিবার জন্য দুইটা টাকা দিলেন, যতক্ষণ রহিলেন অনেক বুঝাইলেন। শৈলেন মুখ ভার করিয়া রহিল। যাহা এত সত্য ছিল আশায়-আহ্লাদে, তাহা হঠাৎ এত মিথ্যা কি করিয়া হইয়া গেল তাহার যেন বোধগম্যই হইতেছে না ; কি ক্ষতি হইতেছে যেন বুঝিতেই পারিতেছে না। তাহার পর জামা-জুতা পরিয়া বইয়ের পুঁটুলি হাতে শশাঙ্ক যখন সবাইকে প্রণাম করিয়া বাবার পিছনে পিছনে উঠানে নামিল সে পিসিমার কোল থেকে একেবারে আছাড় খাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—"ও মাগো, আমি একলা থাকতে পারব না, দাদাকে রেখে যেতে বল!..."

॥ ৯ ॥

দাদা চলিয়া যাইতে সাঁতরা যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। দাদা যে নিত্যসঙ্গী ছিল এমন নয়, তাই যত দিন ছিল, ততদিন বুঝা যায় নাই। যখন পাণ্ডুলে চলিয়া গেল তখন অভাবটা বুঝা গেল। শৈলেনের এমনই বাড়িতে মন বসিত না, আরও যেন কোন আকর্ষণ রহিল না। দাদার চলিয়া যাওয়া, তাহার না যাওয়া, বাবার এই ব্যবহার—এই চিন্তা লইয়াই সারা দুপুর টং-টং করিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো তাহার হইয়া উঠিল বিলাস। পাঠাশালা কামাই হইতে লাগিল, গুরুমশাইয়ের নিকট মার খাইতে লাগিল—জীবনটা হইয়া উঠিল যেন ছন্নছাড়া।

অভিমানে পিতার উপর মনটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল...আর কখনও তাঁহার কাছে কিছু চাহিবে না, তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহাও স্পর্শ করিবে না—কেন প্রবঞ্চনা করিয়া তিনি রাখিয়া গেলেন?...আশ্চর্য, এই মনের ভাবটা গিয়া একদিন দাদার উপরও পড়িল—যখন কয়েক দিন দাদার বিচ্ছেদটা সহনীয় হইয়া আসিল। এটা বোধ হয় এক ধরনের ঈর্ষাই ; কিন্তু শৈলেন মনকে বুঝাইল দাদাও এই চক্রান্তের মধ্যে ছিল, নিজে সব জানিত অথচ শৈলেনকে বলে নাই। বলিলে শৈলেন পলাইয়া গাড়ির এক কোণে লুকাইয়া বসিয়া থাকিতে পারিত তো?...ঠাকুরমা, পিসিমা, খেতনদাদা—সবাই এই চক্রান্তের মধ্যে, শৈলেন সব থেকেই যেন আলাদা হইয়া দাঁড়াইল, সবাইকেই চিনিয়াছে সে!

ক্রমে একে একে আর সবাই বিলুপ্ত হইয়া গিয়া সমস্ত মন জুড়িয়া রহিল শুধু মায়ের মুখখানি। যেমন দীপ্ত তেমনি বিষণ্ণ সে মুখ, সমস্ত জগৎ ঘুরিয়া মাত্র ঐ একটি মুখে শৈলেন নিজের মনের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। সংসারের যত অন্যায় মায়ের উপর, আর শৈলেনের মতোই তিনি অসহায়ভাবে সহিয়া যাইতেছেন। বাবা ছেলেদের লইয়া আসিলেন—হয়তো মাকে এই রকম মিথ্যা দিয়া ভুলাইয়াই—মা শুধু বন্ধ ঘরের জানালা দিয়া চাহিয়া রহিলেন—চোখ দুইটি এখনও যেন দেখা যায়—এ শক্তি নাই যে দুই পা বাহিরে আসিয়া নিজের ছেলেদের ফিরাইয়া লইয়া যান।...বাবা ফিরিয়া গেছেন, মা

BanglaBook.org

জিজ্ঞাসা করিবেন শৈলেনের কথা—দুই ভাই যে একসঙ্গে আসিয়াছিল—বাবা এই রকমই একটা মিথ্যা বলিয়া আবার তাঁহাকে ভুলাইয়া দিবেন। মা আবার তেমনি অসহায় ভাবে কোন একটি জানালার গরাদ ধরিয়া সজল চক্ষে বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিবেন। কোন সময় হয়তো ভাবিলেন শৈলেন নাই বলিয়াই আনা হইল না, নহিলে এক ভাই আসিল, এক ভাইয়ের আবার কি হইল?—সেই তো ছোট, তাহারই তো মায়ের জন্য বেশি মন-কেমন করিবার কথা—আগে আসিবার কথা।

কোন একটা দিকে চাহিয়া চাগিয়া শৈলেনের মনটা ভরিয়া ওঠে—মায়ের দুঃখে কি নিজের দুঃখে বুঝিতে পারে না। মনে কি একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা আলোড়িত হইয়া উঠে, কিছু একটা করিতে, কিছু একটা হইতে ইচ্ছা করে। কী সে করিতে চায় ভাবে শৈলেন—ধর, একটা তার করিয়া দেওয়া হইল—শৈলেন মৃত্যুশয্যায়। কিংবা খেতন-দাদার হাতে পায়ে ধরিয়া লইয়া যাইতে বলিলে কেমন হয়?...চিন্তাটা খানিক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কল্পনাতেই নানারকম ভাঙা-গড়া করিয়া মনটা চঞ্চল হইয়া ওঠে ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন একটা মীমাংসাই হইয়া ওঠে না।

এক দিন হঠাৎ মনে হইল, ঠাকুরদাদা তো সতেরো বৎসর বয়সে পাণ্ডুলে পালাইয়া গিয়াছিলেন—এই বাড়ি হইতেই। সতেরো বৎসরের বয়সটা ঠিক কি প্রকারের জিনিস অতটা ভাবিয়া দেখিতে পারে না, দরকারও হয় না দেখিতে,—তাহার কৈশোবের শিরা-উপশিরায় পিতামহের রক্তের উচ্ছ্বাস জাগে। আর সতেরো বৎসর বয়সটা যেমন বড়, তেমনি ঠাকুরদাদা গিয়াছিলেন পায়ে হাঁটিয়া ; শৈলেন যেমন ছোট তেমনি রেলের সুবিধা আজ-কাল—একই কথা দাঁড়ায় না?—শুভঙ্করী আসিয়া যেন শৈলেনের হাত ধরেন।

দু-চার দিনের মধ্যেই বাধা-বিঘ্নের ভয় সব কাটিয়া গিয়া সঙ্কল্পটা দৃঢ় হইয়া গেল। পাণ্ডুলে পলাইতে হইবে ; ঠাকুরদাদা একদিন যে-কাজ করিয়াছিলেন, নাতির চোখে সেটা অন্যায়ও ঠেকিল না, অসম্ভবও ঠেকিল না।

একদিন দুপুরে যখন সবাই নিদ্রামগ্ন, খেতন-দাদা অফিসে, শৈলেন বাবার দেওয়া নূতন জামা আর জুতা-জোড়াটা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। টাকা দুটো তখনও নিজের কাছেই ছিল, পকেটে ফেলিয়া লইল। ওঁরা যেদিন যান, সেদিন কান্না বন্ধ করিবার জন্য ঠাকুরমা আর মনোমোহিনী পিসিমার কাছে একটা করিয়া চারি-আনি পাইয়াছিল, সে দুটাও রহিল। প্রথমটা একটু পায়ের জড়তা বোধ হইল, তাহার পর সদর রাস্তায় উঠিতে সেটা বেশ কাটিয়া গেল। পথের কথাটা আর চিন্তার মধ্যেই আসিল না ;—পরন্তু এ-সময় সে যে পাণ্ডুলে এরই বিস্ময়ের আনন্দটা তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, —সাঁতরার বাড়ি থেকে দূরত্বটা যতই বাড়িয়া যায় ততই যেন সে নিশ্চিন্ত হয়। স্টেশনের দিকে একটা ঘোড়ারগাড়ি যাইতেছিল, শৈলেন তাহার পিছনের তক্তাটাতে গিয়া বসিয়া পড়িল। এ-ব্যাপারটাতে সে বেশ অভ্যস্ত—তক্তাটায় বুক চাপিয়া পা ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া যায়, কোচম্যানকে যদি কেহ জানাইয়া দেয়, গাড়ির ছাদের উপর শপাৎ করিয়া ছিপটির দড়ি আসিয়া পড়ে, কখনও কাঁধে-মাথায় আসিয়া লাগে, কখনও কোচম্যান লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয়, শৈলেন টুপ করিয়া নামিয়া পড়ে। আজ কেমন একটু গুছাইয়া বসিতে ইচ্ছা হইল ; নূতন জামা, নূতন জুতা পরিয়াছে, তক্তার উপর উঠিয়া গাড়ির দেওয়ালে পিঠ দিয়া রাস্তার দিকে মুখ করিয়া সোজা হইয়া বসিল শৈলেন। যখন বেশ অন্যমনস্ক হইয়া গেছে,

BanglaBook.org

শপাৎ করিয়া কোচম্যানের ছিপটি হাতের উপর আসিয়া পড়িল। শৈলেন সঙ্গে সঙ্গেই লাফাইয়া পড়িল এবং উল্টা লাফানোর জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই রাস্তার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া গেল। যখন ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কোচম্যানটা চলতি গাড়ির উপর দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে হাসিতে তাহাকে আবার আসিয়া বসিতে আহ্বান করিতেছে।

চোট লাগিয়াছে। ডান হাতের কনুই এবং ডান কানের উপরটা ছড়িয়া গেছে, বাঁ হাতে ছিপটির রাঙা দাগ। রাস্তাটার এক দিকে রেল-লাইন, এক দিকে নিম্নশ্রেণীর লোকেদের খোলার বাড়ি। কোনখানে হাসি উঠিল, কেহ সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করিল—আঘাত লাগিয়াছে কিনা। শৈলেন অপ্রতিভ ভাবটা চাপিয়া অগ্রসর হইল ; কেমন যেন একটা কান্না ঠেলিয়া আসিতেছে।

স্টেশনের বাহিরে আসিয়া তাহার যেন দিশাহারা লাগিয়া গেল...বেশ বড় স্টেশন, গলি-ঘুঁজি অনেক। কোথায় টিকিট পাওয়া যায়? ছোটদের কিনিতে দেয় কি? কয় টাকা লাগিবে টিকিটে? দুই টাকাই যদি লাগে তাহা হইলে খাইবে কি? আর যদি টাকায় না কুলায়? আর একটা কথাও এতক্ষণে মনে পড়িল—একটা ছোট ছেলে টিকিট কিনিতেছে দেখিয়া কেহ যদি সন্দেহ করে—পলাইতেছে!

স্টেশনের যেখান দিয়া ঘোড়ারগাড়িগুলা প্রবেশ করে, সেইখানটিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, একটা লোক স্টেশনের দিক থেকে তাহার দিকে আসিল। কাঁচা-পাকা মোটা গোঁফ উপর দিকে ঠেলা, চোখ দুইটা একটু রক্তাভ, বেশ ষণ্ডা-গুণ্ডা চেহারা, গায়ে একটা নীল রঙের জামা। শৈলেনকে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া প্রশ্ন করিল—"কি চাঁহি তোমার খোঁখাবাবু?"

ওর উগ্রতায় সম্মোহিত হইয়া গিয়া শৈলেন মুখের পানে চাহিয়া রহিল। লোকটা আবার বলিল—"কি চাঁহি বোলো না, ডর কি আছে?"

শৈলেন বলিল—"পাণ্ডুলে যাব।"

"পণ্ডোল?—সে তো দরভঙ্গা জিলা ; আমার অপ্পন জিলা আছে। কার জন্যে যাবে?"

উগ্র-দর্শন লোকের সঙ্গে সম্বন্ধের বা আবাস-স্থানের নৈকট্য আবিষ্কার করিলে মনে এক ধরনের ভরসা আসে, বোধ হয় ভীরুতার উল্টা দিক্ ; শৈলেন গোপনীয় কথাটা বলিয়া ফেলিল—"একলা যাব।"

"অকেলা!"—বলিয়া লোকটা একটু বিস্মিতভাবে চাহিল, তাহার পর তাহার মুখের ভাবটা ধীরে ধীরে বদলাইয়া গেল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একটু কি ভাবিল, তাহার পর চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"টিকিস কাটয়েছ?"

"না, কোথায় কাটাতে হয় জানি না।"

"হুঁ,...টাকা আছে?...কো টাকা?"

"দুটো টাকা আছে।"

আবার একটু চিন্তা।

"হুঁ, এদিকে আসো তুমি।"

শৈলেনকে লইয়া ঘেরা প্রাঙ্গণটার একটা নির্জন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"দু টাকায় হোবে না, পাঁ—চটি টাকা লাগবে।"

BanglaBook.org

শৈলেন একটু নিরাশ হইয়া বলিল—"আর তো নেই আমার কাছে।" কি মনে হইল, আর চার-আনি দুইটার কথা বলিল না।

লোকটা আর একবার চারিদিকে নজর বুলাইয়া লইল, তাহার পর শৈলেনের পিঠে দুই-তিনটা লঘু চাপড় দিয়া বলিল—"হুঁ...আচ্ছা তুমি দুঃখু মৎ করো ; হামি বাকি টাকা আপনা পাশসে দিয়ে দোব। মুলুককা আদমি আছে। পাণ্ডুলের বাঙ্গালী বাবুদের ছেইলা, না? হুঁ...বাবুদের হামি চিনে।"

শৈলেনের মনে হইল যেন কত বড় এক আত্মীয় পাইয়াছে ; যেন এখনই মত বদলাইয়া ফেলিতে পারে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি টাকা দুইটি বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া দিল।

"তুমি এইখানে খাড়া থাকো ; খোবোরদর কেউ ডাকলে যাও না, কিছু বেলো ভি না, বোড়ো বদমাসের জগহ্ আছে। হামি দু'মিনিটমে টিকিস্ কিনে আসছি।"

দু মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল, বোধ হয়, দু'ঘণ্টাও কাটিয়া গেল, খানচারেক ট্রেন দুই দিক্ হইতে আসিয়া দুই দিকে চলিয়া গেল—কাহারও দেখা নাই। ছোখ দিয়া কান্না ঠেলিয়া আসিতেছে, কাহাকেও বলিতে কিন্তু সাহস হইতেছে না। ভয়ে নৈরাশ্যে কেমন যেন জড়ভরত করিয়া দিয়াছে, কেবলই নিজেকে লোকচক্ষু হইতে গোপন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আরও খানিকটা সময় কাটিয়া গেল ; টিকিট বা টাকা পাইবার আশায় নয়, পরন্তু পা উঠিতে ছিল না বলিয়াই শৈলেন দাঁড়াইয়া রহিল। ভয় হইতে লাগিল এখনই জানাজানি হইয়া যাইবে, তাহার পর যে কি হইবে সেটা মনের সে-অবস্থায় কল্পনাতেও আসিল না।

এক সময় একটা গাড়ি আসিয়া যখন নূতন লোকের ভিড় নামিল, শৈলেন নিতান্ত চোরের মতো দলে মিশিয়া বাহির হইয়া আসিল।

রেলের এ-দিকটা শহর, ও-দিকটা জঙ্গল, ঝোপ, ডোবা, এখানে-ওখানে ছড়ানো ছ্যাঁচা বেড়ার বাড়ি কয়খানা। শৈলেন লাইনের ফটক পার হইয়া হন্-হন্ করিয়া খানিকটা চলিয়া গেল, কান্না আর আটকাইয়া রাখা যায় না, কেবলই মায়ের মুখ মনে পড়িতেছে। খানিকটা গিয়া বেশ গভীর গোছের একটা ডোবা, আশে-পাশে বাড়ি নাই ; শৈলেন নারিকেল-গুঁড়ির সিঁড়ি দিয়া তাড়াতাড়ি খানিকটা নামিয়া গেল, তাহার পর বসিয়া পড়িয়াই দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল ; মুখ দিয়া শুধু বাহির হইতে লাগিল —"মগো—মাগো—ওগো মা!"

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া মনটা কতক হালকা হইল ; জলতেষ্টা পাইয়াছে, পুকুর থেকেই কয়েক আঁজলা জল পান করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল ; এবার চিন্তা আসিল ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে।

বিকাল হইয়া গেছে। এই সময় তাহার পাঠশালায় থাকিবার কথা, খোঁজ পড়িয়া গেছে নিশ্চয় ; খোঁজ পড়িয়া যাওয়ার কথায় তাহার মনটা হঠাৎ আতঙ্কে ভরিয়া গেল, এবং চিন্তার স্রোতটা ভিন্ন-মুখে ছুটিল—সবার ক্রুদ্ধ মুখ—ঠাকুরমা, পিসিমা, খেতন-দাদা, রাগিয়া সবাই কাঁই হইয়া রহিয়াছেন—পাড়ার সবাই জড়ো হইয়াছে—আজ রাতটা পোহাইলেই কাল গুরুমশাই, এত উগ্র-মূর্তি যে কল্পনা যেন থৈ পায় না।...টাকার কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পর ধরা পড়িবেই প্রবঞ্চিত হওয়ার এই অদ্ভুত ইতিহাস!

BanglaBook.org

উগ্র ভয়ের মধ্যে ফেরার পথটা বন্ধ হইয়া গেল শৈলেনের কাছে ; কয়েকটা মুহূর্ত ধরিয়া অবস্থাটা দাঁড়াইল ত্রিশঙ্কুর মতো—না ফেরার উপায় আছে, না আগে যাওয়ার সম্বল। তাহার পর আগে যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিল।

হ্যাঁ, হাঁটিয়াই যাইবে পাণ্ডুল। সঙ্কল্পটা উদ্ভব হইল অবশ্য ভয় থেকেই, কিন্তু একবার স্থির করিয়া ফেলার পর মনটা যাওয়ার আনন্দেই ভিতরে ভিতরে উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহার একটা কারণ বোধ হয় পিছনকার ভয় থেকে মুক্তি ; কিন্তু ক্রমে ক্রমে গোড়ার ভাবটাই আবার ফিরিয়া আসিল—সেই মায়ের জন্যই পাণ্ডুলে যাওয়ার সংকল্প। মাঝখানে পথের চিন্তাটা আর খুব স্পষ্ট রহিল না—আবছায়া ভাবে খানিকটা ছকিয়া লইল—ঠাকুরদাদার মতো হাঁটিয়াই যাইব—কেননা কেহ দয়া করিয়া খাইতে দিবেনই পথে—ঠাকুরদাদার চেয়ে ছেলেমানুষই তো?...ঠাকুরদাদা একদিন রাত্রে তো ছুরি দিয়া কাঁচা লাউ কাটিয়া খাইয়াছিলেন, না হয় সে-ও খাইবে। তাহা ভিন্ন সঙ্গে আট আনা পয়সা আছে তাহার ; দুই বেলা দুই পয়সার মুড়ি কিনিয়া খাইলে ষোল দিন। ঠাকুরদাদা গিয়াছিলেন পনেরো দিনে, তাহার না হয় কুড়িটা দিনই লাগুক—না হয় এক মাস—সব দিনই কি কিনিয়া খাইতে হইবে? একটু শঙ্কা বোধ হয় আছে মনের কোথাও লাগিয়া, কিন্তু ভবঘুরেপনার অভ্যাস—একটা অ্যাডভেনচারের আনন্দই ধীরে ধীরে মনটাকে পাইয়া বসিল। আর মায়ের মুখটা ক্রমেই বেশি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—হাসি-হাসি মুখটা যেন দেখা যায় সামনেই।

রেলের এদিককার রাস্তা দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল শৈলেন ; গ্র্যান্ডট্রাঙ্ক রোড, একটু ঘুরিয়া একেবারে পরের স্টেশনের ওদিকে চলিয়া গেছে। নির্জন রাস্তা, এইটাই নিরাপদ, এর পরের স্টেশনের একটু ওদিকে একটা অন্য পথে নামিয়া একেবারে লাইনের উপরে গিয়া উঠিবে, তাহার পর লাইন ধরিয়া বরাবর—বরাবর একেবারে মোকামাঘাট পর্যন্ত —তাহার পর গঙ্গা পার হওয়া — কিছু একটা ব্যবস্থা হইয়া যাইবেই ; তাহার পর আবার লাইন ধরিয়া একেবারে পাণ্ডুল।...অতটা কষ্টের পর মনটা একটা সমাধান আর অবলম্বন পাইয়া যেন হালকা হইয়া গেছে, গতি হইয়া উঠিয়াছে বেশ ক্ষিপ্র। রেল-লাইনে পৌঁছাইতে বিকালের আলো ম্লান হইয়া আসিল। পথ ছাড়িয়া শৈলেন লাইনের পাশে পায়ে-হাঁটা পথ ধরিল। দুই দিকে প্রচুর ঘর-বাড়ি, বেশ একটা ভরসার উপরই হন্‌হন্‌ করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। এক একবার দুপুরের টহলে আসিয়াছেও এদিকে, ছুটির দিনে।... নূতন জুতা, খুব বেশি অভ্যাস হয় নাই, পায়ে একটা যেন ফোস্কা পড়িয়াছে দু-এক জায়গায়।...একটা গাড়ি হুস-হুস করিয়া সামনের দিকে চলিয়া গেল। মনটা একটুখানির জন্য দমিয়া গেল। —কেমন হাত গুটাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে সব গাড়িতে! টাকা দুইটা অমন ভাবে না যাইলে সে-ও অমনি ভাবে বসিয়া যাইত না? বোধ হয় এই গাড়িতেই।...শৈলেন আবার নৈরাশ্য কাটাইয়া ওঠে—বেশ সহজেই এক রকম ; মনকে মনে করাইয়া দেয় —ঠাকুদাদা তো হাঁটিয়াই গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে দুই দিকে। আরও পা চালাইয়া দিল শৈলেন। সামনে ওটা মেঘ নাকি আকাশে? হ্যাঁ, মেঘই সামান্য একটু। শৈলেন আরও পা চালাইয়া দিল। ফোস্কাগুলায় লাগিতেছে বেশি—ফাটিয়া গেল নাকি? জুতোজোড়া খুলিয়া হাতে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।...দুই পাশের বাড়ির সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে। সন্ধ্যার

প্রদীপ জ্বলিল, শাঁক বাজিতে আরম্ভ হইল। শৈলেনের মনটা কোন এক উঁচু স্তর থেকে হঠাৎ যেন নিচুতে নামিয়া আসিল।...সাঁতরার বাড়িতে আলো জ্বলিল, শাঁক বাজিল—কে বাজাইতেছে? ঠাকুরমা না বৌদিদি?...ঠাকুরমার মুখখানা হঠাৎ শৈলেনের চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল—সন্ধ্যায় নূতন আলো ঠাকুরমার মুখে আসিয়া পড়িয়াছে, রাগ নই, বিষণ্ণ আর ভয়াকুল; চোখে জল।...মায়ের মুখ যেন আর তত স্পষ্ট নয়।

বোধ হয় বৃষ্টি হইবে। বাস্তব যেন ধীরে ধীরে ঘিরিয়া ফেলিতে লাগিল শৈলেনকে। আজ রাত্রিটা কাটাইতে হইবে কোন্ খানে?...ওর যেন এই প্রথম মনে হইল, কুড়ি দিনের সঙ্গে কুড়িটা রাত্রিও আসিবে এমনি করিয়া। একটু যেন কি-রকম মনে হইতে লাগিল, একটু একটু গা-ছমছম করা গোছের।

তবুও কল্পনা একেবারে লুপ্ত হয় নাই,—সামনে স্টেশন, রাতটা সেখানেই কাটাইবে, স্টেশন তো বেশ ভালো জায়গাই। সে স্টেশনে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে; স্টেশন-মাস্টার নিশ্চয় আসিবে সে-দিকে একবার মা একবার, নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবে আহার হইয়াছে কিনা—বাড়ি লইয়া যাইবে, খাওয়াইবে—শৈলেন ছেলেমানুষ তো?

সন্ধ্যা উৎরাইয়া গিয়া অন্ধকার হইয়াছে—সরু রাস্তার উপর দু-এক স্থানে পাশের বনের লতা-গুল্ম আসিয়া পড়িয়াছে। সামনে হাত দশ-বারো দূরে দুইজন লোক গল্প করিতে করিতে যাইতেছিল—বোধ হয় কোন কলের মজুর—তাহারা হঠাৎ রেলের বাঁধ থেকে নামিয়া ডাইনের দিকে কোথায় চলিয়া গেল। শৈলেনের অস্বস্তিটা আরও একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিল: সাহস যেন ডাকিয়া আনিতে হইতেছে।...দূরে স্টেশনের পাখার লাল-নীল আলো লি-লি করিতেছে।

হঠাৎ গুড়-গুড়-গুড় করিয়া একটা শব্দ হইল। শৈলেন ফিরিয়া দেখিল, পিছনের সমস্তটা ঘিরিয়া ঘন কালো মেঘের রাশি। চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—ভয়টা যখন আসিয়া পড়িল, মেঘের মতোই চারিদিক্ দিয়া ঘিরিয়া আসিল। এতক্ষণ একটা আবেশের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল, এখন ভয়ের দৃষ্টিতে সব কিছুরই রূপ যেন একসঙ্গে বদলাইয়া গেল। চারিদিক নিস্তব্ধ, হাওয়ার দুই-তিনটা হল্‌কা দুই দিক্‌কার বনের উপর দিয়া একটা ঝম্‌ঝম্ শব্দ তুলিয়া বহিয়া গেল; আবার সব নিস্তব্ধ, শুধু সামনে নক্ষত্রপুঞ্জ চাপা দিয়া পিছন থেকে মেঘের স্তূপ বিদ্যুতের মশাল ধরিয়া গড়াইয়া আসিতেছে। কাছে বাড়ি নাই, বহু দূরে অন্ধকারের মধ্যে শুধু গোটা দুই-তিন আলো দেখা যায়—এখানে-ওখানে ছড়ানো—সাহসের বদলে কেমন যেন ভয়েরই সঞ্চার করে। হঠাৎ সমস্ত জায়গাটা যে কি হইয়া গেল—স্টেশনের পাখার জ্বল-জ্বলে আলোগুলাও যেন মনে হইতেছে কাহাদের রক্তচক্ষু।...না; আসলে তাহা তো নয়—রেলের পাখাই তো ওটা—মনকে জোর করিয়া এটা বুঝাইয়া শৈলেন আরও জোরে পা চালাইয়া দিল, এবং কয়েক পা গিয়াই দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

একেবারে মেঘের ডাক আর উগ্রতর হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বেগে বৃষ্টি নামিল। দৌড়াইবার পথ নাই। সরু পথের উপর লাইনের পাথর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার উপর বৃষ্টি নামার সঙ্গে সঙ্গেই পথটা পিছল হইয়া পড়িল। শৈলেন একবার পিছলাইয়া পড়িয়া গেল। হাতে-পায়ে কয়েক জায়গায় জ্বালা করিতেছে; কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া আবার ছুটিল, যেন কিসের কাছে তাড়া খাইয়াছে, একটুও দাঁড়াইলে চলিবে না। মানুষের

শব্দ শোনা যেন আবার দরকার হইয়া পড়িয়াছে—শৈলেন "মাগো!" বলিয়া চেঁচাইয়া সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া ফেলিল।

তবুও ছুটিয়াছে ; আর একবার পড়ো-পড়ো হইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। মাথা নিচু করিয়া ছুটিতেছিল, সোজা হইতেই দেখিল ডান দিকে একটা চরখি। লাইন ছাড়িয়া দিল এবং চরখি ঠেলিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মাথার উপর দিয়া অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িয়া যাইতেছে, শীতে শরীরটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে ; কাঁদিতেছে জোরেই, নিজের কান্নাটাই কানে লাগিয়া নিজেকে বড় অসহায় বলিয়া মনে হইতেছে...ক্রমাগতই বাঁকিয়া ঘুরিয়া চলিতেছে রাস্তাটা, কোথা দিয়া কত দূর যে গেল খেয়াল নাই। অসম্ভব বৃষ্টির ঝাপ্‌টা, চোখ তুলিবার জো নাই। এদিকে একটু একটু থামিয়া মেঘের উগ্র গর্জন।

হঠাৎ একবার মনে হইল যেন ছাদের নল দিয়া ছড়-ছড় করিয়া জল পড়িতেছে। দৌড়াইতে দৌড়াইতে নিচু মুখেই একবার চোখ তুলিয়া দেখিল রাস্তার ধারে একটা বাড়ি, একটু মাথা তুলিয়া বুঝিল দোতলা। রাস্তার উপর সদর দরজা ; "দোর খোল!"—বলিয়া একটু জোরে ধাক্কা দিতেই দরজাটা এমন হঠাৎ খুলিয়া গেল যে প্রায় পড়োপড়ো হইয়া শৈলেন উঠানে যেন ছিটকাইয়া গেল ; কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া লইল। একটা বিদ্যুৎঝলকে ডানদিকে কাছেই একটা সিঁড়ি দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল।

কয়েকটা মুহূর্ত এই দারুণ সঙ্কট হইত পরিত্রাণ পাওয়ার কথা ছাড়া শৈলেনের মনে যেন কিছুই আসিতে পারিল না—মাথার উপর বৃষ্টি নাই, একটা বাড়িতে আসিয়া ছাদের নিচে দাঁড়াইয়াছে।—একটা অপূর্ব নিশ্চিন্ততার অনুভূতি।...তাহার পর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

সমস্ত বাড়িটা অন্ধকার, বাহিরের চেয়ে ঢের বিকট—যেন জমাট বাঁধিয়া গেছে ; নিচে, বারান্দায় কোনখানেই চার-পাঁচ হাতের ওদিকে আর কিছুই দেখা যায় না ; তেমনই নিস্তব্ধ—এক ঐ বৃষ্টির ঝর-ঝর শব্দ ছাড়া। চোখ দুইটা যথাসম্ভব আয়ত করিয়া মাথা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া চারিদিকে চাহিল শৈলেন—চক্ষু নিজেই যেন আয়ত হইয়া যাইতেছে —আরও—আরও, তাহার পর সমস্ত শরীরটা উৎকট ভয়ে ঝিম-ঝিম করিয়া উঠিল— সাঁতরায় সেই চরখির সামনে সেদিন যেমন মনে হইয়াছিল, তাহার চেয়েও যেন কত গুণ বেশি ; শৈলেন বুকের ভিতর থেকে কিসের একটা চাড়েই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রাণপণে চিৎকার করিয়া উঠিল—"কে আছ গা এ-বাড়িতে—কে...?"

তাহার পরের খানিকটা স্মৃতি একেবারে অবলুপ্ত। এর পরেই মনে পড়ে সে একটা চৌকির উপর পাতা বিছানায় শুইয়া আছে, মাথার কাছে একটি স্ত্রীলোক বেশ একটু ঝুঁকিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। মনে হইল যেন মায়ের মতো মুখটা, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া দেখিবার পূর্বেই মুখটা যেন ধীরে ধীরে মিলাইয়া আবার সব অন্ধকার হইয়া গেল।

আবার যখন চাহিল, সেই স্ত্রীলোকটি কপালে হাত দিয়া প্রশ্ন করিল—"কাদের ছেলে তুমি?"

শৈলেন, নিজের কানে যায় না এই রকম একটু নূতন রকম স্বরে উত্তর করিল —"মার কাছে যাব।"

BanglaBook.org

"যেয়ো ; এই দুধটুকু খেয়ে নাও দিকিন, লক্ষ্মীটি।"

এখন পর্যন্ত গলায় যেন স্বাদটুকু লাগিয়া আছে শৈলেনের—দুধও যে এত চমৎকার, সে এর পূর্বে জানিত না, যতটা গেল একটা আতপ্ত স্পর্শে সমস্ত অবসাদকে যেন দুই দিকে ঠেলিতে ঠেলিতে গেল।

প্রশ্ন হইল—"কোথায় মা তোমার?"

"পাণ্ডুলে।"

"কোথায় সে?"

শৈলেন গুছাইয়া উত্তর দিবার জন্য চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটি মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—"আচ্ছা তুমি শুয়ে থাকো চুপ করে। পাণ্ডুল তো? আমি জানি, তোমায় ভাবতে হবে না।"

আদেশ নয়, ক্লান্তিতেই শৈলেন আবার চক্ষু মুদিল। অনুভব করিতেছে মায়ের নরম আঙুলের মতো কয়েকটি আঙুল চুলের গোড়ায় সঞ্চালিত হইতেছে। হঠাৎ বুকে কি যেন একটা ঠেলিয়া উঠিল, আর কিছু না পাইয়া স্ত্রীলোকটির আঁচলের খানিকটাই দুই হাতে নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল, এবং একটু পরেই তাহার মুদ্রিত দুই চক্ষু বাহিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

স্ত্রীলোকটি অপর হাত দিয়া মুছাইয়া দিল, বলিল—"কেঁদো না, কি রকম মা তোমার?"

নিশ্চয় বলার উদ্দেশ্য ছিল—কি রকম মা যে এই দুর্যোগেও ছেলেকে ছাড়িয়া দেয় ; শৈলেনের কিন্তু অস্পষ্ট চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া একটি মাত্রই অনুভূতি ছিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিল—"তোমার মতন।"

আঙুলের সঞ্চালন যেন আরও কোমল হইয়া গেল, আরও মায়ের মতো শুনিতে পাইল—"শুয়ে থাকো, আমি উঠিয়ে খাওয়াব'খন ; কিছু ভয় নেই, আমি এইখানেই বসে আছি।"

সে রাত্রের আর এইটুকুই মনে পড়ে যে একবার উঠিয়া দারুণ ঘুমের ঘোরে এক রকম চক্ষু বুজিয়াই কি আহার করিয়াছিল—বোধ হয় ভাত, একটু দুধ, একটু কি মিষ্ট—মায়ের মতই কে তুলিয়া খাওয়াইয়া দিল...

জীবনে একটি যেন মস্ত বড় রহস্য হইয়া আছে—কে ছিল সে—অত মায়ের মতো?

পরের দিন খুব ভোরে ঘুম ভাঙিয়া গেল, একটু অন্ধকারই ছিল চারিদিকে লাগিয়া তখনও। রাত্রের সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো মনে পড়িতেছে—একটি স্ত্রীলোক—আদর করিল—খাওয়াইল—মায়ের মতো—কিন্তু কোথায় সে?

চারিদিকে চুন-বালি-খসা একটা ঘর, মনে হয় না যে কেহ ব্যবহার করে ; দেয়াল বাহিয়া বৃষ্টি পড়িয়াছিল—লম্বা লম্বা অনেকগুলা ধারা নিচে পর্যন্ত নামিয়া গেছে। অবশ্য বিছানাটা রহিয়াছে ঠিকই। শৈলেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি লইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া পড়িল। দুয়ার খোলা, বাহিরে আসিল।

ঘরটা দোতলায়, বারান্দার দাঁড়াইয়া দেখিল সমস্ত বাড়িটা আগাছার জঙ্গলে ঢাকা এক রকম—সামনে ভাঙাচোরা আরও দুইটা ঘর আর পোড়ো বাড়ির একটা ভ্যাপসা গন্ধ। আবার সেই কাল রাত্রের মতো সমস্ত শরীরটা ভয়ে ঝিম-ঝিম করিয়া আসিতেছে।

BanglaBook.org

তবু দিন, শৈলেন পাশের সিঁড়ি বাহিয়া নিচে নামিল—পা কাঁপিতেছে, কিন্তু কেন যেন কালকের মতো সাড়া লইতে সাহস হইতেছে না। মনকে খুব শক্ত করিয়া খোলা দরজা পার হইয়া শৈলেন রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

কে ছিল স্ত্রীলোকটি?

ছেলেবেলার সমস্ত অংশটাই, অর্থাৎ জীবনের সমস্ত রূপ-কথার যুগটা ব্যাপিয়া শৈলেনের মনে বিশ্বাস ছিল কেহ মায়ের রূপ ধরিয়া আসিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া গিয়াছিল। মা-শীতলা সাঁতরার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, খুব সম্ভব তিনিই আসিয়াছিলেন, ঠাকুরমা প্রায়ই তো মানৎ করিতেন ওদের দুই ভায়ের জন্য। মা-শীতলা যে এই রকম ভাবে ভালো করিয়া বেড়ান—সাঁতরার কত বিপন্নকে উদ্ধার করিয়াছেন, কত রুগ্ণের গায়ে পদ্মহস্ত বুলাইয়া নীরোগ করিয়া দিয়াছেন—বিশেষ করিয়া ছোট ছেলেমেয়েরা নাকি তাঁর আরও আদরের পাত্র।

উত্তর-জীবনে আরও মত বদলাইয়াছে—থিয়োজফিতে বলে যাহাকে প্রাণপণে ভাবা যায় তাহার আত্মা নাকি জীবিত অবস্থাতেই দেহরূপ ধরিয়া উপস্থিত হয়—আত্মার আকর্ষণে—স্বপ্নাবস্থায় অথবা কখনও মূল দেহকে পরিত্যাগ করিয়াও। কত অনুরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত দেওয়া আছে।...তাহার মানে, শৈলেনের আকুল আহ্বানে মা-ই আসিয়াছিলেন—পাশুলে ঘুমাইয়া পড়িয়া। আশ্চর্যের কিছুই নাই, হয়তো পূর্ণেন্দুকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন—শশাঙ্ক-শৈলেনকে স্বপ্নে দেখিয়া আসিতেন - —একথা তো প্রায়ই বলিতেন মা। আবার যেটা সহজ সম্ভাবনীয় সত্য, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেটাতে সায় দেয়, সেটাও মনে হইয়াছে।—একটা জীর্ণ, পরিত্যক্ত বাড়িতে শুধু নিজের প্রয়োজনের জায়গাটুকু পরিষ্কার রাখিয়া একটিমাত্র স্ত্রীলোক কালাতিপাত করিতেছে—বাংলা দেশে এ-দৃশ্য বিরল নয়; সধবা কি বিধবা, ঠিক বয়স কতটা আন্দাজ, মনের সেরূপ অবস্থায় শৈলেনের নিশ্চয় ঠাহর করা সম্ভব ছিল না। মায়ের কথাই সমস্ত মন জুড়িয়া ছিল, অবিরাম মায়ের সান্নিধ্যই কামনা করিতেছিল, তাই যাঁহাকে পাইল সেই স্বল্পালোকিত ভাঙাচোরা ঘরটিতে, সেই ক্ষীণ চৈতন্যের মধ্যে, তাঁহাকেই মা বলিয়া মনে হইয়াছিল, বরং অন্য কেহ বলিয়া মনে হওয়াই অসম্ভব ছিল এক-রকম।...সকালে দেখিতে পায় নাই—সেটা তো কিছুই নয়—এইসব স্ত্রীলোকেরা ধর্মকে অবলম্বন করিয়া দিনাতিপাত করে, হয়তো গঙ্গাস্নান করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন। বেশ মনে পড়ে সেদিন একটা যোগ ছিল; না থাকিলেও ক্ষতি ছিল না।...আরও কত কি হইবার সম্ভাবনা আছে—স্ত্রীলোকটি হয়তো স্থায়িভাবে থাকে না, শহরে থাকে—খাজনা-পত্র আদায় করিতে বা ক্ষেতের শস্য বা বাগানের ফলমূল সংগ্রহ করিতে পুরনো, পরিত্যক্ত বাস্তু-ভিটায় আসিয়াছিল, একা মানুষ—নিজেই সব করিতে হয়। হয়তো বা চাকর-বাকর কেহ ছিলও—নিচে, অন্য কোনও ঘরে। কতরকম কি হইতে পারে—নিতান্ত প্রাকৃতিক নিয়মেই।...কিন্তু ভালো লাগে না সত্যের এত উজ্জ্বল আলোক। ছেলেবেলার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতাকে ছেলেবেলার স্বপ্নালু দৃষ্টিতে দেখিতেই ভাল লাগে—বেশ কেমন মা সমস্তটির কেন্দ্রগত হইয়াছিলেন। মাকে সন্তান শিশু হইয়া দেখিতে চায়—তা যত বয়সই হোক না কেন। বাহিরে আর পাঁচজনের মধ্যে নিশ্চয় বিসদৃশ বোধ হয়; কিন্তু নিজের অন্তরে এই লাগে ভালো।

সাঁতরার বাড়িতে আসিয়াই শৈলেন শয্যাগ্রহণ করে। কঠিন অসুখ—জ্বর, ব্রঙ্কাইটিস, আরও নানা রকম জটিলতা। তৃতীয় দিবস হইতে চৈতন্য হারায় ; যখন জ্ঞান হইয়াছে একটু, দাদা বা মায়ের কথা লইয়া প্রলাপ বকিয়াছে। পাঁচদিন এইভাবে কাটার পর যখন একটু চিনিবার বুঝিবার মতো অবস্থা হইল, দেখে চৌকির পাশে বাবা বসিয়া আছেন। আরও দিনসাতেক পরে আরোগ্যলাভ করিয়া শৈলেন বাবার সঙ্গে চলিয়া গেল।

॥ ১০ ॥

বিপিনবিহারী শৈলেনকে লইয়া পাণ্ডুলে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিন পরের কথা। বিকাল থেকে বৃষ্টি নামিয়াছে। কোন্ ছেলে—হয়তো শশাঙ্কর সাধ হইয়াছিল খিচুড়ি খাইবার, তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। এটা-ওটা খাইবার সাধ হয় বেশি করিয়া শশাঙ্করই ; সাঁতরায় অসুখে ভুগিয়া ভুগিয়া তাহার নাড়ী অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এখানকার জল-হাওয়ায় সুস্থ হইয়া পুষ্টি চায়।

শৈলেনের সে রাত্রিটি বেশ মনে পড়ে; বাহিরে অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে। একটা জানালা দিয়া বাহিরে একটা কিসের ঝোপের জমাট অন্ধকারে অসংখ্য জোনাকি দেখা যায়—সবাই একসঙ্গে আছে বলিয়া ভরসার সঙ্গে একটা নিরর্থক ভয়ের ভাব মিশিয়া চমৎকার লাগিতেছে। এবারে দেশ থেকে বাবা একটা নূতন ধরনের টেবিল-ল্যাম্প কিনিয়া আনিয়াছেন, সেইটা জ্বালা হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল আলোকে ঘরটা ভরিয়া গিয়াছে। এক দিকে আছেন বাবা, দুই পাশে শশাঙ্ক আর শৈলেন ; সামনের দিকে বসিয়াছে হরেন, পূর্ণেন্দু ; হরেনের মুখখানা স্বভাবত রক্তাভ, ভোজনের তৃপ্তিতে আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। সামনে মা হাতে একটা রেকাবি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন ; কি সব গল্প হইতেছে।

এখন, যখন দৃশ্যটি স্মরণ-পথে উদয় হয়, শৈলেনের সারা মনটা একটা পূর্ণতার ভাবে ভরিয়া ওঠে। কৈশোরের মন নিশ্চয় স্পষ্টরূপে ভাবগ্রাহী ছিল না, তবু একটা কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাতে ঐ ধরনের একটা কিছুর আভাস ছিল বলিয়া মনে হয়। একটা কি হাসির কথা হইয়া গেছে, সবার মুখে প্রসন্নতার জেরটা তখনও লাগিয়া আছে ; শৈলেন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"আহা, অহি যদি থাকত বেশ হত, না মা?"

অহি একেবারে শয্যা-ধরা, উঠিবার সামর্থ্য নাই।

বেশ মনে পড়ে, মায়ের মুখটা অত আলোর মধ্যেও যেন ম্লান হইয়া গেল। দাদার এইসব বৈসাদৃশ্যের চেতনাটা ছেলেবেলা থেকেই খুব প্রখর, নিচু মুখেই ঘাড় বাঁকাইয়া নীরব তিরস্কারে শৈলেনের মুখের পানে চাহিল। মায়ের মুখ আর দাদার দৃষ্টি—এই দুই মিলাইয়া শৈলেন বুঝিল কথাটা ভুল হইয়া গেছে।

বাবা সামলাইয়া লইলেন ; অবশ্য নিজেও একটু কি-রকম হইয়া যাইবার পর ; প্রশ্ন করিলেন—"একটা মজার কথা শুনেছ গা?"

মা প্রতিপ্রশ্ন করিলেন—"কি কথা?"

বাবা বলিলেন—"শৈলেন সেদিন দেশে পাণ্ডুল খুঁজতে বেরিয়ে যখন অজ্ঞান হয়ে

BanglaBoi.org

গিয়েছিল তখন...কি বলেছে তোকে রে শশাঙ্ক?"

শশাঙ্ক বলিল—"হ্যাঁ, বলছিল মা এসে যেন..."

শৈলেন, লজ্জিত ভাবে বলিল—"যাঃ।"

মা একটু হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, আমায়ও বলছিল, আমার মতন কে যেন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলে—ওকে খাইয়ে দিলে..."

বাবা বলিলেন—"ও নাকি বলেছে তোমার চেয়ে ঢের ভালো।"

মা হাসিয়া বলিলেন—"তা কি হতে নেই?...কিন্তু তাহলে চলে এল কেন?"

"সে তো আমি নিয়ে এলাম বলে। আবার ভাবছি রেখে আসব—আরও ভালোই যখন পেয়েছে।"

মা আবার হাসিয়া বলিলেন—"তা তুমি পার। না বাপু, মন্দ মাকেই ঘেরে-ঘুরে থাকুক সব, দুটো বছর যা করে কেটেছে, ঠাট্টাতেও ভয় হয়।...শৈল, তোকে আর একটু পায়েস দেব?"

বাবা একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ওর দেশের গর্ভধারিণীর ভয়ে যে তুমি সদ্য সদ্য ভালো হয়ে উঠছ ওর কাছে!"

অহির উল্লেখের বেদনাটুকু কাটিয়া গিয়া আবার পূর্ণতার রূপটি প্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় শোবার ঘর থেকে খঞ্জনী হন্তদন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিল—"হে দুলহীন, দৌড়ু!—অহি বউয়াকে দেখু!"

সঙ্গে সঙ্গেই ঘরের হাওয়া যেন বদলাইয়া গেল। মা ব্যাকুল, অসহায়ভাবে বাবার পানে চাহিলেন, যেন একটা উৎকট সুনিশ্চিত বিপদের সম্মুখীন হইতে পা উঠিতেছে না। বাবা ক্ষণমাত্র তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন—"এসো, দেখি।"

দাওয়াতেই একটা বালতি ছিল, প্রায় ছুটিতে ছুটিতেই একটা কুলকুচি করিয়া শোবার ঘরে চলিয়া গেলেন। শৈলেনরা চার ভাইও উঠিয়া পড়িল। মা যেন কত দিনের রুগ্‌ণার মতো নিজেকে টানিয়া টানিয়া ও-ঘরের দাওয়া পর্যন্ত গেলেন কোন রকমে—যে-কোন মুহূর্তেই মোক্ষম কথাটা যেন কানে আসিয়া যাইতে পারে; তাহার পর দাওয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চাপা গলায় কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহারা ছোট তিন ভাইয়ে বিহ্বলভাবে মাকে ঘিরিয়া বসিল, বড়কে ভগবান বোধ হয় সৃষ্টিই করেন আলাদা করিয়া একটু—শশাঙ্ক আস্তে আস্তে চৌকাঠ ডিঙাইয়া ঘরের ভিতরে গিয়া বাবার কাছে দাঁড়াইল।

প্রায় মিনিট-পাঁচেক পরে বাবা গলা বাড়াইয়া বলিলেন—"ভালো আছে, এসে বোস একটু, আমি ওষুধ দিই একটা।" সঙ্গে সঙ্গেই রাগিয়া উঠিলেন একটু—"এ কি অলুক্ষুণে কান্না তোমার! শুধু কেঁদে রাখতে পারবে?"

খঞ্জনী ও-বাড়ি থেকে শৈলেনের জেঠাইমাকে ডাকিয়া আনিয়াছে; তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"এরকম করে যদি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে কথায় কথায়, বৌদি, তো..."

ও-বাড়ি থেকে জেঠামশায়ও উপস্থিত হইলেন, বাবা তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"সামলে উঠেছে।"

BanglaBook.org

জেঠামশাই একটু গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"আজকাল একটু ঘন ঘন হচ্ছে না?"

"হ্যাঁ, বুধবার দিন হয়েছিল, পাঁচ দিন হল।"

"তাহলে?"

"ওষুধ দিচ্ছি!"

"একবার মধুবাণী হাসপাতাল থেকে..."

শৈলেন উৎকট ঔৎসুক্যে প্রতি প্রশ্ন-উত্তরে পারাপারি করিয়া দুইজনের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতেছিল, জেঠামশাইয়ের প্রস্তাবে বাবা এমন একটু হাসিলেন যে তিনি কথাটা আর শেষ করিতে পালিলেন না।

অহির ছিল আজকাল ডাক্তারি-ভাষায় যাকে বলে রিকেট্স্। জন্ম হইতেই দুর্বল, ওর বয়স হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাড় ছিল না। যতদিন একবারে শিশুটি ছিল ততদিন আশায় আশায় ওকে লইয়া সবাই একটু যুঝিল, তাহার পর বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখা গেল ওর দেহ-মন একেবারেই সাড়া দিতেছে না, তখন নিরাশ হইয়া একেবারে স্রোতে গা ঢালিয়া দিল। কখনও এটা কখনও সেটা—এই করিয়া একটা চিকিৎসা বরাবরই চলিল বটে, কিন্তু তাহার অবশ্যম্ভাবী নিষ্ফলতায় সবাই যেন একটু উদাসীন হইয়া রহিল, শুধু অনিশ্চিত ক্ষণিকের অভ্যাগত বলিয়া তাহার উপর সবার করুণাটা ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।...আহা! দুটো পোশাক ও বেশি পরুক; খাক্ দুটো ভালো জিনিস—ডাক্তারদের মানা অত দেখতে গেলে চলে না।

ঠাকুরমা, বাবা, কাকা, কাকিমা—সবাই চরম সত্যটিকে মানিয়া লইয়াছেন; শুধু মানিতে পারেন নাই মা। অহি চিরকালটা নিশ্চয় এমন থাকিবে না— শীতটা গেলেই যখন ফাল্গুনের নূতন হাওয়া দিবে, অহি এই বয়সে যেমনটি হওয়া উচিত, হু-হু করিয়া তেমনটি হইয়া উঠিবে—কামারটুলির পড়াউয়ের বৌ বলিয়াছে।

বসন্ত গেল, পড়াউয়ের বৌ বলিল—এবারে বসন্তে যে আমের মঞ্জরী হইল না, ফাল্গুনের হাওয়াটায় তেজ নেই কিনা; তাই বলিয়া পরের ফাল্গুন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না, গরমটা কাটিয়া গিয়া একটু ঠাণ্ডা পড়িলেই শরীর ঠিক হইয়া যাইবে অহির। পড়াউয়ের বৌয়ের ব্যবস্থায় বড়হম্ ঠাকুরের পূজা দেওয়া হইতেছে নিত্য। গরম গেল, বর্ষাও শেষ হইয়া শীতের আমেজ শুরু হইল, ঠিক যে সময় গিরিবালা ভাবিতেছেন অহির শীতের জামা এবার একটু বড় করিয়া করাইতে হইবে, পড়াউয়ের বৌ আসিয়া খবর দিল, হস্ত-নক্ষত্রের দুর্জয় বৃষ্টিতে বড়হম্ ঠাকুরের নিজের চালাটি নষ্ট হইয়া গেছে, তিনি নিজেই একটু বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রামের সবাই চালাটি আবার তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে; হয় ভালোই, নয়তো বোধ হয় এ শীতটা এদিকে নজর দিতে পারিবেন না ঠাকুর। তবে পূজা খাইয়াছেন, ভয়ের কারণ নাই।...গিরিবালা লুকাইয়া পড়াউয়ের বৌয়ের হাতে দুইটা টাকা গুঁজিয়া দেন, বলেন—"এই দুটি ছিল আমার কাছে পড়াউয়ের বৌ, দেখ্ যাঁতে ঠাকুরের ঘরটা শিগ্‌গির ওঠে; কেউ যেন না টের পায় কিন্তু।"

কালচক্র আবর্তিয়া চলে। শুধু তো পড়াউয়ের বৌ-ই নয়, আরও আছে—দুখ্‌নার

খুড়ি, শনিচ্‌রার বৌ...। শ্যামার ঠাকুরমা বলে—"হে নয়কী দুলহীন, তোমরা বাঙালীরা যে কী বুঝি না বাপু। দুখ্‌নার খুড়ি জলজ্যান্ত ডাইন, অথচ তাকে নৈলে তোমাদের চলে না, ছেলে ভালো হবে কি?"...গিরিবালার মুখ শুকাইয়া আসে, কিন্তু ডাইন বলিয়াই আরও দুখ্‌নার খুড়িকে চটাইতে সাহস হয় না। খোসামোদ করেন—রীতিমতো পূজা—চাল, ডাল, আলু, নুন, যখন যেটার জন্য হাত পাতিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। মাগিটা গরিব, কিন্তু ভালোমানুষ, দুলহীনের দয়ার জন্য যথাসাধ্য গতর খাটাইয়া দিয়া যায়, অন্য কাজ না থাকিলে অহিকেই লইয়া খেলা করে। তেলের সঙ্গে হলুদ আর এক রকম মশলা মিশাইয়া 'উপটন্‌' তৈয়ার করিয়া ডলিয়া ডলিয়া মাখাইয়া দেয়, বলে—"হে নয়কী দুলহীন! ছেলেটার তুমি ও-সব ওষুধপত্র ছাড়িয়ে আমার হাতে ছেড়ে দাও দিকিন—ডলে-মলে আমি পাথর করে দেব ছেলেকে। আমার দুখ্‌নাকে দেখেছ তো? ছেলেবেলায় ঠিক এই রকমটি ছিল। ভরোসিয়ার দিদিমা ডাইন ছিল কিনা, তারই নজর লেগেছিল...আমার কাছে ডাইন! এমন 'উপটন্‌' দিয়ে ডলে-মলে দেব যে মুল্লুক ছেড়ে যেতে পথ পাবে না।..."

ডাইনের মুখের কথা, এক ধরনের সাহসও হয় একটা, তাহারই সঙ্গে আবার ভয় : মায়ের মন, ভালো বা মন্দ—কোন একটা অনুভূতিকে বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারে না। কোন একটা ছুতা করিয়া গিরিবালা ঘরের মধ্যে চলিয়া যান, তাহার পর দুয়ার বা জানলার খুব সূক্ষ্ম একটা ছিদ্র দিয়া উগ্র ঔৎসুক্যে দুখ্‌নার খুড়ির দিকে চাহিয়া থাকেন —কি রকম চোখের ভাবটা?—চাটিয়া দিতেছে না তো?—কোন তুক্‌ করিতেছে না তো? কেমন যেন সম্মোহিত হইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, কতটা সময় গেল খেয়াল থাকে না। একাগ্রচিত্তে খুব করিয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া তেল মাখাইয়া ছড়া আওড়ায় দুখ্‌নার খুড়ি—

সোনাকে কটোরামে উপটন্‌ তেল,
বউয়াকে লাগায় দেলি দশ-বিশ বের—
বাবু, দশ-বিশ বের...

আরও কত কি সব। তাহার পর ডাক দেয়—"কোথায় গো নয়কী দুলহীন! আমি যাই এবার বাপু।" অহিকে সোজা করিয়া বসাইয়া বুকের তেলটা মালিস করিতে করিতে ঝোঁকে ঝোঁকে ঠোঁট মুখ বিকৃত করিয়া বলে—"ঝাঁটা মারি আমি ডাইনের মাথায়—ঝাঁটা মারি —মুড়ো ঝাঁটা!..."

কি রকম একটা অদ্ভুত শক্তি আসে গিরিবালার মনে—ডাইনিই দুখ্‌নার খুড়ি, সেই জন্য সঙ্গোপনে ওর কার্যকলাপ দেখিয়া মস্ত বড় একটা ভরসা হয়। খোসামোদ করেন —"বড্ড ভালোবাসিস অহিটাকে, না রে দুখ্‌নার খুড়ি? দে ওকে ভালো করে, এক জোড়া শাড়ি দেব তোকে।...তোকে সর্বদাই যে আসতে বলছি তা নয়, গরিব মানুষ, নানা জায়গায় গতর খাটিয়ে খাস, সময় কোথা তোর?"

যদি দু-মুঠো ডালের জন্য আসে, দুটি চালও দিয়া দেন কোঁচড়ে; চালের জন্য আসিলে দু-মুঠা চিড়াও দিয়া দেন; বলেন—"গরিব মানুষ, তোরা দুটো খেতে পেলে আমার অহির কল্যাণ। সত্যিই তোর মন বলছে যে ছেলেটা ভালো হয়ে যাবে?"

দুখ্‌নার খুড়ি বর্ষীয়সী, গিরিবালার চেয়ে ঢের বড়, কৃত্রিম রাগের সহিত একটু ধমক দেয়, বলেন—"অলুক্ষণে ভাবনাগুলো তুমি ছাড় নয়কী দুলহীন। ফাগুন মাসটা দো-রসার

BanglaBook.org

সময়, একটু গরমটা ভালো করে পড়ুক, অহি যদি হুড়মুড়িয়ে মাথা ঝাড়া দিয়ে না ওঠে, তুমি দুখ্‌নার খুড়িকে ডেকে সাত ঝাঁটা গুণে গুণে মেরো।”

গ্রীষ্ম ভালো করিয়া পড়িতে একটা নূতন উপসর্গ দেখা দিল। এত দিন পর্যন্ত এক অতিরিক্ত দৌর্বল্য আর বুদ্ধির অভাব ছাড়া অন্য কোন দোষ ছিল না, বৈশাখের মাঝামাঝি থেকে মাঝে মাঝে ফিট হইতে লাগিল। মধুবাণী হইতে ডাক্তার আনিয়া দেখান হইল, কিন্তু কোন ফল হইল না, ফল হইবে বলিয়া ডাক্তার কোন ভরসাও দিতে পারিলেন না। বৈশাখ মাসে একবার হইল ; বিপিনবিহারী শ্বশুরকে লিখিয়া একটা ঔষধ আনাইয়া লইলেন। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষাশেষি একবার হইয়া আষাঢ় ও প্রায়-সমাপ্ত শ্রাবণ মাসটা ভালো রহিল অহি। শ্রাবণের শেষাশেষি হইতে কিন্তু হঠাৎ বাড়িয়া গেল। শৈলেন আসিল ভাদ্র মাসের গোড়ায়, তাহার আগের দিন-বারোর মধ্যে দুইবার ফিট হইয়া গেছে অহির, আবার পাঁচদিনের মাথায় তাহার সামনেই হইল।

গিরিবালার মোহেও ভাঙন ধরিল। মৃত্যুর এমন স্পষ্ট সূচনা দেখিয়া কি যে করিবেন বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এমন অবস্থা হইয়াছে যে আক্রমণটা হইলে তিনি আর সামনে যাইতে পারেন না, মাঝ-পথেই তাঁহার যেন পা ভাঙিয়া মুড়িয়া যায়, বসিয়া পড়েন। তাঁহাকে লইয়াই যেন একটি নূতন সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে।

বিপিনবিহারী যখন সাঁতরায় যান তখন অহির এ-রকম ভাবটা ছিল না। নূতন চিকিৎসায় শ্রাবণ মাসটা বরং ভালই ছিল এক হিসাবে, নহিলে তিনি মাকে লইয়া আসিতেন। আসিয়া অবস্থা দেখিয়া তিনি তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য চণ্ডীচরণকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

আয়োজনের মধ্যে দিয়া মৃত্যু যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল গিরিবালার কাছে। একটা ভীষণ দ্বন্দ্ব চলিয়াছে মৃত্যুর সঙ্গে। আতঙ্ক, অথচ প্রতিক্ষণেই তাহার পদশব্দ শোনা যাইতেছে নিকট থেকে আরও নিকটে। তাহার পর ওর ছায়াও যেন স্পষ্ট দেখা যায়। অহিকে রাখা যাইবে না? কতবার শুনিয়াছেন মৃত্যুর পথ কেহ অবরোধ করিতে পারে না, দেখিয়াছেনও ; কিন্তু আজকের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় কথাটা যে কী উৎকট সত্যের রূপ গ্রহণ করিয়াছে বলা যায় না। কী যে মনে হইতেছে ধরা যায় না, কী যে করিতে হইবে বোঝা যায় না। মাঝে-মাঝে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন ওঠে মনে—আজ এই বৃহস্পতিবার —আসছে বৃহস্পতিবার অহি কি আছে বাড়িতে?...যদি না থাকে?

প্রতিদিন একটু বেশি করিয়া স্বল্পবাক্‌ হইয়া উঠিতেছেন গিরিবালা।

রৈয়াম থেকে ছোট-জা আসিলেন। গিরিবালা বলিলেন—“তুই এ-দিকটা দেখ্‌ বৌ, আমার বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছে কথায় কথায়; অহির কাছে থাকি আমি।...ওকে যাবে না বাঁচানো?—তোর কি মনে হয়?”

“বাঁচবে বৈকি দিদি। ছি, ও কি অলক্ষুণে কথা?”

খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার জায়ের পানে চাহিলেন—সেই প্রবঞ্চনার ভাষা,—আজ কয় বৎসর ধরিয়া দুখ্‌নার খুড়ি, শ্যামার ঠাকুরমা, আরও সবাই যাহা ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে—ও-বাড়ির জা পর্যন্ত, এমন কি স্বামী পর্যন্ত বাদ দেন নাই। গিরিবালা কিন্তু সে লইয়া কিছু বলিলেন না ; “তুই দেখ্‌ এ-দিক্‌টা বোন”—বলিয়া অহির কাছে গিয়া বসিলেন।

BanglaBook.org

শুক্রবার সন্ধ্যায় আর একবার ফিট হইল। গিরিবালা অস্বাভাবিক কণ্ঠে বেশ জোরেই ডাকিয়া উঠিলেন—"ছোট বউ!"

আসিলে অজ্ঞান অহিকে দেখাইয়া বলিলেন—"দেখ্, এইরকম করে দেয়!"

—যেন কোন্ অমোঘ, ক্রূর অদৃশ্য শক্তির বিরুদ্ধে নিষ্ফল অনুযোগ করিতেছেন —"এই রকম করে দেয়!"

শশাঙ্ক ছুটিয়া বাহির হইতে বিপিনবিহারীকে ডাকিয়া আনিল, ও-বাড়ি থেকেও সবাই আসিলেন। ভালো হইয়া গেলে বেটাছেলেরা সব চলিয়া গেল, ছোট-জা প্রশ্ন করিলেন —"একটু হরির মাটি এনে ঠোঁটে দিয়ে দিই দিদি?"

যেন কত দিনের ক্লান্তির জের টানিয়া গিরিবালা বলিলেন—"দিবি দে,...কিছু হয় না।"

শুক্রবারে রাত্রি দুপুরে আর একটা আক্রমণ হইল, তাহার পর শেষ রাত্রিতে শেষ আক্রমণ।

অহির মৃত্যু ছাপাইয়া শৈলেনের মনে পড়ে মায়ের শোকের মূর্তি। এইটিই যেন সে-দিনের মুখ্য ঘটনা। সবাইকে কাঁদিতে দেখিল, নিজেও কাঁদিয়াছিল কম নয়; কিন্তু সব চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তাঁকে যিনি মোটেই কাঁদেন নাই। কোল থেকে অহিকে লইয়া গেল, শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন মা—সমস্ত উঠানটায় যতক্ষণ দেখা গেল, চোখ ফিরাইয়া। বাবা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে যাইতে যাইতে ও-বাড়ির জেঠাইমাকে বলিলেন —"ওটাকে আগে কোন রকমে কাঁদাও বৌদি, নয়তো পাগল হয়ে যাবে।"

সবাই ঘিরিয়া বসিল, মা দাওয়ার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন, কোনমতেই কাঁদানো গেল না! আশ্চর্য ব্যবস্থা!—জাতক যখন জন্মাইবে, তাহার নিজের কাঁদা চাই, তাহার যখন মৃত্যু তখন কাঁদা চাই অপর সকলের, নইলে উভয়ত্রই গোলমাল। জীবন-মৃত্যু যাহার ক্রীড়নক তাহার রসজ্ঞানের বলিহারি দিতে হবে বৈকি!

বৈকালে নিস্তারিণী দেবী আসিয়া পড়িলেন; নিশ্চয় বধূর অবস্থার কথা শুনিয়া ইচ্ছা করিয়াই একটা আঘাত দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন— "ও বৌমা, আমার অহিকে কোথায় ভাসিয়ে দিলে?..."

"মাগো, রাখতে পারলাম না!"—বলিয়া গিরিবালা তাঁহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িলেন।

কান্না নামিল।

মায়ের আলোচনা হইলেই—বিশেষ ভাবেই হোক বা সাধারণভাবেই হোক, প্রথমেই কি করিয়া দুইটি ছবি শৈলেনের চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে—রুগ্ণ অহি কোলে, তুলসীমঞ্চের মাটি খাওয়াইয়া মা এ-দিকে চোখ ফিরাইতেই মুখে অস্তমান সূর্যের রাঙা রশ্মি আসিয়া পড়িল। আর এই দৃশ্য—অহিকে লইয়া গেল, শুষ্ক উদাস দৃষ্টিতে মা চাহিয়া আছেন।

মা যেন আগে বেদনা, তাহার পর আনন্দ।

BanglaBook.org

॥ ১১ ॥

নিস্তারিণী দেবীকে গঙ্গার তীরে মরিবার আশাটা আপাতত ত্যাগ করিতে হইল, শোকটা গিরিবালার এমন ভাবে লাগিয়াছে যে রীতিমতো চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। শরীর তো ভাঙিয়া গেছে, তাহার অতিরিক্ত নিজের উপর কেমন একটা অবিশ্বাস আসিয়া গেছে যে, শাশুড়ী চলিয়া গেলে তিনি আর কোন ছেলেকেই বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন না। শাশুড়ী দেখিলেন এটা তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিবার ভান মাত্রই নয়, সত্যই দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনটা দেহের চেয়েও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, এ-ভাবটা না গেলে তাঁহার পাণ্ডুল ছাড়া চলিবে না।

এক হয় বধূকে যদি বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে তিনি সাঁতরায় ফিরিয়া যাইতে পারেন। এমন একটা শোকের পর করা উচিতও ব্যবস্থা, একটু অন্যমনস্ক করিয়া দেওয়া নিতান্ত দরকার ; কিন্তু এদিকে পাণ্ডুলের চাকরি লইয়া জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, হঠাৎ কিছু যদি একটা হইয়া যায় তো আশ্চর্য নয়, এ-অবস্থায় বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকাটা সমীচীন নয়। আরও একটা ব্যাপার হইয়াছে—বিপিনবিহারী দ্বারভাঙ্গায় কয়েক বৎসর পূর্বে যে একটু জমি কিনিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে ধীরে-সুস্থে দুইখানি ঘর তুলিতেছিলেন, এখন সাঁতরায় ছেলেদের পড়ার বন্দোবস্ত টিকিল না দেখিয়া দ্বারভাঙ্গার কথা চিন্তা করিতেছেন। কি আকারে বন্দোবস্তটা করিবেন তাহারই খসড়া করিতেছিলেন, এমন সময় অহিভূষণ লইয়া এই বিপদটা আসিয়া পড়িল। সব ওলোট-পালোট হইয়া গেল।

এই রকম অবস্থার মধ্যে দেখিতে দেখিতে চারটি মাস কাটিয়া গেল, ক্ষেত্রের ফসল তুলিবার সময় আসিয়া পড়িল। কাজের তাড়াহুড়ার মধ্যে গিরিবালার যেন একটু পরিবর্তন দেখা দিল, মনে হইল এই ঝোঁকে তিনি শোকটাকে কাটাইয়া উঠিবেন। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে না, শোকটা ভিতরে যেন কোথায় ভাঙন ধরাইয়াছে। নিস্তারিণী দেবী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন ; মালা হাতে বধূর কাজে অল্প অল্প সাহায্য করিতেছিলেন, এবার তাঁহাকে সরাইয়া নিজেকেই সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

কেমন একটা সময় আসিয়াছে, সব ব্যবস্থাই যেন উল্টাইয়া যাইতেছে বিপিনবিহারীর, সামনেও যেন একসঙ্গে অনেকগুলা বিপদের ছায়াপাত হইয়াছে। পিতার মৃত্যুর পরে ঠিক এ-ধরনের দুঃসময় আর আসে নাই। বড়ই ব্যাকুল উদ্বেগে দিন কাটিতে লাগিল।

মাসখানেক আরও গেল তাহার পর হঠাৎ এমন একটা বিপদ ঘাড়ে আসিয়া পড়িল যাহা ছায়াপাতও করে নাই কিঞ্চিৎমাত্র—চণ্ডীচরণের রেয়ামের চাকরিটি গেল। চাকরিটা কতকটা অস্থায়ী গোছেরই ছিল, কিন্তু বেশি আশা ছিল সেটা পাকা হইয়া যাইবারই ; বরং পাণ্ডুলের চাকরির যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে তাহাতে বিপিনবিহারী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন গেলে ওইখানেই গিয়া উঠিবেন ; ওইখানেই সূত্রপাত হইল বিপদের।

কিন্তু সুদিনের আলোও দেখা দিল এই দুর্বিপাকের পিছনেই।

চণ্ডীচরণ আসিয়াছেন খবর পাইয়া বিপিনবিহারী একটু সকাল সকালই অফিস থেকে ফিরিলেন। পা যেন উঠিতে চাহিতেছে না। দুর্বল-চিত্ত আদৌ নন তিনি, কিন্তু বিপদটা

BanglaBook.org

ভাইয়ের উপর দিয়া আসিল বলিয়াই বেশ খানিকটা মুষড়াইয়া গেছেন। নূতন উদ্যম ভাইয়ের, উঠতির সময়ই এই আঘাত, কি করিয়া যে তাঁহার শুষ্ক মুখের পানে চাহিবেন, কি বলিয়া যে সান্ত্বনা দিবেন...বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দেখেন চণ্ডীচরণ হরেনকে বুকের কাছে লইয়া দাওয়ায় বসিয়া আছেন, সামনে মা বসিয়া, দেয়াল ঘেঁষিয়া গিরিবালা দাঁড়াইয়া আছেন। কি একটা যেন হাসির কথা উঠিয়াছিল, সবার মুখেই তাহার জের লাগিয়া রহিয়াছে, চণ্ডীচরণের মুখটা একটু বেশি প্রদীপ্ত।

দাদা আসিতেই চণ্ডীচরণ নিজেকে সংযত করিয়া উঠানে নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। বিপিনবিহারী একটা তেপাই টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলেন, ভাইয়ের মুখের পানে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতেই চাহিয়া লইয়া চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"হঠাৎ কি হল?"

"ঠিক বুঝলাম না দাদা, তবে বোঝবার চেষ্টাও করিনি। মনে হয় ভালোই হয়েছে।"

জ্যেষ্ঠ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তুমি নিজে ছেড়ে দাও নি তো?"

"না, ভালোই হয়েছে এই জন্যে বলছি যে নীলকুঠির অবস্থা দিন দিন কি হচ্ছে দেখতেই তো পাচ্ছি ; অথচ না ছাড়ালে কামড়ে পড়ে থাকতে হত ; তাও আবার রৈয়ামের মতো জায়গায়..."

জ্যেষ্ঠের নমিত মুখের পানে চাহিলেন, বিরক্তির লক্ষণ আছে কিনা দেখিবার জন্য। কিছুই না দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন—"তাই বলছিলাম ভালোই হয়েছে, মা বৌদিকেও সেই কথাই বলছিলাম। আমার প্ল্যান ঠিক হয়ে গেছে।"

ভাইকে অবসাদগ্রস্ত না দেখিয়া বিপিনবিহারী একটা স্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন, তবু যে একটু বিমূঢ় হইয়া না পড়িয়াছিলেন এমন নয়, প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক করেছ?"

"ছেলেদের দ্বারভাঙ্গায় পড়াবার জন্যেই তো বাড়িটা করেছেন আপনি?—আমি সেইখানে গিয়ে ওদের ভর্তি করে দিয়ে বসি। তারপর সেইখান থেকে চাকরির চেষ্টা-চরিত্র করতে থাকি। আজকাল তো নানান দিকে সুবিধে দাদা— রেলের কত ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, দুটো জেলা-কোর্ট রয়েছে, কত রকম ওপ্‌নিং ; আর রৈয়ামে পড়ে থাকলে..."

বিপিনবিহারী চাকরটাকে ডাকিতে তামাক দিয়া গেল। কিছু না বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে হুঁকা টানিতে লাগিলেন। এতগুলা কথার উপর কোনরকম অভিমত না পাইয়া চণ্ডীচরণ চুপ করিয়া গেলেন, বার-কয়েক দাদার মুখের পানে আড়চোখে দেখিলেন মাত্র। বিপিনবিহারীর মুখটা ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে; এক সময় হুঁকাটা থামাইয়া বলিলেন—"মা, তোমার মনে আছে কিনা জানি না—বাবা এক সময় বলেছিলেন—বিপিন যদি কখনও মনে করে যে পাণ্ডুলের মতন ছোট জায়গায় পড়ে থেকে নীলকুঠির আওতায় ও বাড়তে পাচ্ছে না তো ও বেরিয়ে পড়ে সেই ভালো, তাতে দুঃখ করবার কি আছে? ...আমার দ্বারা হল না, কেননা হঠাৎ মারা গিয়ে আমার পথ বাবা নিজেই বন্ধ করে গিয়েছিলেন। আজ কিন্তু চণ্ডীর মুখে বাবার সেই কথা শুনে আমার বুকখানা দশ হাত হয়ে গেছে মা। একটা সুলক্ষণ যে আজ যে করেই হোক, তুমি রয়েছ সামনে, শুনলে বাবার মুখের কথাটা। ওকে আশীর্বাদ কর—নিজের নাম পর্যন্ত যারা ঠিক মতন বানান করতে পারে না সেই সব কুঠিয়ালদের দাবড়ানি ওকে যেন না সইতে হয় আর। অন্য যেখানেই চাকরি করবে—রেলেই হোক আদালতেই হোক—ভদ্র, শিক্ষিত সমাজ পাবে।

BanglaBook.org

তার অভাবটা যে কি, বাবা অত প্রতিপত্তির মধ্যেও হাড়ে হাড়ে বুঝে গেছেন, চিরকালটা আপসোস করে গেছেন এই নিয়ে, আর আমাদের কথা তো ছেড়েই দাও।...চণ্ডীর কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে মা! ও যদি মুষড়ে না পড়ে তো আমি কোন বিপদকেই গ্রাহ্য করি না।"

চণ্ডীচরণের ঐ একটু কথাতেই সমস্ত সংসারের উপর থেকে যেন একটা গুমোট কাটিয়া গেল। এই আকস্মিক আঘাতটা বিপিনবিহারীকে নিতান্ত অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, ওঁর গতিবিধি পূর্বের চেয়েও সবল হইয়া উঠিল, বিপদের মুখে দৃষ্টি হইয়া উঠিল সতেজ, অবসাদমুক্ত। শুধু তাহাই নয়, চণ্ডীচরণ ভাইপোদের লইয়া খেলা—বই-পড়ার এমন একটা মাতন তুলিয়া দিলেন যে বাইরের আবহাওয়াটাই বদলাইয়া গেল। সব চেয়ে পরিবর্তন হইল গিরিবালার। শ্বশুরবাড়ির প্রথম সঙ্গী এই দেওরটির উপর বরাবরই তাঁহার একটু বেশি টান ছিল, কিন্তু বিবাহের সেই প্রথম বৎসরের পর আর এত নিরবচ্ছিন্নভাবে পান নাই ; গল্পে, আলাপে, সেই প্রথম দিনের আলোচনায় তাঁহার মনের অবসাদটা যেন কাটিয়া যাইতে লাগিল, অন্তত এটা বেশ টের পাওয়া গেল যে ভিতরে যাহাই থাক, উপরটা বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে ; চেহারাও অনেকটা ফিরিয়া গেল।

চাকরি-ক্ষেত্রেও বিপিনবিহারী এতদিন একটু সন্তর্পণে কাটাইতেছিলেন, সে ভাবটা ছাড়িয়া কতকটা বেপরোয়া হইয়া উঠিলেন।

মোটের উপর চারিদিক দিয়াই জীবন যেন কতকটা স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল। এই সময় আর একটি ব্যাপার হইল যাহাতে গিরিবালার মনটা শোকের প্রভাব থেকে আর একটু মুক্ত হইয়া উঠিল।

মাঘ মাস। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ছেলেদের ব্যবস্থা করিয়া দিতে বিপিনবিহারী চণ্ডীচরণের সঙ্গে দ্বারভাঙ্গায় গিয়াছিলেন, ফিরিয়া এক্কা হইতে নামিতে চাকর খবর দিল একজন বাঙালী সন্ন্যাসী আসিয়াছেন।

প্রশ্ন করিলেন—"কখন?"

"আজ সকালে।"

"খাওয়া-দাওয়া করেছেন? দেখা-শুনো করেছিলি তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

বৈঠকখানাটা একটু ঘুরিয়া গেলেন। দেখেন দাওয়াতে একজন বৃদ্ধ বসিয়া আছেন। সৌম্য কান্তি, শুভ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডল, মাথায় দীর্ঘ শুভ্রকেশ—কাঁধের ওপর আসিয়া কুঞ্চিত হইয়া আছে। তবে সন্ন্যাসের কিছু দেখিলেন না। নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলেন —"কোথা থেকে আসছেন?"

"আপাতত পশুপতিনাথ থেকে।"

এই সময় নেপালে পশুপতিনাথের মেলা হয়। যাওয়ার অথবা ফিরিবার পথে এক-আধজন যাত্রী এখানে এক-আধদিন আটকাইয়া যায়, ক্বচিৎ দু-একজন বাঙালীও থাকে।

বিপিনবিহারী সাধারণ আতিথ্যের ভদ্রতায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোন রকম অসুবিধা হয় নি?"

"কিছু না ; আপনি জামা-টামা ছাড়ুন গিয়ে।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, এসে আলাপ-পরিচয় করা যাবে ; এখুনি আসছি।"

নিস্তারিণী দেবী ও-বাড়ি গিয়াছেন। বিপিনবিহারী প্রবেশ করিতে গিরিবালা বলিলেন —"বাইরে পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে দেখা হল?"

"কোন্ পণ্ডিতমশাই?"

"বেলে-তেজপুরের।"

আজ প্রায় ষোল-সতেরো বৎসরের কথা, বিপিনবিহারী একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। "পণ্ডিতমশাই!"—বলিয়া তিনি যেমন ছিলেন সেইভাবে ঘুরিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন। একেবারেই ভূমি স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"আপনি! আর আমি দিব্যি কাষ্ঠ-লৌকিকতা করে ভেতরে চলে গেলাম!"

পণ্ডিতমশাই উঠিয়া বিপিনবিহারীকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, বলিলেন—"দোষ হয় নি, কম দিনের কথা নয় তো! আমিও আত্মপ্রকাশ করলাম না, ভাবলাম আগে জামা-জুতো ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে নেওয়াই ভালো। গিরিদিদিমণি বুঝি বলে দিলে?"

"বলে দিতে যে হল এর লজ্জা আমি কি করে ঢাকি বলুন? কী যে মনে হচ্ছে আমার!"

"অনেক দিন হল, তায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, তার ওপর আমিও তোমায় একটু ধোঁকা দিলাম ; আর সব চেয়ে ধোঁকা দিলেন বোধ হয় ইনি—সে সময় তো ছিলেন না" —বলিয়া নিজের দীর্ঘ শ্মশ্রুর উপর দিয়া একবার হাতটা টানিয়া লইয়া হো-হো করিয়া তাঁহার সেই পুরাতন হাসি হাসিয়া উঠিলেন।

বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দিলেন বৈকি 'আপনি' বলে। ওটুকু যদি না করতেন তো বোধ হয় চিনে নিতে পারতাম।"

"যে-উদ্দেশ্যে করা সেটা তো দিদিমণি ফাঁসিয়ে দিলে। তা হোক, তুমি আগে জামা-জুতো ছেড়ে মুখ-হাত ধুয়ে এসো, অনেক দূর থেকে আসছ! তারপর ধীরে-সুস্থে গল্প হবে। উঃ, কত দিন পরে যে দেখছি তোমাদের, আর কী যে আনন্দ হল! ছেলে দুটির সঙ্গে দেখা হল না শুধু, দুটো দিন বিলম্ব হয়ে গেল।"

"সে কি কথা পণ্ডিতমশাই? দ্বারভাঙ্গায় নূতন একটু কুঁড়ে তুলেছি। আপনার পায়ের ধুলো দিতে হবে। আপনাকে পাওয়া—আমার এত বড় সৌভাগ্য বাড়ি বয়ে যখন এসেছে..."

প্রীতিভরে হাসিতে হাসিতে পণ্ডিতমশাই বললেন—"তুমি তো সৌভাগ্যটা আসলে কার বুঝতে পারছ না বিপিন ভায়া। তা যাব দ্বারভাঙ্গায়, পথেই তো পড়ে। তবুও তো একটু খুঁৎ থেকেই যাবে ;—সেই কথাই বলছিলাম—মানে, তোমাদের সব ক'টিকে একসঙ্গে দেখা..."

সামনের একটি চৌকিতে কম্বল পাতা থাকে, মুখোমুখি হইয়া বিপিনবিহারী তাহার উপর বসিয়াছেন। গোড়াতেই একটা ত্রুটি হইয়া যাওয়ায় একটু অনুশোচনায় মিশিয়া আনন্দটা অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ; বলিলেন—"আমি কালই শহরে লোক পাঠিয়ে দেব পণ্ডিতমশাই, সবাই একসঙ্গে পায়ের ধুলো নেব। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে!—ভাবতেও পারি নি কখনও যে আপনি এতটা পথ বেয়ে দয়া করে আসবেন।

BanglaBook.org

এটা নিতান্ত পশুপতিনাথের পথ বলে...”

পণ্ডিতমশাই একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“ভায়া, পশুপতিনাথ যদি মনের কথা জানতে পারতেন তো ফাঁকি দিয়ে ও পুণ্যটুকু নিয়ে নিতাম। কিন্তু তিনি যখন জানেনই সব তখন আসল কথাটা প্রকাশ করে বলাই ভালো—তোমাদের উপলক্ষ করে পশুপতিনাথ দেখে গেলাম কি পশুপতিনাথকে উপলক্ষ করে তোমাদের দেখতে এলাম—কোনটে আমার আসল সে সম্বন্ধে ঠিক করে বলতে পারি না। আরও উদ্দেশ্য ছিল—পুণ্যভূমি মিথিলা দেখা—ন্যায়ের জন্মদাত্রী মিথিলা ; আরও ছিল—বোধ হয় তুমি আন্দাজ করে নিয়েছ...”

বিপিনবিহারী বলিলেন—“হিমালয় দেখা।”

পণ্ডিতমশাইয়ের মুখটা ভাস্বর হইয়া উঠিল। বলিলেন—“ভায়া, কী অপূর্ব জিনিসই যে দেখলাম! কবিবরেরই কথা একটু অন্য অর্থে ব্যবহার করে বলতে ইচ্ছে করে—“সুখং নু দুঃখং নু বা”...অন্য অর্থে এই জন্যে বলছি যে দেখে এবং পেয়ে যতটা আনন্দ পেলাম তার চেয়ে দুঃখই হল বোধ হয় বেশি—এই ভেবে যে সারা জীবনটা কি ধনে বঞ্চিত রয়ে গেলাম!...বার্ধক্য এসে গেল ; ঘোরবার ক্ষমতা, দৃষ্টিশক্তি, সব কমে এসেছে, এমন কি মনের বৃত্তিও নিস্তেজ হয়ে এসেছে, এই অসময়ে, শুধু মনের আপসোস বাড়াবার জন্যে পশুপতিনাথ ডাক দিলেন...”

পণ্ডিতমশাই সদ্য-লব্ধ অভিজ্ঞতার স্মৃতিতে আস্তে আস্তে যেন লীন হইয়া গেলেন, কেহ যে কাছে আছে যেন ভুলিয়া গেছেন, মুখে একটা অস্পষ্ট হাসির সঙ্গে একটা অতৃপ্তির আভাস লাগিয়া আছে, সামনের সন্ধ্যার পানে চাহিয়া আছেন।

বিপিনবিহারীর মনে পড়িয়া গেল—পণ্ডিতমশাই পণ্ডিত, ধার্মিক, সব কিছুই, কিন্তু সর্বোপরি তিনি কবি, ওঁর এই প্রকৃতিটি জীবনের আর সব স্তরকেই অভিসিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। ওঁর ভাবের ঘোরে বাধা না দিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই পণ্ডিতমশাইয়ের মনটা ফিরিয়া আসিল। প্রশ্ন করিলেন—“তুমি যাও নি ওদিকে, নয়?...যেও, নিশ্চয় যেও।”

বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—“আপনি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন পণ্ডিতমশাই যে আমি নীলকুঠিতে কাজ করি।”

পণ্ডিতমশাই বলিলেন—“ও-কথা বললে শুনব না ভায়া, আমি তোমার মনের পরিচয় বহুদিন আগেই পেয়েছি। তোমার সেই হিমালয়ের বর্ণনা এখনও আমার চোখের সামনে যেন জ্বলজ্বল করছে। বাঃ, তুমিই তো আমায় এ-পথের পথিক করেছ। না, যেও একবার নিশ্চয় ফুরসৎ করে...”

BanglaBook.org

দিন পনেরো থাকিলেন পণ্ডিতমশাই। বহুদিন পরে বিপিনবিহারীর সংসারটি যেন চারিদিক দিয়া পূর্ণ হইয়া উঠিল : মা আসিয়াছেন, ভাই ছেলেদের লইয়া দ্বারভাঙ্গা থেকে আসিলেন, তাহার উপর পণ্ডিতমশাই। আরও পূর্ণতা এইজন্য যে, পণ্ডিতমশাইকে কেন্দ্র করিয়া ছোট শিশু থেকে মা পর্যন্ত সবার রূপ যেন নূতন করিয়া ফুটিল। বিশেষ করিয়া মা'র— সাঁতরায় ধর্মালোচনা লইয়াই থাকিতেন ; শীতলা-তলা, গৌরাঙ্গের মন্দির, যাত্রা, কথকতা, গঙ্গাস্নান ; ক্বচিৎ বাহিরে এক-আধটা তীর্থ ;—এখানে আসিয়া অন্তরে অন্তরে

সে-সবের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, পণ্ডিতমশাই কতকটা পূরণ করিলেন। নিস্তারিণী দেবী ডাকিয়া শাস্ত্রালাপ শোনেন দুই বাড়ির বধূদের সঙ্গে লইয়া ; কখনও শাস্ত্রালাপ, কখনও তীর্থভ্রমণ-কাহিনী ; বিপিনবিহারীকে বলেন—কী চমৎকার মানুষ বিপিন ; একটু ভড়ং নেই, একটু ধর্মের ভান নেই, অথচ ধর্ম যেন উপচে পড়ছে ওঁর শরীর-মন বেয়ে। এমনটি তো আর কোথাও দেখলাম না।”

গিরিবালা যেন বর্তাইয়া গেছেন। কি করিবেন, কোথায় রাখিবেন যেন ভাবিয়া পান না। প্রয়োজন পণ্ডিতমশাইয়ের খুব অল্পই, গিরিবালা সব আয়োজনই টানিয়া টানিয়া বাড়াইয়া যতটা সম্ভব তাঁহারই কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। পূজার ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য প্রভৃতির বহর দেখিয়া পণ্ডিতমশাই হাসিয়া বলেন—“এ যে আমার ঠাকুরকে বিগড়ে দিচ্ছ দিদি ; ভবঘুরে মানুষ, নমো নমো করে খানিকটা করে জল দিয়ে ভুলিয়ে রাখি—ধূপের জন্যেও জল দিচ্ছি, নৈবেদ্যের জন্যেও জল দিচ্ছি, আবার আহারের শেষে তাম্বুলের জন্যও এক আঁজলা জলই দিচ্ছি, আর তুমি এ যে...”

গিরিবালা বলেন—“তা হোক ঠাকুরদা, আপনি নির্লোভ মানুষ, আপনাকে তো লোভ দেখিয়ে টেনে আনবার জো নেই—এই তো আঠারো বছরের মধ্যে একবার এলেন, তাই আপনার ঠাকুরকে লোভ দেখিয়ে রাখছি, তিনি যদি আনেন টেনে...”

সঙ্গে সঙ্গে অনুযোগ করেন—“তাও এলেন তো একলা, ঠাকুরমাকে কতদিন দেখি নি, আমার মুখ চেয়েও যে তাঁকে নিয়ে আসবেন না ঠাকুরদা, আসছে বছর আনতেই হবে তাঁকে। মা আমার মুখে তাঁর সুখ্যেত শুনেই কত দুঃখু করছিলেন। আর বাবার কথাও বলি ঠাকুরদা, একবারও কি আসতে পারতেন না? আসলে গিরিকে আর মনে নেই কারুর...”

এই সময়টা একলা পাইয়া বেলে-তেজপুরের কথাই হয় অনেকক্ষণ—সেই আগেকার বেলে-তেজপুরের কথা আর এখনকার বেলে-তেজপুরের কথাও— ভাইয়েরা সব শিবপুরে, বাড়িটা নিশ্চয় খাঁ-খাঁ করে...নিকুঞ্জ-জেঠাদের খবর কি?...দুলাল বাগদিদের কোন খবর রাখেন ঠাকুরদা?...

পূজা আরম্ভ করিতে বিলম্ব হইয়া যায়। পণ্ডিতমশাই হাতে করিয়া আচমনের জন্য জল তুলিয়া লইয়া গল্পে অন্যমনস্ক হইয়া যান—দুলালের অবস্থাটা একটু ভালো, দুটি ছেলে রোজগার করিতেছে, হোক ছোট জাত—বাপ-মায়ের উপর টান আছে দুজনেরই —দুলাল অবশ্য এখন আর কিছু করে না, বয়স হইয়াছে, তায় বরাবরই একটু রুগ্‌ণ ; এই পণ্ডিতমশাই বাহিরে, দুলালই এখন বাড়ি আগলাইতেছে...

গিরিবালা প্রশ্ন করেন—“আর ঠাকুরমা?—তিনি তো রয়েছেন ঐখানেই?”

পণ্ডিতমশাই হাতের জলটা ফেলিয়া দেন, হাসিয়া বলেন—“মেয়েছেলে যে...”

সঙ্গে সঙ্গেই আবার গণ্ডুষের জন্য জল লইয়া অন্য কথা আরম্ভ করিয়া দেন—“হ্যাঁ, আসবার খুব ইচ্ছা ছিল, রসিকলালেরও, তবে সংসারী মানুষ...”

গিরিবালা বলেন—“আপনিও তো সংসারী মানুষ ঠাকুরদা...”

পণ্ডিতমশাই হাতের জলটা ফেলিয়া দেন, হাসিয়া বলেন—“তা তো বটেই, তবে কথা হচ্ছে...”

অভিমানে গিরিবালার মুখটি অন্ধকার হইয়া ওঠে, বলেন—“আসলে তা নয়, গিরিকে

BanglaBook.org

দুজনেই ভুলে গেছেন ঠাকুরদা...তা যান, মেয়েকে নাতনীকে আর চিরদিন কে মনে করে বসে থাকে?...নিকুঞ্জ জেঠার এ-পক্ষের ছেলেটি নাকি নোকসান হয়ে গেল ঠাকুরদা?"

কথাটা ঘুরিতে ঘুরিতে যখন এই রকম প্রসঙ্গে আসিয়া পৌঁছায়, পণ্ডিতমশাই অস্বস্তি ভাবে আসনে একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসেন, কুশি থেকে হাতে আবার গণ্ডূষের জল লইয়া তাড়াতাড়ি একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দেন—"হ্যাঁ, বছরখানেক হয়ে..."

"কেন যে আসে পেটে শত্রুরা..."

পণ্ডিতমশাই মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলেন—"শত্রুই বৈকি, ওদের কথা ভাবতে আছে?"

সঙ্গে সঙ্গেই একটু জোর করিয়া হাসিয়া ত্বরিত ভাবে বলেন—"ও দিদি, ক'বার আচমনের জল নিয়ে ফেলে দিলাম বল দিকিন? আমার ঠাকুর যে শুকিয়ে মরবেন!"

গিরিবালা হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"তা বটে ঠাকুরদা, তা তিনি বেলে-তেজপুরের কথা দেন কেন মনে করিয়ে বলুন? কষ্ট দেওয়ার মতলব থাকলে নিজেও কষ্ট পেতে হয়।"

হাসিতে হাসিতে উঠিয়া পড়িয়া বলেন—"না, সত্যিই দেরি হয়ে গেছে ঠাকুরদা, আপনি বসুন পুজোয় ; আমি যাই ওদিকে একটু।"

যাইবার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় পণ্ডিতমশাই বিপিনবিহারীকে বলিলেন—"বিপিন, তুমি আজ বাইরের ঘরেই শুয়ো, আমি একেবারে প্রত্যুষেই বেরুব, একরকম রাত্রি থাকতেই।"

"যখনই বেরুবেন ডেকে নেবেন পণ্ডিতমশাই। অবশ্য শোবার জন্যে বলছি না, কিন্তু মেয়েদের সবাইকে তো ডাকতেই হবে।"

"না, ওঁদের কাছে রাত্রেই বিদায় নিয়ে নেব ; আমায় এক রকম রাত থাকতেই বেরুতে হবে।"

কথার মধ্যে কি একটা ছিল, বিপিনবিহারী একবার মুখের পানে চাহিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না।

শেষ রাত্রে পণ্ডিতমশাইয়ের ডাকে ঘুম ভাঙিয়া গেল। উঠিয়াই কিন্তু বিস্মিত হইয়া গেলেন—নিজের দৃষ্টিকে যেন বিশ্বাস হয় না ; পণ্ডিতমশাই-ই, তবে আগাগোড়া একটা গেরুয়া রঙের আলখাল্লা পরা, মাথায় একটা ঐ রঙের পাগড়ি জড়ানো। সঙ্গে একটা বেশ বড় গোছের লাঠি আনিয়াছিলেন, তাহার উপর কম্বলটা পাট রহিয়াছে।

বিপিনবিহারীর ঘোরটা একটু কাটিলে পণ্ডিতমশাই অল্প একটু হাসিয়া বলিলেন —"এ বেশে গিরি দিদিমণির সামনে দাঁড়ালে কান্নাকাটি করত, তাই ও-পাঠ কালই চুকিয়ে রেখেছি। এবার পশুপতিনাথ গিয়ে এই পথ অবলম্বন করলাম ভায়া—আরও ঠিক করে বলতে গেলে এই আজ থেকে আরম্ভ হল।"

বিপিনবিহারী প্রশ্ন করিলেন—"সন্ন্যাস নিয়েছেন?"

"ও-কথাটা মস্ত বড় কথা বিপিন। লোকে অবশ্য সন্ন্যাসীই বলবে, আমি কিন্তু নিজেকে বলি পরিব্রাজক মাত্র। সন্ন্যাসীরা চোখ বুজে যাঁকে খুঁজছে, আগে ঘুরে-ফিরে

BanglaBook.org

দু'চোখ ভরে তাঁর বাইরের রূপটা দেখি বিপিন—আশ মিটছে না, কী যে অপরূপ!... পশুপতিনাথ গিয়েছিলাম—দেখি, এক হিমালয় দেখতেই তো কত জন্ম কেটে যাবে—তার পরে তো তার স্রষ্টা...?"

আয়ত দৃষ্টিতে, গৈরিকমণ্ডিত দীর্ঘচ্ছন্ন শরীরে একটি প্রসন্নতা যেন ঝলমল করিতেছে। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া বিপিনবিহারীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু—ইয়ে—ঠানদিদি, পণ্ডিতমশাই?"

পণ্ডিতমশাই দুই পা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিপিনবিহারীর মাথায় হাত দিলেন, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"দিদিমণির কাছে লুকিয়েছি, তাকে বড্ড ভালোবাসত কিনা, দেখলাম একটা মস্তবড় শোক পেয়েছে—এ শোকের বেগটা না কমলে আর তোমার দিদিমণির এ-সংবাদটা দিও না তাকে। আমার এ-বেশের কথা বোল না।...যখন বলবে তখন এটুকুও বলে দিও, বাড়িটা দুলাল বাগদিকে দিয়ে এসেছি—আমার ও বড্ড সেবা করেছিল, তা ভিন্ন আমার শিষ্য আর শিষ্যকন্যার বড় প্রিয় ছিল পরিবারটা..."

শেষের কথা কয়টা বলিতে মুখটা হাসিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

বিপিনবিহারী একটু চকিত হইলেন, মনের দ্বিধাটা প্রকাশ করিতে যাইতেছিলেন, পণ্ডিতমশাই তাঁহার মাথায় হাতটা ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে করিতে বলিলেন—"বুঝেছি বিপিন যা বলবে। ওটুকুও যদি মন থেকে সরিয়ে ফেলতে না পারব তো এ-পথে পা বাড়িয়েছি কেন? যদি কখনও হতে পারি সন্ন্যাসী তো বুঝব ঐখানেই ভগবান তার গোড়া-পত্তন করেছিলেন।...দুলাল অনেক ব্রাহ্মণের চেয়েই দানের উপযুক্ত পাত্র বিপিন—হোক না কেন তা ভদ্রাসনই—স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই বড় পবিত্র স্বভাব...নারায়ণ, নারায়ণ, মানুষকে জাতের জন্যে ছোট ভেবে তাঁর সৃষ্টির যেন অপমান না করতে হয় কখনও।...এবার সময় হয়েছে বিপিন, এসো আলিঙ্গনটা করে নি; আমার গুরু এই গ্রামের শেষেই অপেক্ষা করছেন, এই পনেরোটা দিন তাঁর কাছে ছুটি পেয়েছিলাম। হয়েছে, অত পায়ের ধুলোয় কি হবে?...স্বস্তি—স্বস্তি!"

পথে নামিয়া আর একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না, দৃঢ় ঋজু গতিতে সম্মুখের পথ ধরিয়া এক সময় একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বিপিনবিহারীর মনে হইল, প্রভাতসূর্যের একটি রশ্মি কক্ষচ্যুত হইয়া নামিয়া আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল।

BanglaBook.org

।। ১২ ।।

অফিসের ব্যাপারটা ক্রমে ঘোরালো হইয়া উঠিতে লাগিল। আমলাদের মধ্যে বরাবর একটা ঐক্য ছিল, ক্রমে সেটুকুও যাইতে বসিল ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়া। ছোট সাহেব দু'একজন নিম্নস্তরের আমলাকে হাত করিল, এদিককার কথা ওদিকে পৌঁছিতে লাগিল, খিটিমিটি বাড়িতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় আরও বছরখানেক টানিয়া-টুনিয়া গেল, তাহার পর, যে আগুন ধূমাইতেছিল, এক দিন সামান্য কারণেই দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

নীলের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া কুঠিতে আখের চাষের পরীক্ষা চলিতেছে। চার্জে ছোট সাহেব। বিলাত থেকে একটা আখপেড়াইয়ের কল আসিয়াছ; কুঠি থেকে

মাইলখানেক দূরে সাগরপুর বলিয়া একটা জায়গা আছে, কলটা সেইখানে বসানো হইবে। কৈলাসচন্দ্র অফিসে কাজ করিতেছিলেন, ছোট সাহেবের আর্দালি আসিয়া বলিল—"বাবু, আধ সের তেল চাই, কলটা চালানো হবে।"

কৈলাসচন্দ্র একটু বিরক্তির সহিত কাজের মধ্য হইতে মুখটা তুলিয়া বলিলেন—"তেল—তা এখানে কেন? গুদাম-নবিশের কাছে যা।"

"গুদাম-নবিশ আসেন নি, তাঁর ছুটি।"

"কে দিয়েছে?"

"ছোট সাহেব।"

কৈলাসচন্দ্র একটু থতমত হইয়া রহিলেন, তাঁহার যেন মনে হইল ব্যাপারটা সাজানো, বলিলেন—"তেল বের করে দেওয়া আমার কাজ নয়।"

আর্দালি গিয়া উত্তরটা জানাইতে ছোট সাহেব নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভাবটা বেশ একটু চড়া, প্রশ্ন করিল—"তেল দেওয়া হয় নি কেন?"

কৈলাসচন্দ্রও একটু রুখিয়াই বলিলেন—"তেল বের করে দেওয়া আমার কাজ নয়।"

"গুদাম-নবিশ ছুটিতে থাকলে বড়বাবু হিসেবে তুমিই ব্যবস্থা করবে না?"

"তা করতে হলে গুদাম-নবিশ যে ছুটিতে সেটাও আমার জানা উচিত ছিল।"

"তোমার খোঁজ রাখা উচিত ছিল।"

"সে যে অনুপস্থিত আমার ভাববারই অবসর হয় নি, কেননা ছুটি চাইতে হলে তার আমার কাছেই চাইবার কথা।"

বেশ খানিকটা গরম-গরম আলাপ হইল, সুবিধা করিতে না পারিয়া সাহেব অযথাই তম্বি করিয়া চলিয়া গেল। ব্যাপার যে-রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একটা কিছু করা নিতান্ত দরকার, সকলেই আসিয়া কৈলাসচন্দ্রের টেবিল ঘেঁরিয়া দাঁড়াইল। স্থির হইল সকলের দস্তখতে একটা দরখাস্ত দিতে হইবে বড় সাহেবের কাছে।...দরখাস্ত লিখিয়া সবার দস্তখত করাইয়া তৈয়ার রাখা হইল। সবাই একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল— নিষ্পত্তিটা যাহাই হোক না কেন।

বৈকালে বড় সাহেব অফিসে আসিল অন্য দিনের চেয়ে একটু বিলম্ব করিয়াই। নিয়ম-মতো কৈলাসচন্দ্র ক্যাশ-বুক প্রভৃতি তাঁহার খাতা-পত্র দস্তখত করাইবার জন্য লইয়া আসিলেন। অত্যন্ত গম্ভীর সাহেবের মুখটা আজ। এই সময় দস্তখতের ফাঁকে ফাঁকে প্রতিদিনের কাজ লইয়া কৈলাসচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা হয়। আজ সাহেব একটি কথা বলিল না, বাঁ হাতের আঙুলে চুরুটটি ধরিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া ওলটানো পাতার উপর খস-খস করিয়া দস্তখত করিয়া যাইতে লাগিল—এই দস্তখতের শব্দ আর সেই রকমই শুষ্ক নিঃশ্বাসের আওয়াজ ঘরটার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে লাগিল,...ওদিকে অফিসের হলটাও একটা আসন্ন কিসের আশঙ্কায় স্তব্ধ হইয়া আছে।

শেষ পাতাটির উপর দস্তখত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ খাজাঞ্চি কুলদীপ প্রসাদ দুয়ারের পাশ হইতে বাহির হইয়া দরখাস্তটা সাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া দিতে গেল।

সাহেব একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, কুলদীপ প্রসাদ হাত হইতে দরখাস্তটা বোধ হয় ছাড়িবার পূর্বেই সেটা ছিনাইয়া, মুঠোর মধ্যে দুমড়াইয়া তাহার গায়ে ছুঁড়িয়া দিয়া

গর্জন করিয়া উঠিল—"বেরোও, বেরোও আমার সামনে থেকে, সব বেরিয়ে যাও—তোমরা দল বেঁধে কুঠির সর্বনাশ করতে চাও!..."

সোজা না বলিলেও কৈলাসচন্দ্র এই আপমানসূচক হুকুমের মধ্যে পড়িয়া গেছেন, সংযত কণ্ঠেই বলিলেন—"আপনি অন্যায় করছেন আমাদের ওপর, ছোট সাহেবের..."

সাহেবের উগ্রতাটা সোজা আসিয়া কৈলাসচন্দ্রের উপর পড়িল, বলিল—"তুমিই যত নষ্টের গুরু, দল পাকিয়ে..."

কৈলাসচন্দ্রের কণ্ঠস্বরও কড়া হইয়া উঠিল, বলিলেন,—"মিথ্যা অপবাদ দেবার আগে আপনি কথাগুলো ভালো করে ভেবে দেখবেন..."

সাহেব রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে—"হাউ ডেয়ার ইউ!..." বলিয়া কণ্ঠস্বর আরও চড়াইয়া তুলিতে বিপিনবিহারী এবং কৈলাসচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র জগদানন্দ হল্ থেকে বাহির হইয়া আসিলেন। জগদানন্দ নূতন অপিসে ভর্তি হইয়াছেন, কুস্তি করা শরীর, তেজী যুবক—জামার আস্তিনটা প্রায় গুটাইয়া রাখিতেন ; বিপিনবিহারী একটা রুল লইয়া খাতায় লাইন টানিতেছিলেন, অনবধানবশতঃ সেটা হাতেই ছিল।...রুল আর আস্তিনে-গোটানো দুইটাই আকস্মিক, সাহেব কিন্তু দেখিয়াই—"হামারা বন্দুক লে আও!"—বলিয়া নিজের বাংলোর দিকে পা বাড়াইল।

কতকটা ভুলে, কতকটা ইচ্ছাকৃত ভাবেই সমস্ত ব্যাপারটা এক্তিয়ারের বাহিরে চলিয়া গেল, বন্দুকের নাম করিতেই—"লে আও তোম্‌হারা বন্দুক"—বলিয়া বিপিনবিহারী ও জগদানন্দ দুইজনেই অগ্রসর হইলেন। অফিসের সংলগ্নই সাহেবের বাংলো, সাহেব দ্রুত পা চালাইয়াই প্রবেশ করিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল ; আর সব আমলারা আসিয়াই ইঁহাদের দুইজনকে ধরিয়া ফেলিল।

সেদিনকার নাটকে এখানেই যবনিকা-পাত হইল।

এর পরের ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। আমলারা বিচারের জন্য উপরের কর্তাদের দ্বারস্থ হইলেন, অবশ্য খুব বেশি আশা না রাখিয়াই। আশঙ্কাটাই ফলিল ; পাণ্ডুলের অফিস প্রায় এক রকম নূতন করিয়া গড়া হইল। পাণ্ডুলের প্রায় সত্তর বৎসরের জীবনের অবসান ঘটিল।

পাণ্ডুল।—এ-পরিবারের জীবনে মিথিলার এই সুদূর গ্রামটি বড় একটা পবিত্র স্মৃতি, প্রায়ই আলোচনা হয়, হইলেই সবার মন একটি সজল স্নিগ্ধতায় ভরিয়া ওঠে। চলিয়া আসার স্মৃতিটি বড়ই করুণ। শৈলেনরা তখন দ্বারভাঙ্গায় পড়িতেছে, বিদায়ের অভিজ্ঞতাটা প্রত্যক্ষ করিতে পায় নাই ; মায়ের কাছে প্রায় গল্প শুনিত, কিছু কিছু বাবার কাছেও।

চলিয়া আসিতে হইবে এ-কথাটা যেদিন থেকে পাকা হইয়া গেল, পাড়ায় যেন একটা চাপা হাহাকার পড়িয়া গেল। সত্তর বৎসর ধরিয়া "মধ্যু" বাবুর এই দুই পরিবার সমস্ত পাণ্ডুলের প্রীতিই অর্জন করিয়া আসিয়াছে—এই দুইটি বাড়িতে যে আর কেহ আসিয়া থাকিবে এটা কেহ ভাবিতেই পারিত না। সমস্ত দিন বাড়ি পাড়ার বর্ষীয়সীদের দ্বারা পূর্ণ থাকিত। একদিন দুলারমনের ঠাকুরমা আসিলেন। আর এক রকম নড়িতেই পারেন না বলা চলে ; প্রায় পাঁচ-ছয় বৎসর পূর্বে—নিস্তারিণী দেবী সাঁতরা হইতে ফিরিলে একবার দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, আর এই। লাঠি ধরিয়া, নাতির উপর ভর করিয়া আসিলেন, ধনুকের মতো বাঁকিয়া গেছেন, নিস্তারিণী দেবী তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া ধরিয়া লইয়া

BanglaBook.org

গিয়া কম্বলে বসাইলেন। দুলারমনের ঠাকুরমা পরিশ্রমের জন্য হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, "দুলহীন, একবার বিপিনকে ডেকে পাঠাও...এই সব দেখবার জন্যেই বেঁচে ছিলাম..."

বিপিনবিহারী আসিলে বলিলেন—"কাছে এসে বোস্ বিপিন।"

বিপিনবিহারী পাশে আসিয়া বসিলেন। ছোট ছেলেকে যেমন করে, বৃদ্ধা সেই ভাবে পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন—হাঁপাইতেছেন, চোখে জল ঝরিতেছে—তাহার মাঝেই বলিলেন—"তোকে কোলের ওপর নিয়ে উঠোনের ঐখানটায় পা ছড়িয়ে বসে "উপটন্" মাখাতাম—দুলহীনকে বলতাম—"ছেলের তোমার লোহার শ্রীর করে দোব, যত বিপদ, আপদ, কুনজর—গায়ে লেগে সব ছিটকে পড়বে—আমি থাকতে থাকতেই সেই বিপিন পাণ্ডুল ছেড়ে চলল!...দুলহীন, কথা কইছ না যে তুমি?"

কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নাই, এক বিপিনবিহারী ছাড়া ; কিন্তু তাঁহার অবস্থা সকলের চেয়ে আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চোখের জল ফেলার অভ্যাস একেবারেই নাই—কোন অবস্থাতেই, কিন্তু আর সামলানো যায় না। হঠাৎ উঠিয়া যাওয়া শক্ত, অথচ এদিকে রগ দুইটা এত টনটন করিয়া উঠিতেছে যে চোখের জলের লজ্জা আর বুঝি ঠেকাইয়া রাখা যায় না। অসহ্য অবস্থায় পড়িয়া কি করিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় বাহিরে ডাক পড়িল—"দোস্ত আছ?"

বিপিনবিহারী পরিত্রাণ পাইলেন—"ফণীন্দ্র এসেছ বুঝি?"—বলিয়া উঠিয়া পড়িলেন, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া দুলারমনের ঠাকুরমাকে বলিলেন—"পাণ্ডুল ছেড়ে গেলে পাণ্ডুল কি আমায় ছাড়বে দাদী? তোমাদের টানে আবার কত বার..."

শেষ না করিয়াই বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ফণীন্দ্র ঝা বাল্যবন্ধু, সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার। পণ্ডিত বিশ্বনাথ ঝার বংশের ছেলে ; শান্ত প্রকৃতি, বেশি কথা কন না, আড়ম্বর করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিয়া ধরেন নাই কখনও ; কিন্তু বিপিনবিহারীর চেয়েও বিপিনবিহারীর কথা যে বেশি করিয়া ভাবেন অনেকবারই সেটা ধরা পড়িয়া গেছে। বাংলার মতো এখানেও সম্পর্ক পাতাবার রেওয়াজটা ছিল সে সময়, দুজন পরস্পরকে ডাকেন "দোস্ত্" অর্থাৎ স্যাঙাৎ।

"দোস্ত্ হঠাৎ অসময়ে যে?"

ফণীন্দ্র ঝার এদেশী প্রথায় ত্রিকোচ্য করিয়া কাপড় পরা, বাঁ হাতে একটা কৎবেলের নস্যাধার, গায়ে এদেশী প্রথাতেই একটা চাদর জড়ানো, ডান হাতটা তাহার মধ্যে রহিয়াছে। বিপিনবিহারীর প্রশ্নে একটু অপ্রতিভ ভাবে হাসিয়া বাঁ হাতের নস্যদানিটা আঙুল দিয়া দু-এক পাক ঘুরাইলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না।

বিপিনবিহারী বলিলেন—"তা বসো, অসময়ে আসতে মানা আছে বলেছি নাকি? ...বরং এসে বাঁচিয়েছ আমায়—যা পাল্লায় পড়েছিলাম..."

চৌকিতে বসিতে বসিতে বলিলেন—"দাদী দেখা করতে এসেছে। বুড়িয়া এসেই কচি ছেলের মতন আমায় কোলের কাছে টেনে নিয়ে সেই সব দিনের কথা—কবে কোল পেতে উপটন্ মাখিয়েছিল, কবে কি করেছিল...যেতে হবে, মনটা আজকাল এমনই খারাপ থাকে, তার ওপর বিনিয়ে বিনিয়ে সেই সব পুরনো কথা—আমি ভাবছি দিলে বুঝি বুড়িয়া আমায় এই বুড়ো বয়সে কাঁদিয়ে—এমন সময় তুমি..."

BanglaBook.org

ফণীন্দ্র ঝা বেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া শুনিতেছিলেন, কি যেন একটা চেষ্টা করিতেছেন ভিতরে ভিতরে—আস্তে আস্তে ডান হাতটা বাহির করিয়া নেকড়ায় জড়ানো একটা কিসের তাল্ বিপিনবিহারীর সামনে চৌকির উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"এইটে রাখো দোস্ত্।"

বিপিনবিহারী গল্পের মধ্যেই হঠাৎ থামিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি এ দোস্ত্?"

ফণীন্দ্র ঝা যেন আরও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন—"তোমাকে হঠাৎ যেতে হচ্ছে—এই সময় আবার চণ্ডীরও চাকরিটা গেল—অবস্থাটা তো জানিই দোস্ত্, কাকাজীর মৃত্যুর পর ভালো রকম সামলে উঠতেও পারনি—কিছু নগদ তোমার হাতে থাকলে হত ভালো—তা আমার অবস্থাটা তো জানোই—পণ্ডিতের বংশের ছেলে, পুঁথিতে যদি কাজ হোত, এক সিন্দুক সঙ্গে করে দিতাম..."

ফণীন্দ্র ঝা একটু হাসিয়া সমস্ত ব্যাপারটা হালকা করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর আবার আগের মতোই দ্বিধা-জড়িত স্বরে বলিলেন—"তাই এগুলো নিয়ে এলাম—আমি নিয়ে এলাম কি তোমার দোস্তের বৌ-ই গছিয়ে দিলে—খান-কত রুপোর গয়না—এক-আধখানা বোধ হয় সোনার থাকতে পারে, দেখি নি অত—আমাদের সবই তো রুপোর গয়না, জানোই তো—আর অল্পই—এতে যে কি হবে—তবে আর তো নেই বিশেষ কিছু..."

বিপিনবিহারী সম্মোহিতের মতো বান্ডিলটার দিকে চাহিয়া আছেন। আজ যেন অশ্রুর লজ্জা হইতে পরিত্রাণ নাই-ই, কোনমতেই নাই; এক জায়গায় রেহাই দিয়া সে এক জায়গায় একেবারে ঘিরিয়া ধরিল। বিপিনবিহারী বাধা দিবার কোন চেষ্টাও করিলেন না, কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া বলিলেন— "পাণ্ডুল থেকে শেষে আমায় এই বয়ে নিয়ে যেতে হবে দোস্ত্?"

ফণীন্দ্র ঝা যেন মহাসঙ্কটে পড়িয়া গেলেন, সমস্তটা সম্পূর্ণভাবে স্ত্রীর উপর চাপাইয়া বলিলেন—"আবার সামলে উঠলে তখন...আর মুশকিল, তোমার দোস্তের বৌ কোনমতে ফিরিয়ে নেবে না—মাঝে পড়ে আমি...আর তোমাকে যদি ওরা কখনও আলাদা করে দেখত..."

বিপিনবিহারী চারিটা আঙুল বান্ডিলটার উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন —"আর বলতে হবে না দোস্ত্, এই আমি নিলাম; কিন্তু আপাতত তাঁর কাছে গচ্ছিত রেখে দাও গে; আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দরকার যদি পড়ে আবার তাঁর হাত থেকে নিশ্চয় নিয়ে যাব।"

আসিবার দিন সমস্ত গ্রাম যেন ভাঙিয়া পড়িল, শাম্পেনীতে উঠিলেন—হায়-হায়-এর সঙ্গে শুধু আশীর্বাদ—

গিরিবালা বলেন—"সবটাই খুব কষ্টকর, কিন্তু তার মধ্যেও দুলারমন আর খজনীর মুখ যেন মনে গেঁথে বসে আছে। আমাদের বাড়ির চৌকাঠে ঠেস দিয়ে দুলারমন শাম্পেনীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, দু-হাতে আঁচল তুলে মুখের প্রায় সমস্তটাই ঢেকে ফেলেছে, চোখ দিয়ে জল উপচে উপচে পড়ছে। আঙুলের ওপর দিয়ে আমার পানে চেয়ে আছে —যেন যতটা পারে, যতক্ষণ পারে, দেখে নিতে চায়।"

BanglaBook.org

"আর একটু এগিয়ে, শাম্পেনী থেকে অল্প একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে খঞ্জনী—কান্না নেই, কিচ্ছু নেই, ফ্যাল ফ্যাল করে আমার কোলে অরুর দিকে চেয়ে আছে—মুখ দেখলে মনে হয় তার যেন কিছুই রইল না জীবনে—যেন বুঝতে পারছে না কি হল—যারা ছেড়েই যাবে তাদের জন্যে ও কেন এমন করে সব ছেড়ে দিয়ে বসল..."

দ্বিতীয় পর্যায়

॥ ১ ॥

কথাটা একটু উঁচুদরের দার্শনিকতার মতো শোনায় কিন্তু সুখ-দুঃখ সত্যই আপেক্ষিক। এক সময় যাহা অশ্রু উদ্বেল করিয়া তোলে, তাহারই মধ্যে কোথায় যে আনন্দের, মুক্তির উপাদান লুকানো থাকে বোঝা যায় না। একদিন ভগ্ন-হৃদয়েই পাণ্ডুল ছাড়িতে হইয়াছিল, মনে হইয়াছিল জীবনের সব সঞ্চয় বুঝি বিনষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু উত্তর-জীবনে এটাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাণ্ডুল ছাড়াটা জীবনের পূর্ণতর উপলব্ধির জন্য গিরিবালার প্রয়োজন ছিল। হয়তো সব সময় বোঝা যায় না, কিন্তু প্রবাসমাত্রেই জীবনকে খানিকটা পঙ্গু করে, আরও বেশি করিয়া করে যখন সে প্রবাসের অর্থ পাণ্ডুলের মতো একটা সঙ্কীর্ণ পল্লীজীবন। বাঙালী মেয়ের জীবন ছড়ায় সংসারের মধ্য দিয়া—স্বামী-পুত্র-কন্যা, স্বজন-পরিজন লইয়া এই গৃহস্থালীর সংসারটা তাহার জগৎ—বাইরের যে বড় জগৎ সেখানে সে চিরদিনই অসূর্যম্পশ্যা। সেই জন্য তাহার সংসারটি একটা বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে পাতিতে না পারিলে তাহার জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয় না ; জীবনকে আরও পাঁচজন বড়, ছোট, সমকক্ষের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা যায় না। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে বড় হইয়া থাকিলে মনে হয় দিব্য আছি, চরমে প্রতিষ্ঠিত আছি ; একটু নামিয়া গেলে মনে হয় অতলে ডুবিয়া গেলাম, আর উপায় নাই।

অবশ্য পাণ্ডুলের স্মৃতি চিরকালই মিষ্ট ছিল, খানিকটা কারুণ্যের সংযোগে আরও মিষ্ট—অহি, খঞ্জনী ; নূতন জীবনে বিদেশিনী সঙ্গিনী সব ; স্বজাতিবিরহের মধ্যে দুইটি পরিবারের স্নিগ্ধ জীবন—এক অন্যকে পূর্ণ করিয়া ; তবু কিন্তু এক একবার এক ধরনের আতঙ্কের সহিতই পাণ্ডুল মনে পড়িত ; গিরিবালা হাসিয়া বলিতেন—"জেঠামশাই কী বনবাসেই পাঠিয়ে ছিলেন রে! ঐখানেই যদি পড়ে থাকতে হত!"

মায়ের প্রথম দ্বারভাঙ্গায় আসার ব্যাপারটা শৈলেনের বেশ মনে পড়ে। ওরা দুই ভাইয়ে কয়েক মাস হইতে দ্বারভাঙ্গায় থাকিয়া পড়াশুনো করিতেছে—সাঁতরার মতো পাঠশালা বা মাইনর স্কুল নয়, একবারে বড় হাই স্কুল না হোক, তবু হাই স্কুলের অংশ একটা, ছোট ছোট বাঙালী ছাত্রদের জন্য রাজের হাই স্কুলের একটা শাখা। ক্লাসের সংখ্যা কম বলিয়া অল্প বয়স্কের ছাত্ররাও বেশ মাতব্বর। কত রকম কথা জানে, কত রকম নূতন ছড়া, সে সবের কি অদ্ভুত মানে!—পাণ্ডুলের কেহ কল্পনাতেও আনিতে পারে না। একটা ছড়া রাজস্কুলের হেড় মাস্টারের টাক লইয়া। ফোর্থ ক্লাস, অর্থাৎ এখানকার

BanglaBook.org

সব চেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্র ঘোঁৎনা রচনা করিয়াছে। ঘোঁৎনা নিজেই কি একটা বিরাট ব্যাপার! তিন বছর এক ক্লাসে আছে—এক দিন থার্ড মাস্টারের মুখের উপর বলিল—"আমার গোঁফ বেরিয়ে গেছে স্যার, বেঞ্চের ওপর দাঁড়াতে বললে কথা রাখতে পারব না, বাবাও আমায় ঘোঁতন বলতে শুরু করে দিয়েছেন, ভদ্রতা বলে একটা জিনিস আছে তো?"

হেড মাস্টার পর্যন্ত শুনিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

পাঁচুর বাবার নাম শিবনাথ। কোন মাস্টার অনুপস্থিত থাকিলে মাঝে মাঝে পড়াইতে আসেন, পাঁচু সোজা 'শিবুদা' বলিয়া ডাকে। শৈলেনের নিজের কানে শোনা, ওদের ক্লাসেই পড়ে পাঁচু। বলে—"পাড়ার সবাই ঐ বলে ডাকে, আমি তো তবু নিজের ছেলে রে!"

এ তো গেল স্কুলের কথা, তা ভিন্ন দ্বারভাঙ্গা শহর, রাজার জায়গা, প্রতিনিয়তই সেখানে কত কি হইতেছে। বহু দিন আগে একবার শশাঙ্ক আর শৈলেন পাণ্ডুলে গিয়াছিল, তখন বাংলা স্কুলেও এত শেখে নাই, দ্বারভাঙ্গা সম্বন্ধেও এতটা জানিত না, তাহাতেই এ-বাড়ির ও-বাড়ির সবাইকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছিল, নেহাৎ জেঠামশাই, বাবা না হোক, মা-জেঠাইমা পর্যন্ত তো নিশ্চয়। মা আবার জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতেন, যেন তারাইয়া তারাইয়া। সে গেল অনেকদিন আগের কথা, তাহার পর দুই ভাইয়ে আরও অনেক কিছু দেখিয়াছে, শিখিয়াছে, আরও বেশি করিয়া শহুরে হইয়াছে এবং সেই অনুপাতে পাণ্ডুলের জীবগুলি আরও বেশি করিয়া হইয়া গেছে গেঁয়ো। একটা অদ্ভুত ধরনের অনুকম্পা লাগিয়া থাকে—ছোট ভাই-বোনদের উপর তো বটেই—মা, খুড়িমাও বাদ যান না—আহা, কত কম জানে!—পাণ্ডুলের মানুষ যে!—পাড়াগাঁয়ের!...শোনবার পক্ষে মা যেন আরও ভালো। মা বড় বলিয়া শোনাবার সময় নিজেকে বেশি করিয়া বড় বলিয়াও মনে হয়।

সেই মা আসিতেছেন, এখানকার চোখা চোখা খবর শুনাইবার জন্য দুই ভাইয়ে যেন রেষারেষি পড়িয়া গেছে।

দাদার মনেও যে এই একই প্রবাহ সে-খবর শৈলেন কতকটা আকস্মিক ভাবেই টের পাইল।—গুন্-গুন্ করিয়া গানের সঙ্গে হাতের-লেখা লিখিতেছিল, শশাঙ্ক—"কি লিখছিস, দেখি"— বলিয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, দু-একটা অক্ষর সম্বন্ধে এলোমেলো অভিমত দিয়া বলিল—"হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ে গেল—মা এলেই শৈল যেন—'শুনেছ মা, শুনেছ মা'—বলে তাঁকে উস্তম-ফুস্তম করে তুল না, তেতেপুড়ে আসছেন একে।"

শৈলেন ঠিক না বুঝিয়াই হোক, বা কতকটা সন্দেহেই হোক, ঘুরিয়া দাদার মুখের দিকে একটু চাহিয়া দেখিল। তাহার পর বিজ্ঞের মত স্বরটা গম্ভীর আর হ্রস্ব করিয়া বলিল—"মা এলে তো আগে পায়ের ধুলো নেব।"

ঘুরিয়া আবার লিখিতে লাগিল।

একটু নীরবে গেল। তাহার পর শশাঙ্ক আবার গলাটা অভিভাবকের মতো করিয়া বলিল—'পায়ের ধুলো নিয়েই যত রাজ্যের গল্প এনে জড়ো করবে তো? জিরুতেও দেবে না একটু?"

শৈলেন লিখিতে লিখিতেই একটু ভাবিয়া লইল, না ঘুরিয়াই উত্তর করিল—"জিগ্যেস করলে আমি কি করব? অবাধ্য হতে পারি না তো?—গুরুজন।"

এবার শশাঙ্কর একটু চুপ করিয়া থাকিবার পালা গেল, তাহার পর কাঁধটায় ছোট্ট

BanglaBook.org

একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"আচ্ছা, সে আমি দেখে নোব'খন, জিগ্যেস না করলেই হল তো?"

মন-জানাজানি খানিকটা হইয়াই গেল, আর ঢাকাঢাকি দরকার নাই। শৈলেন কলম ছাড়িয়া ঘুরিয়া বসিয়া বলিল—"তুমি বুঝি আগেভাগে বলে দেবে সব?"

শশাঙ্ক আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বরে বলিল—"আমি বড়ো, বাঃ!"

শৈলেন স্থির দৃষ্টিতে দাদার মুখের পানে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর 'বেশ' বলিয়া আবার লিখিতে শুরু করিয়া দিল।

ছেলেবেলার এই 'বেশ' কথাটা মারাত্মক ; শশাঙ্ক খানিকটা চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—"বেশ বললি যে, করবি কি তুই?"

"আমি যা বলবার বাবাকে বলব।"

তাহার মানে নালিশ—দীর্ঘ দর্দ আছে তাহার, ছেলেবেলার তো এবেলা-ওবেলা ফর্দ বাড়িয়া চলে। অবশ্য শৈলেনের বিপক্ষেও আছে—দীর্ঘতর, কিন্তু সে একটু গোঁয়ার গোছের, প্রহার-লাঞ্ছনাকে অতটা গায়ে মাখে না।...অনেক তর্ক-বিতর্কের পর একটা রফা হইল—কতকগুলা খবর শশাঙ্ক দিবে, কতকগুলা দিবে শৈলেন।—রাজের হাতি ক্ষেপিয়া মাহুতটাকে শুঁড়ে জড়াইয়া পায়ে করিয়া যে কিক্ করিয়াছিল—সে খবরটা দিবে শশাঙ্ক, তেমনি শৈলেনের ভাগে রহিল ঘোঁৎনা—কপিরাইট গোছের—তাহার একটা গল্পও শশাঙ্ক মায়ের কাছে বলিতে পারিবে না। লাহেরিয়াসরাইয়ের সরকারী উকিলের বাড়িতে নিমন্ত্রণের কথাটা বলিবে শশাঙ্ক, কলিকাতা হইতে কি কি জিনিস আসিয়াছিল সে সমস্তই ; তেমনি রাজস্কুলে আগুন লাগার খবরটা দিবে শৈলেন—ধরো যদি ভুলিয়া বলিয়াই ফেলে যে তাহাতে দু-একটা লোকও পুড়িয়া মরিয়াছিল তো শশাঙ্ক কিছু বলিতে পারিবে না, তাহার ভাগে তো খ্যাপা হাতির মাহুত পড়িয়াছে। ক্লাসে কে কে পড়ে, আর কে কি-রকম—সে নিজের নিজের। হেডমাস্টার শশাঙ্কর, তেমনি সেকেন্ড আর থার্ড মাস্টার শৈলেনের ভাগে। রাজের ইন্দ্রপূজাটা লইয়া একটু গোল বাধিল। সে একটা বিরাট ব্যাপার ;—পূজা-অংশটা অনুষ্ঠিত হয় দেউড়ির ঠিক বাহিরেই—যাগযজ্ঞ, সাত-আট দিন ধরিয়া মেলা, কত দেশ থেকে কত রকম দোকান-পাট আমদানি হয়, কত নূতন ধরনের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ; লোকে লোকারণ্য হইয়া যায়। তাহার পর বিসর্জনের অংশটা—স্টেশনের কাছে, শৈলেনদের বাড়ির পাশেই বিরাট দীঘিটার চারিদিকে বাঁশ-বাঁখারির খিলান করিয়া তিন থাকে কাচের গেলাসের মত একরকম প্রদীপ টাঙাইয়া দেওয়া হয় অজস্র, তাহাতে আবার রঙিন, তেল দেওয়া। রাস্তার দুধারে মিনাবাজার বসে, আর প্রশস্ত দীঘিতে অসংখ্য নৌকা— সাঁতরার গঙ্গার বড় বড় ভাউলিয়ার মতো—আলোয় আলোয় ছয়লাপ—নাচ-গান, আতসবাজি...দুইটা মিলাইয়া প্রায় এক পক্ষ ধরিয়া ইন্দ্রের আগমনে সমস্ত শহরটা যেন সত্যই অমরাবতী হইয়া ওঠে!...ও-সব না হয় হইল ; কিন্তু এই ইন্দ্রপূজার বর্ণনাটা কে দিবে মায়ের কাছে? এটা যার ভাগে পড়িবে দাঁড়িপাল্লাটা তাহার দিকে এমন ঝুঁকিয়া যাইবে যে সমস্ত ভাগ-বাঁটরা একেবারে নিরর্থক হইয়া যাইবে। কাহিনীটাতে গাল ভরিয়া বর্ণনা করিবারও অনেক মাল-মসলা ; তা ভিন্ন আর একটা মস্ত বড় লোভ—মা বেলে-তেজপুরের সিংহবাহিনী পূজার কথা বলেন, মাকে স্বীকার করিতে হইবে দ্বারভাঙ্গারই জিৎ। এরা সব এখন দ্বারভাঙ্গারই মানুষ—মা বেলে-তেজপুরের

BanglaBook.org

চেয়ে কত বড় জায়গায় এলেন এ'কথা জানাইয়া দেওয়ার গৌরব অন্যের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া চলে কি করিয়া?

শশাঙ্কর অঙ্কের মাথাটা ভালো, ব্যাপারটাকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া সমস্যাটা মিটাইল—দেউড়ির অংশ আর দীঘির অংশ। লটারিতে দেউড়ির অংশটা শশাঙ্কের ভাগে পড়িল। একটু ক্ষুণ্ন হইল মনে মনে—শুকনো ডাঙার মেলা বাচখেলার সামনে নিষ্প্রভই, একটু ভাবিয়া আনন্দের একটা বুক-ভরা নিঃশ্বাস টানিয়া বলিল—"ভালোই হল আমার।"

শৈলেন সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করিল—"কেন?"

"ভাসানের মেলা তো বাড়ির কাছেই হবে, মা দেখবেনই এই ক'মাস বাদে।"

শৈলেন বলিল—"আমি দেউড়িটা নেব।..."

শশাঙ্ক সহজে রাজী হইতে চাহিল না, তবে শেষ পর্যন্ত হইল রাজী, বলিল—"হাজার হোক তুই ছোট ভাই।"

কিশোর-মনের একটা প্রবণতা হিসাবে কথাগুলা মনে পড়ে, বেশ কৌতুক বোধ হয়। কার্যত কি গল্প বলা হইয়াছিল, কি হয় নাই অত মনে নাই। এটা মনে আছে যে, সদ্যসদ্যই কিছু বলা হয় নাই। বাড়ির নিচেই ছোট খালটি, বাঁশের পুলের উপর দিয়া দুই ভাই ওঁদের প্রতীক্ষায় রাস্তার ধারে গিয়া দাঁড়াইল, কাকা গেছেন স্টেশনে। ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। নামিলেন সবাই; এরা মুখে অর্ধেক হাসি ফুটাইয়া আছে, ওঁরা কিন্তু সবাই বিষণ্ন। শশাঙ্ক-শৈলেনের স্মরণ হইল—বিষণ্ন হইবার তো কথা—মুখের ভাবটা বদলাইয়া লইল, বা আপনিই বদলাইয়া গেল। বোধ হয় গল্পের দুরদৃষ্ট দেখিয়াই দুই ভাইয়ে একবার পরস্পরের মুখের পানে চাহিল।

বাবা, কাকা কেমন একটা ক্লান্ত অবহেলায় জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন। ঠাকুরমা, মা, খুড়িমা বাড়ির দিকে ধীরে অগ্রসর হইলেন। তিনজনেই একটা একটা কি প্রশ্ন করিলেন—মায়ের কথাগুলা মনে আছে—"তোরা ভালো আছিস্ তো রে?" গলাটা একটু ধরা।

পুলটা পার হইয়া এদিকে পা দিতেই মা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

বাড়িতে আসিয়া একটু একলা পাইয়া শৈলেন খুড়িমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা কাঁদছেন কেন গা খুড়িমা?"

খুড়িমার চোখ দুইটিও ভিজিয়া গেছে, আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিলেন—"অহিকে যে আনতে পারলেন না, বাবা।"

এমন কিছু ব্যাপার নয়—সবাই বিষণ্ন ভাবেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, বেশির মধ্যে মায়ের চোখে না হয় দুই ফোঁটা জল। কিন্তু শৈলেনের বেশ মনে পড়ে ঐটুকুতেই সেদিন তাহাকে বেশ অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল। হইতে পারে যে ঐ অশ্রুর জন্যই অত আড়ম্বর করিয়া জমানো গল্প বন্ধ রাখিতে হইল বলিয়া ওর কিশোর-মন একটা ধাক্কা খাইয়াছিল, অন্য কিছুও হইতে পারে— ঠিক মনে পড়ে না, এখন শুধু এইটুকুই মনে পড়ে যে ঐ একরত্তি চোখের জলে মা সেদিন আর সকলের চেয়ে আলাদা হইয়া

BanglaBook.org

গিয়াছিলেন। মায়ের যেন একটা নূতন রূপ খুলিল যাহাতে শৈলেনের মনটা একটা অদ্ভুত বিস্ময়ে ভরিয়া রাখিল। ঠাকুমা, বাবা, খুড়িমা কেহই দূরে গেলেন না, তবে মা যেন পূর্বের চেয়ে আরও অনেক কাছে আসিয়া পড়িলেন।...ব্যাপারটা এইখানেই শেষ হইল না—ঐ বিস্ময়ের পাশেই কখন বিষাদ আসিয়া জড়ো হইল; চিররুগ্‌ণ, ম্লানদৃষ্টি অহির জন্য বুকটা টন্ টন্ করিতে লাগিল। অর্থাৎ মায়ের চোখের জলে বাড়ির হাওয়ায় যে একটা করুণ সুর উঠিয়াছে, শৈলেনের সমস্ত মনকে সেটা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ছেলেবেলার মন, অহেতুকী তাহার গতি, সব চেয়ে আশ্চর্য এই হইল যে এই বিষাদই এক সময় একটা অকারণ অভিমানে রূপান্তরিত হইয়া গেল। বিষণ্ণভাবে এদিক্ ওদিক্ করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেলে শৈলেন খালের ওপারে একটা নির্জন জায়গায় গিয়া বসিল।...সে যেন মরিয়া গিয়াছে অহির মতো; তাহার পর কত কি হইয়া গেল, পাণ্ডুল ছাড়িয়া আজ যেমন সকলে দ্বারভাঙ্গায় আসিয়াছেন, তেমনি দ্বারভাঙ্গা ছাড়িয়া আবার যেন অনেক দূরে কোন্ এক জায়গায় গিয়াছেন,...সকলেই আছে, শুধু শৈলেন নাই। সবাই নূতন ঘরে উঠিল, বিষণ্ন, শুধু মায়ের চোখে দুই বিন্দু জল চক-চক করিতেছে —শৈলেনকে যে আনিতে পারিলেন না তিনি!...নির্জনে বসিয়া শৈলেনের চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিল, ঠোঁট দুইটি বার-দুয়েক থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিসের থেকে যে কি হইয়া যাইত ছেলেবেলায়!

অবশ্য সমস্ত স্মৃতিটা যে এই রকম করুণ তা নয়। অনেকক্ষণ গুমরিয়া গুমরিয়া, একটু রাত হইতে যখন ঘরে আসিল দেখে একটা আলোর সামনে বসিয়া শশাঙ্ক প্রবল উৎসাহে ইন্দ্রপূজার বাচখেলার গল্প বলিয়া যাইতেছে—মা, খুড়িমা, হরেন, চাঁদু—মা আবার শুনিতেছেন সব চেয়ে যেন বেশি আগ্রহের সহিত, শশাঙ্কর পিঠে ডানহাতটা, ঘাড়টা তাহার পানে ফিরানো, মুখে একটু একটু হাসি।

শৈলেনের মনটা আবার একটা ধাক্কা খাইল—বাঃ, তাহার এমন চমৎকার গল্প বলিবার সন্ধ্যাটা তাহলে শুধু শুধুই তো বেশ নষ্ট হইয়া গেল!

মনটা দাদার উপর আক্রোশ-মিশান এক-রকম ঈর্ষায় আর মায়ের অদ্ভুত আচরণের জন্য নিরাশায় সে কি উৎকট ভাবেই ভরিয়া উঠিয়াছিল, সে কথাও খুব স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে।

॥ ২ ॥

দ্বারভাঙ্গার সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হইল। প্রথমেই মনটা এখানকার বাড়ির বড় বড় জানালা দেখিয়া যেন প্রসার লাভ করিল!...পাণ্ডুলের সেই ঘুলঘুলি, সেই উগ্র অবরোধ—গৃহ-প্রাচীরের মধ্যে মনটা হাঁপাইয়া উঠিলে, অতি কষ্টে একটি ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে বাইরের জগতের সামান্য একটু পরিচয় লাভ—গুটিকতক গাছ, মাঠের একটা ছোট্ট ফালি, চারিদিক থেকে অবরুদ্ধ আকাশের একটুখানি নীলিমা—সব একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।...এখানে বড় জানালার কাছে দাঁড়াইলে একটা গোটা দিকের প্রায় সমস্তটা ধরা দেয়। তা ভিন্ন তাহাতে কত বিচিত্রতা! বাড়ির প্রায় গা ঘেঁষিয়াই খালটা—এখানে বলে নহর। নিতান্ত অপরিসর, কিন্তু সেই জন্য আরও চমৎকার লাগে। শ্রাবণের শেষ। নদীতে একটা

BanglaBook.org

বন্যা আসিয়াছে, নহর বহিয়াই তাহার জল একটি সংযত স্রোতে চলিয়াছে দীঘিটার পানে—ও-দীঘির পর আর একটা দীঘি, তাহার পর আর-একটা।...চণ্ডীচরণ বলিলেন—"বৌদি, দীঘি-পুকুর দেখতে হয় তো দ্বারভাঙ্গা ; তুমি বর্ধমানের গল্প কর, কাছে ঘেঁষতেই পারে না। একদিন গাড়ি করে তোমায় বেড়িয়ে নিয়ে আসব, তখন বলবে।"

নহরের পরে অল্প একটু জমি, মাঝখানে একটা পুরনো ইঁদারা। তাহার পরেই আবার একটু খানা-গোছের, নহর আর সেটার মাঝখানের জমিটুকুকে যেন একটা ছোট্ট দ্বীপ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পরই প্রশস্ত টানা রাজপথ—সব মিলিয়া বাড়ি থেকে হাত-কুড়ি-পঁচিশের মধ্যেই। রাস্তাটা গাড়ি-ঘোড়া আর নানা রকমের মানুষে সদাই গম-গম, বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে বলিয়া বেশ নিশ্চিন্তভাবেই বসিয়া বসিয়া দেখা যায়।

আসিবার তৃতীয় দিনের কথা—গিরিবালা রান্নাঘরে ছিলেন, ছোট জায়ের ডাকে ঘরের জানালার সামনে আসিয়া একেবারেই একটা নূতন জিনিস দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন।—সামনে আর পিছনে দুইজন করিয়া চারিজন ঘোড়-সওয়ার—চামড়ায়-পিতলে ঝকমকে সাজ ঘোড়ার—লাল, মোটা বনাতের ওপর জরির কাজ করা পোশাক ঘোড়সওয়ারের। মাঝখানে আরও অপূর্ব ব্যাপার—মখমলের সাজ পরা, মাথায় সামলা দেওয়া, ষোল বেয়ারার একটা পালকি, মখমলের উপর অজস্র সাঁচ্চার কাজ-করা তাহার ঘেরাটোপ, দুই দিকে চার-পাঁচজন করিয়া নানা রঙের কাপড়-পরা দাসী, দুইজন ঘেরাটোপের গায়ে রূপায় বাঁধানো চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে চলিয়াছে, বাকি কাহারও হাতে সোনা-রূপায় গঙ্গাযমুনী ঝারী, কাহারও হাতে রূপার পানবাটার মতো কি, প্রায় সব হাতই রূপার মোটা মোটা গহনায় ঝলমল। দুই জায়েই স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন —কয়টা মুহূর্তের জন্য যেন ছেলেমানুষ হইয়া গেছেন—রূপকথার খানিকটা জীবন্ত হইয়া সামনে দিয়া চলিয়া গেল।

শশাঙ্ক স্কুলে যাইবে, ভাত চাহিতে আসিয়া মা-খুড়িমার অবস্থা দেখিয়া দ্বারভাঙ্গার গুমরে মনে মনে ফুলিয়া উঠিল। বাহিরে নিতান্ত অবহেলার সহিত চাহিয়া দেখিয়া বলিল—"রানী দেখছ বুঝি?—আমাদের স্কুলের কাছ দিয়ে তো রোজ মন্দিরে যান।"

রাজধানীর বড় রাস্তা, সাধারণে-অসাধারণে মিশানো নিত্য এই জনস্রোত ; একটু মনটা চঞ্চল হইলেই গিরিবালা একবার জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়ান। রাজপথের পর একটা আমবাগান, তাহার পরই গাড়িতে-ইঞ্জিনে গমগম দ্বারভাঙ্গার প্রকাণ্ড রেল-স্টেশনের প্রাঙ্গণ। নিজ স্টেশনটা একটু ওদিক পানে বলিয়া যাত্রীর কোলাহলটা অত কানে আসে না—শুধু গতিশীল জগতের একটি পরিপূর্ণ রূপ চোখের সামনে সদাই নিজেকে মেলিয়া ধরিয়া থাকে। পাণ্ডুলের মতো অসহায় মনে হয় না, মনে হয় না যে জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন আছি—সে যে এক কি অসহ্য মনের ভাব!

ছোট-জা একদিন কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"দিদি, পাণ্ডুলের সম্বন্ধে অবিশ্যি বলতে নেই একথা—বাবা পাণ্ডুলেই এসেছিলেন তো—তবু ধরো দ্বারভাঙ্গাতেই যদি এঁদের ভালো কাজ হয়, এখানেই যদি থাকতে পাই আমরা..."

অনেক দিন পরে এই ধরনের একটা মনোভাব গিরিবালার মুখেও প্রকাশ পাইয়াছিল, সামান্য উপলক্ষেই। একটা ছোটখাটো কি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে ; শশাঙ্ক প্রথম স্থান পাইয়াছে—মাকে আসিয়া খবর দিল। গিরিবালা স্থির নেত্রে পুত্রের পানে চাহিয়া

BanglaBook.org

রহিলেন, তাহার পর তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"হবিই তো, তোদের বিকাশ-মামার আশীর্বাদ, তোরা বড় জায়গায় বড় হবি বলে ভগবান আমাদের এনেছেন এখানে, দেখছিস না?"

সত্যই, পাণ্ডুলের চেয়ে এখানে মনের আশাও বড় হইয়াছে ; সবার আশীর্বাদ ফলুক এখানে—জেঠামশাই, বাবা, পণ্ডিতমশাই, কাতু মাসি, বিকাশ দাদা—সবার প্রাণ-ঢালা আশীর্বাদ ; যাহাদের লইয়া জীবন তাহারা এইখানে বড় হইয়া গিরিবালার জীবনকে পূর্ণ করিয়া তুলুক।

জায়গার মতো মানুষের সঙ্গে পরিচয় হইতে লাগিল। আসিবার দ্বিতীয় দিনের কথা —সন্ধ্যা হইয়াছে, জিনিসপত্র এখনও সব গোছানো হইয়া ওঠে নাই, নিস্তারিণী দেবী ঘরের মধ্যে সেই কাজেই ব্যাপৃত আছেন, গিরিবালা শাঁক বাজানো শেষ করিয়াছেন, এইবার ধুইয়া তুলিয়া রাখিবেন, এমন সময় সদর দোর দিয়া জনচারেক স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন বর্ষীয়সী, বিধবা, সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে যতটা বোঝা গেল বেশ টকটকে রং, কাঁচি দিয়া ছাঁটা চুল কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। বাকি দুইজনের মধ্যে একজন প্রায় গিরিবালার মতো, একজন বছর কয়েকের ছোট হইবেন। একটি ছোট মেয়ে, বছর বারো কি তেরো বয়স। পাণ্ডুলের কড়া পর্দার অভ্যাসে এদেশে ব্যাপারটা এতই অস্বাভাবিক ঠেকিল যে গিরিবালা যেন মূঢ়ের মতো ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। অদ্ভুত অভ্যর্থনা দেখিয়া উঁহারাও একটু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন, বড় দুইজনের মধ্যে যিনি অপেক্ষাকৃত ছোট তিনি হঠাৎ দুই পা বাড়াইয়া হাসিয়া বলিলেন —"মুখফোঁড় বলে আমার বদনাম আছেই, রাগ করবেন না বৌদি, আমি তো ভেবেছিলাম আমাদের দূর থেকে দেখেই বুঝি আপনি শাঁক বাজিয়ে অভ্যর্থনা করলেন, কিন্তু এখন দেখছি..."

দলের মধ্যে অল্প একটু চাপা হাসি উঠিল। ততক্ষণে গিরিবালারও সম্বিৎ হইয়াছে, শাঁকটা তুলসীমঞ্চের উপর রাখিয়া আগাইয়া গিয়া বলিলেন—"আসুন আসুন।"

বর্ষীয়সী এবং তাঁহার অপর সঙ্গিনীকেও বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া, ছোট মেয়েটির মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"এসো মা।"

একটু লজ্জায় পড়িয়া গেছেন, জড়িত কণ্ঠে আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, বর্ষীয়সী বলিলেন—"ননীর কথায় কেউ কান দেয় না মা, কিছু মনে করো না। শাশুড়ী কোথায়?"

যাঁহাকে ননী বলা হইল তিনি ঠোঁটে হাসি চাপিয়া বলিলেন—"বুদ্ধিমান হলেই দেয় কান ; নইলে তো এতক্ষণ ঐখানেই দাঁড়িয়ে থাকতেন হাঁ করে।"

এবার সকলে একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, তাহারই মধ্যে গিরিবালা বর্ষীয়সীকে বলিলেন—"মা ঘরেই আছেন, ডেকে দিই"—বলিয়া একটু পা চালাইয়াই ভাঁড়ার-ঘরের পানে চলিয়া গেলেন, এবং তখনই একটি কম্বল হাতে করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বলিলেন—"আপনারা বসুন, মা এলেন বলে।"

বারান্দায় কম্বলটা বিছাইয়া দিলেন।

ওঁদের বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিস্তারিণী দেবী হাত-পা গামছায় ভালো করিয়া মুছিয়া লইয়া বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডুলের অভ্যাসে ওঁরও একটু আড়ষ্ট

BanglaBook.org

ভাব, বর্ষীয়সীই বলিলেন—"আমরা এলাম আপনাদের এখানে বেড়াতে।"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বড় আহ্লাদের কথা ; আমরা আপনাদের আশ্রয়েই এসে পড়েছি।"

সঙ্গিনী তিনজনকে প্রণাম করিবার আদেশ করিয়া বর্ষীয়সী বলিলেন—"বিদেশে সবাই আমরা পরস্পরের আশ্রয়।...চণ্ডীর মুখে, আপনারা এসেছেন শুনে কাল ভাবলাম যাই, সন্ধ্যের পরে একটু আটকে গেলাম—পোড়া জায়গায় দিনমানে তো আর বেরুবার জো নেই, পর্দা নষ্ট হবে! আর এটুকু পথ গাড়ি করে আসাও চলে না।"

প্রণামের পালার মধ্যে গিরিবালা একটু ফাঁপরে পড়িয়াছেন। এঁরা ব্রাহ্মণ না কি? বধূর অস্বস্তির ভাবটা বুঝিয়া নিস্তারিণী দেবীও কি করিয়া তথ্যটা সংগ্রহ করিবেন ভাবিয়া ভিতরে ভিতরে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, ননীবালা হাসিয়া বলিলেন—"বৌদি, মা আমাদের বামুনেরই মেয়ে।"

সবাই একসঙ্গে একটু হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালা তাড়াতাড়ি নত হইয়া গায়ের ধূলা লইলেন, বর্ষীয়সী আশীর্বাদ করিয়া নিস্তারিণী দেবীর দিকে একটু চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন—"দেখলেন তো?—মুখে একটু যদি আগল থাকে, আমাকে পর্যন্ত বাদ দেয় না।"

পরিচয় হইল। এঁরা এখানকার পুরনো বাসিন্দা। যেমন হিসাব পাওয়া গেল, মধুসূদন যে-সময় পাণ্ডুলে আসেন ইঁহার স্বামীও প্রায় সেই সময় বরাবর দ্বারভাঙ্গায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং চাকরি ও সেই সঙ্গে নানা রকম কারবার করিয়া এই শহরে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বছর দুয়েক হইল তাঁহার স্বর্গলাভ হইয়াছে, এখন বড় ছেলে কারবার দেখেন। তিনি ছাড়া আরও তিনটি ছেলে, তাহার লেখাপড়া করে, খবর পাওয়া গেল একটি শশাঙ্করই সহপাঠী। গল্পচ্ছলে যতটা পরিচয় পাওয়া গেল তাহাতে নিস্তারিণী দেবী আর গিরিবালা বুঝিলেন, শহরে এঁদের বেশ প্রতিপত্তি আছে, বাঙালী সমাজে তো বটেই, তাঁহার বাহিরে পর্যন্ত। কথাবার্তার মধ্যে চমৎকার একটি মার্জিত রুচির ছাপ, বর্ষীয়সীর তো বটেই, বাকি তিনজনেরও। তিনটির মধ্যে বড়টি পুত্রবধূ, মাঝেরটি কন্যা এবং ছোটটি দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়ার কন্যা ; সম্বন্ধে নাতনি। পুত্রবধূটি বৌ-মানুষ বলিয়া একটু স্বল্পবাক্, ছোট মেয়েটি নেহাৎই ছোট, ঠাকুরমার গা ঘেঁষিয়া চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। মেয়েটি কথাবার্তায়, গতিবিধিতে একটু মুক্ত, একটু বেশি রহস্যপ্রিয়ও। বাঙালীর মেয়েছেলে পথ বাহিয়া দেখা করিতে আসিল দেশের মতোই—গিরিবালার শুধু যে ভালোই লাগিতেছিল এমন নয়, আশ্চর্যও বোধ হইতেছিল। এঁদের মুখেই শুনিলেন অনেক বাঙালী পরিবারের কথা—দূরের কথা আলাদা, তবে পাড়ার মধ্যে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়া-আসা আছেই। বর্ষীয়সী একটু দুঃখ করিয়া বলিলেন—"তবে ঐ সন্ধ্যের পর। দেশের মতো দুপুর হল, কি বিকেল হল, একবার কাছে-পিঠে থেকে বেরিয়ে এসে মনটা হালকা করে এলাম সেটি হবার জো নেই! নেহাৎ গায়ে-গায়ে বাড়ি হল, চোরের মতন এদিক ওদিক দেখে হুট করে যদি চলে যেতে পারা গেল তবেই। কী কঠিন পর্দা দিদি, বোলো না আর ; কত পাপেই যে বিদেশে বুড়ো বয়স পর্যন্ত কনে বোয়ের মতন কাটাতে হল!"

কতকটা যেন আপনা-আপনিই গিরিবালা শাশুড়ীর পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বৌমার আমার পাণ্ডুলের কথা মনে পড়ে গেল। আপনি

এইতেই দুঃখু করছেন, সে-পর্দা যদি আবার দেখতেন!"

ননীবালা বলিলেন—"আমরা কিন্তু মার মতন অত মানি না জেঠাইমা।"

বর্ষীয়সী বলিলেন—"তোরা মানিস্ না, তোদের মানায়; তোরা হলি এখানকার ঝিউড়ি মেয়ে, এখানেই জন্ম, এখানেই সব। বুড়ো হলেও আমরা তো বউই এখানকার, বলুন দিদি?"

ননীবালা নিজের ভাজের পানে চাহিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"বৌদিদিও মানেন না।"

তিনি শঙ্কিত-ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"ওমা, এমন কথা বলো না ঠাকুরঝি! আমি আবার কবে না মানলাম?"

"এই যে বেড়াতে এলে, সন্ধ্যেই হোক আর যাই হোক, বৌ-মানুষ তো?"

"ওমা, এ তো তোমার সঙ্গে এসেছি!"

"শুনছ মা নিজেই এখনও বৌ-মানুষ।"

সকলেই এক-সঙ্গে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বর্ষীয়সী হাসির মধ্যেই অনেকটা ক্লান্তভাবে বলিলেন—"পারি না আর তোর জ্বালায়। চোপোর দিন এই করছে দিদি, আর বলবেন না। অত কথা কি, আপনাদের বাড়িতে এই প্রথম এল, ঢুকতে না ঢুকতেই বৌমার সঙ্গে..."

ননীবালা বলিলেন—"তোমারই বৌমা, আমার তো বৌদিদিই।"

"তা বলে প্রথম সম্ভাষণেই ঠাট্টা করতে হবে?"

"ননদ হয় ঠাট্টা করে, নয়তো কোঁদল, কোন্‌টে ভালো হত বল না?...শুনুন জেঠাইমা, এতগুলি লোক বাড়িতে ঢুকলাম, বৌদি কোথায় এসে 'আসুন বসুন' বলে খাতির করবেন, কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন—কোঁদলের ব্যবস্থাই তো? সে জায়গায় যদি কোঁদল না করে ঠাট্টা করে থাকি...তাহলে তো দেখছি আসাই মুশকিল..."

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"না মা, তুমি সর্বদাই এসো আর নিজের ভাজ জেনে কোঁদল-ঠাট্টা যখন যা খুশি তাই করো; একটি নয়তো, দুটি ভাজ তোমার এখানে, বিদেশে পাড়াগাঁয়ে থেকে ওঁরা যে কী মানুষ-ক্যাংলা হয়ে গেছেন।"

আরও খানিকক্ষণ গল্পের পর উঁহারা ঘর-দুয়ার আসবাব-পত্র দেখিয়া ইঁহাদের যাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় গিরিবালা একটু একান্তে পাইয়া ননীবালার হাত ধরিয়া বলিলেন—"খুড়িমা হুট বলতেই আসতে পারবেন না, আপনি কিন্তু আসবেন ভাই।"

ননীবালা গলা নামাইয়া বলিলেন—"আমার কি অসাধ? কিন্তু যম যে এখানেই।"

নতুন সম্পর্কে ননদ-ভাজের মধ্যে একটু হাস্যবিনিময় হইল, গিরিবালা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়াই বলিলেন—"সে তো ভালো কথাই আরও, তিনিই পাইক হয়ে আসবেন, নিয়ে যাবেন।"

উহারা চলিয়া গেলে গিরিবালা বলিলেন—"কী চমৎকার মানুষ সব, না মা?"

নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"হ্যাঁ, ভালোই মনে হল তো, দিব্যি মিশুকে, মেয়েটিও বেশ হাসিখুশি।"

BanglaBook.org

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"তাহলে আমরা কবে যাব মা ওঁদের বাড়ি? বলে গেলেন যেতে..."

নিস্তারিণী দেবী বধূর মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিলেন, 'রা' অক্ষরটার উপর ঝোঁক দিয়া বলিলেন—" 'আম্—রা'!...একটু সবুর করো মা, শহরের চাল কি অত তাড়াতাড়ি ধরতে আছে? আমার মালাছড়াটা এনে দাও তো!"

মালা দিয়া আসিয়া গিরিবালা জাকে বলিলেন—"শুনলি তো ছোট-বৌ?...আমাদের আবার শহরে বাড়ি হওয়া! পাণ্ডুল মজ্জায় মজ্জায় সেঁধিয়ে রয়েছে।"

ছোট-বৌ বলিলেন—"উনি আবার ওখানে চুল পাকালেন। ভাগ্যিস চুল কাঁচা থাকতে থাকতেই আমরা চলে আসতে পেরেছি!...না দিদি, পাণ্ডুল মাথায় থাকুন, পাঁচটা লোকের মুখে পাঁচ রকম কথাও তো শুনতে পাব এখানে! তা ভিন্ন আমি তোমার মতো অত মুষড়ে পড়ি নি।"

বড় জায়ের মুখের পানে চাহিয়া মিটি-মিটি হাসিতে লাগিলেন। গিরিবালা রহস্যটা ভেদ না করিতে পারিয়া বলিলেন—"বুঝলাম না।"

"ঐ ননী ঠাকুরঝি ;—ও কি না টেনে নিয়ে গিয়ে ছাড়বে ভেবেছ নাকি? মার কোন জারিজুরিই খাটবে না—আমার কথা লিখে রাখ।"

সেই রহস্যপ্রবণ নাছোড়বান্দা মেয়েটির সামনে শাশুড়ীর অসহায় ভাবটা যেন উপলব্ধি করিয়া দুইজনে কৌতুকরঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন।

॥ ৩ ॥

এক-একটা অবসরের মধ্যে তবুও পাণ্ডুলের জন্য মনটা হু-হু করিয়া ওঠে, চারিদিকে চারটি মাটির ঘর দিয়া ঘেরা সেই ক্ষুদ্র জগৎটি, মাঝখানে প্রশস্ত উঠান, এক পাশে তুলসী-চবুতরা—বৈকালের পড়ন্ত রৌদ্র চালের উপর, ও-বাড়িতে যাওয়ার পথে সজনে গাছটির উপর পড়িয়া ঝিলমিল করিতেছে, দাওয়ায় মা ঠাকুরঝির চুল বাঁধিতে বসিয়াছেন, নিচেই পাড়ার মেয়েরা— পড়াউয়ের বৌ, শনিচ্‌রার বোন, দুখনার খুড়ি—তাহাদের সব কথাতেই একটা বিস্ময়ের ভাব জাগাইবার চেষ্টা করিয়া গল্প—"আই হে দুলহীন!—শুনলিয়েই?" ...হয়তো দুলারমন বসিয়া আছে সামনেই—সেই ছেলেবেলার দুলারমন—হাস্যময়ী—পড়াউয়ের বৌয়ের কথার উপর একটা ঠাট্টার কথা বলিয়া হাসিতে যেন উল্টাইয়া গেল। ...আহা, দুলারমন—যা অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া আসিয়াছেন! আর খজনী? ওঁরা সব কত করিয়া বলিলেন, কিন্তু আর আসিতে চাহিল না।

একটি সখীর মতোই পাণ্ডুল যেন সারা অঙ্গে জড়াইয়া আছে। নিজদের আলাদা করিয়া ভাবা যায় না।...কে আছে সেই বাড়িতে এখন? কাদের কণ্ঠস্বর? ঘরে, দাওয়ায়, উঠানে কি রকম সব পায়ের আঘাত পড়িতেছে—কি রকম শিশুর কলহাস্য? কাহারা আসে যায়? দুলারমন আর আসে না কি? খজনী কি আবার নবাগতদের শিশুর ভার লইল?...না, খজনী আর শিশু ছুঁইবে না বলিয়া শপথ করিয়াছিল—আসিবার এক দিন আগে অরুকে খুব করিয়া একবার বুকে চাপিয়া গিরিবালার কোলে ফিরাইয়া দিয়াছিল —চোখ ডব ডব করিতেছে—বলিল, "অব হামি ফিন্ বাচ্চার মায়ায় কখনও ভুলব না

গো দুলহীন—বড্ড বেইমান—বড্ড বেইমান!...” ঝরঝর করিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িল। গিরিবালা বলিলেন—“পরের ছেলেই তো? তুই এবার সংসারী হ্‌ খজনী—নিজের খোকা মানুষ কর।” “নেই হে দুলহীন!!”—বলিয়া যেন কত আতঙ্কেই খজনী সেই যে পলাইল, আসিল তাহার পরদিন একেবারে যাত্রার সময়—শাম্পেনী থেকে খানিকটা দূরে আতাগাছের তলায় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের প্রাণ দিয়া গিরিবালা এই ইচ্ছা-বন্ধ্যা খজনীর মন বুঝিতে পারেন—ছেলেরা বেইমানই—সত্যই তাহারা যে কত বেইমান হইতে পারে!...অহির কথা মনে পড়ে—মায়ের বত্রিশ নাড়ীর অত দরদ—সবই তো ভুলিল সে?—শেষ পর্যন্ত সব পাণ্ডুলই অহি-ময় হইয়া রহিল তাঁহার কাছে। গিরিবালা চোখ মোছেন—ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখেন—কেহ আসিয়া পড়িল না তো? শুধু দুঃখের পাণ্ডুলই পড়ে মনে, তাই যেন ভালো লাগে আরও বেশি করিয়া। পাণ্ডুল যেন জায়গা নয়, বাড়ি নয়,—যেন একজন কে—অভিমানে মুখ ভার করিয়া আছে।

তবুও দ্বারভাঙ্গা ধীরে ধীরে পাণ্ডুলকে চাপা দিয়া ফেলিতে লাগিল। পাণ্ডুলে প্রথম প্রথম আসর কথা মনে পড়ে—চারিদিকেই অপরিচয়, চারিদিকেই বিধিনিষেধ, দিন দিনই মনটা যেন নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে। দ্বারভাঙ্গা সম্পূর্ণ আলাদা, এখানে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে, নিত্য নূতন অভিজ্ঞতার আগ্রহে ও আশায় মনের দল যেন এক একটি করিয়া বিকশিত হইয়া উঠিতেছে।

ওঁরা শ্রাবণ মাসে আসিলেন, আশ্বিনের শেষাশেষি পূজা আসিয়া পড়িল। এখানে বারোয়ারি দুর্গাপূজা নাই, তবুও পূজার যে সাড়াটা পড়িয়া গেল, ওঁদের অন্তঃপুর পর্যন্ত তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল। আরও একটা ব্যাপার—সে রকম ব্যাপার বোধ হয় কুড়ি বৎসরের মধ্যে তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। অষ্টমীর দিন গেলেন প্রতিমা দেখিতে। ঘোড়ার গাড়ি করিয়া যাইতে যাইতে সে যে কী আগ্রহ! অনেকটা যেন শিশুর কৌতূহলের সঙ্গে পরিণত বয়সের ধর্মভাব মিশিয়া গিয়াছে। গাড়ি হইতে যখন নামিলেন মনে হইল কি যেন এক নূতন লোকে আসিয়া গেছেন।—সামনেই বর্ষার জলে কূলে-কূলে ভরা বাগমতী নদী—উত্তর হইতে আঁকিয়া-বাঁকিয়া আসিয়া মন্দিরের সামনে খানিকটা বিস্তারলাভ করিয়া আবার লীলায়িত গতিতে দক্ষিণের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ওপারের ভাঙা তটের উপর আমবাগান, কাশবন, গাছে-লতায় ঢাকা এক-আধটা ঘর; এপারে ছায়াবৃত কাঁচা ঘাট, তাহার পরেই নানাবিধ দোকানের সারি, তাহার পরেই মন্দির। নানা রকম নানা বয়সের মানুষ, মেয়ে, বেটা-ছেলে; মাঝে মাঝে বাঙালীর মুখ দেখা যায়, পরিচিত আবার অপরিচিত। গাড়ি থেকে নামিয়া চারিদিকে একবার বিহ্বলভাবে চাহিয়া গিরিবালা কতকটা যেন ছেলেমানুষের মতোই প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ মা, এই নদীতেই নাইব তো?” এত বড় সৌভাগ্যটা যেন কল্পনাতেই আনিতে পারিতেছেন না।

চাপা-গলায় একান্তেই বলিলেন, কিন্তু চণ্ডীচরণের কান এড়াইল না, হাসিয়া বলিলেন—“না, বেলে-তেজপুরের গোঁসাই-ঠাকরুণের জন্যে একটা আলাদা আসবে।...ইস্টিশনের রেলগাড়ি নাকি বৌদি?”

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—“পাণ্ডুলে যা হয়েছিল বাবা, বিশ্বাসই করতে পারছেন না।”

BanglaBook.org

সমর্থন পাইয়া গিরিবালা চাপা-গলায় বলিলেন—"নদীতে নাওয়া সেই সাঁতরায় মা, শৈলেন কোলে।"

বাইরের মাটির প্রতি কণাটি মাড়াইয়া যেন নদীতে নামিলেন। স্নান হইল খরধার, মুক্ত স্রোতের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়া ; ডুব দিয়া দিয়া আশ আর মেটে না। এদিকটা সব মেয়েই, বেশ মুক্ত দৃষ্টিতেই সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, চারিদিকের পূর্ণতার ছোঁয়াচেই মনটা যেন কিসে পূর্ণ হইয়া গেছে। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সেই বহুপূর্বে সাঁতরার গঙ্গায় প্রথম স্নান। এটা নিশ্চয় অত বড় কিছু নয়, তবুও বয়েসের, অভিজ্ঞতার পরিণতিতে, তাহার উপর বোধ হয় দিনটির মাহাত্ম্য-অনুভূতিতে আজও যেন একটা নূতন কি উপলব্ধ হইল—নদীর স্রোতে জলের আর এক উচ্চতর স্তর সৃষ্টি করিয়া যেমন বান ডাকে সেইরকম গোছের।...সবাই উঠিয়া আসিয়াছে, গা মুছিতেছে, বেটাছেলেদের কাপড় ছাড়া পর্যন্ত হইয়া গেছে, গিরিবালা তখনও জলে—স্রোতের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে সামনের পানে চাহিয়া আছেন। বিপিনবিহারী বলিলেন —"কবির মেয়ে, টেনে না তুললে উঠবে না চণ্ডী, ব্যবস্থা কর।" চণ্ডীচরণের আদেশে হরেন গিয়া ডাকিল—"মা, তোমার হল না?"

যাহাকে মন্দির বলা হইয়াছে, সেটি মন্দির গোছের কিছু নয়, খুব বড় একটা চৌকো ঘর। মাঝখানে বড় একটি বেদির উপর শ্যামা মূর্তি। শ্যামাই এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সমস্ত এই দেবভূমিটুকুর নাম কালী-স্থান। জনশ্রুতি এই যে, কোন বাঙালী তান্ত্রিক এইখানে কালী-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, পরে দ্বারভাঙ্গারাজ দেবীর জন্য এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। বাংলার মতো মিথিলাও তন্ত্র-সাধনার ক্ষেত্র ; রাজপরিবারের কুলদেবীই কঙ্কালী কালী।

স্থায়ী মূর্তি কালীই, তবে নবরাত্রে এখানে মাটির প্রতিমা গড়িয়া দশভূজা পূজারও ব্যবস্থা আছে। তাহার জন্য কালী মন্দিরের পাশেই অনুরূপ আর একটি ঘর আছে, অপেক্ষাকৃত ছোট। দেশের মতোই ঘুরিয়া ঘুরিয়া পূজার জন্য নৈবেদ্য মালা কিনিয়া, প্রতিমা দেখিয়া একটা মাটির পুতুলের সামনে দাঁড়াইয়া দর করিতেছেন, সামনে দুইটা ঘোড়ারগাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল এবং ননীবালা, তাঁহার জননী ও আরও অনেকে অবতরণ করিলেন। নজর পড়িতেই ননীবালা হন হন করিয়া আগাইয়া আসিয়া গিরিবালার হাতটা ধরিয়া বলিলেন —"বাঃ কি চমৎকার! তোমরাও এসেছ?"

মাঝে আরও কয়েক বার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে, হৃদ্যতা বাড়িয়াছে।

গিরিবালা বলিলেন—"আমাদের তো হয়েও গেল, ফিরতি।"

"ফিরতি বললেই শুনছি কি না ; চল আর একবার ঠাকুর দেখে আসবে।" বলিয়াই ননীবালা "ঐ যাঃ!"—বলিয়া চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া হাতটা একটু উঁচাইয়া এমন সতর্কতার ভঙ্গিতে দাঁড়াইলেন যে, গিরিবালাকে বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিতে হইল—"কি হল?"

"ঠাকুর দেখবার কথাটা মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল কিনা? ভয় হচ্ছিল 'যাব না'—না বলে বসো আবার!"

ফিকির দেখিয়া দুই জায়েই হাসিয়া উঠিলেন। গিরিবালা পাশেই শাশুড়ী এবং অল্প দূরে স্বামী-দেবরকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া বলিলেন—"নিজের হাতে তো নয় ভাই।"

BanglaBook.org

"ও, এই কথা? জেঠাইমা তো আমার হাতে।"—নিস্তারিণী দেবী পাশে একটা দোকানে তুলসীকাঠের মালার দর করিতেছিলেন, ননীবালা কাছে গিয়া বলিলেন—"বৌদিদের আমরা একটু নিয়ে যাই জেঠাইমা ; আমরা এই এলাম।"

"আমাদের তো হয়ে গেছে দেখা মা, ফিরছি যে এবার।"

দুই জায়ে আসিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। ননীবালা বলিলেন—"আর কিছু না, দেখাটা হয়ে গেল বৌদির সঙ্গে, এখন মনটা এই দিকে পড়ে থাকবে, পুজোর ব্যাঘাত হবে, সঙ্গে সঙ্গে থাকলে আর সেটুকু..."

নিস্তারিণী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"তাহলে নিয়ে যাও।"

গিরিবালা বলিলেন—"তোমরা তো দেখছি স্নান করে এসেছ..."

ননীবালা ভ্রূযুগল কপালে তুলিয়া বলিলেন—"নিশ্চয়, না হলে তোমায় ছুঁতে সাহস করি?"

ভিড়ের মধ্যে সকলেই সম্ভব-মতো সংযত হইয়া হাসিয়া উঠিলেন। গিরিবালা বলিলেন—"আমি তাই বললাম? দেখ তো মা। বললাম নাওয়াটা সারা হয়ে থাকলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।"

নিস্তারিণী দেবীকেও আবার যাইতে হইল ; ননীবালার মা সবাইকে গুছাইয়া লইয়া উপস্থিত হইলেন, সঙ্গিনী হিসাবে তাঁহাকেও টানিলেন। নিস্তারিণী দেবী পুত্রের পানে চাহিতে বিপিনবিহারী বলিলেন—"হয়ে এসো তাহলে, আমরা এখানে দাঁড়াচ্ছি।"

পাশেই মন্দিরের সঙ্গে সংলগ্ন, উঁচু দেয়াল ঘেরা খানিকটা বাগান গোছের ; প্রতিমা দর্শন করিয়া সকলে সেখানে উপস্থিত হইলেন। জায়গাটায় পুরুষমানুষ কেহ যায় না, স্ত্রীলোকেরাই বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করে, নিজেদের মধ্যে দেখাশোনো আলাপ-আলোচনা হয়। সেইখানে অনেকগুলি নূতন বাঙালী পরিবারের সঙ্গে দেখা হইল, ননীবালা, তাঁহার জননী এঁদের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। দ্বারভাঙ্গা শহর দ্বিধা-বিভক্ত, এক নিজ্ দ্বারভাঙ্গা, অন্যটি লাহেরিয়াসরাই—আদালত, কাছারি সব সেইখানেই—অনেকগুলি উকিল, মুন্সেফ ডেপুটির পরিবারের সঙ্গে জানা-শোনা হইল। কয়েক জনের গায়ে একেবারে আধুনিক গহনা-পরিচ্ছদ, কেহ বেশ গায়ে পড়িয়া ভাব করে, কেহ একটু গম্ভীর, একটি পরিস্ফুট হাসির সঙ্গে নিজের বিভিন্নতাটুকু বজায় রাখিতে চায়। একজন ননীবালার বোধ হয় বেশি পরিচিত, গিরিবালার পরিচয় করাইয়া দিতে একটি ভঙ্গি সহকারে বেটাছেলের মতো হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, ভ্রূ কপালে তুলিয়া প্রশ্ন করিল—"এখানকার পাড়াগাঁয়ে সতেরো-আঠারো বছর কাটিয়েছেন আপনি! এখানকার শহরে-শহরেই আট বছর কাটাল—ভাগলপুর, ছাপরা, গয়া, দুমকা—তবু বছরে অন্তত বার তিনেক কলকাতায় না গেলে হাঁফ ধরে যায়।"

হাসিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটু কি মিশাইয়া চোখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া গিরিবালার পানে চাহিল, যেন অদ্ভুত কি দেখিতেছে।

একটু সরিয়া আসিয়া ননীবালা একটু নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"দেখে নাও বৌদি, পাণ্ডুলে পড়ে থাকলে এ জিনিস দেখতে পেতে? আমাদের দ্বারভাঙ্গা একটি চিড়িয়াখানা!"

গিরিবালা একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন—"আস্তে ঠাকুরঝি, শুনতে পাবেন।"

"বয়ে গেল! শুনতে পাওয়ার জন্যেই তো বলা। মানুষের মতন একটু আলাপ

BanglaBook.org

কর, না, 'কলকাতায় না গেছে হাঁপিয়ে উঠি'! কেউ আর মুন্সেফের বৌ হয় না; কলকাতাতেই পড়ে থাকে!"

একটি বর্ষীয়সীর আবার কেমন করিয়া গিরিবালাকে চোখে লাগিয়া গেল। পরিচয় প্রসঙ্গে বার-বারই তাঁহার মুখের পানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাহিয়া লইয়া কখনও ননীবালার মা, কখনও নিস্তারিণী দেবী, কখনও বা ননীবালাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—"কত রকম মন্তব্য করিতে লাগিলেন—পাঁচটি ছেলের মা? ...কোলে একটি মেয়ে?—বড় আদরের বোন হবে...সাঁতরায় এদের বাড়ি? ও মা, সে যে খুব সমাজ জায়গা গো...এক একজনকে দেখলেই কেমন একটা আহ্লাদ হয়, মায়া বসে যায়—যায় না?—আপনার বৌটি সেই রকম দিদিই...বেশ লক্ষণমন্ত বৌ...একবার আমাদের ওখানে নিয়ে আয় না এঁদের সবাইকে ননী, দোষ কি? আমার বৌমা দেখলে বর্তে যাবেন; নতুন পোয়াতি, আসতে পারলেন না তিনি। তিনিও এই রকম শান্ত-শিষ্টটি কিনা—বর্তে যাবেন একেবারে..."

ননীবালা বলিলেন—"কিন্তু আমি যে একেবারেই শান্ত নয়, ঢুকতে দেবে কেন?"

সকলের মধ্যে একটা হাসি পড়িয়া গেল। বর্ষীয়সী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শোন কথা ননীর! অথচ সে-বেচারি ননী-ঠাকুরঝি বলতে অজ্ঞান! যাবি, নিশ্চয় যাবি শীগ্‌গির।"

আবার, থিয়েটার আসিতেছে, দিন পনেরো পরেই; বাঙালীদের কালীপূজার বারোয়ারিতে।

জীবনের গতি বড় বিচিত্র, মানুষ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক এক সময় নিজের বয়স ছাড়িয়া দশ-বারো বছর আগাইয়া যায়—হয়তো আরও বেশি। তেমনি আবার পিছাইয়াও যায়—প্রৌঢ়া হয়তো হইয়া পড়ে একেবারে কিশোরী...থিয়েটার আসিতেছে, গিরিবালা ছোট্ট মেয়ের মতোই উদ্বেগ লইয়া প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। ও-জিনিসটা তাঁদের জীবনে দেখা হয় নাই। যাত্রা অপেরার অভিজ্ঞতা আছে প্রচুর, থিয়েটার বাদ পড়িয়া গেছে; ওঁদের ছেলেবেলায় ওটা এখনকার মতো গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করে নাই। তাহার পরই পাণ্ডুল—সেখানে যাই বলো, অপেরাই বলো, থিয়েটারই বলো—সেই এক নটুয়া।

অবশ্য আগ্রহটা বাহিরে বাহিরে প্রকাশ করেন না, তবে ছেলেরা যখন গল্প করে, সীন-সীনারির বর্ণনা দেয়, হাতের কাজ ভুলিয়া আগ্রহভরে শোনেন।

শৈলেনের এখনও মনে পড়ে—মা ছিলেন একেবারে আদর্শ শ্রোত্রী। রান্নাঘরের এক দিকে বসিয়া ওরা তিন ভাইয়ে আহার করিতেছে, শৈলেন বলিতেছে—"নিরোদবাবুর জনার পার্ট দেখ, কাঁদিয়ে যদি না ছাড়েন তো আমায় তখন বলো। ইস্কুল থেকে আসবার সময় রোজ রিহার্সেল শুনছি...আর সে গান! দাদা, যখন সেই 'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর' গানটা গান!..."

গিরিবালা পিঁড়ির উপর বসিয়া একটি ঈষৎ-হাসিতে উৎসুক দৃষ্টিতে ঘাড় বাঁকাইয়া চাহিয়া আছেন, তরকারি দিয়াছেন, খুন্তিটা হাতে রহিয়াই গেছে, প্রশ্ন করেন—"খুব মিষ্টি গলা বুঝি?"

শশাঙ্ক গম্ভীরভাবে বলে—"কলকাতার দানীবাবুর নাম শুনেছ?"

BanglaBook.org

শোনেন নাই বলিয়াই প্রশ্ন। গিরিবালা মানিয়াও লন, বলেন—"পাণ্ডুলে পড়েছিল তোদের মা, শুনবে না?...খুব ভাল গাইতে পারে বুঝি দানীবাবু?"

একটা বেশ কৌতুককর ব্যাপার চলিতে থাকে, বেশ চমৎকার। মা হইয়া গেছেন ছোট, অভিজ্ঞতায় ছেলেরা হইয়া গেছে বড় ; ছেলের থাকে দর্প—সে যে বেটাছেলে, অনেক দেখিয়াছে, পড়িয়াছে ; মায়ের মুখে থাকে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি। ছেলে যদি বুঝিত তো দেখিত সেটাও একটা প্রসন্ন দর্পেরই। ছেলের কাছে পরাভবই যে মায়ের বিজয়!

গিরিবালার প্রশ্নে শশাঙ্ক একটু হাসিয়া শৈলেনের দিকে চায়, নিরীহ ব্যঙ্গের স্বরে বলে—"দানীবাবু গাইতে পারে! শুনে রাখ্ রে শৈলেন!"

মায়ের দৃষ্টির সে-অমৃত শৈলেন এখন বোঝে। লজ্জিত হইবারই কথা তো? কিন্তু ছেলেদের পানে চাহিয়া একটা অপূর্ব শান্ত হাসিতে মুখটা আলো হইয়া গেছে, বলিতেছেন —"ঠাট্টা রাখ বাপু, মা জানে না বলেই তো জিজ্ঞেস করেছে। তোরাও যেন জন্মেই এতটা বড় হয়েছিস, এত দেখেছিস, এত শুনেছিস!...দ্যাখ না!"

যাহা বহু প্রত্যাশিত তাহা যখন আসিয়া পড়ে, তখন অধিকাংশ স্থলেই নৈরাশ্য বহন করিয়া আনে। থিয়েটার সম্বন্ধেও তাহাই হইল। যাহাকে ছেলেরা স্টেজ বলিতেছে সেটার একটু নূতনত্ব আছে বটে, তবে আরও উঁচুদরের কিছু আশা করিয়াছিলেন বলিয়া কয়েক বিষয়ে যেন বিসদৃশ ঠেকিল—নদীও গুটাইয়া যাইতেছে, পাহাড়ও গুটাইয়া যাইতেছে, ঘর-বাড়িও গুটাইয়া যাইতেছে। একবার একটা যুদ্ধের দৃশ্য, মৃত সৈন্যেরা মাটিতে পড়িয়া আছে, হঠাৎ মাঝে একটা প্রকাণ্ড রাস্তাসমেত দুই সারি চারতলা পাঁচতলা বাড়ি হুড়মুড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল ; অপঘাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কয়েকজন মৃত সৈন্যকে তাড়াতাড়ি বাঁচিয়া উঠিয়া সরিয়া পড়িতে হইল। উপর থেকে মুড়ি ছড়াইয়া বৃষ্টি দেখানো হইল। প্রথমটা একটু লাগিয়াছিল ধোঁকা, কিন্তু হঠাৎ স্টেজের মধ্যে থেকেই কাহার একটা কালো বিলাতি কুকুর চেনসুদ্ধ ঢুকিয়া পড়িয়া সেগুলো খুব ব্যস্তভাবে খুঁটিয়া বেড়াইতে থাকায় একটা উগ্র রকম গোলমাল বাধিয়া গেল। যাহার কুকুর সে স্টেজের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া চেন ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল—এদিকে প্রেক্ষাগার হইতে কতকগুলো দুষ্টু ছেলে 'টমি-টমি' বলিয়া চিৎকার করিতে কুকুরটা দোটানায় পড়িয়া প্রবল আপত্তিসূচক নানা রকম ডাক শুরু করিয়া দিল। 'ড্রপ ফেল্, ড্রপ ফেল্' করিয়া একটা শব্দ উঠিল, সামনের পটটা মাঝ পর্যন্ত নামিয়া আটকাইয়া গেল, তাহার পর দুইবার ঝাঁকানি খাইয়া নামিয়া আসিয়া কুকুরের ব্যাপারটা চাপা দিল। এদিকে উগ্র হাস্যের গোলমাল আর ওদিকে স্টেজে কথা-কাটাকাটি, আহত কুকুরের কাতরানি—এই সব মিলিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা তুমুল বিশৃঙ্খলা লাগিয়া রহিল। ননীবালা গিরিবালার পাশেই বসিয়াছিলেন, উগ্র হাসিতে নিজের পেটটা চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন— "আমি এইজন্যেই আরও আসি বৌদি, ভূ-ভারতে আর কোথাও এত হাসির খোরাক যোগাতে পারে না...ওঃ—বাবা গো!—কুকুরে বিষ্টি খাচ্ছে!...মুড়ির কথা কার পোড়া মাথায় ঢুকল বল তো...কী, না, জলের মতন চকচক করতে করতে পড়বে ; বাবাঃ, এত জানে!...তা মুড়ির কথা ভাবলি তো কুকুরটার কথা ভাব্—ওঃ..."

হাসিতে দুইজনে দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিলেন।

যাই হোক্, রাতটা গোলমালে কাটিল মন্দ নয়। লাভের মধ্যে লাভ—আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হইল ; একটা জায়গা থেকে অপরিচয়ের আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়া গিয়া বেশ একটি নিজস্বতার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে, আর ভাল-মন্দ সব কিছুর উপরই একটা দরদ আসিয়া পড়িতেছে। লাহেরিয়াসরাই হইতে একটি পরিবার দেখিতে আসিয়াছিল, একটু নাক সিঁটকাইয়া বলিল— "পোড়া কপাল! এই দেখতে আবার তিন মাইল পথ বেয়ে এলাম!"

পাশাপাশি দুইটি শহর—ভাব-আড়ি দুই-ই আছে ; ননীবালা মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া চিপটেন কাটিলেন—"এর চেয়েও খারাপ হয় বলে আমরা দ্বারভাঙ্গা ছেড়ে অন্য কোথাও যাই-ই না।'

গিরিবালা একটু অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিলেন। থিয়েটার ভাঙিয়া গেলে বলিলেন—"বেশ বলেছ ঠাকুরঝি ; হ্যাঁ গা, অমন একটু বে-গোছ সব কাজেই হয়ে যায়, তাই বলে..."

দ্বারভাঙ্গা দোষে-গুণে মায়া বিস্তার করিতেছে।

॥ ৪ ॥

দ্বারভাঙ্গাতেও দেখিতে দেখিতে তিনটা বৎসর কাটিয়া গেল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা শশাঙ্কের উপনয়ন। উল্লেখযোগ্য বিশেষ করিয়া এই জন্য যে, বিপিনবিহারী ও গিরিবালার সন্তান-সম্পর্কিত এই প্রথম কাজ ; তাহা ভিন্ন নূতন বাড়িতেও এই প্রথম উৎসব। বিপিনবিহারী কতকটা সাধ্যাতীতই খরচ করিলেন। ছোট বোন অভয়া দেবী পূর্ব হইতেই আসিয়াছিলেন, কাজের সময় আর তিনজনেও আসিলেন ; শিবপুর হইতে আসিলেন শশাঙ্কের দুই মামা। দ্বারভাঙ্গার বাড়িটার শ্রী কয়েক দিনের জন্য একেবারে অন্য রকম হইয়া উঠিল।

জীবনে পূর্বেকার অন্য সব উৎসব হইতে এ উৎসবের সুর বেশ একটু স্বতন্ত্র। অবশ্য সংসারে শাশুড়ীই সব, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া সব কিছু, তবুও এই উৎসবের লহরগুলি চারিদিক হইতে আসিয়া যে দোলা দেয় তাহাতে একটা নূতন ধরনের অনুভূতি জাগে—মনে হয়, জীবনে একটা মস্ত-বড় সার্থকতা আসিল—মা হওয়ার যেন একটা নূতন অর্থ হইল। কাজ-কর্মের ব্যস্ততার মাঝে হঠাৎ এক এক সময় অন্যমনস্ক হইয়া শশাঙ্কের পানে চাহিয়া থাকেন—তাহার উপর যেন একটি নূতন আলোক আসিয়া পড়িয়াছে—সেই আলোকে হঠাৎ বড় হইয়া ছেলে যেন একটু আলাদা হইয়া পড়িয়াছে। এক একবার এক অদ্ভুত ধরনের কষ্ট হয় ; সবাই বলে পৈতার সঙ্গে ওদের নাকি আলাদা করিয়া জন্ম হয়—দ্বিজ মানে নাকি তাই। ওর ছেলেবেলা থেকে একটি ধারাবাহিক চিত্র-পরম্পরা চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে—ধীরে ধীরে বড় হইয়া আসিতেছে তবু যেন নিতান্ত মায়ের জিনিস। পৈতা ওর জন্মান্তর, সবাই বলিতেছে—নিশ্চয় ঠাট্টা করিয়া বলিতেছে—পৈতার পর ছেলেদের জাতও যায় বদলাইয়া, এদিকে স্ত্রীলোক বলিয়া মায়ের জাত যে-কে সেই থাকে।...দেখেন, শশাঙ্ক উৎসবের আয়োজনে কোন না কোন ফরমাস লইয়া ব্যস্ত

ভাবে ঘোরাফিরা করিতেছে—গম্ভীর মুখটা পরিশ্রম আর উৎসাহে রাঙা। একটা নূতন ধরনের ব্যথা লাগে মনে, ভয় হয়। ননীবালা বলেন—"দেখো বৌদি, দণ্ডী নেবার পর ছেলে যেন তিন পা-র বেশি না চলে যায়, তা হলেই ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।" হাসির মধ্যেই হয় কথা, নিজেও হাসিয়াই উত্তর দেন, কিন্তু একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কায় বুকটা দুরু দুরু করিতে থাকে। কী যে অদ্ভুত জিনিস এই সন্তান ; এক জন্মে বেদনা, আর এক জন্মে যে-আশঙ্কা, যে-উদ্বেগ তাহাতে মনে হয় বেদনা ছিল সহস্রগুণ ভালো।

মন যে সর্বদাই এইরকম যুক্তিহীন হইয়া থাকে এমন নয়। এই তো চারিদিকেই ব্রাহ্মণদের পৈতা-হওয়া ছেলে, কে আর সন্ন্যাসী হইয়া গেছে? কে-ই বা হইয়া গেছে মা থেকে পৃথক ; বরং এই যে ছেলের একটা নূতন ব্যক্তিত্ব হইতেছে, এর জন্যই তাহাকে যেন আরও নূতন করিয়া পাওয়া যায়।

তবুও একবার একলা পাইয়া সতর্ক করিয়া দিলেন—"শশাঙ্ক, শোন্ বাবা, তুই যেন তিন পায়ের বেশি এগিয়ে যাস্ নি দণ্ডী নেওয়ার পর।"

শশাঙ্ক এখন স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র, নূতন নূতন কথা শিখিয়াছে, হাসিয়া বলিল —"কী অন্ধ সংস্কার তোমার মা! ও-সব নাকি ফলে?"

গিরিবালা যতটা সম্ভব নির্ভয়ের ভাব দেখাইয়া বলিলেন—'জানি গো জানি—কলিকালে ও-সব কিচ্ছু ফলে না আর, তবু তোমার বাহাদুরি করে তিন পায়ের বেশি যেতে হবে না।...বামন হতে যাচ্ছ, একটা কথা সর্বদা মনে রেখো বলে দিচ্ছি।'

"কি?"

"গোড়াতেই মায়ের অবাধ্য হয়ো না,—সেটা যে কত বড় দোষের!...পৈতেই বলো, যাই বলো, মায়ের চেয়ে কিছুই বড় নয়।"

মাতৃত্বের গুমর নয়, শুধু একটা ভয় দেখাইয়া রাখা।

ভয় পাওয়ার উল্টা পিঠেই তো ভয় দেখানো।

"ভবতি, ভিক্ষাং দেহি মে।"

দাদার পৈতার দিনের সমস্ত উৎসাহ-কোলাহলের উপর ঐ ক'টি সংস্কৃত কথার ঝঙ্কার শৈলেনের কানে যেন এখনও লাগিয়া আছে। সবার আগে ভিক্ষা চাহিল মায়ের কাছে।...শাস্ত্রের ব্যবস্থায় বড় কৌতুক বোধ হয়—নারীর প্রতি অবহেলাটা যেন মাঝে মাঝে মনে পড়িয়া যায়, তাই মাঝে মাঝে অকস্মাৎ মাকে আনিয়া একেবারে সবার পুরোভাগে দাঁড় করাইয়া শাস্ত্র নিজের দোষটা স্খালন করিয়া লয় ; ঋষি, আচার্য, পুরোহিত, এমন কি পিতা পর্যন্ত থাকেন পশ্চাতে।

মা শুধু সন্তানের নয়, শাস্ত্রেরও যেন মস্ত বড় একটা ভরসা।

দণ্ডী-ঘরের মধ্যে মায়ের সামনেই দাদা দাঁড়াইয়া—মুণ্ডিত কেশ, পরনে গৈরিক উত্তরীয়, হাতে বিল্বদণ্ড, গৌর বক্ষের উপর শুভ্র যজ্ঞোপবীত বাঁকা হইয়া নামিয়া আসিয়াছে। কতকটা এই নূতন বেশ-সংস্কারে আবার কতকটা যেন একটা ভিতরেরই অভিনব কিছুতে সমস্ত শরীরটি ভাস্বর।...একটা রব উঠিল—"আগে মাকে ডাকো, মাকে ডাকো আগে...মারই হাতের ভিক্ষে আগে নিতে হবে, এখানে আর সবাই পরে,

BanglaBook.org

বাবা!...মার এদিকে খোঁজই নেই—কোথায় তিনি?...কোথায় গো নতুন ব্রহ্মচারীর মা?...”

ছোট পিসিমা গিয়া মাকে ডাকিয়া আনিলেন—কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, একটা কাজ নয় তো তাঁহার আজ। রাঙাপেড়ে গরদের শাড়িপরা, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়া যেন একটি জ্যোতিশ্চক্রের সৃষ্টি করিয়াছে ; সবার নানা অভিমতের মধ্যে যেন একটু বিপর্যস্ত। বড় পিসিমা হাতে সাজানো ভিক্ষাপাত্র তুলিয়া দিলেন—একখানি রেকাবিতে আলোচাল, পৈতা, দুটি টাকা। শশাঙ্ককে বলিলেন—ব্রহ্মচারী এবার বলো—“ভবতি ভিক্ষাং দেহি মে।” শশাঙ্ক কথাটা বলিয়া কাঁধের ভিক্ষার ঝুলিটা মেলিয়া ধরিল, মা রেকাবিটা উজাড় করিয়া দিলেন। পিসিমা শশাঙ্ককে বলিলেন—“এবার বলো—‘স্বস্তি’।”

অনেকে জড়ো হইয়াছে, বড় পিসিমা সবার মুখের উপর সস্মিতদৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া বলিলেন—“বুঝলেন ঠাকরুন, তিন দিনের জন্যে ছেলে সন্ন্যাসী এখন, সে আর কাউকে প্রণাম করবে না, উল্টে তারই আশীর্বাদ নিতে হবে।”

অন্য কে একজন অল্প অল্প মাথা দুলাইয়া বলিল—“হুঁ, শাস্ত্র বড় কড়া জিনিস বাপু!”

মা একটু মাথা নিচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, চোখে অশ্রু জমিয়াছে, সেটাকে গোপন করা দরকার ; একবার চকিতে একটু হাসিয়া বড় ননদের পানে মুখ তুলিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি হইল, কে বলিল—“মায়ের মনই তো—কেমন একটু উৎলে ওঠেই এই সময়টা।”

উপনয়নটা হইল পাণ্ডুল ছাড়িবার প্রায় বৎসরখানেক পরেই।

একটা জিনিস দিন দিন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল—সংসার অচল হইয়া আসিতেছে। মধুসূদনের মৃত্যুতে অর্থ-সংগতির দিক্ দিয়া যে অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল, বিপিনবিহারী পাণ্ডুলে থাকিতে ধীরে ধীরে সেটা কোন রকমে সামলাইয়া আনিয়াছিলেন মাত্র, বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিবার অবসর হয় নাই। এই সময় পাণ্ডুলের চাকরি গেল। দ্বারভাঙ্গার জীবনটা আরম্ভ হইল অনিশ্চিত ভরসার উপর ;—আশা করা ভালো কিন্তু অনিশ্চিতের উপর ভরসা করিয়া থাকার মতো মারাত্মক আর কিছুই নাই ; একটা কিছু হইবেই, ভগবান কি এতই বিরূপ হইবেন?—তিনিই যখন এতগুলিকে সংসারে আনিয়াছেন।...কথাটা নিশ্চয় সত্য—চরম সত্যই তাহাতে ভুল নাই ; ভুল হইলে একটা কিছু ব্যবস্থা হইয়া যাইবেই, এই ভরসায় হাতে অল্প যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল, সেটার খরচে হিসাবের বিশেষ বালাই না রাখা। নূতন শহরে বাস, বৃহত্তর সমাজের মধ্যে খরচও নানা আকারে হইয়া পড়ে ; বুঝিতে বুঝিতে, টাকাগুলা যে কোন্ পথে বাহির হইয়া যাইতেছে ধরিতে ধরিতে তার অনেকটাই খালি হইয়া আসিল। এই সময় শশাঙ্কর উপনয়নও আসিয়া পড়িল। নিজেদের সাধ তো আছেই, তাহা ভিন্ন চারিদিক থেকেই আত্মীয়-কুটুম্বদের পত্র আসিতে লাগিল—বিপিনবিহারীর কাছে, আবার গিরিবালার কাছেও—প্রথম ছেলের প্রথম কাজ, কেহ কোন ছুতা-নাতা শুনিবেন না।

উপনয়নের পর প্রায় মাসখানেক পর্যন্ত বিপিনবিহারী হিসাবের দিকে ঘুরিয়াও চাহিলেন না। বোনেরা অনেক দিন পরে আসিয়াছে, তাও আসিয়াছে একেবারে তাঁহার সংসারে। পাণ্ডুলে ছিল মধুসূদনের পাতা পুরনো সংসারের ধারা, সেখানে কোন ত্রুটি-

BanglaBook.org

বিচ্যুতি হইলে বিপিনবিহারীর বিশেষ কোন সংকোচ ছিল না, তাঁহাদেরও গায়ে লাগিত না। এখানে এখন আলাদা কথা। তাহা ভিন্ন বোনেরা সেই রকমই আছে। কালের বিস্তারে শাখা-প্রশাখায় তাহারা হইয়া পড়িয়াছে সুদূর কুটুম্ব; ভাই-বোনের মাঝেও মর্যাদা আসিয়া পড়ে।...বিরাজমোহিনীর বড় মেয়েটির বিবাহ হইয়াছে, নূতন জামাইটিও আসিয়াছে।

মাসখানেক পরে, একে একে যখন সবাই চলিয়া গেলেন বিপিনবিহারী হিসাব করিতে বসিলেন। দেখা গেল, অদূর ভবিষ্যতে অনেক ভরসার সেই অনিশ্চিতের গর্ভে একটা কিছু না আসিয়া পড়ে তো এত বড় সংসারটা যে কি করিয়া চলিবে তাহার কোন হদিসই পাওয়া যায় না।

তাহার পরও দুইটা বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এত বড় সংসার, কি করিয়া যে কাটিয়াছে যেন বুঝিয়া ওঠা যায় না। দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলে এখনও যেন আতঙ্ক আসিয়া পড়ে মনে। আর সংসার ঠিক সেইখানেই দাঁড়াইয়া নাই; চণ্ডীচরণের সন্তান-সন্ততি হইয়াছে, নিজেরও ছয়টি পুত্র একটি কন্যা। তা ভিন্ন বড় হওয়া তো শুধু আকারেই বিস্তার নয়, কত সমস্যার আবির্ভাব হয়, জটিলতা আসে। চারিটি ছেলে স্কুলে পড়ে; এক এক সময় মনে হয় ছাড়াইয়া লই, আর কিছু না হোক কাগজ-পেন্সিলেও তো একটা নিয়মিত খরচ আছে, পোশাক-পরিচ্ছদেও ওরই মধ্যে একটা ঠাট বজায় রাখিতে হয়, তাহাতে সংসারে টান পড়ে।...অভাবের কাছে প্রায় পরাভব স্বীকার করিতে করিতে বিপিনবিহারী আবার সিধা হইয়া ওঠেন। ভগবান যেমন দুঃখ দিয়াছেন সেই সঙ্গে দিয়াছেন অটুট স্বাস্থ্য আর অদম্য সাহস।...একটু যেন আশার আলো দেখা যায়, এক এক করিয়া দুটি ছেলের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে, পাশ করিবেই, তাহার পর...

ঋণ হইয়া পড়িয়াছে। দ্বারভাঙ্গা তখন বিদেশই, বিদেশে ঋণের চেহারা যেন আরও ভয়াবহ। তাহাকে তুষ্ট করিতে গিরিবালার গায়ের কয়েকখানি গহনা গেল। নিস্তারিণী দেবী ভাঙিয়া পড়িলেন। বলিলেন—"আমার ভয় হচ্ছে আরও কি দেখতে হবে বিপিন, চল্ পাণ্ডুলে ফিরে যাই। বিঘে-কয়েক ক্ষেত রয়েছে, তারই একপাশে দুটো কুঁড়ে তুলে থাকা যাবে। বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দে, তা থেকেও কিছু আসবে; সমাজের মধ্যে অভাবগুলো যেন আরও বিটকেল হয়ে দেখা দেয়। আর সামনে থাকলে ক্ষেতের জিনিসগুলাও একটু পাওয়া যাবে, এমন ফাঁকি পড়তে হবে না।"

বিপিনবিহারী বলেন—"দেখি..."

স্ত্রীর মতটা জিজ্ঞাসা করেন। মত হইলে সেই অনুযায়ীই যে কাজ করিবেন তাহা নয়; একবার দেখেন—কে কতটা নুইয়া পড়িল।

গিরিবালার অনেক আশা—বিকাশ দাদার কথাগুলো যেন তাঁহার রক্তকণার সঙ্গে মিশিয়া আছে—"বড় মা হতে হবে গিরি।"—এত দুঃখ-অভাবের মধ্যে যে তাহারই আয়োজনেই হইতেছে। বিকাশ দাদা এখনও খোঁজ নেন মাঝে মাঝে। চিঠি যখন আসে, গিরিবালা সব অভিযোগের কথা যান ভুলিয়া—লেখেন এরা সবাই মানুষ হইয়া উঠিতেছে—গৌরবে মনটা ভরিয়া ওঠে বলিয়া লেখার মধ্যে নিজেকে একটু অন্তরালে রাখেন, লেখেন—তিনি নিজে তো অত-শত বোঝেন না, তবে যেখানেই যান ওদের সুখ্যাতি

BanglaBook.org

শোনেন, সবাই বলে ওরা দিবেই পাস, তারপর নাকি কলেজে যাইবে—সে আবার এখানে নয়, কলকাতায় কি পাটনায়—ওঁর এখন থেকে এত ভাবনা হইতেছে—নিতান্ত ছেলেমানুষ কিনা ওরা, কখনও বাহিরে যায় নাই—আর পাটনা তো এখানে নয়, কলকাতা আরও দূর—কী যে করিবেন, এখনই থেকে যেন ভাবনায় পড়িয়াছেন...

নিজের আশাটাকে আশঙ্কার সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া লেখা। যে-দিন লেখেন, সমস্ত দিন এমন হালকা বোধ হয়, সংসারের ছোট বড় দুঃখগুলা যেন স্পর্শই করিতে পারে না ; সব কাজেই যেন নিজের মাতৃত্বকে অনুভব করিয়া ফেরেন।

হরেন, পূর্ণেন্দু কি অরু—এরা সব ছোট, অত বোঝে না, গিরিবালা শশাঙ্ক কিংবা শৈলেনকে কাছে ডাকিয়া প্রশ্ন করেন—"তোদের কষ্ট হচ্ছে বড্ড, না রে?"

ছেলেরা হয়তো বিমূঢ় ভাবেই উত্তর দেয়—কেন মা?

গিরিবালা একটু অস্বস্তিতে পড়িয়া যান ; প্রথমটা বাধো-বাধো ঠেকে,...বলেন—"না, এমনি জিগ্যেস করছিলাম..."

সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা পরিষ্কার করিয়া দেন, একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে বলেন—"এই ধর্ ভালো খাওয়া-দাওয়া পাস না, কাপড়-জামার কষ্ট..."

যখন বলিয়াই ফেলিয়াছেন, স্পষ্ট করিয়াই লইবার জন্য স্থিরদৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া থাকেন।

দুজনেই এ-সব বোঝে আজকাল। একটু হয়তো অপ্রতিভ হইয়া পড়ে, তাহার পরই হাসিয়া একটু চোখ নাচাইয়া বলে—"ভয়ঙ্কর কষ্ট হচ্ছে—ভয়ঙ্কর!—ভয়—ঙ্কর।...মা, তুমি যেন কী হয়ে পড়ছ দিন দিন!..."

শৈলেন আবার একটু ভাবুক গোছের, এক দিন মাকে একলা পাইয়া গল্পে গল্পে মনের অনেক চোরা কুটুরি খুলিয়া ফেলিল। একবার বলিয়া উঠিল— "আমার কি মনে হয় জান মা?"—একটু লজ্জিত দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"কি রে, বল্ না।"

"না, তুমি হাসবে।"

"বলই না ; না হাসব না।"

"মনে হয় আসছে জন্মে তোমরা দুজনে গোড়া থেকেই খুব গরীব থাকবে, খু—ব গরীব ; কিন্তু এই রকম ধার্মিক। তার পর কষ্ট যখন খুব বেশি সেই সময় আমি জন্মাব। তার পর অনেক দিন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠে তোমাদের এত বড় করে তুলব যে..."

গিরিবালা একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, হাসির মধ্যেই কিন্তু আবার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। হাসি আর অশ্রুর মাঝেই বলিলেন—"কি সাধ ছেলের বাবা! আমরা কোথায় মাথা কুটে মরছি—কি করে একটু ভালো খাবে, কি করে ভালো পরবে, ছেলের ওদিকে সাধ..."

একটু পরেই কিন্তু কতকটা বিস্মিত ভাবে বলিলেন—"শোন্ তাহলে, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ; বিকাশ দাদাও ঠিক তোর মতন কথাই মাঝে মাঝে বলতেন শৈল, মামা-ভাগনের একটা মিল থাকেই কিনা। বলতেন 'গিরি, একেবারে বড়-মানুষ হয়ে জন্মাবার মতন দুর্ভাগ্য আর নেই, তাতে মনটা বাড়তে পায় না। মানুষের যত নিচু পর্যন্ত বনেদ

BanglaBook.org

তত উঁচুতে সে উঠতে পারবে—তত বেশি তার মনের প্রসার হবে।'...হ্যাঁ রে শৈল, আর জন্মের কথা আর জন্মে, এ-জন্মেও তো কষ্টটা কম পেলি না—আমরা দুজনে তো তোদেরই মুখ চেয়ে আছি..."

এক দিন আবার হরেনকে প্রশ্ন করিয়া খুব একটা মজার উত্তর পাওয়া গেল। হরেন একটু চনমনে গোছের, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া মুখটা ঘুরাইয়া উত্তর করিল—"কষ্ট কেন? ...যার বাবা নেই, মা নেই, তারই কষ্ট ; আমাদের তো ঠাকুরমা পর্যন্ত রয়েছেন!"

বিকাশ দাদাকে যখন উত্তর দেন, এই সব কথা লিখিতে বড় ইচ্ছা করে—কত বড় মা হইবার যে তাঁর আশা তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিতে ; লজ্জায় অতটা পারিয়া ওঠেন না।

বিপিনবিহারীর প্রশ্নে গিরিবালা যে সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারেন এমন নয়। মনের আশাটা এত বড় সে সেটা প্রকাশ করিয়া বলিতে গেলে, বর্তমান অবস্থার সামনে নিজের মনেই কেমন বেখাপ্পা শোনায়। তা ভিন্ন আশাটা যতক্ষণ মনের গোপনে থাকে, থাকে এক রকম, আলোচনা করিতে গেলেই সেটা যে কত অসম্ভব তাহা যেন স্পষ্ট হইয়া ওঠে।...সাদা উত্তর না দিয়া ঘুরাইয়া বলিলেন—"গয়না দুটো গেল কিনা, মা বড় মুষড়ে পড়েছেন।"

বিপিনবিহারী বলিলেন—"মার কথা থাক্, সে তো তাঁর মুখেই শুনেছি। তোমার মতটা কি—ওদের ছাড়িয়ে নি? মা যা বলছেন সে তো মন্দ কথা নয়..."

গিরিবারা একটু ভীত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিলেন। মুখে দিয়া কোন উত্তর বাহির হইল না।

বিপিনবিহারী অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে স্ত্রীর পানে চাহিলেন, বলিলেন—"মার কথা বলছ—ননীবালাদের বাড়ি নেমন্তন্ন হল, তুমি মাথাব্যথার ভান করে পড়ে রইলে, গেলে না—সেটাও তো গয়নার শোকেই হতে পারে ; ভালো কাপড়ও নেই, গয়নাও গেল, তাই আমাদের ওপর অভিমান করে..."

গিরিবালার মুখটা হঠাৎ এমন হইয়া গেল যেন স্বামীর কথা মনের অন্তরতম প্রদেশে গিয়া আঘাত দিয়াছে, বলিলেন—"তুমি বলতে পারলে কথাটা—এত দিন আমায় দেখবার পর!"

বিপিনবিহারী উত্তরটা ঐ রকমই আশা করিয়াছিলেন, তবে এ আকারে নয়। যাহাকে চিরদিন নরম প্রকৃতির বলিয়া জানিয়া আসিয়াছেন, মনে হইয়াছিল সে নরম ভাবেই, রুচিকর করিয়া বলিবে কথাটা ; একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—"সত্যিই একটু ভুল হইয়া গেছে—এই বংশেরই আর এক বৌ যে খালি পেটে শুধু পানে ঠোঁট রাঙা করে ঠাট বজায় রাখতেন সে-কথা ভুলে গেছলাম।"

গিরিবালা মনের একটু চড়া সুরে বাঁধা তারটা ঢিলা করিয়া দিলেন, তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন—"অত বাড়ায় না, কোথায় তিনি, কোথায় আমি!"

একটু হাসিয়া বলিলেন—"গয়নার কথা বলছ—আসল গয়না তো ওরাই ; বাঁ হাতে শাঁকাটা থাকলেই হল আমার।"

এইখানেই আর একটা কথা বলিয়া রাখিতে হয় ; এই সময়টা প্রায় শেষাশেষি বাইরে

BanglaBook.org

একটা রেল-অফিসে চণ্ডীচরণের চাকরি হইল। বিপিনবিহারী বলিলেন—"বৌমাকে তুমি নিয়ে যাও চণ্ডী।"

আপত্তি করিতে বলিলেন—"বুঝেছি তোমার মনের ভাবটা কিন্তু এই রকম করাতেই আমার বেশি সাহায্য হবে, সেখানেও সামলাবে আমারই সংসারের একটা অংশ তো? তা ভিন্ন ঘরকন্না আর চাকরি দুই-ই সামলাতে গেলে, চাকরিটাই হাতছাড়া হবে ; কত বড় দুঃসময় যাচ্ছে দেখছ না?"

॥ ৫ ॥

ভাইয়েরা বহু দিন হইতেই একবার লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, এবারে উপনয়নের সময় আসিয়া আরও ধরিয়া পড়িল। যাওয়া কিন্তু হইয়া উঠিতেছে না, কয়েক বৎসর ধরিয়াই একটানা একটা কিছু লাগিয়াই আছে। এমন সময় একদিন খবর আসিল, মা হঠাৎ কিশোরের বিবাহের জন্য বড় জিদ ধরিয়া বসিয়াছেন, সামনের মাসে দিতেই হইবে। পাত্রী এখনও ঠিক হয় নাই, তবে অনেক জায়গায় দেখাশুনা হইতেছে। এ-উপলক্ষে গিরিবালাকে আসিতেই হইবে। এখানকার পত্রে দিন ধার্য করিয়া পাঠাইলেই সাতকড়ি আসিয়া লইয়া যাইবেন।

কয়েক দিন আগে ছোট জা চণ্ডীচরণের কর্মস্থানে চলিয়া গেলেন। গিরিবালা বিরূপ অদৃষ্টের উপর যেন অভিমান করিয়া ঈষৎ হাসিয়া স্বামীর পানে চাহিয়া বলিলেন—"হবার নয়, শুধু ভগবানের ঠাট্টা করা!...কত দিন যে দেখি নি সবাইকে ; বাবাও জেঠামশাইয়ের মতো ফাঁকি দেবেনই—বুঝতেই পারছি।"

কয়টা দিন গেল, কি উত্তর দেওয়া হইবে আলোচনা হইতেছে, এমন সময় একটা পোস্টকার্ড আসিল—বরদাসুন্দরী দিন-চারেকের জ্বরে হঠাৎ মারা গিয়াছেন, দিন-দুই পরেই সাতকড়ি গিরিবালাকে লইয়া যাইবার জন্য রওনা হইবে।

শোকের প্রথম বেগটা কমিলে, সে-দিনটা বাদ দিয়া বিপিনবিহারী পরদিন প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক করলে?"

গিরিবালা একটু বিস্মিত হইয়া প্রতি-প্রশ্ন করিলেন—"কি ঠিক করার কথা বলছ?"

"সামনেই এগজামিন ছেলেদের, এখন গেলে..."

গিরিবালার মুখটা কঠিন হইয়া উঠিল, বলিলেন—"ছাড়িয়ে নাও ছেলেদের স্কুল থেকে ; না হয় একটা বছর ঐ ক্লাসেই থাক।"

সঙ্গে সঙ্গেই আবার ব্যাকুল মিনতির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তোমরা কি ভাব?...আমি যেমন মা, আমারও তো একজন মা ছিলেন? মেয়ে হয়ে জন্মেছি বলেই এমন ভাবে সব মুছে দিয়ে সংসার করতে হবে?"

সমস্ত দিন চঞ্চল ভাবে কাটাইয়া বিকালে শাশুড়ীর কাছে বসিয়া হঠাৎ পা দুইটা জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন—"মা, একবার বাবাকে দেখবার উপায় করে দাও —দিতেই হবে তোমায় করে।"

বধূর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিস্তারিণী দেবী বলিলেন—"বিপিনকে বলেছি

BanglaBook.org

বৌমা, চণ্ডীকে তার করে দিয়েছে ছোটবৌমাকে নিয়ে আসবে।...কি করবে বল?—মেয়েছেলের সংসার করা এমনই, তুমি মা হারালে, আমি গঙ্গা হারিয়ে বসে আছি।"

গিরিবালা বারো বৎসর পরে পিত্রালয়ে আসিলেন। কান্না লইয়াই প্রবেশ করিতে হইল এবারে, কিন্তু দুদিন পরে মায়ের শোকটা যখন একটু উপশম হইল, বাড়ির শোকে মনটা আচ্ছন্ন রহিল। চারখানা ঘর লইয়া ছোট্ট মাটির বাড়ি, কিন্তু সেইটুকুই যে কি একটা তৃপ্ত আনন্দ-কলরবে পূর্ণ থাকিত! এখন সে আনন্দ তো নাই-ই, শ্রীও যেন কোথায় চলিয়া গেছে। নিতান্ত যেটুকু সর্বদা ব্যবহার হয় সেটুকু আছে এক রকম, তাহার পরই জঙ্গল। ব্যবহার করার ইতিহাসও শুনিলেন—ভিটা কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতেন শুধু তিনটি প্রাণী—রসিকলাল, বসন্তকুমারী আর বরদাসুন্দরী। তিন ছেলেই শিবপুরে, দুই বৌ-ও। না আসেন যে এমন নয়, শনিবারে শনিবারে কেউ একজন আসেন, সে-রকম কিছু কাজ হইলে বৌয়েরাও দু-তিন দিনের জন্য আসিয়া থাকেন! তেমনি আবার বরদাসুন্দরী মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি গিয়া কয়েক দিন করিয়া কাটাইয়া আসেন। আবার এমনও হয়, বাড়িতে তালা আঁটিয়া তিনজনেই দীর্ঘকালের জন্য শিবপুরে গিয়া রহিলেন।

গিরিবালা ভায়েদের প্রশ্ন করিলেন—"হ্যাঁরে, ভিটে ছেড়ে দিলি সব?"

উত্তর রসিকলালই দিলেন—"ওদের দোষ দিবি না গিরি; বেলে-তেজপুরে আরও থাকবার জায়গা নেই; অন্তত আমাদের পক্ষে তো নেই। পণ্ডিতমশাই গেছেন বিবাগী হয়ে, ঘোষাল কাকা গেছেন মারা, নিকুঞ্জ দাদা—সেও না-থাকার মধ্যেই। তুই বোধ হয় বলবি—সে যা ছিলেন তার চেয়ে এই ভালো, কিন্তু সেটা বোধ হয় ভুল—অনেক শত্রুতা করেছেন, তবুও নিজের লোকই তো? তা ভিন্ন ওরা আসবেই বা কি করে?—ম্যালেরিয়ায় দেশ ছেয়ে গেছে, দুটো দিন যদি থাকে তো জ্বর নিয়ে যায়, বৌমাদের তো আরও সয় না। এবার তো সব বাঁধনই ঘুচল—এক দিক ভেঙে দাদা বেরিয়ে পড়লেন, এক দিক ভেঙে এই ছোট বৌ, এবারে সদরে তালা ঝোলানো ভিন্ন আর কি উপায় আছে বল? আর আমাদেরও তো হয়ে এল—এখন তো এই মনে হয় মা সিংহবাহিনী শিবপুরে যে একটু সঙ্গতি করে দিয়েছেন এই তাঁর দয়া, গঙ্গাই দরকার এখন দুজনের, সেটুকু তো পাব?"

কী রকম যে হইয়া গেছেন বাবা, গিরিবালা যেন ওঁর দিকে চাহিতে পারেন না, চুল প্রায় সবই পাকিয়া গিয়াছে; অমন শরীর টিলা মারিয়া গেছে। যদি হাসেন তো সেটা যেন হাসির মুখোশ পরা।

সাতকড়ি একবার একান্তে পাইয়া বলিল—"ওঁকে এইখান থেকে শিবপুর নিয়ে যেতেই হবে দিদি, তুমিও জোর দাও, নৈলে উনি বাঁচবেন না। ওঁর কবে থেকে এ-দশা শুরু হয়েছে জানো?—যবে থেকে পণ্ডিতমশাই গেছেন চলে। সুন্দর প্র্যাকটিস গড়ে উঠেছিল, লেখাতেও কি সুন্দর হাত খুলে গিয়েছিল, যেই পণ্ডিতমশাই গেলেন, এক দিনে যেন সব উবে গেল।...নিয়ে চল শিবপুরে, সেখানে থাকেনও ভালো, দেখবে।"

নিকুঞ্জ জেঠার সঙ্গে দেখা করিলেন। উপরের ঘরে একটা খাটে আফিম খাইয়া এক রকম নিঝুম হইয়া পড়িয়া আছেন, একবার ডাকে সাড় হইল না, দ্বিতীয় বার একটু জোরে ডাকিতে চোখ খুলিয়া পিট-পিট করিয়া চাহিয়া রহিলেন। গিরিবালা পায়ের ধূ

BanglaBook.org

লইয়া বলিলেন—"জেঠামশাই, আমি গিরি।"

সাড় হইল। একটু ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন, তাহার পর কতকটা বিড় বিড় করিয়াই বলিলেন—"গিরি—গিরি।...বোস্।"

সামনের জলচৌকি থেকে গড়গড়াটা নামাইয়া রাখিয়া গিরিবালা উপবেশন করিলেন।

নিকুঞ্জলাল নিজের কপালের উপর ডান হাতটা বুলাইয়া, পাঁচটা আঙুল দিয়া কপালটা যেন একটু খামচাইয়া ধরিলেন, মাথাটা একটু দুলাইয়া দুলাইয়া বলিলেন—"গিরি—গিরি—হুঁ—দেখতে যে আর পাব এমন আশা ছিল না...দেখ্ না, দিদিভাইয়ের বিয়ে দিয়ে গেল...কৈ গো, গিরি এসেছে একবার এসো—বৌমাও চলে গেল—কত অত্যাচারটা করেছি তোদের ওপর—ঐ দুটো নিরীহ বৌ আর লক্ষ্মণের মতন দুটো ভাই মুখ বুজে—কি বলছিলাম যেন...?"

গিরিবালা বলিলেন—"সে সব পুরনো কথা আর কেন জেঠামশাই?—সে সবই আপনার আশীর্বাদ।"

"ছেলেপুলে কটি বললি নি তো?"

"আপনার ছটি নফর জেঠামশাই, কোলেরটি আপনার দাসী।"

ঘাড়টা গোঁজাই আছে, নিকুঞ্জলাল হাতটা একটু তুলিলেন, বলিলেন—"আশীর্বাদ করব বৈ কি, ফলবেও দেখে নিস্...যাদের বুক ভেঙে গেছে তাদের আশীর্বাদ ফলেই...হ্যাঁ, কি বলছিলাম?...এই তো, ঠিকই বলছিলাম—ছোট বৌমা গেলেন—সতীলক্ষ্মী...দামুদিদি গেল কোথায়?—রসিকের একটা বিয়ে দিয়ে দেবে না?...বাঃ, একা দারাই?—ছোট বাই কে নয়?...দেখলি তোর নতুন জেঠাইমাকে?...বাঃ, একা দাদারই?—ছোট ভাই কেউ নয়?...দেখলি তোর নতুন জেটাইমাকে?...কে গো?..."

দরজার পাশেই একটি স্ত্রীলোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, এক পা আগাইয়া আসিতেই গিরিবালার নজর গেল। বয়স আন্দাজ পঁচিশ-ছাব্বিশ, শ্যামাঙ্গী, একটু ঢ্যাঙা-গোছের, চোখ দুটি রাইমণির মতোই নরম, একটি বছর ছয়েকের ছেলে হাঁটুর কাছের কাপড়টা খামচাইয়া গিরিবালার পানে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গিরিবালা গিয়া প্রণাম করিলেন।

স্ত্রীলোকটি নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"গিরিবালা, না? কার সঙ্গে কথা কইছ—মানুষ?—দুটো কথার মিল পাবে না। এসো বাইরে।"

গিরিবালা ফিরিয়া দেখিতে বলিলেন—"ও ভাবতে হবে না, নিঝুম হয়ে পড়েছেন। এসো তুমি।"

অনেকক্ষণ গল্প হইল ; চোখ দুটির মতো স্বভাবটিও রাইমণির মতো নরম। একটা বিশেষত্ব এই দেখিলেন—নিজের লইয়া গল্প করিলেন না বেশি—যে পরিচয়টুকু না দিলেই নয়, বা যেটুকু নেহাৎই প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িল শুধু সেইটুকু। বেশি ভাগ গল্পই হইল গিরিবালার শ্বশুরবাড়ি লইয়া— কেমন দেশ, কি বৃত্তান্ত—এই সব। নিজের সম্বন্ধে যেটুকু বলিতে হইল তাহাতেও যে একটা বেদনা বা অসন্তোষের সুর আছে এমন মনে হইল না। সোজা বলিয়া যাওয়া—কুলীনের মেয়ে—কি করিয়া সম্বন্ধটা হইল, কি করিয়া বিবাহ হইল..."এখন দুটি ছেলে, এই ইনি বড়—তোমাদের পাঁচজনের কল্যাণে থাকেন বেঁচে

BanglaBook.org

ভালো, নৈলে করছিই বা কি বলো?"

রাইমণির মতোই লুচি-হালুয়া করিয়া জল খাওয়াইলেন, গিরিবালা আপত্তি করিতে বলিলেন—"ও মা, সে কি হয়? এ-বাড়ির যিনি লক্ষ্মী ছিলেন তাঁর কাছে তোমরা কী ছিলে সে কি জানা নেই আমার?"

হারাণের আর সে ভাব নেই, কেন না ঘুড়িটা নেই, আর রসিকলালা নিয়মিতভাবে প্র্যাকটিস্‌ও করেন না। বন্ধু-মনিবের অনুকম্পায় সে জোতজমি করিয়াছে কিছু, তাই লইয়াই থাকে। তবে প্রতিদিন সকালে আসিয়া একবার করিয়া হাজিরা দেয়, তিনটি প্রাণীর গৃহস্থালী, কিছুই কাজ থাকে না, তবু খুঁজিয়া পাতিয়া কিছু না কিছু একটা করিয়া দিয়াই যায়। বয়স হইয়াছে, তবে কষ্টে নাই বলিয়া ভাঙিয়া পড়ে নাই।...রসিকলাল তাগাদায় পড়িয়া যদি কোনও 'কলে' যান, পালকি ডাকিয়া আনে ; পালকিতে যথেষ্ট স্থান থাকিলেও ঔষধের বাক্সটি পূর্বের মতোই নিজের হাতে ঝুলাইয়া লইয়া পাশে থাকিয়া গল্প করিতে করিতে চলিতে থাকে। গিয়া, রসিকলাল যখন রোগী দেখিতে ভিতরে ব্যস্ত থাকেন, পূর্বের মতোই বাহিরে লোক জড়ো করিয়া নানা রকমের মুড়ুলি করিতে থাকে, সান্ত্বনা দেয় —বলে—"দেশে রোগ বেড়েছে তার তোয়াক্কাটা কি? —তোরা গা-ঢেলে অসুখে পড় না কেন—বাবাঠাকুরকে আমি এখান থেকে ছেড়ে দিলে তো কলকাতা যাবেন গিয়ে?...আরও আছি এক ফিকিরে, সে দেখবি'খন।"

চোখ নামাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে।

ফিকিরটা বোধ হয় একেবারে গিরিবালার কাছেই প্রকাশ করিবার জন্যে প্রতীক্ষা করিতেছিল।

উনি আসিবার দিন পাঁচেক পরে হঠাৎ এক দিন একটা মাস-কয়েকের মাদি ঘোড়ার বাচ্চা আনিয়া হাজির করিল—একেবারে বাড়ির মধ্যে। গিরিবালা তিনটি ছেলে এবং কোলের মেয়েটি লইয়া আসিয়াছেন, তাহা ভিন্ন কাজের আয়োজনের বাড়ি—মা, পিসি, বোনের সঙ্গে আরও ছেলেমেয়ে জুটিয়া উঠানে রকে জটলা করিতেছে, ঘোড়ার বাচ্ছা দেখা মাত্রই তাহাদের মধ্যে একটা উৎসুক চঞ্চলতা পড়িয়া গেল এবং একটু ডানপিঠে গোছের বলিয়া অরু দাওয়া হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া এক লাফে বাচ্ছাটার পিঠে চড়িয়া বসিয়া ঝুঁটিটা কষিয়া ধরিল। বাচ্ছাটা চঞ্চল হইয়া পড়ায় পড়ো-পড়ো হইতেই হারাণ তাড়াতাড়ি আনন্দে এরকম চিৎকার করিয়া উঠিল—"গিরি দিদিমণি দেখো, শীগগির দেখোসে।"

ছেলেদের মধ্যে হাততালি নাচ আর নানাবিধ অঙ্গবিক্ষেপের সঙ্গে একটা উৎকট কলরব পড়িয়া গেল। গিরিবালা ঘরে বেসন চালিতেছিলেন, চালুনি হাতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন, আর সকলেও আসিয়া জড়ো হইল, রীতিমতো একটা হট্টগোল পড়িয়া গেল। গিরিবালা ভীত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"শীগগির নামিয়ে দে, এখুনি পিঠ থেকে ছিটকে দেবে ফেলে ও-ডানপিটেকে। নাব বলছি অরু!"

হারাণের মুখটা আনন্দে আর চাপা বিস্ময়ে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, বলিল—"তুমি বাজে বকুনি দিদিমণি—পড়লেই হল যেন। তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু লক্ষণটা মিলিয়ে যেয়ো..."

গিরিবালা ভয়ের সঙ্গে বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"ওরে, নাবিয়ে দে হারাণ—অরু নাব বলছি, কাজের বাড়িতে হাত-পা ভেঙে শেষে একটা..."

হারাণ শুধু সওয়ার আর সওয়ারি উভয়ের পানে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, বিজয়-হাস্যের সহিত বলিল—"আমি যা বললাম—থির হয়ে তুমি শুধু লক্ষণটা মিলিয়ে যেয়ো..."

বাচ্ছাটা হয়তো একটু হতভম্ব হইয়া গিয়াই এক রকম শান্ত ভাবেই দাঁড়াইয়া আছে। হারাণের সাহায্য লইয়া অরু জিহ্বা ও তালুর সংযোগে টক্ টক্ করিয়া একটা শব্দ করিতেছে এবং মাঝে মাঝে নিজের শরীরের দোলা দিয়া সেটাকে গতিমান্ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ভয়টা লাগিয়া থাকিলেও ব্যাপারটা হইয়া পড়িয়াছে হাস্যোপদ্দীপকই বেশি। গিরিবালা একবার সবার মুখের উপর চোখ বুলাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আচ্ছা, আমি লক্ষণ কি মেলাব বল দিকিন?..."

বসন্তকুমারী কতকটা রাগের ভান করিয়া, কতকটা হাসিয়া বলিলেন—"তুই নাবা দিকিন আগে—লক্ষণ তো দেখছি হাত-পা ভাঙবার...আর ছেলেও তোর কি হয়েছে গিরি!—এ কী খোট্টা বোম্বেটে বাবা!...নাব বলছি দাদু..."

হারাণ বলিল—"লক্ষণটা বুঝতে পারলে নি তোমরা?—এটা বাবাঠাকুরের ঘুড়ির নাতনি..."

একটি মুহূর্ত শুধু সকলেই কিছু না বুঝিতে পারিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর সবার উচ্চহাস্যে উঠানটা যেন ফাটিয়া পড়িল, ঠাট্টার সম্বন্ধই বেশি লোকের, ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলিয়া উঠিলেন—"ওমা, সেই জন্যে বুঝি তুই..."

হারাণ একটু রাগিয়া উঠিল—"তোমরা লক্ষণটা কেউ বুঝবে না ঠাকুরুন, সেরেফ ঠাট্টা। শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে বাড়িতে তো এতগুলি ছেলেপিলে রয়েছে, কৈ, গিরি দিদিমণির এই ছেলেটি ছেড়ে তো কেউ লাপ্যে এসে আপন সওয়ারি ভেবে ঘাড়ে উঠে বসল না...কেন? গিরি দিদিমণিই বলুন না, হারাণে সেই কোন্ কালে বলে দেয় নি যে তানার ছেলেই বেলে-তেজপুরের মোক্তার হয়ে বসে বাবাঠাকুরের পাওনাগণ্ডাগুনো জোচ্চোরদের হাত থেকে খালাস করবে?...কৈ, 'না' বলুক দিকিন গিরি দিদিমণি?"

বাড়িতে হাসির একটা ছোঁয়াচ আসিয়া গিয়াছে, তাহার রাগাতে আর বলিবার ভঙ্গিতে হাসিটা বাড়িয়াই চলিল, বসন্তকুমারী বলিলেন—"বেশ, তোমার মোক্তারকে এখন নাবাও দৈবিজ্ঞি ঠাকুর, যখন হবে তখন তার মোক্তারির ব্যাগ হাতে করে পাশাপাশি যেয়ো...তোমার কপালের নেকন কে খণ্ডাবে?"

তাহার অত বড় গুরু-গম্ভীর কথাটা সবাই ঠাট্টাতেই হাল্কা করিয়া দিতেছে দেখিয়া হারাণ একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে, সেই জন্যই আরও একটু বেশি রাগিয়া তর্জনী সঞ্চার করিয়া বলিলেন—"কপালের নেকন আমার নয়, কপালের নেকন তাদের যারা বাবাঠাকুরকে অকর্মণ্যি ভালোমানুষ পেয়ে ফিসের ট্যাকা আটকে রেখেছে—কিছু নয় তো পাঁচশো—হাজার তো হবেই। হারাণে বসে নেই, সেই ঘুড়ির নাতনির পিঠে চড়িয়ে খোকাবাবুকে দিয়ে না আদায় করাই তো..."

একটা ঝাঁকানি দিয়া সওয়ারসুদ্ধ বাচ্ছাটার মুখ সদর দরজার দিকে ফিরাইয়া লইয়া

BanglaBook.org

বলিল—“চল খোকাবাবু তুমি বাইরে—এখানে—কি যে বলে...”

একটু ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—“তা হাসো সবাই, হাসতে তো মানা নেই, কিন্তু য্যাখন দুশমনের ঘরের ট্যাকা এনে ঝনজনিয়া ঢালবে ত্যাখন বলো—হারাণে পরামাণিক একদিন বলেছিল—আর ঢালবেই—সে আমি খোকাবাবুর ঘোড়ায় চড়বার দাপটেই টের পেয়েছি...”

মেয়েদের হাসি ও একপাল ছেলে-মেয়ের হুল্লোড়ের মধ্যে ভাবী মোক্তারকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

এঁদের আর একটি আশ্রিত পরিবারের অবস্থাও এখন ভালো, চারিদিক্‌কার এত কষ্ট-নৈরাশ্যের মধ্যে গিরিবালা খানিকটা তৃপ্তি পাইলেন।—

দুলাল বাগদি কাজের ক'টা দিন এক রকম সপরিবারেই এখানে পড়িয়া রহিল। নিজেদের বয়স হইয়াছে, আর বেশি খাটিতে পারে না, তবে তাহার ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতকুড় সবাই মিলিয়া আনা-থোওয়া, কাঠ কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার করা—তাদের অধিকারের মধ্যে যে সব কাজ তাহার জন্য একটি লোক রাখিতে দিল না। এই পরিবারটিও বেশ সুখেই আছে। কাজের ভিড়ের মধ্যেই একদিন গিরিবালা তাদের সবাইকে একত্র করাইয়া পরিচয় লইলেন। তিনটি ছেলের বৌ, দুইটি জামাই—একটিকে ঘরজামাই করিয়া রাখিয়াছে দুলাল। বলিল—খেঁদিটা, আমাদের দুজনকে ছেড়ে থাকতে পারলে নি দিদিমণি—হুড়কো হয়ে উঠল—য্যাতবার শ্বশুরবাড়ি পাঠাই পেলিয়ে এসে—ত্যাখন ঐ সমুন্দিপোকে বললাম—তু ব্যাটাই তাহলে আমাদের এখেনে এসে থাক...”

—বলিয়া নিজের রসিকতায় হাসিয়া উঠিল।

বেশ জামাইটি হইয়াছে—হৃষ্টপুষ্ট, যেন কালো পাথরে কোঁদা শরীরটা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া তেল-কুচকুচে চুল, টানা টানা দুটি চোখ, বয়স বাইশ-তেইশ। ডাক পড়তে সে কাজের মধ্যেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, শ্বশুরের ঠাট্টায় হাসিয়া মুখটা কাত করিয়া লইল। দুলাল আরও একটু ঠাট্টা করিল, গিরিবালার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—“তা কিন্তু ব্যাটা আমার বেইমান নয় গো দিদিমণি, লোতুন বাপকে আগলে পড়ে থাকে—খেঁদির মতন হুড়কো লয়।”

ছেলেটি লজ্জায় আর দাঁড়াইল না। ওরা সকলে কাজে চলিয়া গেলেও গিরিবালা দুলাল আর তাহার বৌকে বসাইয়া রাখিলেন, বলিলেন—“তোরা একটু বোস্ বাছা ; তবু তোরা মা-সিংহবাহিনীর কৃপেয় বেঁচে-বর্তে আছিস, একটু কথা কইতে পারছি, এদিকে তো পণ্ডিতমশাই গেলেন, ঠাকুরমা গেলেন, ঘোষাল ঠাকুরদা গেলেন, নিকুঞ্জ জেঠামশাইয়ের ঐ অবস্থা...বাড়ির কথা তো ছেড়েই দিলাম...”

দুলাল একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—“হুঁ, আচি বৈ কি বেঁচে দিদিমণি—না বাঁচলে বড়কর্তার জন্যে, ছোটমা'র জন্যে কে শ্মশানে কাঠ বইত গিয়ে?”

হঠাৎই চোখে কাপড়ের খুঁট চাপিয়া খুক্-খুক্ করিয়া একটু কাঁদিয়া উঠিল। গিরিবালার চোখে জল আসিয়া গেল, দুলালের বৌ চোখে আঁচল দিল। প্রায় মিনিট দুই-তিন কেহই আর কিছু কথা বলিতে পারিল না। তাহার পর গিরিবালা চোখ দুইটা মুছিয়া বলিলেন—“চুপ কর, দুলাল, কি আর করবি?”

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শোকটা আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, আঁচলটা মুখে চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন—"তোর তো ভাগ্যি, ওটুকু সেবাও করতে পারলি, আমি মেয়ে হয়ে কি করতে পারলাম বল্? জেঠামশাই যাবার আট মাস পরে টের পাই..."

শোকের আবেগটা প্রশমিত হইতে বিলম্ব হইল। অনেকক্ষণ কোন কথাই যোগাইল না। তাহার পর গিরিবালা বলিলেন—"তা এখন কেমন আছিস-টাছিস বল্ দুলু—সে রকম কষ্টের ভাবটা আর নেই তো? দিনকতক যেন বড্ডই কষ্টে পড়েছিলি পাঁচটা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে।"

দুলাল নিজের পাকা চুলগুলা মুটোয় করিয়া উবু হইয়া বসিয়াছিল, বলিল—"কষ্টটা একটা মস্ত-বড় বিপদের মধ্যে দিয়ে যে কেটে গেল দিদিমণি, শোন নি?"

"বিপদ!—" গিরিবালা একটু বিস্মিতভাবে চাহিলেন।

"বিপদ নয় কেমন করে? পণ্ডিতমশায় বাপের ভিটে বাগদীর ঘাড়ে চাপ্যে গেলেন। তিনি বিবাগী-সন্ন্যিসী, পাপ কাছে ঘেঁষতে পায় না, কিন্তু আমার যে কী দশাটা করে গেলেন!...অথচ গুষ্টিসুদ্যু মরতে বসেছি—বলে লোভ শত্তুরই—আরও শত্তুর হয়ে দাঁড়্যেচে। এদিকে পেটের জ্বালা, সম্পত্তির লোভ, উদিকে পরকালের ভয়...কেউ একটা সৎপরামর্শও দেয় না, মুখ ঘুরিয়ে বসে—ঐ যে, বামুনের একটু দয়া পেয়েচি। বাবাঠাকুরের কাছে এলুম—উল্টো পরামর্শ—বলে, 'পাপটা কি এত সস্তা রে দুলু? পণ্ডিতমশাই যা করে গেচেন তার ওপর চিত্তগুপ্তের আঁচড় চলবে না, এই বলে দিলুম—তুই কর্ তো ভোগদখল'...গুরুরই শিষ্যি তো দিদিমণি! শেষে ভেবে-ভেবে ধর্মঠাকুরের কাচে মাথা খুঁড়ে একটু বুদ্ধি যোগালো..."

গিরিবালা অধিকতর কৌতুকে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, দুলাল বলিল—"বামুনের হাতে বেচে দিনু দিদিমণি,—রেজেস্টারি করে চোখে একটু ঘুম এল—একটুও মিথ্যে নয়, তোমার ছাওয়ায় বসে বলচি—ডাক্তার বাবাঠাকুরের মেয়ে তুমি।"

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"নিলে কে?"

"সে-কথা আর বলু নি—নিলে চক্কোত্তিঠাকুর...হক্কের আদ্দেক দামও দিলে না, চারটে ঘর, অতখানি বাগান! তবে একটা কথায় রাজী করিয়েছি—পণ্ডিতমশাই যে-ঘরটাতে থাকতেন সে-ঘরটায় একটি শিবঠাকুর পিতিষ্টে করে নিত্যি ভোগ দিতে!"

দুলালের স্ত্রী একটি ছোট নাতনীকে কোলে লইয়া এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল। স্বামীর পানে খুব দ্রুত একটা কটাক্ষ করিয়া, মুখটা ঘুরাইয়া লইয়া মন্তব্য করিল—"তা দিচ্ছে ঘটা করে, কাঁসর-ঘন্টার আওয়াজ শুনতে পাও নি রোজ সাঁজে-সকালে?"

দুলাল একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"দেবে, দেবে, করচে ব্যবস্থা, একদিনেই হয়? আমায় কাল পজ্জন্ত বললে—করচি ব্যবস্থা।"

তাহার বৌ মুখ না ঘুরাইয়া টিপ্পনী করিল—"আর রান্না চড়িয়ে কাজ নেই—পেসাদ খাবে দলা-দলা করে!"

দুলাল চটিয়া উঠিল, বলিল—"তুই চুপ কর, সে তোদের মতন হাড়িবাগদি কিনা —ঠাকুর দেবতাকে ভোগা দিতে যাবে!"

গিরিবালার পানে চাহিয়া বলিল—"তা ত্যাত দিন পজ্জন্ত পণ্ডিতমশাইয়ের পুণ্যির জন্যে আমি করে রেখেছি ব্যবস্থা—সেই ইস্তক ধর্মঠাকুরের ঘরে রোজ একটা বড় ঘিয়ের

BanglaBook.org

পিদ্দিপের যোগাড় আছে ; তা ভেন্ন তানার নাম করে বাবার মন্দিরটাও লতুন কোরে মেরামত করে দিনু—এই লক্ষ্মীর মা-ই সলা দিলে।...তবে কথা কি জান দিদিমণি?—ধম্মবাবা আমাদের ছোটজেতের ঠাকুর কিনা—পুণ্যি যা দেয় তাতে তেমন জোর হয় না...তার সাক্ষী এই আমাদেরই দেখো না গে...”

॥ ৬ ॥

বেলে-তেজপুর ছাড়িতে খুব কষ্ট হইল—জন্মভূমি আর কখনও দেখিতে পাইবেন কি না কে জানে? তবে সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে শিবপুরে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। প্রথমত শোকের পরিমণ্ডল থেকে মুক্তি, দ্বিতীয় সবই নূতন—অতবড় একটা শোকের পর নূতনত্বটা যেন মনটাকে আরও ধুইয়া দিল। ভাইয়েরা খুব একচোট ঘুরাইয়াও আনিলেন—কলকাতার যত দ্রষ্টব্য স্থান—চিড়িয়াখানা, আজব ঘর, পরেশনাথের মন্দির, কালীঘাট ;—পথে পড়িল হাওড়ার পুল, বড়বাজার, চৌরঙ্গী, গড়ের মাঠ...অফুরন্ত বিস্ময়ে চাহিয়া চাহিয়া চোখ দুইটা যেন টন টন করিতে থাকে, অথচ এদিকে পলক ফেলাও যায় না। চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের গৃহিণী গিরিবালা, বিস্ময়ের আকুলতা প্রকাশ করিবার বয়স নাই, তবু দ্বিতীয় দিন সব দেখিয়া শুনিয়া আসিয়া গল্প-গুজবের মধ্যেই একবার অহেতুক ভাবেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভাইয়েরা প্রশ্ন করিতে বলিলেন—তোরা হাসবি, কিন্তু তবু না বলে থাকতে পারলাম না—তোদের কাছে তো দুলারমনের গল্প করেছিলাম সেবার—সেই তার বরের কলকাতায় পালিয়ে আসবার কথা? —এইবার ভাবছিলাম তোদের বলব একটু খোঁজ করতে...ভাগ্যিস বলি নি!”

আবার হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—“তা দোষ দিবি কি করে বল্?—দ্বারভাঙ্গায় থাকি, রাজার শহর—কলকাতা বড়লাঠের শহর না হয় তার চার গুণই হবে ; বাবাঃ, এ কি কাণ্ড রে!”

সামনের দু-এক বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে পরিচয়ও হইল, ক্রমে আলাপ গাঢ় হইয়া উঠিল। শিবপুরের একটা মস্ত-বড় সুবিধা কলিকাতার পাশে থাকিয়াও সেটা একটা মফঃস্বল শহরেরই মতো—বেশির ভাগ রাস্তাই অপরিসর—প্রায় গলির মতো, দোকান-পাট কি গাড়ি-ঘোড়ার বালাই নাই তত। সাঁতরার ধরনেরই, শুধু বাড়িগুলা একেবারে গায়ে গায়ে লাগা। বেশ লাগে, দুপুরবেলা জেঠাইমার সঙ্গে পাশের বাড়ি, সামনের বাড়ি, তাহার পর আবার তাদের সংযোগে কাছের বা অল্প দূরের অন্য সব বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ানো। কাছেই চৌধুরীদের বড় পুকুর, কাকচক্ষুর মতো জল, মেয়েদের জন্য আলাদা ঘাট ; ওদের শিবমন্দিরের পাশ দিয়া—দূর্বা ঘাসে ঢাকা মাঠের উপর দিয়া নিত্যই পাঁচ-ছয়জন মিলিয়া স্নান করিতে যান, ফিরিবার সময় মন্দিরের উঁচু চাতালে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে সমস্ত শরীরটি এমন একটি মধুর শুচিতায় ভরিয়া যায় যে, এক-একদিন চোখের পাতা আর্দ্র হইয়া ওঠে।...কেমন যেন নিজের ঘর, নিজের দেশের পদ্ধতি ; এখানকার জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটিগুলো হইয়া ওঠে নূতন করিয়া সরস, নূতন ভাবে অর্থবান।...গঙ্গাস্নান করিবার বাসনা হইলেও বেশ সঙ্গিনী জোটে, বাজারের ভিড়ের মধ্যে দিয়া লঘুগতিতে চলিয়া যান সবাই, জেটির পাশে স্নানের ঘাটটিতে একটু গড়িমসিও করেন—উন্মুক্ত স্থান,

BanglaBook.org

প্রশস্ত নদী—মনটা একটু তরল হইয়া ওঠে, মনে হয় সত্যই যেন মায়ের বুকের কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এক-একদিন সঙ্গিনীদের কাহারও কাহারও পরিচয়ের জের ধরিয়া আরও নূতন পরিচয় হয়—সাঁতরার গঙ্গার ঘাটের মতই। ফিরিবার পথে রাস্তার ধারেই কালীতলায় প্রণাম করিয়া পূজা দেন ; প্রণাম করিবার সময় বুকটা ভরিয়া ওঠে—মা কেন এমন ভাবে গেলেন?—অহি কোথায়?—দ্বারভাঙ্গার সবাইকে তুমিই দেখো মা—তোমার ভরসাতেই সবাইকে ফেলে এসেছি...আরও সব কত কি কথা, ভালো মতো বোঝা যায় না ; শুধু একটা অসীম নির্ভরতার সঙ্গে মনটা থমথম করিতে থাকে।...আনন্দেরই তো উপকরণ, কিন্তু তবুও যে মনটা কেন আর কি করিয়া বিষাদে গড়াইয়া পড়ে, গিরিবালা আশ্চর্য হইয়া যেন কূল পান না।

বাড়িতে যতক্ষণ থাকেন বাপের কাছেই কাটান, সেবা করিয়া গল্প-গুজব করিয়া ; অবশ্য রসিকলাল যদি থাকেন বাড়িতে। রসিকলালের জীবনটা আবার একটু বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে ; গিরিবালার অনুরোধে-অভিমানে এখন তবুও অনেকটা নিয়মাধীন হইয়াছেন, নচেৎ নাওয়া-খাওয়ার একেবারেই ঠিক থাকে না—হয়তো কোন মঠে গিয়া সমস্ত দিনটাই কাটাইয়া দিলেন, নয়তো কোন নূতন সাধু দর্শন, কি কোথায় কথকতা হইতেছে, কালী-কীর্তন হইতেছে ; এক-একদিন গঙ্গার ধারে কোনও নির্জন জায়গায় বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেন, যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন হয়তো প্রহর দুয়েক রাত্রি অতিক্রান্ত হইয়া গেছে। গিরিবালা থাকিতেও কয়েকদিন এই রকম হইয়া গেল। এক-একদিন সকাল বেলায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া ফিরিলেন সন্ধ্যার একটু প্রাক্কালে। পূর্ব হইতেই বৌয়েদের উপর শপথ দেওয়া, তাঁহারা আহার করিয়া লন, বসন্তকুমারী আর গিরিবালা ভাত আগলাইয়া উপোস করিয়া রহিলেন।...গিরিবালা একটু বেশি অভিমানেই অশ্রুমুখী হইয়া বলিলেন—"তুমি এমন করে আর বাঁচবে না বাবা ; তুমিও যাবে আর জেঠাইমাও যাবেন।"

বসন্তকুমারী বলিলেন—"জেঠাইমার থাকবার ভারি সাধ!...কিন্তু ওঁর শরীর তো পাত হচ্ছে এই করে করে।"

রসিকলাল আসনে বসিতে বসিতে হাসিয়া বলিলেন—"যত বাঁচবার দায় আমার, না?"

বসন্তকুমারী মুখ ভার করিয়া গিরিবালাকে বলিলেন—"ঐ শোন্, সমস্ত দিনের পর ভাতের আসনে বসতে বসতে কথার ছিরি শুনলি তো? কিছু আর বলি না। হ্যাঁরে গিরি, এই তিনটি অপোগণ্ডকে সংসারে বসিয়েছ, এখন একটু..."

অন্নের গ্রাস তুলিতে তুলিতে রসিকলাল থামিয়া গেলেন, হাসিয়া বলিলেন—"সংসার পেতে দিলাম, দেখে-শুনে করুক সব—সেই গল্পের বুড়ির মতো আমায় আবার কুলগাছ আগলে বসে থাকতে হবে নাকি? সে বরং তুমি করো—চুলগুলো শনের নুড়ির মতো হয়েছেও—"

অট্টহাস্যই করিয়া উঠিলেন।

এঁরা দুজনেও না হাসিয়া পারিলেন না। বেগটা থামিলে রসিকলাল গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"তা নয় গিরি, শোন্—আমি হয়েছি গুরুমশাই-মরা পাঠশালের পোড়ো, আমায় এখন পায় কে? না বিশ্বাস হয় এখনও সাক্ষী রয়েছে তোর জেঠাইমা—আমি

BanglaBook.org

চিরকালটাই এইরকমটা ছিলাম না নিজের খেয়াল নিয়ে? বন-বাদাড়, নদীর চর, চষা মাঠ, এ-গ্রাম, সে-গ্রাম,...কে আমায় ফাঁদে ফেলে...”

গলাটা ধরিয়া আসিল, পরিষ্কার করিয়া লইয়া আবেগটাকে যেন ঠেলিয়া রাখিবার জন্যই এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া লইলেন ; একটু অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিয়া আবার বলিলেন—“কেন, ফাঁদে পড়বার পরও তোয়াক্কা রাখি নি—অনেক দিন পর্যন্ত, থাকতেন পণ্ডিতমশাই, ভজিয়ে দিতাম।...তারপর ফাঁদ কষে কষে আমায় একেবারে জখম করে নিজে কেমন টপ করে পড়লেন সরে!”

আবার বুকে যেন কি ঠেলিয়া উঠিল, একটু গলা-খাঁকারি দিয়া সেটাকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—“আমি গুরুমশাই-মরা পাঠশালের পোড়ো...আমায় আর এখন...”

আর রোখা গেল না, বাঁ হাত দিয়া চোখ দুইটা মুছিয়া লইলেন। এঁদের দুজনের চোখেও অঞ্চল, বসন্তকুমারী অঞ্চল সরাইয়া বলিলেন,—“আর খেতে বসে চোখের জল ফেলতে হবে না। পূজা-আর্চা, সাধুসঙ্গ এই সব নিয়েই তো রয়েছ, মানা করতে যাব কেন? তবে যতদিন গিরিটা রয়েছে, অন্তত খাবার সময়টুকু ঠিক রেখো একটু—এই রকম উপোস করে থাকবে ভাত কোলে করে?”

আর একদিন এই রকম একটু অনিয়মের ব্যাপারে প্রসঙ্গটা উঠিল, তবে এবার আর রসিকলালের সামনে নয়। আলোচনার শেষে বসন্তকুমারী বলিলেন—“তাই বলি গিরি—ছোট-বৌ বেশ গেল, আমি যে কী দেখবার জন্যেই রইলাম পড়ে...ভয় হয় এক-একবার ভাবতে গিয়ে।”

সেদিন আর সব কথা বাদ দিয়া মায়ের যাওয়া লইয়াই গিরিবালার মনটা পড়িয়া রহিল। সত্যই কি মা গেছেন ভালো?...গিরিবালার মনটা সমস্ত সংসারটির উপর দিয়া যেন একবার ঘুরিয়া আসিল।—দুই ভাইয়ে ভালো কাজ করিতেছে, কিশোরও শীঘ্র একটি পাইবে। বাড়ি আলো-করা দুটি বৌ। সবচেয়ে বড় কথা—সংসারের আগের ঠাটটি বজায় আছে, বরং এদের সংসারের বাহার বোধ হয় আরও বেশি—তাঁহারা ছিলেন দুই সহোদর ভাই, এঁরা খুড়তুত জেঠতুত হইয়াও অভেদ।...কিন্তু মা বরাবর অনটনের অভাবটাই দেখিয়া গেলেন। যখন নূতন গাছে কচি পাতা দেখা দিল, ফুল ফুটিবে, ফল ধরিবে, তিনি সরিয়া পড়িলেন।...ব্যথিত কণ্ঠে গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—“এই মার যাওয়ার সময় হল জেঠাইমা?”

বসন্তকুমারী বলিলেন—“হ্যাঁ, গিরি, বুঝছিস না তুই, এই তো যাওয়ার উপযুক্ত সময়। ছোট-বৌ ড্যাংডেঙিয়ে চলে গেল।”

মাঘের শেষ। পশ্চিমে থাকিয়া এখানকার শীত আর গায়ে লাগে না, তবে কদিন থেকে একটু মেঘ বৃষ্টি হইয়া ঠাণ্ডাটা অল্পস্বল্প পড়িয়াছে। সেদিন আবার আকাশ একটু বেশি ঘোরালো, মনটা বাইরে থেকে যেন ক্রমাগত নিজের মধ্যে গুটাইয়া আসিতেছে। সন্ধ্যা হইয়াছে। একাদশী, জেঠাইমা সকাল সকাল শুইয়া পড়িলেন। দুই বৌয়ে রান্নাঘরে, বাবা বাইরের ঘরে, একতারার একঘেয়ে আওয়াজের সঙ্গে গুন্-গুন্ করিয়া একটি রামপ্রসাদী গাহিতেছেন, ভাইয়েরা ক্লাবে গেছে। ছেলেরা রান্নাঘরে—ভাত-ডাল যে হইয়া উঠিল, চোখের সামনে এই প্রমাণের সান্ত্বনা রাখিয়া মামীরা গল্প বলিতেছে।

কোলের মেয়েটিকে লইয়া গিরিবালা বিছানায় গিয়া শুইলেন। আজ কি হইয়াছে,

BanglaBook.org

মায়ের যাওয়ার কথাটা ক্রমাগত মনে যাওয়া-আসা করিতেছে— কত বিচিত্র অর্থের সাজ পরিয়া।...মনটি গিয়া পড়িয়াছে দ্বারভাঙ্গায়, অনেক দিন চিঠি পান নাই...জোর করিয়াই জেঠাইমার কথাটা মানিয়া লইতেছেন গিরিবালা—তা তো বটেই, ভালো যাওয়া তো এই —তবু কি একটা বিষাদে মনটা পূর্ণ হইয়া ওঠে—এই দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দুজনের একটিমাত্র আশা—শশাঙ্ক, শৈলেন, হরেন বড় হইয়া উঠিতেছে, দুঃখ ঘুচিবেই—সবাই বলিতেছে, সূত্রপাতও আরম্ভ হইয়াছে—শশাঙ্ক তো দিয়া আসিল পরীক্ষা, লিখিয়াছে—পাস করিবই।...গিরিবালার মনটা সার্থকতার এই রঙীন সূত্র ধরিয়া আগাইয়া চলে—তিন জনে একটার পর একটা করিয়া পাস দিয়া চলিয়াছে—পিছনে আসিতেছে এরা তিন ভাই...ধীরে ধীরে বধূতে, সম্পদে ঘর পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে...নবমীর মতো নাতি-নাতনিরা সংসারের প্রাঙ্গণে নূতন পা ফেলিল এই সময় মায়ের মতো না বলা না কওয়া, ঝপ্ করিয়া একদিন চলিয়া যাইতে হইবে...একটু আগে হইলে বোধ হয় আরও ভালো।

তা না হইলে...ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়...এই তো অহি গেল! কাহার মনে কি আছে কে জানে?...মা যেন উপর থেকে আশীর্বাদ করেন।

গিলিবালা খুকির মাথা থেকে বাঁ হাতটা সরাইয়া লন, দুইটি হাত একত্র করিয়া বার বার কপালে ঠেকান।—আশীর্বাদ করো মা, আশীর্বাদ করো যেন তোমার মতন সব বজায় রেখে যেতে পারি।

এক এক সময় কী যে হয়, চারিদিক দিয়া একই ধরনের ভাবের স্রোত আসিয়া পড়ে। হঠাৎ কিশোরের গলা কানে গেল—"বড় বৌদি আমাকে শিগ্‌গির ভাত দাও। এক হ্যাঙ্গাম হয়েছে।"

প্রশ্ন হইল—"কি হল গা ঠাকুরপো?"

"চাটুজ্জেদের ছেলেটা মারা গেল, এক্ষুনি নিয়ে যেতে হবে।"

গিরিবালার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল, ধড়মড়িয়া উঠিয়া বাহিরে আসিলেন, ভীত দৃষ্টিতে প্রশ্ন করিলেন—"কত বড় ছেলে রে কিশোর? কেন?—কি হয়েছিল যে—?"

কিশোর দিদিকে হঠাৎ এত ব্যাকুল দেখিয়া একটু বিস্মিত হইলেন, তাহার পর কতকটা নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন—"তাদের তুমি জানো না, অনেক দিন থেকেই ছেলেটি নানান খানায় ভুগছিল।...এই দুর্যোগে ভোগান্তি দেখো না?"

গিরিবালা সেই রকম ব্যাকুল ভাবেই বলিলেন—"নানান খানায় ভুগছিল...কিন্তু ছেলেই তো?"

কিশোরের উত্তরে সম্বিৎ হইল যে কথাটা একটু বেখাপ্পা হইয়াছে; কিশোর জামা খুলিতে ঘরে গিয়াছিলেন, সেখান থেকেই একটু হাসিয়া নির্লিপ্ত ভাবে বলিলেন—"কিন্তু চিত্রগুপ্ত সে কথা শুনবে কেন দিদি?...কৈ গো, ভাত বাড়লে বৌদি?"

কিন্তু কথার ভুলটা বুঝিলেও গিরিবালার মনটা বড় তোলাপাড়া করিয়া উঠিল। ছেলে লইয়া এই রকম চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে কেন এই রকম একটা উৎকট খবর আসিয়া পড়িল? খানিকক্ষণ ছটফট করিয়া ঘর-বারান্দায় পায়চারি করিলেন। কিশোর খাইতে গিয়াছেন, একবার দোরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, ভয় হইতেছে—আবার এমন কিছু অসংলগ্ন বলিয়া ফেলিবেন না তো যাহাতে মনের চাঞ্চল্যটা ধরা পড়ে! অথচ যেন কিছু বলা দরকার; নিজেই বুঝিতেছেন মুখটা শুকাইয়া গেছে। বলিলেন—"ছেলেগুলো এখনও

BanglaBook.org

খায় নি বৌ, ওদের সকাল সকাল ঘুমোনর অব্যেস।"

অত্যন্ত কর্কশ লাগিল নিজের কানেই, কি করিয়া যে কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইল! —আর কেনই বা যে।

দুটি বৌই যেন একটু কাঠ মারিয়া গেলেন। বড়বৌ সামলাইয়া লইয়া বলিলেন —"এই হল দিদি, ঠাকুরপো উঠলেই..."

গিরিবালা ততক্ষণ চলিয়া গেছেন।...ছেলেদের কথা ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গে এ কী দুঃসংবাদ!—এমন হওয়া খুব খারাপ নাকি? কাহাকেই বা জিজ্ঞাসা করা যায়? কি ভাবেই বা তোলা যায় প্রশ্নটা?...জেঠাইমার পায়ের কাছে বসিয়া পা দুইটা কোলে টানিয়া লইলেন, কয়েকবার টিপিয়া প্রশ্ন করিলেন—"জেঠাইমা জেগে?"

একটা ক্ষীণ উত্তর হইল, আজ উপোসটা লাগিয়াছে বেশি, কয়েক বারই বলিয়াছেন। গিরিবালা আর জাগাইলেন না। চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ পা দুইটা টিপিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে হাত থামিয়া যাইতেছে।...এ রকম ভাবনার সঙ্গে একটা খারাপ খবর মিলিয়া যাওয়া কুলক্ষণ নয় তো?...নিজেই প্রবোধ লইতেছেন—না, তা কেন হতে যাবে? তা কি হয়? ভাবনায় লোকের মনে অমন কত রকম ওঠে...

"দিদি, আসি গো ; দোরটা দিয়ে যাও কেউ।"—বলিয়া কিশোর চলিয়া গেলেন। গিরিবালার বুকটা আবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। সদরের দুয়ারটা বন্ধ করিয়া বাহিরের ঘরে গিয়া বসিলেন। রসিকলাল গানে একটা যতি দিয়া বলিলেন—"বোস্ গিরি। খেলে ছেলেগুলো?"

"বসেছে বোধ হয় বাবা। রান্নাঘর আগলে না থেকে বড় দুটোও যদি তোমার কাছে একটু বসে..."

রসিকলাল হাসিয়া বলিলেন—"রান্নাঘরের কাছে দাদামশাই!...আসে বই কি, আমার কাছেই তো থাকে সারাক্ষণ।"

পিন্-পিন্ করিয়া একতারার আওয়াজ উঠিল, এখনই গান শুরু হইবে। গিরিবালা খুব সহজ ভাব ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"চাটুজ্জেদের ছেলেটা মারা গেল বাবা।"

বাপের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন এবং বুঝিলেন নিজের মুখে সহজ ভাব একেবারেই নাই।

রসিকলাল আঙুল থামাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোন্ চাটুজ্জে?"

জানা নাই। জানা নাই অথচ এত দুশ্চিন্তা, গিরিবালা বাপের মুখের পানে একটু ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিলেন—"ঐ যে গো, ছেলেটি ভুগছিল অনেকদিন থেকে..."

"তোর গর্ভধারিণী বেশ গেল গিরি।"—বলিয়া মন থেকে একটা ক্রমবর্ধমান আবর্জনাকে যেন ঠেলিয়া রাখিয়া রসিকলাল বলিলেন—"থাক্ ও-সব কথা গিরি, শোন্, একটা নতুন গান বেঁধেছি।"

একটু হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"গানের কথায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল ; —ছেলেবেলায় তোকে সেই বর্ষার সকালে ঘটা করে পদ্য শোনাবার কথা মনে পড়ে গিরি? —ছোটবৌ সেই রান্নাঘর থেকে ভিজতে ভিজতে এসে..."

হাসিটা যেন ভুল পথে আসিয়াছে বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গেই গা-ঢাকা দিল। রসিকলাল

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি তানপুরায় আঙুলের টান দিয়া গাহিয়া উঠিলেন—

খেলা আমার শেষ হল মা,
এবার অমানিশার ভোরে,
নাও মা ডেকে মুছিয়ে মলা,
নাও মা তুলে কোলে করে...

॥ ৭ ॥

এই সময় আর একটি ব্যাপার ঘটিল।

সন্ধ্যা হইতে একটু বাকি আছে। কলে জল নই ; একটা রেকাবি ধোয়ার প্রয়োজন ছিল, গিরিবালা খিড়কির পুকুরের দিকে গেছেন। দুইটা ধাপ নামিয়াছেন, দেখেন ডান দিকে পুকুরের ধার দিয়া একটি মেয়েছেলে ধীরে ধীরে এদিক্ পানে চলিয়া আসিতেছে। পরনে একটা মলিন ডুরে সাড়ি, আঁচলের দিকটা বাঁ হাতে করিয়া বুকের মাঝখানটিতে জড়ো করা, গায়ে আর কিছুই নাই। মেয়েটির রং আধময়লা, বয়স পাঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যে।

জেলেরা পুকুরে মাছের চার ছাড়িয়াছে, কখন কখন মেয়ে হোক, পুরুষ হোক, কেহ কেহ আসে তদারকে—চারিদিকেই বাড়ি, মাছ চুরি যায়।...গিরিবালা তাদেরই একজন ভাবিয়া প্রথমটা গা করেন নাই, তাহার পর ভাগ-গতিক দেখিয়া তাঁহাকে দাঁড়াইয়া যাইতে হইল।

খুব সন্তর্পণে আর খুব আস্তে আস্তে বেশ একটু লম্বা লম্বা পা ফেলিয়াই মেয়েটি অগ্রসর হইতেছে। দু-এক ধাপের পরই দাঁড়াইয়া, মাথাটা নিচু করিয়া গভীর অভিনিবেশে জলের মধ্যে কি যেন দেখিতেছে, আবার আগাইয়া আসিতেছে। তখনও বোধহয় অতটা কিছু ভাবেন নাই, তাহার পর হঠাৎ একবার মুখটা তুলিয়া গিরিবালার পানে চাহিল —অদ্ভুত এক শূন্যদৃষ্টি। সেকেন্ড কয়েক চাহিয়াই আবার মুখ নিচু করিয়া সেই তীক্ষ্ণ অনুসন্ধান—একটা মানুষ যে সামনে আছে কোন খেয়ালই নাই যেন।

আরও দুই ধাপ অগ্রসর হইলে গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কে বাছা তুমি?"

মেয়েটি এবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল ; স্থিরদৃষ্টিতে গিরিবালার পানে এমন ভাবে চাহিয়া রহিল যেন প্রশ্নের মানেটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু পারিয়া উঠিতেছে না।

গিরিবালা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি করছ তুমি এখানে? কে তুমি?"

এবার কতকটা যেন অর্থটুকু বোধগম্য হইয়াছে এই ভাবে বলিল—"খুঁজছি।"

"কি খুঁজছ?"

আবার সেই রকম অবুঝ, অপলক দৃষ্টি।

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় বাড়ি তোমার? সন্ধ্যে হয়ে এলো, এ-রকম করে..."

মেয়েটি এ-কথাগুলো যেন একবর্ণও বুঝিল না, পূর্ব-প্রশ্নের উত্তর দিল—"ছেলে।"

BanglaBook.org

গিরিবালার ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিলেন—"ছেলে?—এখানে..."

"কে গা দিদি? কার সঙ্গে কথা কইছ?"—বলিতে বলিতে বড়-বৌ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মেজবধূও আসিয়া পিছনে দাঁড়াইলেন। দুইটা নূতন লোক যে আসিয়া দাঁড়াইল, মেয়েটির সে-বিষয়ে কোন চৈতন্যই নাই, গিরিবালার মুখের উপর হইতে দৃষ্টি না সরাইয়া উত্তর করিল—"দু'বার হারালো কিনা—একবার জলে একবার আগুনে।"

মেজবৌ কতকটা স্বগত ভাবে বলিলেন—"পাগল।"

মেয়েটি এবার যেন একটু ব্যস্ত-দৃষ্টিতে তাঁহার পানে ঘুরিয়া চাহিল, বলিল—"না না, পাগল নয়, ছিল—ছিল যে!..."

একবার যেন নিরুপায় ভাবে চারিদিকে চাহিল, যেন কি প্রমাণ দিয়া বিশ্বাস করাইবে বুঝিতে পারিতেছে না। তাহার পর আবার মেজবধূর মুখের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া বিশ্বাস করাইবার জন্য কাতর অনুনয়ের স্বরে বলিল—"হ্যাঁ, ছিল গো!"

বাহিরে কোথা হইতে কিশোর আসিয়া প্রবেশ করিলেন। "তোমাদের কিসের জটলা গা?"—বলিতে বলিতে খিড়কির দিকে আসিয়াই স্তম্ভিত হইয়া গেলেন ; দুইদিকেই প্রশ্ন করিলেন—"এ কোথা থেকে এলো?...তুমি এখানে কি করছ?"

অচঞ্চল চক্ষু দুটি তাঁহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল ; বুদ্ধিহীন একটা অদ্ভুত দীপ্তি ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। কিশোর আর একটা কি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলেন—"যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে।"—বলিয়া থামিয়া গেল, তাহার পর যেন সময় নাই এইভাবে এবার একটু দ্রুত ভাবেই সেই রকম খুঁজিতে খুঁজিতে পুকুরের অন্য দিক দিয়া ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আর পুকুরে নামিতে গিরিবালার কি রকম একটা সঙ্কোচ আসিয়া পড়িল, দোরটা দিয়া সকলে ভিতরে চলিয়া আসিতে কিশোর বলিলেন—"এ মেয়েটার কথা তোমাদের বলি নি, না?"

গিরিবালা বলিলেন—"না, কৈ বলিস্ নি তো ; পাগলই বোধ হচ্ছে।"

বারান্দার জানালার খাঁজে আধ-বসা হইয়া কিশোর বলিলেন—"পাগল তো বটেই, সেদিন কিন্তু বড্ড ভয় লাগিয়ে দিয়েছিল। বোস না দিদি চৌকিটার ওপর, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার..."

বড়বৌ বলিলেন—"ছেলে মরে গিয়ে ঐ রকম হয়ে গিয়েছে আর কি।"

কিশোর শুরু করিতেই যাইতেছিলেন, হঠাৎ কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গিয়া বলিলেন—"না, থাক, কাজ নেই শুনে।" তাহার পর গিরিবালার জিদেই আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"সে-দিনে চাটুজ্জেদের ছেলেটাকে দাহ করতে গেলাম না?...বেশই খানিকটা রাত হয়ে গেল, ঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন একটার ওপর হয়ে গেছে। চিতা-টিতা সাজিয়ে আগুন দিতে প্রায় দুটো হয়ে গেল। তেমনি শীত সেদিন, ওদিকে আকাশে মেঘ করে আছে, হাওয়াও দিচ্ছে ; পাঠকমশাইকে শ'য়ের কাছে রেখে আমরা সবাই ঘরের ভেতরে গিয়ে দোর দিয়ে বসলাম। ওদের বোতল আছে, গাঁজার ছিলিম আছে, কম পক্ষে বিড়িটা তো আছেই পকেটে, গরম হয়ে গল্প জুড়ে দিলে। সব ভূতুড়ে গল্প, দাহ করতে গিয়ে কবে কে কি দেখেছে না দেখেছে—সেই সব কথা। আবার সান্ডেল জুটেছে, খুব জমে

BanglaBook.org

উঠল গল্প। আমি এক কোণে মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, অনুকূলের ডাকাডাকিতে ঘুমটা গেল ভেঙে। প্রথমেই তো মনটা ছাঁৎ করে উঠল—এ আবার কোথায় আছি!...তার পরেই সব মনে পড়ে গেল, জিজ্ঞেস করলাম—'কি বলছিস?' অনুকূল বললে—'যা, এবার তোর পালা, আগুনটা ঠিক জ্বলছে কিনা দেখে আয় একবার।' বললাম— 'একলা?'...'একলা নয় তো দোকালা কোথায় পাবি? দেখছিস্ তো বোতল খালি করে সব ফ্ল্যাট হয়েছে ; পাঠকমশাই সুদ্যু। আমি আর সদানন্দ শুধু জেগে আছি দুজনে পালা করে দেখে এলাম, এবার তোর পালা।'...সদানন্দ উড়ে, পাঠকের হোটেলে কাজ করে, একটু দূরে গাঁজা সাজছিল, আমি তারই ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করলাম, বললাম—'আমি ভয়কাতুরে মানুষ সদানন্দ, তায় এই রকম রাত...' 'সে আমিও ভয়...' বলে সদানন্দ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে গিয়ে আমি পারব না বলে ঘাড়ের ওপর হাতটা নেড়ে ঘুরে বসে কলকে সাজাতে বসল। অনুকূল বললে—'তুই-ই যা, আর প্রায় ভোর হয়ে এল, ভয়ের কি আছে? আর তুই তো সমানে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলি, গল্পগুলোও শুনিস নি যে কথা। যতে সান্ডেল যা একখানি হাঁকড়েছিল শুনলে আর...কি বলো সদানন্দ'?

আর একটু চেষ্টা করে শেষে আমাকেই উঠতে হলো। দোরটা একটু খুলে রাখতে বললাম, অনুকূল বললে—'দোরের ফাঁক দিয়ে যা হাওয়া ঢোকে তা আরও সাংঘাতিক ; তুই যা না, একটু ঝেড়ে-ঝুড়ে দিয়ে চলে আসবি, এই তো রয়েছি আমরা।'

শেষ রাত্তিরে অমন ঘুমটা ভাঙিয়ে দিয়েছে, আমি চোখ কচলাইতে কচলাইতেই বেরিয়ে গেলাম, ওরা দোরটা বন্ধ করে দিলে।

শ'য়ের কাছে এসেই আমার সমস্ত শরীরটা যেন হিম হয়ে গেল। প্রথমটা ভাবলাম বুঝি চোখ রগড়েছি তাই এই রকম হল, আবার একবার ভালো করে মুছে নিয়ে দেখি—না, ঠিক—একটা আধ-বয়সী মেয়ে হাঁটুর ওপর দুটো হাতের ভর দিয়ে একেবারে ঝুঁকে শ'য়ের মাথার দিক্‌টায় একঠায় চেয়ে আছে। চুল একেবারে এলো আর ভিজে, পরনে গাছকোমর করে বাঁধা একটা খাটো শাড়ি, আর দ্বিতীয় কিছু গায়ে নেই। সব থেকে ভয়ঙ্কর চেয়ে থাকাটা—কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, ঠায় শিয়রের দিকটায় চেয়ে আছে। অন্ধকার, থমথমে মেঘ, শ্মশান, সামনে গন্‌গনে চিতা জ্বলছে, আর ঐ মূর্তি! —অবস্থাটা বুঝতেই পার। চেঁচাতে গিয়ে যেন গলা বেধে গেল, পালাতেও যেন পা উঠছে না, মনে হল পেছন ফিরলেই একটা কিছু ঘটবে। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই এক ধরনের সাহস এসে গেল কোথা থেকে। মানে, ভুতের ভয়টা রইল না, তখন অন্য ভয় এসে জুটল—পিচাশ-সিদ্ধ নয় তো? হয়তো শবদেহ খাবার জন্যে এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমটা ভাবলাম যা হয় করুক, আমি সরে পড়ি, আর আছেই বা কি যে খাবে? তার পর মনে হল, না, এটা খুবই অন্যায় হয়। আমি আর কিছু না ভেবে—'অনুকূল!' বলে একটা হাঁক দিলাম। একে হাওয়া তায় গলাটা হঠাৎ এমন খাটো হয়ে গেল যে ভেতরে কেউ শুনতেই পেলে না। কিন্তু এদিকে এক ব্যাপার হল, ডাকটা শুনেই মেয়েটা একেবারে খিদে হয়ে আমার দিকে চাইলে। সে যে কী মূর্তি, দিদি, এখনও যেন আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে—ঠোঁট দুটো চাপা, কটমট করছে চাউনি, তার মধ্যে চিতের

আগুনের শিখাগুলো কাঁপছে, এলো চুলগুলো হাওয়ায় উড়ে উড়ে গায়ে পড়ছে, সমস্ত শরীরেও চিতের একটা আলো পড়েছে...সকলের উপরে সেই চাউনি—বাপ!...কিছু একটা হল এই—ঠিক এই ভাবে আমি যে কি করে দাঁড়িয়ে আছি, আমিই জানি। তার পর ওরই মধ্যে কোথা থেকে একটু বুদ্ধি ফিরে এল। আর কাউকে না ডেকে, ওকেই মরীয়া হয়ে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলাম—'কে মা তুমি? কি দরকার এখানে তোমার?'

চাউনি আর মুখ থেকে ফেরে না, তবে আস্তে আস্তে যেন একটু নরম হয়ে এল, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম—'বলো মা, তুমি কে, কি চাও?'

বললে—'খুঁজছি।'

'কাকে খুঁজছ?'

'ছেলেকে। একবার জলে হারালাম, একবার আগুনে। নেই এখানে, দেখো না।'

চোখের সেই কড়া চাউনি আর নেই—কত যেন কাতর ভাব, কত মিনতি!

আমার তখনও গা'টা বেশ ছম-ছম করছে, কিন্তু লোক ডাকবার একটা সুবিধে পেলাম, বললাম—'তুমি দাঁড়াও, আমি ডেকে আনছি সবাইকে, তারপর দেখব খুঁজে।'--বলে, মাঝে মাঝে পেছন দিকে চাইতে চাইতে ঘরের দিকে চলে গেলাম।

অনুকূল পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছে। দোর খোলাতে, তার পর ওদের বুঝিয়ে বিশ্বাস করাতে খানিকটা সময় গেল। সবাই অবশ্য উঠলও না। যখন বাইরে এলাম—কেউ নেই। তখন আমায় নিয়ে সবাই পড়ল ; হাজার বলি, বিশ্বাস করতে চায় না ; যতে নিজে অমন গল্প করে, সে পর্যন্ত নয়, বললে—'ধন্যি বাবা বিশ্বনাথের মাহাত্ম্য, গাঁজা খেলাম কারা, আর নেশা হল কার!'

আমার তখন কেমন জিদ চেপে গেল। এরা সবাই জেগেছে, ভোর ভোরও হয়ে এসেছে, আমি খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। ঐ শ্মশানঘাটের বাড়িটুকু, তার পরেই মাঠ, ওদিকে গঙ্গা—কোনখানে কিন্তু আর তাকে পেলাম না। একবার কি মনে হল চেঁচিয়ে উঠলাম—'কোথায় গেলে গো বাছা? এই পেয়েছি দেখোসে।' কারো উত্তর দিতে বয়ে গেছে!

ফিরছি, দেখি গোপাল ব্রহ্মচারী ঘাটের ওপর বসে, যেমনি কেন শীত হোক্‌, ওর চারটের সময় চাই কিনা নাওয়া। জিজ্ঞেস করলাম—'ঠাকুরদা, একটি মেয়েকে শ্মশানের দিকে থেকে এসে এদিকে যেতে...' ”

হঠাৎ চুপ করে গেলেন কিশোর, গিরিবালার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন নামিয়া গেছে ; যন্ত্রচালিতের মতো প্রশ্ন করিলেন—“কি বললেন তিনি?”

এমন অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে, কিশোর কোনমতেই উত্তরটা আর চাপিতে পারিলেন না। যন্ত্রচালিতের মতোই কেমন একটু অপ্রতিভ ভাবে সবটুকু বলিয়া গেলেন। বলিলেন—'ব্রহ্মচারী বললে—পাগলিটার কথা বলছ? সে আবার গঙ্গার ধারে ধারে খুঁজতে খুঁজতে ঐদিকে চলে গেল ; আগুনে পেলে না তো, এই জল।'

তান্ত্রিকের কড়া প্রাণ, বলে একটু হাসলেও।

আবার একটু চুপ করিলেন কিশোর। কিন্তু ভুল বা অন্যায়ের একটা সম্মোহন শক্তি আছে ; অনুচিত জানিয়াও তিনি নিজের মন্তব্যটুকু পর্যন্ত দিয়া সমস্ত কাহিনীটুকু পূর্ণ করিয়া দিলেন, বলিলেন—“হয়েছে কি বুঝলে না? ছেলেটা আগে জলে ডুবে মারা যায়, তার

BanglaBook.org

পর তাকে নিয়ে গেছে দাহ করতে।...সেই মেয়েটাই এসেছিল, তাই জিজ্ঞেস করলাম না?..."

মনের উপর একটা দুর্বহ চাপ গিরিবালা যেন আর সহ্য করিয়া উঠিতে পারিলেন না, মাথায় একটু ঝাঁকুনি দিয়া অস্ফুট স্বরে বলিয়া উঠলেন— "উঃ, বাবাঃ!"

ভুল যে হইয়াছে এটা বুঝিতে বেশি বিলম্ব হইল না। রাত্রিটা গিরিবালা বড় বিমর্ষ এবং অন্যমনস্ক রহিলেন। পরদিবসও ভাবটা সেই রকমই রহিল, বাড়তির মধ্যে বাড়ি থেকে অনেক দিন কোন খবর না পাওয়ার কথা কয়েক বার বলিলেন, এবং আরও যাহা করিলেন, তাহা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই অহির উল্লেখ করা। অহির প্রসঙ্গটা গিরিবালা এক রকম তোলেনই না—কারণটা বলা যায় না, হয়তো স্বামীর শপথ দেওয়া আছে, হয়তো জীবনের যা সব চেয়ে নিবিড় বেদনা মানুষ তাহাকে লোক-সমক্ষে আনিতে চায় না ; অন্য কোন কারণও হইতে পারে, তবে এ-দিন গিরিবালা যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া অহির স্মৃতিতে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন।

শেষে আশঙ্কাটা তৃতীয় দিনে ফলিলই। মায়ের মৃত্যুর কথা চিন্তা করিতে করিতে মনে অহেতুক ভাবেই যে একটা আতঙ্ক জমিয়া উঠিয়াছিল, চাটুজ্জেদের ছেলের মৃত্যু-সংবাদ সেটাকে নিতান্ত অহেতুক ভাবেই পুষ্ট করিল। ইহার পর খিড়কিতে পাগলীর সাক্ষাৎ সেটাকে প্রায় চরমের কাছাকাছি ঠেলিয়া তুলিয়াছে, এমন সময় আসিল কিশোরের এই উগ্র কাহিনী—পুত্রশোকের একটা নিদারুণ চিত্র চিতার আলোকেই যেন নিজের উৎকট ভীষণতায় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনের উপর এতটা চাপ সহিল না। গিরিবালা তৃতীয় দিনের সকাল হইতেই একেবারে এক শত তিন ডিগ্রী টেম্পারেচার হইয়া জ্বরে পড়িলেন ; শীঘ্রই সেটা আরও বাড়িয়া ভুল বকা আরম্ভ হইয়া গেল। শুধু অহির কথা— "আমায় বেরিয়ে খুঁজতে দিচ্ছ না কেন তোমরা?—আমি তাকে বের করবই...আসছি অহি—বাবা আমার, কেঁদো না...দুখ্‌নাকে-চাচি, এই দুটো টাকা—আরও দোব, এখন হাতে নেই—বুড়োঠাকুরের চালাটা সারিয়ে দিয়ে বল তিনি যেন অহিকে শীগগির নীরোগ করে দেন—বলিস্ দুখনাকে-চাচি..."

একটা যেন ওলট-পালট হইয়া গেল। বিপিনবিহারীকে তার করিতে হইল, তিনি যেন অন্তত শশাঙ্ককে লইয়া পরের গাড়িতে চলিয়া আসেন।

অহির মৃত্যুর পর প্রায় আট বৎসর কাটিয়া গেছে। অনেকেই ভুলিয়াছে, বোধ হয় কম-বেশি করিয়া সবাই। সকলে ভাবিল ঐ সবাইয়ের মধ্যে বোধ হয় মা-ও আছে —আট-আটটা বছর—একটা যুগের কাছাকাছি যে!

এই একটি মাত্র মানুষ যে শুভঙ্করীর সব মাপ-জোখের বাইরে সেটা সব সময় সবার স্মরণে থাকে না।

॥ ৮ ॥

অসুস্থতা সমেত এই ঘটনাটুকু গিরিবালার দ্বারভাঙ্গায় ফিরিয়া যাওয়া আরও মাস দুয়েক পিছাইয়া দিল। নিস্তারিণী দেবী বধূর মন চেনেন, ছেলে লইয়াই চরম রকমের কিছু একটা হইয়াছে, টেলিগ্রামের ধরনে এই রকম গোছের একটা আন্দাজ করিয়া শশাঙ্কর সঙ্গে

BanglaBook.org

হরেনকেও পাঠাইয়া দিলেন। প্রায় সবগুলিকেই কাছে পাইয়া গিরিবালার শরীর এবং মন বেশ দ্রুতই আবার ঠিক হইয়া উঠিল। তাহার পর বিপিনবিহারী ওদের লইয়া চলিয়া গেলেন।

বিদায়ের বেদনার কথা আলাদা, কিন্তু গিরিবালা নিজে যখন শিবপুর ছাড়িলেন তখন তাঁহার মনটা প্রফুল্লই। অমন একটা আঘাত পাওয়ার পর তাঁহাকে সর্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টার মধ্যে দিয়া বাড়িটাতে যেন একটা নূতন শ্রী ফুটিয়াছে। পাশের বাড়ির একটি বৃদ্ধা নিতান্ত অকারণেই কেমন করিয়া গিরিবালাকে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া ফেলিয়াছিলেন, বেশি আনাগোনায় জেঠাইমা বসন্তকুমারীর সঙ্গে তাঁহার একটি নিবিড় সখ্য আসিয়া পড়িল। জেঠাইমার মধ্যে যে একটি বিষাদের সুর ক্রমে ঘনাইয়া উঠিতেছিল সেটি গেছে ; বেশ লাগে এখন দুটি বৃদ্ধাকে একসঙ্গে দেখিতে—মা-ই যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রফুল্লতার সব চেয়ে বড় কারণ পিতার মধ্যে অনেকটা পরিবর্তন দেখিয়া যাইতেছেন গিরিবালা ; তাঁহারই মনে কোন রকম উদ্বেগ দুশ্চিন্তা না আসে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে রসিকলালের মধ্যে অনেকখানিটাই নিয়মানুবর্তিতা আসিয়া পড়িয়াছে। শরীরও ফিরিয়াছে। বৃদ্ধের কাছে বার্ধক্য নিশ্চয় ভাল নয়, কিন্তু তাহার সন্তানের কাছে সেইটাই সব চেয়ে আকাঙ্ক্ষার জিনিস—নানা কারণেই।...গিরিবালা অন্তরাল হইতে পিতাকে কখনও কখনও দেখেন—অল্প নত, দীর্ঘছন্দ সুগৌর দেহ, গায়ে সর্বদাই একটি রেশমের নামাবলী, মুখে গোলাপী রঙের আভা, তার চারিদিকে—সেই আভারই রশ্মিপুঞ্জের মতো শুভ্র কেশের রাশি। গিরিবালার মনটা কিসে যেন ভরিয়া ওঠে—মুনি-ঋষি তাহা হইলে এই নাকি?—এর চেয়ে আর বেশি কি হওয়া সম্ভবই বা?

যাইবার সময় গিরিবালা বলিলেন—"বাবা, তুমি নিজের দিকে একটু চেয়ো, তোমার আর বয়েস নেই অমন করে ঘুরে বেড়াবার ; মস্ত বড় দোষ দাঁড়িয়েছে তোমার।"

রসিকলাল হাসিয়া কন্যার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"তুই যে একেবারে উল্টো বললি মা, আমার আর বয়েসই নেই নিজের দিকে চাইবার ; যেটুকু চাই সেটুকু বরং মস্ত বড় দোষ।"

ম্লান হোক, তবু অশ্রুর মধ্যেই একটু হাসি সবার মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

দ্বারভাঙ্গার জীবন আবার শুরু হইল। কয়েকদিন একটু কষ্টই হইল—ভাইয়েদের সংসারে সচ্ছলতার পরেই এখানকার অভাবটা যেন আরও স্পষ্ট। ঠিক এ-ভাবটা হয়তো রহিল না, তবু যাহা রহিল তাহাও যেন অসহনীয় হইয়া ওঠে। বর্ষার মেঘের মতোই এর যেন আর অন্ত নাই। যখন অভাব-দুঃখ তখন মানুষ একটি একটি করিয়া দিন গনিয়া সময়ের হিসাব করে—যেন ভারী গরুর গাড়ির চাকা, প্রত্যেক মাটির কণাটি মাড়াইয়া চলিতেছে—এই একটি দিনের পর একটি দিন গাঁথিয়া দীর্ঘ তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। একঘেয়ে দুঃখের নয়, সুখও আসিয়াছে, তবে সে বিদ্যুৎঝলকের পর অন্ধকারের মতো দুঃখকেই আরও নিবিড় করিয়াছে। যেমন শশাঙ্ক পাস দিল—এক অদ্ভুত উল্লাস মনের। আর, একটা গর্ব—ছেলে পাস দিল, মনের কেমন একটা আভিজাত্য আসিয়া গেছে, প্রতি দিনের ক্ষুদ্র অভাব-অভিযোগ মনটাকে যেন স্পর্শই করিতে পারিতেছে না। কেমন করিয়া, তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই, তবে মনে হইতেছে—শশাঙ্ক

BanglaBook.org

পাস দিয়াছে, এবার তো এরা চলিল, যে-কটা দিন দিতে পারে কষ্ট দিয়া যাক্‌ না।

কি যেন একটা করিতে ইচ্ছা হইতেছে। সেবারে ননী ঠাকুরঝির ভাই পাস দিল, পাড়াসুদ্ধ সকলকে লইয়া একটা প্রীতিভোজ দিলেন। ঐ রকম একটা কিছু করা যাইত! —অতটা না-ই হইল, ননী ঠাকুরঝির বাড়ি, ও-বাড়ি, রাস্তার ওধারে নূতন ভাড়াটিয়াদের বধুর সঙ্গে 'আতর' পাতাইয়াছেন—সেই 'আতর'-এর বাড়িটুকু, আর এদিক ওদিক ছুটকো দু'চারজন—কতই বা লাগিবে? আর লাগিলেও উচিত করা—এ দিনটি তো জীবনে রোজ আসে না।

চিন্তার মধ্যেই পাস-করা ছেলের মা, আর অভাবগ্রস্ত সংসারের গৃহিণী আলাদা হইয়া গেল। স্বামী বাহিরে গেছেন, আসিলেই বলিতে হইবে। না রাজী হইতেও পারেন, এটুকু ভাবিতেও স্বামীর ওপর রাগ হইল—তাঁহার যেন হিসাবের বাড়াবাড়িটা একটু বেশি, অত করিলে চলে কখনও? না এই রকম অবস্থাই থাকিবে চিরদিন? এই তো শশাঙ্ক পাস দিয়াছে।—আর তাহার দিকটাও দেখা চাই তো বাপ-মা হইয়া—একটা সাধ-আহ্লাদ নাই তাহার?

কিছু চাই করা, নিজেকে বড় বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে—পাস-করা ছেলের মা।

গিরিবালা বিকাশ দাদাকে একটা চিঠি লিখিলেন—বেশ বানাইয়া বানাইয়া অনেকখানি—তাঁহারই আশীর্বাদ—কত কষ্টে যে শুধু তাঁহাদেরই কথা সব মনে করিয়া শশাঙ্ককে মানুষ করিয়াছেন!—আজ মনে হইল সব সফল হইয়াছে—এবারও তাঁহার উপদেশ আর আশীর্বাদ নূতন করিয়া দরকার—একটা কথা জানেন বিকাশ দাদা?—শশাঙ্ক এই বংশের মধ্যে প্রথম ছেলে যে পাস দিল!...

মনের আবেগ অনেকটা কমিল, কিন্তু আশ মিটিতেছে না; বিশেষ করিয়া মনে জাঁকিয়া বসিয়াছে খাওয়ানোর কথা—কোনমতেই ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিতেছেন না। আজ যদি পাণ্ডুল থাকিত, শ্বশুর বাঁচিয়া থাকিতেন...

কেমন এক ধরনের অভিমান আর রাগ হইতেছে গিরিবালার; স্বামীকে বলিলে তিনি শুনিবেন না, কোনমতেই শুনিবেন না—কেমন একটা হিসাব-হিসাব বাই দাঁড়াইয়া গেছে—সব সময় হিসাব লইয়া থাকিলে চলে?...আর ধরিবেই যে লোকেরা, এড়ানো চলিবে?

সংসারের দায়িত্বে আজ নিজেকে অনেকখানিই বড় বলিয়া মনে হইতেছে।...এর পর গিরিবালা এমন একটা কাজ করিয়া বসিলেন যাহা ইতিপূর্বে তিনি কখনও করেন নাই। খাটের গদির নিচে বিপিনবিহারীর নিজের ক্যাশবাক্সর চাবি থাকে; বাক্সটিও খাটের সঙ্গে গাঁথা একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখা। গিরিবালা উঠিয়া চাবিটা বাহির করিয়া খাটের বাক্সটা খুলিলেন। এমন কিছু লুকোচুরির ব্যাপার নয়—স্বামীকে খাওয়ানোর কথা বলিবেন, তাহার পর স্বামী যেই অর্থাভাবের কথাটা তুলিবেন, গিরিবালা বলিবেন—"এমনই কি অভাব?— তোমার বাক্সে তো রয়েছে কিছু, আমি দেখলাম যে চুরি করে—এত টাকা, এত আনা, এত পাই; ঠকিয়ে ভোলাবে সেই পাত্রী কিনা আমি!—দেখেছি চুরি করে।"...চুরির কথায় একটা বোধ হয় হাসিও পড়িয়া যাইতে পারে।

খাটের বাক্সটা খুলিয়া ক্যাশবক্সটা বাহির করিয়া চাবি লাগাইয়াছেন, বিপিনবিহারী

BanglaBook.org

আসিয়া প্রবেশ করিলেন, একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি করছ?"

গিরিবালা একেবারে প্রস্তরমূর্তিবৎ নিশ্চল হইয়া গেলেন। হাতটা চাবিতে, দৃষ্টি স্বামীর মুখের ওপর, তাহাতে কী যে লজ্জা, কী যে অপরাধের গ্লানি আসিয়া জড়ো হইয়াছে! মুখে রা নাই, হালকা হাসির ভরসাতেই হাত দিয়াছিলেন এ-কাজে, কিন্তু মনে হইতেছে যেন এ-জন্মে আর এ-মুখে হাসি ফিরিয়া আসিবে না।

দৃশ্যটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত, স্ত্রী ক্যাশবাক্স খুলিতেছেন, তাহাও তাঁহার অবর্তমানের সুযোগে—বিপিনবিহারী একেবারে নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন একটু, তাহার পর কতকটা রূঢ় ভাবেই প্রশ্ন করিলেন—"ও কি করছ?"

সঙ্গে সঙ্গে হুঁশ হইল প্রশ্নটার বিকৃত রূপে, কিছু সেই সঙ্গে কণ্ঠস্বরও ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, বলিলেন—"মনে ভাবো টাকা আছে, তবু সংসারের দুর্দশা দেখে বের করে দিচ্ছি না? এই দেখ তাহলে..."

গিরিবালা বুক দিয়া বাক্সটা চাপিয়া ধরিলেন, ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন,—"না, থাক্।"

বিপিনবিহারী একটা কঠিন শপথ দিয়া বসিলেন, গিরিবালাকে সরিয়া দাঁড়াইতে হইল। ডালা খুলিয়া বিপিনবিহারী বলিলেন—"ঐ পড়ে আছে দেখো ; আজ মাসের কুল্যে আট তারিখ।"

গিরিবালা স্বামীর মুখ হইতে দৃষ্টিটা বাক্সর দিকে একটুও বাঁকাইলেন না, প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন—"আমি সে ভেবে খুলতে যাই নি।"

এ আসরে কি ভোজের কথা তোলা চলে? গিরিবালা আবার নিস্পন্দ নির্বাক হইয়া রহিলেন।

বিপিনবিহারী একটু অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। তাহার পর—"নাও, বন্ধ করে দাও।" বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, এবার গিরিবালাই শপথ দিলেন—"আমার মাথা খাও, তুমিই বন্ধ করে দাও।"—বলিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন।

তুহিনের মতন শীতল দারিদ্র্যের বাতাস, আনন্দের অঙ্কুরও সে পারে না সহ্য করিতে। আর কেহই জানে না, স্বামীও আর কিছু বলিলেন না, তবু সমস্ত বাড়ির বাতাসটা যেন গ্লানিতে বিষাক্ত হইয়া রহিল। বিকাশ দাদাকে লেখা উচ্ছ্বাসময় চিঠিটা যেন অদৃশ্য কাহার বিদ্রূপের নিকট হইতেই লুকাইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন রকমে নিজেকে সামলাইয়া রাখিলেন, তাহার পর অন্ধকার একটু ঘন হইয়া আসিতে যেন একটা আশ্রয় পাইয়া নিজের ঘরের জানালাটির কাছে দাঁড়াইলেন। হু হু করিয়া চোখে বন্যা নামিল—যতবার মোছেন, স্রোতের মুখ যেন আরও খুলিয়া যায়, অস্ফুট স্বরে কয়েক বারই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—"কেন আসে এরা পেটে?—কিসের আশায় আসে?"

বিপিনবিহারী এ-সময়টা বেড়াইতে যান। আজ মনটা বড়ই ভার হইয়া আছে, তিনিও আজ বাহির হন নাই। কি মনে করিয়া একবার ভিতরে আসিয়া দেখেন তাঁহার ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। তাহার পরই একটা টানা শব্দ কানে গেল—অনেকখানি কান্নার পর কে যেন ক্লান্ত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন গিরিবালা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া আছেন। পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

BanglaBook.org

প্রশ্ন করিলেন—"কাঁদছিলে তুমি?"

গিরিবালা আর একটি কান্নার বেগকে মাঝপথে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিপিনবিহারী একটু অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—"কেন যে বাক্স খুলতে যাচ্ছিলে তুমি বোধ হয় আমায় কখনও বলবে না, তবে আমি কতকটা আন্দাজ করেছি..."

বোধ হয় গিরিবালা বলিতে পারেন এই আশায় একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"আন্দাজটা আমার এই যে তুমি শশাঙ্কের পাসের জন্য কিছু মানত-টানত করেছিলে, দেখছিলে কিছু আছে কি না বাক্সয়—তাহলে চাইতে। আমার কি মনে হয় জান?—ভগবানের সব চেয়ে বড় পরীক্ষা, যারা আমার মতন অবস্থায় তাদের মনে বড় একটা আশা সাঁদ করিয়ে দেওয়া—দিয়ে দেখা সেটা ধরে রাখতে পারি কিনা। বাবার আশীর্বাদের জোরে আমি কোন পরীক্ষাতেই এ-পর্যন্ত হারি নি, এতেও হারব না। শুধু তাই নয়, আমি আরও বড় দুঃখের মধ্যে এই পরীক্ষা দোব তুমি যদি না মুষড়ে পড়..."

গিরিবালা একটু থামিয়া বলিলেন—"মুষড়ে পড়তে হয় ওদের দেখেই, নিজের কথা কি ভাবি?"

উত্তরটা বিপিনবিহারীর কানে গেল না ঠিক মতো ; বোধ হয় উত্তর কোন আশাও করেন নাই। স্ত্রীকে ভালো রকমেই চেনেন, জানেন তাঁহার অন্য রকম উত্তর নাই। আবেগের ঘোরে এক দিকে চাহিয়াছিলেন, বলিলেন—"কি মানত করেছ জানি না, তবে আমি মানত মানে বুঝি তাঁর দেওয়া আশাকে পুষ্ট করা, জীবনে ফলিয়ে তোলা ; তিনি যা দিয়েছেন সেইটেকে সার্থক করা—এই তো তাঁর পূজো। তোমার মানত কি জানি না, তবে পাসের খবর পাওয়ার পর থেকে আমি তো সবই মানত করে বসেছি।"

গিরিবালা বিস্মিত কৌতূহলে মুখ ফিরাইয়া চাহিতে চলিলেন—"পাণ্ডুলের ক্ষেতটুকু তো আছে—মোটা ভাতটা জুটে যাচ্ছে।"

গিরিবালা কতকটা ভীত দৃষ্টিতেই প্রশ্ন করিলেন—"বেচে দেবে?"

বিপিনবিহারী একটু হাসিয়া বলিলেন—"এই তো শুনেই মুষড়ে গেলে তুমি, যা ভয় করছিলাম।"

গিরিবালা তখনকার উত্তরটাই আবার হাজির করিলেন, বলিলেন—"নিজের জন্যেই কি বলছি? একমুঠো ভাতের সংস্থানও গেলে ওরা যাবে কোথায়?"

"ঠিক এই কথাটির উত্তর আপাতত আমার কাছে নেই। সব কিছু না পারি, অনেক কিছুই তো ভগবানের উপর ছাড়তে হয়?—এটুকুও তাঁর হাতেই রইল। নিজের জন্যে তুমি মুষড়ে পড়বে একথা বলছি না, গা হাত খালি হয়ে এসেছে কি করে তার ইতিহাস তো জানি। তবে ওদের মুখ চেয়েই ওদের কষ্টের কথা ভুলতে হবে—বাপ-মায়ের পক্ষে সেইটেই তো বেশি শক্ত।"

গিরিবালা যেন স্বামীর কথাগুলো অনুধাবন করিতে পারিতেছেন না, আগেকার মতো ব্যাকুল কণ্ঠেই বলিলেন—"কিন্তু যদি দু-বেলার ভাতের ব্যবস্থাটুকুও নষ্ট হয়! সাধ-আহ্লাদ তো জীবনে নেই-ই কিছু।"

বিপিনবিহারী একটু যেন নিরাশ হইলেন। তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তা যে-স্তরের তাহার তুলনায় যেন অনেক নিচু স্তরের মনোভাব। তাঁহার বারবার একটা বিশ্বাস ছিল —অনেক বার তাহার প্রমাণ পাইয়াছেন যে, স্ত্রীর মনের খুব একটা প্রসার আছে, তিনি

BanglaBook.org

যত উঁচু কথাই ভাবুন, বরাবর এই মনের সাহচর্য পাইবেন। আজ এই প্রথম নিরাশ হইলেন—হইলেনও যখন সব চেয়ে বেশি দরকার সে-সাহচর্যের ; বলিলেন—"দেখ ভেবে, আজই যে করছি বিক্রি এমন নয়।"

ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

নিস্তারিণী দেবী বাড়িতে ছিলেন না, ননীবালাদের বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলেন ; গিরিবালা অনেকক্ষণ পর্যন্ত জানালার ধারটিতে দাঁড়াইয়া রহিলেন। একটি চলচ্চিত্রের মতো সমস্ত দিনের ঘটনাগুলি চোখের সামনে দিয়া চলিয়া গেল। সকালবেলা শশাঙ্ক পাসের খবর দিল—মুখে কী দীপ্ত শ্রী! কখনও দেখেন নাই অমন। সমস্ত বাড়িতে যেন আলো ছড়াইয়া পড়িল— সম্পূর্ণ এক নূতন ধরনেরই আলো...খোকাকে খাওয়াইতেছিলেন, শশাঙ্ক আসিয়া প্রণাম করিল।..."আমার এঁটো হাত, দাঁড়া"—"হ্যাঁ, মার আবার এঁটো হাত!...ঠাকুরমা কোথায়?"...পূজার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। হরেন, পূর্ণেন্দুও আসিয়া একটা আনন্দের তরঙ্গ তুলিল।...স্বামীর আনন্দটা চাপা— চিরকালই ঐ রকম—শুধু মুখটা রাঙা হইয়া ওঠে—আজ যেন আরও অদ্ভুত ভাবে রাঙা। গিরিবালাই খবর দিলেন—"শুনেছ?—শশাঙ্ক পাস করেছে।" অনুচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলেন—"তোমার সন্দেহ ছিল বলে মনে হচ্ছে!" গিরিবালা হাসিয়া উত্তর করিলেন—"সন্দেহ থাকলেও শুনে খুশী হতে নেই?...তোমার যেন সব বাহাদুরি!"

এই রকম ভাবেই গেছে ওদিকটা—হাল্‌কা ভাবে অনেক জল্পনা-কল্পনাও। তাহার পর সেই চিত্রেরই সন্ধ্যায় এই রূপ! শুধু অভাবের ছায়াতেই সব বর্ণ বিকৃত। আবার এই অভাবকেই স্বামী বাড়াইয়া তুলিতে চান! কেন—এ কী সর্বনাশা জিদ? ধর, চাল সংগ্রহ হয় নাই বলিয়া সময়ে ভাত হয় নাই, টিফিনের সময় আসিয়া ছেলেরা খাইতে বসিল : চারজনেই বা উহাদের মধ্যে কেহ একজন বলিল—"আজ বেশি ক্ষিদে মা, দেরিতে খেতে বসেছি..."

—শ্বশুর যেমন একদিন তাঁহার মা, অর্থাৎ গিরিবালার দিদিশাশুড়ীকে বলিয়াছিলেন —"আর দুটি ভাত আছে মা?—আজ ক্ষিদেটা বেশি পেয়েছে"...দিদিশাশুড়ীর মুখের সেই নিদারুণ লজ্জা কত বৎসরের পথ বাহিয়া আসিয়া আজ গিরিবালার মনটাকেও আচ্ছন্ন করিয়া দিতেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, এইখানেই গিরিবালার চিন্তার মোড় ফিরিল—দারিদ্র্যের মধ্যে সেই প্রসন্ন লক্ষ্মীরূপ। সন্তানদের খাওয়াইয়া যেদিন কিছু থাকিত না, পানে মুখটি রাঙা করিয়া প্রতিবেশিনীদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। শ্বশুর গল্পপ্রসঙ্গে বলিতেন—"মা ছিলেন পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে আমুদে ; লক্ষ্মী যদি দরিদ্র হতেন তো যেমন হতেন আর কি।"

একটা অদ্ভুত ধরনের শক্তি আসে গিরিবালার মনে ; মনে হয় স্বামী তো ভুল বলেন নাই ; এই বংশের এই তো শ্রেষ্ঠ আদর্শ—ছেলে বড় হইবে বিদ্যায়-চরিত্রে, তার জন্যে মাকে খালি পেটে, শুধু পানের প্রবঞ্চনা সাজাইয়া হাসিমুখে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে। গিরিবালা অবশ্য স্বামীকে নিজের কর্মের কথা বলেন নাই, তবে দিদিশাশুড়ীর এ-রূপের কথাও তাঁহার মনে পড়ে নাই তখন। এখন পরম আশীর্বাদের মতো এই স্মৃতিই যেন তাঁহাকে নূতন ব্রতের জন্য উন্মুখ করিয়া তুলিল।

BanglaBook.org

ছেলেদের কষ্টের কথা—সেখানেও দিদিশাশুড়ীর স্মৃতি আজ নূতন আলোকে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়া দেখা দিল। দিনের পর দিন তিনি দুটি পুত্রের মলিন মুখ দেখিয়া গেছেন,—যাহা কল্পনা করিতেও গিরিবালার বুক কাঁপিয়া ওঠে—কেন? না একদিন তাহারা মানুষ হইবে। বিপিনবিহারী তো মিথ্যা বলেন নাই—মায়ের পক্ষে এই তো সব চেয়ে কঠিন ব্রত। ওদের মুখ চাহিয়াই ওদের কথা ভুলিতে হইবে। আবছা আবছা মনে পড়ে বিকাশ দাদার কাছে শোনা কত মায়ের কাহিনী। ভাবিতে ভাবিতেই গিরিবালার মনে একটা শক্তি আসিল—মায়ের এ শখের ব্রত নয়—এ অনিবার্য, ছেলের কল্যাণের জন্যই একে মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। মায়ের এই অদৃষ্টলিপি!

সেদিন আর কিছু বলিলেন না। ভালো করিয়া ভাবিবার জন্য সেই রাত্রি আর পরের সমস্ত দিনটা লইলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত গিরিবালা মনস্থির করিয়া ফেলিলেন।

স্বামীকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এমন সময় তিনি নিজেই একটু হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন, বাড়ির অপর দিকটায় একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া একটু চাপা গলায়ই প্রশ্ন করিলেন—"তোমার ননী ঠাকুরঝি এসেছে?"

"না তো!"

"আসবে—এক্ষুনি বা একটু পরে। এই টাকা ক'টা রাখ।"

পনেরোটি টাকা। অতিশয় বিমূঢ় ভাবে হাতে লইয়া গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কি হবে? এল কোথা থে‚ক?"

বিপিনবিহারী একটু ত্বরিত ভাবেই বলিলেন—"ননীবালা শশাঙ্কর পাসের জন্যে মিষ্টি খেতে চাইলে এই থেকে কিছু আনিয়ে দিও। বাকি টাকাটা থাক হাতে, আরও যদি কেউ চায়! তা ভিন্ন তোমার মানৎ..."

গিরিবালা শুধু প্রশ্ন করিলেন—"হঠাৎ?"

"বিকেলে ওদের বাড়ি গেছলাম, ওর দাদার কাছে। দোরের আড়াল থেকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে—শশাঙ্কর পাসের মিষ্টি চাই। শশাঙ্ককে ভালবেসে যে ছোট বোনের মতন আমার কাছে এ আবদারটা করলে, তার মুখ রাখতেই হবে, তাই..."

গিরিবালার হঠাৎ স্বামীর অনামিকায় দৃষ্টি পড়িল, শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"তোমার আংটি?"

বাহিরে নহরের পুলের ওদিকে কণ্ঠ শোনা গেল—"আমরা সবাই এলাম গো পাস-করা ছেলের মা!"

বিপিনবিহারী অন্য দিক্ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে বলিলেন—"শশাঙ্ক হীরের আংটি গড়িয়ে দেবে।"

॥ ৯ ॥

সুখের দিনে গিরিবালা এইসব দুঃখের ব্যাপারগুলো একটি প্রীতিমণ্ডিত কৌতুকের দৃষ্টিতেই দেখিতেন, ছেলেদের কাছে গল্প করিতে হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না। বলিতেন —"ঐ যে ঠিক করলাম অভাবে কষ্টে তোদের মুখ চুন হলেও মনকে কড়া করে রাখব, তার পর আমার যেন একটা বাই দাঁড়িয়ে গেল কেবলই লক্ষ্য করা—তোদের মুখ চুন

BanglaBook.org

হল কিনা। তোরা টের পেতিস না, তবে আমি কেবলই আড়চোখে তোদের মুখের পানে চাইতাম। শুধু কি তাই? এমন রোগ দাঁড়াল যে বারান্দায় তোদের খেতে দিয়ে, আমি রান্নাঘরের দরজার জোড়ের কাছে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম তোদের মুখের ভাব কিছু বদলাল কিনা। শেষ পর্যন্ত এমন হল, মনমরা হতে না দেখে —তোদের ফুর্তি, তোদের মুখের হাসি দেখেই আমার মুখ যেন শুকিয়ে যেতে লাগল ; ভাবি, নিশ্চয় ভেতরে ভেতরে কষ্ট হচ্ছে বলে এরা ওপরে ওপরে মুখটা হাসি-হাসি করে রাখে। সে আরও জ্বালা, মন কড়া করব কি সর্বদাই প্রাণটা যেন আইঢাই করতে থাকে। শেষে হরেনকে ডেকে একদিন চুপি চুপি বললাম—হ্যাঁ রে হরু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব, নুকুবি নি?"

না।

'গা ছুঁয়ে আছিস!'

'বলছি তো নুকুব না।'

'হ্যাঁ রে, সত্যি বলবি, শশাঙ্ক কলেজে পড়ছে, তোদের বড় কষ্ট হচ্ছে, না?'

গিরিবালা জোরে হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"ভেতরে ভেতরে ভয়ে সন্দেহে মনটা এমন হয়ে রয়েছে যে কি করে যে গুছিয়ে বলব সে হুঁশও নেই। হরু ঠিক ধরেছে, মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে বললে—'বা রে কথা তোমার!—দাদা কলেজে পড়ছে তাই কষ্ট হবে আমার!—শত্রু নাকি?'

এ আবার উল্‌টো উৎপত্তি। বললাম—'সে কষ্ট নয় রে, খাওয়া-পরার কষ্ট—শশাঙ্ককে মাসে মাসে টাকা পাঠাতে হচ্ছে তো?'

ও তো আরও এ-সব ব্যাপার গ্রাহ্য করত না, কথাগুলো একটু কাঠখোট্টা গোছের ছিল, আর তেমনি ছিল চঞ্চল—'বা রে, বন্ধ করে দিলে তার কষ্ট হবে না?—কি রকম একচোখো তুমি মা?'—বলে খেলতে না কোথায় যাচ্ছিল, হন হন করে বেরিয়ে গেল।"

গিরিবালা আবার হাসিতে থাকেন—"মুখ চুন না দেখতে পেয়ে সন্দেহের ওপর সে যে কী সব দিনই কেটেছিল। অমন বিপরীত কাণ্ড কেউ কখনও দেখে নি, উঃ!"

এ-সব স্মৃতির কথা। সুখ উদার, তাই সুখের দিনে অতীতের দুঃখের ছবি প্রসন্ন অনুকম্পার দৃষ্টিতে যায় দেখা, কিন্তু সত্যই দুঃখ যখন ছিল, সেটা নিদারুণ হইয়াই ছিল।

অন্ধকারটা চারিদিক দিয়াই যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। অদৃষ্টের পরিহাস যে, এই অন্ধকারকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিবার জন্যই গোড়ার কয়েকটা দিন হঠাৎ আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—শশাঙ্ক পাস করিল, ক্ষেত বিক্রয় করিয়া হাতে একটা মোটা টাকা আসিল। হাতে টাকা থাকিলে যা হয়—হাজার টানিয়া খরচ করিলেও খানিকটা সচ্ছলতা আসিয়া যায়ই সংসারে, একটু শ্রী ফিরিল ; তাহার পর আরও একটু শুভ যোগাযোগ হইল, একটি বাঙালী ভদ্রলোক কয়লার ব্যবসায় করিতেন, তাঁহার পরমর্শে এবং আনুকূল্যে বিপিনবিহারী টাকাটা ফেলিয়া না রাখিয়া একটা মোটা অংশ কয়লার কারবারে খাটাইলেন। বেশ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইল ; অনেক বছর পরে একটা উপার্জনের পথ আবিষ্কার হওয়ায় গৃহস্থালির মধ্যে একটি সাহসের হাওয়া বহিল, স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল,

BanglaBook.org

স্বামী-স্ত্রীর অনেক দিনের ছোটখাটো সাধ-আহ্লাদও মিটাইয়া লইলেন দুইজনে—ছেলেদের কিছু পোশাকী জামা-কাপড়, দু-একখানা আসবাব—শহরের এ-বাড়িতে সে-বাড়িতে দেখিয়া সাধ যায় মনে ; আর দু-এক মাস দেখিয়া গিরিবালার একখানা নতুন গহনার কল্পনাও উঠিল স্বামীর মনে ; স্ত্রীকে বলিলেনও।

নিস্তারিণী দেবীকেও বলিলেন—“এবার শীতটা পড়লে তুমি কাছে-পিঠে দু-একটা তীর্থ সেরে এসো না মা, ক্রমেই অথর্ব হয়ে পড়ছে তো? চণ্ডীকে লিখব পাসের জন্যে, শুধু এদিককার খরচটুকু তো?”

আরও আলো আনিল নিতান্ত দৈবাধীনই একটি ব্যাপার। এই সময় শশাঙ্করা সাতটি ভাই। পুত্রবান দম্পতির কন্যা-মুখ দর্শনের একটি নিবিড় আকূতি থাকে, ভগবান সেটিও পূর্ণ করিলেন। এর সঙ্গে নিশ্চয় সমৃদ্ধির কোন সম্বন্ধ নাই, তবু কেমন মনে হইল—এ একটা শুভ লক্ষণ—সব চেয়ে বড় শুভ লক্ষণ ; বিধাতা নিশ্চয় মুখ তুলিলেন। দুঃখের দিনে কেবলই লক্ষণ মিলাইয়া আশায় আশায় থাকা একটা অভ্যাস হইয়া পড়ে যে।

বিধাতা দয়াবান কি নির্দয়—এ প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই, তবে একটা কথা ঠিক, তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী ; সুখকে ফোটান দুঃখের পাশে রাখিয়া, যখন দুঃখকেই নিবিড় করা হয় প্রয়োজন, তাহার আগে দেন সুখের একটি উজ্জ্বল রেখা টানিয়া।

শীতের ক'টা মাস এই করিয়া কাটিল।

তাহার পর আশা যখন চরমের পাশে ঠেলিয়া উঠিতেছে, হঠাৎ সব ওলট-পালট হইয়া গেল। শীতের শেষে দেখা দিল প্লেগ। দু-এক বৎসর হইতে এই সময়টায় হইতেছে একটু আধটু—দূরে দূরে, যে দিকটা বেশি ঘিঞ্জি। কিছু ইঁদুর পড়ে, লোকও মরে দু-একজন, তাহার পর তাতটা পড়িতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। এবারে যেন একেবারে একটা বিপর্যয় ঘটাইয়া দিল। রোগটার চিকিৎসা নাই, যদি বাঁচিতে চাও তো বাড়ি ছাড়িয়া পালাও। দেখিতে দেখিতে মৃত্যুতে, গৃহত্যাগে সমস্ত শহরটা খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল।

এদিকে করাল হইলেও অসুখটার ধর্মজ্ঞান আছে—পুরাপুরি আসিয়া পড়িবার আগে একটা নোটিস দেয়, ঘরে ইঁদুর মরে—স্ফীত গায়ের রোঁয়াগুলা খাড়া হইয়া গেছে—দেখিলেই বোঝা যায় এ মৃত্যুদূতের বিশিষ্টতা আছে।

শীতের শেষে আসে, একটু গরম পড়িলেই চলিয়া যায়। এবার কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা দিল।

শীত গেল, ক্রমে পশ্চিমা হাওয়াটা অল্পে অল্পে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। কষ্টকর কিন্তু নীরোগ, সবাই আশা লইয়া এরই দিকে থাকে চাহিয়া। বসন্তে যে সব কণ্ঠ থাকে আতঙ্কে রুদ্ধ, ‘চৈতী’র সুরে পায় মুক্তি, মানুষ আবার নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে জীবনের পানে চায়। এবার কিন্তু গরম যতই বাড়িতে লাগিল, রোগ যেন ততই হিংস্র মূর্তিতে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, মনে হইল যেন মরণের দূত তাহার প্রবল শত্রুটাকে বশে আনিয়া তাহারই স্কন্ধে চড়িয়া বিজয়ের দুর্বার অভিযানে ছুটিয়া চলিয়াছে। ধূলায় আকাশ আরক্তিম হইয়া উঠে, দিগন্ত যায় ডুবিয়া, শহরের জনহীন পথে ছোটে চৈতালী ঘূর্ণির স্তম্ভ —সেই সঙ্গে এ-পথ ও-পথ দিয়া ক্বচিৎ শ্মশানযাত্রীর দল—স্তব্ধ, নিরুপায়, শঙ্কিত।...এর পরে কার পালা কে জানে?...হঠাৎ বাজারের দিকে কোথায় হাহাকার উঠিল—যেন মনে হয় এই আর্ত কণ্ঠস্বরই পশ্চিমা হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া কোন অদৃশ্য দানবের অট্টহাস হইয়া উঠিয়াছে...

BanglaBook.org

কী অসহায় অবস্থা! একটি অহির শোকেই অত, আর এ যে সব হারাইতে বসা। ছেলেরা কেহ পড়ে, কেহ ঘুমায়, কেহ খেলা করে, মুখ দেখিলে মনে হয়, তাঁহারই উপরে সব দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া তাহারা সবাই নিশ্চিন্ত আছে। সবার উপর চক্ষু বুলাইয়া গিরিবালা জানালার কাছে গিয়া রুদ্র মধ্যাহ্নের দিকে চাহিয়া থাকেন—কি হবে? কি হবে?—কাকে বলি?—এ নতুন রোগের কে দেবতা তুমি, চিনি না : যেই হও, রক্ষে করো—ওরা কিছু জানে না—সব অপরাধ আমার...

বুক আইঢাই করে, শাশুড়ীর কাছে যান, কোলে একটি পা তুলিয়া লন, হাত বুলান, প্রশ্ন করেন—"মা ঘুমুলে?"

"কি বৌমা?"

"কি হবে মা?"

শাশুড়ী ভালো ভাবেই জাগিয়া ওঠেন।

"ছি, অত ব্যাকুল হলে চলে মা? ভগবান রয়েছেন।"

কোথায় তিনি? গিরিবালা যেন আরও দেখিতে পান না তাঁহাকে আজকাল। আগে অন্তত পুজার সময়টা একটু আনন্দ থাকিত, এক-একবার মনে হইত অন্তরে যেন ক্ষণিক বিকাশে কাহাকে পাওয়া গেল। আজকাল সব অবস্থায় সব সময় একটি মাত্র চেতনা —ভয়। সব যেন অন্ধকার করিয়া রাখে।

যেন ভগবানকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলিবার চেষ্টা করেন—"হ্যাঁ, তিনিই তো ভরসা গরীবদের।"

তাহার পর আবার সেই ভয়।—

"আজ মা এই একটু জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম—তুমি বারণ করেছ, আর দাঁড়াই-ই না—তা ঐটুকুর মধ্যে চার-চারটেকে নিয়ে গেল, আমার তো..."

শাশুড়ী একটু ধমকের সুরে বলেন—"আবার তুমি দাঁড়িয়েছিলে, বৌমা? না বাছা...এবার শুনলে আমি সত্যিই রাগ করব বাপু! কি করবে—হাত-পা আছড়ে কোন ফল আছে? শুধু মা-শেতলাকে ডাকো।"

শাশুড়ী একসময় আবার তন্দ্রালস হইয়া পড়েন, হয়তো কোথাও একটা অটল বিশ্বাস আছে, না হয় বার্ধক্যের শিথিলতায় ভয়-উৎকণ্ঠার বেগটাও আসিয়াছে কমিয়া। গিরিবালা আস্তে আস্তে পা নামাইয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসেন। বিপিনবিহারী নিদ্রা হইতে জাগিয়া নিজের বিছানাতেই শুইয়া আছেন, হাতে একটা হিসাবের খাতা। গিরিবালা প্রয়োজন না থাকিলেও আলনা হইতে একটা কাপড় লইয়া ভালো করিয়া কোঁচাইতে লাগিলেন। স্বামীর দিকে মুখ না ফিরাইয়াই যেন নিজের মনে বলিলেন—"ক'দিন যে আর চলবে এরকম করে!"

এমন অর্ধোচ্চারণে বলিলেন, বিপিনবিহারীকে প্রশ্ন করিতেই হইল— "আমায় কিছু বললে?"

"না, তোমায় নয়...বলছিলাম, আর কত দিন ভয়ে-ভয়ে এ-রকম ভাবে থাকতে হবে? ঘরে গরম, খেয়ে-দেয়ে জানলার কাছে গিয়ে একটু দাঁড়িয়েছিলাম, ওর মধ্যেই চার-চারটে..."

"এ দিকটা ভালো আছে।"

BanglaBook.org

"যখন তুললে কথাটা বাপু, ভালো থাকতে থাকতেই সরে যাওয়া ঠিক ; না, তুমি করো একটা ব্যবস্থা ; এ যেন সর্বদা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকা—কখন কি হয়, কখন কি হয়..."

বিপিনবিহারী হিসাবের খাতাটা রাখিয়া দিলেন। একটু রুষ্ট ভাবেই বলিলেন—"একটু ভগবানের ওপর না ছেড়ে দিলে চলে? কত বারই তো তোমায় বুঝিয়ে বলেছি—এখন বাড়ি ছেড়ে গেলে সব তছনছ হয়ে যাবে। প্রথমত খড়ের ঘর করতে এক-কাঁড়ি খরচ—কোথা থেকে আসবে? খড় একেবারে অগ্নিমূল্য—তা ভিন্ন জায়গার ভাড়া আছে। এর ওপর আলাদা করে নতুন সংসার পাতবার খরচ আছে। সব চেয়ে বড় বিপদ—নতুন কাজটার যে একটু গোড়াপত্তন হচ্ছে, যার ওপর ভবিষ্যৎ, সেটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে, সমস্ত টাকা যাবে ডুবে। আর এ অবস্থায় এ সম্বলটুকু গেলে কী যে হবে বোধহয় বুঝতে পাচ্ছ—শশাঙ্কটা পড়ছে, শৈলেনও আসছে বছর স্কুল ছেড়ে বেরুবে—ক্ষেত নেই আর যে—পড়ানো দূরের কথা, অন্ন জোটানোই ভার হবে—তার জন্যেই বোধ হয় বাড়িটির ওপর হাত পড়বে।...ভেবে বল।"

হাতে গড়গড়ার নল ছিল, কয়েকবার টান দিয়া অপেক্ষাকৃত নরম কণ্ঠেই বলিলেন—"তা বলে বলছি না ছেলেদের প্রাণের কাছে এ-সব কিছু...। ভগবানের একটু দয়া আছে বৈকি, অস্বীকার করলে পাপের ভাগী হতে হবে। প্রথমত দেখো, এখন একটি জায়গা পেয়েছি যা শহরের মধ্যে হয়েও শহরের বাইরে। অনেকখানিই নিশ্চিন্দি আছি তো? ক'বছর থেকে ব্যারামটা হচ্ছে, একটা ইঁদুর পর্যন্ত পড়ে নি বাড়িতে—দয়া আছে বলেই তো তাঁর...রোগটার সব খারাপ, শুধু এইটুকু ভালো, বাড়ি খারাপ হলে আগে ইঁদুর মরবেই..."

বাহিরে ডাক-পিয়ন আসিয়া হাঁকিল—"চিঠি হ্যায়।"

শৈলেন একটা খাম আনিয়া বিপিনবিহারীর হাতে দিল। বিপিনবিহারী এইটারই প্রত্যাশায় ছিলেন, ব্যগ্র হস্তে ছিঁড়িয়া একটি হলদে কাগজ বাহির করিলেন, মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, বলিলেন—"দু'গাড়ি কয়লার রেলওয়ে চালানটাও এসে গেল। কত বড় একটা সুবিধে—প্রায় সমস্ত ব্যবসাদারই শহর ছেড়ে পালিয়েছে ; এ সময় যদি শুধু ভয়ে বাড়ি ছেড়ে—"

শশাঙ্ক, শৈলেন ভিতরের এ-প্রান্তটায় পড়িতেছিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে জড়াজড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল। এই কয়েক পা আসিতেই কি রকম হইয়া গেছে, মুখ শুকনো, ভয়ে চোখ দুইটা ঠেলিয়া আসিয়াছে, জড়াজড়ি করিয়া বলিল—"ইঁদুর!!—ঠাকুরমার ঘরের সামনে! শীগগির এসো।"

দুইজনে তাড়াতাড়ি গিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলেন ; তাড়াতাড়ি কিন্তু সমস্ত শরীর যেন ঝিম-ঝিম করিতেছে। বিপিনবিহারী ভীতি-কর্কশ স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন—"মা, খাট থেকে নেমো না, ইঁদুর পড়েছে! খবরদার নেমো না!"

অতি সামান্যই একটা ইঁদুর, নিতান্তই ঘরোয়া, কিন্তু কি বিকৃত দৃশ্য! ফুলিয়া প্রায় দেড়া হইয়া গেছে, রোঁয়াগুলা সব সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। একটা বৃত্ত লইয়া ক্রমাগত ঘুরিতেছে—নীরব যন্ত্রণা—সামনে স্পষ্ট দেখা যায় মৃত্যুর আবর্ত।...একটা নৌকা যেন

BanglaBook.org

নিতান্ত অসহায় ভাবেই দহের কেন্দ্রের চারিদিকে পাক দিতেছে—ডুবিবেই, কোন উপায় নাই।...ক্রমে বৃত্তটা আরও ছোট হইয়া আসিল—আরও ছোট, গতিতেও মন্থর হইয়া আসিল ইঁদুরটার, তাহার পর কয়েকটা দ্রুত আক্ষেপের পরই সব শেষ!

প্লেগের ধর্মজ্ঞান আছে, গৃহস্থকে নোটিস দিল!

॥ ১০ ॥

আরও দুইটা বৎসর কাটিল।'এই ভাবে' বলা ভুল হইবে, কেননা অন্ধকার আরও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। সেই যে প্লেগের ছত্রভঙ্গ—তাহার পর কারবারটা যে কোথা দিয়া কি হইল যেন হিসাবই পাওয়া গেল না। ঠিক যাহা ভয় করিয়াছিল বিপিনবিহারী।...দুঃখের দিনে শুভ লক্ষণগুলো ফলে না, ভয় কিন্তু ফলে অক্ষরে অক্ষরে।...সামলাইতে সামলাইতে প্রায় বারো আনা গেল ডুবিয়া। বাকি যে চার আনা তাহারই উপর রহিল সব—সংসারের ষোল আনা —শশাঙ্কর কলেজের খরচ, সংসার, শৈলেনদের স্কুলের খরচ।

অন্ধকারকে আরও নিবিড় করিবার জন্যই বিধাতা আর একটি আলোর রেখা দিলেন টানিয়া। পর-বৎসর শৈলেনও পাশ করিয়া স্কুল ছাড়িল।

আবার আশা জাগে, উদ্যম জাগে। বিপিনবিহারী শৈলেনকে পড়ানোর প্রস্তাব তোলেন, গিরিবালা সাহসে বুক বাঁধেন, নতুন করিয়া দিদিশাশুড়ীকে স্মরণ করেন, আশীর্বাদ চান।

শশাঙ্ক যে সাধ বাড়াইতেছে। এবার সামনের যা জীবন তা তো ওদের লইয়া ক্রমে আরও বেশি করিয়া। বাপ-মা সন্তানদের আনে জগতে, তাহার পর ওদের মধ্যেই যায় মিলাইয়া, ওদের মধ্য দিয়া এক নতুন জগৎকে দেখে। ...শশাঙ্ক যখন ছুটি-ছাটাতে আসে, একটি নতুন জগৎকে সঙ্গে করিয়া আনে। কলেজের গল্প—কত জায়গার কত রকম ছেলে—প্রফেসারদের গল্প—কাহার কি রকম অভ্যাস, কি মুদ্রাদোষ সেটুকু পর্যন্ত—রাজধানী শহর, সেখানে কত কী যে হয়...

শশাঙ্ককে দেখিতেও হইয়াছে আরও সুন্দর। নূতন বয়স, তাহার উপর পড়িয়াছে বড় শহরের চাকচিক্য। মনে হয় এই যে একটা বৃহত্তর পরিমণ্ডল, শশাঙ্ক যেন চারিদিক দিয়াই তাহার উপযোগী হইয়া উঠিতেছে। গৌরবে মন পূর্ণ হইয়া ওঠে গিরিবালার, এক একবার একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি আসে—শশাঙ্ক গল্প করিতেছে—কখনও হাসিতে কখনও বা আবেগে মুখটা রাঙা হইয়া উঠিতেছে—গিরিবালার কাছে সবই মুছিয়া যায়, মনে হয় যেন নিজেই সন্তানে রূপান্তরিত হইয়া গেছি, নূতন জগতে নিয়াছি জন্ম। এত অদ্ভুত আর মিষ্ট যে বেশিক্ষণ থাকিতেই পারে না অনুভূতিটা—যখন ও আর সামনে থাকে না, মনের অলিগলিতে সেটাকে খুঁজিয়া ফেরেন গিরিবালা—'কি যেন চমৎকার একটা পেয়েছিলাম—জিনিসটা কি? কোথায় গেল?—আর মনে আসছে না কেন?' আরও একটা নূতন জগৎ আনিবে শশাঙ্ক, জীবনের পূর্ণতার একটা নূতন দিক, তাহারও সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন পথ— সন্তানকে অতিক্রম করিয়াও তাহার দূরত্ব যায় দেখা। —বধূ, পৌত্র, পৌত্রী—নিজের জীবনটাই যেন কতদূর প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে—কত যুগ পর্যন্ত যেন নিজের বুকেই স্পন্দন শোনা যায়।

BanglaBook.org

না, শৈলেনও যাক কলেজে। এই রকম সোনা হইয়া ফিরুক। আর দুই-তিনটা বৎসর চোখ-কান বুজিয়া চালান, তাহার পরই শশাঙ্ক কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইবে। দিদিশাশুড়ীর ঠোঁটের তাম্বুল-রেখা অক্ষয়, অপরাজেয় হইয়া থাক। গিরিবালা পারিবেন সহিতে।

আশ্বিন মাস, পূজার ছুটিতে দুই ভাই দুই দিক হইতে আসিল।

শৈলেনের মনে পড়ে দিনটি। দুপুরের গাড়িতে আসিল। সর্বকনিষ্ঠ ভাই 'খোকা'র জন্ম হইয়াছে। মা তাহাকে পাশে একটি পিঁড়িতে শোয়াইয়া উঠানে একটি মলিন মাদুরে পা ছড়াইয়া রোদ পোহাইতেছেন। পরিধানের বস্ত্রখানি পরিষ্কার কিন্তু কয়েক জায়গায় ছিন্ন। শৈলেন প্রবেশ করিতে বলিলেন—"শৈলেন এলি,—আয়।"

বেশ মনে পড়ে ছবিটি। মাকে এ-মূর্তিতে অনেক বারই দেখিয়াছে। কিন্তু সেদিনকার ছবিটি যেন মনে দাগ কাটিয়া বসিয়া গেছে। পায়ের গোছের কাছে কাপড়ে একটি গ্রন্থি ছিল, সেটুকু পর্যন্ত আছে মনে। আসল কথা ছেলেবেলায় সেই সাঁতরায় বছর দুয়েকের পরে এই ছিল মা হইতে শৈলেনের প্রথম বিচ্ছেদ, মনটা ব্যাকুল হইয়া ছিলই, তাহার উপর যখন তাঁকে দেখিল তখন একেবারে পূর্ণ মাতৃত্বের মূতিতেই দেখিল। কী যে অপূর্ব লাগিয়াছিল, এখন ভাবিয়া কূল পায় না শৈলেন! মা শীর্ণ হইয়া গেছেন, ক্লান্ত, মলিন ; এদিকে ছিন্নবাস, দীন শয্যা—যেন চারিদিক দিয়াই নিঃস্ব ; অথচ যাহার জন্য নিঃস্ব সে ঐ নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় পাশে সুপ্তিমগ্ন।...কিন্তু এই সমস্ত নিঃস্বতার মধ্যেও কত বিরাট! মাতৃ-মূর্তির অনেকই তো ছবি দেখিল শৈলেন, মনে হয় শিল্পী মাকে আধ্যাত্মিক স্তর পর্যন্ত তুলিয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু এ ছবি কোথায়?—এই সর্বংসহা, সর্বরিক্তা মানবী মায়ের?

শৈলেন প্রণাম করিবার জন্য নত হইতেই ব্যস্ত ভাবে পা দুইটি একটু টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠলেন।—"আমায় ছুঁস নি, আমি এখনও শুদ্ধ হই নি, দেখছিস কাপড়-বিছানার অবস্থা!...

শৈলেন পায়ের ধূলা লইয়া হাসিয়া বলিল—"বাড়ি ঢুকলাম, প্রণাম করবার জন্যে, আমি এখন শুদ্ধ মা কোথায় খুঁজে বেড়াই?"

এ চিত্রটি এখানেই শেষ হইল।

কয়েক দিন পর শশাঙ্ক আসিল। এবার তাহার পরীক্ষা; সমস্ত ছুটিটা আর এখানে ছিল না, মাত্র শেষের কয়টা দিন কাটাইবে। মা তখনও ঘরে ওঠেন নাই। প্রণাম লইতে ঐ আপত্তি করিলেন।

মায়ের আপত্তিতে সেও হাসিয়া পায়ের ধূলা মাথায় দিয়া বলিল—"বেশ তো, এই আমি শুদ্ধ হলাম, আমায় ছুঁয়ে তুমিও হয়ে গেছ শুদ্ধ।"

নিস্তারিণী দেবী কাছেই ছিলেন, শশাঙ্ক আগেই তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছে।

গিরিবালা তাঁহাকে সাক্ষী মানিলেন—"শুনলে কথা মা?—ঘর-দোর সব ছোঁবে তো?"

নিস্তারিণী দেবী অল্প হাসিয়া বলিলেন—"কথাটা মোটেই মিথ্যে বলে নি, মা-ধনই তো?—তার চেয়ে আর শুদ্ধ কে আছে জগতে? তবে চিরকাল লোকে একটা মেনে

BanglaBook.org

আসছে —একটু না হয় মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে নিক।"

শশাঙ্ক অতিমাত্র ভয়ের অভিনয় করিয়া বলিয়া উঠিল—"সে কি—মার পায়ের ধুলো আছে যে মাথায়?"

দুই মানেই হয় কথাটার, তাহার বলিবার ঢঙে সকলেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

যে বড় হয় তাহাকে অন্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়াই পাঠান ভগবান। এর পর হইতেই কিন্তু শশাঙ্কর হাসি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল। মুখটি সর্বদাই একটু বিমর্ষ। হাসিতে গল্পে যোগ দেয় কিন্তু যেন ওই ভাবটাকে ঢাকিবার জন্যই। ঠাকুমার, বাবা, মা—তিনজনেই কারণটা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাই আবার প্রশ্ন করিলেন—"পরীক্ষার ভাবনা?"

শশাঙ্ক বলিল—"হ্যাঁ।"

উঁহারা জবাবদিহিটা মানিয়া লইলেন। বলিলেন—"তাই এত মন-মরা হয়ে থাকতে হবে? এখনও তো ঢের দেরি!"

একদিন শৈলেনকে একান্তে ডাকিয়া শশাঙ্ক বলিল—"মার শরীরটা দেখছিস এবার?"

যাহার মন ভাবের দিকটায় আবদ্ধ থাকে, সে বাস্তবকে ঠিকমত দেখিতে পায় না। দাদার কথাতেই যেন শৈলেনের চৈতন্য হইল, বলিল—"একটু বেশি কাহিল, না?"

"এত কাহিল হন নি কখনও মা। মনু, অবু, খুকির বেলা তো দেখেছি।"

একটু থামিয়া বলিল—"লক্ষ্য করেছিস মা আমাদের আই-মা, অর্থাৎ ঠাকুরদাদার মার গল্প করতে ভালোবাসেন?"

শৈলেন একটু অবুঝ ভাবেই মাথা নাড়িল। শশাঙ্ক বলিল—"ঐ হয়েছে কাল; মা আমাদের জন্যে নিজেকে মেরে ফেলছেন। খাওয়া দেখেছিস তো ওঁর?—এখন এই রকম খেলে বাঁচবেন? একটা পুষ্টিকর কিছু পাতে থাকে না।"

দুই ভাইয়ে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল কিছুক্ষণ। তাহার পর শশাঙ্কই কথা কহিল, বলিল—"আমি আরও সব কথা শুনেছি শৈল, সে-সব কিন্তু এখন থাক। এটাও তোকে বলতাম না, বললাম শুধু এই জন্যে যে দেখিস, প্রথম বারেই যেন পাসটা করে যাস।"

ছুটি ফুরাইতে দুইজনে আবার নিজের কলেজে ফিরিয়া গেল।

তাহার পর আরও একটা মাস কাটিয়া গেল।

অবস্থাটা দ্রুত চরমের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ডুবন্ত কারবারের গহ্বর থেকে যে সামান্য কিছু টাকা বাঁচানো গিয়াছিল, সেটা দিয়াও আরও কিছু ঋণ হইয়াছে। ঋণের টাকাও আসিয়াছে ফুরাইয়া, আর এবার অবস্থা এমন যে ঋণ পাইবার যা সম্বল—এক-আধখানি গহনা, তাঁহাও আর নাই বলিলেই হয়।

এবার আবার সব চেয়ে বিপদ, গিরিবালার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ভগবানের একটা দয়া ছিল, কাহারও স্বাস্থ্য লইয়া কখনও ভাবিতে হয় নাই। খোকা হওয়ার পর সেই যে শরীর ভাঙিয়াছে, আর সারিতে চাহিতেছে না। নিস্তারিণী দেবী চিন্তিত

BanglaBook.org

থাকেন। অভাবের সংসারে দুশ্চিন্তা—কোনও উপায় নাই। চিরকাল ধর্মের সেবা করিয়া আসিয়াছেন —দুর্দিনে তাঁহাকেই ধরেন জড়াইয়া—জলপড়া, মাদুলি, মানৎ ; কিন্তু কিছু হয় না। তিনিও যেন কি-রকম হইয়া গেছেন আজকাল। অনেকদিন কোন তীর্থ করিতে পান নাই—উপায়ও নাই। মাঝে মাঝে এক চণ্ডীচরণকে দেখা ছাড়া অন্য কোন সন্তানকেই বহুদিন দেখেন নাই।—উপায়ও নাই—বোধ হয় বধূকেও হারাইতে হয়—এরও যেন উপায় নাই। মনটা এখন শুধু অতীতের স্মৃতি লইয়া খেলা করে, ভিতরে ভিতরে একটু তিক্তও হইয়া উঠিয়াছে।

বিপিনবিহারী মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেন গিরিবালাকে। গিরিবালা উত্তর দেন—"সেরে আর উঠছি না? তুমি সর্বদাই দেখছ তাই বুঝতে পারছ না। এই তো ঠাকুরপো এসেছিলেন, শরীর খারাপ দেখলে তাঁর নজরে পড়ত না?"

"চণ্ডী তোমায় বলে নি, বোধ হয় ভয় পেয়ে যাবে বলে, আমায় তো বলছিল!"

গিরিবালা বেশ ভালো ভাবেই তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া ওঠেন, বলেন—"ভাই-ই তো, চোখের দৃষ্টি আর কত তফাত হবে?"

স্বামীর মনে হয়, হয়তো সত্যও বা। আসলে মনটা তো ওদিকে বেশি নাই, মন রহিয়াছে শশাঙ্কর দিকে—মানুষ করিতে হইবে। কাহার সঙ্গে যেন যুদ্ধ চলিতেছে, ক্রমেই জিদটা যাইতেছে বাড়িয়া।

এক মাস পরের কথা। গিরিবালা খোকাকে লইয়া বারান্দায় মাদুরের উপর কাঁথা পাতিয়া শুইয়া আছেন। শরীরটা কয়েক দিন থেকে বেশি খারাপ, বিছানায় যাইতে ভালো লাগে না, দুপুরের রোদটুকু বড় মিষ্টি লাগে।

আজ শত কষ্টের মধ্যে গিরিবালার মনে একটা নূতন ধরনের আন্দাজ জাগিয়া উঠিতেছে। আজ দিদিশাশুড়ীর দেওয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিতে বসিয়াছেন। আজ গিরিবালার মুখে তাঁর সেই দিদিশাশুড়ীর পান ; প্রবঞ্চনা। ঠিক যে অন্নের অতটা অভাব হইয়াছে তাহা নয় ; পেটের এক দিকে যে বেদনাটা ছিল, সেটা আজ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে মাঝে মাঝে। আজ আহার করিতে পারিলেন না। কেহ ছিল না সামনে, ভাতটা সরাইয়া ফেলিলেন।

কিন্তু অসুখ জানিতে দেওয়া হইবে না তো! এ সংসারে চিকিৎসার হাঙ্গাম আনিয়া ফেলিলেই যে শশাঙ্ক শৈলেনের পড়া যাইবে বন্ধ হইয়া। শেষ পর্যন্ত কি হইতে পারে? —তা ভগবানই জানেন, আজ তো থাক অজানা।

খুব ঘটা করিয়া একটি পান সাজিয়া শীর্ণ ওষ্ঠাধর লাল করিয়া রাঙাইয়া গিরিবালা খোকাকে লইয়া বারান্দায় শুইয়া রহিলেন।

স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেমন একটু ছমছমে ভাব। প্রশ্ন করিলেন— "খেয়েছ তুমি?"

গিরিবালা মুখটা তাঁহার দিকে ঘুরাইয়া উত্তর করিলেন—'হ্যাঁ, কেন?"

"না, এমনি..."

তাহার পরের বক্তব্যটা বিপিনবিহারী একটু তাড়াতাড়িই বলিয়া গেলেন, যেন এক নিঃশ্বাসে।—"ইয়ে একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করতে এসেছি— আমাদের মত ঠিক হয়ে গেলে মাকে বলব...জিজ্ঞেস করা মানে—ঠিকই করে ফেলেছি, আর কোন উপায়

BanglaBook.org

তো নেই। মানে, শশাঙ্ক-শৈলেনদের পড়াতে গেলে—মানুষ করতে গেলে—ওদিকে হরেন-পূর্ণেন্দুও তো এগিয়ে এসেছে— তাই এই ঠিক করে ফেললাম—উপায় তো নেই। ...বাড়িটা বন্ধক রাখছি। তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, তুমি কি বল। মানে, লেখাপড়া সব ঠিক হয়ে গেছে।...এবার লোকটাকে নিয়ে বেরুব কোর্টে রেজেস্টারি করতে...তুমি অমন করে শুয়ে রয়েছ, শরীরটা খারাপ নাকি?"

"কৈ, না তো!"

যন্ত্রণাটা উঠিয়াছিল, এইমাত্র উপশম হইয়াছে। মুখটা বেশ ভাল ভাবেই স্বামীর পানে ঘুরাইয়া লইলেন গিরিবালা, একটু হাসিলেন।...স্বামী দেখুন না, যাহার শক্ত অসুখ সে কখনও খাইয়া পান চিবায়, কখনও হাসিতে পারে?

বলিলেন—"বন্ধক রাখছ, কিন্তু বাড়িটা গেলে..."

তাহার পরই যেন অমানুষিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া বলিলেন—"তা রাখ—রাখ—ভাল করে মানুষ হোক ওরা।"

বিপিনবিহারী চলিয়া যাইবার পর প্রায় মিনিট দশ-বারো হইয়াছে, অবু ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল—"মা কে আসছে বল তো?—বড়দা!"

শশাঙ্ক আসিয়া প্রণাম করিয়া একটু ব্যগ্র-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"বাবা চলে গেছেন মা?"

গিরিবালার তখন বেদনাটা উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারিলেন না, সেটাকে চাপিয়া একটু হ্রস্ব শব্দ করিয়া বলিলেন—"হঠাৎ এলি যে?"

শশাঙ্ক শঙ্কিত-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"ও কি?"

"ও কিছু নয়, একটা ব্যথা, খাবার পরেই উঠল, আজ এই প্রথম। এক্ষুনি সেরে যাবে। হঠাৎ এলি যে?"

শশাঙ্ক যে মাকে এত খারাপ অবস্থায় দেখিবে ভাবিতে পারে নাই, বলিল—"বাবা চলে গেছেন—রেজেস্টারি করতে?"

বিস্মিত প্রশ্ন হইল—"তুই কি করে টের পেলি?"

শশাঙ্ক পূর্ণেন্দুর পানে চাহিয়া বলিল—"তুই শীগগির যা, গাড়ির এখনও মিনিট-কুড়ি দেরি আছে, বলবি—বলবি—মার শরীরটা বড় খারাপ...না, থাক, বলবি দাদা পাটনা থেকে এসেছেন—খুবই একটা দরকারী কাজ—তিনি যেন এক্ষুনি ফিরে আসেন। যা, যদি না আসেন, পা জড়িয়ে ধরবি, পারবি?"

গিরিবালা হতভম্ব হইয়া গেছেন, বলিলেন—"কথার উত্তর দিলি নি—হঠাৎ এলি যে? আর টের পেলি কি করে, যে—?..."

"পড়া ছেড়ে দিয়ে এলাম মা।"

গিরিবালার সমস্ত শরীর যেন শিথিল হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে বলিলেন,—"ছেড়ে দিলি?—কি সর্বনাশ করলি শশাঙ্ক!—কেন?"

মনের আবেগ চাপিবার চেষ্টায় শশাঙ্ক একটু অন্য দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরই ভাঙিয়া পড়িল—"আমাদের সর্বনাশ বলে কিছু থাকতে নেই মা? তোমরা পথে দাঁড়াতে চলেছ—আর দিদিশাশুড়ীর ব্রত নিয়ে তিল তিল করে তুমি নিজেকে মেরে ফেলছ

BanglaBook.org

—আমাদের সর্বনাশ বলে কিছু থাকতে নেই? তুমি আজ খাওনি—তোমার মুখের ও পান মিথ্যে—আমাকেও ঠকাবে? বল, মিথ্যে নয়—বল, না...”

মায়ের বুকে মুখ ঢাকিয়া শশাঙ্ক হু-হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

তৃতীয় পর্যায়

॥ ১ ॥

কয়েক বৎসর কাটিয়া গেছে। গিরিবালার জীবনে অনেক কিছুই ঘটিয়া গেল, অনেক পরিবর্তন, অনেক ভাঙা-গড়া। পিতা মারা গেলেন, জেঠাইমা বসন্তকুমারীও ; শাশুড়ী নিস্তারিণী দেবীও নাই। এদিকে আবার তেমনি নূতনেরা আসিয়া জুটিল। নিজের আর একটি কন্যা, ভগবানের শেষ দান। এখন তাহারই বয়স বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। শেষ কুড়ানো সন্তান, বড় আদরের, আরও আদরের এই জন্য যে গিরিবালার বিশ্বাস ও তাঁর মাসি কাত্যায়নী। প্রতিশ্রুতি দেন নাই কাত্যায়নী?—“গিরি, তোর মেয়ে হয়ে জন্মাব, তখন এমনি করে আমায় ধোয়াবি, মোছাবি, আদর-যত্ন করবি তো?”...ওর নাম হইল লীনা, বোধ হয় কাত্যায়নী দেবীর মতো অমন করিয়া গিরিবালার মধ্যে আর কেহ লীন হইয়া যায় নাই বলিয়াই।

আরও আসিয়াছে—পরের মেয়ে নিজের হইয়া। গিরিবালার বেশ মনে পড়ে সেই প্রথম দিনটি। পরের মেয়ে নিজের হইয়া আসা এ তো নিত্যই হইতেছে, তবু নিজের জীবনে যখন ঘটিল, গিরিবালার বড় যেন আশ্চর্য বোধ হইল। মনে হইল বধূরূপে এই যে এ আসিল, এ যেন আরও মধুর—পরের মেয়ে কি অসীম নির্ভরেই না আসিয়া দাঁড়াইল তাঁহার কাছে।...মায়ার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে একটি কৃতজ্ঞতার ভাব আসে—ও তাঁহার সন্তানের একটি নূতন রূপ ফুটাইয়াছে। শশাঙ্ককে যেন পূর্ণতর করিয়া আনিয়া দিল। জীবনে কী সব অপূর্ব অনুভূতি!—কোথায় ছিল এ-সব? এত কষ্ট মা হওয়া, আবার এত আশ্চর্য ভাবে মধুর!

তাহার পর আসিল নব যুগের যাত্রীরা—গিরিবালার জীবনের ধারা যাহারা ভবিষ্যতের দিকে দিবে প্রসারিত করিয়া—নাতি-নাতনি। এমন দুইটি সন্তানে তাহারা পাঁচটি।

একদিকে পুরানো যাহা ছিল তাহা গেল ঝরিয়া, একদিকে নূতন উঠিতেছে গড়িয়া। একদিকের বেদনা আর একদিকের এই নূতন আশা-আনন্দের মধ্যে গিরিবালা আছেন এক নূতন রূপে বিকশিত হইয়া। এই রূপকে আরও অপরূপ করিয়া দিয়াছে দ্বারভাঙ্গায় গোড়ার জীবনের দুঃখ-অভাব।...শৈলেনের ডায়েরির এক স্থানে লেখা আছে—”দুঃখ আর কার কাছে কি জানি না, তবে বাবার জীবনে, মায়ের জীবনে এসেছিল ভগবানের আশীর্বাদ রূপে ; ওঁরা যেন তপস্যা আর তীর্থস্নানের পর শান্ত বিশ্বাসে, শান্ত তেজে আর শান্ত মর্যাদায় জীবনের নব পর্যায়ে এসে দাঁড়াইলেন।”

শশাঙ্কর বিবাহ হইয়া গেল অল্প বয়সেই, কলেজ ছাড়িবার বছরখানেক পরেই,

ওর বয়স যখন বোধ হয় আঠারো হয় নাই। অনেকগুলো কারণ ছিল, সব চেয়ে বড় কারণ বোধ হয় নিস্তারিণী দেবীর নাত-বৌয়ের মুখ দেখিয়া মরিবার সাধ, বাঙালী-পরিবারের একটি জরুরী ব্যাপার, যা অনেক ক্ষেত্রেই সংসারের মোড় ফিরাইয়া দেয়। আরও ছিল—গিরিবালা সংসারে একা পড়িয়া গেছেন। আরও একটা কারণ, ঠিক কারণ না বলিলেও চলে—এই কারণগুলার পরিপোষক।—

শশাঙ্ক যে শুধু কলেজ ছাড়িয়া আসিয়াছিল এমন নয়, এক রকম চাকরি হাতে করিয়া আসিয়াছিল। সেই যে পূজার কটা দিনের জন্য আসিয়াছিল তাহাতেই সে বুঝিয়াছিল তাহার উচ্চ শিক্ষার মানে হইল সংসারের ধ্বংস ;— শুধু সঙ্গতির দিক দিয়াই নয়—বাবার বোধ হয় কঠিন পীড়া হইয়া পড়িবে, আর মাকে যে হারাইতে হইবে সেটা একেবারেই সুনিশ্চিত। ইহার পর এক দিন সে নিতান্ত অতর্কিত ভাবেই বিপিনবিহারীর বাড়ি বন্ধক দেওয়ার কথাটা শুনিয়া ফেলিল। সে সময় যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাস দিয়াছে তাহাদেরও অনেক সুবিধা ছিল ; তায় সে ভাল ভাবেই পাস দিয়াছে, কয়েকটা অফিসে দরখাস্ত করিয়া দিল। সময়ে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পড়িল। সেই আহ্বানেই সে বাড়ি আসে।

চাকরি হইল, সুতরাং নিস্তারিণী দেবীর সাধ মিটানোর এবং গিরিবালাকে একটি সহায়িকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ায় কোন বাধা রহিল না।

সব চেয়ে বড়টি নাতনি—বয়স বছর নয়-দশের মধ্যে ; ভাইটি বছর ছয়েকের, ছোটটি মেয়ে—একেবারে কোলের। গিরিবালা বিপিনবিহারী দুজনেরই এখন অবসর আছে জীবনে, আর সেই সঙ্গে আছে জীবনের প্রতি একটা অনুরাগ—আজকের এই সচ্ছলতা, এই স্নিগ্ধতাটুকু সৃষ্টি করিবার জন্যই তো প্রাণপাত করিতে বসিয়াছিলেন দুজনে, এখন ইচ্ছা করে ওর সমস্ত মধুটুকু কণ্ঠ ভরিয়া পান করেন। আর এর যত মাধুর্য কি ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছে এই নাতি-নাতনিদের মধ্যে? অবশ্য গিরিবালার অবসর অত বেশি নয় —তবে বিপিনবিহারীর একেবারে পূর্ণ মুক্তি—সংসারটা ছাড়িয়া দিয়াছেন স্ত্রীর হাতে, নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছেন এদের হাতে।

এত বড় ভার পাইবার জন্যই হোক, বা যে জন্যই হোক, বড় নাতনিটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটি পাকা গৃহিণী। সংসার থেকে সমস্যার টুকরা-টাকরা কথার আমদানি করিয়া ঠাকুরদাদাকে লইয়া তাহার এক নূতন সংসার ভাঙে গড়ে। চালের দর, ডালের দর, পড়ানোর খরচ, কুটুম্বিতার ভাবনা—ঠাকুরদাদার সঙ্গে খুব জোর আলোচনা হয়। অভিমত যা দেয়, তাহার যেমনি ওজন তেমনি দাম।—"এক সময় ছিল যখন টাকায় আট মোণ চাল ছিল, এখন সে জায়গায় আট সের চাল খেয়ে চারিদিক সামলানো কম কথা?—বল দাদু?"

আট মণ চালের কথা বিপিনবিহারী বোধ হয় নিজের ঠানদিদির মুখেও শোনেন নাই ; একটু ঘাঁটাইতে ইচ্ছা করে, হাতে হুঁকা বা গড়গড়ার নল থাকিলে খুব গম্ভীর ভাবে টান দিয়া বলেন—"তোমার সেই ছেলেবেলাকার কথা বলছ তো?"

নাতনি একটু আড়চোখে চায়—ঠাট্টা নয় তো?...সংসারের দিকটাই ছাড়িয়া দিয়া অন্য কথা পাড়ে—"আজ আবার দাদু মেজকাকা পড়তে ডেকেছিলেন। সময় থাকলে আমি কেনই বা যাব না দাদু? এইটুকু বোঝেন না। মেজকাকার সবই ভাল দাদু, শুধু

BanglaBook.org

বুদ্ধিসুদ্ধি একটু কম। কথায় বলে না ভোঁতা বুদ্ধি?—তাই আর কি।"

"গিয়েছিলে পড়তে তুমি?"

নাতনি একটু বিরক্তির সহিত মুখটা ভার করিয়া বসে—সবাইকে আক্কেল খোয়াইতে দেখিলে মুখের অবস্থা যেমন হওয়া স্বাভাবিক। একটু পরে ঠোঁট দুইটা ফুলাইয়া মুখের পানে চাহিয়া বলে—"তুমিও বেশ ভেবেচিন্তে কথা বল না দাদু, খুব সময় দেখছ আমার!"

গিরিবালার অবসর হয় দুপুরে একটু, আর সন্ধ্যার পর। নাতিটি একটু বেশি প্রিয়, অন্তত বেশি ঘিরিয়া থাকে সে-ই। তাহার দুশ্চিন্তা অন্য রকম—একটু নিজেকে কেন্দ্র করিয়া। গিরিবালা কোলেরটিকে লইয়া শুইয়াছেন, খোকন আসিয়া উপস্থিত হইল। ওর প্রায় রোজই এক প্রশ্ন ;—পাশতলা দিয়া উঠিতে উঠিতে বলিবে—"হ্যাঁ গিন্নী, বৌ এসে মাটিতে পা দেবে?"

গলাটা বয়সের পক্ষে একটু বেশি মোটা, দুর্ভাবনা আর উৎকণ্ঠার ভাবটা একটু বেশি করিয়াই ফুটিয়া ওঠে।

এক দিকে খুকি, অন্য দিকটা সে দখল করিয়া শোয়। ঐ সূত্র ধরিয়াই গল্প আরম্ভ হইয়া যায়—

গিরিবালা বলেন—"সে কি ভাই, অমন কথা মুখে এনো না। নাতবৌ এসে যদি মাটিতে পা দেয় তো আমাদের দুজনের বেঁচে ফল কি?—তোমার দাদুর আর আমার কথা বলছি—।"

সঙ্গে সঙ্গেই গল্প উঠে জমিয়া।—খোকন 'হুঁ' দেয়, অর্থাৎ চলুক, ঠিক শুনছি।

গিরিবালা বলেন—"যেমনি কিনা পালকি এসে গেটের সামনে দাঁড়ালো আমার যত তোলা শাড়ি, তোমার দাদুর যত শাল-আলোয়ান এ-মুড়ো ও-মুড়ো দেওয়া হবে বিছিয়ে। কি ফলই থেকে যদি নামতে গিয়ে, চলতে গিয়ে নাতবৌয়েরই পায়ে লাগল ধুলো? তার পর সেই শাল-বেনারসীর ওপর দিয়ে ঝামোর ঝামোর করে মল বাজিয়ে..."

কচি কানের কাছে সুরটি বড় লোভনীয়, খুকি বলে—"ধমোর—ধমোর—ধমোর..."

দাদা অধৈর্য ভাবে ধমক দেয়—"চুপ কর খুকু, কাজের কথা হচ্ছে।"

অধৈর্য প্রশ্ন হয়—"হুঁ, তার পর গিন্নী?"

তার পর অনেক কথা—নূতন যুগের নূতন বধূ আসিবে, সে গল্পের কি আর শেষ আছে?

ওদের মা এক এক সময় অনুযোগ করে। হয়তো শ্বশুর-শাশুড়ি দুইজনেই আছেন, বলে—"বাঁদরগুলো আপনাদের বড্ডই ঘেরে ফেলেছে। আবার সেজবৌ আসছে অজুকে নিয়ে। সে শুনছি আবার এর মধ্যেই মহাদিগ্‌গজ হয়ে দাঁড়িয়েছে—তার মাসি লিখেছে কিনা। ব্যস্, একে তো আমাদের যেন ছেড়েই দিয়েছেন..."

শাশুড়ি বলেন—"ও হিংসে করতে নেই বাছা। আমার ঘর ভরে যাক্..."

বধূ হাসিয়া বলে—"ভরার কথা তো হচ্ছে না মা, এমন দখল করে থাকে যে এক একবার যে একটু সুচরস্কুলে দুটো কথা জিজ্ঞেস করব তার পর্যন্ত উপায় থাকে না। আর বাবাকে তো আরও টেনে নিয়েছে। ঠাকুরপোরা বলে..."

বিপিনবিহারী হাসিয়া বলেন—"বাঃ, এ যে তোমাদের অন্যায় কথা বৌমা, আমরা

BanglaBook.org

এখন নতুন লোক পেয়ে নতুন সংসার পেতেছি ; আমাদের ও বাসি সংসারে টানতে গেলে আমরা আমল দেব কেন?"

॥ ২ ॥

পাণ্ডুল এখন প্রায় স্মৃতিমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যত দিন ক্ষেতটা ছিল, লোকের যাওয়া-আসা ছিল, খবরটা-আসটা পাওয়া যাইত। ক্ষেত গেছেও তো অনেক দিন হইল, প্রায় বারো-তের বৎসর, এখন নাতি-নাতনির কাছে গল্পের খোরাক যোগায় পাণ্ডুল ; দিক্‌বলয়-লগ্ন সূর্যের মতো দূরে রহিয়াছে বলিয়াই পাণ্ডুল এখন একটা রাঙা আভায় যেন ঘিরিয়া থাকে—নাতি-নাতনিদের কাছে রূপকথার রোমান্স খুব জমে।

গিরিবালা বলেন—"আর পাণ্ডুলে ছিল খজনী, কালো—তা যেমন-তেমন কালো নয়, ভাতের হাঁড়ির তলা বলে আমি পদে আছি ; তার ওপর সাদা সাদা বড় বড় দাঁত, গোল গোল চোখ, এই গতর ; ঘুমোলো তো একেবারে কুম্ভকর্ণ, পালের মতন মোটা কাপড় পরে যখন খসখস করে চলত..."

নাতিও গুটিসুটি মারিয়া কাছে ঘেঁষিয়া আসে, বলে—"ভয় করছে গিন্নী!"

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"না, ভয় নেই।"

তাহার পর একটু চুপ করিয়া যান, গলাটা কিসের আবেগে স্নিগ্ধ হইয়া আসে, বলেন,—"পাহাড় দেখেছিস্ তো? এবার দেশে যেতে রেল থেকে দেখলাম, মনে আছে?"

নাতির বোধ হয় তাড়কা রাক্ষসীর কথা মনে পড়ে প্রশ্ন করে—"পাহাড়ও উপড়ে ফেলে খজনী?"

গিরিবালা আবার একটু হাসেন, বলেন—"না, উপড়ে ফেলে না, দেখেছিস তো কি রকম ভয়ঙ্কর দেখতে পাহাড়গুলো? আমি একবার তীর্থে গিয়ে ওর চেয়ে ভয়ঙ্কর একটা পাহাড় দেখেছিলাম—গাছপালার নাম-গন্ধ নেই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো পাথর, বড় বড় ফাটল যেন হাঁ করে গিলতে আসছে, দেখলেই যেন ভয়ে বুক গুরগুরিয়ে ওঠে। সেই পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠে একটা বড় গর্তের মধ্যে দিয়ে খানিকটা ভিতরে গিয়ে পাহাড় কেটেই কী চমৎকার একটা মন্দির! আর তার ঠিক মাঝখানেতে সাদা পাথরে চমৎকার একটা গঙ্গামূর্তি। মন্দির! মন্দিরের একটা ফাটল দিয়ে এক জায়গায় ঝির-ঝির করে জল পড়ে একটা নালি দিয়ে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে—বাইরেটা অমন পাহাড়-ফাটা গরম তো?—ভেতরটা ঠাণ্ডা বরফ, মা যেন নিজেই অবতরণ করছেন..."

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া যান, কি দুইটি জিনিস যেন মনে মনে মিলাইয়া দেখিতেছেন। তাহার পর বলেন—"খজনী ছিল ঠিক এই রকম, বাইরেটা ছিল ঐ পাহাড়ের মতন কালো কুচ্ছিৎ, দেখলে ভয় করে, কিন্তু তার বুকের ভেতরটা যে কী মধু ছিল!—একটি নয় তো?—তোর মেজঠানদি থেকে পূর্ণেন্দু পর্যন্ত সবাইকে কোলে নিয়ে খেলিয়েছে—যেটিকে পেত কী মায়া দিয়ে যে জড়িয়ে থাকত! বোধ হয় মায়েও অতটা পারে না।"

কথাগুলা গিরিবালা যে ঠিক নাতির জন্যই সাজাইয়া বলেন এমন নয়, মনের চিন্তাটা

যেন আপনি মুখর হইয়া বাহির হইয়া আসে। নাতির পক্ষে বরং বেশ গুরুপাকই হয় ; পাহাড়ের মধ্যে ঠাকুরের মূর্তিটি ভালোই বোঝে—চমৎকার একটি রূপকথার মতো, কিন্তু খজনীর ভিতর-বাহির লইয়া এর মধ্যে যে রূপকের অংশটুকু সেটা ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে এড়াইয়াই যায়।

চুপ করিয়া থাকিয়া একবার বলে—"আমিও মা গঙ্গাকে দেখব গিন্নী।"

গিরিবালাও খানিকটা চুপ করিয়া থাকেন।...কোথায় গেল খজনী? ছুঁড়িটার জন্য বড় মন কেমন করে এক এক বার। অদ্ভুত ধরনের মেয়ে! গিরিবালার মনশ্চক্ষু নিজের সংসারের উপর এক একবার দৃষ্টি বুলাইয়া আসে,—এই তো কাম্য—পুত্রকন্যা, শাখা থেকে ভগবান আজ এই প্রশাখা কয়টি পর্যন্ত দিয়াছেন, দয়া হয় আরও দিবেন, তাহার জন্যই তো সাধনা। অথচ খজনী এ সব চাহিলই না?

কেন?...বড় আশ্চর্য লাগে গিরিবালার। কাছে থাকিতে অতটা ভাবিতেন না এ দিকটা ; এখন সুখের দিনে, পূর্ণতার দিনে, কথাগুলা আপনিই যেন পথ করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়। কেমন একটা ছমছমে ভাব জাগে মনে। সে সব দিনে অত মনে পড়িত না, কিন্তু আজকাল খজনীর দু-একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে, বিশেষ করিয়া যখন সংসারের ভরা-রূপটি চোখের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। খজনী অনেকগুলিকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, কিন্তু এখন মিলাইয়া দেখিয়া মনে হয় স্নেহের অন্তরালে খজনীর একটা দারুণ অবিশ্বাস ছিল ছেলেমেয়েদের উপর। প্রায়ই চোখ-মুখ ঘুরাইয়া বলিত—'না গো দুলহীন, ওদের বিশ্বাস করো না, ওরা বড্ড বেইমান, বড্ড বেইমান ওরা, বড্ড বেইমান...'

কেন বলিত খজনী এ কথা? কাছে থাকিতে ছিল মাত্র দাসী, অলক্ষ্যে থাকায় এখন তাহাকে মনে হইতেছে মস্ত এক বিদুষী। অহি অত মায়া বাড়াইয়া চলিয়া গেল ; কী বিশ্বাস এদের? গিরিবালা নাতিকে বুকে জড়াইয়া চাপিয়া ধরেন, বুকের সমস্ত উত্তাপ দিয়া মনে মনে আশীর্বাদ করেন—বাঁচিয়া থাক্।...কিন্তু কীই বা বিশ্বাস?

খজনী কি এই ভয়ে সংসারের পাশ কাটাইয়া গেল?

গিরিবালার আর একটা কথা মনে পড়িতেছে। খজনীর একটি ছোট ভাই হইয়া মারা যায়, তাহার পর আর হয় নাই। কথাটা যখন উঠিত, খজনীর মা দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া মেয়েকে দেখাইয়া বলিত—"হবে কোথা থেকে মাইজী? ওই যে ডাইনী বসে আছে আগলে! নিজের যা আশ্রয় করে দিলাম সেখানেও যাবে না, এখানেও আর কাউকে আসতে দেবে না। নৈলে ছেলেটা যখন মারা গেল, ঝাঁটাখাকী ডাইনী স্বচ্ছন্দে বললে কিনা—"মা, আর ভাই-টাই হয়ে কাজ নেই মা ; হবে না তো?'...নিজের পেটের মেয়ের মুখে এই কথা দুল্হীন?—আসতে দেবে ও ডাইনী আর কাউকে?—পেটে থাকতেই খেয়ে ফেলবে..."

কুশ্রী, কদাকার—না, এক এক সময় মনে হয় ভীষণ আকার—খজনী সম্বন্ধে তখন সব কথাই বলা সহজ ছিল, এমন কি বিশ্বাস করাও। আজ স্থান আর কালের ব্যবধানে কথাগুলি নূতন অর্থে আসিয়া দেখা দিয়াছে। খজনীর অবিশ্বাস, খজনীর আতঙ্ক এই লইয়া যে, এরা যখন থাকিবেই না, তখন এদের মিছে আদর করিয়া ডাকিয়া আনা কেন? —যদি নিতান্তই থাকে তাহা হইলেও পদে পদে মায়ায় টান দিয়া, পদে পদে সংশয় বিভ্রম সৃষ্টি করিয়া কাঁদানোই যখন এদের উদ্দেশ্য।

BanglaBook.org

শাশুড়ি নিস্তারিণী দেবী দু-একবার বলিয়াছিলেন —"অহি যখন যায়, বৌমাকে কাঁদানোই এক দায় হয়ে উঠেছিল ; আমি আসার পর উনি যদি তবু কাঁদলেন, খজনী তো একবারও চোখের জল ফেললে না ; তার কথা উঠলেই হাঁ করে চেয়ে থাকত পাগলের মতন।"

আজ গিরিবালার কাছে সব একটি অর্থে অর্থবান ;—খজনী ভাইয়ের মৃত্যুতে, অহির মৃত্যুতে, বোধ হয় এই রকম আরও সব মৃত্যুতে পিছাইয়া গেল। মা হওয়ার ভয়েই ও আর মা হইতে চাহিল না। গিরিবালা নিজের মাতৃত্বের আকৃতি দিয়া সেই কদাকার মৈথিল শূদ্রাণীর মনের গভীরতা মাপিবার চেষ্টা করেন, যেন থৈ পান না।

হঠাৎ কি মনে হয়, গিরিবালা যেন চেষ্টা করিয়া খজনীর কথা মন থেকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহেন। হাসিয়া বলেন—"কিন্তু কি কুচ্ছিতই ছিল, বাবাঃ! তোর দাদু কি বলতেন জানিস?"

"কি গিন্নী, কি বলতেন?" নাতি উল্লসিত হইয়া ওঠে, ভাবে গল্প বুঝি এবার নূতন পথে মোড় ফিরিল।

গিরিবালা বলেন—"বলতেন মেনকা ; মেনকা হল স্বর্গের পরী কিনা।"

বেশ জোরে হাসিয়া ওঠেন।...যথাসাধ্য চেষ্টা—খজনীকে মন থেকে সরাইতেই হইবে ; কোন দোষ নাই, খুবই ভালো খজনী, অথচ মনে কি একটা অস্বস্তি জাগায় —ওঁর মনের অমঙ্গল-আতঙ্কের আঁচ লাগে যেন।

পাণ্ডুলের রূপকথা অন্য দিক দিয়া আরম্ভ করেন—পাণ্ডুলের যখন সুখের দিন, মধুসূদনের প্রতিপত্তি যখন মধ্যাহ্ন-রেখায়—তখনকার কথা সব। খুব ঘটা করিয়া আরম্ভ করেন গিরিবালা—"তাহালে শোন্, তোর বাপের জন্মের কথা থেকেই আরম্ভ করি..."

নাতিও পিতৃ-জন্মকথা খুব ঘটা করিয়া শুনিবার জন্য নড়িয়া-চড়িয়া শোয়, বলে —"হুঁ", বলো। আমার বাবা তো আগে জন্মেছিলেন গিন্নী, না? অজুর বাবা তো তার পর..."

চমৎকার জমিয়া ওঠে, আর চেষ্টা করিয়া হাসিতে হয় না গিরিবালাকে, আপনা হইতেই খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া বলেন—"শোনো কথা বোম্বেটের! এর মধ্যে বাপের জন্ম নিয়ে হিংসে আরম্ভ হয়ে গেছে ভাইয়ে-ভাইয়ে!...আর তোর বাবা যে এদিকে বলে —আমি বড় না হয়ে সব ছোট হয়ে জন্মালে বাঁচতাম?"

"বাবা ছোট-কাকা হয়ে যেতেন গিন্নী?"

"হত না? তখন কোথায় বা থাকতে, কারই বা হিংসে করতে?"

এ কল্পনাতীত অবস্থা খোকার মাথায় ঢোকে না, আবার ধাঁধায় পড়িয়া একটু চুপ করিয়া থাকে। গিরিবালা বলেন—"না ; ছোটভাই-এর হিংসে করতে নেই। গল্প শোন্ ; তোর বাবা যখন জন্মাল, সমস্ত পাণ্ডুলে হৈ-চৈ পড়ে গেল, সরকারের প্রথম নাতি হয়েছে, সোজা কথা নয় তো! সামনের অতবড় বটতলা আর অশথতলা তো একেবারে অষ্টপ্রহর লোক গিজ্-গিজ্ করছে—সামনের উঠোনটায় প্রকাণ্ড সামিয়ানা পড়েছে—ভাট, নটুয়া, বাজনা-বাদ্যি—এতটুকুর জন্যে বিরাম নেই। বাড়িতে এদিকে তোর বাবার চিৎকার—বড্ড চেঁচাত কিনা, কাক-চিল বসবার জো ছিল না—ওদিকে বাইরে ঐ সব। তোর বাবার যিনি ঠাকুর্দা, আমাদের যিনি বাবা আর কি, তাঁর ভেতরে ভেতরে খুব আমোদ হয়েছে ; কিন্তু

BanglaBook.org

সে কথা তো মানবেন না, তোর বাবার ঠাকুরমাকে বলছেন—'কী এক তোমার নাতি হয়েছে বাবু, বাড়িতেও টেঁকতে দেবে না, বাইরেও টেঁকতে দেবে না'।"

বৃদ্ধের এই অসহায় অবস্থায় খোকার মনে কোথায় সুড়সুড়ি লাগে, একেবারে খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে। তাহার পর প্রতিকারের কথা মনে পড়ে, বলে—"নাটুয়াদের কেন তাড়িয়ে দিলেন না গিন্নী? আমি যদি থাকতাম তো..."

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"বটেই তো, বাবা উঠোনে শুয়ে ট্যা-ট্যা করছে, সে সময় তোমার না থাকলে মানাবে কেন? কথায় বলে না?—বাবা পেটে, মা হাঁটে, আমি তখন বছর আটে।...নটুয়ারা কি কারুর হুকুমে এসেছে যে তাড়ালেই যাবে চলে? সরকারের নাতি হয়েছে, তারা আমোদ করতে এসেছে, তাদের তাড়ায় কে? গান শোনাবে, বকশিশ নেবে, তার পর যাবে...এদিকে ঐ, এর ওপর ঘোড়ার শব্দ, মাঝে মাঝে হাতিও আওয়াজ করে উঠছে।..."

"পক্ষিরাজ ঘোড়া গিন্নী?"

গিরিবালা খানিকটা বাড়াইয়া বলিতেছিলেনই, নাতির পক্ষে রুচিকর করিয়া তবে তাহার কল্পনা যে আবার এতটা উদ্বুদ্ধ হইবে ভাবিতে পারেন নাই। হাসিয়া বলেন—"হ্যাঁ পক্ষিরাজ বৈকি, তুই কি ভেবেছিস্ এই ঘোড়া নাকি, দুৎ!"

এর পরে আর সুর নামানো যায় না, পাণ্ডুল আপনা-আপনিই রূপকথার রাজ্য হইয়া পড়ে। একে পাণ্ডুল, তায় প্রথম সন্তানের কথা একটি স্বপ্নযুগেরই স্মৃতি, গিরিবালার আর একটুও যেন বাধে না। ঘোড় যেমন পক্ষিরাজ হইয়া যায়, হাতিও তেমনি হইয়া পড়ে ঐরাবৎ। গল্প চলিতে থাকে: শুভ উপলক্ষে অনেকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়াছিল—কেহ পালকিতে, কেহ ঘোড়ায়; দূর কুঠি থেকে এক-আধজন বোধ হয় হাতিতেও—একের জায়গায় পাঁচগুণ করিয়া গিরিবালা গল্প চালাইয়া যান। এমনও কত বিচিত্র কাণ্ড হয়, যাহার মূলে মোটেই কিছু নাই। কচি ছেলের কান্না শুনিয়া কোন্ গ্রাম থেকে অপরূপ সুন্দরীর বেশ ধরিয়া কোন্ এক ডাইন আসিতেছিল, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়িয়া কি পরিণামটাই হইল তাহার। আরও সব অনেক কাণ্ড। দুইজনের জগৎ—নাতি আর ঠাকুরমা, তৃতীয় কোন অধিকারীর প্রবেশ নাই সেখানে, তাই কোন প্রশ্ন নাই, কোন সংশয়ের ছায়া নাই—শুধুই কথার আনন্দ, আর শোনার বিস্ময়—দ্বারভাঙ্গার অস্তিত্বই যেন যায় মিটিয়া।

এক সময় নাতি হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল—"আর পরী এল না গিন্নী?"

গিরিবালা থামিয়া যান, মনে মনে বোধ হয় একটু হাসেন, তবে হারটা একেবারে স্বীকার না করিয়া বলেন—"ওমা, পরী এসেছিল বৈকি, সে কথা বুঝি তোকে বলি নি এতক্ষণ? তোর বাবার জম্মেতে আর পরী আসেনি!"

একটু ভাবিতেই গিরিবালার সমস্ত মনটি আলো করিয়া পরী আসে নামিয়া—দুলারমন। পাণ্ডুলে তো দুটো পরীই ছিল—এক খজনী ছদ্মরূপে, আর এক দুলারমন, রূপের ডালি সাজাইয়া।

নাতির সামনে গিরিবালা প্রিয়সখীকে নিখুঁত করিয়া আঁকিয়া তোলেন, এমন পটভূমিকায় তাহাকে পাইয়া মনটা উল্লসিত হইয়া ওঠে।

"পরীও এসেছিল। কী তার রং!—সমস্ত পিঠ ছেয়ে কালো চুলের ঢেউ, ভোমরার

BanglaBook.org

মতো কালো চোখ, তার ওপর সরু-উ-উ দুটি ভুরু কে যেন তুলি দিয়ে টেনে দিয়েছে; তিল ফুলের মতন নাক; ঠোঁট বলে এবার আমি রক্তে ফেটে পড়ব! আর সে কি দাঁত! —যেন দু-সারি মুক্তো সাজানো, যখন হাসছে, মনে হয়...”

নাতি প্রশ্ন করে—“কে বিয়ে করলে গিন্নী?”

গিরিবালা একেবারেই খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠেন, বলেন—“কেন, মতলবখানা কি বলো দিকিন শুনি? তাকে মেরে ধরে কেড়ে নিয়ে আসবে নাকি?”

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু গম্ভীর হইয়া যান, দুলারমনের প্রসঙ্গে মনে যেন কী একটা জোয়ার আসিয়াছে, বাধা মানে না। বলেন—“শোন্ না, তোর বাবাকে পাশে নিয়ে উঠানে বসে রোদ পোয়াচ্ছি, হঠাৎ যেন সমস্ত উঠোনটা আলো করে পরী এল। কোলের উপর হাত দুটি জড়ো করে, দাওয়ায় বসে ঠায় তোর বাবার পানে চেয়ে আছে, মুখে মিটি-মিটি হাসি, কি যেন একটা দুষ্টুমির কথা বলব বলব করছে—সর্বদাই হাসি-ঠাট্টা ভালোবাসত কিনা; তার পর হঠাৎ বলে উঠল—‘দুল্হীন, তুমি একটু চোখ বোজ দিকিন’।”

জিজ্ঞাসা করলাম—‘কেন?’

‘খোকাকে নিয়ে আমি পালাব, চমৎকারটি হয়েছে!’

আমি হেসে বললাম—‘চোখ বোজবার দরকার কি, তুমি এমনিই নিয়ে যেয়ো না দুলারমন’।”

নাতি প্রশ্ন করে—“পরীর নাম ছিল গিন্নী?”

গিরিবালা বলে—“নাম ছিল বৈ কি; সবাই বড় ভালবাসত, তাই নাম হয়েছিল দুলারমন—ওদের ভাষায় দুলার মানে তো আদর করা?...আমি বললাম—তুমি নিয়েই যাও না, যা কাঁদুনে হয়েছে! তোমার ঠাণ্ডা ছেলে হলে বরং আমায় দিও। তাই শুনে সে কি...”

নাতি বাধা দিয়া প্রশ্ন করে—“পরীদের ছেলে খুব ঠাণ্ডা হয় গিন্নী? একটুও কাঁদে না?”

গিরিবালা বলেন—“এ-পরী যে নিজে বড্ড ঠাণ্ডা ছিল...”

“একটুও কাঁদত না?”

“না, দুলারমন-পরীকে যখনই দেখ, শুধু...”

হঠাৎ যেন মনে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল, গিরিবালা চুপ করিয়া গেলেন। আজ ঠিক করিয়াছিলেন রূপে, রঙ্গপ্রিয়তায় দুলারমনের যে আনন্দমূর্তি, নাতির কাছে সেইটিই লোভনীয় করিয়া ফুটাইয়া তুলিবেন, ভগবানের আশীর্বাদে তিনি যে সুখটুকুর আজ অধিকারী, প্রিয় সহচরীকে মনে মনে যেন তাহার ভাগ দেওয়া—নাতিকে লইয়া দুই সখীর কৌতুক। নাতির একটি প্রশ্নে সব ওলটা-পালট হইয়া গেল, উত্তরটি মুখে আটাইয়া গেল।

গিরিবালা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; মন হঠাৎ রূপকথার পাণ্ডুল থেকে বাস্তব পাণ্ডুলে নামিয়া আসিয়াছে। একবার নাতির নিকট উৎসুক তাগাদা খাইয়া তাঁহার ঘোর ভাঙিল, বলিলেন—“অ্যাঁ, কি বলছিলি—কাঁদত না?...না, হাসিই ছিল মুখে লেগে তার...তবে কাঁদতও—কাঁদত বৈ কি—”

রূপকথায় নাতি একজন অথরিটি, ঠাকুরমাকে সাহায্য করে—“না কাঁদলে মানিক ঝরবে কি করে, না গিন্নী? পরীদের তো কাঁদলে মানিক ঝরে, হাসলে মুক্তো ঝরে...”

BanglaBook.org

গিরিবালা যেন কূল পান—"হ্যাঁ, মানিকই ঝরত, তার কান্নায় মানিকই ঝরত বটে—"

নাতি নিজের অভিমতে বোধ হয় গর্ব অনুভব করে, একটু গম্ভীর হইয়া বলে—"আর তুমি বলছিলে কাঁদত না!"

"না কাঁদত—কাঁদত বৈ কি।"—গিরিবালা আবার অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন, কথা হইয়া পড়ে অসংলগ্ন—"কাঁদত, তবে হাসত বেশি...রোস্ হয়েছে—এবার মনে পড়েছে—সে হাসি দিয়ে কান্না চেপে রাখত—তাই মুক্তোয়-মানিকে জড়াজড়ি হয়ে যেত তার হাসিতে..."

নাতির সব জানা—এক-এক সময় ঠাকুরমার এই রকম কি হয়, ক্রমাগতই তাঁহাকে সাহায্য করিতে হয়, মনে করাইয়া দিতে হয়, গল্প কিন্তু আর কোনমতেই জমে না।...তবু একটু চেষ্টা চলিল।

তাহার পর একসময় একটা ছুতা করিয়া সে নামিয়া গেল।

দুলারমনের চিন্তা আসিয়া গিরিবালার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিল।...কোথায় গেল দুলারমন? শেষ পর্যন্ত হতভাগিনীর জীবনে কি হইল? পাণ্ডুলে নাই, পাণ্ডুলের কেহ দিতে পারে না কোন খবর। কয়েক বৎসর আগে একবার গঙ্গাস্নানের জন্য এই পথ দিয়া মেয়ে-পুরুষের একটি যাত্রীদল যাইতেছিল ; একটি আধ-বুড়ি গোছের স্ত্রীলোক 'দুল্হীন' বলিয়া আসিয়া পরিচয় দিল, সে পাণ্ডুলের নিকটবর্তী সাগরপুরের লোক। কিছু কিছু গল্প হইল। তাহার নিকট মাত্র এইটুকু টের পাইয়াছিলেন যে, দুলারমন পাণ্ডুলে নাই, ওদের বাড়িতে মাত্র তাহার ভাই ভাজ আর তাহাদের দুইটি ছেলে আছে। মনে হইল বুড়ি দুলারমন সম্বন্ধে আলোচনাটা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেই করিতেছে। তাহার পর দলের লোকেরা হঠাৎ ডেরা তুলিয়া যাত্রা করায় আর কথাটা পরিষ্কার হইল না। আরও কয়েক বৎসর পরের কথা—বিপিনবিহারীর একবার মধুবাণীতে দরকার পড়িয়াছিল ; গিরিবালা একটু খোঁজ লইতে বলিয়া দিয়াছিলেন। বিপিনবিহারী আসিয়া বলিলেন—ওদের বসত-বাড়িটা কিনিয়া লইয়া কে একজন একটা কোঠা-বাড়ি তুলিয়াছে। তাও তালা-বন্ধ : এদিকে গাড়িরও সময় হইয়া গিয়াছিল, তিনি আর বেশি খোঁজ লইতে পারিলেন না।

এই প্রায় কুড়ি বৎসরের মধ্যে দুলারমনের মাত্র এইটুকু সংবাদ পাওয়া গেছে। মাঝে মাঝে এই দুইটি সংবাদ-কণিকার চারিধারে গিরিবালার মনটা যেন পাক খাইতে থাকে—প্রিয়কে ঘিরিয়া তো থাকে আশঙ্কাই!—গিরিবালার কেবলই মনে হয়, দুলারমনের আলোচনায় সেই বুড়ির মনটা হঠাৎ যে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, কেন?

নাতি উঠিয়া গেলে গিরিবালা চুপ করিয়া বিছানাতেই শুইয়া রহিলেন, পাশে নাতনিটি ঘুমাইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন রূপে দুলারমন যেন চোখের সামনে মিলাইয়া মিলাইয়া যাইতেছে—প্রথমে সেই হাস্যময়ী নবপরিচিতা কথায় কথায় হাসি, কথায় কথায় রহস্য—দুলারমন আসিয়াছে, বাড়ির গুমোট যেন সঙ্গে সঙ্গেই কাটিয়া গেল। তাহার পর সেই ব্রীড়াময়ী বধূ—গহনায়, শাড়ি-আংরাখায়, নূতন প্রসাধনে জমজম করিতেছে দুলারমন...গিরিবালা শাশুড়িকে প্রশ্ন করিতেছেন—"মা, সীতাও নাকি এই রকম ছিলেন মা?..." আরও পরের কথা, গিরিবালা বাপের বাড়ি থেকে ফিরিয়া আসিলেন, দুলারমন পাণ্ডুলেই, কিন্তু আসে না।...বড় ননদ বিরাজমোহিনী জানাইলেন—ওকে শ্বশুরবাড়িতে আর নেয় না।...অবশেষে

BanglaBook.org

অনেক ডাকাডাকির পর একদিন আসিল দুলারমন। মলিন, ক্লান্ত, অবসন্ন, ফুলটিকে যেন ভিতরে ভিতরে পোকায় কাটিয়াছে, এইবার ঝরিয়া পড়িবে। তবু হাসি—জীবনের অসফলতাকে হাসি দিয়া ঢাকিবার সে কী অমানুষিক চেষ্টা! সেই কথা মনে করিয়াই তো গিরিবালা নাতিকে বলিলেন—"সে হাসি দিয়া কান্না চেপে রাখত, মুক্তোয়-মানিকে জড়াজড়ি হয়ে যেত তার হাসিতে।" তাহার পর আরও মলিন, আরও মলিন, আরও মলিন—যেন আর চাওয়া যায় না দুলারমনের পানে। এই চিত্রপরম্পরার শেষ চিত্রটি এখনও চোখে যেন লাগিয়া আছে—পাণ্ডুল ছাড়িয়া শেষ যাত্রায় চলিয়াছে তাঁহাদের শামপেনি, যতক্ষণ দেখা গেল দুলারমন বাড়ির চৌকাঠে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আঁচলে প্রায় সমস্ত মুখটা ঢাকা, তাহারই উপর দিয়া শামপেনির পানে চাহিয়া আছে —যতক্ষণ দেখা যায়—যত দূর পর্যন্ত।...তাহার সব গেছে, এই বিদেশী পরিবারের দরদ ছিল যেন একটা অবলম্বন, বিধাতা সেটুকুও ঘুচাইলেন।

এর পর আসিল পাণ্ডুল আর মধুবাণীর ঐটুকু খবর।

আজ খুব বেশি করিয়া দুলারমনকে রঙে আলোয় সাজাইতে গিয়া তাহার চারিদিকের অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হইয়া গেছে। কেবলই মনে হইতেছে কোথায় গেল দুলারমন, হতভাগিনীর জীবনের শেষ পরিণাম কি? দুলারমনের আলোচনায় সেই বৃদ্ধা হঠাৎ অমন হইয়া গেল কেন? আর সহ্য করিতে না পারিয়া দুলারমন কি শেষে...

চিন্তাটাকে গিরিবালা যেন দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া ঠেলিয়া রাখিতে চান।

॥ ৩ ॥

যাহাকে হারানো যায়, ঠিক তাহার জায়গাটি অন্য কেহ পূরণ করিতে পারে না, কেন না প্রত্যেকেই তো একটি আলাদা জগৎ লইয়া আমাদের জীবনে প্রবেশ করে। তবু গিরিবালার এক এক সময় মনে হয় ননীবালা যেন তাঁহার দুলারমন—হাস্যময়ী, যেখানে থাকেন, যেখান দিয়া যান, একটি যেন অদৃশ্য আলো বিকিরণ করিতে থাকেন। ওঁর বাপের বাড়ি তো এখানেই, এদিকে আসিয়া স্বামীও সেই শহরেই বাড়ি করিলেন, আর তাও গিরিবালাদের বাড়ির কাছে ; মাঝে একটি সরু রাস্তার ব্যবধান, তাহার পর খানদুয়েক বাড়ি বাদ দিয়েই ননীবালাদের বাড়ি।

বেশ জমে দুইজনে। অবশ্য অনেক দিনের কথা হইয়া গেল, ওঁর বাড়িটিও এখন ছেলে-মেয়ে দৌহিত্র-দৌহিত্রীতে ভরা, তবু নিতান্ত অসম্ভব না হইলে একবার করিয়া আসা চাই-ই। তাহা ভিন্ন কোথায় নূতন কি হইতেছে—থিয়েটার, বাংলা বায়োস্কোপ, কি বাংলা দেশ হইতে কথক আসিয়াছে, বা কীর্তনদল—দ্বারভাঙ্গাতেই হোক বা লাহেরিয়াসরাইয়ে —যাওয়া চাই। শুধু ননদ-জায়ে নয়, বৌয়ে-ঝিয়ে একটি বড় দল করিয়া। একটা কিছুর গুজব উঠিলে গিরিবালার মেয়ে বৌয়েরাও সপ্তাহখানেক পূর্ব থেকে ননীবালারই দরবার শুরু করিয়া দেয়।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষে লাহেরিয়াসরাই বারোয়ারী-তলায় একটু বিশেষ ধুমধাম হয়, দ্বারভাঙ্গায় কালীপূজায় যেমন থিয়েটার হয়। দ্বারভাঙ্গার সবাই যে যাইতে পারে এমন

নয়, অনেকটা দূর ; তবে ননীবালার একেবারে বাঁধা। গিরিবালার আপত্তি বিশেষ থাকেও না, থাকিলেও খাটে না। এবার আবার কাশী থেকে নাচের ছেলে আসিয়াছে, একটু সাড়া পড়িয়া গেছে বেশি। ভিড় হইবে, একটু সকাল সকালই গেছেন।

থিয়েটার আরম্ভ হইবার খানিকটা আগে পর্যন্ত ঘণ্টাখানেক সময় মেয়েদের জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; তাঁহারা দেখিয়া-শুনিয়া আলাপ-পরিচয় করিয়া বেড়ান, পর্দা সে রকম ঢিলা হওয়া এই সেদিন থেকে আরম্ভ হইয়াছে। তাহা ভিন্ন বিশিষ্ট বেহারী পরিবারের স্ত্রীলোকেরাও আসেন, তাঁহাদের মধ্যে পর্দার কড়াক্কড়ি একটু বেশিই।...এই ঘণ্টাখানেকের সময় পুরুষেরা একটু সরিয়া থাকেন ; থিয়েটারের সাজঘরে যা খানিকটা জটলা হয়।

নূতন পরিচয় করার উৎসাহ এবং দক্ষতা দুইটাই কম গিরিবালার। দেবীমণ্ডপের কাছে কয়েকজন পরিচিতার সঙ্গে দেখা হইল, একটু গল্প-গুজব হইল, তার পর মেয়েদের জায়গায় একটু আগের দিকে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

ননীবালা হাত-কয়েক দূরে একজনের সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন, বলিলেন—"তাহলে আমাদের জন্যে খানিকটা জায়গা আগলে রেখো বৌদি, নৈলে ঝগড়া হবে..."

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একজন মহিলা গিরিবালার পাশে বসিতেছিলেন—বর্ষীয়সী, প্রায় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়স, টকটকে রং, লম্বায় আড়ে দশাসই চেহারা, হাতে একটা মাঝারি সাইজের পানের বাটা ; শরীরের গুরুত্বের জন্যই ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। ননীবালা কথাটা শেষ না করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"তা বলে বৌদি তুমি যেন জায়গার জন্যে হুট করে ঝগড়া করতে যেও না কারুর সঙ্গে, নিজের ওজন না বুঝে..."

বর্ষীয়সীর পানে আড়ে চাহিয়া লইয়া হঠাৎ একটু ভয়ের অভিনয় করিয়া বলার ভঙ্গিতে কাছাকাছি সবাই হাসিয়া উঠিল। গিরিবালাও মুখটা ঘুরাইয়া হাসি চাপিবার চেষ্টা করিলেন।

বর্ষীয়সী হাসিয়া একটা হাতের ভরে বসিতে বসিতে বলিলেন,—"সে তোমার ভয় নেই বাছা, এবার যা সেপাই বসলাম, তোমার জায়গা রক্ষে..."

ননীবালা ঠোঁটে অল্প একটু হাসি লইয়া আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন—"মাপ করবেন, আমার একটু বলা মুখ,·রক্ষে করবার জন্যে সেপাই আর আমার রাখলেন কি? সবটাই তো নিজেই গ্রাস করে নিলেন।"

সকলেই একেবারে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বর্ষীয়সী একটু রঙ্গপ্রিয়ই—মোটা লোকে প্রায় হয়ই, নিজেও শরীর দুলাইয়া হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন,—"না, তুমি যাও। অভয় দিচ্ছি, না কুলোয় ছেড়েই দেব জায়গা, আর কি হবে?"

ননীবালা গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"এর চেয়ে ভয়ের কথা কি আছে?"

"কেন গো?"

"আমার ঐ পানবাটাটির ওপর লোভ ছিল, ভেবেছিলাম জায়গায় যে লোকসানটা গেল, পানবাটার মধ্যে থেকে সেটা সুদে-আসলে উসুল করে নেব, তা গেলে তো আর আপনি ওটা ছেড়ে যাবেন না? আমি আসছি শীগগির"—বলিয়া হাসির মধ্যে ননীবালা সঙ্গিনীকে লইয়া অন্য দিকে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে, গিরিবালা বর্ষীয়সীর সহিত গল্পসল্প করিতেছেন, ননীবালা আসিয়া আবার উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে একজন স্ত্রীলোক, প্রায় এঁদেরই বয়সী, তাহার পিছনটিতে

এক পাশে দাঁড়াইয়া একটি সাত-আট বছরের মেয়ে। ননীবালা স্ত্রীলোকটির পানে চাহিয়া গিরিবালাকে দেখাইয়া বলিলেন– "এই ইনি।"

গিরিবালা একটু বিস্মিতভাবে নবাগতাকে দেখিয়া লইয়া ননীবালার পানে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিলেন, ননীবালা বলিলেন—"উনি পাণ্ডুলের বিপিনবাবুর স্ত্রী গিরিবালার খোঁজ করছিলেন, আমি দ্বারভাঙ্গায় থাকি শুনে; তা তুমিই তো?"

স্ত্রীলোকটি অল্প একটু হাসির সঙ্গে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া গিরিবালাকে বলিলেন—"আপনি একবার উঠবেন দয়া করে?"

গিরিবালার চোখের সামনে একটা পর্দা যেন ওঠা-নামা করিতে করিতে ধীরে ধীরে গুটাইয়া আসিতেছে—একবার স্মৃতি, আবার তখনই সন্দেহ—তাহার পর তাঁহার মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠল, একবার জিভের একটু জড়তা কাটাইয়া বিস্ময় আর আনন্দের অর্ধস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"দুলারমন না?"

নূতন ধরনের নামে বর্ষীয়সী আর ননীবালা উভয়েই চকিতে একবার স্ত্রীলোকটির মুখের পানে চাহিলেন। কিছু একটা রহস্য আছে সন্দেহ করিয়া ভদ্রতার খাতিরেই ননীবালা বলিলেন—"আমি আসছি বৌদি!—না হয় উনি যখন ডাকছেন, তুমি উঠ, আমি জায়গা আগলাই, এবার ভিড়টা এদিকেই ঝুঁকবে।"

হঠাৎ বর্ষীয়সীর পানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"এবার আপনি তাহলে আপনার পান বের করতে পারেন।"

বর্ষীয়সী হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"হ্যাঁ, এসো; এতক্ষণ হুকুম না পেয়ে যে কী ছটফটানিটাই ধরেছিল আমার!"

পূজার দালানের পাশে বাহিরের দিকে এক ফালি রক আছে, গিরিবালা আর দুলারমন তাহার এক কোণে একটু নিরিবিলি দেখিয়া দাঁড়াইলেন; বিস্ময়ে গিরিবালার মুখে যেন কথা সরিতেছে না। একটা মানুষের জীবনে চারিদিক দিয়া এত পরিবর্তন কল্পনা করা যায় না; দুলারমনের সাজসজ্জা প্রায় সমস্তই বাঙালী ধরনের—মাথায় বাঙালী ধরনের সাদাসিধে খোঁপা, হাতে একটা করিয়া মৈথিল প্যাটার্নের হালকা রূপার জশম আর দুই গাছি করিয়া গলার 'লহটি' বাদে গহনা সমস্তই বাঙালী; বাঙালী শাড়ি, পরাও বাঙালী ধরনেই, শুধু সামনেটা এদেশী প্রথায় একটু কুঞ্চিত। এদিকে রূপ যেন ধরিতেছে না। বয়স হইতেছে—প্রায় গিরিবালারই বয়সী তো—কিন্তু সেই রং যেন আরও চতুর্গুণ উজ্জ্বল হইয়াছে। একটু মোটা হইয়াছেন, তাহাতে ছেলেবেলার সেই ক্ষীণাঙ্গী দুলারমনের চঞ্চলতাটা যেন ঢাকা পড়িয়া গেছে বটে, কিন্তু বয়স হিসাবে মানাইয়াছে ভালো। ...সর্বোপরি বেশ বোঝা যায় দুলারমন সুখে আছেন, আদরে আছেন, যত্নে আছেন; গহনা-পরিচ্ছদ বাহুল্যবর্জিত, কিন্তু ওরই মধ্যে দামী, শরীরের বর্ধিত শ্রীও এর সাক্ষ্য দেয়। মেয়েটি দুলারমনেরই কন্যা মনে হইল, সাহেবদের মেয়ের মতো গায়ে ফ্রক, মাথার দুই দিকে দুইটি বেণী দুলিতেছে; আগায় রাঙা ফিতের বো; আজকাল বাঙালী এবং অবস্থাপন্ন বেহারীর ঘরের ছোট মেয়েরা যেমন সাজিয়া থাকে।

ঐটুকু আসিতে আসিতেই গিরিবালা সব দেখিয়া লইলেন। সব চেয়ে আশ্চর্য ঠেকিল দুলারমনের বাংলা কথা; একটু জড়তা নাই, একটু মৈথিল টান নাই। অন্য কোথাও হইলে কেহ পরিচয় দিয়া দিলেও শুধু বাংলা কথার জন্য বিশ্বাস করা শক্ত হইত যে দুলারমন!

BanglaBook.org

মুখোমুখি দাঁড়াইয়া দুলারমন প্রশ্ন করিলেন—"তাহলে পারলে চিনতে দুল্‌হীন? আমি ভেবেছিলাম..."

গিরিবালার বিস্ময়ের ঘোরটা কাটে নাই, বলিলেন—"চিনতে তো পারলাম, কিন্তু বুঝতে পারছি না, আপনার..."

দুলারমন হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন—"আর 'আপনার' থাক্‌, পাণ্ডুলের সম্বন্ধটা আর বদলাবার দরকার নেই, না হয় বয়সই বেড়েছে। আমিও সেই জন্যে 'দুল্‌হীন' বলেই ডাকলাম, আর ডাকবও, তা তুমি যতই গিন্নী-বান্নি হও না কেন।"

হাসিয়া শরীরের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া বলিলেন—"আর হয়েছও দেখতে পাচ্ছি।"

আর একটু জোরে হাসিয়া উঠিলেন।

গিরিবালার জড়তা কাটে নাই ভাল ভাবে, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"এক ভাবে কি থাকা যায়?"

দুলারমন কি একটু ভাবিয়া লইয়া বলিলেন—"গেলে কিন্তু মন্দ হত না; ভেবে দেখ না, পাণ্ডুলের সেই দিনগুলো যদি ধরে রাখা যেত, থাক্‌...এই দিন পাঁচেক হল তোমার নন্দাই এখানে বদলি হয়ে এসেছেন, আর সেই থেকে আমি যে কী ছটফট করছি!"

গিরিবালার দৃষ্টি আরও জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিল।

দুলারমন চোখ দুইটা বড় করিয়া বলিলেন—"ওমা, তুমি বুঝি কিছুই জানো না?"

মেয়েটির দিকে চাহিয়া মৈথিলীতে বলিলেন—"তুই ঠাকুর দেখগে যা রামকিশোরী, আমি ডেকে নেব।"

মেয়েটি চলিয়া গেলে বলিলেন—"কিছুই জানো না বুঝি তুমি—হারাধন যে আবার পাওয়া গেছে!"

গিরিবালা বলিলেন—"তা অনেকটা বুঝতে পারছি, কিন্তু কি করে?"

"হাল ছেড়ে দিয়ে।"—বলিয়া দুলারমন চাপাগলায় খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"জান তো?—যতক্ষণ হা-হুতাশ করবে, ততক্ষণ ওঁরা ধরা দেবার পাত্র নন। শেষে বিরক্ত হয়ে যেই মনে মনে বললাম—দুত্তোর আর ভাবব্‌ই না, অমনি..."

পাণ্ডুলের সেই রহস্য-কৌতুকমণ্ডিত দিনগুলি ফিরাইয়া আনিতেছিলেন দুলারমন। নিজের অজ্ঞাতসারেই গিরিবালার মুখে একটু হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে, ওঁর মুখের পানে চাহিয়া আছেন। দুলারমন একটু থামিয়া বলিলেন—"দুল্‌হীনের বিশ্বাস হচ্ছে না; হ্যাঁ গো, ভাবনার পাটই দিচ্ছিলাম উঠিয়ে..."

স্বরটা একটু মলিন হইয়া গেল, গিরিবালার মুখেও একটা আতঙ্কের ছায়া পড়িল, সেটা স্পষ্ট হইবার পূর্বেই বা তাঁহার উদ্বিগ্ন প্রশ্নটা বাহির হইবার পূবেই দুলারমন কণ্ঠস্বরটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন—"ব্যস্‌ সঙ্গে সঙ্গে বাবুর খবর এসে হাজির। ঠাকুরমা মারা গেলেন, বাবা মারা গেলেন, আমি তখন মধুবাণীতে তো—এক দিন হঠাৎ শ্বশুরের নামে একখানি বড় রেজেস্টারি খাম এল,—একখানি গেজেট, তাতে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া..."

দুলারমন হঠাৎ থামিয়া গেলেন, বোধ হয় নিজের মুখে নিজের সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলা আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিতেছে, নিজের ভাব ও ভঙ্গি দুই-ই বদলাইয়া বলিয়া উঠিলেন

BanglaBook.org

—"না, এবার তুমি আন্দাজ করো দুল্‌হীন, দেখি তোমার সেই হেঁয়ালি ধরবার ক্ষমতাটা আছে কি হারিয়েছে!"

গিরিবালার সহজ ভাবটি ফিরিয়া আসিয়াছে, হাসিয়া বলিলেন—" না তুমিই বলো ; জীবনে অনেকে যেমন হারাধন পায়, তেমনি অনেকে আবার পাওয়া-ধন হারায় তো? আমি হারিয়েছি সে ক্ষমতাটা।"

দুলারমন হাসি মুখেই একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া গিরিবালার পানে চাহিয়া মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিলেন—"হুঁ,—কিন্তু দুষ্টু বুদ্ধিটুকু তো হারাও নি দুল্‌হীন!"

দুজনেই হাসিয়া উঠিলেন। দুলারমন একটু চুপ করিয়া রহিলেন। প্রিয় সঙ্গিনীর কাছে সংবাদটি দিতে আনন্দে, গরবে, লজ্জায় তাঁহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কি করিয়া প্রকাশ করিবেন সেই লইয়া যেন অস্বস্তিতে পড়িয়া গেলেন, তাহার পর হাত দুইটা পিঠের দিকে করিয়া, ঠাকুরঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়া কতকটা অবহেলার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"এমন কিছু নয়,—গেজেটে লাল পেন্সিলে নিজের নামের নিচে দাগ দেওয়া—সাব ডেপুটির পদ পেয়েছেন।"

গিরিবালা আনন্দে বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"সাব ডেপুটি!—সে তো বড় চাকরি ভাই!"

দুলারমনের মুখটা আরও রাঙা হইয়া উঠিল, যেন এদিককার পাটটা চুকাইয়া দিবার জন্যই বলিলেন—"তেমন আর কি?—তবে হ্যাঁ, আমাদের নাগালের তো বাইরেই বলতে হবে? ওর মধ্যে ডেপুটি পদটা যা একটু...তা এতদিন পরে সেই পদে এখানে বদলি হয়ে এলেন।"

দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। গিরিবালা দুইটি ছবি মনে মনে মিলাইয়া দেখিতেছেন—সেই দুঃখিনী দুলারমন—কথা কহিতে, হাসিতে বুকে টান ধরিতেছে, মুখটা নীল হইয়া উঠিতেছে, আর এই সুখৈশ্বর্যময়ী। ...একটি প্রীতির রসে ওঁর মন সিক্ত হইয়া আসিয়াছে, কিছু একটা বলা দরকার এইসময়, দুই দিকেই এই চুপ করিয়া থাকার অস্বস্তিটা কাটে তাহা হইলে, কিন্তু মনের আনন্দটিকে প্রকাশ করে এমন কথা যোগাইতেছে না। এ সব অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে দুলারমনই যোগ্য বেশি, হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন— "বাঃ, আসল কথাই তো জিগ্যেস করলে না দুল্‌হীন—আমি এমন বাংলা শিখলাম কোথায়!"

যেন নিজেরই তাঁহার আশ্চর্য হইবার কথা, এই ভাবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া রহিলেন। গিরিবালা বলিলেন—"হ্যাঁ, আমিও তাই আশ্চর্য হচ্ছিলাম।"

"মধুবাণী থেকে একেবারে যে চাঁইবাসায় টেনে তুললে গো! চাকরিটা সেইখানেই আরম্ভ হল কিনা। তার পরই প্রায় পনেরো বছর তো সেই দিকেই কাটল—কোথায় ধানবাদ, কোথায় রঘুনাথপুর, কোথায় পুরুলে—সব তো বাংলা দেশই? তোমার নন্দাই আমায় বলেন—'ঠিক হয়েছে, যেমন বাঙালী-বাঙালী করতে...' "

গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"তা লাগল কেমন?"

দুলারমন কি ভাবিয়া চোখ দুইটা একটু ঘুরাইয়া লইলেন, প্রশ্ন করিলেন—"তোমার এখানে কি রকম লাগছে—"

সেই কথার মারপ্যাঁচ!...গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—"মন্দ কি?—এখানে তো বাঙালীও অনেক, অভাবটা বোঝা যায় না।"

দুলারমন বলিলেন—“ওদিকেও কয়েক জায়গায় বেশ কিছু-কিছু মৈথিল আছে, তবে তোমার নন্দাইয়ের কথা বলতে গেলে সব জাত খুইয়ে বাঙালী হয়ে গেছে।”

বাঙালীকে ছোট করিয়া দেওয়ায় দুলারমন খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালাও যোগ দিলেন, বিপিনবিহারীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—“তোমার ভাইয়ের কাছে বলতে বলো না, সাহস থাকে তো বাঙালী-মৈথিলের বোঝা-পড়াটা ভাল করে হয় যাবে'খন।”

“ও মা, এতকাল নাগাড়ে বাংলায় কাটিয়ে নিজেরই তার জাত আছে নাকি?”

বর্ধিত হাসির মধ্যেই গিরিবালা অনুযোগের স্বরে বলিলেন—“তুমি বুঝি আমাদের ছোট করছ ভাই?”

“আমারই জাত আছে নাকি?”—বলিয়া দুলারমন আবার খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আশে-পাশে লোকের জন্য হাসিটা চাপা দেওয়ার চেষ্টায় দুজনেরই শরীর কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

একটু পরে নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া দুলারমন বলিলেন—“গেরো! ...হ্যাঁ, কি কথা হচ্ছিল? হ্যাঁ, আমার তো বেশ ভালই লাগত ভাই, বেশ মানুষ সব। মানুষ যে ভাল তার নমুনা তো আগেই পেয়েছিলাম পাণ্ডুলে।”

মুখটা একটু আড় করিয়া লইয়া প্রীতিস্নিগ্ধ দৃষ্টিতে গিরিবালার পানে চাহিয়া রহিলেন। প্রশংসার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই গিরিবালা বলিলেন —“তা তো হল ; কিন্তু চাকরিটা হল কি করে বললে না তো ; বেশ খোঁটার জোর না থাকলে তো হয় না এসব চাকরি।”

দুলারমন আবার যেন একটু ফাঁপরে পড়িলেন। ঘরছাড়া, নিঃসহায় একটি যুবক নিজের অন্তরের প্রেরণায় সামাজিক কুসংস্কারের গণ্ডি কাটাইয়া শুধু নিজের উদ্যম আর অধ্যবসায়ের জোরে কি করিয়া জীবনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইল,—কত ঝড়, কত ঝঞ্ঝা, কত হীনতা, কত নৈরশ্যের মধ্যে দিয়া এই বিজয় অভিযান—সে ইতিহাস তো শোনাইবারই মতো, বিশেষ করিয়া নিজের মনের মানুষকে ; কিন্তু বড় লজ্জা করে। দুলারমন চুপ করিয়া একটু যেন ভাবিলেন, তাহার পর মুখটা তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন —“সে হবে'খন আর এক দিন, দুলারমন খালি বকে যাক, আর উনি শুনে যান, বা রে, কী চালাক!...এবার তোমাদের খবর বল—বিপিন-ভাইয়া কেমন আছেন, কি ছেলে-পুলে...”

“উনি ভালই আছেন। ছেলেপুলে...”

—বলিয়া গিরিবালা আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, চুপ করিয়া গেলেন। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল দুলারমনের প্রথম জীবনের কথা, একটু কুণ্ঠিতভাবে মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ, আগে তোমার কি ছেলেপুলে, বলো, অন্য কথা না হয় পরেই শুনব। ঐ তো একটি মেয়ে...”

প্রশ্নের উদ্দেশ্যটি বুঝিলেন দুলারমন : এমনি কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সাধারণ ভাবেই জবাব দিতেন, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে পারিলেন না ; সেই পুরনো দিনের কথা সব মনে পড়িয়া গেল—সেই দুঃখে, তাপে, গঞ্জনায়, অত্যাচারে না-পাইতেই হারানোর কথা—মুখটা যেন কি-রকম হইয়া গেল, গিরিবালার মুখের পানে যেন চাহিতে পারিতেছেন না ; শেষে চোখ দুইটি পর্যন্ত ছলছল করিয়া উঠিল, ধরা গলায় বলিলেন—“দুলহীন, ছেলেরা বড্ড

BanglaBook.org

অভিমানী হয় যে—একবার এসে আদরের ঘটা দেখে আর...”

মুখটা ঘুরাইয়া চোখ দুইটা মুছিয়া লইলেন।

গিলিবালা অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—“চুপ করো ভাই, আমারই ভুল হয়ে গেছে—”

মুশকিল হইল এর পরে নিজের সন্তানের প্রসঙ্গটা তোলা—ভগবানের অসীম দয়া, আর যাই হোক, অন্তত এদিক দিয়া তাঁহাকে যে সমৃদ্ধই করিয়াছেন। অস্বস্তিতে পড়িয়া একটু চুপ করিয়াই থাকিতে হইল, তাহার পর সামলাইয়া লইলেন দুলারমনই। নিজেকে সংযত করিয়া লইয়াছেন, মুখ না ফিরাইয়া একটু হাসিয়াই বলিলেন—“এত বাজে কথাও মনে পড়ে যায়!...ঠিক কথা, তোমার বড় ছেলের তো বিয়ে হয়ে যাওয়ার কথা দুল্‌হীন? শশাঙ্ক নাম ছিল না?”

গিরিবালা যেন বাঁচিলেন, বলিলেন—“হয়ে গেছে বিয়ে তার।”

দুলারমনের মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিলেন—“সত্যি? বৌকে এনেছ নাকি থিয়েটার দেখতে, না আপনি নাপিয়ে এসেছ?”

“না, এসেছেন বৈ কি, দেখবে'খন, সেজ বৌমাও এসেছেন।”

“সেজ?...দাঁড়াও, হরেন নাম ছিল তো? আমার ঠিক মনে আছে, একটু দুরন্ত ছিল বেশি...”

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—“হ্যাঁ, আজকাল ঠাণ্ডা হয়েছে।”

“শোন কথা দুল্‌হীনের? চিরকালটাই নাকি এক ভাবে থাকে গা? যে যত দুষ্টু সে আবার তত ঠাণ্ডা হয় পরের কালে...আর মেজ বৌমা? মেজ ছেলের নাম শৈলেন ছিল না? একটু যেন...”

গিরিবালার মুখের পানে চাহিয়া দুলারমনের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল ; মুখটা তাঁহার একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া গেছে। একেবারে চরমতম আশঙ্কার সহিত যেন সম্মোহিত ভাবেই দুলারমন মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

গিরিবালা বলিলেন—“মেজটি বিয়ে করতে চাইলেন না তখন ভাই, সে দুঃখের কথা আর বলো না।”

দুলারমন রুদ্ধশ্বাসটা ধীরে ধীরে মোচন করিয়া দিলেন। ভয়টা একেবারে উগ্রতম হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া মনটা তাঁহার এত হালকা হইয়া উঠিল যে, এই নৈরাশ্যটুকু গায়েই মাখিলেন না ; হাসিয়াই বলিলেন—“চাহিলে না তো?—আমি মোটেই আশ্চর্য হই নি, মেজ ছেলে যে!—ভোগাবে। আমি অনেক মিলিয়ে দেখেছি ; তোমাদের নন্দাইও বাপ-মায়ের মেজ ছেলে...নাকের জলে চোখের জলে করবে...”

হাসিয়া আঙুল নাড়িয়া দৈবজ্ঞের মতো বলার ভঙ্গিতে গিরিবালাও হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—“কিন্তু এই এখন আবার রাজী হয়েছে, সেজ ছেলের ন'ছেলের হয়ে গেল বিয়ে, পরেরটির কথাবার্তা চলছে, এত দিন পরে এখন বলছে—”

দুলারমন একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—“ঠিক হয়েছে। ঐ ওষুধ ওদের। একেবারে গা করো না। ইস্, ব্যাটারা আমার সব ভীষ্মদেব হবেন, সংসার আর থেকে কাজ নেই! এবার ধমকে বলবে—‘যা বিয়ে করবি তো নিজের বৌ দেখে নিগে যা, আমরা আর ও-সবের মধ্যে নেই' ; দেখ না, কি রকম কেঁচোটি হয়ে—”

BanglaBook.org

মুখে আঁচল দিয়া দুজনে দুলিয়া-দুলিয়া হাসিতেছেন, ননীবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত গম্ভীর ভাবে চাহিয়া বলিলেন—"ও মা, আর আমি ওদিকে জায়গা রাখবার জন্যে সবার সঙ্গে ঝগড়া করে মরছি!"

গিরিবালা হাসিতে হাসিতেই দুলারমনকে সাক্ষী মানিয়া বলিলেন—"আর আমাদেরও তো এখানে ঝগড়ার কথাই হচ্ছিল, না ভাই?"

দুলারমন ননীবালার গম্ভীর ভাব লক্ষ্য করিয়া উত্তর করিলেন—"হ্যাঁ, এবার গুটি-গুটি চলো, নৈলে কি হয় বলা যায় না ; ঝগড়ারই হাওয়া উঠেছে এখানে,—ইনিও যে শান্তির জল ছিটোতে এসেছেন এমন মনে হয় না।"

আর একটা হাসির তরঙ্গ তুলিয়া তিনজনে প্রেক্ষাগৃহের দিকে অগ্রসর হইলেন।

॥ ৪ ॥

মনে হইল জীবন যেন পরিপূর্ণ ভাবে সার্থক হইয়া আসিতেছে। দুলারমনকে এতদিন পরে ফিরিয়া পাওয়া, তাও আবার এই রকম অদ্ভুত পরিবর্তনের মধ্যে—সবটুকু মিলিয়া গিরিবালাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। দুলারমনের এই সুখ—এও যেন তাঁহার সুখেরই পূর্ণতা : কোথায় একটু খালি ছিল, ভগবান যেন সেইটুকু পূরাইয়া দিলেন। এই রকমই তো হয় মনে ; শুধু নিজের সংসারটুকু লইয়াই তো জীবন নয় ; সুখের দিনে মনে হয় যাহাকে যাহাকে জীবনে ভালবাসিয়াছি, সবাইকেই সুখী দেখি। ঠিক এই সময়টিতে আনন্দকে গ্রহণ করিবার জন্য গিরিবালার মনটা প্রস্তুতও ছিল বেশি করিয়া—মেজ ছেলে এতদিন পরে বলিয়াছে বিবাহ করিবে, বহু দিনের একটা ভার নামিয়া গিয়া মনটা হাল্‌কাও ছিল ; দুলারমনঘটিত সমস্ত ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত স্নিগ্ধতায় যেন আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

দেরি করিয়া উঠিবার কথা, কিন্তু ঘুমটা ভোরেই ভাঙিয়া গেল। বাড়িতে কিছু একটা উৎসব থাকিলে, কিংবা কিছু একটা নূতন জিনিস পাইলে যেমন একটা প্রসন্ন চাঞ্চল্যে শিশুদের মনটা ভরিয়া থাকে—ঘুমাইতে দেয় না, কতকটা সেইরূপ। আকাশে টুকরা টুকরা মেঘ, সূর্যোদয় হইবে, হাল্‌কা গাঢ় কত রকম রঙের পূর্বাভাস লাগিয়াছে, আর সবগুলাই ক্রমে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। পূর্বদিকের জানালার কাছটিতে গিরিবালা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ প্রত্যেকটি জিনিসই লাগিতেছে মিষ্ট, অতি সামান্য ঘটনাটুকুও জীবনের মধু নিংড়াইয়া দিতেছে।...কখন এক সময় মনটা দিনের প্রভাত থেকে জীবনের প্রভাতে গিয়া উপস্থিত হইল। সেই খেলাঘরের দিনগুলি—এক একটা ছবি এখনও বেশ স্পষ্ট—শিউলিতলায় ভাঙা পুতুল লইয়া খেলা, মা ভাত খাইবার তাগাদা দিতেছেন রান্নাঘর থেকে।...আজ গিরিবালার নাতি-নাতনীরা জীবনের ঐ পর্যায়ে ; বড় আশ্চর্য লাগে। ...তাহার পর বিবাহ, সাঁতরা, পাণ্ডুল আর দ্বারভাঙ্গারও প্রথম জীবন। কত বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়া জীবনের গতি। তাহার মধ্যে পাণ্ডুল আর দ্বারভাঙ্গার নিদারুণ দুঃখের দিনগুলাও আছে। কিন্তু কৈ, তবুও তো জীবনকে মন্দ লাগে না। দুঃখও জীবনকে দেয় পূর্ণতা—ছেলেদের মধ্যে কে যেন সেদিন কথাটা বলিল। সত্যই তো, অসুখ লুকাইবার জন্য গিরিবালা সুস্থতার ভান করিলেন, স্বামী প্রবঞ্চিত হইলেন, কিন্তু শশাঙ্ক তো ঠিক ধরিয়া

ফেলিল, মাকে বাঁচাইবার জন্য জীবনের সব উচ্চাশা ছাড়িয়া বাড়ি আসিয়া বসিল। দুঃখের এ দান গিরিবালা কি কখনও ভুলিতে পারিবেন? মা হওয়ার এই গৌরবটুকু পাওয়ার জন্য যে জন্ম জন্ম ধরিয়া দুঃখের সাধনা করা চলে।

প্রভাত আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এতক্ষণ শুধু আলোর খেলা ছিল, একটু একটু করিয়া শব্দও জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার পর নূতন জাগিয়া-ওঠা মানুষের কণ্ঠ —গিরিবালার ছোট নাতিটির গলাও শোনা যাইতেছে—সেজ বধূ প্রায় কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলেন—"সেই রাত তিনটে থেকে উঠে সমস্ত বিছানাটায় দৌরাত্মি করে বেড়ায় মা, একটুও যদি চোখ বুজিতে দেয়!..."

আপনি আপনি গিরিবালার মুখে একটি স্মিত হাস্য ফুটিয়া উঠিল—ওদের সবই তো এমনি করিয়া হয় দিয়া দিতে—আপনার বলিয়া কিছু কি রাখিতে দেয় ওরা, তবু যে ওদের চাই-ই। দুলারমনের আপসোস তো এত পাইয়াও গেল না। অভাব শুধু এইটুকুই তো?

রাস্তার ওধারে আম গাছটির পিছনে ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হইল। শাখা-পল্লব-কিশলয়-মুকুলে সমস্ত গাছটিকে মনে হইতেছে যেন একখানি সংসার, তাঁহাদের নিজেদের জীবনের সঙ্গে কোথায় একটি বেশ মিল আছে ; এই নূতন সূর্যের আলো আসিয়া পড়িল, ওটুকু যেন কেমন করিয়া কোথা দিয়া তাঁহাদের সংসারেও আসিয়া পড়িয়াছে।...বোধ হয় কবি-পিতার উত্তরাধিকারেই খুব দুঃখ কিংবা খুব সুখের সময় এই রকম গোছের এক একটা অস্পষ্ট অনুভূতি গিরিবালার মনে আসিয়া পড়ে, অনুরূপ শিক্ষার অভাবেই সেটাকে রূপ দিতে পারে না, স্থিরদৃষ্টিতে শূন্যে চাহিয়া থাকেন।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গিয়া গিরিবালার ভিতরটা যেন হাসিতে উচ্ছল হইয়া উঠিল—দুলারমন বেশ বলিয়াছে—"একেবারে গা করো না দুল্‌হীন্, এবার ধমকে বলবে —বিয়ে করতে হয় তো যা নিজের বৌ খুঁজে নিগে যা, আমরা আর ও সবের মধ্যে নেই..."

আনন্দকেই একটু কৌতুক-রসে মিশাইয়া লইলে যেন আরও মজে, মনটা ক্রমাগতই দুলারমনের কথা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে লাগিল, আর ততই বুকে হাসি যেন গুর-গুর করিয়া উঠিতে লাগিল। বিবাহ যখন সুনিশ্চিত, একবার যদি বলা যাইত শৈলেনকে এ-কথাগুলা!...নিজের দ্বারা হইবে না অবশ্য, মায়ের মুখে শুনিলে কি হইতে কি হয়, ঐ তো ছেলে। তবে বলিবার লোক আছে—ননীবালা—সে আরও একটু অম্লরস মিশাইয়া কথাটিকে এমন সরস করিয়া তুলিবে যে বিয়ে-বাড়িতে একটা উপভোগ্য জিনিস হইয়া থাকিবে।...তাহার পর গিরিবালার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল দুলারমনের কথা,—ঠিক তো, সে তো আসিবেই, তাহাকেই দুষ্টামি করিয়া টিপিয়া দিন না—বলিবার অমন লোক তো আর পাওয়া যাইবে না।...কৌতুকরসে গিরিবালার মনটি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে ; একটি দৃশ্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—দুলারমন আসিয়াছে—শৈলেনকে ডাকিয়া গিরিবালা দুলারমনকে পরিচিত করিয়া দিলেন—প্রণাম করিয়া শৈলেন সামনেই একটু জবুথবু হইয়া দাঁড়াইতেই—যেমন সে দাঁড়ায়—দুলারমন আশীর্বাদের পর অল্প হাসি মুখে লইয়া বলিতেছে—"উঃ!—এই শৈলেন? সেই এতটুকু দেখেছিলাম পাগুলে।—শুনলাম তোমার সব ভাল, কিন্তু এ দুর্মতি কোথা থেকে সেঁদুল মাথায়—বিয়ে করব না?...আমি বাবা খুব

BanglaBook.org

রাগ করেছি—তোমার মাকে বলছিলাম—থাক্, তোমরা আর এর মধ্যে থাকতে যেও না, বেটা আমার সায়েবের জামাই, নিজের কনে নিজেই বেছে নিক গে।"

সঙ্গে সঙ্গে কথার সব গুরুত্ব ছিন্নভিন্ন করিয়া পাণ্ডুলের সেই হাসি...

বড় মেয়ে খুকি আসিয়া একটু যেন কিরকম ভাবে প্রশ্ন করিল—"মা, মেজ দাদার আজ সকালের ট্রেনে কোথাও যাবার কথা ছিল নাকি?"

গিরিবালার বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল, কিন্তু কি ভাবিয়া নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সহজ কণ্ঠে বলিলেন—"কৈ না...মানে, জানি না তো!"

এর পরেই একটু চুপ করিয়া গেলেন, অর্থাৎ কন্যা কেন এ প্রশ্ন করিল এটা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছে না। বুকের ধুকধুকুনিটা হঠাৎ অতিরিক্ত বাড়িয়া গেছে। একটু থামিয়া কণ্ঠস্বর আরও নিশ্চিন্ত করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কেন রে? ওকথা জিগ্যেস করলি যে?"

কন্যা বলিল—"না, খুব ভোরে—অল্প অন্ধকার রয়েছে তখনও—একবার উঠেছিলাম—মনে হল মেজ দাদার মতন ঐ মোড় ঘুরে স্টেশনের রাস্তা ধরে কে যেন চলে গেল—একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে যেন দেখলেও। মেজ দাদা তো বেড়ানও না সকালে, তাও আবার অত সকালে..."

গিরিবালার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন কানে আসিয়া জড়ো হইয়াছে, প্রতিটি কথার সঙ্গে বুকের ধুকধুকুনি যাইতেছে বাড়িয়া—শব্দটা যেন বাহির হইতে শোনা যায়। তবু প্রাণপণে সহজ ভাবটা ধরিয়া আছেন তবে মুখে প্রশ্ন আর যোগাইতেছে না। কন্যা জিজ্ঞাসা করিল —"কাউকে বলব—বাইরের ঘরটা একবার দেখতে?"

গিরিবালা হঠাৎ একটু ধমকের সুরেই বলিলেন—"কেন?"

তাহার পরই আবার খুব সহজ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলিলেন—"কে না কে যাচ্ছিল! রাস্তা দিয়ে চলবে না?...তুই যা, খোকা উঠেছে মনে হচ্ছে।"

কন্যা চলিয়া গেল।

গিরিবালা যেন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহিরটা যেমন অচপল, ভিতরটা তেমনি আছাড়ি-পাছাড়ি খাইতেছে : শৈলেন চলিয়া গেছে বাড়ি ছাড়িয়া, নিশ্চয়—অতি নিশ্চয় একেবারে—জননীর অন্তর দিয়া গিরিবালা জানেন ওর ভিতরে একটা বিক্ষোভ আছে ; একটা দুরন্ত ঘূর্ণি, যা ওকে কখনই স্থিতু হইতে দিবে না, ঘর বাঁধিতে দিবে না —সমস্ত আশার পাশে পাশে এ নিত্য আশঙ্কা।...শৈলেন গেছেই বাড়ি ছাড়িয়া, এতটুকু সন্দেহ নাই গিরিবালার—তবু মায়ের প্রাণ, একেবারে নির্ভুল প্রমাণের সামনা-সামনি হইতে পারিতেছে না।...সেই প্রভাব আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু একেবারে মলিন। কেমন করিয়া অদ্ভুত ধরনের ভয় জাগিতেছে মনে—যে প্রমাণগুলোকে, অর্থাৎ নিশ্চিতের যে-রূপকে গিরিবালা এড়াইতে চাহিতেছেন, একটু পরেই সবাই জাগিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে...যে দিনটাকে এই কয়েক মুহূর্ত আগে পর্যন্ত এত আশ্চর্য রকম মিষ্ট বোধ হইতেছিল, সেটা আতঙ্কের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন রকমে পরিত্রাণ নাই এর হাত থেকে? বাড়ির প্রত্যেক মানুষটিকে, এতটুকু ছেলেকে পর্যন্ত ভয় হইতেছে—কে কখন আসিয়া কি ভাবে খবরটা দিবে ; আর অবিশ্বাস করিবার, আর সহজ অবহেলার কণ্ঠে উত্তর দিবার কোন উপায়ই থাকিবে না।

BanglaBook.org

গিরিবালা জানালাটির সামনেই দাঁড়াইয়া রহিলেন, সংসারটা চারিদিক্ দিয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল—কর্মে-কলরবে। শৈলেন দেরি করিয়া ওঠে, এদিকে খুকি নিজের শিশুকে ঘুম পাড়াইতে পাড়াইতে নিজেও ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, সংবাদটা আর এক চোট চাপা রহিল কিছুক্ষণ ধরিয়া। তাহার পর বাহিরে হঠাৎ নূতন করিয়া যেন চাঞ্চল্য উঠিল—কতকগুলা উৎসুক প্রশ্ন, কতকগুলা এলো-মেলো উত্তর—সবগুলাতেই একটা ভয়ের, উৎকণ্ঠার ছাপ। এক সময় ছোট ছেলে খোকা আসিয়া চোখ বড় বড় করিয়া খবর ছিল—"মা, মেজদা সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন!"

—ছেলেমানুষ, যতটা কল্পনায় আসে গুরুত্বপূর্ণ এবং মানানসই করিয়াই দিল খবরটা, নিজেদের বাড়ির এত বড় একটা সংবাদ।

গিরিবালা ঘাড় ফিরাইয়া সহজ অবিশ্বাসের গলায় কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাহার আগেই স্বয়ং বিপিনবিহারী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; গম্ভীর, অনাসক্ত ; হাতে একটা ছোট্ট চিরকুট, গিরিবালার দিকে বাড়াইয়া বলিলেন—"নাও, বিয়ে-বিয়ে, এই পড়ো ছেলের চিঠি।"

গিরিবারা প্রাণপণে সত্যটাকে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন—শেষ পর্যন্ত—"কে—কি চিঠি?...কার কথা?"

হাতে চিরকুটটা লইয়া স্থিরদৃষ্টিতে সেটার পানে চাহিয়া রহিলেন, অক্ষরগুলায় যেন চোখ বসিতেছে না, তাহার পর এক সময় পড়িলেন। লেখা আছে —"চাকরিটা ছাড়িয়াই যাইতেছি, অতটা অন্যায় সহ্য হইল না। বিবাহের কথাটাও থাক, অযথা সমস্যা বাড়াইয়া ফল কি? চেষ্টা করিয়াছিলাম, তবু কিন্তু তোমাদের কষ্টের কারণ হইয়াও থাকিতে হইল। এই আমার অদৃষ্ট, কি করি?"

গিরিবালা স্বামীর মুখের পানে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। ভাবনা গিয়া আশঙ্কায় দাঁড়াইয়াছে, কি ভাবে ব্যাপারটা গ্রহণ করিবেন তিনি?— অন্য কথা বাদ দিলেও, বিবাহের কথাবার্তা যে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেছে, নিরাশা, লজ্জা, অপরের কাছে সম্ভ্রমহানি, ছেলের অভিশপ্ত জীবনর উপর পিতারও অভিশাপ আসিয়া পড়িবে না তো? যে ভাবে —যে অসহ্য অবস্থার মধ্যে অসীম সহিষ্ণুতায় এদের সবাইকে মানুষ করা, এতটা অকৃতজ্ঞতা কি সহ্য করিতে পারিবেন তিনি?..মায়ের কথা আলাদা, মায়ের সবই সয়।

গিরিবালার দৃষ্টি ধীরে ধীরে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এক সময় বলিলেন—"ছেলেমানুষ না বুঝে..."

বিপিনবিহারীর মুখের একটি রেখার কোথাও পরিবর্তন নাই ; বলিলেন—"সাতাশ বছর পেরিয়ে গেছে।"

গিরিবালা আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, অসহায় ভাবে একবার এদিক ওদিক চাহিয়া যেন একটা মস্ত বড় যুক্তির কথা মনে পড়িয়া গেছে এই ভাবে বলিলেন—"সাতাশ হলেই কি বুদ্ধি হয়? বেটাছেলে..."

অদ্ভুত যুক্তিতে বিপিনবিহারীর ওষ্ঠাধর অল্প একটু কুঞ্চিত হইল, বলিলেন—"বাইশ বছরে আমি একটা পুরো সংসার ঘাড়ে করেছিলাম।"

গিরিবালা এবার ভীত হইয়া পড়িলেন। বেশ খানিকক্ষণ ওঁর মুখে কোন কথাই যোগাইল না ; একটা অনিশ্চিত ভয়ে একবার স্বামীর মুখের পানে, একবার নিচে, একবার

BanglaBook.org

এদিকে, একবার ওদিকে চাহিলেন। তাহার পর হঠাৎ একটা বিসদৃশ কথা বলিয়া বসিলেন—"ত্যাজ্যপুত্র করবে না, তো? না কোরো না।"

তর্কে কুলাইল না, এবার ভিক্ষা। সৃষ্টির আদি থেকে সন্তান লইয়া পিতা বিচারক, মাতা করুণার ভিখারিণী। গিরিবালার দৃষ্টিতে ভয়, ব্যাকুলতা, মিনতি সব একসঙ্গে আসিয়া জমা হইয়াছে।

বিপিনবিহারী এবার বেশ স্পষ্ট ভাবেই হাসিলেন, বলিলেন—"বেশ বলেছ, সমস্ত জীবন ধরে মস্ত বড় সম্পত্তি গড়েছি—ত্যাজপুত্র করে তাই থেকে ওকে বঞ্চিত করব!"

একটু চুপ করিয়া বলিলেন—"অনেক আশা করে ভেবেছিলাম—এরাই আমার এক-একটা সম্পত্তি; সে ভুলটা ভাঙল।"

গিরিবালা যেন প্রাণপণে একটা ভাঙনই বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এই ভাবে গভীর মিনতির কণ্ঠে বলিলেন—"আবার ফিরে আসবে। একটা খেয়ালের মাথায় গেছে চলে—ছেলেমানুষ..."

বিপিনবিহারী এ কথার উপর মন্তব্য করিলেন না, নিজের কথার জের ধরিয়াই কহিলেন—"ভুল মানুষের যত শিগ্‌গির ভাঙে ততই মঙ্গল।"

আর কিছু না বলিয়া, কোন উত্তর না লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

॥ ৫ ॥

দীর্ঘ একটা বৎসর কাটিয়া গেল।

এমন কিছু অনুর্বর বৎসরও নয় ; সেজ ছেলে দূর বিদেশে কাজ লইয়াছিল, ছাড়িয়া-ছুড়িয়া বাড়ি আসিয়া বসিয়াছে। স্বাধীনভাবে কাজ করিতেছে, উন্নতিও হইতেছে। একটি ছেলে সরকারি চাকরিতে পাকা হইল, একটি ছেলের ভালো চাকরি হইল। এক বৎসরের ফসল হিসাবে মন্দ কি?

কিন্তু সুখের চেয়ে দুঃখই গভীরতর রেখাপাত করে। শৈলেনের অনুপস্থিতির কথাটাই মনে যেন সব চেয়ে বড় হইয়া থাকে অষ্টপ্রহর, বরং যখন একটা আনন্দের কথা হয়, মনের আলোটা উজ্জ্বল হইয়া ওঠে—এই বিষাদের কৃষ্ণরেখাটি হইয়া ওঠে সব চেয়ে বেশি স্পষ্ট।

একটা বৎসর শৈলেনের দেখা নাই, চিঠি নাই। বিপিনবিহারীর মনটা যেন দিন-দিন সংসার থেকে উঠিয়া যাইতেছে ; ঠিক গায়ে মাখিয়া সংসারী হইয়া থাকাটা উঁহার আর ছিলই না এদিকে, কিন্তু সেটা ছিল অন্য ধরনের ব্যাপার ; কৃতজ্ঞ প্রসন্নতায় ধীরে ধীরে নিজেকে আলাদা করিয়া লইয়া এই সমস্ত দানের যিনি দাতা তাঁহার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। ছেলে-বৌয়েরা অনুযোগ করিলে হাসিয়া বলিতেন—"আমি এখন ভগবানের পেনসন ভোগ করছি ; সামান্য যে গবর্নমেন্ট সে-ও এ অবস্থায় খাটতে দেয় না, আর আমি তাঁর দয়ার অমর্যাদা করব? এখন আমার কাজ মাঝে-মাঝে দাতার দরবারে গিয়ে সেলাম ঠোকা। নৈলে আবার পেনসন বাতিল হবার ভয় আছে তো?"

এখন অন্য রকম ভাব : সে তৃপ্ত ঔদাসীন্য নয়, নৈরাশ্যের বৈরাগ্য—একটা অবিশ্বাস, একটা সুগভীর বিশ্বাস যে এত যত্ন করিয়া গড়া সবই এক মুহূর্তে নিরর্থক হইয়া যাইতে

BanglaBook.org

পারে ; যতক্ষণ আছে, যেখানে যে ভাবে আছে, থাক্, বুক দিয়া জড়াইয়া ধরিবার দরকার নাই ; অনেক আশা করিয়া জড়াইতে গেলেই ফাঁকি—দেখা যাইবে হাতটা শূন্যকে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়াছে।

কিন্তু পুরুষকে যা সংসার থেকে আলাদা করে—বৈরাগ্য আনিয়া, মেয়েদের সেইটাই সংসারে টানে, নিবিড়তর মমতায়। গিরিবালা যেন আরও বুক দিয়া পড়িয়াছেন। সুখেরই দিন, চারটি ভাই একেসঙ্গে হইয়া রোজগার করিতেছে—কিন্তু বুক দিয়া যে সুখের মধুটুকু আহরণ করিতেছেন এমন নয়, শুধু একটা আকুলি-বিকুলি—সব বজায় থাক্—কি করিয়া যে সব বজায় থাকিবে!—ঐ যে একটা অশান্তি, ওটা বাড়ির কোথাও স্থায়ী অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে না তো?—মায়ের ব্যথা বুকে গোপন করিয়া শুধু খুঁজিয়া বেড়ানো মুখে হাসিটুকু বজায় রাখিয়া।...হাসি যে সংসারের আলো—নিজের মেদ জ্বালাইয়াও তাহাকে সজীব রাখিতে হইবে।

সংসারের বাইরেও এই আলো জ্বালিয়া রাখিতে হয়। ছেলে নিরুদ্দেশ, চিঠি দেয় না, এর লজ্জা যে কত গভীর, যার লজ্জা সেই জানে। অথচ মানের বড়াই করিতে হয়, মা হওয়ায় মর্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখা চাই তো? বাহিরের কেহ সহানুভূতি দেখাইয়া প্রশ্ন করিলে গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"বাবার—মানে, ওর ঠাকুরদাদার ধাত পেয়েছে যে, এক জায়গায় পাকা হয়ে না বসে চিঠি দেবে? বাবার কথা হলেই কান পেতে শুনত--ছেলেবেলা থেকেই, তখন কি জানি পেটে পেটে এই সব মতলব জমছে?"

—যেন নিতান্তই হাসিয়া তর্কটা উড়াইয়া দেবার জিনিস, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি হাসি টানিয়া আনেন, যে-মা অসময়েও এত হাসিবার ক্ষমতা দিয়াছেন, কৃতজ্ঞ চিত্তে তাঁহাকে স্মরণ করেন।

এদিকে যেখানে নিতান্তই একা সেখানে অবিরাম হাহাকার চলিতেছে—এত অকৃতজ্ঞ—চিঠি পর্যন্ত দিল না! এত অবহেলা!...

গিরিবালা জানালাটির ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন, সেই জানালার ধারে যেখানে গভীরতম দুঃখের দিনের প্রভাতটি আর সব দিনের চেয়ে মোহময় হইয়া বিকশিত হইয়াছিল। অন্ধকারই লন বাছিয়া—দুঃখে, অভিমানে চক্ষু সজল হইয়া ওঠে, তাড়াতাড়ি মুছিয়া চিন্তার গতি রুদ্ধ করেন—না, এতটুকু অভিমান করা চলিবে না, এতটুকু ক্ষোভ নয়। মায়ের অদৃষ্ট, প্রসন্ন মনে সহিয়া যাইতে হইবে, হ্যাঁ, প্রসন্ন মনেই ; মুখের হাসি যেন মনের গভীরে পর্যন্ত প্রবেশ করে—মায়ের অভিমানে, মায়ের ক্ষোভে যে বিষ আছে—ছেলে প্রবাসে, আরও বেশি হাসি দিয়া সহিয়া যাইতে হইবে—এই অভিনয়ের জন্যই মাকে এত আলাদা করিয়া গড়িয়াছেন যে বিধাতা।

স্বামীর অভিমানেও ভয় হয় ; নিজের অন্তর দিয়াই তো বোঝেন সেটা কত গভীর। চেষ্টা করেন মাঝে মাঝে। এক দিন বেশ লঘু ভাবেই বলিয়াছিলেন—"তোমার যেন আবার একটু বাড়াবাড়ি ভাবনা ; মেয়েছেলে হয়েও তো আমি কৈ অতটা করি না। স্পষ্ট দেখছি বাবার ধাত পেয়েছে। যেমন গেছে তেমনি হঠাৎ এক দিন..."

মাঝ-পথেই থামিয়া যাইতে হইয়াছিল ; বিপিনবিহারী বেশ একটু আপত্তির সহিতই স্ত্রীর মুখের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বলিয়াছিলেন—"আর যা করো, বাবার সঙ্গে তুলনা করো না। বাবা বীরের মতন সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, কাপুরুষের মতো এড়িয়ে

যান নি। স্নেহের জন্য ছেলের মর্যাদা বাড়াতে চাও অন্য ভাবে বাড়াও, বাবার মর্যাদা ছোট করে নয়।"

ঠিক এক বৎসর নয় মাস পরে শৈলেন বাড়ি ফিরিল। হিসাবটা গিরিবালারই; অনেক দিন পরে এক দিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন—"ঠিক এক বছর ন'মাস পরে তুই এলি, একটা দিন বেশি হয়েছিল।"

শৈলেন একটু অপ্রতিভ হইল, মাথাটা একটু নুইয়াও পড়িল, তবে সেই সঙ্গে একটু গর্ব যে না হইল এমন নয়, দুঃখ দিয়াও এই উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা জাগাইয়া রাখা মনে —সন্তানের এই যে অধিকার—এ গর্বের বৈ কি। তবুও অপ্রতিভ ভাবটা কাটাইবার জন্য হাসিয়া বলিল—"বাবাঃ, মা যেন পাঁজি হাতে করে বসে দিন গুনছিলেন—কবে ফিরবে, ভালো করে খোঁটা দেব!"

শৈলেনের জীবনের যে ব্যর্থতা, এ কাহিনীর সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অল্পই, অর্থাৎ ততটুকুই, গিরিবালার জীবনে তাহা যে পরিমাণে ব্যর্থতা সঞ্চার করিয়া রাখিল। কে জানে, —হয়তো মায়ের জীবনকে পূর্ণভাবে বিকশিত করিতে এটুকুর দরকার ছিল; এই যে নিবিড় বেদনার প্রতিদানে ক্ষমা—এই যে অভিশাপকে আশীর্বাদ—এ অমৃত মায়ের হৃদয় মন্থন না করিয়া ভগবান আর কোথায় তুলিতে পারিতেন?

এক কথায় এ যুগের যে ট্র্যাজেডি, শৈলেনের জীবনেও সেই ট্র্যাজেডি, অর্থাৎ প্রতি পদে জীবনকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অগ্রসর হওয়া বা হওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু এত প্রশ্ন জীবন সহ্য করিতে পারে না। তাই যে করে প্রশ্ন তাহাকে দূরে ঠেলিয়াই রাখে। জীবন বলে—আলো-ছায়ায় আমার রূপের পূর্ণতা; আজই নয়, এই আমার যুগ-যুগের ইতিহাস; আমায় গ্রহণ করিবে তো সেই পূর্ণতায় গ্রহণ করো; পূর্ণ সাহসে; নয় তো তোমাদের পথ আলাদা—নয় তো আদর্শের আলেয়ার পিছনে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দাও গিয়া। ...শৈলেনের জীবনে এই ট্র্যাজেডি। এই প্রায় দুই বৎসরের কাহিনী সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই, শুধু শেষ দিনের কথাটুকু বলিলেই চলিবে।

আলেয়ার পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতে সত্যই শৈলেন নিঃশেষিত হইয়া গেল। প্রথমটা চিঠি দিল না বিবাহ ভঙ্গ করিয়া আসিবার জন্য, ঘুণাক্ষরেও সন্ধান পাইলে নিজের দিকের এঁরা, আবার ওদিক থেকে কন্যাপক্ষ আসিয়া কোন রকমে জোয়াল চাপাইয়াই দিবেন ঘাড়ে। অজ্ঞাত প্রবাসই চলুক। যত দিনে বিবাহের বিপদটা কাটিল, তত দিনে এদিকে অপরাধের গ্লানিটা গেছে বাড়িয়া, তাহার সঙ্গে আসিয়াছে নৈরাশ্যের অবসাদ। পিতামহ মধুসূদনের আদর্শটা সামনে ছিল; আশা ছিল, মানুষের মতো হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার অপরাধটা পৌরুষে স্খালন করিয়া আবার সংসারে গিয়া দাঁড়াইবে। দুই বৎসরের ঘোরাঘুরিতে কিছুই হইল না। কেন বলা সহজ নহে—হয়তো পিতামহের সে-যুগ নাই, হয়তো সে-সাহস নাই, হয়তো এ-অদৃষ্টই নয়। দু-এক জায়গায় চাকরি হইল, কিন্তু বড় আদর্শ ধরিয়া থাকার জন্য তাহার গ্লানিটাই যেন চোখের উপর উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। পৃষ্ঠভঙ্গ। অন্যভাবেও জীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিল—যেখানে গ্লানি নাই সেখানে নিজের অক্ষমতা আছে, সেটা স্বীকার না করিলেও পরিণামে তাই দাঁড়ায়। আবার পৃষ্ঠভঙ্গ। বেশ বোঝা যায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে, মানুষের মতো মানুষ হওয়া দূরের কথা,

BanglaBook.org

মনুষ্যত্বের যাহা শেষ সম্বল—আশা আর একটু বিশ্বাসের রেশ—সেটুকুও বোধ হয় যায় মুছিয়া।...এক সময়ে মুছিয়া গেলও : শৈলেন সত্যই নিঃশেষিত হইয়া জীবনের শেষ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল। সেই দিনটির কথাই বলা যাক।—গঙ্গার একটা পার-ঘাট শৈলেন ট্রেনে করিয়া আসিয়া পৌঁছিল—ওপারে গিয়া গাড়ি ধরিয়া একটা জায়গায় যাইবে। একটা নূতন আশা পাইয়াছে, তাহারই আলোক লক্ষ্য করিয়া যাত্রা। গাড়িটা বেলা চারিটার সময় পৌঁছিবার কথা, পৌঁছিল সারে পাঁচটায় ; নামিয়া শুনিল স্টীমার ছাড়িয়া দিয়াছে।

আজ-কাল অল্পেই মনের প্রসন্নতা নষ্ট হইয়া যায়, যেটুকু বা আছে। অল্পেই মনে হয় তাহাকে ঘিরিয়া চারিদিকেই একটা চক্রান্ত চলিয়াছে। শৈলেন প্ল্যাটফরমে একটা বেঞ্চে চুপ করিয়া খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। এর পরের স্টীমার রাত প্রায় আটটায়। উল্টা দিক থেকে একটা গাড়ি আসিল, খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। শৈলেন অসাড় ভাবে চাহিয়া রহিল খানিক ; এই আসা-যাওয়া, খোঁজা-পাওয়া, হাঁক-ডাক, ছুটাছুটি, মনে একটা স্পন্দন জাগায় অন্য সময়, আজ যেন কোন অর্থ গ্রহণই হইতেছে না। গাড়িটা চলিয়া গেল, স্টেশনটা আবার শান্ত হইল। গরম পড়িয়াছে, তায় আজ নাওয়া-খাওয়ার সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ নাই, একটু হাওয়ার আশায় শৈলেন প্ল্যাটফরম্ ছাড়িয়া গঙ্গার দিকে চলিয়া গেল। আষাঢ়ের মাঝামাঝি, কয়েকটা বর্ষা হইয়া গেছে, গঙ্গার কোল ছাড়িয়া বেশ খানিকটা উঠিয়া আসিয়াছে, গৈরিক জলস্রোতে কল্লোল জাগিয়াছে।

একটু একটু হাওয়া আছে, কিন্তু দুইটা ট্রেনের লোক, অসহ্য ভিড় ; অত মুক্ত হাওয়ার মধ্যেও যেন হাঁপাইয়া উঠিতে হয়। শুধু কি ভিড়?—অসম্ভব নোংরামি। গ্লানিতে মনটা আরও তিক্ত হইয়া ওঠে, মনে হয় ঐ গাড়িটার আসা আর এই অপরিচ্ছন্ন জনরাশি ঢালিয়া দেওয়া, এ-ও সেই কূট চক্রান্তের মধ্যে। এ জায়গাটা ছাড়িয়া শৈলেন গঙ্গার তীর ধরিয়া স্রোতের উল্টা দিকে অগ্রসর হইল। ছোট ঝোপ-ঝাড়, ভুট্টা-জনেরার মধ্যে দিয়া একটা সরু গুণটানা পথ চলিয়া গিয়াছে, সেইটা ধরিয়া বরাবর চলিল। অপ্রসন্নতাটুকু ধীরে ধীরে কাটিয়া যাইতেছে, কিন্তু তাহার জায়গায় ধীরে ধীরে কী যে একটা অদ্ভুত ভাবে মনটা ভরিয়া যাইতেছে, ঠিক যেন ধরা যাইতেছে না। শুধু এইটুকু বোঝা যাইতেছে, সেটা ঠিক প্রসন্নতা নয়, একটা যেন পাঁচমিশালি অনুভূতি, জীবনে এর আগে কখনও এর সন্ধান পাইয়াছে বলিয়া মনে পড়িতেছে না—একটা অব্যক্ত বিষাদ, খানিকটা ঔদাসীন্য, তাহার সঙ্গে একটা অদ্ভুত শূন্যতা।

পাশেই নিচে বর্ষাস্ফীত গঙ্গার কলতান। সামনে একটা বড় চড়া ; কিছু একটা আবদ্ধ আছে, মত্ত স্রোত সেটাকে যেন চারিদিক থেকে চাপিয়া ধরিয়াছে। আজ চিন্তার বেশ স্পষ্টতা নাই শৈলেনের, দু-একটা এই সব দৃশ্য মাঝে মাঝে আরও অন্যমনস্ক করিয়া দিতেছে। চরের উপর দু-একটা খড়ের ঘর, তীরে দু-একখানা নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, একটু ত্রস্ত-চাঞ্চল্যে কয়েকজন কুটির থেকে কি সব জিনিসপত্র আনিয়া তাহাতে তুলিতেছে। সূর্য রাঙা হইয়া আসিয়াছে, চারিদিকে কলমুখর জলরাশি, তাহার মধ্যে এই অভিশপ্ত চরে জীবনের এই স্পন্দনটুকু বড় অদ্ভুত লাগিল। শৈলেন খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল, বেশ অনেকক্ষণ, তাহার পর অগ্রসর হইল।...এক-এক জায়গায় তীরের খানিকটা করিয়া ধসিয়া গেছে, একেবারে-সিধা, প্রায় দুই তলা নিচে গঙ্গা—ছোট মেয়ের মতো পাঁক ঘোলাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে...শৈলেন একবার ফিরিয়া দেখিল, অনেক দূরে স্টেশন, মাইল

BanglaBook.org

খানেকের উপরই হইবে। সেই ভিড়টা—জীবন যেন জট পাকাইয়া গেছে। একটু দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহার পর বিতৃষ্ণায় মুখটা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—শৈলেন বুঝিয়া দেখিবার চেষ্টা করিল—কেন, এর আগে লোকসমাগম তো তাহার বরাবর ভালই লাগিয়া আসিয়াছে! হঠাৎ এ বিতৃষ্ণার কারণটা ঠিক বোঝা গেল না। শৈলেন আবার আগাইয়া চলিল।...সামনে সূর্য আরও রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। একবার মনে হইল, না ফেরা যাক, অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল স্টিমার তো সেই আটটায়। আগাইয়া চলিল—এক সময় স্টেশনের দূরত্ব, স্টিমারের বিলম্বের কথাও মন থেকে যেন মুছিয়া গেল, চলাটাই লাগিতেছে ভালো, তাই চলিতে লাগিল— মনে হইল যেন একটা পরিত্রাণ—চারিদিকের শান্তির মধ্যে সে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে—সামনের ছায়া এই শান্তিটিকে যেন একটা স্পষ্ট রূপ দিতেছে অদৃশ্য তুলির টানে। এক সময় হঠাৎ একটু চমকিত এবং আতঙ্কিত হইয়া শৈলেন দেখিল গুনটানা রাস্তাটা আর নাই। অকস্মাৎ একটা বিপদের সামনে আসিয়া সম্বিৎটা ফিরিয়া আসিল, নূতন রাস্তা খুঁজিতে হইবে, এই চিন্তাতেই সুপ্ত বুদ্ধি যেন জাগিয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যাহার জন্য জাগা, অর্থাৎ পথ খোঁজা বা নূতন পথ সৃষ্টি করা—সেই দিকেই গেল না বুদ্ধিটা, হঠাৎ এক নূতন পরিস্থিতির সামনে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সামনেই একটা গহ্বর, একটা বেশ বড় পুকুর, পথটা এই বড় গহ্বরের মধ্যে অবলুপ্ত। ...গঙ্গার একটা বড় ধস, এত-বড় ধস বড় একটা চোখে পড়ে না, রাস্তাটা স্বাভাবিক পরিণতিতে শেষ হয় নাই, এই ধসের মধ্যেই কবলিত হইয়াছে।...বড় আশ্চর্য বোধ হইল শৈলেনের—একটা পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, একটা গতি গন্তব্যের আগেই আবেগ ফুরাইয়া বসিল!...জীবনও তো পথ, জীবনও গতি ; এই আকস্মিক বিলোপ তো তাহারও হইতে পারে। যখন হিসাব চলিতেছে—জীবনের আরও তিন ভাগ বাকি—আরও অর্ধেক, তখন হঠাৎ দেখা গেল—একেবারে শেষ।...ধসটা নিজের বিপুল ভারেই একটা দ'য়ে দাঁড়াইয়াছে ; শৈলেন সম্মোহিতের মতো স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। মাঝখানে একটা বিরাট চক্র—ত্রস্ত,—কুটিল—একটা যেন বিকৃত আনন্দে নিজের কেন্দ্র লক্ষ্য করিয়া আবর্তিত হইতেছে। এ এক বিকৃত আনন্দ—সমস্ত চক্রটাই নিজের সৃষ্ট গহ্বরের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। ছিন্নমস্তার মতো নিজের সৃষ্টি মৃত্যুর সঙ্গেই এই উন্মাদ ক্রীড়ার সামনে শৈলেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। উন্মাদের চাপা হাসির মতোই খল-খল করিয়া মাঝে মাঝে একটা অস্ফুট শব্দ হইতেছে।...ঐ ঘূর্ণির রেখাটা? ঐ একটা কুটা—ঐ একটা কিসের ডাল—একটা কি শস্যের গুচ্ছ, প্রাণের পূর্ণতায় সবুজ—একে একে টানের মধ্যে পড়িয়া, গতিবেগ বাড়িয়া বাড়িয়া একেবারে নিরুদ্দেশ। একটা কি সরীসৃপ, বড় গিরগিটি গোছের—পরিত্রাণের কী অসম্ভব চেষ্টা! ঘূর্ণির মুখের কাছে বার দুয়েক উঠিলও ঠেলিয়া, তাহার পর ক্ষুদ্রতম কুটাটির মতোই অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিন্তু কী দরকার এই পরিত্রাণের চেষ্টার? কি-ই বা ক্ষতি এই বিলুপ্তিতে?

শৈলেনের মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে, এই আবর্তের মতোই একটা ঘূর্ণি জাগিয়া উঠিতেছে মাথার মধ্যে। দ' থেকে দৃষ্টি সরাইয়া প্রশস্ত গঙ্গার উপর রাখিল। স্রোতকে বলে জীবন, সরীসৃপটা ঐ আবর্তিত মৃত্যু থেকে এই জীবনকেই জড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিল।...কিন্তু এই অমোঘ, অনিশ্চিত স্রোত সত্যই কি জীবন?—খুব বেশি তো,

BanglaBook.org

বিলম্বিত মৃত্যুই নয় কি? শৈলেন পিছন ফিরিয়া দেখিল—জনতাকীর্ণ স্টেশনটা নিতান্ত অস্পষ্ট, মনে হইল বহু দূরে ছাড়িয়া আসা জীবন যেন। চরটার উপর নজর পড়িল, নৌকা দুটা পাড়ি দিয়াছে। উষ্ণ মস্তিষ্কের মধ্যে চমৎকার একটা অর্থ ফুটিয়া উঠিতেছে। খেয়া—একটা অভিশপ্ত জীবন ছাড়িয়া একটা নিরাপদ জীবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শৈলেনের মাথায় যেন হঠাৎ উল্লাসের একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল ; বাঃ, বেশ তো—একটা নূতন, নিরাপদ জীবনের জন্য এই তীর ছাড়া!...কী আনন্দ, ছাড়া যাক না খেয়ার নৌকা ঐ আবর্তের পথে! জীবনের নামে এই যে এত বৎসরব্যাপী অভিশাপ, কেন মায়া তাহার জন্য?...সূর্যাস্ত হইতেছে—বেশ চমৎকার লগ্ন, এত চমৎকার লগ্ন জীবনে আর না-ও আসিতে পারে। সমস্ত জীবন ধরিয়া এত সৌন্দর্যের সাধনা করিল কেন শৈলেন, যদি এই বিরাট সৌন্দর্যকেই সে ব্যর্থ হইতে দেয়? না, আর দ্বিধা নয়।

একটু পাশে আরও খানিকটা ফাটল ধরিয়াছে, একটা মাঝারি গাং-ঝাউয়ের গাছ, ঝিরঝিরে বেগুনে ফুলে ভরা, নিজের আয়ুর ইতিহাস জানিয়াও যেন অবিচল ধৈর্যে দাঁড়াইয়া আছে।...না, ঝাঁপ দেওয়া নয়—বড় গদ্যময় মৃত্যু সে, এই মাহেন্দ্র লগ্নের উপযোগী নয় ; এমন চমৎকার আবেষ্টনীর যোগ্য নয় অমন নির্ভয় মৃত্যু-সাথীর অমর্যাদা...

শৈলেন ধীর পদে গিয়া সেই ফাটলধরা জমিটার উপর দাঁড়াইল, ফাটলটা আর একটু ফাঁকা হইয়া গেল—নোঙ্গরের কাছিতে টান পড়িয়াছে, শৈলেন বন-ঝাউটার আরও কাছে সরিয়া গেল, তাহার পর কি ভাবিয়া ঝাউয়ের একটি পুষ্পিত শাখা ডান হাত দিয়া নিজের বুকে জড়াইয়া ধরিল!...চলো বন্ধু, এবার আমাদের তরী তীর ছাড়ুক,...

পৃথিবী যেন অবলুপ্ত হইয়া গেছে। তাহার পরেই একটা নিতান্ত অভাবিত দৃশ্য চোখের সামনে ফুটিয়া উঠিল। একেবারে বিদায়ের শেষ ক্ষণে একেবারে অবলুপ্ত চেতনা থেকে এই রকম এক-একটি ছবি মনের পর্দায় আলোর রঙে ক্ষণিকের জন্য ওঠে ফুটিয়া ; কবে দেখিয়াছিল, বড় ভালো লাগিয়াছিল, তাহার পর আবার কি করিয়া স্মৃতির অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর হিম স্পর্শে আবার উঠিল জাগিয়া।...ছবিটা এমন কিছুই নয় ; এই রকম একটি সন্ধ্যায় মা আঁচলে প্রদীপ ঢাকিয়া তুলসী-মঞ্চের পানে যাইতেছেন, আলোর আভায় আঁচলের রাঙা পাড় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মুখও উজ্জ্বল, তবে শুধু আলোর প্রভায়ই নয়, আরও যেন একটা কিসের প্রভা আছে, জগতের কোন আলোতেই যাহার আভাস পাওয়া যায় না।

সমস্ত পৃথিবী যেন এই একটি ছবিতে রূপান্তরিত হইয়া গেছে।...শৈলেন স্থির নেত্রে শূন্যবদ্ধ ছবিটির পানে চাহিয়া রহিল—বেশ খানিকক্ষণ ; দুই বিন্দু অশ্রু চোখের পাতা ঠেলিয়া উঠিয়াছে ; তাহার পর মনে পড়িল সে একটা ফাটলের উপর দাঁড়ইয়া আছে, গঙ্গার ধার, বর্ষার গঙ্গা, ফাটলটা ধীরে ধীরে বিস্তীর্ণতর হইতেছে...

সন্তর্পণে পা ফেলিয়া ফাটল ডিঙাইয়া নিরাপদ ডাঙায় আসিয়া দাঁড়াইল ; তাহার পর স্টেশনের দিকে পা বাড়াইল। কয়েক পা অগ্রসর হইয়া একটা শব্দে ফিরিয়া চাহিতে দেখিল—পুষ্পিত বন-ঝাউ সমেত ফাট-ধরা জমিটা দ'য়ের মধ্যে নামিয়া যাইতেছে।

শৈলেনের সেদিনকার ডায়েরীতে লেখা আছে : আমি আবার ফিরে এলাম মা।

BanglaBook.org

তোমায় চরম আঘাত দিতে গিয়ে আমার হুঁশ হল—তুমি থাকতে আমার যাবার অধিকার নেই, আমার সাধ্যও নেই।

॥ ৬ ॥

মৃত্যুর দিক থেকে মুখ ফিরাইয়া লইল বটে, সে কিন্তু ঘুরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইল ; মা কেমন আছেন? এই প্রায় দুই বৎসরের বিচ্ছেদ, যত আশঙ্কা এক মুহূর্তে তার পুঞ্জীভূত তীব্রতায় শৈলেনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আর ঐ একটি প্রশ্ন আশ্রয় করিয়া মৃত্যু যেন শত শত রূপে, শত বিভীষিকায় জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মা কি রকম আছেন? ...আছেন তো? যদি না থাকেন?...সর্বনাশ, এ কি হইয়া গেল!...দুই বৎসরের মধ্যে শৈলেন এত অসম্ভব কথা সব ভাবিয়াছে—এত অসম্ভব আশা, এত অসম্ভব কল্পনা—আর এই সব চেয়ে বড় সম্ভাবনার কথাটাই ভাবে নাই!

গতিটা আপনিই দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে, যেন এখনই পৌঁছিতে হইবে। এমনও তো হইতে পারে যে, এই আজ পর্যন্ত ছিলেন মা, কিংবা আর কিছুক্ষণ পর্যন্ত থাকিবেন, তার পর...

শৈলেন এর পরে আর নিজেকে ভাবিতে দেয় না, জোর করিয়া চিন্তার গতি রোধ করিয়া রাখে। সেই রুদ্ধ বেগই যেন পায়ে আসে নামিয়া, পদক্ষেপ আরও যায় ক্ষিপ্র হইয়া। মনটা বেশ প্রকৃতিস্থ নাই-ই আজ, এক সময় মাত্র একটি চিন্তাই মনকে চাপিয়া ধরিতে চায় ; এই একটু আগে ছিল—যাইতে হইবে, এইবার দাঁড়াইয়াছে—ফিরিতে হইবে ; স্থান, কাল, অবস্থার চেতনা সব গেছে মন থেকে মুছিয়া।

সেটা ফিরিয়া আসিল স্টেশনে আসিয়া। মা আর তাহার মাঝে এখনও যে বহু দূরের ব্যবধান! আপাতত সম্বল স্টিমার, তাহার এখনও প্রায় দুই ঘণ্টা দেরি।

শৈলেন জলে নামিয়া বেশ ভালো করিয়া মুখ-হাত ধুইল ; বেশ গুছাইয়া ভাবিবার ক্ষমতাটা অল্পে অল্পে ফিরিয়া আসিতেছে। আজ সমস্ত দিনের ঘটনাগুলা আদ্যোপান্ত একবার ভাবিয়া দেখিল। গঙ্গার দ'য়ে আসিয়া চিন্তাটা যেন এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল—অনেকক্ষণ : সেই কেন্দ্রমুখী আবর্ত, তাহার উপর গাঢ় অন্ধকার নামিয়াছে এখন। মৃত্যু যেন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া জীবন-স্রোত থেকে সন্দেহলেশহীনদের নিজের গহ্বরে টানিয়া টানিয়া লইতেছে—কুটাকুটি, সবুজ ডাল, সবুজ শস্য, জীবন্ত গাছ ; কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ।...কোথায়?...শৈলেন এতক্ষণে—কত আগেই না সে-প্রশ্নের উত্তর পাইয়া যাইত! মনটা বিষণ্ন হইয়া আসে। জীবনে আবার প্রত্যাবর্তন করিয়া মৃত্যু সম্বন্ধে প্রাণের স্বভাবত যে সন্দিগ্ধ আতঙ্ক সেটা কি আবার ফিরিয়া আসিতেছে?

BanglaBook.org

রাত বারোটার পর শৈলেন দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছিল। নিতান্ত নিরুপায় হওয়ার জন্যই মা লইয়া যে উদ্বেগটা কতক চাপা ছিল সেটা আবার উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, কি দেখিতে হইবে?—কি শুনিবে?...কাছেই বাড়ি, কিন্তু ঐটুকুতেই পা যেন শিথিল হইয়া আসিয়াছে। বাড়ির কাছে আসিয়া আর যেন উঠিতে চায় না।

বাহিরে কেহ নাই, শুধু শশাঙ্ক একখানি ডেক-চেয়ারে গা ঢালিয়া খালের ধারে চুপ

করিয়া বসিয়া আছেন। একটা গুমট গরম যাইতেছে, এদিকে গাঢ় অন্ধকার।

কে আসিতেছে দেখিয়া শশাঙ্ক সোজা হইয়া বসিলেন। শৈলেন পায়ের ধূলা লইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছে না, গলাও গেছে শুকাইয়া। শশাঙ্কই প্রথমে কথা কহিলেন, উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"শৈলেন?"

"হ্যাঁ দাদা, মা কি রকম...মার কোন রকম...মানে, মার..."

শশাঙ্ক বলিলেন—"ভালোই আছেন মা—আর সবাইও ; ভেতরে চল্।"

মেয়েদের এই একটু আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে, গিরিবালা শয়ন করিতে যাইতেছিলেন, শশাঙ্ক ডাকিয়া বলিলেন—"মা, শৈলেন, এসেছে।"

"কে?"—বলিয়া গিরিবালা চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দার ধারে দাঁড়াইলেন ; শৈলেন গিয়া প্রণাম করিল।

আশীর্বাদ করিতে গিরিবালার একটু সময় লাগে ; কপালের মাঝখানে চারিটি আঙুল বুলাইয়া বুলাইয়া একটু কি বলেন মনে মনে, হাজার তাড়াহুড়া আবেগ-উদ্বেগের মধ্যেও এই শান্তিটুকু তাঁহার অবিচলিত থাকেই। বাড়িতেও সবার অভ্যাস, আশীর্বাদ-গ্রহণের এই সময়টুকু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শেষ হইলে প্রশ্ন করিলেন—"এই গাড়িতে এলি?"

শৈলেন উত্তর করিল—"হ্যাঁ, এই বারোটার গাড়িতে।"

গিরিবালা এক দৃষ্টিতেই শৈলেনের সমস্তখানি যেন দেখিতেছেন, তবে তাহাতে না আছে চেষ্টা, না আছে চাঞ্চল্য। প্রশ্ন করিলেন—"খাওয়া হয় নি নিশ্চয়?"

ছেলেদের যাহারা জাগিয়া ছিল উঠিয়া আসিয়াছে, দুইটি পুত্র-বধূও আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়াছে। শৈলেনকে প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একজন বৌকে খাবারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন, কতকটা আত্মগত ভাবে বলিলেন—"ওকে তো কত দিন খাওয়া হয় নি তাই জিজ্ঞেস করলেই ভালো হয়।"

প্রবাস লইয়া কিন্তু অনুযোগের কথা আর কিছুই বলিলেন না। আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করিয়া দেয়, এটা শশাঙ্কেরও মনঃপূত নয়, এদিক-ওদিক দু-একটা কথাবার্তার পর বলিলেন—"আর কাউকে তুলে কাজ নেই এখন, বাবাকেও নয়। তুইও কাপড়-চোপড় ছেড়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে যা শৈলেন ;বেশ ক্লান্ত হয়ে রয়েছিস।"

বোধ হয় আর সবাইকে উদাহরণ দেখানো হিসাবেই নিজেও শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন।

সবাই চলিয়া গেলে মুখ-হাত ধুইয়া শৈলেন বলিল—"চলো মা, ছাতে গিয়ে একটু বসা যাক চলো, বড্ড গরম, আর গাড়িতে যা ভিড় ছিল!"

ছাদে গিয়া বসিয়াছে, ছোট বোন লীলা আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রণাম করিয়া মায়ের পাশে বসিতে বসিতে বলিল—"বেশ যা হোক! ধন্যি।"

বোধ হয় অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখটা ফিরাইয়া লইল। এই জিনিসটাকেই অনেক কষ্টে এতক্ষণ বিচক্ষণতার সহিত ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে, আর বোধ হয় সম্ভব হইত না, কিন্তু এই সময় শশাঙ্কর বড় মেয়েটি ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কাকার প্রিয় বলিয়া তাহার মাই-ই বোধ হয় উঠিইয়া দিয়াছে—বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে

BanglaBook.org

টপ করিয়া একটা ফাঁস পরাইয়া দেওয়াই নিরাপদ। "মেজকা!"—বলিয়াই কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তাহার পর মুখটা একটু সরাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"আমার জন্যে কি এনেছ?"

"এই যাঃ, ভুলে গেছি! দাঁড়া আবার যাই।"—শৈলেন তাড়াতাড়ি উঠিবার ভান করিতেই সে অত্যন্ত ভীতভাবে হাঁটু দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"না—না—না, তুমি বড্ড পালাও!"

তিনজনের মধ্যে হাসি পড়িয়া গিয়া উদ্যত অশ্রুটা চাপাই পড়িয়া গেল। এর পরে প্রবাসের কথাটাই সহজে আসিয়া পড়িল। লীনা প্রশ্ন করিয়া মাঝে মাঝে মন্তব্য গুঁজিয়া দিয়া কাহিনীটি বাহির করিয়া লইতে লাগিল—কোথায় কোথায় গেল শৈলেন, কি কি করিল। "মা গোঃ, চিঠিও তো দিতে হয়—দু-দুটো বছর! সত্যি তোমায় ধন্যি বলতে হয় মেজদা! নয় কি মা?"

গিরিবালার গলায় উত্তরটা একটু আটকাইয়া গেল, ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"জানছি, যেখানে আছে, ভালোই আছে..."

একটু ভয়ও হয়, অথচ এ-সব কথা তুলিতে লীনাকে সোজাসুজি বারণও করিতে পারেন না ; কতকটা যেন শৈলেনেরই পক্ষ লইয়া বলিলেন—"আর চিঠিপত্র মারাও যায় বড্ড আজকাল বাপু, এই তো সেদিন খুকি লিখলে দু-দুখানা, ও চিঠি গিয়েছিল অথচ..."

"আমি কিন্তু একখানাও চিঠি দিই নি মা",—বলিয়া শৈলেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এঁরা দুইজনেও হাসিয়া উঠিলেন, লীনা আরও বাড়াইয়া দিল হাসিটা, বলিল—"ঐ নাও, আসামীর সঙ্গেই তার উকিলের মিল নেই।"

সেজবৌ লুচি ভাজিয়া লইয়া আসিল ; শৈলেন রেকাবিটা টানিয়া লইয়া বলিল—"এবার এখানকার কথা বলো মা, আমার গল্প এত মিষ্টি নয় যে লুচির সঙ্গে চালাতে পারব, কি বল্ লীনা?"

লীনা হাসিয়া বলিল—"ফিরে এসেছ, এখন মন্দ লাগছে না ; কাহিনীতে দাঁড়িয়েছে কিনা!"

গিরিবালা বলিলেন—"আর কাহিনীতে কাজ নেই বাবা, রক্ষে করো!...এখানকার খবর?—ও! তোকে আসল খবরটাই বলা হয় নি—মোনুর চাকরি হয়েছে—ঐ দুলারমনের বর এখন যা তাই আর কি।"

যে পরিবারকে একেবারেই নিচে থেকে আরম্ভ করিতে হইয়াছে, তাহার পক্ষে খবরটা বেশই বড়, শৈলেন মুখে হাত তুলিতেছিল, অনুচ্ছ্বসিত হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"ডেপুটিগিরি?

উত্তরটা লীনাই দিল, মায়ের মুখ থেকে একরকম কাড়িয়াই একটু আবেগের সহিতই বলিল—"হ্যাঁ, ডেপুটিগিরি। আর সেই কথাটা মা—বলো।"

মাকে অবসর না দিয়া নিজেই বলিল—"এখানকার জজ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে রাঙাদার।"

শৈলেন হাসিমুখে একটু বিস্ময়ের সহিত মায়ের মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ মা?"

BanglaBook.org

ভিতরের আনন্দে গিরিবালার মুখটা একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, স্বভাবসিদ্ধ শান্ত কণ্ঠেই বলিলেন—"হ্যাঁ, তাঁর বৌয়ের মোনুকে নাকি বড্ড পছন্দ হয়েছে। এদিকে আবার মুন্সেফ বাবুর বোনের সঙ্গে অবুর বিয়ের কথা হচ্ছে, শশাঙ্ককে ধরেছেন তিনি। আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি বাবা, সত্যি কথা বলতে কি। সব নিজেদের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে গেরস্থ-ঘরের মেয়ে এনেছি, বেশ মিশ খেয়েছে, এর মধ্যে বড়লোকের মেয়ে এনে ফেলা —আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু যাদের নিয়ে আমার ভয়, সেই বৌমারাই আবার জিদ ধরে বসেছেন বিয়ের জন্যে, একটু উভয়-সঙ্কট নয়?"

লীনা তর্ক জুড়িয়া দিল—"বাঃ, এই তো সেজ বৌদিও বড় একজন উকিলের মেয়ে, মিশ খায় নি?"

গিরিবালা বলিলেন—"কি জানি বাছা, আমার তো মনে হয় উকিলরা, ডাক্তাররা যেন আমাদেরই দলের—হাজারই বড় হোক ; বড় চাকরিওয়ালা হলেই মনে হয় যেন আলাদা।"

লীনা বলিল,—"তা ওঁর বাবা তো উকিল থেকেই জজ হয়েছেন।"

গিরিবালা হাসিয়া উঠিলেন, শৈলেনের পানে চাহিয়া বলিলেন—"ঐ শোন, এই সব তর্ক সবার মুখে মুখে ঘুরছে—বৌমাদেরও। তা বেশ তো বাছা, তোদের সবার মুখ চেয়েই তো বলা, তোদের মনে হয় বেমানান হবে না, মিলেমিশে থাকতে পারবি, আমি আপত্তি করতে যাব কেন?...আসল কথা শৈল, বংশটি ভালো হওয়া দরকার, গরীবও বুঝি না, বড়-মানুষও বুঝি না, সৎ-বংশের মেয়ে যেখানে যাবে মানিয়ে নেবে। তবে কথা হচ্ছে অবস্থার খুব বেশি তারতম্য থাকলে বংশের পরিচয় পাওয়াও একটু মুশকিল হয়..."

লীনা উৎসুক ভাবে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আছে, চেষ্টা, একটু সংশয়জনক হইলেই মতটা তাড়াতাড়ি নিজেদের দিকে ফিরাইয়া লওয়া। বলিল..."আর ওরাও আট ভাই, দুই বোন, মেজদা তোমাদেরই মতন..."

গিরিবালা এবার জোরেই হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন—"ঐ নে, আর একটা তর্কের নমুনা! কী জ্বালা বাবা! এই রকম সব ঘটকী হলেই হয়েছে!—দু-দিকেই আটভাই বোন তো আর বিয়ের কোন আটক নেই!...আর যদি এর পরে ওদের ভাই-বোন হয়?..."

লীনা বলিল—"বয়ে গেল, তখন তো কাজ হয়ে গেছে..."

আদাড়ে তর্কে এবার শৈলেন পর্যন্ত হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ওরা ছাড়বে না মা, তোমায় রাজী করাবেই।"

আসিয়া অবধিই শৈলেনের মনটা সমস্ত হাসি-গল্পের মধ্যে একটি জিনিস খুঁজিতেছে, অবশ্য খুব সূক্ষ্মভাবেই—তাহার এই দীর্ঘ প্রবাসটা মায়ের দেহমনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ; এদিকে গল্পটা মা আর লীনা চালাইয়া যাওয়ায় লক্ষ্য করিবার একটু সুবিধাও হইয়াছে। শুনিতেছে, হাসিতেছে, মন্তব্যও করিতেছে এক-আধটা, কিন্তু চিন্তার একটি অন্তঃস্রোত একেবারেই অন্য পথে প্রবাহিত হইতেছে। গিরিবালা শরীরে যে বেশ একটু শুকাইয়া গেছেন, যে-কোন কারণেই তাহা হইতে পারে, মনের প্রফুল্লতাও যে নষ্ট হইয়া ছিল তাহারও বেশি প্রমাণ কোথায়? অবশ্য আজ—এই এখন যে প্রফুল্লতা সেটা শৈলেনের ফিরিয়া আসার জন্যই ; কিন্তু মা যে এর আগে বিষণ্ণই ছিলেন তাহার প্রমাণ কৈ? যে মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষণ্ণ থাকে, বিষাদের কারণটা অপসৃত হইলে সে

BanglaBook.org

একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না?—বিশেষ করিয়া সেই অপসারণ যখন এত আকস্মিক।...গিরিবালার কিন্তু এতটুকু উচ্ছ্বাস নাই, প্রশ্ন করিলেন যেন—দুই বৎসর নয়, এই দু-দিন আগে শৈলেন কোথায় গিয়াছিল, এই গাড়িতে নামিয়াছে।

কিন্তু মায়ের সন্তান সম্বন্ধে যেমন একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে, সন্তানেরও মায়ের সম্বন্ধে ঠিক তেমনিই একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে—মা আর সন্তান একটা বিষয়েরই দুই দিক তো! সন্তান যেমন মাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না, মায়েরও তেমনি সন্তানের কাছে প্রবঞ্চনা খাটে না। মায়ের অমন প্রফুল্লতার মধ্যে কোথায় যে খাদ মিশিয়াছে শৈলেনের সেটা দৃষ্টি এড়াইল না। মনের গভীর নিভৃতে একটা অপরিসীম ক্লান্তি আসিয়াছে মায়ের—সেটা চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের হাসি, মুখের কথা—সবেতেই অতি সূক্ষ্ম একটা প্রবঞ্চনার সঙ্গে মিশিয়া আছে। বেদনা যেখানে স্পষ্ট সেখানে এটা হয় না, সেখানে হাসির জায়গায় হাসি থাকে, অশ্রুর জায়গায় অশ্রু। তাহার মানে এই দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া মা প্রফুল্লতার প্রলেপে বিষাদটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন—যাহারা আছে তাহাদের মুখ চাহিয়া। দুইটি বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত মাকে এই অভিনয় করিয়া আসিতে হইয়াছে —ভিতরে ভয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ; বাহিরে যেন এমন কিছুই হয় নাই, শৈলেনের ওটা নিরুদ্দেশ হওয়া নয়, চিঠি না পাওয়ার উদ্বেগ আর অপমানটা প্রতিনিয়তই উঁহাকে যেন শেলের মতই বিদ্ধ করিতেছে না। ঢাকা দিবার অমানুষিক চেষ্টায় গিরিবালা বুঝিতেই পারেন নাই কখন যে তাঁহার প্রসন্নতার মধ্যে বিষাদের বিষ অল্পে অল্পে গেছে মিশিয়া। এখন সেই অভিনয়ই চলিতেছে। কী করিল শৈলেন!—মায়ের সেই রূপ আবার কবে ফিরিয়া পাইবে?—কখনও আর পাইবে কি?

ওদিকে গল্প চলিয়াছে। শৈলেনের কথায় গিরিবালা বলিলেন—"ছাড়াছাড়ির কথা তো নয়, ভেবে দেখবার কথা। রাজী হব না এমনও তো ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসি নি আমি, না আমার বড়-মানুষের সঙ্গে শত্রুতা আছে? সেটা তো হিংসে শৈল। আমি চাই বিয়ের ব্যাপার যেখানে, সেখানে যেন মিলটা ভালো হয়।"

লীনা বলিল—"জজের জামাই ডেপুটি—মন্দ মিল হোল?"

গিরিবালা বলিলেন—"কিন্তু সেই ডেপুটি যে গরীবের ছেলে—সেটা দেখতে হবে না?"

লীনার মুখটা একটু মলিন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, বেশ একটা কথা মনে পড়ে গেল—বড়দা সেদিন বলছিলেন—আমরা দশটি ভাই-বোনে মার পায়ের দশটি আঙুল..."

গিরিবালা একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"নাও, তর্কে এঁটে উঠতে পারলে না, শেষকালে খোশামোদ!"

তাহার পর কন্যাকে একটু সমস্যায় ফেলিবার জন্যই হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন —"বেশ বুঝলাম—দশটা আঙুল ; তা কি হয়েছে?"

লীনা একটু হকচকিয়া গেল, তাহার পর ভাবিবার জন্য দু-একবার এদিক ওদিক চাহিয়া লইয়া বলিল—"বাঃ, দশটি আঙুল তোমার যেদিকে নিয়ে যেতে চাইবে সেদিকে যেতে হবে না তোমায়—মানে, সমস্ত শরীরটাকে?"

খোশামোদকে এরকম জবরদস্তিতে পরিণত হইতে দেখিয়া শৈলেন সুদ্ধ হাসিয়া

উঠিল। রাত অনেকখানি হইয়াছে, শৈলেনেরও খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, এক সময় সবাই নিচে চলিয়া গেলেন।

॥ ৭ ॥

শয্যা যেন শৈলেনের কাছে কণ্টক হইয়া উঠিয়াছে। যে চিন্তাটাই আরম্ভ করিতেছে সেইটাই কেমন করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মায়ের হাসির পিছনে যে ক্লান্তি সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে। অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া এক সময় সে উঠিয়া পড়িল। কৃষ্ণপক্ষের শেষের দিক এটা, সরু হাঁসুলির মতো চাঁদ উঠিয়াছে। সেটা রাস্তার ওধারে আমগাছগুলার উপর আসিয়া দাঁড়াইতে খুব একটা পাতলা জ্যোৎস্নায় চারিদিক ছাইয়া গেল। শৈলেন ঘরের বাহিরে আসিল।

তখন অন্ধকার ছিল বলিয়া দেখিতে পায় নাই, অল্প হইলেও জ্যোৎস্নার জন্য এইবার সমস্ত বাড়িটার একটা আবছায়া মূর্তি চোখে পড়িল। বাড়িটাতে বেশ খানিকটা উন্নতি হইয়াছে ; ছিল একতলা এখন উপরে কয়েকখানা ঘর, টানা রেলিং-দেওয়া বারান্দা, তাহার মাথায় নূতন ফ্যাশানে কংক্রিটের ঢালাই জাফরি। হঠাৎ চোখে পড়ার জন্যই যেন ভালো করিয়া বিশ্বাস করা যাইতেছে না, মনে হইতেছে যেন একটা স্বপ্নপুরী। অন্যত্র খানিকটা খানিকটা করিয়া পরিবর্তন হইয়াছে, এরই সঙ্গে ছন্দ মিশাইয়া। বিপিনবিহারীর বাগানের শখ, বাহিরের উঠানের পাশে খানিকটা জায়গা লইয়া একটা বাগানের আদল দেখা যায়, খুব মৃদু হাসনাহানার গন্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া আছে। শৈলেন উঠান, বারান্দা, ছাদ সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়িটা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল—কোথায় আগে কি রকমটা ছিল, এখন কি রকম হইয়াছে, সব মিলাইয়া মিলাইয়া। যেন একটা অভিশপ্ত প্রেতাত্মা, মায়ার আকর্ষণে মাটির সঙ্গে লিপ্ত হইয়া ঘুরিতেছে। এক সময় আস্তে আস্তে দুয়ারটা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

চাঁদটা আরও খানিকটা উঠিয়া আসায় জ্যোৎস্না আরও একটু স্বচ্ছ হইয়াছে। খালটা পার হইয়া রাস্তা পর্যন্ত গেল। সেখান থেকে সমস্ত বাড়িটি বড় অপূর্ব দেখাইতেছে। বাহিরের হাওয়ায় শরীরের গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে মনের গ্লানিও অনেকটা কাটিয়া গেছে, শৈলেন আসিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। গেটের উপর একটা জেসমিনের ঝাড়, প্রবেশ করিতে তাহার গন্ধের খানিকটা যেন সর্বাঙ্গে লেপিয়া গেল।

আবেষ্টনীর প্রভাবে মাঝে মাঝে যে একটি স্নিগ্ধতার ভাব আসিতেছে, সেটা কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। কেবলই মা'র মুখটি মনে পড়িতেছে। আশ্চর্য, হাসির দিকটা যেন চোখেই পড়িতেছে না, চোখে পড়িতেছে শুধু বেদনার দিকটা।

এই প্রায় দুটি বৎসর মায়ের জীবনকে একটি নবতর সার্থকতায় পূর্ণ করিয়া তুলিবার কথা। মায়ের জীবনের বিকাশে যে কয়েকটি ধাপ—মায়ের মুখে শোনা গল্প থেকেই শৈলেন স্তর নির্ণয় করিয়া লইয়াছে—সিমুরের প্রথম জীবন, তাহার পর সাঁতরার গঙ্গাতীর, তাহার পর পাণ্ডুলের প্রথম জীবন—শশাঙ্ক—বড় সমাজের মধ্যে দ্বারভাঙ্গার প্রথম জীবন—এই সবের সুরে সুর মেলানো মায়ের জীবনের এই দুইটি বৎসরও। অনেক দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের পর বড় ছেলের চাকরির সঙ্গে যে সচ্ছলতার সূত্রপাত হইয়াছিল, এই দুই বৎসরে

BanglaBook.org

যে সেটুকু সমৃদ্ধিতে পরিণত হইয়াছে চারিদিকেই তাহার প্রমাণ সুস্ফুট। এটুকুকেও আবার পূর্ণতা দিয়াছে ঐ দুটি বিবাহের প্রস্তাব। মা যাহাই বলুন, অন্তরে অন্তরে তিনি এ যোগাযোগের বিপক্ষে নহেন। ব্যাপারটা নিশ্চয় খুব এমন বিরাট কিছু নয়, তবুও আকাঙ্ক্ষার যোগ্য : আর গৌরবের বৈকি—বাবা-মা তো এর জন্য প্রার্থী হইয়া দাঁড়ান নাই, প্রস্তাব ওদিক থেকেই। সন্তানের মধ্যে দিয়া এও তো জীবনের একটা পরিণতি, মায়ের জীবন আরও সন্তানাশ্রয়ী বলিয়া তাঁহার জীবনে এ একটা বড় সার্থকতা। মনে মনে মা যে হৃষ্ট, এটা বেশ বোঝা যায়—আশা করিয়া আছেন যেন বংশের দিক দিয়াও বেশ মিল হয়, ঐ দুটি কন্যাই বধূ হইয়া আসে এ বাড়িতে।

এই এমন দুইটি বৎসরের আনন্দ মলিন করিয়া রাখিয়াছে শৈলেন। শশাঙ্কর পর তাহারই উপর আশা।...চিঠি পর্যন্ত না দিল কেন?

অত ক্লান্তির পর সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই, তাহার পর অক্টোপাসের মতো এই অপরাধের চিন্তাটা মনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে ; মাথাটা ঝিম ঝিম করিতেছে। শৈলেন আবার উঠিয়া খালের ওধারে দ্বীপের মতো জমিটুকুর এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল।...চাঁদটা অনেক উঠিয়া গেছে, আমগাছের মাথার ঠিক উপরে শুকতারাটা দপ-দপ করিতেছে। অন্যমনস্কভাবে অনেকক্ষণ ঐটুকু জমির উপর পায়চারি করিল।...শুকতারাটা নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। নিচে দিকরেখার উপরে একটা খুব হালকা আলোর আভাস—দিনের প্রথম সূচনা। সমস্ত রাত্রিটি নিদ্রাহীন কাটিল ; দুই বৎসর আগে যখন বাড়ি ছাড়িয়া যায় তখনও ঠিক এই রকম একটু রাত্রি—বিনিদ্র, অপরাধ-ক্লিন্ন।...হে ভগবান, জীবনে আর কত এমন অভিশপ্ত রজনী আসিবে?

ঊষার বিকাশটি ভালো লাগিতেছে, শৈলেন সামনে চাহিয়া রহিল। নিপুণ হাতে কে যেন খুব হালকা এক-একটা তুলির টান দিয়া যাইতেছে—একটু আলো, তাহার পর আর একটু, তাহার পর আরও একটু...

এইবার একটু পরে বাবা উঠিবেন, তাঁহার সঙ্গে প্রথমেই এই ভাবে দেখা হওয়াটা ঠিক হইবে না। শৈলেন ঘুরিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইল।

সঙ্গে সঙ্গে বাবার ঘরের বাইরের বারান্দায় নজর পড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখে, পুব দিকে মুখ করিয়া বারান্দার রেলিং ঘেঁষিয়া মা দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁদারার কাছে একটা কামিনী ফুলের গাছ, তাহাতে একটা অপরাজিতার লতা উঠিয়াছে, শৈলেন এদের হালকা জাফরির আড়ালে ছিল, তাহা ভিন্ন বেশ খানিকটা দূরেও—মা দেখিতে পান নাই। শৈলেন আবার সেই জাফরির আড়ালে সরিয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ একভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, চোখ দুইটি পুব আকাশের দিকে একটু তোলা, মুখে এই ঊষার মতোই একটি সুগভীর শান্তি। শৈলেনের মনে হইল, কালকের রাত্রের সেই যে ক্লান্তির ছায়া তাহার লেশমাত্রও কোথাও নাই আর—যে-দীপ্তিতে মুখটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—বেশ বোঝা যায় বাইরে এই নূতন দিনের আলোর চেয়ে অন্তরের আলোই তাহাতে বেশি। একটি রাত্রির শান্তিতে একটা মস্তবড় পরিবর্তন হইয়াছে মায়ের মধ্যে, মা শুধু নিরাময় হন নাই, যেন পূর্ণতর হইয়াছেন। মাকে সুখে-দুঃখে কত রূপেই দেখিল, সবই মহিমাময়—কিন্তু আজ মনে হইতেছে তিনি যেন আরও কিছু—একটি পরম রহস্য। সমস্ত আবেষ্টনীর সঙ্গে শৈলেন তাঁকে মিলাইয়া দেখিল—মনে হয়

BanglaBook.org

এই নূতন উষা, ঐ শুকতারা, আর মা—রহস্যময়ী এই ত্রয়ী, রজনীশেষের এই নিবিড় প্রশান্তির মধ্যে কোন্ এক শাশ্বত অসীমের সামনা-সামনি হইয়া বিনম্র স্তব্ধতায় দাঁড়াইয়া আছেন।

দেখিয়া দেখিয়া শৈলেনের মনটা উদ্বেল হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল গিয়া একটি প্রণাম করে—তাহা হইলেই পুঞ্জীভূত অপরাধের বোঝা হালকা হইয়া যাইবে ; এই উপযুক্ত সময়। কিন্তু প্রকৃতিটাই এই রকম যে নিজের অনুভূতির প্রকাশে অল্প কিছুও আড়ম্বর আনিয়া ফেলিতে বাধে।...আড়ালে থাকিয়া বাহির হইতেছে এই রকম যাহাতে মনে না হয় সেই জন্য অল্প একটু ঘুরিয়া ধীরে ধীরে মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। গিরিবালা একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"এত ভোরে উঠেছিস্ যে?—ঘুম হয় নি রাত্তিরে?"

শৈলেন আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছে না ; গলায় কি ঠেলিয়া আসিতেছে, রগ দুইটা টন-টন করিতেছে, চোখ দুইটাও আর শুষ্ক রাখা যায় না। এগুলোকে চাপিবার জন্যই মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—"কি করে ঘুম আর আসবে মা?"

"কেন?"—বলিয়াই গিরিবালা থামিয়া গেলেন ; হাসির মধ্যেই শৈলেনের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিয়াছে। একটু মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া গিরিবালা কি যেন একটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ও!"

শৈলেন সিঁড়ির এক ধাপ নিচে ছিল, গিরিবালা একটু সরিয়া আসিয়া তাহার কাঁধে একটা হাত দিলেন, বলিলেন—"কি এমন দোষ করিছিস্ শৈল যে..."

শৈলেন গলাটাকে সহজ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"দোষের মধ্যে যেগুলো বড় সেগুলোর কথা ছেড়ে দিই মা, যেটা দেখতে সব চেয়ে ছোট সেটার ভারও আমি সইতে পারছি না। তোমার কষ্ট..."

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, স্নেহের অভ্যাসবশেই হাতটি ধীরে ধীরে শৈলেনের কাঁধে সঞ্চারিত হইতেছে। একটু পরে বলিলেন—"আমাদের সব চেয়ে বড় কষ্ট, তোদের জন্যে ভাবনা, তা এসেই তো গেছিস্। আর দোষের কথা —এই ক'টা মাসে আমি ওটা ভেবে দেখেছি শৈলেন। তুই যেটাকে দোষ বলছিস্ সেটা কি আমাদের ভুলের একটা দিক নয়? এই কথাটাই আমি ভেবেছি এই ক'টা মাস। আমার মনে হয়েছে নিজের কথা ভেবে আমরা তোদের জীবন নষ্ট করতে বসি এক এক সময়। এই ধর্ আজকের দিনটি,—সব দিক দিয়েই তো কালকের মতন ; কিন্তু অন্তত এইখানেই তো তফাত যে কালকের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে? তোদের যুগ, তোদের জীবনও তেমনি ; তোরা যে নতুন করে গড়বি তোদের জীবন তার জন্যে তোদের ইচ্ছামত চলতে দেওয়া দরকার তো? একটা সময় ছিল যখন যত ইচ্ছে বিয়ে করে কত মেয়ের জীবন বিষ করে তুলত। এখন কেউ যদি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নাই চায় বিয়ে করতে তো কোন দোষই না হবার কথা তো তার। তবে হ্যাঁ, একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। আমি ভগবানকে সেই কথা বলি—তুই যদি এমনি থাকিস্ তো তার মধ্যে যেন একটা সৎ উদ্দেশ্য থাকে —তাহলে আর আমাদের কোন আপসোসই থাকবে না।"

চুপ করিলেন, হাতটা অভ্যাসের বশে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে।

খুব বড় কথা একটু অস্বস্তি জাগায়ই মনে। একটু হালকা ভাব আনিয়া ফেলিবার

জন্যই শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল—"ক্ষমা করবার জন্যেই তুমি যেন কথাগুলো ভেবে ভেবে সাজিয়ে রেখেছ মা। আমি জানতাম ক্ষমা চাইবার দায়িত্বটাই বেশি—ছেলের দিক থেকে : তোমার দিক থেকে ক্ষমা করবার দায়িত্বটাকেই তুমি যেন তার চেয়ে বড় করে তুলেছ।"

একটু অপ্রতিভ ভাবেই গিরিবালার মুখে একটা হাসি ফুটিল, কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিপিনবিহারী শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

শৈলেন দুইজনকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে প্রশ্ন করিলেন—"ভোরের গাড়িতে এলে?"

"আজ্ঞে না, রাত্তিরের গাড়িতে।"

বিপিনবিহারীর স্বভাবের মধ্যে কি আছে, এক যুগের গ্লানি এক মুহূর্তে কাটিয়া গিয়া মনটা উৎসাহদীপ্ত হইয়া ওঠে, যদিও বাহিরে আরও বেশি সংযতই থাকেন। গিরিবালার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুললে না কেন? এত কি ঘুম-কাতুরে আমি?"

শেষ পর্যায়

॥ ১ ॥

আরও কত বৎসর গেল কাটিয়া।

জীবনের যেটা সৃষ্টির অংশ সেটা ধীরে ধীরে অতীত হইয়া গেল। এখন গিরিবালার এদিক দিয়া ছুটি, বুকের উত্তাপ দিয়া এক দিন যাহা সৃজন করিয়াছেন—সুখে দুঃখে—একটি নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে তাহার মধ্যে বিচরণ করিয়া ফেরা, জীবন মানে এখন এই দাঁড়াইয়াছে। সবার ভাগ্যে এ তৃপ্তিটুকু জোটে না, কেননা জীবনের এই সন্ধিক্ষণে পুরাতনের পাশে যে নূতন আসিয়া দাঁড়ায় তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই ঘটে বিরোধ—পুরাতন মনে করে তাহার অধিকারের মধ্যে নূতনের এটা অনধিকার প্রবেশ। বোধহয় কবি-পিতার কন্যা বলিয়াই গিরিবালার মনটা এদিক দিয়া একেবারে মুক্ত; সমস্ত জীবনটাকে আলোছায়া, নূতন-পুরাতনের বৈচিত্র্যময় সমগ্রতায় দেখিতে অভ্যস্ত। নূতন আচার, নূতন সজ্জা সমস্ত জীবনটার প্রতিই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি—ছেলে-মেয়ে-বধূদের মধ্যে দিয়া, পরে আবার নাতি-নাতনিদের মধ্যে দিয়া নূতনকে ছাড়াইয়া আরও নূতন—সমস্তকেই গিরিবালা নিজের পাশটিতে টানিয়া লন। মেয়ে-স্কুলের অভাবে আজকাল দুটি নাতনি ভাইদের স্কুলেই যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির মাস্টারমশাইয়ের নিকট হইতে পড়িয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া মুখে কোন রকমে এক মুঠা ভাত গুঁজিয়া লয়, তাহার পর বব্ করিয়া ছাঁটা চুলে তাড়াতাড়ি চিরুনির গোটাকতক টান দিয়া, খাটোফ্রক আর অল্প গোড়ালি-উঁচু স্ট্র্যাপ সু পরিয়া ক্ষিপ্র-পদে ভাইয়েদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে—চোখে-মুখে রাজ্যের উদ্বেগ। গিরিবালার অনভ্যস্ত চোখে একটু অদ্ভুত লাগে বৈকি; মুখে একটু হাসি লইয়া চাহিয়া থাকেন। ঠাট্টা করিবার লোক আছে—বড় নাতি-নাতনির দল—বলে—"গিন্নী, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে হিংসে হচ্ছে তোমার, মনে মনে বলছ

Banglabook.org

এ-জন্মে তো হল না, আসছে জন্মে যেন ঐ রকম করে আমিও যেতে পারি ইস্কুলে।”

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—“ঠিক হিংসের মতন এমন কিছু না হলেও মন্দ কি? —বেঁচে আছি বলেই তো দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কালে এই বয়েসটায় পুণ্যি-পুকুর, সেঁজুতি এই সব নিয়ে থাকতাম, আজ বৌমারা যেমন দেরির জন্যে এদের তাড়া দিচ্ছেন, তখন নাইতে, ফুল তুলে আনতে দেরি হলে মা-জেঠাইমারা আমাদের সেই রকম তাড়া দিতেন।”

ওদের মধ্যে থেকে দুষ্টামির প্রশ্ন হয়—“কোনটা ভালো গিন্নী?”

গিরিবালার দৃষ্টি একটু স্বপ্নালু হইয়া আসে, বলেন—“ভালো মন্দের বিচার করা শক্ত, তবে আমার তো মনে হয় যে, আবার যদি জন্মাতেই হয় তো যেন বেলে-তেজপুরের মতন কোন জায়গায় এই বয়েসটায় পুণ্যি-পুকুর, সেঁজুতি নিয়েই থাকি! সে যে আবার কি ছিল তোদের বোনেরা তো জানতে পারছে না!”

কথাটা মিথ্যা নয়, এমন কি বাড়াইয়াও বলা নয়, কেননা নিজের অতীতের মতো এত মিষ্ট আর কিছুই লাগে না মানুষের কাছে। কিন্তু এই ধরনের দৃশ্যগুলিও গিরিবালা সম্পূর্ণ প্রীতির চক্ষেই দেখেন। শুধু প্রীতিই নয়, চোখে লাগিয়া থাকে একটা বিস্ময়। ...ও-পাড়ায় মিত্তিরদের বড় ছেলের বিবাহ হইল, বউটি বি. এ. পাস। ‘বিবি বউ বিবি বউ’—শহরে একটা রব পড়িয়া গেল। একদিন গিয়া দেখিয়া আসিলেন। আজ-কাল বিয়ের কনের বয়স হইয়া যাইতেছে—গিরিবালার চোখে একটু একটু করিয়া সহিয়া আসিতেছে, তবে ওঁদের সে-যুগের পক্ষে তো কল্পনাতীতই। এ-মেয়েটি যেন আরও বড়, বছর কুড়ি তো বটেই। ঘোমটাটানা বউয়ের জড়ানে-জড়ানে ভাব অবশ্য মোটেই নাই—ওঠা-বসা-চলা সবতাতেই একটা সপ্রতিভ স্বচ্ছন্দতা, কিন্তু কৈ, বিবিয়ানা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার ধার দিয়াও তো যায় না, বাড়ির মধ্যে তো একটুকু বে-মানান নয়। বেশই তো লাগিল গিরিবালার, এই নূতন যুগটিই যেন চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে মেয়েটিকে। তাঁহার সম্ভ্রম এতটুকু নষ্ট করিল না, নিজের হায়ার এতটুকু অপচয় হইতে দিল না, অথচ দিব্য মানানসই করিয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া গেল, এতটুকু বাচালতা না করিয়া অনেক রকমই গল্প করিল। বেশ অনেক কিছু জানে, তবে জানে যে এটা জানাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা নাই। সবচেয়ে গিরিবালার মিষ্ট লাগিল মেয়েটি ওঁর ছেলের লেখা বই পড়িয়াছে; যাহার বই পরিয়াছে তাহারই মায়ের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে—এর আনন্দটুকুর যেন থই পাইতেছে না মেয়েটি, এই বিস্ময়টুকু শেষ পর্যন্ত যেন কাটাইয়া উঠিতে পারিল না।

মনে বেশ একটি মিষ্ট স্বাদ লইয়া ফিরিলেন গিরিবালা। বিশেষ করিয়া ছেলের লেখা লইয়া যে ব্যাপারটুকু সেটা লাগিল বড় চমৎকার। মানুষের একটা অহমিকা থাকেই, মেয়েটি বড় কোমল একটি স্পর্শ দিয়াছে তাহাতে; গিলিবালা ভাবেন—এরা শিখিয়াছে, পাঁচ রকম পড়িয়াছে, বোঝে, তাই তো এদের কাছে তাঁহার এই মর্যাদা।...বাড়িতে আসিয়া নিজেই একসময় ওপরপড়া হইয়া প্রসঙ্গটা তুলিলেন, নিজের যুগটাকে একটু খাটো করিয়া দিয়াই বলিলেন—“তা যখনকার যেটা দোষ সেটা বলতে হবে বৈ কি—আগেকার বউ দেখা সে যেন একটা একঘেয়ে কাণ্ড ছিল বাপু, এক ফোঁট্রা একটি মেয়ে কলের পুতুলের মতন চোখ বুজে বসে আছে, জবুথবু, ঘোমটাটি তুলিয়া ‘বাঃ বেশ, দিব্যিটি’ বলে গোটা কতক বাঁধা বুলি আওড়ে যাও, না কোন কথা, না কিছু। তার চেয়ে এ একটা মানুষের

BanglaBook.org

মতন কাছে এসে বসল, পাঁচটা কথার উত্তর দিলে, নিজেও পাঁচটা ভালমন্দ কথা তুললে, দিব্যি হাসি-হাসি ভাব, অথচ যে বেহায়াপনা বলব তাও নয়, আমার তো বেশ লাগল বাপু, চমৎকারটি..."

সত্যই, বউটি এই নূতন যুগেও যেন একটি নূতন আলোক-সম্পাত করিয়াছে। গিরিবালার মনটা চিরদিনই দেশ-কালের সব রকম সঙ্কীর্ণতার উপরে। কোথাকার মেয়ে, কোথায় বধূ হইয়া আসিলেন, কোথায় আবার জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে চলিয়াছে—এ ধরনের মানুষ জীবনকে ছোট ছোট গণ্ডি দিয়া মাপিয়া চলিতে শেখে না; তবুও মেয়েটি এ যুগের উপর বিশেষ করিয়া একটা নূতন শ্রদ্ধা আনিয়া দিয়াছে। ভাষা দিয়া ঠিক মতো প্রকাশ করিতে পারেন না, তবে বোঝেন ভাষা এদের এবং প্রসঙ্গ উঠিলে চেষ্টাও করেন নিজের অনুভূতিটাকে গুছাইয়া সামনে ধরিতে। মেয়েদের লেখাপড়ার এই বাড়াবাড়ি লইয়াই একদিন শশাঙ্ক বলিলেন—"জীবন যদি মাটির ঢেলার মতো এক জায়গায় পড়ে থাকবার জিনিস হত তো তোমাদের সময় যা ছিল আজ তাই থাকত মা; কিন্তু জীবন যে সচল, চলবার জন্যেই তাকে নতুন সময়ের মতন করে নতুন পথ সৃষ্টি করতে হবে।"

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া, যেন মনে মনে কি মিলাইয়া লইলেন, তাহার পর বলিলেন—"সে তো বটেই। আমার এক এক সময় কি মনে হয় জানিস্?—রাস্তাটা যাতে শুধু চলবার যুগ্যিই না হয়ে খানিকটা সুন্দরও হয় সেদিকে আজকালকার সবার নজর একটু বেশি। ভুল-ভ্রান্তি যে না হচ্ছে এমন নয়...কিন্তু ভুল-ভ্রান্তিই তো বড় করে ধরে থাকবার জিনিস নয়..."

নব-যুগের চিন্তাধারার আরও নূতন নূতন গতিপথ আছে:

মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই। ছেলেবেলায় যে-ইংরাজের অত গুণগান শুনিতেন, পাণ্ডুলের যুগেও যাহারা অপযশের মধ্যেও একটা সম্ভ্রমই জাগাইয়া গেছে, নবযুগের যাচাইয়ে তাহারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে শত্রু। দ্বারভাঙ্গা-বাসের প্রথম অংশে বাংলায় যে হাওয়াটা উঠিল সেটা এখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে...কত অত্যাচার, কত আত্মবলি! অন্তঃপুরে এক-আধটু যা ঢেউ আসে তাহাতে ভয়ই হয়, যদিও হয়তো কৌতূহল মিশ্রিত একটা প্রশংসাও থাকে। ভয়—এত কষ্ট করিয়া ছেলেদের মানুষ করা—কখন্ কাহার গায়ে এ বাতাসের ঢেউ লাগে কি বলা যায়?...অনেক আগেকার কথা, তখন শশাঙ্কর পর শৈলেন নূতন চাকরি শুরু করিয়াছে, এক দিন হঠাৎ খবর আসিল হরেন কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে। এম্. এস্-সি. পড়িতেছিল, বাড়ির মধ্যে এই প্রথম ছেলে যে এম্.এস্-সি. পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিল, গিরিবালা মস্ত বড় একটা আশা পোষণ করিয়াছিলেন, খুব রূঢ় আঘাতই পাইলেন। বিপিনবিহারী বাড়ি ছিলেন না, শশাঙ্ক-শৈলেনও কর্মস্থান থেকে ফিরিল সন্ধ্যার সময়। তাহাদের ভয় মায়ের জন্যই বেশি; গিরিবালা কিন্তু ততক্ষণে দুঃখ-দুর্ভাবনার পালা শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, শশাঙ্ক প্রসঙ্গটা তুলিলে তাহার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিলেন—"ভুল করে ফেলেছে, ছেলেমানুষ—চাকরি-পড়া ছাড়ার কেমন একটা ঢো উঠেছে..." একটু হাসিয়া বলিলেন—"তোরা দুজনে এ ভুল না করলেই হল!"

শশাঙ্ক বিরক্ত হইয়াছিলেন, কি ভাবে বুকের রক্ত দিয়া গড়া সংসার—বাবা-মা'র

BanglaBook.org

পর এক তিনিই জানেন, বলিলেন—"আমরা চাকরি ছাড়লে আর ও-বাবুর হুজুগে মাতবার অবসর হবে কোথা থেকে মা?"

এ-কথাটুকু বাহির করা দরকার ছিল, গিরিবালা নিশ্চিন্ত হইলেন ; বলিলেন—"কড়া করে কিছু তাকে লিখিস্ নি যেন বাবা। উঠেছে একটা হাওয়া, যদি না-ই চায় আর পড়তে ও। আমার মন কি বলছে জানিস্!—ওর ভালো হবে।"

শশাঙ্ক একটু বিস্মিতই হইলেন। তিনি তো এই ধরনের একটা কিছু আশঙ্কাই করিতেছিলেন, মনটা কতক প্রস্তুত ছিল ; মা'রই বরং ভাঙিয়া পড়িবার কথা। বলিলেন —"ভালো হয়, ভালোই। কিন্তু মন তোমার এমন অদ্ভুত কথা বলে কি করে বুঝি না তো মা। দুটো মাস গেলে পাশ করে বেরুত ও!"

এতবড় আশার উৎস যে কোথায় সেটা প্রকাশ করিয়া বলিতে বাধে গিরিবালার ; একেবারে মর্মস্থলের বস্তু, গোপনেই রাখিতে ইচ্ছা করে। খবরটুকুর প্রথম আঘাত কাটাইয়া উঠিবার পর থেকেই গিরিবালা বিকাশ দাদার কথাই ভাবিয়াছেন মনে মনে। রাজনীতি, সমাজনীতি অত কিছু না বুঝুন, এটা বুঝিতে পারেন হরেন যাহা করিয়াছে তাহার সঙ্গে বিকাশ দাদার আদর্শের একটা মিল আছে। বিকাশ দাদা যে যুগের বি. এ. ছিলেন, ভালো চাকরির সুযোগ আসিয়াছিল কয়েক বারই, কলিকাতার বড় সওদাগরী আফিসে, কিন্তু যান নাই। একবারকার কথা মনে আছে, বলিলেন—"গিরি, ওরা বেনে হয়ে এসেই যে ধাপ্পাবাজি করে আমাদের দেশটা হাতে করেছে এ-আক্রোশ আমার যাবার নয়, আমি বেনে-ইংরেজের গোলামি করতে পারবো না।" ওই কথাটাকেই আজ এরা ফলাও করিয়া বলিতেছে—স্কুল-কলেজের নাম দিয়াছে গোলাম তৈয়ার করিবার কারখানা। যদি দিয়াই থাকে ছাড়িয়া হরেন তো এমন কি হইয়াছে তাহাতে?...বিকাশ দাদা উপর থেকে আশীর্বাদ করিবেন।...ভয়ও হয় হরেন যদি আরও মাতামাতি করে জেলে যায়! গিরিবালার মনে যে সুরটুকু ধ্বনিত হইয়াছে সেটা অত উদাত্ত হইয়া উঠিতে পারে না, বাঙালী গৃহস্থ-জননীর মনই তো। তবু ভয়টুকু যে একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন না এমন নয়, পরিণামটা আরও ঊর্ধ্বে একজনের হাতে ছাড়িয়া দেন, মনে মনে বলেন—"যায় তখন ভগবান আছেন, করছিই বা কি আর?"

এ-ই এখন গিরিবালার জীবন ; নিজে আছেন নিজের পুরাতন আসনটিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেখানে থাকিয়াই দুই বাহু প্রসারিত করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিয়া গেছেন।...শৈলেন একদিন লীনাকে চিঠিতে মায়ের কথার প্রসঙ্গে লিখিল—"সব চেয়ে অপূর্ব জিনিস যা মায়ের মধ্যে এখন দেখেছি লীনা, তা এই যে মা আমাদের সবাইকে যে বিস্ময় আর আনন্দের মধ্যে বুকে তুলে নিয়েছেন, আজ পরিবর্তিত জগতের যত নূতন আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধারণা সেগুলোকেও ঠিক সেই বিস্ময় আর আনন্দেই মনের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। ভেবে কূল পাই না কি করে সম্ভব হল এটা! মা শিক্ষিতা নন, যে-অর্থে তোরা শিক্ষিতা ; তাহলে কি মায়ের জীবনের গতিরই এইটে স্বভাবিক পরিণতি? সেই গতির মধ্যেই বা এমন কি বিশেষত্ব ছিল?—মায়ের মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিস যা আমার চোখে পড়েছে তা হচ্ছে তাঁর প্রসন্নতা। তার গভীরতায় এত শক্তিই কি লুকানো থাকতে পারে?

"আমি দেখছি যতই দিন যাচ্ছে মা যেন আরও বড় করে মা হয়ে উঠছেন। আগে

BanglaBook.org

জীবনের এক স্তরে ছিলেন মাত্র আমাদের জননী, এখন নতুন আশা, নতুন বিশ্বাস—অর্থাৎ মানুষের মনের যত নবজাতক—সে সবকেও কোল দিয়ে মা যেন ছোট মাতৃত্ব ছড়িয়ে আর একটা বড় মাতৃত্বে পরিণত হয়ে চলেছেন। মায়ের যত অনুপ্রেরণা সব বিকাশমামার কাছ থেকে পাওয়া—তা তুই জানিস ; কিন্তু মনে হয় তিনিও কখনো এ-পরিণতি কল্পনায় আনতে পারেন নি।”

॥ ২ ॥

একটি তৃপ্ত নির্বিরোধ জীবন-প্রবাহ ; নিজের অটুট শান্তিতে সংসারের উপর দিয়া যেন একটি আশীর্বাদের মতো বহিয়া চলিয়াছে।

এই তৃপ্তি, এই শান্তির গোড়ায় গিরিবালার জীবনের গঠন-বৈশিষ্ট্য ছাড়া কিন্তু আরও একটা বড় কথা আছে—তিনি উত্তর-জীবনে কোন অতি-রূঢ় আঘাত পান নাই। দুঃখ-অনটনের কথা বাদ দেওয়া যায়, তাহারা তো শত্রুরূপে আসিয়া মিত্ররূপেই বিদায় লইয়াছে, প্রথম জীবনে এক অহিভূষণের কথা বাদ দিলে মৃত্যু পর্যন্ত ওঁর কাছে আসিয়াছে নিতান্ত স্বাভাবিক রূপেই : পিতা, মা, জেঠামশাই, জেঠাইমা, শ্বশুর, শাশুড়ী আরও সবাই যাঁহারা গেছেন এক রকম সময়েই গেছেন। অকাল বা আকস্মিকতার উগ্র ভীষণতায় মৃত্যু গিরিবালার জীবনে দেখা দেয় নাই। এ দিকে জীবনের কোন না কোন সময় মনে মনে যাহা কামনা করিয়াছেন—ধন, জন, সম্পদ—কে যেন অঞ্জলি ভরিয়াই দিয়া গেছে। ...সব ভালো হইলেও কিন্তু এ ধরনের যাহার জীবন সে কোন আকস্মিক সুকঠোর আঘাত বা তাহার সম্ভাবনার সামনে একেবারেই ভাঙিয়া পড়ে। তাহার জীবনের গতিই একেবারে বদলাইয়া যায়। গিরিবালার এই প্রশ্রয়-পাওয়া জীবনেরও শেষের দিকে খানিকটা সেই অবস্থা দাঁড়াইল :

মাঘমাসের পয়লা। কয়েকদিন হইতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, রাত্রে আর সকালের খানিকটা পর্যন্ত ঘরের ভিতর থেকে বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে, কন্‌কনে পশ্চিমা হাওয়া যেন হাড় পর্যন্ত বিঁধিয়া দেয়। বেলা প্রায় দুইটা ; খাওয়া-দাওয়া সারিয়া গিরিবালা একটি নাতিকে কোলে লইয়া উপরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। দোতলার পাশে একটা খোলা ছাদ, শীতের দুপুরে এটুকু একটি পরম আশ্রয়, কয়েকদিন থেকে যেন আরও লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বড় বধূর নিকট হইতে পান লইয়া উঠান হইতে ছাদের দিকে পা বাড়াইবেন হঠাৎ গুম্ গুম্ করিয়া একটা শব্দ কানে গেল। একটু দূরেই রেলের মাল-গুদাম, কখনও কখনও ভারী বোঝা ফেলিবার সময় এই ধরনের শব্দ ওঠে, পাশে রেলের প্রাঙ্গণ, সেখানেও শানটিঙের সময় গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ওঠে একটা শব্দ মাঝে-মাঝে। এটা কিন্তু ওরই মধ্যে একটু অন্য ধরনের, ব্যাপক, একটা চাপা গ্যাঙানির মতো। নাতিকে কোলে লইয়া গিরিবালা ভ্রূ কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। উপরের একটা ঘরে হরেন শুইয়াছিল, একটু বিস্মিত ভাবেই হাঁক দিয়া প্রশ্ন করিল—“মা, আওয়াজটা কিসের বল তো?”...শব্দের প্রকৃতিটা বুঝিতে আর হরেনের প্রশ্নে বোধ হয় আধ মিনিটও গেল না, ইতিমধ্যে গ্যাঙানিটা বাড়িতে বাড়িতে যেন চরমে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা উৎকট ঝাঁকানি। “মা, ভূমিকম্প

নাকি?" বলিয়া হরেন খাট হইতে নামিতে গিয়া মেঝেয় পা ঠিক রাখিতে না পারিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—"ভূমিকম্প! বাইরে বেরিয়ে পড়ো সব!..." সন্দেহের আর তখন নাইও কিছু, সমস্ত শহর কাঁপাইয়া উৎকট আর্তনাদ..."ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!... কেয়ামৎ...নিকলো!...বাহার আও!..." বিপিনবিহারী বাহিরের ঘরে ছিলেন, ছুটিয়া উঠানে নামিয়া চিৎকার করিতেছেন, সবাইকে বাহির করিতে যাইতেছেন—টলিয়া পড়িতেছেন —মেয়েরা ছেলেমেয়ে কোলে করিয়া বাহিরে পলাইতে যাইয়া পা মুড়িয়া পড়িতেছে —সঙ্গে সঙ্গে অসহায়ভাবে চিৎকার...সব চেয়ে ভীষণ মাথার উপর দোতলাটা—হরেন রেলিঙের ধারে ছোট ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া আর সবাইকে বাড়ি ছাড়িবার জন্য গলা ফাটাইয়া নির্দেশ দিতেছে: নিজে সম্পূর্ণ নিরুপায়, অগ্রসর হইবার কয়েকবার চেষ্টা করিয়া আছাড় খাইয়া এক হাতে ছেলেটি, অন্য হাতে রেলিং চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গিরিবালার অবস্থা বর্ণন করা যায় না, কোলে নাতি, উপরে ছেলে আর নাতির ঐ অবস্থা —একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া "ভগবান বাঁচাও!" "হে ভগবান বাঁচাও!" বলিয়া আর্তনাদ করিতেছেন। এদিকে মনে হইতেছে, তিনখানা ঘর আর টানা বারান্দাসুদ্ধ সমস্ত দোতলাটা উঠানের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আবার সোজা হইয়া উঠিতেছে—যে কোন মুহূর্তে চুর-চুর করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া সব একাকার করিয়া ফেলিবে।...নিচের আর সবাই কোন রকমে বাহির হইয়া পড়িল—টানিয়া বাহির করিতে বিপিনবিহারী কয়েক বারই আছাড় খাইলেন, পাগলের মতো উপরের পানে ছুটিয়া যাইবেন, এমন সময় সেই উৎকট ঝাঁকানি হঠাৎ থামিয়া গেল। "আপনি আসবেন না—কোনমতে না!" বলিয়া বিকৃত কণ্ঠে বিপিনবিহারীকে যেন ধমক দিয়া আদেশ করিয়া হরেন নামিয়া পড়িয়া মাকে এক রকম টানিতে-টানিতে বিপিনবিহারীকে পর্যন্ত জাপ্‌টাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমেই হিসাবের পালা; বড় সংসারে, অনেকগুলি কচি-কাচা উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের মধ্যে মিলাইতে কয়েক বারই গোলমাল হইল, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সকলেই বাহির হইয়াছে, একটু-আধটু হয়তো কাটা-ছড়া ব্যতীত এক রকম অক্ষতই,... বাড়িটা?...দুই মিনিটের ভূমিকম্প—তাহার আগে পর্যন্ত ছিল পরম আশ্রয়, এখন আর কাছে যাইতে সাহস নাই কাহারও। দুটি মিনিটেই পৃথিবীতে সব ওলট-পালট হইয়া গেছে—ঐ পরম মিত্র এখনই তো চরম শত্রুতা করিতে পারিত—এখনও তো পারে!

তাই হইয়াছেও। নিজেরা বাঁচিয়া বাহিরের দিকে নজর দিবার ফুরসত হইল—পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—শহরের চারিদিকেই গগনভেদী আর্তনাদ—সমস্ত আকাশ ধূলায় সমাচ্ছন্ন, এখনও ধূলার নূতন নূতন স্তম্ভ আকাশে উঠিতেছে, বাড়ি পড়ার শব্দও মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসে—এখনও; এ ওর মুখের পানে চায়, এত অতর্কিত—এত অল্প সময় —কেহ যেন কিছু বুঝিতে পারিতেছে না, বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

কোলের কাছটা একটু সামলানোর সঙ্গে সঙ্গেই দূরের কথা মনে পড়িল—শশাঙ্ক, পূর্ণেন্দু, অবু অফিসে, ছেলে-মেয়েরা স্কুলে কেমন আছে তাহারা—আছে তো?...চিন্তার মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব, বিশ্বাস-অবিশ্বাস যেন জোট পাকাইয়া গেছে,...মনে পড়িল শৈলেনের কথা—একাট কর্ম উপলক্ষে পাটনায় গেছে—সেখানকারই বা কি অবস্থা?...

BanglaBook.org

বিপিনবিহারী মাথার ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না ; কোথায়, কাহার কাছে যাইবেন? এক রকম জ্ঞানশূন্য হইয়াই ছুটিয়া বাহির হইবেন, হঠাৎ পাশের শুক্‌নো ডোবাটার পানে নজর পড়িল—গর্ত হইয়া গিয়া তাহার ভিতর থেকে জল আর বালি উঠিতেছে—একেবারে কয়েক জায়গায়। "এ কি সর্বনাশ!" বলিয়া ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার পা বাড়াইয়া রাস্তার ধার পর্যন্ত গেছেন, দেখেন একদিক থেকে পূর্ণেন্দু হন্‌-হন্‌ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। বাবার দিকে চাহিয়া আছে কিন্তু মুখ দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না। কাছে আসিয়া কোন রকমে কয়েকটা ঢোঁক গিলিয়া প্রশ্ন করিল—"খবর কি?"

বিপিনবিহারী কি ভাবিয়া বাড়িটার পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"কিছু হয় নি—বেঁচে গেছে।...তোমার খবর?"

সামনে দেখিয়াও ক্ষত কি অক্ষত যেন সন্দেহ মিটিতেছে না। একটা উত্তরে পূর্ণেন্দুরও আশা মিটিতেছে না, প্রশ্ন করিল—"সবাই?"

"হ্যাঁ, সবাই...তোমার...?"

"কোন রকমে বেঁচে গেছি, কি করে যে তা বুঝতে পারছি না ; বাইরে খোলা একটা রকে এসে দুজনে দাঁড়ালাম—পেছনে যে একটা উঁচু দেয়াল আছে হুঁশ নেই—চালুনির মতন জমিটা কে যেন চালাচ্ছে—হঠাৎ পেছন থেকে আমায় কে যেন একটা কড়া ধাক্কা দিলে—ছিটকে সামনে জমির উপর মুখ থুব্‌ড়ে পড়লাম—ফিরে দেখি দেয়ালটা পড়ে গেছে, পাশের লোকটা একেবারে তার মধ্যে শেষ।...আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"অ্যাঁ—কোথায়?...তুমি তো এসে গেছ, শশাঙ্ক, অরু...ছেলেমেয়েরা স্কুলে রয়েছে—খবর পেয়েছ কিছু?"

"না...ঐ তারা আসছে, সবাই আছে—ও-বাড়ির ছেলেরাও..."

বিপিনবিহারী ঘুরিয়া দেখিলেন দূরে স্টেশন-রাস্তার মোড়ে ছেলেরা ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে, মেয়ে দুটি একটু পিছনে, একটু পা নরম করিল, তাহার পর আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। বিপিনবিহারী অগ্রসর হইলেন। পূর্ণেন্দু আবার প্রশ্ন করিল—"কোথায় চললেন?"

"লাহেরিয়াসরাই—শশাঙ্ক, অরুকে দেখি..."

"যাবেন না, পায়ের নিচে জমি ফাটছে এখনও..."

তাহার পর যাওয়াটার গুরুত্ব বুঝিয়া বলিল—"বরং ফিরুন বাবা, আমি যাচ্ছি—এই তিন মাইল পথ আপনি..."

বিপিনবিহারী ততক্ষণে অনেকটা চলিয়া গেছেন, ফিরিয়া হাতটা উঁচাইয়া বলিলেন—"একটা এক্কা ধরে নেব, তুমি বাড়িতে থাকো। তোমার গর্ভধারিণী কি রকম যেন হয়ে গেছেন, একটু লক্ষ্য রেখো।"

উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথ বাহিয়া চলিলেন, শক্তি শুধু এই একটা ক্ষীণ সান্ত্বনায় যে, ভগবান যখন এদিকে সবাইকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন, ও-দুজনকেও নিশ্চয় দিবেন বাঁচাইয়া, সমস্ত বুকের জোর এই সম্ভাবনাটুকুর মধ্যে ঢালিয়া দিতেছেন। একটা এক্কা তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, থামিবার হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া তেমনি তীরবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পথে আরও এক্কা, ঘোড়ার গাড়ি দেখা গেল, ছুটিয়া আসিতেছে, অথবা তাঁহার

BanglaBook.org

দিক হইতে যাইতেছে, কোন চালক কথার একটা উত্তর দিল, কেহ বা দিল না; চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, বাড়ির উদ্দেশে ছুটিয়াছে, কেহ উলটিয়া প্রশ্ন করিল—"বাবু, অমুক মহল্লার খবর জানেন? আছে বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে? লোকেরা?'...পায়ে-হাঁটা লোকও চলিয়াছে কেহ ছুটিয়া, কাহারও গতি একেবারে মন্দ, ভয়ে আতঙ্কে স্নায়ুমণ্ডলী একেবারে শিথিল হইয়া গেছে, পা দুটাকে যেন কোনমতে টানিয়া টানিয়া চলিয়াছে। রাস্তার দুই পাশে এখানে, ওখানে, সেখানে গর্ত বাহিয়া জল বালি ঠেলিয়া উঠিতেছে—বীভৎস দৃশ্য—ধরণীর গায়ে যেন দূষিত ব্রণ! আর ফাটল—পূর্ণেন্দু যাহার কথা বলিয়াছিল—লম্বা, গভীর ফাটল হাঁ করিয়া রহিয়াছে, চাহিয়া দেখিতে ভয় করে, কয়েক স্থানেই রাস্তার এপার-ওপার চলিয়া গেছে—যেটা সব চেয়ে সঙ্কীর্ণ—হয়তো হাতখানেক চওড়া, সেটাকেও ডিঙ্গাইতে যেন সাহস হয় না—কে জানে, পাতাল পর্যন্ত নামিয়া গেছে কিনা!...ঝাড়া তিন মাইল পথ কি ভাবে অতিক্রম করিলেন, কতক্ষণ লাগিল, কোন হুঁশ নাই—ঐ একটি মাত্র সান্ত্বনা পায়ে শক্তি যোগাইয়া আসিয়াছে—ভগবান যখন এদিককার সবাইকে বাঁচাইয়াছেন—পূর্ণেন্দুকে আবার অমন অদ্ভুত ভাবে—তখন এ দুজনকে নিশ্চয় দিবেন বাঁচাইয়া!...এক সময় অফিসের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিরাট দুইতলা আদালত অফিস, উপরতলটা কে যেন হাতুড়ি দিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে; শশাঙ্ক আর অরু দুজনেই অফিসে ছিল, ওরই একটা ঘরে।

বহিঃচৈতন্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল বিপিনবিহারীর একেবার অবলুপ্ত হইয়া গেল। কয়েক সেকেন্ড পর্যন্ত যেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাহার পর আবার একটু হুঁশ হইল। ত্রস্ত প্রশ্ন করিতে করিতে আগাইয়া চলিলেন—"শশাঙ্কবাবুকো দেখা হ্যায়? অ্যাকাউন্‌টেন্ট শশাঙ্কবাবু? উস্‌কো ভাই অরুবাবু? উৎর গেয়া-থা উপরসে?..." কে কাহাকে উত্তর দেয়! অনেকে প্রতি-প্রশ্ন করিল—অমুকের খবর জানেন?...জজ-মুন্সেফ, আমলা-পিয়ন কেহই নাই, আছে যাহারা তাহারা বাহিরের লোক, ভাই-ছেলে-আত্মীয়য়ের খোঁজে আসিয়াছে—মুখে তীব্র আতঙ্কের ছায়া—অনেকক্ষণ হইয়া গেছে তবুও একটা জটিল কলরব—এক জায়গায় কতকগুলা কুলি তাড়াতাড়ি রাশীকৃত ইট-রাবিশ পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেছে। বিপিনবিহারী সেই দিকে ছুটিতেছিলেন এমন সময় একটি বাঙালী ছোকরার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, সে-ই প্রশ্ন করিল —"শশাঙ্কবাবুকে খুঁজছেন আপনি?"

"হ্যাঁ...আর অরু, তার ভাই...বেঁচে গেছে?"

ছেলেটি একটু থতমত খাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই সামলাইয়া লইয়া বলিল—"আপনি হাসপাতালে যান–শীগ্‌গির...অরুবাবুর কিছু হয় নি..."

"আর শশাঙ্কর?"

"আপনি যান হাসপাতালে শীগ্‌গির।"

"কেন?..."

গলা শুকাইয়া আসার জন্যই মুখ দিয়া আর কিছু বাহির হইল না, বিপিনবিহারী এবার ছুটিলেন। খানিকটা দূরেই হাসপাতাল, যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন আর্তনাদ তীব্র হইয়া উঠিতে লাগল। গবর্নমেন্টের বিরাট হাসপাতাল, সমস্ত চুরমার হইয়া গেছে। এখানে-ওখানে মৃতদেহ, অনেক আহতও, জায়গায় জায়গায় ইঁট-রাবিশ সরানোয় কুলি লাগিয়া গেছে। চরম অবস্থায় বিপিনবিহারীর যেন যৌবনের সেই শক্তি আর স্থৈর্য হঠাৎ

BanglaBook.org

ফিরিয়া আসিয়াছে। চারিদিকে তীব্র সন্ধানী-দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে আগাইয়া চলিলেন, সব কিছু দেখিবার জন্য মনটাকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। একটু অগ্রসর হইয়া একসময় একেবারে থামিয়া পড়িলেন। ডান দিকে একটু দূরে একটা গাছতলায় অরু গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। সামনেই শয়ান অবস্থায় শশাঙ্ক। অরু কতকটা পিছন ফিরিয়া ছিল। পিতাকে হঠাৎ দেখিয়া ক্ষণমাত্রের জন্য যেন হকচকাইয়া গেল, তাহার পর একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময় শশাঙ্ক খুব স্তিমিত দৃষ্টি মেলিয়া একবার ঘাড়টা ফিরাইলেন। বিপিনবিহারী মুখটা নামাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন— "কোথায় লেগেছে?"

শশাঙ্ক উত্তর দিতে পারিলেন না ; ক্ষণিক চৈতন্য আসিয়াছিল, বোধ হয় চেনেনও নাই ; চোখ দুইটাও তখনই আবার বুজিয়া গেল। অরু এতক্ষণ অসহায়ভাবেই বসিয়াছিল, বাবাকে দেখিয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কান্নার মাঝেই বলিল—"ঘাড়ে-পিঠে সর্বত্রই —বাঁ হাতটায় বড্ড বেশি চোট..."

বিপিনবিহারী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের আকারে বলিলেন—"ডাক্তার...জল একটু?"

অরু ব্যাকুলভাবে বলিল—"ছেড়ে উঠতে পারছি না—একটা এক্কা এইটুকু এনে দিয়ে চলে গেল—ডাক্তার কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, নেই বোধ হয়।"

"থামো"—বলিয়া বিপিনবিহারী চারিদিকে একবার চাহিয়া লইয়া এক দিকে ছুটিলেন ; ফাটলের মধ্যে দিয়া দূরে এক জায়গায় একটু জল জমিয়াছে, রুমালটা ভিজাইয়া আনিয়া মুখে ভালো করিয়া জল ছিটাইয়া দিলেন, তাহার পর হাঁ করাইয়া মুখের মধ্যেও দিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গেলেন ; এতদিনের চেনা ধরিত্রীর উপর হঠাৎ বিশ্বাস হারাইয়া গেছে, কে জানে, জলের আকারে বিষ উদ্‌গিরণ করিতেছে কি না!

অরুকে বলিলেন—"তুমি একবার দেখ—ডাক্তার কম্পাউন্ডার যে কেউ একজনকে পাও—ফার্স্ট এডের যা কিছু একটু নিয়ে..."

মিনিট দশেক পরে অরু একজন কম্পাউন্ডারকে লইয়া আসিল, তাহার হাতে ভাঙা শিশিতে একটু টিংচার আয়োডিন মাত্র, আর কিছুই নাই। শশাঙ্কর একটু একটু চৈতন্য হইতেছে, তবে থাকিতেছে না। সর্বাঙ্গে আঘাত। একটু একটু করিয়া আয়োডিন লাগাইয়া কম্পাউন্ডার হাতটা যতটা পারিল ঠিক করিয়া দিয়া অরুর দেওয়া ছেঁড়া কাপড়ের ফালি দিয়া ব্যান্ডেজ করিয়া দিল, বলিল—"যত শীগ্‌গির পারেন বাড়ি নিয়ে গিয়ে কোন ডাক্তারের হাতে দিন। অনেক চোট...কয়েকটা সিরিয়াস..."

বিপিনবিহারী বিহ্বলভাবে প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় পাই ডাক্তার?"

অরু পাগলের মতো একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"একটা এক্কাও যে..."

কম্পাউন্ডার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—"ওটুকুর বেশি আর কিছুই বলতে পারছি না আমি—এখানে আর কোন রকমই সাহায্যের উপায় নেই—ডাক্তার কম্পাউন্ডারের মধ্যে কে আছে, কোথায় আছে কিছু জানি না...যাই, ঐ আবার দুটোকে টেনে বের করেছে —কেনই যে করা...আচ্ছা নমস্কার।"

বিলম্বের জন্য একটা উদ্বেগ লাগিয়া আছে, তবুও গিরিবালা অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত

আছেন। পূর্ণেন্দু বুদ্ধি করিয়া নিজের বাঁচিয়া যাওয়ার ইতিহাসটা আর জানায় নাই। স্কুল থেকে নাতি-নাতনিরাও অক্ষত শরীরে ফিরিয়াছে। বাড়ির ভিতর যাওয়া যাইতেছে না, তবুও বাহির হইতে মনে হয় গোটাই আছে বাড়িটা। চারিদিকের ধ্বংসের মধ্যে এই নিরাপত্তায় মনে হয় তবে বোধহয় ভগবান করিলেনই রক্ষা। দু মিনিটের মধ্যে এমন একটা খণ্ডপ্রলয়—যাঁহার এই লীলা তাঁহার ভৈরব রূপের সামনে গিরিবালা যেন অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তবু তাহারই মধ্যে সমস্ত মনটি আবার কৃতজ্ঞতায় ভরপুর। অতি-বিরাটের সামনে অতি-অসহায়ের কৃতজ্ঞতা তোষামোদেরই রূপ লইয়া ওঠে ফুটিয়া...হে হরি, তোমারই তো সব, বাঁচিয়েছ, তোমার পায়ে লক্ষ-কোটি প্রণাম জানাচ্ছি—ভালোয় ভালোয় এখন শশাঙ্ক আর অরুকে ঘরে ফিরিয়ে এনে দাও—আর তুমি আনবেই ফিরিয়ে, এত কাণ্ডর মধ্যেও তোমায় দয়াল বলে সবাই...

এই রকম কৃতজ্ঞ চিন্তার মধ্যেই প্রায় সন্ধ্যার সময় শশাঙ্ককে অচৈতন্য অবস্থায় এক্কা হইতে নামাইয়া আনা হইল।

প্রচুর শান্তির মধ্যে প্রবল বিশ্বাসের মধ্যে অতর্কিত এই আঘাতটা গিরিবালাকে যেন সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত করিয়া দিল—অহির মৃত্যুর চারিদিকের দিনগুলি আসিল ফিরিয়া, শুধু আরও পরিপক্ক বিশ্বাসের মধ্যে বলিয়া আরও উগ্রভাবে। কথা অল্প হইয়া আসিল, একটা আতঙ্ক, একটা অবিশ্বাস—মনের ভাবটা যেন এই যে, এত করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়িয়া তো ভাল করেন নাই—এদিকে কোলের কাছে এই অবস্থায় শশাঙ্ক, ওদিকে এক শত মাইল দূরে শৈলেন—রেল-ডাক-টেলিগ্রাফ বন্ধ, একেবারেই কোন্ খবর নাই। এই অবস্থায় পনেরোট দিন কাটিয়া গেল—সেই সময় যখন একটা প্রহরকে একটা যুগ বলিয়া মনে হয়। পনেরোটা দিন পরে শৈলেন রাত্রি প্রায় তিনটার সময় হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল—রেল সমস্তটা খোলে নাই, পথ বিপজ্জনক, খানিকটা রেলে খানিকটা এক্কায় আসিয়াছে, খবর কিছুই দেওয়া সম্ভব ছিল না, বাড়ির খবর জানেও না কিছু। দেখে, বাড়ি থেকে দূরে খড়ের চালা করা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে পরিবারের সবাই। মা শশাঙ্ককে কোলে লইয়া জাগিয়া বসিয়া আছেন। শশাঙ্ক অবশ্য তখন অনেকটা সুস্থ, বিপদের গণ্ডিটা পার হইয়া গেছে।

মায়ের মুখে কিন্তু তখন রাজ্যের ক্লান্তির সঙ্গে একটা যেন তীব্র আতঙ্কের ছাপ। শৈলেনকে দেখিয়া মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু খুব যে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন এমন মনে হইল না। চোখে বারংবারই একটা অভিমানের অশ্রু ঠেলিয়া আসিতে লাগিল, মুছিয়া মুছিয়া লইতে লাগিলেন। শান্ত প্রশ্ন আর গল্প-গুজবে রাত্রিটা শেষ হইয়া গেল।

কয়েক দিন পরের কথা—শশাঙ্ক তখন ভাল হইয়া গেছেন। একদিন গল্পপ্রসঙ্গে শৈলেনকে প্রশ্ন করিলেন—"মা'র ভাবটা লক্ষ্য করেছিস?"

শৈলেন বলিল—"হ্যাঁ দাদা, একটু ছাড়া-ছাড়া নয় কি?"

শশাঙ্ক একটু মাথা নাড়িয়া হাসিয়াই বলিলেন—"ঠিক তাই। মা আমাদের সবার ওপর একটু চটে গেছেন বলা চলে।"

শৈলেন অবশ্য সে রকম কিছু পরিচয় পায় নাই, একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিল —"চটে গেছেন? তার মানে?"

শশাঙ্ক এবার আর একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন—"তার মানে কে

BanglaBook.org

জানে, আমরা সবাই হয়তো অহির অভিসন্ধি নিয়ে বসে আছি, যে কোন সময় দাগা দিতে পারি। ভূমিকম্পে আমার এত-বড় একটা ফাঁড়া গেল—পিওর অ্যাক্‌সিডেন্ট, কোনই হাত নেই আমার—মা কিন্তু ঐ অর্থ দাঁড় করিয়ে বসে আছেন। আমিই যেন ইচ্ছে করে এত-বড় একটা তোড়জোড় করে ওঁকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করেছিলাম! হাসব কি কাঁদব তাই বল না!"

॥ ৩ ॥

ক্রমে ধীরে ধীরে এই আতঙ্কের ভাবটা মিলাইয়া আসিল। শুধু মিলাইয়া আসা নয়, মুখচ্ছবি হইয়া আসিল আগের চেয়ে প্রশান্ত—একটা স্বচ্ছ সরোবরের, ঝড়ঝঞ্ঝায় সাময়িক বিক্ষোভের পর সামান্য বীচিভঙ্গটুকুও বিলীন হইয়া গেছে ; এখন তাহার উপর পড়িয়া আছে নীল আকাশের একটি শান্ত প্রতিচ্ছায়া।

তাহাই হইয়াছে—কোন্ অনন্ত-অসীমের প্রতিচ্ছায়াই পড়িয়াছে গিরিবালার সমস্ত সত্তাটিকে আচ্ছন্ন করিয়া। আতঙ্কে ওদের প্রতি আসিয়া গিয়াছিল ক্ষুদ্র অবিশ্বাস, এখন কাহার উপর নির্ভরতায় একটা অটল বিশ্বাস আসিয়া সেই জায়গাটি পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

আজকাল নাতি-নাতনি বা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজবের সময়— বিশেষ করিয়া গল্পগুজব যখন খুব জমাট, কলহাস্যে উচ্ছল, গিরিবালা মাঝে মাঝে যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া যান, কাহারও দিকে থাকেন চাহিয়াই, মুখে হাসিও থাকে লাগিয়া, কিন্তু সে দৃষ্টি আর হাসিতে এক নূতন আলো আসিয়া পড়ে—মনে হয় এরা যাঁহার দান, এদের অতিক্রম করিয়া গিরিবালার মন একেবারে তাঁহারই সামনা-সামনি গিয়া পড়িয়াছে। এটা সর্বদাই যে হয়, তাহা নয়, স্থায়ীও হয় না—যখন হয়, কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তেই যায় মিলাইয়া। কিন্তু এ সব জিনিসের মাপকাঠি তো স্থায়িত্বই নয়, এক মুহূর্তেই কত সুদূরের পাড়ি যে দিতে পারে মন তাহার হিসাব কে-ই বা পারে রাখতে?

শৈলেন একদিন শশাঙ্ককে কথাটা বলিতে শশাঙ্ক বলিলেন—"আমি লক্ষ্য করেছি শৈলেন, কিন্তু আমি তেমন খুশী হতে পারি নি ; অবশ্য নিজেদের দিক থেকে কথা বলছি।"

শৈলেনকে সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন—"অবশ্য আমার মনের একটা সন্দেহের কথা—আমার কেমন একটা ভয় হয় মাকে আমরা হয়তো আর বেশি দিন পাব না—দৃষ্টি ও আলো যেন এখানে ট্যাকবার নয় বেশি দিন।"

একটু থামিয়া বলিলেন—"এর মধ্যে হয়তো সত্যিকার কিছু নেই, তুই নেহাত কথাটা তুললি বলেই বললাম—মনের একটা সন্দেহ কাউকে বেঁটে দিলে মনটা হালকা হয় বলে।"

একটু ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখিয়া বেড়াইবার ইচ্ছাটা হঠাৎ প্রবল হইয়া উঠিল,—কিছু কিছু তীর্থও, আবার নিজের যাহারা যেখানে আছে তাহাদেরও। তীর্থের সঙ্গীও ভালো —ননীবালা ; এমনই পূর্ণতার মধ্য দিয়া তিনি এখন জীবনের এই প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এ সব দিক দিয়া তিনি বেশ দক্ষই। ছাড়িয়া ছাড়িয়া বছরখানেকের বেশ

BanglaBook.org

একটা বড় ছক তৈয়ার হইল, শুধু তীর্থ-ভ্রমণেরই, আর যেখানকার সে পরে হইবে। ননীবালা হাসিয়া বলিলেন—"ঠাকুরে মানুষে মিশিয়ে দিয়ে চিরকালটা তো একটা জগাখিচুড়ি পাকানো গেল, আর কেন? এবার ওঁদের পাওনাটা আগে মিটিয়ে দিয়ে আসি চলো।"

প্রথম ঝোঁকে মাস তিনেকের একটা ব্যবস্থা ঠিক হইল। কাছাকাছি কয়েকটা ছোটোখাটো তীর্থ শেষ করিয়া গিরিবালা একদিন বলিলেন—"এবার একবার ঘুরে এলে হয় না বাড়ি থেকে?"

ননীবালা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"বাড়ি! এর মধ্যে কি গো? তিন মাসের ঠিক করে বেরিয়েছি, এখনও দিন দশেকও হয় নি—হিসেব নেই আমার?"

গিরিবালা মুখের পানে চাহিয়া একটু অপ্রতিভভাবে হাসিলেন।

ননীবালার মুখেও হাসি ফুটিল, সেটা গাম্ভীর্যে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়া, চোখ বড় বড় করিয়া বলিলেন—"তিন মাসের ব্যবস্থা যে, ও বৌদি!...বড় বৌমা বললেন—পিসিমা, মার মনটা যেন উঠে যাচ্ছে সংসার থেকে, আমরা পারি কখনও সামলাতে? আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।...আমি মনে মনেই বললাম—আমার বয়ে গেছে, চিরদিনই মুখ গুঁজড়ে থাকবে নাকি সংসারে? সুমতি হয়েছে, এবার বরং একটু বাইরে টেনে নিয়ে যাই।...ওমা, এই তোমার সংসার থেকে মন ওঠা!...ফিরে গেলে ওদের চাপা হাসিই কি করে সামলাবে তাই নয় একবার ভাবো, ঠাকুরের কথা না হয় বাদই দিলাম।"

বেশ জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, গিরিবালাও যোগ দিলেন, যাওয়াটা স্থগিতও রহিল, কিন্তু দিন চারেক পরে কাছের আর একটা তীর্থ সারার পর ননীবালা বুঝিলেন এ রকম তীর্থ করায় ফল নাই, এ যেন জোর করিয়া টানিয়া ঘুরানো হইতেছে!

ফিরিলেন।

বাড়িতে সবাই খুশী হইল, তবে বিস্মিতও হইল কম নয়। একটু একান্তে পাইয়া বধূরা ননীবালাকেই কারণটা জিজ্ঞাসা করিল। ননীবালা একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিলেন, তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, "বৌমা, মনের কথা পুষে রাখা পাপ —বিশেষ করে ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার নিয়ে। দোষটা অবশ্য তোমার শাশুড়ীর ঘাড়েই চাপিয়ে ফিরলাম, কিন্তু আমারই কি মন টেঁকছিল বাছা? মিলিয়ে দেখলাম, ও বয়েসকালেই তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো চলে, এখন যত যাবার দিন এগিয়ে আসছে ততই যেন ভগবান নগদ যেটুকু দিয়েছেন সেইটুকু আঁকড়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। তোমার শাশুড়ীর ঘাড়ে দোষ চাপালে কি হবে? দেখলাম তো নিজেও!"

সেজ বৌ বলিলেন—"তোমাদের সুবুদ্ধি হওয়ায় বাঁচলাম পিসিমা, এবার তোমরা ননদ-জায়ে দিনকতক সামলাও তোমাদের সংসার, আমরা দু-বাড়ির বৌয়েরা মিলে বয়স থাকতে থাকতে সেরে আসি গোটাকতক তীর্থ এইবেলা।...নিদেন একবার বাপের বাড়ি..."

একটু হাসি পড়িয়া গেল ; বড়বৌ বলিলেন—"হ্যাঁ, যেও ভাল করে, এসেই গেয়ে রেখেছেন নিজেই বাপের বাড়ি চললেন, মনটা নাকি বড্ড উতলা হয়ে উঠেছে। কেমন শেয়ানা বাপের মেয়ে!"

ননীবালা বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ওমা, আর আমায় যে বললে দিন

BanglaBook.org

আষ্টেকের মধ্যেই আবার বেরুবো গো। আমার সঙ্গেও এমন নুকোচুরি যদি খেলে তো সে মানুষকে নিয়ে কি করে চলবে?”

আসল কথা নিজের মনই লুকোচুরি খেলিতেছে গিরিবালার সঙ্গে; কি যে চান কি না চান বেশ স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কাছে থাকিলে মনে হইতেছে—আর কেন, এইবার ধীরে ধীরে মুক্ত হই, দূরে গেলে সেই বাঁধনের মায়াতেই টানিতেছে আবার।...কেমন আছে সবাই? উনি যখন থাকিবেন না—একেবারেই, ওরা সব কেমন থাকিবে?...দেখিলেন ভালোই আছে, যিনি সব দিয়াছেন, যিনি শশাঙ্ককে দিয়াছেন ফিরাইয়া—তাঁহার দৃষ্টি সজাগ আছে। নিশ্চিন্ততার সঙ্গে নির্ভরতা আরও গেল বাড়িয়া।

একটা কথা কিন্তু গিরিবালা মনের কাছে গোপন করিতে পারিতেছেন না—বাহিরে বাহিরে সেই দেবতাকে খুঁজিয়া বেড়াইতে যেন মনে সরিতেছে না। মায়া যেন কেমন করিয়া আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে—বেশ তো, যাহারা আপন, যাহারা জীবনের অপরাংশ, তিনি যদি তাহাদের মধ্যেই একটি আলাদা জায়গা করিয়া লইয়া থাকেন তো কাজ কি দূরে দূরে তাঁহাকে এ ভাবে সন্ধান করিয়া ফেরার?

ননীবালা বলিলেন—“শুনলাম নাকি কচি মেয়ের মতন বাপের বাড়ি যাওয়ার বায়না ধরেছ?”

গিরিবালা হাসিয়া বলিলেন—“তোমার এই শহরেই বাপের বাড়ি, আবার এইখানেই শ্বশুরবাড়ি, চিরকালটা তাই কচিই থেকে গেলে, বুড়োর যে আবার কি মায়া তোমায় কি করে বোঝাই বল?...না ঠাকুরঝি, একবার হয়ে আসি, দেখাশুনো একটু করে আসি একবার; আর তো ডাক আসবার সময় হল।”

ননীবালা হাসিয়া উত্তর দিলেন—“সে ভাবনা নেই, এখনও তোমার দেরি আছে; এমনভাবে যে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে তাকে টেনে তুলতে যমের মেহনত হয়, সময় লাগে।”

এবারে অনেক দিন পরে আসিয়াছেন। ইচ্ছা করিলেই পারেন আসিতে এখন, কিন্তু ইচ্ছাটাই আর সে-রকম নাই। আসল কথা, মেয়েদের বাপের বাড়ির টান তত দিনই থাকে যত দিন শাশুড়ী থাকে বাঁচিয়া। পণ্ডিতমশাই বলিতেন—“উমা কি পারে না আসতে বাপের বাড়ি? চায় না তাই বছরে ঐ তিনটি দিন এসে একটা ঠাট বজায় রাখে।” সেবারে রসিকলাল গুরুর কথার উপর একটু রং ফলাইয়া কন্যাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন—“আসলে তাও নয় গিরি, তোরা হচ্ছিস্ আবদেরে জাত, আবদার করে না নিতে পারলে তোদের কোন জিনিস মিষ্টি লাগে না, শাশুড়ী না থাকলে তো আবদার করে আসবার উপায় থাকে না, বাপের বাড়ির দিকে আর তেমন টানও থাকে না তাই।”

অনেক দিন পরে সবার সঙ্গে একসঙ্গে হইল দেখা। ভাইয়েদের ছেলেমেয়েরা বড় হইয়া উঠিতেছে, নূতন কয়টিও আসিয়াছে, ধীরে ধীরে সংসারটি পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। একেবারে নূতনের মধ্যে মেজবৌ। আগে যিনি ছিলেন তিনি অনেক দিন মারা গেছেন, তার পর হরিচরণ দ্বিতীয় বার বিবাহ করিয়াছেন। সে-ও প্রায় আট নয় বৎসরের কথা, তবে গিরিবালার এর মধ্যে আর আসা হয় নাই।

মন পুরানোকেই খোঁজে, কিন্তু নূতন বধূটি যেন সে অবসরই দিল না। শিবপুরেরই

BanglaBook.org

মেয়ে, কিন্তু দেহে বা মনে শহরের একটুও যেন ছোঁয়াচ লাগে নাই। আসিয়া প্রণাম করিয়া দু-একটা কথার পর এমন একটা সলজ্জ কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি লইয়া দাঁড়াইল যে গিরিবালার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা মায়া বসিয়া গেল। তবে তাঁহাকে একটু সঙ্কোচেও ফেলিল, দু-একবার মুখ ঘুরাইয়া দেখিলেন, মুগ্ধ দৃষ্টিতে কি এক যেন অপূর্ব জিনিস দেখিতেছে। আর সবার সঙ্গে কথা কহিয়া গিরিবালা অপ্রতিভ ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, কিশোর আসিয়া উপস্থিত হইলেন, প্রণাম করিয়াই প্রথম প্রশ্ন—"তোমার নতুন ভাজকে কেমন দেখলে দিদি, আগে তাই বলো।"

গিরিবালা আর একবার দেখিয়া লইলেন, হাসিয়া বলিলেন—"চমৎকারই তো, লক্ষ্মী-প্রতিমের মতন ; কিন্তু কথা যে বড্ড কম, শিবপুরের মেয়ে, অথচ..."

"কম নয়, এর পরে টের পাবে। তবে টপ করে মুখ খুলতে যে চান না তার কারণ..."

"আঃ ঠাকুরপো!—" বলিয়া মেজবৌ পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেই কিশোর গিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন—"সমস্ত শহর উটকে আমরা এক অজ পাড়াগেঁয়ে বের করেছি দিদি। দাদার অসুখে সেবার দেওঘরে গেলাম না? তপোবন দেখতে গেছি, ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে স্বামীজীর সামনে খানিকটা বসলাম। কথাবার্তা খানিকটা হল, আরও সব লোক ছিল। স্বামীজী পুজোর জন্যে উঠে যেতে আমরা সবই তাঁর কথা কইতে কইতে বাড়ি ফিরছি, মেজবৌদি আমায় একলা পেয়ে চুপি-চুপি জিজ্ঞেস করছেন—"হ্যাঁ ঠাকুরপো, সবাই স্বামীজী স্বামীজী বলছে, উনি কার স্বামী যে এত নাম-করা গা?"

বাড়ির মধ্যে একটা ক্ষ্যাপানে গল্প দাঁড়াইয়া গেছে, সবাই হাসিয়া উঠিতে মেজবৌ আরও গুটাইয়া গেলেন। গিরিবালা গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"থাম্ বাপু, তোরা সব এক দিনে পণ্ডিত হয়েছিস। তোকে জিজ্ঞেস করেই ভুল করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, একেবারে স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করলেই ঠিক হত।"

আর এক তোড়ে হাসি নামিল।

সত্যিই এত অজ্ঞ নয়, আর এ অনেকদিন আগেরও কথা, তবে কথাবার্তার মধ্যে এখনও একটা অদ্ভুত সারল্য আছে। সন্ধ্যার সময় ছাদে বসিয়াছিলেন গিরিবালা, কোলের শিশুটিকে লইয়া মেজবৌ আসিয়া মাদুরের এক পাশে বসিলেন। দু-এক কথার পর বলিলেন—"বড্ড দেখবার ইচ্ছে ছিল তোমায় দিদি ; এমনি ইচ্ছে হয়ই, নিজের বড় ননদ তো, কিন্তু শুধু সে জন্যেই নয়..."

গিরিবালা একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—"তবে আর কি জন্যে?"

মেজবৌ একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর নূতন লোকের কাছ যেন একটু গুছাইয়া লইয়া বলিলেন—"এখানে সবাই তোমার বড্ড নাম করেন, তিন ভাইয়েই দিদি বলতে অজ্ঞান..."

একটু হাসিয়া অস্বস্তিটা কাটাইয়া গিরিবালা বলিলেন—"তাদের দিদিই তো!"

"দিদি তো অনেকেরই হয়।...তা ভিন্ন আর একটা কথা—কিন্তু ঠাকুরপোকে বলো না দিদি, দোহাই তোমার, ক্ষেপিয়ে ক্ষেপিয়ে আমায় অস্থির করে তোলে। ...বলছিলাম আট ছেলের মাকে দেখাও তো একটা পুণ্যি গা ; বলো না?"

তাঁহাকেই সাক্ষী মানিবার ভঙ্গিতে বড় হাসি পাইল গিরিবালার ; সেটুকু সামলাইয়া

BanglaBook.org

লইয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় কিশোর আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাহার পরই বড়বৌ, দু-তিন জন ছেলে-মেয়ে ; গল্পের স্রোতটা বিভিন্ন মুখে ছুটিল। বেলে-তেজপুরের কথাই হইল বেশি। গিরিবালাই তুলিলেন, যাইবেন ; কতদিন যে দেখেন নাই! কিশোরকে বলিলেন—"তোরা তিনজনেই কয়েক দিনের ছুটি নে, একবার সবাই মিলে একসঙ্গে থেকে আসি, কি জানি আমার মনটা এদিকে অনেক দিন থেকে তেজপুর তেজপুর করছে, আর সত্য আমার পক্ষে তো এই শেষ দেখাই।"

বড়বৌ কিশোরের পানে চাহিয়া কি একটা যেন ইঙ্গিতচ্ছলে শুধু বলিলেন—"ঠাকুরপো..."

কিশোরের মুখে একটি ম্লান হাসি জাগিয়া উঠিল, বলিলেন—"দিদি, বেলে-তেজপুরে আর যেও না।"

একটু উৎসুকভাবেই গিরিবালা প্রশ্ন করিলেন—"কেন রে?"

"সে বেলে-তেজপুর তো নেই-ই, এমন কি সেবারে যা দেখে এসেছিলে ততটুকুও নেই। তোমার তবু ভাগ্যি, খানিকটা ভালো ধারণা নিয়ে থাকবে ; আমাদের মাঝে মাঝে যেতে হয়েছে—চোখ ফেটে জল আসে। চারিদিকে আগাছার বন—মানুষ চোখে পড়ে না—অমন যে বেলে-তেজপুর..."

কি ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করিয়াই রহিলেন সবাই, গিরিবালার চোখের তারা দুইটি খুব আস্তে আস্তে ঘুরিতেছে-ফিরিতেছে—স্মৃতির তলে ডুবিয়া গিয়া কি যেন অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছেন। একটু পরে বলিলেন—"যেতে একবার হবেই আমায় কিশোর। তবুও বেলে-তেজপুরই তো, যেটুকু পাই সেইটুকুই মিষ্টি। ধর্ না—মার কথা ছেড়ে দিই, জেঠাইমার কথাই ধর, যদি বেঁচে থাকতেন সে-জেঠাইমাকে তো পেতাম না— সেই টক-টক করছে রং, সেই হাসিখুশি—হয়তো জবুথুবু হয়ে পড়ে থাকতেন বিছানাতে, কিন্তু তবুও তো..."

কিশোর বলিলেন—"তোমার তুলনাটা মন্দ হল না দিদি, শুধু তফাত এই যে বেলে-তেজপুর আর বেঁচেই নেই।"

তাহার পর প্রসঙ্গটার বেদনাটুকু যেন না বাড়াইবার জন্যই বলিলেন—"বেশ যেও, আর সত্যিই তো একবার দেখে আসতে করেই মন।"

একটু যেন বানাইয়া বানাইয়া ভালোর দিকটা বলিয়া গেলেন, অনুগত অপেক্ষিতদের মধ্যে হারানের ছেলেদের অবস্থা ভালো। হারান নিজে নাই, তবে জোত-জমি, খামার-পুকুর রাখিয়া গেছে, দুটি ছেলে একসঙ্গে আছে, ভালোই আছে। দুলাল বাগ্দী এখনও বাঁচিয়া আছে ; বয়স হইয়াছে—তা বছর পঁচাত্তর তো বটে ; এখনও কিন্তু প্রতি বছর আমের সময় একটি ঝুড়ি গাছের আম মাথায় করিয়া দেখা করিয়া যাওয়া চাই-ই।

এক সময় সাতকড়ি আর হরিচরণ আসিলেন, ছেলেমেয়েদের খাওয়াইবার জন্য বৌয়েরা নিচে নামিয়া গেলেন, বেলে-তেজপুরের গল্প অসম্পূর্ণ রাখিয়া ভাই-বোনে যখন নামিয়া আসিলেন, রাত্রি তখন বেশ গভীর হইয়া আসিয়াছে।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল শিবপুরে, দেখা-শুনা, ঘোরা-ফিরার মধ্যে বেলে-তেজপুরে যাইবার দিন ঠিক হইতেছে, আবার পিছাইয়া যাইতেছে, শিবপুরেই যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনটাকে তৃপ্তিতে মন্থর করিয়া দিতেছে—বেলে-তেজপুর হইবে'খন—হাতের

BanglaBook.org

পাঁচই তো। ভাইয়েদের কাছে শুনিয়া শুনিয়া মনটা হয়তো একটু অবসাদগ্রস্তও হইয়া থাকিবে ভিতরে ভিতরে।

দিন দশেক পরের কথা। হরিচরণ আহারাদি সারিয়া অফিসে বাহির হইতেছিলেন, আবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন—"দিদি একবার বাইরে এস তো, দেখোসে কে এসেছে।"

গিরিবালা রকে আসিয়া দাঁড়াইতেই একটি ছেলে পদধূলি লইয়া লজ্জিতভাবে অল্প হাসিমুখে একটু সরিয়া দাঁড়াইল। মোটা খদ্দরের কাপড়-পরা, গায়ে খদ্দরের পাঞ্জাবি, মাথায় একটা খদ্দরের টুপি ছিল, সেটা নামাইয়া হাতে ধরিয়া আছে ; পায়ে একজোড়া স্যান্ডেল। সবাই চুপ করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সামনে যেন একটা হেঁয়ালি ধরিয়া দিয়াছে। একটু ধোঁকা লাগিল গিরিবালার, একেবারেই অদেখা, তাহার পর ঐ পরিচ্ছদ ; কিন্তু বেশি বিলম্ব হইল না, একটা খুব ক্ষীণ স্মৃতি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিল ; এই রকমই একটি যুবা তাঁহার সমস্ত জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, ঠিক এই রকমই, বেশ মনে পড়ে ; শুধু অন্য বেশে। গিরিবালার মুখখানা দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন— 'বিকাশ দাদার ছেলে না?"

তাহার পরই কিন্তু বুকটা উদ্বেল হইয়া উঠিল, চোখে জল ছাপাইয়া উঠিল, খানিকক্ষণ কোন কথাই কহিতে পারিলেন না গিরিবালা। আজ তিন বছর হইল বিকাশ দাদা মারা গেছেন, শেষ দেখা হয় নাই ; মস্ত বড় একটা ত্রুটি থাকিয়া গেছে জীবনে। মনটা একটু হাল্‌কা হইলে দুই পা আগাইয়া গিয়া ছেলেটির পিঠে হাত দিয়া বলিলেন—"তোমার নাম কি বাবা?...ঠিক একেবারে বিকাশ দাদা বসানো!"

হরিচরণ বলিলেন—"নাম দিয়েছেন সমীর, সিমুরের সঙ্গে মিলিয়ে। দেশ আর গ্রাম নিয়েই তো সমস্ত জীবনটা কাটালেন।"

তাহার পর সমস্ত দিন সিমুরের গল্প চলিল, বিকাশ দাদাকে কেন্দ্র করিয়া যে-সিমুর। স্কুল ছাড়িয়া নিজের স্কুল গড়িয়াছিলেন—ঠিক এ-ধরনের স্কুল নয়, আশ্রম বলা হয় সেটাকে—সমীরের এই খদ্দর সেই আশ্রমের তৈয়ারী ; সমীর যেন একটু লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল—"আমার নিজের হাতেই বোনা পিসিমা।"...একবার লজ্জাটা কাটিয়া গেলে বেশ মুক্ত ভাবেই গল্প করিয়া গেল। ...বেশ সুস্থ সবল চেহারা। বিকাশ দাদার মুখে এক একবার যে বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িত এর মুখে তাহার যেন লেশমাত্রও নাই। কথাও বলে বেশ আশায় ভরা, বিশ্বাসে ভরা, সাহসে ভরা ; বিকাশ দাদা ছেলের মধ্যে নিজেকেই যেন নিখুঁত করিয়া রাখিয়া গেছেন।

আশ্রমের তাগিদ আছে, তবুও তিন দিন ধরিয়া রাখিলেন গিরিবালা। রাত্রের আসরে সমীরের গল্পই একটানা চলে—ঐটুকু ছেলে, কতই বা বয়স?—কুড়ি-একুশ এই, কিন্তু অনেক জানে, অনেক দেখিয়াছে এর মধ্যে। একবার জেল পর্যন্ত হইয়া আসিয়াছে।

ক্রমাগতই বকাইয়া যান গিরিবালা ; সমস্তটা কি গল্পেরই মোহ?—এক এক সময় মনে হয় বড় অন্যমনস্ক হইয়া গেছেন, দৃষ্টিটাই শুধু সমীরের দিকে আছে মন কিন্তু কোথায় বহু দূরে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে গল্পের মধ্যেই এক সময় প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—"ছেলেবেলায় যে শিউলি গাছটার তলায় খেলতাম আমরা, তার চারাটা বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে সেবার দেখলাম—আছে সেটা রে সাতকড়ি?"

BanglaBook.org

সাতকড়ি উত্তর দিলেন—“থাকে কখনও? তুমি গেছলে সেও প্রায় এক যুগ হল, কতবার বন গজাল, কতবার কাটা হল তার মধ্যে।”

গিরিবালার দৃষ্টিটা ম্লান হইয়া গেল, কিছু বলিলেন না কিন্তু। কথাটা ভাইদের সবাই আর বড়বৌ অল্প অল্প বুঝিলেন। একটি ম্লান মৌন সবার মুখে রহিল ছাইয়া, সমীর অবশ্য না বুঝিয়া করিয়াই চলিল গল্প।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। একবার বেলে-তেজপুর দেখিয়া আসিতে হইবে, সমীর আসার পর থেকে সিমুর যাওয়ারও ঝোঁক হইয়াছে, আর বারদুয়েক আসিয়াও ছিল সে। ভাইয়েরা ছুতানাতা করিয়া দিনটা পিছাইয়া দিতেছেন; ও দুটো জায়গা হইলেই তো দ্বারভাঙ্গায় ফিরিবার তাড়া পড়িবে। গিরিবালা ভাইদের উদ্দেশ্যটা বুঝিয়াছেন নিশ্চয়, জানিয়া শুনিয়াই এলাকাড়ি দিতেছেন।...তাহার পর একদিন আচম্বিতেই ফিরিবার জন্য তাড়াহুড়া লাগাইয়া দিলেন।

খান-কতক বাড়ি পরেই গোঁসাইদের বাড়ি, গিন্নির সঙ্গে খুব ভাব হইয়াছে গিরিবালার। বাড়িতে বিগ্রহ ওঁদের গোপাল; নিজের পূজা সারিয়া গিরিবালা রোজ একবার প্রণাম করিতে যান, গিন্নীর সঙ্গে গল্পস্বল্পও হয়। আজ গিয়াই দেখেন বাড়িতে হৈ-চৈ পড়িয়া গেছে—গোপালের ভোগ রান্না হইয়া ওঠে নাই, গিন্নী বকাবকি লাগাইয়া দিয়াছেন, দুটি বৌ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। গিরিবালা যাইতে গিন্নী তাঁহাকেই সাক্ষী মানিয়া বলিলেন—“বলুন দিদি, ঠাকুর শুনতেই ঠাকুর, অবোধ বালক বৈ তো কিছু নয়, বাড়িতে বেঁধে রেখে এই রকম করে উপোস করিয়ে রাখা—পুজোর নামে এ নিগ্রহ কেন বাপু?”...

গিরিবালা অবশ্য বৌদের পক্ষই একটু লইয়া গিন্নীকে ঠাণ্ডা করিলেন! ভোগ হইয়াই আসিয়াছিল, ঠাকুরের সেবা হইলে কিন্তু প্রণাম করিয়া দু-একটা কথার পরই তিনি উঠিয়া আসিলেন। সামলাইয়াই ছিলেন, বাড়িতে আসিয়া কিন্তু মনের বিষণ্ণতাটাকু বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। বড় ভাজকে প্রশ্ন করিলেন—“বৌ, হরিচরণ বেরিয়ে গেছে?”

কিশোর ছিলেন, বাহিরে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন—“কেন গা দিদি?”

গিরিবালা সহজ ভাবটা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—“বলছিলাম...বলছিলাম যে গাড়িটা কখন্?”

“বেলে-তেজপুরের? গাড়ি তো অনেকগুলো—”

গিরিবালা বাধা দিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—“বেলে-তেজপুরে আর যেতে দিলি কোথায়? দ্বারভাঙ্গার গাড়ির কথা বলছিলাম—ফিরতে হবে না?”

তিন বৌয়েই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ যাওয়ার কথায় সকলেই বিস্মিত হইয়া গেছেন, গিরিবালা যতই মুখে হাসি টানিয়া রাখার চেষ্টা করুন, কিন্তু হঠাৎ কিছু যে একটা হইয়াছে সেটা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। বড়-বৌয়ের সঙ্গে বয়সের পার্থক্য বেশি না হওয়ায় একটু সাহসের সঙ্গেই কথা বলেন, বলিলেন—“হঠাৎ এত তাড়া কেন দিদি? দু'দিন থাকবে আমরা এই জানি, হঠাৎ বাড়ি ঢুকেই গাড়ির খোঁজ? সেখানে শত্রু-মুখে ছাই দিয়ে সব ক'টি বৌ রয়েছে, কি আর তোমার এমন মাথা-ব্যথা গা যে—”

গিরিবালা হাসিবার চেষ্টা করিয়াই আরম্ভ করিলেন—“সেই জন্যেই কি বৌ?—কতদিন

BanglaBook.org

হল, যেতে হবে না?"

তাহার পরই রাগিয়া উঠিলেন—"তুই যখন তুললিই কথা বৌ—ঐ শৈলেনটা — মানুষের মতন মানুষ হয়ে বিয়ে-থা করে সংসারী হত, নিশ্চিন্দি থাকতাম—এখন কি যমের বাড়ি গিয়েও আমার সোয়াস্তি আছে?...সময়ে ভাতের থালাটা সামনে পড়ল কি না পড়ল...অবিশ্যি, করছে না কি? বৌয়েরা আরও বেশি করেই করে বরং...কি কথায় কি কথা এসে পড়ল ; তা নয়, ছেলেদের ভাবনা নয় ; অনেক দিন হলও তো এখানে..."

বেশ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। ভাইয়েরা চেনেন, শৈলেনের কথাটা যে নিতান্ত হঠাৎ আসিয়া পড়ে নাই সেটা বেশ বুঝিলেন, বেশি জিদ করিলেন না। সেদিনই আর হয় না, তাহার পরের দিন যাওয়া ঠিক হইল।

যাওয়ার কিছুক্ষণ আগের একটি ছোট ঘটনা : মেজবৌ সকাল থেকেই যেন সুযোগ খুঁজিতেছেন, কিন্তু বলিতে চান। বিকালে একটু একান্তে পাইয়া বলিলেন,—"দিদি, একটা কথা রাখবে?"

মুখে লজ্জা আর সঙ্কোচের সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ভয় লাগিয়া আছে ; বড় কৌতূহল হইল গিরিবালার, প্রশ্ন করিলেন—"কি কথা, বল্ না।"

"যেন মাথায় সিঁদুরটুকু নিয়ে যেতে পারি ; তুমি পুণ্যবতী, আশীর্বাদ করো দিদি।"

হিন্দু মেয়ের সাধারণ ভিক্ষা হইলেও, বিশেষ করিয়া চাহিবার কি এমন কারণ ঘটিয়াছে! কয়েক মুহূর্ত গিরিবালার মুখে কোন কথাই যোগাইল না। তাহার পর কারণটা বুঝিলেন, দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—স্বামীর সঙ্গে বয়েসের তফাতটা একটু বেশি, তাই এই শঙ্কা ; পিঠে হাত দিয়া স্নেহভরে বলিলেন—"তাই যাবি বোন, আমার আশীর্বাদে যদি কিছু থাকে বল তো তাই যাবি।"

"বল খুবই আছে দিদি, আমি যাবই, দেখে নিও তুমি।"

গিরিবালা রাগ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—"মরণ! আমি বর দিলাম, ও আমায় শাপ দিচ্ছে উল্‌টে!— তুমি যাবে, আর আমায় তাই দেখতে হবে, আমিই বুঝি মার্কণ্ডের পরমায়ু নিয়ে এসেছি!"

ভাজকে দেওয়া আশীর্বাদ গিরিবালার নিজেরই একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

প্রায় বছরখানেক পরের কথা। চাকরি লইয়া শৈলেন গেছে বাহিরে। এই একটা বড় পরিবর্তন সংসারে। গিরিবালা গিয়া গোছগাছ করিয়া দিয়া কিছুদিন থাকিয়া ফিরিয়া আসিলেন দ্বারভাঙ্গায়। সংসার আবার পুরানো খাতে বহিয়া চলিল ; বাড়তির মধ্যে ছেলের উপর অভিমানটুকু আবার জাগিয়া উঠিল গিরিবালার মনে—এ-চিন্তাটুকু সে সঙ্গের সাথী করিয়া রাখিলই তাঁহার!

বর্ষার সন্ধ্যা। শরীরটা একটু খারাপ ছিল, শৈলেন আজ অফিসে যায় নাই, বাড়িতে বসিয়াই দিনের কাজগুলা আস্তে আস্তে শেষ করিয়া যাইতেছে। হঠাৎ টেবিলের উপর টেলিফোন্‌টা বাজিয়া উঠিল, রিসিভারটা উঠাইতে খবর পাওয়া গেল একটা ট্রাঙ্ককল আসিয়াছে। কানেক্‌শন দিল।

শশাঙ্ক দ্বারভাঙ্গা থেকে কথা কহিতেছেন। বাবার অসুখ ; চিন্তার কারণ নাই, তবে শৈলেন যেন শীঘ্র চলিয়া আসে। তিন মিনিটের মেয়াদ, আরও দু-একটা এদিক-ওদিক

banglabook.org

কথা কহিতেই সময়টা শেষ হইয়া গেল।

একটু ভুল হইয়া গেল। শশাঙ্কর উদ্দেশ্য এইটুকুই ছিল যে শৈলেন যেন অতিরিক্ত চঞ্চল না হইয়া পড়ে। শৈলেন কিন্তু সংবাদটা তাঁহার বলা-মতোই গ্রহণ করিল, শরীরটাও ছিল খারাপ, রাত্রে যে একটা গাড়ি ছিল, সে-গাড়িতে আর গেল না।

পরদিন দুপুরে আবার একটা কল্। বোকার মতো খবরটা যথাযথ ভাবেই লওয়ায় বিরক্ত হইয়াছেন শশাঙ্ক ; বাবার অসুখটা খারাপই, শৈলেন যেন তাড়াতাড়ি চলিয়া আসে।

বৈকালেই একটা গাড়ি। যেমন ছিল সব ফেলিয়া ছড়াইয়া শৈলেন যাত্রা করিল। মনে উদ্বেগের সঙ্গে অপরাধের গ্লানি লাগিয়া রহিয়াছে। কি দেখিবে গিয়া?—দেখিতে পাইবে কি?...কেন এমন ভুলটা হঠাৎ হইয়া গেল এমন করিয়া? বাবা আজ দুপুর পর্যন্ত ছিলেন—কাল যাইলে দেখা হইতই, এখন তো সবই অনিশ্চিত।

আর মা?—দুজনকেই হারাইতে বসিল নাকি শৈলেন? দাদার আঘাতের সময় মায়ের মুখে যে উদ্বেগ আর আশঙ্কা দেখিয়াছিল শৈলেন, সেটা তো মৃত্যুর কাছাকাছিই একটা ব্যাপার। আরও বয়স হইয়াছে মা'র, আরও দুর্বল —সে-দুর্বলতার মধ্যেও আছে তাহারই অপরাধ...মা সহিতে পারিবেন না, তাঁহাকেও হারাইতে হইবে ; ভগবান দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করাইবার জন্যই কি এই ভুলটুকু করাইলেন?

রাত্রি বারোটার সময় শৈলেন আসিয়া স্টেশনে নামিল। বাড়ি পর্যন্ত পথটা যেন পৃথিবীর এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত পড়িয়া আছে—সুদীর্ঘ ক্লান্তিতে ভরা, অথচ এ-ও সাহস হয় না যে এক কথাতেই গিয়া পৌঁছাইয়া যাই।...কী দেখিতে হইবে?

বাড়ি একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া আছে। বাবার ঘরের একটা দরজা বাহিরের দিকে ; সেটা খোলা রহিয়াছে। শৈলেন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। বাবা বিছানার মাঝখানে চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন, পাশে মা আছেন বসিয়া। পা দুইটি ছড়ানো। বোধ হয় দুই-তিন দিন আগে আলতা পরিয়াছিলেন, হালকা রাঙা দাগ লাগিয়া আছে।

শুধু সুস্থ দেখাই নয়, দুইজনের সংস্থানের মধ্যে এমন অনির্বচনীয় কিছু একটা ছিল যাহার জন্য শৈলেন প্রণাম ভুলিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল—যেন একটি পৌরাণিক উপাখ্যান মূর্তি ধরিয়া রহিয়াছে সামনে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের বিলম্ব ; তাহার পর প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে বিপিনবিহারী প্রশ্ন করিলেন—"ভাল ছিলে তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—বলিয়া শৈলেন মা'র মুখের পানে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিল। গিরিবালা বলিলেন—"এখন অনেকটা সামলেছেন, তবে হয়েছিল ভয়ানক ; দুটো দিন আর দুটো রাত যে কি ভাবে কেটেছে। বুকের আর পিঠের যন্ত্রণায় ক্রমাগত ছটফট করেছেন, উঠে স্বস্তি নেই, শুয়ে স্বস্তি নেই, বসে স্বস্তি নেই, দাঁড়িয়ে যেন দেখা যায় না—এমন কাতরানি—বাবাঃ, ঢের অসুখ দেখেছি, এ রকম যন্ত্রণার অসুখ দেখি নি।"

বিপিনবিহারী বলিলেন—"অতিরিক্ত ভয় পেয়ে গেছে এরা শৈলেন।"

গিরিবালা বলিলেন—"তুমি চুপ করো বাপু, ভয় পেয়ে গেছে সাধে! সে যদি দেখতিস শৈল, ডাক্তারের পর্যন্ত ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছল। এখন তো সামলেছেন অনেকটা—আজ দুপুরের পর থেকে, সকাল পর্যন্ত যে কি অবস্থা গেছে, মনে হলে জ্ঞান থাকে না। কী যে হবে, আমি তো ভেবে কূল পাচ্ছি না শৈল।"

শৈলেন মা'র পানে চাহিয়া আছে, এক অদ্ভুত দৃশ্য, একেবারে অপ্রত্যাশিত বলিয়া

BanglaBook.org

আরও অদ্ভুত বোধ হইতেছে—মা খুব শুকাইয়া গেছেন, চোখে-মুখে রাজ্যের শ্রান্তি; দু'দিন দু'রাত এক মুহূর্তের জন্য চক্ষু বোজেন নাই, সমস্ত ঝড়টার মধ্যে সাধ্যমতো যে নিজেকেই আগাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, এর চিহ্ন সমস্ত শরীরে সুস্পষ্ট। কিন্তু এই বিশুষ্কতা— বিশৃঙ্খলার পাশেই আরও একটি জিনিস আছে যাহাতে মনে হয় মা যেন তপস্যা হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন—সিদ্ধি একেবারে হাতে লইয়া। দাদার আঘাতের সময় মাকে দেখিয়াছিল, আজও দেখিতেছে—কত তফাৎ যে যেন হিসাব হয় না। সে উদ্বেগ, সে আশঙ্কার চিহ্নমাত্র নাই, ক্লান্তির সঙ্গে ওতঃপ্রোত হইয়া আছে একটি গাঢ় শান্তি; ভয়ের ভাষাতেই অবস্থাটা বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরে একটি গভীর নিশ্চিন্ততার সুর। মুখে বলিতেছেন—"আমি তো ভেবে কূল পাচ্ছি না শৈল কিন্তু বেশ বোঝা যায় কূলের রেখা তাঁর দৃষ্টিতে খুব স্পষ্টই একেবারে।

বাড়ির ভিতরে আরও কয়েকজন জাগিয়া তখনও, ছোট ভাই খোকা ডাক্তার, ওষুধ লইয়া আসিল, শৈলেন আসিয়াছে শুনিয়া শশাঙ্ক আসিলেন। ঘরেই একটু গল্প-স্বল্প করার পর বলিলেন—"ভেতরে চল, খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিক্।"

ভিতরে আসিয়া শৈলেন সমস্ত ইতিহাসটা ভাল করিয়া শুনিল। শক্তিমান লোক নিজের শক্তিমত্তায় অতিরিক্ত বিশ্বাসে এক এক সময় যে বিপদ আনিয়া ফেলে এ-ও হইয়াছে তাই। ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে কিছু জমি আছে, রেলে করিয়া যাইতে হয়। পাণ্ডুল থেকেই জমির উপর টান, ছেলেদের মানা সত্ত্বেও বিপিনবিহারী নিজে গিয়া দেখা-শুনা করেন। এবার ট্রেন ধরিবার সময় বিলম্ব হইয়া যাওয়ায় বাড়ির গাড়ি হইতে নামিয়া প্লাটফর্ম আর পুলের উপর দিয়া খানিকটা ছুটাছুটি করেন। সেখানে গিয়া পিঠে একটা বেদনা ওঠে, এবং বুক পর্যন্ত চরাইয়া পড়ে। স্থানীয় ডিস্টিক্টবোর্ডের ডাক্তারকে না দেখাইয়া বিপিনবিহারী জমির মুন্সিকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া আসেন। ওদিককার মেঠো রাস্তা, তারপর রেলগাড়ি, পরে ঘোড়ারগাড়ি—সমস্ত ধকলটা অসুস্থ শরীরের উপর বহিয়া বিপিনবিহারী যখন বাড়ি পৌঁছিলেন তখন রোগ একেবারে পূর্ণমাত্রায়।

শশাঙ্ক বলিলেন—"ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েই চিকিৎসা আরম্ভ করলে শৈল— 'থ্রম্বসিস অব দি হার্ট"—বাঁচে খুব কম, এ বয়সে তো নয় বলিলেই চলে—তায় যে ভাবে আরম্ভ হয়েছে আর যে স্টেজে চিকিৎসা শুরু হয়েছে...দুটো দিন আর দুটো রাত যে কিভাবে কেটেছে! তুই পরের গাড়িতেই না এসে ভুল করেছিলি নিশ্চয়, কিন্তু সামলে যখন গেছে এখন মনে হচ্ছে না এসে ভালোই হয়েছিল—বাবার সে বিশ্রী ছটফটানি চোখে দেখতে হয় নি।"

তাহার স্মৃতিতেই যেন শশাঙ্ক কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শৈলেন প্রশ্ন করিল —"এখন ডাক্তাররা কি বলছেন, বিপদটা কেটে গেছে?"

"অতটা ভরসা দেন না, বয়সটা তো খারাপই। তবে এসব ব্যাপারে লক্ষণটা আবার অন্য জায়গাতেও খুঁজি...তুই মা'র মুখের চেহারাটা লক্ষ্য করেছিস?"

শৈলেন দৃষ্টি তুলিয়া একটু হাসিল, বলিল—"করেছি দাদা, অথচ যখন ভূমিকম্পে চোট খেয়ে পড়েছিলে, কি আতঙ্ক মা'র চোখে!"

"ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে মা বড় দুর্বল শৈল, স্বভাবটাই ঐ রকম ওঁর—একটু কিছু হলে তাই যেন ভেঙে পড়েন, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে ওঁর অদ্ভুত একটা শক্তি আছে যেন। আমি

এমনিই একটু আশাবাদী, জানিসই, তায় এই মায়েরই ছেলে তো, ওঁর এই অদ্ভুত নিশ্চিন্দি ভাব দেখে সত্যিই মনে হচ্ছে বিপদ যেন কাটিয়ে উঠেছি আমরা।"

হয়তো এ সবই কল্পনা মাত্র—মা লইয়া ছেলের তো থাকেই গুমর—গিলিবালার ছেলের তো আরও বেশি করিয়াই থাকিবার কথা, পরমায়ু কি এতই দেওয়া-নেওয়ার জিনিস? গিরিবালার যে প্রশান্তি, যে নিঃসংশয় নিশ্চিন্ততা সেটা হয়তো ওঁর জীবনেরই সহজ পরিণতি, যিনি সব দিয়াছেন তাঁহার উপর অটল বিশ্বাসের একটা দিক—যদি ফিরাইয়াই লন তিনি আবার সব তো করিবারই বা আছে কি? প্রসন্ন মনেই তাঁহার এই বঞ্চনাকেও মাথা পাতিয়া লওয়া ভিন্ন উপায় কি আছে আর?

শৈলেন ভাবে এ কথা; যুগটাই যে এই রকম—জ্ঞানের আলোয় পদে-পদেই বিজ্ঞানের সংশয়-ছায়া আসিয়া পড়িতেছে—সম্ভব ছিল কি সাবিত্রীর তপস্যা? মৃত্যুর অসপত্ন অধিকারের মধ্যে মানুষ তার চিন্তা, বাসনা, আশা লইয়া এমন ভাবে কি পারে বিপর্যয় ঘটাইতে? প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, তবে তাতে শৈলেনের গর্বের এতটুকু হয় না লাঘব—ঐ যে অটল বিশ্বাসের প্রশান্তি, সে-ও তো একটা তপস্যাই—তার মায়েরই...এই বিশ্বাসই কি আরও বড় তপস্যাই নয়?

কিন্তু বিশ্বাসের তপস্যাই হোক বা আয়াসের তপস্যাই হোক, গিরিবালাকে তাহার মূল্য চুকাইয়া দিতে হইল। বিপদ কাটিল, কিন্তু সময় লইল, এবং এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গিরিবালার স্বাস্থ্য ভিতরে ভিতরে ভাঙিয়া পড়িল।

বাহিরটা কিন্তু ক্রমেই হইয়া উঠিতে লাগিল আরও প্রশান্ত, আরও প্রসন্ন, আরও উজ্জ্বল।...এ তো হয়ই—ইন্ধন যত আসে দগ্ধ হইয়া শিখার উজ্জ্বলতা তো ততই আরও বাড়ে।

॥ ৪ ॥

বিপিনবিহারী অসুখে পড়িয়াছিলেন আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি, ভাদ্রের শেষের দিকে এক দিন ডাক্তারেরা বলিলেন, আর ভাবনার তেমন কিছু নাই।

গিরিবালা পূজা করিতেছিলেন, আসিলে বিপিনবিহারী হাসিয়া বলিলেন—"এবার আমার ছুটি, ডাক্তাররা বাইরে ঘুরে-টুরে বেড়াবার হুকুম দিয়ে গেল।" একটু থামিয়া বলিলেন—"তোমারও ছুটি...বড্ড ভুগলে দুটো মাস ধরে।"

গিরিবালা একটু হাসিয়া স্বামীর মুখের ওপর দৃষ্টি তুলিয়া বলিলেন—"দিলে তো ছুটি নিজের মুখে?"

বিপিনবিহারীর হাসিটা সঙ্গে-সঙ্গেই মলিন হইয়া যাইতেই গিরিবালার হুঁশ হইল। কথাটা যেন অতর্কিতেই মুখে দিয়া বাহির হইয়া গেছে—শেষ বয়সে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আগে যাওয়া লইয়া হয় রহস্য—হয়তো সেই অভ্যাসেই। তবুও ঠিক এই সময়টিতে বলিবার কথা নয় যেন। চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া হাসিয়াই বলিলেন—"ঘোরাঘুরি কিন্তু বুঝে করতে হবে। নিজের ভোগান্তির কথা এত শীগ্‌গির ভুললে চলবে না। আমায় আর কতটুকু ভুগতে হয়েছে?"

আরও অন্য কথা আনিয়া ফেলিলেন—ঐ দুটি কথা কিন্তু সমস্ত দিন থাকিয়া থাকিয়া

BanglaBook.org

বিঁধিতে লাগিল মনে—নূতন কথা নয়, কিন্তু কেমন যেন বেমানান হইয়া গেছে। অবশ্য সময়ের দিক দিয়া, স্বামীর শারীরিক আর মানসিক অবস্থার দিক দিয়া বিবেচনা করিতে গেলে, নয়তো রহস্য হিসাবেই তো নেওয়া যায়।

আশ্বিন আসিয়া পড়িল। এবারে বর্ষাটা ছিল প্রবল—শুধু আকাশেই নয়, মনেও, তাই আশ্বিনটা লাগিতেছে বড় মিষ্ট। আরও একটা কারণ আছে, বিপিনবিহারীর অসুখের উপলক্ষে পূজার ছুটির সঙ্গে কিছু বেশি ছুটি লইয়া, বাহিরে যে ছেলেরা আছে কিছু দিন আগেই আসিয়া পড়িয়াছে। মেয়েদের আসা নিয়মিত নয়, এবারে তাহারাও আসিয়াছে, এমন কি নাতনিদের লইয়া নাতজামাইয়েরাও ; আত্মীয়দের মধ্যেও কেহ কেহ আসিবে চিঠি দিয়াছে।...একটা বড় কঠিন অসুখ হইতে তো উঠিলেন বিপিনবিহারী, নূতন করিয়া একবার দেখিবার আগ্রহ জাগিয়াছে সবার মনে। বহুদিন পরে সংসারটি পরিপূর্ণতায় যেন নিটোল হইয়া উঠিয়াছে। আরও পূর্ণ বরং আগের চেয়ে—সবারই তো এখন নিজের নিজের সংসার—শাখায় শাখায় প্রশাখা—প্রশাখায় পল্লব...

ছোটরাই থাকে সর্বক্ষণ ঘিরিয়া। তাহাদের গল্পের চাহিদা মিটাইয়া যেটুকু সময় বাঁচে সেটুকু পূজা, সংসার, ছেলেমেয়ে আর বিপিনবিহারীর মধ্যে ভাগাভাগি হয়।...ছেলেরা একটু বেশি আদায় করিবার চেষ্টা করে—বিশেষ করিয়া যে কয়জনের বাহিরে বাহিরেই কাটিতেছে। বলে—"গল্প তোমার ফুরোয় না মা?—ঝুলিতে যা আছে ঝেড়ে দিয়ে হঠাও না ওদের।...নতুন আরব্যোপন্যাস ফেঁদেছ নাকি?—জের আর মিটতে চায় না যে..."

চলতি গল্পের ঝুলি অনেক দিনই খালি হইয়াছে, গিরিবালা এখন অবলম্বন করিয়াছেন নিজের জীবনকে। আরব্যোপন্যাসই বটে ; জীবনের এ-প্রান্ত থেকে কি অপরূপই লাগে ও-প্রান্তর ছবিগুলি—যেখানটা হাসির আলো, আলোয় যেন ঝলমল করিতেছে ; যেখানটা বিষাদের ছায়া, কি অপরূপই যে তার স্নিগ্ধতা!...গল্প বলিয়া চলেন—বেলে-তেজপুরের শিউলিগাছের তলা—সিংহবাহিনীর উৎসব-মুখরিত প্রাঙ্গণ ; সিমুর—সাঁতরার গঙ্গার সেই প্রথম দিনের রূপ, জীবনে যাহা কেমন করিয়া চির নূতনই রহিয়া গেল ; পাণ্ডুলের অবরোধ আর তার বাইরের মুক্ত জীবনের স্বপ্ন, এই দ্বারভাঙ্গারই পুরানো ইতিহাস—যেদিন অশ্রুজলের সঙ্গে প্রথম আসিলেন, তার পরে...

চুপ করিয়া সবাই শোনে, নাতি-নাতনিদের মধ্যে যারা হয়তো একটু বেশি ভাবুক, হাঁ করিয়া মুখের পানে চাহিয়া থাকে—এত প্রত্যক্ষ—এই 'গিন্নী', ঐ দাদু, ঐ বাবা-মা-কাকারা এদের ঘিরিয়া এত রূপ-কথা!...গল্প শেষ হয় না—আরব্য উপন্যাসের মতোই পাকে-পাকে শৃঙ্খল যায় বাড়িয়া ; অনেক শ্রোতা, বিপুল তাহাদের কৌতূহল—প্রশ্ন ওঠে, মূল গল্প পায় বাধা, নন্তি থেকে গিয়া পড়ে দুলারমনে, দুলারমন থেকে হয়তো পালের মতো মোটা খসখসে শাড়ি-পরা খজনী, খজনী থেকে ছেঁড়া-কাপড়ে দুলালের বৌ। ...একটি অপরূপ আনন্দে-বিষাদে নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সমস্ত জীবনটি যেন ঘুরিয়া বেড়ান গিরিবালা—যত গোড়ার দিকের স্মৃতি, ততই যেন আরও মিষ্ট ; যত মধু সব ফুলের কেন্দ্রটিতেই জমা।

পূজা আসিয়া পড়িল। এমন পূজা গিরিবালার জীবনে আসে নাই, নিজের বলিতে যে যেখানে আছে সবাইকে মা দিয়াছেন আনিয়া—নিজে যেমন করিয়া সবাইকে লইয়া

BanglaBook.org

আসেন। কৃতজ্ঞতায় মনটা যায় ভরিয়া—তাহার মধ্যেই এই একবার হঠাৎ বিষাদের রেখাপাত হয়—খুব স্পষ্ট, ঠিক বোঝা যায় না; বিষাদের কোন কারণ নাই বলিয়া গিরিবালা চেষ্টাও করেন না বুঝিবার।...শরীরটা দু'দিন থেকে একটু যেন খারাপ যাইতেছে—খুব সামান্য একটু— হয়তো সেই জন্যই।

শহরে পূজা হয় কয়েক জায়গায়, বাঙালীর মেয়েরা তিন জায়গায় যায় মূর্তি দেখিতে —বারোয়ারী, নদীর তীরে কালীস্থান আর বড়বাজারে এক বাঙালীর বাড়ির পূজায়। শরীরকে খুব আমল দিলেন না গিরিবালা—সময়ের পরিবর্তনে পূজার সময় হয়ই একটু খারাপ। তবে কাল মহাষ্টমী, উপোসের ব্যাপার আছে, স্নান করিয়া নিকটে বারোয়ারী-তলা হইতেই সপ্তমীর প্রতিমা দেখিয়া অঞ্জলি দিয়া আসিলেন। শরীরটা ভালো হইল কি আর একটু খারাপই, চেষ্টা করিয়াই সে-খোঁজটা যেন এড়াইয়া গেলেন। ভরা বাড়িতে বাড়িভরা আনন্দের হট্টগোল, একটি প্রসন্ন, স্মিত হাস্যে তাহারই মধ্যে রহিলেন মিশিয়া। অষ্টমীর দিন ভালো করিয়াই স্নান করিলেন, তাহার পর গাড়ি আনাইয়া গেলেন কালীস্থান। অন্যান্য বার যে তৈয়ার রহিল তাহাকেই সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান; এবারে সব কিছুতেই কেমন একটা পূর্ণতার আবেগ আসিয়াছে, নিজেই তাগাদা দিয়া বধূদের, মেয়ে দুটিকে এবং বড় নাতনিদের স্নান করাইলেন, তাহার পর তাহারা প্রস্তুত হইলে সবাইকে লইয়া যাত্রা করিলেন।

কালীস্থান, বড়বাজার বারোয়ারিতলা হইয়া ফিরিতে প্রায় বৈকাল গড়াইয়া গেল। কাপড় বদলাইয়া গিরিবালা বারান্দায় পাতা একটা বেঞ্চে বসিয়া আছেন, উঠানে কচিদের হুটাহুটি আরম্ভ হইয়া গেছে, শৈলেন আসিয়া পাশে বসিল, দু-একটা কথার পর মুখের পানে চাহিয়া বলিল..."মুখটা বেশি যেন শুকনো মা তোমার!"

"উপোস করে আছি তো?...ঘুরেও এলাম এই।"

"এই দেখো! করেছ তো উপোস?...আর তোমার এ সব চলে না মা; কতবার বারণ করেছি সবাই। খেয়ে নাও তুমি।"

"এইটুকুর জন্যে আবার খাবো? আরতিটা দেখে একেবারে—"

একটা কেমন সন্দেহ হওয়ায় শৈলেন কপালে হাত দিল, তাহার পরই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—"মা, তোমার গা গরম!—এ কি, কচি মেয়ের মতন জ্বর নুকিয়েছ কেন মা?"

প্রবীণ এক দিক দিয়া হইয়াই পড়ে কচি; অবুঝ কচি মেয়েরই মতো মুখ ভার করিয়া গিরিবালা অনেকখানি অপ্রসন্নতার সঙ্গেই গিয়া বিছানায় শুইলেন—সবাই যেন জোর করিয়া তাঁহাকে এত সঙ্গীর মধ্যে পূজার এমন আনন্দ থেকে বঞ্চিত করিল। একটি ছায়া পড়িল বাড়িতে, তবে ছেলেপুলের বাড়ি, একটা চাঞ্চল্য রহিলই জাগিয়া।

এদিকে মাঝে মাঝে কয়েকবার হইয়াছেও বাতিকের জ্বর, একেবারে চরম কিছুর আশঙ্কা জাগিল না কাহারও মনে। সে রকম কিছু লক্ষণ দেখা দিল না। নবমীর রাত্রি পর্যন্ত সাধারণ চিকিৎসাতেই জ্বরটা রহিল এক ভাবে আটকাইয়া। কিছু যে হয় নাই, উৎসবের বাড়িতে সে-ভাবটা বজায় রাখিবার জন্যই যেন গিরিবালা নাতি-নাতনিদের বেশি করিয়া ডাকিয়া গল্প করিলেন।...প্রবঞ্চনা দিয়া নিজেকে লুকাইয়া সংসার করাই তো অভ্যাস; অসুখ শরীরে খালি-পেটে পান চিবাইয়া একদিন তো স্বামীকে করিয়াছিলেন

BanglaBook.org

বঞ্চিত, পুত্রকেও চাহিয়াছিলেন বঞ্চিত করিতে।

দশমীর দিন আর বঞ্চনা চলিল না; বাড়াবাড়ি হইল, ডাক্তার শুষ্ক মুখে বলিলেন —ম্যালিগ্‌নেন্ট ম্যালেরিয়া—ব্রেন অ্যাফেক্ট করতে পারে যে কোন সময়েই।

বিজয়ার রাত্রি বলিয়াই সবার মুখ যেন আরও শুকাইয়া গেল; একটা অন্ধ ভয় —গিরিবালার বিদায় হওয়ারই যে রাত্রি এটা।

কিন্তু অপূর্ণতা জীবনে কোনখানেই ছিল না, আজও রহিল না; সজ্ঞানেই স্বামীর বিজয়ার পদধূলি লইলেন গিরিবালা, সজ্ঞানেই সবাইকে বিজয়ার পদধূলি দিলেন।

পরদিন সকাল হইতেই চৈতন্য লোপ পাইল। আশা তবু ধরিয়াই রহিল সবাই, বিজয়া যখন কাটিয়া গেছে তখন আর ভয় নাই নিশ্চয়।...সন্তানদের উপর আশার শেষ আশীর্বাদটুকুও দু'দিন ধরিয়া বিতরণ করিয়া, ত্রয়োদশীর দিন সকালে গিরিবালা জীবনের শেষ নিঃশ্বাস মোচন করিলেন।

গ্রন্থ সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG